তারাশঙ্কর-রচনাবলী

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ষষ্ঠ খণ্ড



মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স
প্রা ই ভে ট লি মি টে ড
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩.

প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৩৯২, এপ্রিল ১৯৮৫

উপদেষ্টা পরিষদ :

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার
আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
ডক্টর সুকুমার সেন
শ্রীপ্রমথনাথ বিশী
ডক্টর প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত
শ্রীজিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত
ডঃ তারাপদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক :

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র
শ্রীসুমথনাথ ঘোষ : শ্রীসনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও পি. এম. বাক্‌চি এণ্ড কোং (প্রাঃ) লিঃ, ১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীজয়ন্ত বাক্‌চি কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

কবি

এক

শুধু দস্তুরমত একটা বিস্ময়কর ঘটনাই নয়, রীতিমত এক সংঘটন। চোর ডাকাত বংশের ছেলে হঠাৎ কবি হইয়া গেল।

নজীর অবশ্য আছে বটে,—দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ। কিন্তু সেটা ভগবৎ-লীলার অঙ্গ। মূককে যিনি বাচালে পরিণত করেন, পঙ্গু যাঁহার ইচ্ছায় গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে, সেই পরমানন্দ মাধবের ইচ্ছায় দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের জন্ম সম্ভবপর হইয়াছিল; রামায়ণের কবি বাল্মীকি ডাকাত ছিলেন বটে তবে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণের ছেলে। সেও ভগবৎ-লীলা। কিন্তু কুখ্যাত অপরাধ-প্রবণ ডোমবংশজাত সন্তানের অকস্মাৎ কবিরূপে আত্মপ্রকাশকে ভগবৎ-লীলা বলা যায় কি না সে বিষয়ে কোন শাস্ত্রীয় নজীর নাই। বলিতে গেলে গা ছম-ছম করে। সুতরাং এটাকে লোকে একটা বিস্ময় বলিয়াই মানিয়া লইল। এবং বিস্মিতও হইল।

গ্রামের ভদ্রজনেরা সত্যই বলিল—এ একটা বিস্ময়! রীতিমত!

অশিক্ষিত হরিজনরা বলিল—নেতাইচরণ তাক্ লাগিয়ে দিলে রে বাবা!

যে বংশে নিতাইচরণের জন্ম, সে বংশটি হিন্দু সমাজের প্রায় পতিততম স্তরের অন্তর্গত ডোমবংশ, তবে শহর অঞ্চলে ডোম বলিতে যে স্তরকে বুঝায় ইহারা সে স্তরের নয়। এ ডোমেরা বাংলার বিখ্যাত লাঠিয়াল—প্রাচীনকাল হইতেই বাহুবলের জন্য ইহারা ইতিহাস-বিখ্যাত। ইহাদের উপাধিই হইল বীরবংশী। নবাবী পল্টনে নাকি একদা বীরবংশীরা বীরত্বে বিখ্যাত ছিল। কোম্পানীর আমলে নবাবী আশ্রয়চ্যুত হইয়া দুর্ধর্ষ যুদ্ধব্যবসায়ীর দল পরিণত হয় ডাকাতে। পুলিসের ইতিহাস ডোমবংশের কীর্তিকলাপে পরিপূর্ণ। এই গ্রামের ডোম-পরিবারগুলির প্রত্যেকের রক্তে রক্তে এখনও সেই ধারা প্রবাহিত। পুলিস কঠিন বাঁধ দিয়াছে সে প্রবাহের মুখে—লোহা দিয়া বাঁধিয়াছে। হাতকড়ি, লোহার গরাদে দেওয়া ফটক, ডাণ্ডা-বেড়ীর লোহা প্রত্যক্ষ; এ ছাড়া ফৌজদারী দণ্ডবিধির আইনও লোহার আইন। কিন্তু তবু বাছিয়া বাছিয়া ছিদ্রপথে অথবা অন্তরদেশে ফল্গুধারার মত নিঃশব্দে অধীর গতিতে আজও সে ধারা বহিয়া চলিয়াছে। নিতাইয়ের মামা গৌর বীরবংশী—অথবা গৌর ডোম এ অঞ্চলে বিখ্যাত ডাকাত। এই বৎসরখানেক পূর্বেই সে পাঁচ বৎসর 'কালাপানি' অর্থাৎ আন্দামানে থাকিয়া দণ্ড ভোগ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে।

নিতাইয়ের মাতামহ—গৌরের বাপ শম্ভু বীরবংশী আন্দামানেই দেহ রাখিয়াছে।

নিতাইয়ের বাপ ছিল সিঁদেল চোর। পিতামহ ছিল ঠ্যাঙাড়ে। নিজের জামাইকেই নাকি সে রাতের অন্ধকারে পথিক হিসাবে হত্যা করিয়াছিল। জামাইমারীর মাঠ এখান হইতে ক্রোশ খানেক দূরে।

ইহাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষের ইতিহাস পুলিস-রিপোর্টে আছে, সে এক ভীতিপ্রদ রক্তাক্ত ইতিহাস।

এই নিতাইচরণ সেই বংশের ছেলে। খুনীর দৌহিত্র, ডাকাতের ভাগিনেয়, ঠ্যাঙাড়ের পৌত্র, সিঁদেল চোরের পুত্র—নিতাইয়ের চেহারায় বংশের ছাপ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। দেহ কঠিনপেশী, দীর্ঘ সবল, রঙ কালো, রাত্রির অন্ধকারের মত। শুধু বড় বড় চোখের দৃষ্টি তাহার বড় বিনীত এবং সে দৃষ্টির মধ্যে একটি সকরুণ বিনয় আছে। সেই নিতাই অকস্মাৎ কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। লোকে সবিস্ময়ে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল,—নিতাই গৌরবের লজ্জায় অবনত হইয়া জোড় হাতে সকরুণ দৃষ্টিতে মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার সঙ্গে ঠোঁটের

রেখায় ঈষৎ একটু লজ্জিত হাসি।

ঘটনাটা এই—

এই গ্রামের প্রাচীন নাম অট্টহাস—একান্ন মহাপীঠের অন্যতম মহাপীঠ। মহাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম মহাদেবী চামুণ্ডা। মাঘী পূর্ণিমায় চামুণ্ডার পূজা বিশিষ্ট একটি পর্ব; এই পর্ব উপলক্ষে এখানে মেলা বসিয়া থাকে। এই মেলায় চিরকাল জমজমাট কবিগানের পালা হয়। নোটনদাস ও মহাদেব পাল—দুইজনে এ অঞ্চলে খ্যাতনামা কবিয়াল, ইহাদের গান এখানে বাঁধা। এবার সেই প্রত্যাশায় অপরাহ্ণ বেলা হইতেই লোকজন জমিতে শুরু করিয়া সন্ধ্যা নাগাদ বেশ একটি জনতায় পরিণত হইয়াছিল—প্রায় হাজার দেড় হাজার লোকের একটি সমাবেশ।

সমারোহ করিয়া আসর পাতা হইয়াছিল, সন্ধ্যায় চারিদিকে চারিটা পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বালা হইল, কবিয়ালদের মধ্যে মহাদেবের দল আসিয়া আসরে বসিল, কিন্তু নোটনদাসের সন্ধান মিলিল না। যে লোকটি নোটনকে ডাকিতে গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—বাসাতে কেউ কোথাও নাই মশায়—লোক না—জন না—জিনিস না, পত্তর না—সব ভোঁ-ভোঁ করছে। কেবল শতরঞ্জিটা পড়ে রয়েছে—যেটা আমরা দিয়েছিলাম।

শুনিয়া মেলার কর্তৃপক্ষ স্তম্ভিত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল। লোকেরা হৈ হৈ করিয়া গোলমাল করিয়া উঠিল।

* * *

কাজটা যে ঘোরতর অন্যায় হইয়াছে তাঁহাতে সন্দেহ নাই। তবু বলিতে হইবে যে নোটনদাসের দোষ নাই। গতবার হইতেই তাহার টাকা পাওনা ছিল। গতবার মেলা-তহবিলে টাকার অনটন পড়িয়াছিল, সেইজন্য চামুণ্ডার মোহন্ত তাহাদের মাথায় বিল্বপত্র দিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—আসছে বার। বাবা সকল, আসছে বার। আসছে বার গাওনার আগেই তোমাদের দু বছরের টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে।

নোটন এবং মহাদেব বহুদিন হইতেই এ মেলায় গাওনা করে, এককালে এ মেলার সমৃদ্ধির সময় তাহারা পাইয়াছেও যথেষ্ট, সেই কৃতজ্ঞতা বা চক্ষুলজ্জাতেই গতবার তাহারা কিছু বলিতে পারে নাই। কিন্তু এবার আসিয়া নোটন যখন মোহন্তকে প্রণাম করিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল, তখনও তিনি টাকার পরিবর্তে তাহার হাতে দিলেন তাজা টকটকে একটি জবা ফুল, এবং আশীর্বাদ করিলেন—বেঁচে থাক বাবা, মঙ্গল হোক।

বলিয়াই তিনি প্রসঙ্গান্তরে মনোনিবেশ করিলেন। লোক-জন অনেকেই সেখানে বসিয়াছিল—অধিকাংশই গ্রামের ভদ্রলোক, তাঁহাদের সঙ্গেই প্রসঙ্গটা আগে হইতে চলিতেছিল। নোটন প্রসঙ্গটা শেষ হইবার অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। মজলিসে আলোচনা হইতেছিল—মেলার এবং মা চামুণ্ডার স্থানের আয়ব্যয় লইয়া। মোহন্ত আয় এবং ব্যয়ের হিসাব সবিস্তারে বিবৃত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া দিলেন যে, মা চামুণ্ডার হ্যাণ্ডনোট না কাটিলে আর উপায় নাই। পরিশেষে মৃদু হাসিয়া বলিলেন—দাও না, তোমরা কেউ টাকা ধার দাও না বাবা! দেখ এমন খাতক আর মিলবে না। এ খাতকের কুবের খাজাঞ্চি। ধর্মের কাগজে কামনার কালিতে হ্যাণ্ডনোট লিখে নিয়ে অর্থ দিলে—ওপারে মোক্ষসুদ সমেত পরমার্থ কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে পাবে। বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই হাসিল। নোটনদাসও হাসিল। তবে সে বুদ্ধিমান। সুতরাং তারপরেই মজলিস হইতে সরিয়া পড়িল।

নোটনের বাসায় তখন নূতন একটা বায়না আসিয়া তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে একটা মেলা বসিতেছে, সেখানে এবার প্রচুর সমারোহ, তাহারা কবি-গানের আসরে নোটনদাসকে পাইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছে। অন্তত এখানকার মেলায় গাওনা শেষ করিয়াও যাইতে হইবে। আর যদি এখানে কোনরকমে শেষের দিনের গাওনাটা না গাহিয়া আগেই যাইতে পারে তাহা হইলে তো কথাই নাই। সে ক্ষেত্রে দক্ষিণার কাঞ্চন-মূল্যও ওজনে ভারী হইবে।

নোটন হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিল—জয় মা চামুণ্ডা। তারপর সে তাহার দোহারকে বলিল—বোতলটা দে তো! বোতল না হইলে নোটনের চলে না। বোতলের মুখেই খানিকটা পানীয় পান করিয়া নোটন গা-ঝাড়া দিয়া বসিল।

লোকটি নোটনের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল, সে বলিল—তা হ'লে ওস্তাদ, আমাকে একটা কথা বলে দেন। আমাকে আবার এই ট্রেনেই ফিরতে হবে। ট্রেনের তো আর দেরি নাই।

নোটন হাসিয়া বলিল—আমি যদি কাল থেকেই গাওনা করি?

লোকটা বিস্মিত ও চিন্তিত হইয়া বলিল—আজ্ঞে, তা হ'লে এখানকার কি হবে?

নোটন বলিল,—নিজে শুতে পাচ্ছিস সেই ভাল, শঙ্করার ভাবনা ভাবতে হবে না তোকে। আমি তা হলে টাকা কিন্তু বেশী নোব।

লোকটা সোৎসাহে বলিল—আচ্ছা বেশ। তা কবে যাবেন আপনি?

—আজই। এখুনি। তোর সঙ্গে। এই ট্রেনে।

লোকটা উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

—দক্ষিণে কিন্তু পনেরো টাকা রাত্রি।

—আজ্ঞে, তাই দোব। লোকটার উৎসাহের আর সীমা ছিল না।

—কিন্তু আগাম দিতে হবে।

তৎক্ষণাৎ লোকটি একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিল। বলিল—এই বায়না। আর সেখানকার মাটিতে পা দিলেই বাকী টাকা কড়াক্রান্তি হিসেব ক'রে মিটিয়ে দোব।

নোটখানা ট্যাঁকে গুঁজিয়া নোটন উঠিয়া পড়িল। ঢুলী ও দোহারদের বলিল—ওঠ! লোকটাকে বলিল—টাকা মিটিয়ে নিয়ে বাসায় ঢুকব কিন্তু। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে অন্ধকারে মাঠে মাঠে স্টেশনে আসিয়া মুখ ঢাকিয়া ট্রেনে উঠিয়া বসিয়াছে। এবং সে ট্রেনও চলিয়া গিয়াছে। ঘটনার এই শেষ।

* * *

নোটন ভাগিয়াছে শুনিয়া অপর পাল্লাদার কবি মহাদেব আসরে বসিয়া মনে মনে আপসোস করিতেছিল। আজও পর্যন্ত নোটনের সহিত পাল্লায় কখনও সে পরাজয় স্বীকার করে নাই, কিন্তু আজ সে সর্বান্তঃকরণে নীরবে পরাজয় স্বীকার করিল—সঙ্গে সঙ্গে নোটনকে বেইমান বলিয়া গালও দিল। তাহাকে বলিলে কি সেও যাইত না!

আসরের জনতা ক্রমশঃ ধৈর্য হারাইয়া ফেলিতেছিল, সংবাদটা তখনও তাহাদের কাছে পরিষ্কার হয় নাই। অধীর শ্রোতার দল কলরবে একেবারে হাট বাধাইয়া তুলিয়াছে। অন্যদিকে একপাশে মেলার কর্তৃপক্ষ এবং গ্রাম্য জমিদারগণ নোটন-প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে-ছিলেন। মোহন্ত চিন্তিতভাবে দাড়িতে হাত বুলাইতেছেন। মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন—তারা, তারা!

নোটন ভাগিয়াছে, কবিগান হইবে না,—এই কথাটি একবার উচ্চারিত হইলে হয়, সঙ্গে সঙ্গে এই দর্শকদল বাঁধভাঙা জলাশয়ের জলের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। জলশূন্য পুষ্করিণীর ভিজা পাঁকের মত জনশূন্য মেলাটায় থাকিবে শুধু পায়ের দাগ আর ধূলা।

ওদিকে আর একদল গ্রাম্য জমিদারই একেবারে খড়ের আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এখনি পাইক লাঠিয়াল ভেজিয়া গলায় গামছা বাঁধিয়া নোটনকে ধরিয়া আনিয়া জুতা মারিয়া পিঠের চামড়া তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা হইতে ক্ষতিপূরণের মামলা করিয়া হতভাগ্যের ভিটামাটি উচ্ছন্ন দিবার ব্যবস্থা পর্যন্ত—নানা উত্তেজিত কল্পনায় তৃণদাহী বহ্নির মতই তাহারা লেলিহান হইয়া জ্বলিতেছে। এই জমিদারদের অন্যতম, গঞ্জিকাসেবী ভূতনাথ—নামে ভূতনাথ হইলেও দক্ষযজ্ঞনাশী বিরূপাক্ষের মতই সে দুর্মদ ও দুর্দান্ত—সে হঠাৎ মালকোঁচা সাঁটিয়া লাফাইয়া উঠিল। বলিল—দুটো লোক। বলিয়া দুইটা আঙুল তুলিয়া ধরিল। কিছুক্ষণ থামিয়া থাকিয়া বলিল—দোঠো আদমী হামারা সাথ দেও, হাম আভি যায়গা। দশ কোশ রাস্তা। আরে দশ কোশ তো দুলকীমে চলা যায়গা। বলিয়া সে যেন দুলকী চালে চলিবার জন্য দুলিতে আরম্ভ করিল।

ঠিক এই সময়েই কে একজন কথাটা জানিয়া ফেলিয়া আসরের প্রান্ত হইতে হাঁকিয়া উঠিল—উঠে আয় রে রাখহরি, উঠে আয়।

—কেন রে? উঠে গেলে আর জায়গা থাকবে না।

—জায়গা নিয়ে ধুয়ে খাবি? উঠে আয়—বাড়ী যাই—ভাত খাই গিয়ে। ওরে নোটন-দাস ভাগলবা, পালিয়েছে। কবি হবে না।

—না। মিছে কথা।

—মাইরি বলছি। সত্যি।

রাখহরি রসিক ব্যক্তি, সে সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল—বল হরি—! সমগ্র জনতা নিম্নাভিমুখী আলোড়িত জলরাশির কল্লোলের মতই কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হইয়া ধ্বনি দিয়া উঠিল—হরি বো—ল! অর্থাৎ মেলাটির শবযাত্রা ঘোষণা করিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে তৃণ-দাহী বহ্নি যেন ঘরে লাগিয়া গেল। জমিদারবর্গ জনতার উপরেই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

—কে? কে? কে রে বেটা?

—ধর তো বেটাকে, ধর তো। হারামজাদা বজ্জাত, ধর তো বেটাকে!

ভূতনাথ ব্যাঘ্রবিক্রমে ঘুরিয়া রাখহরির বদলে যে লোকটিকে সম্মুখে পাইল, তাহারই চুলের মুঠায় ধরিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল—চোপ রও শালা।

অন্য কয়েকজনে তাহাকে ক্ষান্ত করিল—হাঁ হাঁ-হাঁ! কর কি ভূতনাথ, ছাড়, ছাড়। ও রাখহরি নয়।

ভূতনাথ তাহাকে ছাড়িয়া দিল, কিন্তু বীরবিক্রমে শাসন করিয়া দিল—খবর—দা—র!

একজন বিবেচক ব্যক্তি বলিল—মেলা-খেলায় ও-রকম করে মানুষ। রঙ তামাসা নিয়েই তো মেলা হে। ভোলা ময়রা কবিয়াল—জাড়া গাঁয়ে কবি গাইতে গিয়ে জমিদারের মুখের সামনেই বলেছিল—"কি ক'রে তুই বললি জগা, জাড়া গোলক বৃন্দাবন, যেখানে বামুন রাজা চাষী প্রজা—চারিদিকেতে বাঁশের বন! কোথায় বা তোর শ্যামকুণ্ডু কোথায় বা তোর রাধাকুণ্ডু—সামনে আছে মুলোকুণ্ডু করগে মুলো দরশন।" তাতে তো বাবুরা রাগ করে নাই, খুশীই হয়েছিল।

ভূতনাথ এত বোঝে না, সে বক্তাকে এক কথায় নাকচ করিয়া দিল—যা-যা-যাঃ। কিসে

আর কিসে—ধানে আর তুষে।

—আরে তুষ হ'লেও তো ধানের খোসা বটে। চটলে চলবে কেন? দু'তিন মাইল থেকে সব তামাক টিকে নিয়ে এসেছে কবিগান শুনতে। এখন শুনছে—'কবিয়াল ভাগলবা'; তা ঠাট্টা ক'রে একটু হরিধ্বনি দেবে না? রেগো না।

মোহন্ত এখন মোহান্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু এককালে তিনি একজন পাকা পাটোয়ার অর্থাৎ জমিদার-সেরেস্তার কূটবুদ্ধি নায়েব ছিলেন। গাঁজা তিনি চিরকালই খান। তিনি এতক্ষণ ধরিয়া নীরবে কবিগানের কথাই চিন্তা করিতেছিলেন। তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—আচ্ছা, আচ্ছা, কবিগানই হবে। চিন্তা কি তার জন্যে? চিন্তামণি যে পাগলী বেটীর দরবারে বাঁধা, তাঁর চিনির ভাবনা। বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হইয়াছে, চিনির সন্ধান মিলিয়াছে।

কবিগান চিনি কি না—সে প্রশ্ন তখন কাহারও মনে উঠিবার কথাও নয় সময়ও নয়। সুতরাং সে প্রশ্ন না করিয়া সকলে উৎসুক দৃষ্টিতে মোহন্তের মুখের দিকে চাহিল।

মোহন্ত বলিলেন—ডাক মহাদেবকে আর তার প্রধান দোয়ারকে। অতঃপর ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—তাই হোক—গুরু-শিষ্যেই যুদ্ধ হোক। রামরাবণের যুদ্ধের চেয়ে দ্রোণ-অর্জুনের যুদ্ধ কিছু কম নয়। রামায়ণ সপ্তকাণ্ড, মহাভারত হ'ল অষ্টাদশ পর্ব।

শোর-গোল উঠিল—মহাদেব! মহাদেব! ওহে কবিয়াল! ওস্তাদজী হে, শোন শোন।

দুই

দায়ে পড়িয়া মহাদেব প্রস্তাবটায় সম্মতি না দিয়া পারিল না।

মোহন্ত সুদুর্লভ আশীর্বাদ করিয়া তাহাকে কল্পতরুর তলায় বসাইয়া দিলেন এবং চারিদিকে প্রমত্ত জনতা। অতঃপর সম্মত না হইয়া উপায় কি! কিন্তু আর একজন ঢুলি ও দোয়ারের প্রয়োজন। ঠিক এই সময়েই নিতাইচরণের আবির্ভাব। সে জোড়হাতে পরম বিনয়সহকারে শুদ্ধ ভাষায় নিবেদন করিল—প্রভু, অধীনের নিবেদন আছে—আপনাদের সি-চরণে।

অন্য কেহ কিছু বলিবার পূর্বেই মহাদেব কবিয়ালই বলিয়া উঠিল—এই যে, এই যে আমাদের নেতাইচরণ রয়েছে; তবে আর ভাবনা কি? নেতাই বেশ পারবে দোয়ারকি করতে। কি রে, পারবি না?

নিতাইয়ের গুণাগুণ কবিয়ালরা জানিত, কবিগান যেখানেই হউক, সে গিয়া ওই দোয়ারদের দলে মিশিয়া বসিয়া পড়িত, কখনও কাঁসি বাজাইত—আর দোয়ারের কাজে তো প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বেগার দিয়া যাইত।

বাবুদলের মধ্যে একজন কলিকাতায় চাকরি করেন, ময়লা কাপড়-জামার গাদার মধ্যে তিনি ধোপদুরস্ত পাটভাঙা বস্ত্রের মতই শোভমান ছিলেন। চালটিও তাঁহার বেশ ভারিক্কী, তিনি খুব উঁচুদরের প্রায়াভারী পৃষ্ঠপোষকের মত করুণামিশ্রিত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন—বল কি, অ্যাঁ? নেতাইচরণের আমাদের এত গুণ! A poet! বাহবা, বাহবা রে নিতাই! তা লেগে যা রে বেটা, লেগে যা। আর দেরি নয়—আরম্ভ ক'রে দাও তা হ'লে। তিনি হাত-ঘড়িটা দেখিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—এখনই তো তোমার—। ক'টা বাজল?

কে একজন ফস করিয়া দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালিয়া আগাইয়া ধরিল।

ভদ্রলোক বিরক্ত হইয়া হাতটা সরাইয়া লইয়া বলিলেন—আঃ! দরকার নেই আলোর। রেডিয়ম দেওয়া আছে, অন্ধকারে দেখা যাবে।

ভূতনাথ এত সব রেডিয়ম-ফেডিয়মের ধার ধারে না, সে হি-হি করিয়া হাসিয়া নিতাইকেই বলিল—লে রে বেটা, লে; তাই কাক কেটেই আজ অমাবস্থে হোক। কাক—কাকই সই! তোর গানই শুনি!

নিতাই মনে মনে আহত হইলেও মুখে কিছু বলিল না। ওদিকে তখন আসরে ঢোলে কাঠি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, কুড়্‌তাক কুড়্‌তাক কুড়ুম-কুড়ুম।

নিতাই দোয়ারকি করিতে লাগিয়া গেল।

আপন দোয়ারের সহিত কবিওয়ালার কবিগানের পাল্লা। সুতরাং পাল্লা বা প্রতিযোগিতাটা হইতেছিল আপোসমূলক—অত্যন্ত ঠাণ্ডা রকমের। তীব্রতা অথবা উষ্ণতা মোটেই সঞ্চারিত হইতেছিল না। শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠিল দুই ধরণের। যাহারা উহাদের মধ্যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাহারা বলিল—দূর দূর! ভিজে ভাতের মত গান। এই শোনে! সাঁট ক'রে পাল্লা হচ্ছে! চল বাড়ী যাই। দুই চার জন আবার উঠিয়াও গেল।

অপর দল বলিল—মহাদেবের দোয়ারও বেশ ভাল কবিয়াল মাইরি! বেশ কবিয়াল, ভাল কবিয়াল! টকাটক জবাব দিচ্ছে।

নিতাইচরণের প্রশংসাও হইতেছিল। প্রশংসা পাইবার মত নিতাইচরণের মূলধন আছে। তাহার গলাখানি বড় ভাল। তাহার উপর ফোড়নও দিতেছে চমৎকার। মহাদেবের দোয়ারকে পিছনে ফেলিয়া নিজে স্বাধীনভাবে দুই-চার কলি গাহিবার জন্য সে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে।

বাবুরা ইহাতে তাহাকে উৎসাহ দিলেন—বলিহারি বেটা, বলিহারি! বলিহারি!

নিতাইয়ের স্বজন ও বন্ধুজনে বলিল—আচ্ছা, আচ্ছা!

এক কোণে মেয়েদের জটলা। এ মেয়েরা সবাই ব্রাত্য সমাজের। তাহাদেরও বিস্ময়ের সীমা নাই, নিতাইয়ের পরম বন্ধু স্টেশনের পয়েন্টস্‌ম্যান রাজালাল বায়েনের বউ হাসিয়া প্রায় গড়াইয়া পড়িতেছে—ও মা গো! নেতাইয়ের প্যাটে প্যাটে এত! ও মা গো!

তাহার পাশেই বসিয়া রাজার বউয়ের বোন, ষোল-সতের বছরের মেয়েটি, পাশের গ্রামের বউ—সে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছে, সে মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইয়া বলিতেছে—না ভাই, খালি হাসছিস তু! শোন কেনে!

রাজা বন্ধু-গৌরবে অদূরে বসিয়া ক্রমাগত দুলিতেছিল, সে হাসিয়া বলিল— দেখতা হ্যায় *ঠাকুরঝি? ওস্তাদ কেয়সা গানা করতা হ্যায়, দেখতা?*

রাজা এই শ্যালিকাটিকে বলে—*ঠাকুরঝি!* নিতাইও তাহাকে বলে—*ঠাকুরঝি*। শ্বশুর-বাড়ী অর্থাৎ পাশের গ্রাম হইতে সে নিত্য দুধ বেচিতে আসে। নিতাই নিজেও তাহার কাছে এক পোয়া করিয়া দুধের 'রোজ' লইয়া থাকে। এই কারণেই মেয়েটির বিস্ময় এত বেশী। যে লোককে মানুষ চেনে, তাহার মধ্য হইতে অকস্মাৎ এক অপরিচিত জনকে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখিলে বিস্ময়ে মানুষ এমনই হতবাক হইয়া যায়।

নিতাইয়ের কিন্তু তখন এদিকে চাহিয়া দেখিবার অবসর ছিল না। সে তখন প্রচণ্ড উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে, উৎসাহের প্রাবল্যে সে গল্পের উটের মত নাসিকা-প্রবেশের পথে মাথা গলাইয়া দিল এবং নিজেই সে স্বাধীনভাবে গান আরম্ভ করিল। আ—করিয়া রাগিণী টানিয়া মহাদেবের দোয়ারের রচিত ধুয়াটাকে পর্যন্ত পাল্টাইয়া দিয়া সেই সুরে ছন্দে নিজেই নূতন ধুয়া ধরিয়া দিল। এবং নিজের সুন্দর কণ্ঠের প্রসাদে তাহাকে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়াও ফেলিল।

মহাদেবের দোয়ার, সে-ই প্রকৃত একপক্ষের পাল্লাদার ওস্তাদ। সে আপত্তি তুলিয়া বলিয়া উঠিল—অ্যাই! ও কি? ও কি গাইছ তুমি? অ্যাই—নেতাই! অ্যাই!

নিতাই সে কথা গ্রাহ্যই করিল না। বাঁ হাতখানিতে কান ঢাকিয়া ডান হাতখানি থুথু নিবারণের জন্য মুখের সম্মুখে ধরিয়া গান গাহিয়াই চলিল। সম্মুখের দিকে অল্প একটু ঝুঁকিয়া তালে তালে মৃদু নাচিতে নাচিতে সে তখন গাহিতেছিল—

হুজুর - ভদ্দ পঞ্চজন রয়েছেন যখন
সুবিচার হবে নিশ্চয় তখন—
জানি জানি—

বাবুরা খুব বাহবা দিলেন—বহুৎ আচ্ছা! বাহবা! বাহবা! নেতাই বলছে ভাল!

সাধারণ শ্রোতারাও বলিল—ভাল। ভাল। ভাল হে।

নিতাই ধাঁ করিয়া লাফ মারিয়া ঘুরিয়া ঢুলীটাকে ধমক দিয়া বলিল—অ্যা-ই কাটছে। সঙ্গে সঙ্গে সে তাল দেখাইয়া হাতে তালি দিয়া বাজনার বোল বলিতে আরম্ভ করিল—ধিকড় তা-তা-ধেনতা—তা-তা-ধেনতা—গুড়-গুড় তা-তা-থিয়া—ধিকড়;—হাঁ—! বলিয়া সে তাহার নূতন স্বরচিত ধুয়াটায় ফিরিয়া আসিল—

ক-য়ে কালী কপালিনী—খ-য়ে খপ্পরধারিণী,
গ-য়ে গোমাতা সুরভি—গণেশজননী—
কণ্ঠে দাও মা বাণী।

একপাশে কতকগুলি অর্ধশিক্ষিত ছোকরা বসিয়া ছিল—তাহারা হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

একজন বলিল—গ-য়ে গরু, ছ-য়ে ছাগল, ভ-য়ে ভেড়া। বহুৎ আচ্ছা!

হাস্যধ্বনির রোল উঠিয়া গেল।

নিতাই সঙ্গে সঙ্গে খাড়া দাঁড়াইল, তারপর হাস্যধ্বনি অল্প শান্ত হইতেই বলিল—বলি দোয়ারগণ!

মহাদেবের দোয়ার রাগ করিয়া বসিয়া ছিল, অপর কোনো দোয়ারও ছিল না। কেহই সাড়া দিল না। নিতাইও উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়াই বলিল—দোয়ারগণ! গোমাতা শুনে সবাই হাসছে! বলছে, গ-য়ে গরু, ছ-য়ে ছাগল, ভ-য়ে ভেড়া!

ঢুলীটা এবার বলিল—হ্যাঁ!

—আচ্ছা!—বলিয়া সে ছড়ার সুরে আরম্ভ করিল—

গো-মাতা শুনিয়া সবে হাস্য করে।
দীন নিতাইচরণ বলছে জোড়করে—

বলিয়া হাত দুইটি জোড় করিয়া একবার চারিদিক ঘুরিয়া লইল। বন্ধু রাজা পরম উৎসাহে বলিয়া উঠিল—বহুৎ আচ্ছা ওস্তাদ।

কিন্তু নিতাই তখন চোখে স্পষ্ট করিয়া কিছু দেখিতেছিল না, রাজাকেও সে লক্ষ্য করিল না, সে আপন মনে ছড়াতেই বলিয়া গেল—

শুনুন মহাশয় দীনের নিবেদন।
গো কিম্বা গরু তুচ্ছ নয় কখন॥
গাভী ভগবতী, ষাঁড় শিবের বাহন।
সুরভির শাপে মজে কত রাজন॥

রব উঠিল—ভাল! ভাল! ঢুলীটা ঢোলে কাঠি দিল—ডুডুম!

নিতাই বলিল—

শাস্ত্রের সার কথা আরও বলে যাই।
গো-ধন তুল্য ধন ভূ-ভারতে নাই॥
তেঁই গোলকপতি—বিষ্ণু বনমালী।
ব্রজধামে করলেন গরুর রাখালী॥

নিতাইয়ের এই উপস্থিত জবাবে সকলে অবাক হইয়া গেল। ছন্দে বাঁধিয়া এমন ত্বরিত এবং যুক্তিসম্পন্ন জবাব দেওয়া তো সহজ কথা নয়। বন্ধু রাজা পর্যন্ত হতবাক; রাজার বউয়ের হাসি থামিয়া গিয়াছে; ঠাকুরঝির অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়িয়াছে—দেহের বেশবাসও অসম্বৃত।

নিতাইয়ের তখনো শেষ হয় নাই, সে বলিল—

তা ছাড়া মশাই—আছে আরও মানে—
গো মানে পৃথিবী শুধান পণ্ডিত জনে॥

এবার বাবুরাও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া উঠিলেন। আসরের লোকেরা হরিধ্বনি দিয়া উঠিল।

নিতাই বিজয়গর্বে ঢুলীটাকে বলিল—বাজাও।

এতক্ষণে সকলে নড়িয়া চড়িয়া বসিল, রাজা একবার ফিরিয়া স্ত্রী ও ঠাকুরঝির দিকে চাহিয়া হাসিল—অর্থাৎ, দেখ! স্ত্রী বিস্ময়ে মুগ্ধ হাসি হাসিয়া বলিল—তা বটে বাপু।

তরুণী ঠাকুরঝিটির কিন্তু তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটে নাই। সে বিপুল বিস্ময়ে শিথিল-চৈতন্যের মত নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া ছিল। রাজা তাহার অসম্বৃতবাস বিস্মিত ভঙ্গি দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিল, রূঢ়স্বরে বলিল—অ্যাই! ও ঠাকুরঝি! মাথায় কাপড় দে।

রাজার স্ত্রী একটা ঠেলা দিয়া বলিল—মরণ, সাড় নাই মেয়ের!

ঠাকুরঝি এবার জিভ কাটিয়া কাপড় টানিয়া মাথায় দিয়া বলিল—আচ্ছা গাইছে বাপু ওস্তাদ।

ওদিকে বাবুদের মহলেও বিস্ময়ের সীমা ছিল না। সেই কলিকাতা-প্রবাসী চাকুরে বাবুটি পর্যন্ত স্বীকার করিলেন—yes। এ রীতিমত একটা বিস্ময়। Son of Dom—অ্যাঁ—He is a poet!

দুর্দান্ত ভূতনাথ ক্রুদ্ধ হইলে রুদ্র, তুষ্ট হইলে আশুতোষ—মানসিক অবস্থার এই দুই দূরতম প্রান্তে অতি সহজেই সে গঞ্জিকাপ্রসাদে ব্যোমমার্গে নিমেষমধ্যেই যাওয়া-আসা করিয়া থাকে, সে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে বলিল—ধুকুড়ির ভেতর খাসা চাল রে বাবা! রত্ন রে—একটা রত্ন—মানিকের বেটা মানিক! বলিহারি রে!

মোহন্ত হাসিয়া বলিলেন—আমার পাগলী বেটীর খেয়াল বাবা; নিতাইকে বড় করতে মা আমার নোটনকে তাড়িয়েছেন।

ইহার পরই আরম্ভ হইল মহাদেবের পালা। মহাদেব পাকা প্রাচীন কবিয়াল। ব্যাপারটা দেখিয়া শুনিয়া ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি করিয়া গান ধরিল—ব্যঙ্গে, রঙ্গে, গালি-গালাজে নিতাইকে শূলবিদ্ধ করিয়া তিলে তিলে বধ করিতে আরম্ভ করিল। তাহার সরস, অশ্লীলতা-ঘেঁষা গালি-গালাজে সমস্ত আসরটা হাস্যরোলে মুখর হইয়া উঠিল। নিতাই আসরে বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, এবং মনে মনে গালি-গালাজের জবাব খুঁজিতেছিল।

কিন্তু ক্ষুণ্ণ হ'ল রাজা। সে মিলিটারী মেজাজের লোক, বন্ধুকে গালি-গালাজগুলা তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। সে আসর হইতে উঠিয়া খানিকটা মেলার মধ্যে ঘুরিবার জন্য চলিয়া গেল। রাজার স্ত্রী প্রচুর হাসিতেছিল। ঠাকুরঝি মেয়েটি কিন্তু অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছে, সেও এবার বিরক্তভরে বলিল—হাসিস না দিদি! এমনি ক'রে গাল দেয় মানুষকে!

মহাদেব ছড়া বলিতেছিল—

সুবুদ্ধি ডোমের পোয়ের কুবুদ্ধি ধরিল।
ডোম কাটারি ফেলে দিয়ে কবি করতে আইল॥
ও-বেটার বাবা ছিল সিঁদেল চোর, কর্তা-বাবা ঠ্যাঙাড়ে।
মাতামহ ডাকাত বেটার—দ্বীপান্তরে মরে॥
সেই বংশের ছেলে বেটা কবি করবি তুই।
ডোমের ছাওয়াল রত্নাকর, চিংড়ির পোনা রুই॥

একজন ফোড়ন দিল—

অল্পজলই ভাল চিংড়ির—বেশী জলে যাস না।

দোয়ারেরা পরমোৎসাহে মহাদেবের নূতন ধুয়াটা গাহিল—

আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা—স্বগ্‌গে যাবার আশা—গো!
ফরাৎ ক'রে উড়ল পাতা—স্বগ্‌গে যাবার আশা গো!
হায়রে কলি—কিই বা বলি—
গরুড় হবেন মশা গো—স্বগ্‌গে যাবার আশা গো॥

অকস্মাৎ মহাদেব বলিয়া উঠিল—আঃ, জ্বালাতন রে বাপু! বলিয়াই সে আপনার পায়ে একটা চড় মারিয়া বসিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই গাহিল—

পায়েতে কামড়ায় মশা—মারিলাম চাপড়।
গোলকেতে বিষ্ণু কাঁদেন—চড়িবেন কার উপর!

মহাদেবের দোয়ার—যাহাকে নাকচ করিয়া নিতাই কবিয়াল হইয়াছে—সে-ই এবার ফোড়ন দিয়া উঠিল—চটাৎ চড়ের সয় না ভর, স্বগ্‌গে যাবার আশা গো।

ইহার পর রাত্রি যত অগ্রসর হইল, মহাদেবের তাণ্ডব ততই বাড়িয়া গেল। শ্লীল-অশ্লীল গালি-গালাজে নিতাইকে সে বিপর্যস্ত করিয়া দিল। মহাদেবের এই শূল-প্রতিরোধের ক্ষমতা নিতাইয়ের ছিল না। কিন্তু তাহার বাহাদুরি এই যে জর্জর ক্ষতবিক্ষত হইয়াও সে ধরাশায়ী হইল না। খাড়া থাকিয়া হাসিমুখেই সব সহ্য করিল। সে গালি-গালাজের উত্তরে কেবল ছড়া কাটিয়া বলিল—

ওস্তাদ তুমি বাপের সমান তোমাকে করি মান্য।
তুমি আমাকে দিচ্ছ গাল, ধন্য হে তুমি ধন্য॥
তোমার হয়েছে ভীমরতি—আমার কিন্তু আছে মতি তোমার চরণে।
ডঙ্কা মেরেই জবাব দিব—কোনই ভয় করি না মনে॥

লোকের কিন্তু তখন এ বিনীত মিষ্ট রস উপভোগ করিবার মত অবস্থা নয়। মহাদেব গালি-গালাজের মত্তরসে আসরকে মাতাল করিয়া দিয়া গিয়াছে, এবং মহাদেবের তুলনায় নিতাই সত্যই নিষ্প্রভ। সুতরাং তাহার হার হইল। তাহাতে অবশ্য নিতাইয়ের কোন গ্লানি ছিল না। বরং সে অকস্মাৎ নিজেকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়াই অনুভব করিল।

পাল্লার শেষে সে বাবুদের প্রণাম করিয়া করজোড়ে সবিনয়ে বলিল—হুজুরগণ, অধীন মুখ্যু

ছোট নোক—

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বাবুরা বলিলেন—না না। খুব ভাল, ভাল গেয়েছিস তুই। বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা!

প্রচণ্ড উৎসাহে তাহার পিঠে কয়েকটা সাংঘাতিক চপেটাঘাত করিয়া ভূতনাথ বলিল—জিতা রহো, জিতা রহো রে বেটা। জিতা রহো!

চাকুরে বাবুটি করুণামিশ্রিত প্রশংসার হাসি হাসিয়া বার বার বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন—ইউ আর এ পোয়েট, অ্যাঁ! এ পোয়েট! ইউ আর এ পোয়েট!

কথাটার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া নিতাই বিনীত সপ্রশ্নভঙ্গিতে বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল—আজ্ঞে?

বাবু বলিলেন—তুই তো একজন কবি রে।

নিতাই লজ্জিত হইয়া মাথা নীচু করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর সে মহাদেবকে বলিল—মার্জনা করবেন ওস্তাদ। আমি অধম। বলতে গেলে আমি মশকই বটে।

মহাদেব অবশ্য প্রতিপক্ষের এ বিনয়ে লজ্জিত হইল না, সে বরং নিতাইয়ের বিনয়ে খুশী হইয়াই বলিল—আমার দলে তুই দোয়ারকি কর রে। এর পর নিজেই দল বাঁধতে পারবি। তা ছাড়া তোর গলাখানি খুব মিষ্টি।

নিতাই মনে মনে একটু রূঢ় অথচ রসিকতাসম্মত জবাব খুঁজিতেছিল; মহাদেবের গালি-গালাজের মধ্যে জাতি তুলিয়া এবং বাপ-পিতামহ তুলিয়া গালি-গালাজগুলি তাহার বুকে কাঁটার মত বিঁধিয়াছিল। কিন্তু কোন উত্তর দিবার পূর্বেই পিছন হইতে দশ-বিশজন একসঙ্গে ডাকিল—নেতাইচরণ, নেতাইচরণ! ওহে!

ডাক শুনিয়া নিতাইচরণ পুলকিত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। আজই সে 'নিতে' 'নেতা' 'নিতো' 'নেতাই' হইতে নিতাইচরণ হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা ডাকিতেছিল, তাহারা অদূরবর্তী বাবুদের দেখাইয়া বলিল—বাবুরা ডাকছেন। মোহন্ত ডাকছেন।

মোহন্তজী চণ্ডীর প্রসাদী একগাছি সিন্দূরলিপ্ত বেলপাতার মালা তাহার মাথায় আলগোছা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—বাঃ বাঃ, খুব ভাল। মা তোমার উন্নতি করবেন। মায়ের মেলায় একরাত্রি গাওনা তোমার বাঁধা বরাদ্দ রইল। সুন্দর গলা তোমার!

চাকুরে বাবু নিতাইয়ের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—একটা মেডেল তোকে দেওয়া হবে! তারপর হাসিয়া আবার বলিলেন—You are a poet! অ্যাঁ! এ একটা বিস্ময়!

নিতাই দিশাহারা হইয়া গেল। কি করিবে, কি বলিবে, কিছুই ঠাওর করিতে পারিল না। বাবু বলিলেন—কিন্তু খবরদার, আপন গুষ্টির মত চুরি-ডাকাতি করবি না। তুই বেটা কবি—a poet!

হাতজোড় করিয়া এবার নিতাই বলিল—আজ্ঞে প্রভু! চুরি জীবনে আমি করি নাই। মিছে কথাও আমি বলি না হুজুর, নেশা পর্যন্ত আমি করি না। জাত-জ্ঞাত-মা-ভাইয়ের সঙ্গেও এইজন্যে বনে না আমার। ঘর তো ঘর, আমি পাড়া পর্যন্ত ত্যাজ্য করেছি একরকম। আমি থাকি ইস্টিশানে রাজন পয়েন্টসম্যানের কাছে। কুলিগিরি ক'রে খাই।

এ গ্রামের চোর, সাধু, ভাল মন্দ, সমস্ত কিছুই ভূতনাথের নখদর্পণে, সে সঙ্গে সঙ্গে নিতাইকে সমর্থন করিয়া বলিল—হাজারোবার! সাচ্চা সাধু আচ্ছা আদমী নিতাই।

নিতাই আবার বলিল—এই মা-চণ্ডীর সামনে দাঁড়িয়ে বলছি। মিছে বলি তো বজ্রাঘাত হবে আমার মাথায়।

তিন

নিতাই মিথ্যা শপথ করে নাই। সত্যই নিতাই জীবনে কখনও চুরি করে নাই। তাহার আত্মীয়-স্বজন গভীর রাত্রে নিঃশব্দপদসঞ্চারে নির্ভয় বিচরণের মধ্যে যে উদ্বেগময় উল্লাস অনুভব করে, সে উল্লাসের আস্বাদ সত্যই নিতাইয়ের রক্তকণিকাগুলির কাছে অজ্ঞাত। গ্রীক বীর আলেক-জাণ্ডারের সম্মুখীন থেসিয়ান দস্যুর মত ন্যায়ের তর্ক এখানকার বীরবংশীরা জানে না বটে, তবে নীতি ও ধর্মের কথা শুনিয়া তাহারা ব্যঙ্গ করিয়া হাসে। এবং নিতাইয়ের এই চৌর্যবৃত্তি-বিমুখতার জন্য তাহারা তাহার মধ্যে আবিষ্কার করে একটি ভীরুতাকে, এবং তাহার জন্য তাহারা তাহাকে ঘৃণা করে।

কেমন করিয়া সে এমনটা হইল তাহার ইতিহাস অজ্ঞাত। তাচ্ছিল্যভরে কেহ লক্ষ্য করে নাই বলিয়াই সম্ভবত অলক্ষ্যে হারাইয়া গিয়াছে। তবে একটি ঘটনা লোকের চোখে বার বার পড়িয়াছিল। এবং ঘটনাটি লোকের চোখে এখনও ভাসে। রোজ সন্ধ্যায় নিতাই-চরণ বইয়ের দপ্তর বগলে করিয়া কালি-পড়া লণ্ঠন হাতে নাইট ইস্কুলে চলিয়াছে। স্থানীয় জমিদারের মায়ের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত নৈশবিদ্যালয়ে নিতাই পড়াশুনা করিয়াছিল। সেকালে ডোমপাড়ার অনেকগুলি ছেলেই পড়িত। ছাত্রসংগ্রহের উদ্দেশ্যে জমিদার একখানা করিয়া কাপড় দিবার ঘোষণার ফলেই বীরবংশীর দল ছেলেদের পাঠশালায় আনিয়া ভর্তি করিয়া দিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে নিতাইও আসিয়াছিল। বৎসরের শেষে কাপড় লইয়া দ্বিতীয় ভাগের চোর বেণীর গল্প পড়িবার পূর্বেই ডোমেদের ছেলেগুলি পাঠশালা হইতে সরিয়া পড়িল, কেবল নিতাই-ই থাকিয়া গেল। নিতাই পরীক্ষায় ফার্স্ট হইয়াছিল বলিয়া কাপড়ের সঙ্গে একটা জামা ও একখানা গামছা এবং তাহার সঙ্গে একটা লণ্ঠন পাইল। এই প্রাপ্তিযোগের জন্যই সকলে পাঠশালা ছাড়িলেও নিতাই ছাড়ে নাই। সে সময় ছেলে কাপড়, গামছা, জামা ও লণ্ঠন চার দফা পুরস্কার পাওয়াতে নিতায়ের মাও বেশ খানিকটা গৌরবই অনুভব করিয়াছিল। বংশধারা-বিরোধী একটি অভিনব গৌরবের আস্বাদও বোধ করি নিতাই পাইয়াছিল। ইহার পর আরও বৎসর দুয়েক নিতাই পাঠশালায় পড়িয়াছিল। এই দুই বৎসরে পুরস্কার হিসাবে কাপড়, জামা, গামছা; লণ্ঠন ছাড়াও নিতাই পাইয়াছিল খানকয়েক বই—শিশুবোধ রামায়ণ, মহাভারতের কথা, জানোয়ারের গল্প। সেগুলি নিতাইয়ের কণ্ঠস্থ। নিতাই সুযোগ পাইলে আরও পড়িত, কিন্তু একমাত্র নিতাই ছাড়া পাঠশালায় আর দ্বিতীয় ছাত্র না থাকায় পাঠশালাটিই উঠিয়া গেল। অগত্যা নিতাই পাঠশালা ছাড়িতে বাধ্য হইল। ততদিনে তাহার বিদ্যানুরাগ আর এক পথে শাখা বিস্তার করিয়াছে। এ দেশে কবি গানের পাল্লার সে মস্ত ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাংলার সমগ্র অশিক্ষিত সম্প্রদায়ই কবিগানের ভক্ত। কিন্তু সে ভক্তি তাহাদের অশ্লীল রসিকতার প্রতি আসক্তি। নিতাইয়ের আসক্তি অন্যরূপ। পুরাণ-কাহিনী, কবিতার ছন্দমিল এবং উপস্থিত বুদ্ধির চমক-দেওয়া কৌতুকও তাহার ভাল লাগে!

মামাতো মাসতুতো ভাইয়েরা নিতাইকে ব্যঙ্গ করিয়া এতদিন বলিত—পণ্ডিত মাশায়! এইবার তাহারা তাহাকে দলে লইয়া দীক্ষা দিতে ব্যগ্র লইয়া উঠিল। অর্থাৎ রাত্রির অভিযানের দলে তাহারা তাহাকে লইতে চাহিল।

মামা গৌরচরণ সদ্য পাঁচ বৎসর জেল খাটিয়া ঘরে ফিরিয়াছে। সে বোনকে ডাকিয়া গম্ভীর ভাবে বলিল—নিতাইকে এবার বেরুতে বল। নেকাপড়া তো হ'ল।

গৌরচরণের গম্ভীর ভাবের কথার অর্থ—তাহার আদেশ। নিতাইয়ের মা আসিয়া ছেলেকে বলিল—তোর মামা বলছে, এইবার দলের সঙ্গে যেতে হবে তোকে।

নিতাই মায়ের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল—ছি! ছি! ছি! গভ্যধারিণী জননী হয়ে এই কথা তু বলছিস আমাকে!

নিতাইয়ের মা হতভম্ব হইয়া গেল।

নিতাইয়ের মামা চোখ লাল করিয়া আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—কি বলছিস মাকে? হচ্ছে কি?

নিতাই তখন পুরানো খাতাটায় রামায়ণ দেখিয়া হাতের লেখা অভ্যাস করিতেছিল। সে নির্ভয়ে বলিল—লিখছি।

—নিকছিস? গৌর আসিয়া খাতাটা ও বইখানা টান মারিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। নিতাইও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে মামাকে অতিক্রম করিয়া সে খাতা ও বই কুড়াইয়া লইয়া নিজেদের পাড়া পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। গ্রাম খুঁজিয়া সেই দিনই সে ঘনশ্যাম গোসাঁইয়ের বাড়ীতে মাহিন্দারী চাকুরিতে বাহাল হইল।

গোসাঁইজী বৈষ্ণব মানুষ, ঘরে সন্তানহীনা স্থূলকায়া গৃহিণী, উভয়েরই দুগ্ধপ্রীতি মার্জারের মত। ঘরে দুইটি গাই আছে, গাই দুইটি এতদিন রাত্রে স্বেচ্ছামত বিচরণ করিয়া প্রভাতে ঘরে আসিয়া দুধ দিত। কিন্তু ইদানীং কলিকাল অকস্মাৎ যেন পরিপূর্ণ কলিত্ব লাভ করিয়াছে বলিয়া গ্রামের লোকের গো-ব্রাহ্মণে ভক্তি একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে। সেই কারণে তাঁহার গাভী দুইটিকে গত দুই মাসে পনেরো বার লোকে খোঁয়াড়ে দিয়াছে। বাধ্য হইয়া গোসাঁইজী গাভী-পরিচর্যার জন্য লোক খুঁজিতেছিলেন। নিতাইকে পাইয়া বাহাল করিলেন। নিতাইয়ের সহিত শর্ত হইল, সে গাভীর পরিচর্যা করিবে, বাসন মাজিবে, প্রয়োজনমত এখানে ওখানে যাইবে, রাত্রে বাড়িতে প্রহরা দিবে। গোসাঁইজীর সুদী কারবারে মূল এক শত মণ ধান এখন সাত শত মণে পরিণত হইয়াছে। ঘরের উঠানেও একটি ধানের স্তূপ বারোমাস জড়ো হইয়াই থাকে। খাতকেরা রোজই কিছু কিছু ধান শোধ দিয়া যায়। গোসাঁইজী স্ফীতোদর মরাই ও নিজের বিশীর্ণ দেহের দিকে চাহিয়া নিয়তই চিন্তায় পীড়িত হইতেছিলেন। বলিষ্ঠ যুবক নিতাইকে পাইয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন। নিতাই গোসাঁইজীর বাড়ীতেই বসবাস আরম্ভ করিল।

দিন কয়েক পরেই, সেদিন ছিল ঘন অন্ধকার রাত্রি। গভীর রাত্রে গোসাঁই ডাকিলেন—নিতাই!

বাহিরে খুটখাট শব্দে নিতাইয়ের ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল, সে জাগিয়াই ছিল, সে ফিসফিস করিয়া বলিল—আজ্ঞে, আমি শুনেছি।

—গোলমাল করিস না, উঠে আয়। গোসাঁইজী অগ্রসর হইলেন। নিতাই শীর্ণকায় গোসাঁইজীর অকুতোভয়তা দেখিয়া শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিল। গোসাঁই আসিয়া নিঃশব্দে বাহিরের দুয়ার খুলিয়া বাহির হইলেন। বাহিরে চারজন লোক, তাহাদের মাথায় বোঝাইকরা চারটি বস্তা। ভারে উত্তেজনায় লোকগুলি হাঁপাইতেছে এবং থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। দরজা খুলিতেই নিঃশব্দে লোক চারিজন ঢুকিয়া উঠানের ধানের গাদায় বস্তা চারিটা ঢালিয়া দিল। রাত্রির অন্ধকারের মধ্যেও নিতাই ধানের সোনার মত রং প্রত্যক্ষ করিল। লোকগুলিকেও সে চিনিল, তাহার আত্মীয় কেহ না হইলেও প্রত্যেকেই খ্যাতনামা ধানচোর।

সকালবেলাতেই জোড়হাত করিয়া গোসাঁইজীকে নিতাই বলিল—প্রভু, আমি মাশায় কাজ

করতে পারব না!

—পারবি না!

—আজ্ঞে না।

—এক পয়সা মাইনে আমি দেব না কিন্তু। আর এ কথা প্রকাশ পেলে তোমার জান থাকবে না।

নিতাই কথার উত্তর করিল না। তাহার কাপড় ও দপ্তর লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। আসিয়া উঠিল গ্রামের স্টেশনে।

স্টেশনের পয়েণ্টস্‌ম্যান রাজা বায়েন তাহার বন্ধু। রাজালাল একটু অদ্ভুত ধরণের লোক। বিগত মহাযুদ্ধের সময় তাহার ছিল তরুণ বয়স, সে ঘটনাচক্রে কুলি হিসাবে গিয়া পড়িয়াছিল মেসোপটেমিয়ায়। ফিরিয়া আসিয়া কাজ করিতেছে এই লাইট রেলওয়েতে। প্রাণখোলা দিলদরিয়া লোক, অনর্গল ভুল হিন্দী বলে, ঘড়ির কাঁটার মত ডিউটি করে, বার ছয়-সাত চা খায়, প্রচুর মদ খায়, ভীষণ চীৎকার করে, স্ত্রীপুত্রকে ধরিয়া ঠেঙায়। রাজার সঙ্গে নিতাইয়ের আলাপ অনেক দিনের, অর্থাৎ রাজার এখানে আসিবার পর হইতেই আলাপ, সে প্রায় তিন বৎসর আগের ঘটনা।

নিতাই সেদিনও, অর্থাৎ প্রথম আলাপের দিনও স্টেশনে বেড়াইতে আসিয়াছিল, রাজার ছেলেটা ট্রেন আসিবার ঘণ্টা বাজিতেই হাঁকিতে শুরু করিয়াছিল—হট যাও! হট যাও! লাইনের ধারসে হট যাও!

নিতাইয়ের বড় ভাল লাগিয়াছিল, সে প্রশ্ন করিয়াছিল—বাহা রে! কাদের ছেলে হে তুমি?

—আমি রাজার ছেলে।

—রাজার ছেলে? কেয়াবাৎ! তবে তো তুমি 'যোবরাজ'!

রাজা ছিল কাছেই, সে নিতাইয়ের কথা শুনিয়া হাসিয়াই সারা। সঙ্গে সঙ্গে সে নিতাইয়ের সঙ্গে আলাপ জমাইয়া ফেলিয়াছিল। ট্রেন চলিয়া যাইতেই রাজা নিতাইকে ধরিয়া লইয়া একেবারে তাহার কোয়ার্টারে আনিয়া হাজির করিয়াছিল। স্ত্রীকে বলিল—আমারি দোস্তনোক! উমদা আদমী! ফটকেটাকে বলে—রাজার বেটা যোবরাজ। বলিয়া সে কি তাহার হা-হা করিয়া হাসি!

নিতাই উৎসাহভরে কবিয়ালদের নকল করিয়া গালে হাত দিয়া, মুখের সম্মুখে অপর হাতটি রাখিয়া ঈষৎ ঝুঁকিয়া রামায়ণ স্মরণ করিয়া গান ধরিয়াছিল—

রাজার বেটা যোবরাজা, তেজার বেটা মহাতেজা
খায় সে খাস্তা খাজা গজা
বিদিত ভো-মণ্ডলে!

রাজা লাফ দিয়া ঘরের ভিতর হইতে তাহার পৈতৃক ঢোল ও তাহার নিজের কাঁসি বাহির করিয়া আনিয়া নিজে লইয়াছিল ঢোলটা—ছেলেটার হাতে দিয়াছিল কাঁসিটা। ওই কাঁসিটা রাজার বাবা রাজাকে কিনিয়া দিয়াছিল মহেশপুরের মেলায়। সেদিন দ্বিপ্রহরেই কবিগান জমিয়া উঠিয়াছিল রাজার ঘরে। নিতাই রাজার ছেলেকে 'যোবরাজ' বলিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, রাজার পরিবারের দিকে ফিরিয়া গাহিয়াছিল—

রাজার ঘরের ঘরণী যিনি—তিনি মহামান্তা রাণী—
তিনি খান বড় বড় ফেনী—
সর্বলোকে বলে।

ঠিক এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল আর একজন। পনের-ষোল বছরের একটি কিশোরী। মেয়েটির রং কালো, কিন্তু দীঘল দেহভঙ্গীতে ভুঁইচাপার সবুজ সরল ডাঁটার মত একটি অপরূপ শ্রী। মেয়েটির মাথায় কাপড়ের বিড়ার উপর তকতকে মাজা একটি বড় ঘটী, হাতে একটি ছোট গেলাস; পরনে দেশী তাঁতের মোটা সুতার খাটো কাপড। মোটা সুতার খাটো কাপড়খানির আঁটোসাঁটো বেষ্টনীর মধ্যে তাহার ছিপছিপে কালো দীঘল দেহখানির স্বাভাবিক খাঁজগুলিকে প্রকট করিয়া যেন একটি পোড়ামাটির পুতুলের মত দেখায়। মেয়েটি রাজার শ্যালিকা, পাশের গ্রামের বধূ। সে এই বর্ধিষ্ণু গ্রামখানিতে প্রত্যহ দুধের যোগান দিতে আসে। রাজার স্টেশনে গাড়ী আসে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া, আর এই মেয়েটি আসে—পশ্চিমসমীপবর্তী দ্বিপ্রহরের সূর্যের অগ্রগামিনী ছায়ার মত। মেয়েটির সরল ভীরু দৃষ্টিতে বিস্ময় যেন কালো জলের স্বচ্ছতার মত সহজাত। সেদিন সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ এই দৃশ্য দেখিয়া অকস্মাৎ এই সরল মেয়েটি হাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল—অসঙ্কোচ খিলখিল হাসি।

রাজার স্ত্রী কিন্তু কঠিন মেয়ে, সে বোনকে ধমক দিয়াছিল—হাসিস না ফ্যাক ফ্যাক ক'রে। বেহায়া কোথাকার!

মুহূর্তে মেয়েটির হাসি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে রাগ করে নাই বা দুঃখিত হয় নাই, স্বচ্ছন্দে শাসন মানিয়া লওয়ার মত বেতসলতাসুলভ একটি নমনীয়তা তাহার স্বভাবজাত গুণ। দেহখানিই শুধু লতার মত নয়, মনও যেন তাহার দীঘল দেহের অনুরূপ।

নিতাইও থামিয়া গিয়াছিল। ধরতার সময় পার হইয়া গেল, তবু নিতাই আর গান ধরিল না দেখিয়া রাজা বাজনা বন্ধ করিল। এবং মেয়েটিকে বলিল—দেখতা কেয়া ঠাকুরঝি? হামারা মিতা। ওস্তাদ আদমী। হামারা নাম হ্যায় রাজা, তো ফটকেকো নাম দিয়া যোবরাজা, তোমারা দিদিকো নাম দিয়া রাণী।—বলিয়াই অট্টহাসি।

এবার অট্টহাসির ছোঁয়াচে রাণীও হাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরঝিরও আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল আবার সেই হাসি। হাসিতে হাসিতে মাথার অবগুণ্ঠন খসিয়া গেল, চোখ দিয়া টপটপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িল, তবু তাহার সে হাসি থামিল না।

হাসি থামাইয়া রাজা বলিয়াছিল—ওস্তাদ! ই কালকুট্টি হামারা ঠাকুরঝি হ্যায়। ইসকো কেয়া নাম দেগা ভাই।

নিতাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখিতেছিল, তাহার সর্বাঙ্গে কচিপাতার মত যে একটি কোমল ঘনশ্যাম শ্রী আছে, তাহা দেখিয়া তাহাকে লইয়া রহস্য করিতে নিতাইয়ের প্রবৃত্তি হয় নাই। সে বলিয়াছিল—ঠাকুরঝি ভাই ঠাকুরঝি, ওর আর দোসরা নাম হয় না। আমার ঠাকুরঝিও ঠাকুরঝি, রাজার ঠাকুরঝিও ঠাকুরঝি। ঠাকুরঝি আমাদের সবারই ঠাকুরঝি। কেমন ভাই ঠাকুরঝি!

রাজা নিতাইয়ের তর্ক-যুক্তিতে অবাক হইয়া গিয়াছিল। গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া সে স্বীকার করিয়াছিল—হাঁ, হাঁ, ঠিক, ঠিক। ই বাত তো ঠিক হ্যায়! ঠাকুরঝি ঠাকুরঝি!

তাহার পর রাজা পাড়িয়াছিল মদের বোতল—আও ভাই ওস্তাদ!

নিতাই জোড়হাত করিয়া বলিয়াছিল—মাফ কর ভাই রাজন। ও দব্য আমি ছুঁই না।

—তব্? তব্ তুমি কি খায়েগা ভাই?

ঠাকুরঝি বলিয়াছিল—দুধ খাবা, দুধ? বলিয়া আবার সেই খিল খিল হাসি।

নিতাই হাসিয়াছিল—তা খেতে পারি। এমন দব্য কি আছে ভো-মণ্ডলে? দেবদুল্লভ।

ঠাকুরঝি সত্যই বড় ঘটি হইতে মাপের গেলাসে পরিপূর্ণ একগ্লাস দুধ ঢালিয়া নিতাইয়ের সম্মুখে নামাইয়া দিয়া তাহার অভ্যস্ত দ্রুতগমনে প্রায় পলাইয়া গিয়াছিল।

এ সব পুরোনো কথা।

রাজা এখন তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, গুণমুগ্ধ ভক্ত।

সেই সূত্রেই গোসাঁইজীর চাকরিতে জবাব দিয়া নিতাই আসিয়া উঠিল স্টেশনে। সমস্ত শুনিয়া রাজা বলিল—ঠিক কিয়া ওস্তাদ্। বহুৎ ঠিক কিয়া ভাই।

—আমাকে কিন্তু তোমার এইখানে একটু জায়গা দিতে হবে।

—আলবৎ দেগা। জরুর দেগা।

—এইখানে থাকব, আর ইস্টিশানে মোট বইব। তাতেই আমার একটা পেট চ'লে যাবে।

রেলওয়ে কনস্ট্রাকশনের সময় এই স্টেশনটি এ লাইনের একটি প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল। সে সময় প্রয়োজনে অনেক ঘরবাড়ী তৈয়ারী হইয়াছিল, সেগুলি এখন পড়িয়াই আছে। তাহারই একটাতে রাজা ওস্তাদের বাসস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিল। নিতাই এখন স্টেশনে কুলিগিরি করে, ভদ্রলোকজনের মোট তুলিয়া দেয়, নামাইয়া লয়, গ্রামান্তরেও মোট বহিয়া লইয়া যায়, উপার্জন তাহার ভালই হয়। স্টেশনে মাল নামাইতে-চড়াইতে মজুরি দুই পয়সা, এই গ্রামের মধ্যে যাইতে হইলে চার পয়সা, গ্রামান্তরে হইলে রেট দূরত্ব অনুযায়ী। অন্য কুলিদের অপেক্ষা নিতাইয়ের উপার্জন বেশী। কারণ তাহার সহায় স্বয়ং রাজা।

স্টেশন-স্টলটি তাহাদের একটি আড্ডা; স্টলের ভেণ্ডার 'বেনে মামা' রহস্য করিয়া নিতাইকে বলে—রাজ-বয়স্য।

মামার দোকানে সজীব-বিজ্ঞাপন বাতব্যাধিতে আড়ষ্ট, অতি-প্রগল্‌ভ বিপ্রপদ বলে—বয়স্য কি রে বেটা, বয়স্য কি? সভাকবি, রাজার সভাকবি।

নিতাই বিপ্রপদর পদধূলি লইয়া 'সুপ' শব্দ করিয়া মুখে দেয়, সভাকবি কথাটিতে ভারি খুশী হইয়া উঠে। বিপ্রপদকে বড় ভাল লাগে তাহার। এত যন্ত্রণাদায়ক অসুখের মধ্যেও এমন আনন্দময় লোক দেখা যায় না। বাতব্যাধিগ্রস্ত বিপ্রপদ সকালে উঠিয়াই কোনমতে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে স্টেশনে আসিয়া মামার দোকানে আড্ডা লয়, বেঞ্চিতে বসিয়া অনর্গল বকে, লোকজনকে চা খাইতে উৎসাহিত করিয়া মধ্যে মধ্যে হাঁকিয়া উঠে—চা গ্রো-ম! চা গ্রো-ম! দেহ তাহার যত আড়ষ্ট, জিহ্বা তত সক্রিয়। উৎকট রসিক ব্যক্তি, 'বসুধৈব কুটুম্বকম' মেজাজের মানুষ। মামার দোকানে সকালবেলায় আসিয়া বিপ্রপদ চা বিড়ি খাইয়া খাইয়া বেলা বারোটায় বাড়ী ফিরে খাইবার জন্য। খাইয়া, খানিকটা ঘুমাইয়া লইয়া বেলা তিনটায় আবার খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে স্টেশনে আসিয়া বসে। যায় রাত্রি সাড়ে দশটার ট্রেন পার করিয়া তবে। বিপ্রপদর সঙ্গে নিতাইয়ের জমে ভাল। নিতাই পদধূলি লইলে, বিপ্রপদ স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকে আশীর্বাদ করে—

ভব কপি, মহাকপি দগ্ধানন সলাঙ্গুল্—

হাত জোড় করিয়া নিতাই বলে—প্রভু, কপি মানে আমি জানি।

বিপ্রপদ হাসিয়া ভুল স্বীকার করিয়া বলে—ও। কপি নয়, কপি, নয়, কবি, কবি। আমারই ভুল। আচ্ছা, কবি তো তুই বটিস, কই বল দেখি—'শকুনি খেললে পাশা, রাজ্য পেলে দুর্যোধন, বাজী রাখলে যুধিষ্ঠির কিন্তু ভীমের বেটা ঘটোৎকচ মরল কোন্ পাপে?'

নিতাই সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কবিগান আরম্ভ করিয়া দেয়। বাঁ হাত গালে চাপিয়া মুখের সম্মুখে ডান হাত আড়াল দিয়া ঈষৎ ঝুঁকিয়া সুর ধরিয়া আরম্ভ করে—আহা—আ হা রে—ঘটোৎকচ মরল কোন্ পাপে?

রাজা ভাবে, ঢোলকটা পাড়িয়া আনিবে নাকি? কিন্তু সে আর হইয়া উঠে না। ইতিমধ্যে বারোটার ট্রেনের ঘণ্টা পড়ে।

দূরান্তরের যাত্রী অধিকাংশই পায় নিতাই। স্টেশনের জমাদার রাজার সুপারিশে যাত্রীরা নিতাইকেই লইয়া থাকে। নিতাইয়ের ব্যবহারও তাহারা পছন্দ করে।

মজুরির দরদস্তুর করিতে নিতাই সবিনয়ে বলে—প্রভু, গগনপানে দিষ্টি করেন একবার। গ্রীষ্মকাল হইলে বলে—দিনমণির কিরণটা একবার বিবেচনা করেন। বর্ষায় বলে—কিষ্ণবন্ন মেঘের একবার আড়ম্বরটা দেখেন কর্তা। শীতে বলে—শৈত্যের কথাটা একবার ভাবেন বাবু।

মামার দোকানে বসিয়া বিপ্রপদ নিতাইকে সমর্থন করে,—বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাদের তো সব শাল-দোশালা আছে। ওর যে কোন শালাই নাই। ওর কষ্টের কথা বিবেচনা করুন একবার।

দ্বিপ্রহরে বাহিরে যাইতে হইলে নিতাই রাজাকে বলিয়া যায়—রাজন, ঠাকুরঝি এলে দুধটা নিয়ে রেখো।

এখানে থাকিলে বারোটার ট্রেনটি চলিয়া গেলেই নিতাই একটু আগাইয়া গিয়া পয়েণ্টের কাছে লাইনের ধারে যে কৃষ্ণচূড়ার গাছটি আছে তাহার ছায়ায় গিয়া দাঁড়ায়। দ্বিপ্রহরে তখন রোদ পড়িয়া লোহার লাইনের উপরের ঘষা অংশটা সুদীর্ঘ রেখায় ঝকমক করে। নিতাই নিবিষ্ট মনে, যেখানে লাইনটা বাঁক ঘুরিয়াছে সেইখানে দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়। সহসা সেখানে শুভ্র একটি চলন্ত রেখার মত রেখা দেখা যায়, রেখাটির মাথায় একটি স্বর্ণবর্ণ বিন্দু। স্বর্ণবর্ণ-বিন্দুশীর্ষ শুভ্র চলন্ত রেখাটি আগাইয়া আসিতে আসিতে ক্রমশ পরিণত হয় একটি মানুষে। ক্ষারে কাচা তাঁতের মোটা সুতার খাটো কাপড়খানি আঁটসাঁট করিয়া পরা সে একটি কালো দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে; এবং তাহার মাথায় একটি তক-তকে মাজা সোনার বর্ণের পিতলের ঘটী। ঘটীটি সে ধরে না—একহাতে মাপের গেলাস, অন্য হাতটি দোলে, সে দ্রুতপদে অবলীলাক্রমে চলিয়া আসে। মেয়েটি চলে দ্রুত ভঙ্গিতে, কথাও বলে দ্রুত ভঙ্গিতে। মেয়েটি সেই ঠাকুরঝি।

নিতাই নেশা করে না; কিন্তু দুধ তার প্রিয়বস্তু। চায়েও আসক্তি তাহার ক্রমশ বাড়িতেছে। ঠাকুরঝির কাছে সে নিত্য একপোয়া করিয়া দুধ যোগান লইয়া থাকে। দুধ আসিলেই চায়ের জল চড়াইয়া দেয়। মামার দোকানে চা খাইলে দাম দিতে হয় দু পয়সা কাপ। বিপ্রপদর মত বিনা পয়সায় চা খাইবার অধিকার তাহার নাই। তা ছাড়া জমে না। কেমন ছোট ছোট মনে হয়।

স্টেশনে নিত্য নানা স্থানের লোকজনের আনাগোনা। আশপাশের খবর স্টেশনে বসিয়াই পাওয়া যায়। খবরের মধ্যে কবিগানের খবর থাকিলে নিতাই উল্লসিত হইয়া উঠে। সেদিন সন্ধ্যাতেই লালপেড়ে পরিষ্কার ধুতি ও হাতকাটা জামাটি পরিয়া, মাথায় পাগড়ি বাঁধিয়া সাজে

এবং গুন-গুন করিয়া কবিগান গাহিতে গাহিতে রাজাকে আসিয়া তাগাদা দেয়। মিলিটারী রাজা সাড়ে আটটার ট্রেন পার করিয়াই বলে—ফাইভ মিনিট ওস্তাদ!

পাঁচ মিনিটও তাহার লাগে না, তিন মিনিটের মধ্যেই রেলওয়ে কোম্পানির দেওয়া নীল কোর্তাটা চড়াইয়া স্টেশনের একমুখো বাতি ও লাঠি হাতে বাহির হইয়া পড়ে। ভোর হইবার পূর্বেই আবার ফিরিয়া আসে। শুধু কবিগানই নয়, যাত্রাগান, মেলা—এ সবই নিতাইয়ের ভাল লাগে। আহা, আলোকোজ্জ্বল উৎসবমুখর রাত্রির মধ্যেই যদি সমস্ত জীবনটা তাহার কাটিয়া যায়, তবে বড় ভাল হয়।

মনের এই বাসনাটুকু সে দুই কলি গানে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। নির্জন প্রান্তর পাইলেই গাহিয়া সে নিজেকেই শুনায়; আর শুনায় কোন রসময় ভাইকে। সে রসময় ভাই তাহার রাজন।

সেই মেলাতে কবে যাব
 ঠিকানা কি হায়রে!
যে মেলাতে গান থামে না
 রাতের আঁধার নাইরে।
ও রসময় ভাইরে!

রাজা শুনিয়া বাহা বাহা করিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলে—ওস্তাদ তুম ভাই গানা তৈয়ার করো। আচ্ছা গানা আতা তুমারা!

গান তাহার অনেক আছে। কিন্তু কোনটাই সম্পূর্ণ হইয়া উঠে না।

হঠাৎ চণ্ডীমায়ের মেলাতে এই নিতাই সত্য সত্যই কবিয়াল হইয়া উঠিল।

চার

কবিগানের পাল্লার পর চণ্ডীমায়ের প্রসাদী সিন্দুরমাখানো শুকনো বেলপাতার মালা গলায় দিয়া নিতাই মেলা হইতে বাড়ি ফিরিতেছিল রাজদত্ত মাল্যকণ্ঠে সেকালের দিগ্বিজয়ী কবিদের মত। যেন একটা ভাবের নেশার ঘোরের মধ্যে পথ চলিতেছিল। মনে মনে সে বেশ অনুভব করিতেছিল যে সে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, সে একজন কবি।

সমস্ত পথটা তাহার আত্মীয়স্বজন, যাহারা এতদিন তাহার সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখিত না, আজ তাহারা তাহাকে ঘিরিয়া কলরব করিতে করিতে সঙ্গে আসিতেছিল। তাহাদের কলকোলাহলের কিছুই কিন্তু তাহার কানে আসিতেছিল না।

রাজা আসিতেছিল তাহার গা ঘেঁষিয়া। ওস্তাদের গৌরবে বুক তাহার ফুলিয়া উঠিয়াছে, সে পথ চলিতেছিল সভাকবির গৌরবতৃপ্ত রাজার মতই। অনর্গল সে লোকজনকে সাবধান করিতেছিল—হট যাও, হট যাও। এতনা নগিচমে কেঁও আতা হ্যায়? হট যাও। উৎসাহের প্রাবল্যে আজ তাহার ভুল-হিন্দী বলার মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছে। রাজার স্ত্রী ও ঠাকুরঝি একটু পিছনে আসিতেছিল। নিতাইয়ের আত্মীয়দের সহিত রাজার বউ গলগল করিয়া বকিতেছিল—তোমরা তো মা তাড়িয়ে দিয়েছিলে। এই তো ইস্টিশান, তোমাদের বাড়ীর দুয়োর থেকে দেখা

যায় ; কই, কোন দিন নেতাইয়ের খোঁজ করেছ ?

ঠাকুরঝি মেয়েটি অন্ধকারের মধ্যে ভীরু দৃষ্টি মেলিয়া, যে যখন কথা বলিতেছিল, তাহার মুখের দিকে চাহিতেছিল। পাশের গ্রামে তাহার শ্বশুরবাড়ী, মেলা উপলক্ষে সে আজ দিদির বাড়ী আসিয়াছে, রাত্রে এইখানে থাকিবে, ভোরে উঠিয়া চলিয়া যাইবে। তাহার বড় ইচ্ছা হইতেছিল ওস্তাদকে কয়টি কথা বলিতে!—তুমি এত সব কি ক'রে শিখলে ?. দিদির ঘরে গায়েন করতে, আমরা হাসতাম। বাবা, এত নোকের ছামুতে—ওই এত বড় কবিয়ালের সঙ্গে!—বাবা! কল্পনামাত্রেই রাত্রির অন্ধকার আবরণের মধ্যে অপরের অজ্ঞাতে মধ্যে মধ্যে তাহার দৃষ্টি বিস্ময়ে বড় হইয়া উঠিতেছিল।

চণ্ডীতলা হইতে ডোমপাড়ার ভিতর দিয়াই স্টেশনের পথ। নিতাইয়ের কয়েকজন আত্মীয় আজ তাহাকে আহ্বান করিল—বাড়ী আয়।

নিতাইয়ের মা এখানে আর থাকে না, সে তাহার কন্যাকে আশ্রয় করিয়া গ্রামান্তরে জামাইয়ের বাড়ীতে থাকে। জামাই এ অঞ্চলের বিখ্যাত দাঙ্গাবাজ লাঠিয়াল। রাত্রে ডাকাতি করে, গোপনে মদ চোলাই করিয়া বিক্রয় করে, ভাঙা ঘরে বসিয়া পাকী মদ খায়, ও সের দরুনে মাছ কেনে। নিতাইয়ের মা শুধু ভাতের জন্য নয়—ওই পাকী মদ ও মাছের প্রলোভনেই সেখানে এখন বাস করিতেছে। নিতাই একবার নিজের ভাঙা ঘরটার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, বলিল,—না, আমার আস্তানাতেই যাই।

ঠিক এই মুহূর্তটিতেই একটা রূঢ় কণ্ঠের কয়েকটা কঠিন কঠিন বাক্য অতি অতর্কিতে কোন নিষ্ঠুর হাতের ছোঁড়া কয়েকটা পাথরের টুকরার মত নিতাইকে আসিয়া আঘাত করিল,—এই শূয়ার—যাবি কোথা ? দাঁড়া!

এ তাহার মামার কণ্ঠস্বর। মামা এখানকার কুলাধিপতি। তাহাদের স্বজাতিদের নৈশাভিযানের দলপতি। দোর্দণ্ডপ্রতাপ।

নিতাই চমকিয়া উঠিল।

পাড়ার গলিমুখ হইতে মামা নামিয়া আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইল—প্রহ্লাদের সম্মুখে হিরণ্যকশিপুর মত। এবং খপ করিয়া তাহার টুঁটি টিপিয়া ধরিয়া বলিল—তোর বাবাকে দাদাকে গাল খাওয়ালি খাওয়ালি—আমার বাবাকে দাদাকে গাল খাওয়ালি ক্যানে আসরের মধ্যিখানে ? শূয়ারের বাচ্চা শূয়ার!

একমুহূর্তে হতভম্ব হইয়া গেল সকলে। রাজন পর্যন্ত। নিতাইয়ের মামার হাত সাঁড়াশীর চেয়েও শক্ত। লোহার তালা ওই হাতের মোচড়ে মট করিয়া ভাঙিয়া যায়। নিতাইয়ের শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু সে কবিগান করিলেও ওই মামারই ভাগিনেয়, ওই বংশেরই সন্তান। দেহে শক্তি তাহারও কম নয়। তার উপর প্রথম জোয়ান বয়স। সে দুই হাত দিয়া মামার হাতখানা টানিয়া ধরিল। পরমুহূর্তে রাজন আগাইয়া আসিল—ছোড়ো—!

মামার হত্যা করিবার সঙ্কল্প ছিল না। ইচ্ছা ছিল শাসনের। তাই নিতাইয়ের গলা ছাড়িয়া দিয়া বলিল—যাঃ। আর এ-পাড়ার পথ মাড়াবি না। মহাদেব কবিয়াল ওই একটা কথা ঠিক বলেছে। আস্তাকুঁড়ের আঁটো (এঁটো) পাতার স্বগ্‌গে যাবার আশা গো!—বলিয়া সে যেমন অতর্কিতে আসিয়াছিল—তেমনিই চকিতে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল।

সমবেত লোকগুলি স্তব্ধ হইয়াই ছিল—স্তব্ধ হইয়াই রহিল। রাজন শুধু চীৎকার করিতে চেষ্টা করিল—ই ক্যা হ্যায় ? ই ক্যা বাত ? আঁঃ। কেয়া, মগকে মুল্লুক হ্যায় ?

পাড়ার ভিতর হইতে আর একটা হুঙ্কার আসিল—যাঃ—যাঃ, চেঁচাস না রে বেটা কুলী !—

নিতাই রাজনের হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল—রাজন চুপ কর। চল। ই আমার পাপ ভাই। চল। বলিয়া হাসিয়া বলিল—আজ থেকে অকূলে ভাসলাম। সে অকূলে তুমিই আমার ভেলা।

রাজন তাহার হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিল—তুমি সাচ্চা আদমী ওস্তাদ।

নিতাই আবার একটু হাসিল। পেছনে ফোঁস ফোঁস করিয়া কাঁদিতেছিল ঠাকুরঝি। রাজার স্ত্রী বলিল—মরণ! কানছিস ক্যানে লো!

ভিড় তখন কমিয়া গিয়াছে। সঙ্গের লোকজন আপন আপন বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, নিতাই ও রাজার পরিবারবর্গ কেবল স্টেশনের পথে চলিল। কোয়ার্টারে আসিয়া রাজা বলিল —কুছ খা লেও ভাই ওস্তাদ।

নিতাই বলিল—গান শুনবে ভাই রাজন! ভাল গানের কলি এসেছে মনে। শুনবে?

রাজন বলিল—ঠ্যয়রো! ঢোলটো—

নিতাই হাত চাপিয়া ধরিল—না। শুধু গান।

বলিয়াই তাহার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর ঈষৎ চাপিয়া গাহিল—

আমি ভালবেসে এই বুঝেছি সুখের সার সে চোখের জলে রে।
তুমি হাস আমি কাঁদি বাঁশী বাজুক কদমতলে রে॥

রাজন বলিল—বাঃ, বাঃ, বাঃ! উসকা বাদ?

নিতাইয়ের চোখ দিয়া জল গড়াইতেছিল। সে জল মুছিতে মুছিতে বলিল—আর নাই।

তারপর সে সঙ্গে সঙ্গেই বিছানায় গড়াইয়া পড়িল। মনের মধ্যে অনেক কথা। মামার হাতে লাঞ্ছনার কথাটা তাহার কাছে খুব বড় নয়। মামার কাছে অনেক লাঞ্ছনাই সে ভোগ করিয়াছে। ওটা তাহার অঙ্গের ভূষণ। ও ছাপাইয়া সে ভাবিতেছিল কবিগানের কথা।

বিশেষ করিয়া এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ কবিয়াল তারণ মণ্ডলের কথা। তারণ কবি যে-আসরে গান করিয়াছে, সে আসরে কত লোক! হাজারে হাজারে, কাতারে কাতারে! সে যেবার প্রথম তারণ কবির গান শোনে সেবারকার সে-ছবি এখনও তাহার মনে জলজল করিতেছে।

এই চণ্ডীমায়ের মেলাতেই, সে কি জনতা, আর সে কি গোলমাল! তখন মেলারও সে কি জাঁকজমক! চার-পাঁচটা চাপরাসীই তখন মেলার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বাহাল করা হইত। তাহাদের সঙ্গে থাকিত বাবুদের দারোয়ান এবং দুই-চারিজন বাবু। তবু সে কি গোলমাল! নিতাইয়ের স্পষ্ট মনে পড়িল কলরবমুখর জনতা মুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া গেল, আলোকোজ্জ্বল আসরের মধ্যে তখন তারণ কবি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই লম্বা মানুষটি, পাকা চুল, পাকা গোঁফ, কপালে সিন্দূরের ফোঁটা, বুকে সারি-সারি মেডেল, লাল চোখ। তারণ কবির আবির্ভাবেই সব চুপ হইয়া গিয়াছিল। আসরের একদিকে বেঞ্চ পাতিয়া গ্রামের বাবুরা বসিয়া ছিল, তাহারা পর্যন্ত চুপ করিয়া গিয়াছিল। আর সে কি গান!

তারপর হইতে আশেপাশে যখন যেখানে তারণ কবির গান হইয়াছে; সেইখানেই সে গিয়াছে। একবার ভিড়ের মধ্যে হাত বাড়াইয়া সে তারণ কবির পায়ের ধুলাও লইয়াছিল। তখন হইতেই তাহার সাধ, কবিয়াল হইবে। ইচ্ছা ছিল তারণ কবির দলে দোয়ারকি করিয়া সে কবিগান শিখিবে। কিন্তু তারণ মরিয়া গেল। মদ খাইয়াই নাকি তারণ মরিয়াছে।

তারণ কবির ওই একটা বড় দোষ ছিল, ভীষণ মদ খাইত। আসরেই তাহার বোতল গেলাস থাকিত, সকলের সম্মুখেই সে মধ্যে মধ্যে জল বলিয়া মদ খাইত। ওই তারণ কবি সেদিন গানে গাহিয়াছিল—

"তোমার লাথি আমার বুকে পরম আশীষ শোন দশানন,
তোমার চরণধূলা আমার অঙ্গে অগুরু চন্দন
বিভীষণের রাক্ষস জন্মের শাপবিমোচন,
খালাস, খালাস, খালাস, আমি খালাস নিলাম হে।"

সেদিন পালাতে তারণ হইয়াছিল বিভীষণ এবং প্রতিপক্ষ বিষ্ণু সিং হইয়াছিল রাবণ। সেই কথাটাই আজ বার বার করিয়া মনে পড়িতেছিল। সে আজ খালাস। খালাস। খালাস।

এক-একসময় তাহার মনে হয় তারণ কবি তাহারই কপালদোষে মরিয়া গেল। সে গুরু পাইল না। এমন ভাল গুরু না হইলে কি ভাল কবি হওয়া যায়! শাস্ত্রের কি অন্ত আছে? পড়িয়া শুনিয়া সে সব শিখিতে গেলে এ জীবনে আর কবিয়াল হওয়া হইয়া উঠিবে না। রামায়ণ মহাভারত—। সহসা তাহার মনে হইল, মহাদেব আজ রামায়ণ হইতে যে প্রশ্নটা লইয়া তাহাকে অপদস্থ করিয়াছে, সেটা কিন্তু ঠিক নয়। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠিয়া বসিল। আলো জ্বালিল।

ছোট একটি চৌকির উপর যত্নের সহিত রঙিন কাপড়ে বাঁধিয়া সে তাহার পুঁথিগুলি রাখিয়া থাকে। দপ্তর খুলিয়া সে রামায়ণ বাহির করিল। দপ্তরের মধ্যে একগাদা বই। পাঠশালা হইতে আজ পর্যন্ত সংগৃহীত বইগুলি সবই তাহার আছে। পথেঘাটে উড়িয়া বেড়ায় যে সমস্ত ছেঁড়া কাগজ ও বইয়ের পাতা, তাহারও অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়া নিতাই রাখিয়াছে। কাগজ দেখিলেই সে কুড়াইয়া লইয়া পড়িতে চেষ্টা করে। যাহা ভাল লাগে তাহাই সে সযত্নে রাখিয়া দেয়। বইয়ের সংগ্রহ তাহার কম নয়—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, কৃষ্ণের শতনাম, শনির পাঁচালী, মনসার ভাসান, গঙ্গামাহাত্ম্য, স্থানীয় থিয়েটার-ক্লাবের ফেলিয়া-দেওয়া কয়েকখানা ছেঁড়া নাটক; ইহা ছাড়া তাহার পাঠশালার বইগুলি—সে প্রথম ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেকখানি আছে। আর আছে খান দুইয়েক খাতা, ভাঙা স্লেট-পেন্সিল, একটা লেডপেন্সিল, ছোট একটুকরা লাল-নীল পেন্সিল। আর কিছু ছেঁড়া পাতা, খোলা কাগজ।

সেই রাত্রেই সে নিবিষ্ট মনে রামায়ণের পাতা উল্টাতেই আরম্ভ করিল। ঠিক, মহাদেব তাহাকে ধাপ্পা মারিয়াই হার মানাইয়াছে। ভুল তাহার নয়, মহাদেবই ভুলকে সত্য করিয়াছে মুখের জোরে। হাসিয়া সে মহাদেবের প্রশ্নের উত্তরের ঠাঁইটা বন্ধ করিয়া রাবণ ও বিভীষণের বিতণ্ডার অধ্যায়টা খুলিল। পড়িয়া বই বন্ধ করিয়া সে আবার শুইয়া পড়িল। কিন্তু ঘুম কিছুতেই আসে না। রগের শিরা দুইটা দপ দপ করিয়া লাফাইতেছে, কানের পাশে এখনও যেন ঢোল কাঁসির শব্দ উঠিতেছে। ধীরে ধীরে শব্দগুলা মৃদু হইতে মৃদুতর হইতে হইতে একসময় নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

ঘুম ভাঙিল রাজার ডাকে।

মিলিটারী রাজা রাত্রি জাগিয়াও ঠিক সকাল ছয়টায় উঠিয়াছে। সাতটায় এ লাইনের ফার্স্ট ট্রেন এ-স্টেশন অতিক্রম করিবে। যুদ্ধ-ফেরত রাজা চা খায়, চায়ের জল চড়াইয়া দিয়া স্টেশনে সিগন্যাল দিয়া ও ঘণ্টি মারিয়া আসিয়া ওস্তাদকে ডাকিল—ওস্তাদ! ওস্তাদ!

ওস্তাদ না হইলে চা খাইয়া সুখ হয় না। বউটা এখনও ঘুমাইতেছে। ঠাকুরঝি কিন্তু ঠিক আছে, সে রাজার পূর্বেই উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে। ঠাকুরঝির শাশুড়ীটা বড় দজ্জাল। এমন মেয়েটিকেও বড় কষ্ট দেয়। রাজা মনে মনে এখন আপসোস করে,—বউটাকে কেন সে বিবাহ করিল! ঠাকুরঝিকে বিবাহ করিলেই ভাল হইত। ছিপছিপে দ্রুতগামিনী দ্রুতহাসিনী দ্রুত-ভাষিণী মিষ্ট স্বভাবের ঠাকুরঝি তাহার মুখরা দিদির চেয়ে অনেক ভাল।

নিতাইয়ের সাড়া না পাইয়া রাজা আবার ডাকিল—হো ওস্তাদ!

এবার নিতাই জড়িত স্বরে উত্তর দিল—উঁহু।

—চা হো গেয়া ভেইয়া!

—উঁহু।

—আরে ট্রেন আতা হ্যায় ভেইয়া।

—উঁহু।

রাজা নিরুপায় হইয়া চলিয়া গেল। আর ডাকিল না। কাল রাত্রে ওস্তাদের বড়ই খাটুনি গিয়াছে, আজ বেচারার একটু ঘুম দরকার।

* * * *

বেলা নয়টা নাগাদ নিতাই উঠিল। হাসিমুখেই উঠিল। বোধ হয় গত রাত্রের কথা স্বপ্ন দেখিয়াই, একটু মৃদু হাসি মুখে মাখিয়া উঠিয়া বসিল। এবং প্রথম কথাই মনে হইল যে কলিকাতার সেই চাকুরে বাবুটি আজ তাহাকে দেখিলেই বলিবেন—আরে তুই একজন কবি রে, অ্যাঁ! তাহার পর ইংরেজীতে কি একটা।

ভূতনাথবাবু তারিফ করিবেন—বাহবা রে নিতাই, বাহবা!

ক্রমে ক্রমে সমস্ত গ্রামের লোকেরই সপ্রশংস বিস্মিত-দৃষ্টি মুখগুলি তাহার মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল। বিপ্রপদ ঠাকুর তো একেবারে কোলাহল জুড়িয়া দিবে। স্টেশনে গিয়া বসিলেই হয়। এই সাড়ে নটার ট্রেনেই বিপ্রপদর মারফৎ তাহার কবিখ্যাতি একেবারে কাটোয়া পর্যন্ত আজই পৌঁছিয়া যাইবে। বাসি দুধ চা চিনি ঘরেই আছে, তবু সে আজ ঘরে চা তৈয়ারী করিল না। চায়ের মগটি হাতে করিয়া শিথিল মন্থর পদক্ষেপে স্টেশন-স্টলে আসিয়া উপস্থিত হইল, মুখে সেই মৃদু হাসি।

বিপ্রপদ হৈ-হৈ করিয়া উঠিল—এই! এই! চোপ, সব চোপ! তারপর তাহাকে সম্বর্ধনা করিয়া বলিল—বলিহার বেটা বলিহার! জয় রামচন্দ্র! কাল নাকি সত্যি সত্যিই লঙ্কাকাণ্ড করে দিয়েছিস শুনলাম। ভ্যালা রে বাপ কপিবর!

আশ্চর্যের কথা, বিপ্রপদর পুরানো রসিকতায় নিতাই আজ অত্যন্ত আঘাত অনুভব করিল, মুহূর্তে সে গম্ভীর হইয়া গেল।

বিপ্রপদর সেদিকে খেয়াল নাই, সে উত্তর না পাইয়া আবার বলিল—ধুয়ো কি ধরেছিলি বল দেখি? 'উপ! 'উপ! খ্যাকোর—খ্যাকোর উপ! চুপ রে বেটা মহাদেবা চুপ চুপ চুপ!' না কি? বলিয়া সে টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল।

নিতাই এবার হাত জোড় করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল—আজ্ঞে প্রভু, মুখ্যু-সুখ্যু মানুষ, ছোট জাত; বাঁদর, উল্লুক, হনুমান, জাম্বুমান যা বলেন তা-ই সত্যি। ' বলিয়াই সে আপনার মগটি বাড়াইয়া ভেণ্ডার বেনে মামাকে বলিল—কই গো, দোকানী মাশায়, চা দেন দেখি! সঙ্গে সঙ্গে সে পয়সা দিবার জন্য খুঁট খুলিতে আরম্ভ করিল।

দোকানী বেনে মামা মগে চা ঢালিয়া দিয়া বলিল—মাতুল না ব'লে দোকানী বলছিস,

সম্বন্ধ ছাড়ছিস নাকি নিতাই ?

নিতাই কথার উত্তর দিল না। বেনে মামাই বলিল—নাঃ, কাল নেতাই আমাদের আচ্ছা গান করেছে, ভাল গান করেছে ! সে যাই বলুন আপনি।

বিপ্রপদ তাড়াতাড়ি একটা ঘুঁটে লইয়া একটা ছিদ্র করিয়া তাহাতে দড়ি পরাইতে পরাইতে বলিল—তার জন্যে কপিবরকে একটা মেডেল দোব।

কিন্তু তাহাকে সে অবসর না দিয়াই নিতাই চায়ের মগটি হাতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

ওদিকে সাড়ে নয়টার ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে আসিয়া পড়িয়াছে। বিপ্রপদ ও বেনে মামা মনে করিল নিতাই বোধ হয় মোটের সন্ধানে গেল। কিন্তু প্ল্যাটফর্ম হইতে রাজা হাঁকিতেছিল—ওস্তাদ ! ওস্তাদ !

সাড়া না পাইয়া রাজা নিজেই ছুটিয়া আসিল। বেনে মামা বলিল—এই তো উঠে গেল ! প্ল্যাটফর্মে নাই ?

এদিক ওদিক চাহিয়া রাজার নজরে পড়িল, গাছপালার আড়ালে আড়ালে নিতাই চলিয়াছে বাসার দিকে। সে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে ধরিল।

—গাঁওকে একঠো মোট হ্যায় ভেইয়া, একঠো বেগ আওর ছোটাসে একঠো বিস্তারা।

নিতাই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না।

—আরে, বড়বাবুকে জামাই। উমদা বকশিশ মিলে গা। দো আনা তো জরুর।

—না।

—কেয়া, তবিয়ৎ কুছ খারাপ হ্যায় ?

—না।

—তব্‌ ? রাজা বিস্মিত হইয়া গেল।

নিতাই গম্ভীরভাবে বিষণ্ণ মৃদু হাসিয়া বলিল—কুলিগিরি আর করব না রাজন।

রাজা এবারে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল।

পাঁচ

নিতাই বাসায় আসিয়া হঠাৎ রামায়ণখানা খুলিয়া বসিল। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া গভীর মনোযোগের সঙ্গে বইখানি খুলিল। বিপ্রপদর কথায় সে মর্মান্তিক আঘাত পাইয়াছে। সে বার বার ভাবিতে চেষ্টা করিয়াছে—ব্রাহ্মণবংশের মূর্খ কি বুঝিবে ! কিন্তু কিছুতেই তাহার মন শান্ত হয় নাই। তাই সে রামায়ণখানা টানিয়া লইয়া বসিল। বইখানা খুলিয়া সে বাহির করিল দস্যু রত্নাকরের কাহিনী। বহুবার সে এ কাহিনী পড়িয়াছে, কিন্তু আজ এ কাহিনী নূতন রূপ নূতন অর্থ লইয়া তাহার মনের মধ্যে সাড়া জাগাইয়া তুলিল। বই হইতে পড়িবার পূর্বেই জানা কাহিনী তাহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখে জলও আসিয়াছে। চোখ মুছিয়া সে এবার পড়িতে আরম্ভ করিল।

"রামনাম ব্রহ্মাস্থানে পেয়ে রত্নাকর।
সেই নাম জপে ষাট হাজার বৎসর॥"

বাহির হইতে রাজা তাহাকে ডাকিল—ওস্তাদ !

উদাসভাবেই মুখ তুলিয়া নিতাই তাহাকে আহ্বান করিল—এস, রাজন এস।

রাজা আসিয়া বসিয়াই তাহাকে প্রশ্ন করিল—কেয়া হুয়া ভাই তুমারা? কাম কেঁও নেহি করেগা?

নিতাই হাসিয়া বলিল—শোন, আগে এই কাহিনীটা শোন।

রাজা বলিল—দূ-রো, ওহি লিখাপড়ি তুমারা মাথা বিগড় দিয়া।

নিতাই তখন পড়া শুরু করিয়া দিয়াছে। রাজা অগত্যা একটি বিড়ি ধরাইয়া শুনিতে বসিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে তন্ময় হইয়া গেল।

"বর দিয়া ব্রহ্মা গেলা আপন ভবন।
আদিকাণ্ড গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ॥"

পড়া শেষ করিয়া নিতাই রাজার মুখের দিকে চাহিল। রাজা তখন গলিয়া গিয়াছে। সে হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—সীয়ারাম! সীয়ারাম! তারপর নিতাইয়ের তারিফ্ আরম্ভ হইল—আচ্ছা পঢ়তা হ্যায় তুম ওস্তাদ! বহুৎ আচ্ছা!

নিতাই এবার গম্ভীরভাবে বলিল—রাজন, এইবার তুমিই বিবেচনা ক'রে দেখ।

রাজা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—কি?

জানালা দিয়া রেললাইনের রেখা ধরিয়া দূরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিতাই বলিল—রত্নাকর, ধর কবি হলেন, তারপর কি তোমার তিনি ডাকাতি করতেন, না, মানুষ মারতেন?

রাজা বলিয়া উঠিল—আরে বাপ রে, বাপ রে! এইসা কভি হো শকতা হ্যায় ওস্তাদ!

—তা হ'লে? কাল রাত্রির কথাটা একবার স্মরণ ক'রে দেখ। চারিদিকে তো র'টে গেল কবিয়াল ব'লে!

—আলবৎ! জরুর!

—তবে? আর কি আমার মস্তকে করে মোট বহন করা উচিত হবে? বাল্মীকি মুনির কথা ছেড়ে দাও! কার সঙ্গে কার তুলনা! ভগবানের অংশ, দেবতা ওঁরা। কিন্তু আমিও তো কবি। না হয় ছোট।

এতক্ষণে এইবার রাজা সমস্তটা বুঝিল এবং একান্ত শ্রদ্ধান্বিত বিস্ময়ে নিতাইয়ের মুখের দিকে নির্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

নিতাই বলিল—বল রাজন, আর কি আমার কুলিগিরি করা শোভন হবে? লোকে ছি ছি করবে না? বলবে না—কবি মোট বহন করছে!

—হাঁ, ই বাত ঠিক হ্যায়। কিন্তু পরক্ষণেই চিন্তিত হইয়া রাজা বলিল—লেকিন একঠো বাত ওস্তাদ—

—বল? রাজার মুখের দিকে চাহিয়া নিতাই প্রশ্ন করিল।

—লেকিন রোজগার তো চাহিয়ে ভাই; খানে তো হোগা ভেইয়া!

বার বার ঘাড় নাড়িয়া নিতাই বলিল—সে আমি ভাবি না রাজন। দুবেলা না হয়, একবেলা খেয়েই থাকব, তাও যেদিন না জুটবে, সেদিন না হয় উপবাসীই থাকব। অতঃপর অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া কণ্ঠস্বরে বিপুল গুরুত্ব আরোপ করিয়া সে বলিল—তা ব'লে ভগবান যখন আমাকে কবি করেছেন, তখন—! নিতাই বার বার অস্বীকারের ভঙ্গীতে ঘাড় নাড়িল, অর্থাৎ না—না—না! তখন সে মাথায় করিয়া মোট আর বহিবে না।

রাজাও গম্ভীরভাবে চিন্তা করিতেছিল, সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া এবার পরিষ্কার বাংলায় বলিল—না ওস্তাদ, ছোট কাজ আর তোমার করা হবে না। উঁহু। নাঃ।

রাজার উপর নিতাইয়ের প্রীতির আর সীমা রহিল না। গভীর আবেগের সহিত সে বলিল—তুমি আমার সত্যকার মিত্র রাজন।

—ধন্য হোগেয়া ওস্তাদ, তুমারা মিত্র হোয়কে হাম ধন্য হোগেয়া। রাজনেরও আবেগের অবধি ছিল না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিতাই এবার বলিল,—আজ বড় দুঃখ পেয়েছি রাজন।

—দুখ? কৌন দুখ দিয়া ভাই?

—ওই তোমার বিপ্রপদ ঠাকুর। আমাকে বললে কি না—কপিবর, মানে হনুমান! আমি হনুমান রাজন?

রাজা মুহূর্তে সোজা হইয়া বসিল। তাহার মিলিটারী মেজাজ মাথা-চাড়া দিয়া উঠিয়াছে, সে ক্রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করিল নিতাইকে—জবাব কেঁও নেহি দিযা তোম?

—জবাব জিহ্বার অগ্রভাগে এসেছিল রাজন, কিন্তু সামলে নিলাম। ব্রাহ্মণ বংশের মূর্খ বলীবর্দ অপেক্ষা কপি অনেক ভাল রাজন।

—জরুর। আলবৎ। লেকিন বলীবর্দ কিয়া হায় ভাই?

নিতাই বলিল—বলদকে বলে ভাই!

তারপর নিজেই রচনা করিয়া বলিল—

"সংসারে যে সহ্য করে সেই মহাশয়।
ক্ষমার সমান ধর্ম কোন ধর্ম নয়॥"

কবিতা আওড়াইয়া নিতাই বলিল—বুঝলে রাজন, ক্ষমা করেছি আমি। একে ব্রাহ্মণ, তায় রোগা লোক, তার উপর মূর্খ, ওকে আমি ক্ষমা করেছি।

রাজন মুগ্ধ হইয়া গেল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল—সাদা বাংলায় বলিল—ভালই করেছ ওস্তাদ। তারপরই সে আবার বলিল—তা'হলে কি করবে ওস্তাদ? একটা কিছু করা তো চাই ভাই। পেটের তুল্য অনবুঝ তো নাই সংসারে।

—আমি একটা দোকান করব ওস্তাদ।

—দোকান?

—হ্যাঁ, দোকান। বিড়ির দোকান, নিজেই বিড়ি বাঁধব, আর ইস্টিশানের বটতলায় বসে বেচব। দু-এক বাক্স সিগারেটও রাখব।

রাজন উৎসাহিত হইয়া উঠিল—বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা হোগা ওস্তাদ!

নিতাই কিন্তু এবার একটু ম্লানভাবেই বলিল—বণিক মাতুল একটু রুষ্ট হবে আমার ওপর। কিন্তু—

—কেয়া কিন্তু? উ গোসা করনেসে কেয়া হোগা? জাস্তি ভাত খায়েগা আপনা ঘরমে!

—না রাজন। কারও ক্ষতি করতে আমার ইচ্ছা নাই। তা ছাড়া আমার হাতের পান, চা, জল এ তো কেউ খাবে না। বলিতে বলিতেই সে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।—আচ্ছা রাজন, বাঁশ কিনে যদি মোড়া সাজি বেশ শৌখীন করে তৈরি করি, তা'হলে কেমন হয়?

—উ সব্‌সে আচ্ছা!

—কিন্তু বিপ্রপদ বলবে কি জানো? ডোমবৃত্তির দিকে আঙুল দেখিয়ে বলবে—বেটা ডোম!

দাঁতে দাঁত ঘষিয়া রাজন বলিল—একদিন ঠেসে কান দুটো মলে দেবো বেটা বামুনের।

—না। না। না। হাজার হ'লেও ব্রাহ্মণ! রাজন, "ব্রাহ্মণ সামান্য নয়, ব্রাহ্মণে করিলে ক্রোধ হইবে প্রলয়।" শাস্ত্রের কথা ভাই। তা ছাড়া—

রাজা বাধা দিয়া বলিল—ধ্যে-ৎ! ব্রাহ্মন! সাতশো ব্রাহ্মন একঠো বক-পাখীকা ঠ্যাং ভাঙনে নেহি শকতা হ্যায়! ব্রাহ্মন?

নিতাই হাসিয়া বলিল—না-না-না। বলুক ডোম! ডোমেই বা লজ্জা কি? ডোমই বা ছোট কিসে? ডোমও মানুষ বামুনও মানুষ!

—বাস—বাস—বাস! কেয়া হরজ্। বলনে দেও ডোম। রাজনেরও আর কোন আপত্তি রহিল না।—বহুত আচ্ছা কাম, দোকান লাগাও, আওর একঠো সাদী করো ওস্তাদ! সন্সার পাতাও।

তাচ্ছিল্যের সহিত ঠোঁট উল্টাইয়া নিতাই বলিল—দূর!

—দূর কেঁও ভাই? উ হাম নেহি শুনেগা।

—আচ্ছা তার আগে একটা কাহিনী বলি শোন।

কাহিনীতে রাজনের পরম অনুরাগ, সে বিড়ি ধরাইয়া জাঁকিয়া বসিল। নিতাই আরম্ভ করিল লেজকাটা শেয়ালের গল্প। গল্প শেষ করিয়া নিতাই বলিল—তুমি লেজ কেটেছ ব'লে আমি লেজ কা'টছি না রাজন!

রাজা প্রথমে অবশ্য খানিকটা হাসিল, তারপর কিন্তু বলিল—উ বাত তুমারা ঠিক নেহী হ্যায়। সন্সারমে আয়কে সাদী নেহি করেগা তো কেয়া করেগা?

নিতাই এবার বলিল—তুমি ক্ষেপেছ রাজন! বিয়ে ক'রে বিপদে পড়ব শেষে! আমাদের জাতের মেয়ে কখনও বিদ্যের মর্ম বোঝে?—কেবলই খ্যাঁচ-খ্যাঁচ করবে দিনরাত। তা ছাড়া ধরগা তোমার—; কথা শেষ হইবার পূর্বেই নিতাই ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

ভ্রূ নাচাইয়া রাজা প্রশ্ন করিল—উ কেয়া বাত ওস্তাদ? ফিক করকে হাঁসতা কেঁউ?

—হাসবো না? তোমার, তেমন মনে-ধরা কনেই বা কোথায় হে? বেশ মৃদু হাসিয়া নিতাই বলিল—আমরা হলাম কবিয়াল লোক। আমাদের চোখ তো যাতে-তাতে ধরবে না রাজন!

রাজা এবার হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। রাজার উচ্চহাসি উৎকট এবং বিকট। রাজার সে হাসি কিন্তু অকস্মাৎ আবার বন্ধ হইয়া গেল। গম্ভীর হইয়া সে বার বার ঘাড় নাড়িয়া এই সত্যকে স্বীকার করিয়াই বলিল—ঠিক বাত ওস্তাদ, ঠিক বাত বোলা হ্যায় ভাই। লড়াইমে গিয়া, দেখা, আ-হা-হা একদম ফুলকে মাফিক জেনানা। ইরাণী দেখা হ্যায় ওস্তাদ, ইরাণী? ওইসা, লেকিন উস্‌সে তাজা।

রাজার কথা ফুরাইয়া গেল, কিন্তু স্মৃতির ছবি ফুরাইল না। সে উদাস দৃষ্টিতে জানালার ভিতর দিয়া চাহিয়া রহিল বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রের দিকে। যেন বসরার সেই রূপসীদের শোভা—ওই ধূ-ধূ-করা কৃষিক্ষেত্রে ভাসিয়া উঠিয়াছে। নিতাইও চাহিয়া ছিল জানালার ভিতর দিয়া, রেললাইনের সমান্তরাল শাণিত দীপ্ত দীর্ঘ রেখা দুইটি বাঁকের মুখে যেখানে একটি বিন্দুতে এক হইয়া মিলিয়া গিয়াছে, সেই বিন্দুটির দিকে। সহসা একসময় সেই বিন্দুটির উপর জাগিয়া উঠিল চলন্ত সাদা কাশফুলের মত একটি রেখা, রেখাটির মাথায় একটি স্বর্ণবিন্দু, যেন ঝকমক করিয়া উঠিতেছে মুহূর্তে মুহূর্তে! চকিতে চকিতে একটি ছটা ছুটিয়া আসিতেছে।

তাহাদের এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল রাজার স্ত্রীর তীক্ষ্ণ উচ্চ কণ্ঠ। রাজার স্ত্রী চীৎকার করিতেছে। রাজা এখানে বসিয়া আড্ডা দিতেছে, তাই সে আপনার অদৃষ্টকে উপলক্ষ্য রাখিয়া, রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বাছিয়া বাছিয়া শাণিত বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিতেছে।

—ছি রে, ছি রে আমার অদেষ্ট! সকালবেলা থেকে বেলা দোপর পর্যন্ত মানুষের ঘর ব'লে মনে থাকে না। অদেষ্টে আমার আগুন লাগুক, পাথর মেরে এমন নেকনকে (কপালকে) ভেঙে কুচিকুচি করি আমি।

রাজার মুখখানা ভীষণ হইয়া উঠিল, সে উঠিয়া পড়িল। নিতাই শঙ্কিত হইয়া বলিল—কোথা যাচ্ছ?

—আতা হ্যায়। আভি আতা হ্যায়। সে চলিয়া গেল।

—রাজন! রাজন! নিতাই পিছন পিছন আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরই রাজা ফিরিল সেই উচ্চহাসি হাসিতে হাসিতে। হাসিয়া সে মাটির উপর শুইয়া পড়িল। নিতাই প্রশ্ন করিল—হ'ল কি?

রাজার হাসিতে মুহূর্তের জন্য ছেদও পড়ে না এবং এমন টানা হাসির মধ্যে কথাও বলা যায় না। তবুও বহুকষ্টে রাজা বলিল—ভাগা হ্যায়। মাঠে মাঠে—। সঙ্গে সঙ্গে সেই উৎকট উচ্চহাসি।

নিতাই বুঝিল। গালিগালাজ-মুখরা রাজার স্ত্রী রুদ্র মূর্তিতে রাজাকে আসিতে দেখিয়াই বিপরীত দিকের দরজা দিয়া বাহির হইয়া ছুটিয়া পলাইয়াছে। রাজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ফিরিয়া দেখার অভিনয় করিয়া বলিল, এইসা করকে দেখতা; হাম এক পাঁও গিয়া তো ফিন দৌড় লাগায়া। অর্থাৎ রাজাকে এক পা অগ্রসর হইতে দেখিলেই সে দৌড় দিয়াছে, আবার কিছুদূর গিয়া ফিরিয়া দেখিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে রাজা আর এক পা বাড়াইয়াছে, দৌড়িয়া যাইবার ভঙ্গি করিয়াছে, অমনি রাজার বউও ছুটিয়া পলাইয়াছে। রাজার কিলকে তাহার বড় ভয়। বলিতে বলিতে রাজা আবার হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

এই মুহূর্তটিতেই বাড়ীর মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল সেই ঠাকুরঝি। পরনে সেই ক্ষারে ধোয়া ধবধবে মোটা সুতার খাটো কাপড়, মাথায় পরিচ্ছন্ন মাজা পিতলের ঘটী। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে সেটি সোনার মত ঝকঝক করিতেছে।

নিতাই সাদরে আহ্বান করিল—এস ঠাকুরঝি, এস!

ঠাকুরঝি রাজাকে এমনভাবে হাসিতে দেখিয়া বিপুল কৌতুক অনুভব করিল। সকৌতুকে সে রাজার দিকে আঙুল দেখাইয়া নিতাইকে প্রশ্ন করিল তাহার স্বভাবগত বাচন ভঙ্গিতে—এই, এই, জামাই এত হাসছে কেনে?

—শুধাও ভাই জামাইকে। নিতাই হাসিল।

—অই! অই! ই কি হাসি গো! এমন ক'রে হাসছ কেনে গো জামাই? সঙ্গে সঙ্গে হাসির ছোঁয়াচ তাহাকেও লাগিয়া গেল। সেও হাসিতে আরম্ভ করিল—হি-হি-হি। হি-হি-হি। অত্যন্ত দ্রুত মৃদু ধাতব ঝঙ্কারের মত হাসি।

রাজার হাসি অকস্মাৎ থামিয়া গেল। তাহার দিকে আঙুল দেখাইয়া হাসার জন্য সে ভীষণ চটিয়া উঠিয়াছে। তাহার মনে হইল মেয়েটা তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। ভীষণ চটিয়া রাজা ধমক দিয়া উঠিল—অ্যাও!

ধমক খাইয়া মেয়েটির হাসি বাড়িয়া গেল।

রাজা বলিল—আলকাতরার মত রঙ, সাদা দাঁত বের ক'রে হাসছে দেখ! লজ্জা নাই তোর?

এবার মেয়েটি যেন মার খাইয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া অত্যন্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়া সে বলিল—লাও বাপু, দুধ লাও! আমার দেরি হয়ে গেল। গেরস্তেতে বকবে।

রাজা বলিল—তোকেও একদিন ঠ্যাঙানি দিতে হবে দেখছি। দিদির মত মাঠে মাঠে—! আবার সে হাসিতে আরম্ভ করিল।

ঠাকুরঝি কিন্তু এবার হাসিল না। সে নীরবে নতমুখে ঘটী হইতে মাপের গ্লাসে দুধ ঢালিয়া গ্লাসটি পরিপূর্ণ করিয়া ধরিয়া আবার তাগাদা দিল—কই গো, কড়াই পাত।

নিতাই ব্যস্ত হইয়া দুধের কড়াটি পাতিয়া দিয়া বলিল—রাগ করলে ঠাকুরঝি? না না, রাগ ক'রো না।

ঠাকুরঝি উত্তর দিল না, মাপা দুধ ঢালিয়া দিয়া সে নীরবেই চলিয়া গেল। পিছন হইতে রাজা এবার রসিকতা করিয়া বলিল—ওঃ, ঠাকুরঝি আমার ডাকগাড়ি গেল। বাবা রে, বাবা রে, ছুটেছে! পোঁ—ভস-ভস ভস-ভস। বাবা রে!

ঠাকুরঝি কিন্তু ফিরিয়াও চাহিল না।

নিতাই বলিল—না রাজন, এ-প্রকার বাক্য বলা তোমার উচিত হ'ল না।

কিন্তু রাজা সে কথা স্বীকার করিল না। কিসের অনুচিত? সে ফুৎকারে আপনার অন্যায় উড়াইয়া দিল—ধে—ৎ!

সঙ্গে সঙ্গেই সে উঠিয়া পড়িল। দেড়টার গাড়ীর ঘণ্টা দিতে হইবে। এই সময়টি নির্ণয়ে ঠাকুরঝি তাহার সিগনাল। ঠাকুরঝি দুধ দিয়া গ্রামে গেলেই সে স্টেশনের দিকে রওনা হয়, মধ্যপথেই শুনিতে পায় মাস্টার হাঁকিতেছে—রাজা!

রাজা নিত্য সাড়া দেয়, আজও দিল—হাজির হায় হুজুর।

ঠাকুরঝি এবং রাজন দুজনেই চলিয়া গেল। নিতাই একটু বিষণ্ণ হইয়াই বসিয়া রহিল। না-না, এমন ভাবে ওই মিষ্টি মেয়েটিকে রাজনের এমন কটু কথা বলা উচিত হয় নাই। সংসারে সুখ ভালবাসায়, মিষ্টি কথায়। কাল রাত্রে গাওয়া গানখানি আবার তাহার মনে পড়িয়া গেল।

"আমি ভালবেসে এই বুঝেছি—
সুখের সার সে চোখের জলে রে!"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠাকুরঝি দুধ দিয়া গিয়াছে; চা খাইতে হইবে। সে উনান ধরাইতে বসিল। দোকানী বণিক মাতুলের মাপা চায়ে তাহার নেশা হয় না; তা ছাড়া শরীরটাও আজ ভাল নাই। গত রাত্রির পরিশ্রমে, উত্তেজনায়, অনিদ্রায়—আজ অবসাদে দেহ যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। মাথা ঝিমঝিম করিতেছে। কানের মধ্যে এখনও যেন ঢোল-কাঁসির শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আর একটু চা না হইলে জুত হইবে না।

উনান ধরাইয়া কেত্‌লির বিকল্প একটি মাটির হাঁড়িতে সে জল চড়াইয়া দিয়া নীরবে বসিয়া রহিল; তাহার মন আবার উদাস হইয়া উঠিল। নাঃ, রাজনের এমন কটু কথা বলা ভাল হয় নাই। ঠাকুরঝি মেয়েটি বড় ভাল। আজ সে অনেক কথা অনর্গল বলিত। বলিবার ছিল যে! গত রাত্রির কবিগান শুনিয়া ঠাকুরঝি সবিস্ময়ে কত কথা বলিত। মেয়েটি অত্যন্ত দুঃখ পাইয়াছে, তাই সে কথাগুলি না বলিয়াই চলিয়া গেল। 'আলকাতরার মত রঙ'—। ছি, ওই কথাই কি বলে? কালো? ওই মেয়ে কালো? রাজনের চোখ নাই। তা ছাড়া কালো কি মন্দ। কৃষ্ণ কালো, কোকিল কালো—চুল কালো—আহা-হা! আহা-হা! বড় সুন্দর, বড় ভাল একটি কলি মনে আসিয়া গিয়াছে রে! হায়, হায়, হায়!

"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে ?"

কেন কাঁদ ?

ছয়

বড় ভাল কলি হইয়াছে। নিতাইয়ের নিজেরই নেশা ধরিয়া গেল।—

"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে ?"

বাহবা, বাহবা, বাহবা! কেন কাঁদ ?

ওদিকে চায়ের জল টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। ব্যস্ত হইয়া নিতাই ফুটন্ত জলের হাঁড়িটা নামাইয়া চা ফেলিয়া দিয়া একটা কলাই-করা লোহার থালা চাপা দিল। 'ফুটন্ত জলে প্রত্যেক জনের জন্য এক চামচ চা দিয়া পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন'—বেনে মামার স্টলে নিতাই চা প্রস্তুত করিবার বিজ্ঞাপন পড়িয়াছে! কিন্তু তাহার পর কি ?

চা দিয়া আবার সে আপন মনে কলিটা ভাঁজিতে আরম্ভ করিল। দ্বিতীয় কলি আর মনোমত হইতেছে না। সে জানালা দিয়া বাহিরের যাবতীয় কালো বস্তুর দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু তবু পছন্দসই দ্বিতীয় কলি আসিল না। অন্য দিন সে গরম জলে চা দিয়া মনে মনে এক হইতে ষাট পর্যন্ত পাঁচবার গনিয়া যায়, তারপর দুধ চিনি দেয়। আজ আর সে হইয়া উঠিল না, কেবলই কলিটা গুনগুন করিয়া ভাঁজিয়া মনে মনে দ্বিতীয় কলি খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরিল। অকস্মাৎ তাহার চায়ের কথা মনে হইতে সে দুধ চিনি দিয়া চা ছাঁকিয়া লইল। কলাইকরা লোহার মগে চা লইয়া বাকিটা রাজার জন্য ঢাকা দিয়া রাখিয়া সে আসিয়া বসিল কৃষ্ণচূড়া গাছটির তলায়। এটি তাহার বড় প্রিয় স্থান। ঘন কালো সরু সরু পাতায় ছাতার মত গাছটি; নিতাই বলে—'চিরোল-চিরোল পাতা'। তাহার উপর যখন চৈত্রের শেষ হইতে থোপা-থোপা লাল ফুলে ভরিয়া উঠে, তখন নিতাই প্রায় অহরহই গাছটির তলায় বসিয়া থাকে। ফুলের লোভে ছেলের দল আসে, নিতাই তাহাদিগকে ঝরা ফুল দিয়া বিদায় করে, গাছে চড়িয়া ফুল তুলিতে দেয় না।

স্টেশন হইতে রাজার হাঁক-ডাক আসিতেছে। এই ট্রেনটার সঙ্গে মালগাড়ী থাকে, এখানকার মাল থাকিলে গাড়ী কাটিয়া দিয়া যায়—সেই গাড়ী শান্টিং হইতেছে। নিতাইও আগে নিয়মিত অন্য কুলিদের সঙ্গে মালগাড়ী ঠেলিত। সহসা তাহার মনের গান চাপা দিয়া জাগিয়া উঠিল জীবিকার ভাবনা। কুলিগিরি সে আর করিবে না, সে কবিয়াল। কুলিগিরি না করিলে অন্ন জুটিবে কেমন করিয়া ?

এই ভাবনার মধ্যেই হঠাৎ চোখে পড়িল লঘু দ্রুত গমনে ঘন ঘন পা ফেলিয়া ধপধপে মোটা কাপড় পরা, হাল্কা কাশফুলের মত চলিয়াছে ঠাকুরঝি; মাথায় সোনার টোপরের মত ঝকঝকে পিতলের ঘটি। ঠাকুরঝির কথাও যেমন দ্রুত, চলেও সে তেমনি ক্ষিপ্র গতিতে। ঢ্যাঙা নয়, অথচ সরস কাঁচা বাঁশের পর্বের মত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিতে বেশ একটি চোখজুড়ানো লম্বা টান আছে। ওই দীঘল ভঙ্গিটি নিতাইয়ের সব চেয়ে ভাল লাগে। আর ভাল লাগে তাহার কালো কোমল শ্রী। যতবারই সে ঠাকুরঝিকে দেখে ততবারই এই কথাগুলি তাহার মনের মধ্যে সাড়া তোলে।

ঠাকুরঝি আজ অত্যন্ত দ্রুত চলিয়াছে। নিতাই মনে মনে একটু হাসিল—তাহাকে দেখিয়াই ঠাকুরঝি এমন হনহন করিয়া চলিয়াছে। শক্তি থাকিলে ঠাকুরঝি নিশ্চয় মাটি কাঁপাইয়া পথ চলিত। কিন্তু রাজনের এমন কড়া কথা বলা ভাল হয় নাই। আলকাতরার মত রঙ হইলেও ঠাকুরঝি তো মন্দ দেখতে নয়! মন্দ কেন, ভালই! কালো রঙে কি আসে যায়!

'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?'

নিতাই ডাকিল—ঠাকুরঝি! অ ঠাকুরঝি!

ঠাকুরঝি গ্রাহ্য করিল না, সে হনহন করিয়াই চলিয়াছে।

—আমার দিব্যি! নিতাই হাঁকিয়া বলিল।

ঠাকুরঝি থমকিয়া দাঁড়াইল।

মিঠা সরু আওয়াজে দ্রুতভঙ্গিতে মেয়েটি বলিল—না, আমার দেরি হয়ে যাবে।

—একটা কথা। শোন শোন।

—না। ওইখান থেকে বল তুমি।

—আমার দিব্যি।

অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ঠাকুরঝি এবার আগাইয়া আসিয়া নিতাইয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—তোমার দিব্যি যদি আমি না মানি?

—না মানলে মনে বেথা পাব, আর কি ঠাকুরঝি। নিতাই ছলনা করিয়া বলিল না, আন্তরিকতার সহিতই বলিল।

অপেক্ষাকৃত শান্ত সুরেই এবার মেয়েটি বলিল—লাও কি বলছ, বল!

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মিষ্ট হাসি হাসিয়া নিতাই বলিল—রাগ করেছ?

মুহূর্তে ঠাকুরঝির ভীরু চকিত দৃষ্টি ভরা চোখ দুইটি সজল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিল—কালো আছি, আমি আপনার ঘরে আছি। কেউ তো আমাকে খেতে পরতে দেয় না!

নিতাই হাসিয়া বলিল—আমি কিন্তু কালো ভালবাসি ঠাকুরঝি। ঠাকুরঝির মুখের কালো রঙে লাল আভা দেখা যায় না, তবু তাহার লজ্জার গাঢ়তা বোঝা যায়। নিতাই কিন্তু গ্রাহ্য করিল না, সে গালে হাত দিয়া মৃদু স্বরে গান ধরিয়া দিল—

কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে!

লজ্জিতা ঠাকুরঝি এবার সবিস্ময়ে শ্রদ্ধান্বিত দৃষ্টিতে নিতাইয়ের দিকে চাহিল, বলিল—লতুন গান? বলিয়া সে সঙ্গে সঙ্গেই বলিল—কাল তুমি বাপু ভারি গান করেছ।

—ভাল লেগেছে তোমার?

—খুব ভাল।

—এস, এস, একটুকুন চা আছে—খাবে এস।

—না না। ঠাকুরঝির চা খাইতে বেশ ভালই লাগে, কিন্তু মেয়েদের ভাল লাগার কথা নাকি বলিতেই নাই। ছি!

নিতাই আবার দিব্যি দিল—আমার দিব্যি। নিতাই বাসার দিকে ফিরিল। রাজনের জন্য যে চাটুকু ছাঁকিয়া রাখিয়াছিল, সেটা উনানের উপরে বসানোই ছিল, সেটা দুইটা পাত্রে ঢালিয়া একটা ঠাকুরঝিকে আগাইয়া দিল। মেয়েটি আবার সলজ্জ ভাবে বলিল—না, না, তুমি খাও।

—না, তা হবে না। তাহলে বুঝব, তুমি এখনও কোধ করে আছ।

বাটিটা টানিয়া লইয়া সকৌতুক বিস্ময়ে ঠাকুরঝি বলিল—কোধ কি গো ? কোধ ?

—রাগ। 'কোধ' মানে হ'ল গিয়ে তোমার রাগ! কয়ে রফলা 'ও'কার ধ, কোধ! 'হিংসা কোধ অতি মন্দ কভু নহে ভাল'। বুঝলে ঠাকুরঝি, এই কারুর হিংসে করো না, আর কোধ করো না। কোধের নাম হ'ল চণ্ডাল।

গভীর বিস্ময়ে মেয়েটি নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—আচ্ছা, তুমি এত সব কি ক'রে শিখলে ?

গম্ভীরভাবে নিতাই উপরের দিকে চাহিয়া পরম-তত্ত্বজ্ঞের মতই বলিল—ভগবানের ছলনা ঠাকুরঝি! নইলে কবিয়াল ক'রেও তিনি আমাকে 'ডোম'-কুলে পাঠালেন কেনে, বল ?

নীরব বিস্ময়ে মূর্তিমতী শ্রদ্ধার মত মেয়েটি কবিয়ালের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার চোখের উপর ভাসিতেছিল—শত শত লোকের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে এই লোকটি মুখে মুখে ছড়া বাঁধিয়া গান গাহিতেছে!

অকস্মাৎ একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিতাই বলিল—সবই তাঁর লীলা। না হলে আমাকে ঠাট্টা ক'রে কপিবর, মানে হনুমান বলে!

চকিত উত্তেজনায় ঠাকুরঝির ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, সে প্রশ্ন করিল—কে ? কে বটে, কে ?

আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিতাই বলিল—সে আর শুনে কি করবে বল ? লাও, চা খাও। জুড়িয়ে গেল।

ঠাকুরঝি এবার পিছন ফিরিয়া বসিল, জামাই বা নিতাইয়ের দিকে মুখ রাখিয়া সে কখনও কিছু খায় না। পিছন ফিরিয়া বসিয়া চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়া সে বলিল—না, বলতে হবে তোমাকে। কে বটে, কে সে ? জামাই বুঝি ? জামাই অর্থে রাজন।

—না না, ঠাকুরঝি, রাজন আমার পরম বন্ধু, বড় ভাল নোক।

—হ্যাঁ, ভাল নোক না ছাই। যে কট্‌কটে কথা!

—না, না। আজ তোমাকে ওটা পরিহাস ক'রে বলেছে। তুমি শালী, পরিহাসের সম্বন্ধ।

—পরিহাস কি গো ?

—ঠাট্টা ঠাট্টা। তোমার সঙ্গে তো ঠাট্টার সম্বন্ধ।

ঠাকুরঝি চুপ করিয়া রহিল, নিতাইয়ের কথাটা সে মনে মনে স্বীকার করিয়া লইতেছিল। ঠাকুরঝির কোমল কালো আকৃতির সঙ্গে তাহার প্রকৃতির একটি ঘনিষ্ঠ মিল আছে, সঙ্গীত ও সঙ্গতের মত। কয়েক মুহূর্ত পরেই সে বলিল—তা বটে। জামাই আমাদের রাগীদার হোক, নোক ভাল।

—ভারি ভাল নোক।

—কিন্তু তোমাকে উ কথা কে বললে, বলতে হবে! সে মুখপোড়া কে বটে, কে ?

—গাল দিয়ো না ঠাকুরঝি, জাতে ব্রাহ্মণ। ওই যে বণিক মাতুলের দোকানে 'বক্র' মুনির মত বসে থাকে আর ফরফর করে বকে ? ওই বিপ্রপদ ঠাকুর।

—কেন উ কথা বলবে ?

—ছেড়ে দাও কথা। জাতে ব্রাহ্মণ, আমি ছোট জাত—তা বলে বলুক।

—আঃ ভারি আমার বাম্ভন। কই, এমনি মুখে মুখে বেঁধে গান করুক দেখি, একবার দেখি! উত্তেজনায় ঠাকুরঝির মাথার কাপড় খসিয়া গেল।

নিতাই মুগ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বা-বা-বা! ভারি মানিয়েছে তো ঠাকুরঝি!

ঠাকুরঝির রুক্ষ কালো চুলের এলো খোঁপায় এক থোকা টকটকে রাঙা কৃষ্ণচূড়া ফুল। লজ্জায় মেয়েটি সচকিতা হরিণীর মত তাহার খসিয়া-পড়া ঘোমটাখানি ক্ষিপ্র হস্তে, দ্রুত ভঙ্গিতে মাথায় তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু নিতাই একটা কাণ্ড করিয়া বসিল, সে খপ করিয়া হাতখানি ধরিয়া বাধা দিয়া বলিল—দেখি! দেখি! বা-বা-বা!

মেয়েটি লজ্জায় অধোমুখ ও কাঁদো কাঁদো হইয়া গেল, বলিল—ছাড়ো। ছাড়ো।

মুহূর্তে নিতাইয়ের কাণ্ডজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, সে তাহাকে ছাড়িয়া দিল। ছাড়া পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি চায়ের বাটিটা হাতে নতমুখে ছুটিয়া পলাইয়া গেল—বাটিটা ধুইবার অজুহাতে। নিতাই লজ্জিত স্তব্ধ হইয়া নতমুখে বসিয়া রহিল। ছি! ছি! ছি! এ কি করিল সে?

চুপ করিয়াই সে বসিয়াছিল, হঠাৎ ঠুং শব্দে সে মুখ তুলিয়া দেখিল—ঠাকুরঝি বাটিটা নামাইয়া দিয়া আপনার ঘটীটি তুলিয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছে। সে মুখ ফিরাইয়া চাহিল। সলজ্জ হাসিতে ঠাকুরঝির কাঁচা মুখখানি রৌদ্রের ছটায় কচি পাতার মত ঝলমলে হইয়া উঠিয়াছে। চোখোচোখি হইতেই ঠাকুরঝি হাসিয়া চট্ করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল, সেই বেগে তাহার আবার মাথার ঘোমটা খসিয়া গেল। ঠাকুরঝি এবার ছুটিয়া পলাইয়া গেল, ঘোমটা তুলিয়া না দিয়াই;—তাহার রুক্ষ কালো চুলে লাল কৃষ্ণচূড়া পরিপূর্ণ গৌরবে আকাশের তারার মত জ্বলিতেছে!

নাঃ, ঠাকুরঝি রাগ করে নাই। ওই যে, যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া চাহিয়া হাসিতেছে। কিন্তু কালো চুলে রাঙা কৃষ্ণচূড়া বড় চমৎকার মানাইয়াছে।

ঠাকুরঝি ক্রমে ক্রমে স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুলের মত ছোট হইয়া পথের বাঁকে মিলাইয়া গেল। নিতাই বসিয়া আপন মনেই ঘাড় নাড়িতে আরম্ভ করিল। দ্বিতীয় কলিটাও তাহার মনে আসিয়াছে।

"কালো কেশে রাঙা কুসুম হেরেছ কি নয়নে?"

সাত

কালো কেশে রাঙা কুসুমের শোভা দেখিয়া গান রচনা করিয়া কবি হওয়া চলে, কিন্তু ও শোভা দেখিতে দেখিতে পথ চলা চলে না। নিতাই সত্য সত্যই একটা হুঁচোট খাইল—বিষম হুঁচোট। পায়ের বুড়ো আঙুলের নখটার চারিপাশ ফাটিয়া রক্ত বাহির হইয়া পড়িল। সে ওই গানখানা ভাঁজিতে ভাঁজিতে চণ্ডীতলায় চলিয়াছিল। নির্জন পথ—বাঁ হাতখানি গালের উপর রাখিয়া নিতাই বেশ উচ্চ কণ্ঠেই গান ধরিয়া চলিয়াছিল—মধ্যে মধ্যে ডান হাতের তর্জনী নির্দেশ করিয়া যেন 'কালো চুলে রাঙা কুসুমের' শোভাটি কাহাকেও দেখাইয়া দিতেছিল; যেন দ্রুতপদে ঠাকুরঝি তাহার আগে আগেই চলিয়াছে এবং তাহার রুক্ষ কালো চুলে রাঙা কৃষ্ণচূড়ার গুচ্ছটি ঝলমল করিতেছে।

হঠাৎ আঙুলে হুঁচোট খাইয়া বেচারী বসিয়া পড়িল। দুর্বল শরীরে চোট খাইয়া মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। এ কয়দিন নিতাই এখন একবেলা খাইতেছে। উপার্জন নাই, পূর্বের সঞ্চয় যাহা আছে, সে অতি সামান্য; সে সঞ্চয় আবার দোকানে লাগাইতে হইবে। সেই জন্য নিতাই

একবেলা খাওয়া বন্ধ করিয়াছে ; একেবারে অপরাহ্ণ বেলায় সে এখন কোনদিন রাঁধে পায়েস, কোনদিন খিচুড়ি। কথাটা সে রাজাকেও বলে নাই, ঠাকুরঝিকেও না। তাহারা জানিলে বিষম আপত্তি তুলিবে। রাজা হয়ত পাঁচ-সাত টাকা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিবে—চালাও পানসী—বানাও খানা—ফিন্ দরকার হোনেসে দেগা।

রাজার মত বন্ধু আর হয় না। এদিকে রাজা সত্য-সত্যই রাজা। বিপ্রপদ যে-সব নাম তাহাকে দিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি এখন নিতাইকে পীড়া দেয়, কেবল একটি ছাড়া—সে নামটি হইল সভাকবি, রাজার সভাকবি। রাজার কাছে কোন লজ্জাই তাহার নাই ; কিন্তু রাজার স্ত্রী রাণী নয়, সে রাক্ষসী। বাপ রে! মেয়েটার জিভে কি বিষ! সর্বাঙ্গে যেন জ্বালা ধরাইয়া দেয়। মিলিটারী রাজা কঞ্চির আঘাতে মেয়েটার পিঠখানা ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দেয়—তবু তাহার জিভ বিষ ছড়াইতে ছাড়ে না ; সে পড়িয়া পড়িয়া কাঁদে আর অবিরাম গাল দিয়া চলে। মর্মচ্ছেদী জ্বালা-ধরানো নিষ্ঠুর গালিগালাজ। পৃথিবীর উপরেই তাহার আক্রোশ, মধ্যে মধ্যে ট্রেনকেও সে অভিসম্পাত দেয়। ট্রেনের সময় রাজা ডিউটি দিতে গেলে যদি তাহার রাজাকে প্রয়োজন হয়, তবে সে স্টেশন-মাস্টার হইতে গার্ড, ট্রেন, সকলকে গালি-গালাজ দিতে আরম্ভ করে। সেই গালি-গালাজগুলি স্মরণ করিয়া নিতাই দুঃখের মধ্যেও হাসিয়া ফেলিল। রাজার বউয়ের গালি-গালাজের বাঁধুনী বড় চমৎকার, কবিয়ালেরাও এমন চমৎকার বাঁধুনী বাঁধিয়া গালি-গালাজ দিতে পারে না। কালই ট্রেনখানাকে অভিসম্পাত দিতেছিল—"পুল ভেঙে প'ড়ে যমের বাড়ী যাও ; যে আগুনের আঁচে 'হাঁকিড়ে' 'হাঁকিড়ে' চলছ—সেই আগুনের তাতে অঙ্গ তোমার গ'লে গ'লে পড়ুক! যে চাকায় গড়গড়িয়ে চলো সেই চাকা মড়মড়িয়ে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাক—যে চোঙার গলায় চিলের মত চেঁচাও সেই গলা চিরে চৌচির হোক। তুমি উল্‌টিয়ে পড়, পাল্‌টিয়ে পড় ; নরকে যাও।" বলিহারি বলিহারি! মহাদেবের আঁস্তাকুড়ের এঁটো পাতা কোথায় লাগে ইহার কাছে!

রাজা অবসর পাইলেই নিতাইয়ের কাছে আসিয়া বসে, তাই তাহার আক্রোশ নিতাইয়ের উপর কিছু বেশী। রাজার অনুপস্থিতিতে নিতাইকে শুনাইয়া কোন অনামা ব্যক্তিকে গালি-গালাজ করে। সে হাসে। রাজার আর্থিক সাহায্য আর কিছুতেই লওয়া চলিবে না। রাজা দিতেও ছাড়িবে না, গোপনও করিবে না এবং রাণী জানিতে পারিবেই। সে জানিতে পারিলে আর রক্ষা থাকিবে না। কালই একটা কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে, ঠাকুরঝির চা খাওয়া রাণী দেখিয়াছে। চা খাইতে খাইতে নিতাইয়ের রসিকতায় ঠাকুরঝি খিলখিল করিয়া হাসিতেছিল। রাজার বউ বোধ হয় কোথাও যাইতেছিল, হাসির শব্দে সে উঁকি মারিয়া দুইজনকে একসঙ্গে দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গেই মুখ সরাইয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছিল। ঠাকুরঝি বেচারী মুহূর্তে যেন শুকাইয়া উঠিয়াছিল, তাহার সঙ্গে নিতাইও। পরমুহূর্তেই বাড়ীর বাহিরে রাজার স্ত্রীর শ্লেষতীক্ষ্ণ কণ্ঠ বাজিয়া উঠিয়াছিল—

"হাসিস্ না লো কালামুখী—আর হাসিস্ না,
লাজে মরি গলায় দড়ি—লাজ বাসিস্ না?"

ঠাকুরঝির আর চা খাওয়া হয় নাই, চা জুড়াইয়া গিয়াছিল, জুড়ানো চা রাখিয়া সে এক ঘটি ঠাণ্ডা জল খাইয়া তবে বাড়ী ফিরিয়াছিল।

হুঁচোটের ধাক্কাটা সামলাইয়া নিতাই কোনমতে চণ্ডীতলায় আসিয়া উঠিল। চণ্ডীমাকে প্রণাম করিয়া সে মোহন্তের সম্মুখে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল।

মোহন্ত সস্নেহেই বলিলেন—এস, কবিয়াল নিতাইচরণ এস।

নিতাই কৃতার্থ হইয়া গেল। সে মোহন্তকে প্রণাম করিল।

—জয়োস্তু! তারপর, সংবাদ কি?

—আজ্ঞে প্রভু, আমাকে মেডেল দোব বলেছিলেন!

—মেডেল!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আচ্ছা, সে হবে। পাবে। মোহন্ত অকস্মাৎ উদাসীন হইয়া উঠিলেন। সহসা চণ্ডীদেবতার মহিমা উপলব্ধি করিয়া গম্ভীর স্বরে ডাকিয়া উঠিলেন—কালী কৈবল্যদায়িনী মা!

নিতাই চুপ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। এমন ভাবাবেশের মধ্যে মোহন্তকে আর বিরক্ত করিতে সাহস করিল না। কিছুক্ষণ পর ওদিকে চণ্ডীর দাওয়ার উপর একটা শব্দ উঠিল—ঠং।

মোহন্ত মুহূর্তে উঠিয়া পড়িলেন। ওদিকে চণ্ডীমায়ের মন্দিরে যাত্রী আসিয়াছে, বোধ হয় একটা প্রণামী ছুঁড়িয়াছে।

মোহন্ত ফিরিয়া আসিতেই নিতাই সুযোগ পাইয়া আবার হাত জোড় করিয়া বলিল—বাবা!

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মোহন্ত বলিলেন—বলেছি তো, পরে হবে। আসছে বার মেলার সময়, সমস্ত লোকের সামনে মেডেল দেওয়া হবে।

নিতাই অত্যন্ত বিনয় করিয়া বলিল—আজ্ঞে, বিদায় কিছু দেবেন না?

—বিদায়! টাকা?

—আজ্ঞে।

মোহন্ত সকৌতুকে কিছুক্ষণ নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন, সে দৃষ্টির সম্মুখে নিতাইয়ের অস্বস্তির আর সীমা রহিল না। অকস্মাৎ মোহন্ত কথা বলিলেন—ভালা রে ময়না; ভাল বুলি শিখেছিস তো! টাকা! মায়ের স্থানে টাকা! গান গাইতে পেয়েছিস সেইটে ভাগ্যি মানিস না!

মোহন্তের কথার সুরে যেন চাবুকের জ্বালা ছিল; সে জ্বালায় নিতাই চমকিয়া উঠিল। লজ্জার আর সীমা রহিল না তাহার। সত্যই তো—গান গাহিতে পাইয়া সে-ই তো ধন্য হইয়া গিয়াছে। আবার টাকা চায় কোন্ মুখে!

ইহার পর কোন কথা না বলিয়া সে একরকম ছুটিয়া পলাইয়া আসিল। ফিরিবার পথে কিন্তু অকস্মাৎ তাহার চোখে জল আসিল; অকস্মাৎ মহাদেব কবিয়ালের ছড়াটা মনে পড়িয়া গেল—সেদিন গানের আসরে মহাদেব বলিয়াছিল, 'আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা স্বগ্‌গে যাবার আশা গো!' ঠিক কথা, মহাদেব কবিয়াল,—আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা স্বর্গে যায় না, যাইতে পারে না। কবিয়াল মহাদেব হাজার হইলেও গুণী লোক, সে ঠিক কথাই বলিয়াছে। তাহার কবি হওয়ার আশা আর আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতার স্বর্গে যাইবার আশা—এ দুই-ই সমান।

আপন মনেই সে বেশ পরিস্ফুট কণ্ঠে যেন নিজেকে শুনাইয়াই বলিয়া উঠিল—দূ-রো! অর্থাৎ নিজের কবিয়ালত্বকেই দূর করিয়া দিতে চাহিল। এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঠিক করিল আবার এই বারোটার ট্রেন হইতেই সে 'মোটবহন' আরম্ভ করিবে।

বিপ্রপদ ঠাট্টা করিবে, তা করুক। কবিয়াল হইয়া তাহার কাজ নাই। সে মনকে

বেশ খোলসা করিয়াই সকৌতুকে গান ধরিল, মহাদেবের সেই গানটি—

আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা—স্বগ্‌গে যাবার আশা গো!
ফরাৎ ক'রে উড়ল পাতা—স্বগ্‌গে যাবার আশা গো!
হায়রে কলি—কিই বা বলি—গরুড় হবেন মশা গো।

খানিকটা আসিয়াই তাহার কানে একটা শব্দ আসিয়া ঢুকিল। ট্রেন আসিতেছে না? হ্যাঁ! ট্রেনই তো! সঙ্গে সঙ্গে চলার গতি সে দ্রুততর করিল। রাজা এতক্ষণে স্টেশনে গিয়া হাজির হইয়াছে। সিগন্যাল ফেলিবে, ট্রেনের ঘণ্টা দিবে। ঠাকুরঝি বোধ হয় তালাবদ্ধ ঘরের সম্মুখে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সে তো আজ কিছুতেই রাজার বাড়ী যাইবে না। কাল ছড়ার মধ্যে যে কুৎসিত ইঙ্গিত রাজার স্ত্রী করিয়াছে! সে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে যখন স্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল, ট্রেনখানা তখন বিসর্পিল গতিতে সবে স্টেশন হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। নিতাই হতাশ হইয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া দাঁড়াইয়া গেল। রোজগার ফসকাইয়া গেল, ঠাকুরঝি চলিয়া গিয়াছে।

হঠাৎ কানে আসিল কে তাহাকে ডাকিতেছে—নিতাই!

স্টেশনের স্টলে দাঁড়াইয়া বণিক মাতুল তাহাকে দেখিয়া উৎসুক হইয়া ডাকিতেছে—নিতাই, নিতাই!

বাতে আড়ষ্ট বিপ্রপদ বহুকষ্টে দেহসমেত ঘাড়খানা ঘুরাইয়া হাসিতেছে,—সেও ডাকিল,—কপিবর, কপিবর!

নিতাই অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। একটা কঠিন উত্তর দিবার জন্যই সে স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। বণিক মাতুল কিন্তু বেশ খানিকটা খুশী সুরেই বলিল—নাঃ, সত্যিকারের গুণীন বটে আমাদের নিতাই। ওরে তোর কাছে যে লোক পাঠিয়েছে মহাদেব কবিয়াল। বায়না আছে কোথায়। গাওনা করতে হবে।

অপ্রত্যাশিত সংবাদে নিতাই হতবাক হইয়া গেল।

মহাদেব কবিয়াল তাহার কাছে লোক পাঠাইয়াছে! বায়না আছে! অকস্মাৎ তাহার সে বিস্ময়-বিমূঢ়তা কাটিল রাজনের চাৎকারে। উচ্ছ্বসিত আনন্দে রাজন প্রায় গগনস্পর্শী চীৎকার করিয়া ডাকিতেছে—ওস্তা—দ! ওস্তা—দ!

রাজনের সঙ্গে একজন লোক। মহাদেবের দোয়ারের দলের একজন দোয়ার। এই মেলার আসরেই সে গান করিয়া গিয়াছে। নিতাই তাহাকে চিনিল।

—বায়না, ওস্তাদ, বায়না আয়া হ্যায়! রাজা আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

লোকটি নিতাইকে নমস্কার করিয়া বলিল—ভাল আছেন?

এতক্ষণে নিতাই প্রতিনমস্কার করিয়া মৃদুস্বরে বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাদের কুশল? ওস্তাদ ভাল আছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনিই পাঠালেন আপনার কাছে। একটা বায়না ধরেছেন ওস্তাদ, আপনাকে দলে দোয়ারকি করতে হবে। মহাদেব কবিয়ালের শরীর ভাল নাই। গলা বসেছে। আপনার ভাল গলা। ওস্তাদ আপনাকে দিয়ে গাওয়াবে। আপনি নিজেও গাইবেন—এই আর কি!

রাজা বলিল—জরুর, জরুর, আলবৎ, আলবৎ যায়েগা! চলিয়ে তো বাসামে, বাতচিৎ হোগা, চা খায়েগা।

নিতাই রাজার কথাকেই অনুসরণ করিল, আজ তাহার সব গোলমাল হইয়া যাইতেছে।

মহাদেব কবিয়াল তাহার কাছে লোক পাঠাইয়াছে—বায়না আছে! সেও বলিল—হ্যাঁ—হ্যাঁ—নিশ্চয় যাব, নিশ্চয়। আসুন, বাসায় চা খেতে খেতে কথা হবে।

বাসার দুয়ারে আসিয়া নিতাই আশ্চর্য হইয়া গেল, একটি ঝোপের আড়ালে—কৃষ্ণচূড়া গাছটির ছায়াতলে, ও কে বসিয়া?

ঠাকুরঝি!

উৎসুক উচ্ছ্বসিত দৃষ্টিতে ফিরিয়া চাহিয়াই ঠাকুরঝি লজ্জায় যেন কেমন হইয়া গেল। কিন্তু পরমুহূর্তেই সে আত্মসম্বরণ করিয়া বেশ ধীর ভাবেই বলিল—কোথা গিয়েছিলে বাপু, আমি দুধ নিয়ে ব'সে আছি সেই থেকে!

নিতাই বলিল—কাল একটুকু সকাল ক'রে দুধ এনো বাপু! কাল বারোটায় আমি কবি গাইতে যাব। তার আগেই যেন—

রাজা কথাটা সংক্ষিপ্ত করিয়া দিল—হাঁ, হাঁ, ঠিক আয়েগি; ঘড়িকে কাঁটাকে মাফিক আতি হায় হাম্যারা ঠাকুরঝি। আজ রাজাও ঠাকুরঝির উপর খুশী হইয়া উঠিয়াছে। ঠাকুরঝির মুখখানিও সেই খুশীর প্রতিচ্ছটায় মুহূর্তে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। ঠাকুরঝি যেন কাজল দীঘির জল! ছটা ছড়াইয়া পড়িলে সঙ্গে সঙ্গে ঝিকমিক করিয়া উঠে; আবার মেঘ উঠিলে আঁধার হয়—কে যেন কালি গুলিয়া দেয়!

ঠাকুরঝি সেই খুশীর ছটামাখা মুখে নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিল—তুমি কবিগান গাইতে যাবে কবিয়াল? বায়না এসেছে?

কথাটা ঠাকুরঝিও শুনিয়াছে।

নিতাই ফিরিল পাঁচদিন পর। ট্রেন হইতে যখন সে নামিল, তখন তাহার ভোল পালটাইয়া গিয়াছে। তাহার পায়ে সাদা ক্যাম্বিশের একজোড়া নূতন জুতা, ময়লা কাপড়জামার উপর ধপধপে সাদা নূতন একখানা উড়ানি চাদর। মুখে মৃদুমন্দ হাসি—কিন্তু বিনয়ে অত্যন্ত মোলায়েম। ট্রেনে সারা পথটা সে কল্পনা করিতে করিতে আসিতেছে, স্টেশনমাস্টার হইতে সকলেই তাহাকে দেখিয়া নিশ্চয় বিস্মিত শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্ভাষণ করিয়া উঠিবে।

—এই যে নিতাই! আরে বাপ রে, চাদর জুতো! এই যে, বাপ রে তোকে চেনাই যায় না রে!

উত্তর নিতাই ঠিক করিয়াই রাখিয়াছিল।

—আজ্ঞে, চাদরখানা বাবুরা শিরোপা দিলেন। আর জুতো জোড়াটা কিনলাম।

শিরোপার কথাটা অবশ্য মিথ্যা; জুতা-চাদর দুইই নিতাই নগদমূল্যে খরিদ করিয়াছে! গেরুয়া না পরিলে সন্ন্যাসী বলিয়া কেহ স্বীকার করে না, 'ভেক নহিলে ভিখ মিলে না'; চাদর না হইলে কবিয়ালকে মানায় না। নগ্নপদ জনের পদবী মানুষ সহজে স্বীকার করিতে চায় না। তাই নিতাই পাদুকা ও চাদর কিনিয়াছে। স্টেশনে নামিয়া প্রত্যাশাভরে মুখ ভরিয়া বিনীত অথচ আত্মপ্রসাদপূর্ণ হাসি হাসিয়া সে সকলের মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়াও কেহ যেন তাহাকে দেখিল না; সম্ভাষণ দূরের কথা, কেহ একটা প্রশ্নও করিল না। যে প্রশ্ন করিবার একমাত্র মানুষ, সে তখন ইঞ্জিনের কাছে কর্তব্যে ব্যস্ত ছিল। মালগাড়ী শান্টিং হইবে। গাড়ী কাটিয়া রাজা ইঞ্জিনে চড়িয়া হাঁক মারিতেছিল—এই! হট যাও, এই—এই বুড়বক! হটো—হটো!

নিতাইয়ের মনটা উদাস হইয়া গেল। মানুষ বৈরাগ্যভরে যেমন জনতাকে জনবসতিকে

পাশ কাটাইয়া পথ ছাড়িয়া আপথে সকলের অলক্ষিতে অগোচরে চলিয়া যায়, তেমনি ভাবেই সে স্টেশনের মেহেদীর বেড়ার পাশের অপরিছন্ন স্থানটা দিয়া স্টেশন অতিক্রম করিয়া আসিয়া উঠিল আপনার বাসার দুয়ারে। মনটা তাহার মুহূর্তে উদাস হইয়া গিয়াছে; শুধু মনই নয়, সারা দেহেই সে যেন গভীর অবসন্নতা অনুভব করিতেছে।

হঠাৎ কানে ঢুকিল—গুন্ গুন্ সুর।

"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?"—গুনগুন করিয়া অতি মৃদুস্বরে কে গান গাহিতেছে! ওই ঝোপটার আড়ালে; কৃষ্ণচূড়াগাছটির তলায়। মুহূর্তে ভাটার নদীতে যেন ষাঁড়াষাঁড়ির বান ডাকিয়া গেল। ঠাকুরঝি! তাহারই বাঁধা গান গাহিতেছে ঠাকুরঝি। রবার-সোল ক্যাম্বিশের জুতা পায়ে নিঃশব্দে নিতাই আসিয়া তাহার পিছনে দাঁড়াইল এবং অপরূপ মৃদুস্বরে গাহিল,

'কালো কেশে রাঙা কুসুম হেরেছ কি নয়নে?"

ঠাকুরঝি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল সচকিত বন্য কুরঙ্গীর মত।—বাবা রে! কে গো?

পরমুহূর্তেই সে বিস্ময়ে নির্বাক হইয়া গেল—কবিয়াল!

নিতাইয়ের মুখ ভরিয়া আবার হাসি ফুটিয়া উঠিল, পরম স্নেহভরে সে ভক্ত অনুরাগিণীটিকে বলিল—এস, চা খেতে হবে একটু!

ঘরে আসিয়া নিতাই চাদরখানি গলা হইতে খুলিয়া রাখিতে গেল। কিন্তু বাধা দিয়া ঠাকুরঝি বলিল—খুলো না, খুলো না; দাঁড়াও দেখি ভাল ক'রে!

ভাল করিয়া দেখিয়া ঠাকুরঝি বলিল—আচ্ছা সাজ হইছে বাপু। ঠিক কবিয়াল কবিয়াল লাগছে। ভারি সোন্দর দেখাইছে।

নিতাই বলিল—বাবুরা শিরোপা দিলে চাদরখানা।

—ম্যাডেল? ম্যাডেল দেয় নাই?

—সে আসছে বার দেবে। মেডেল কি দোকানে তৈরী থাকে ঠাকুরঝি!

—তা চাদরখানাও আচ্ছা হইছে। তুমি বুঝি খুব ভাল গায়েন করেছ, লয়?

হাস্যোদ্ভাসিত মুখে কহিল—খুব ভাল। 'কালো যদি মন্দ তবে' গানখানাও গেয়ে দিয়েছি।

সঙ্গে সঙ্গে কালো মেয়েটির মুখখানিও কেমন হইয়া গেল; চোখের পাতা দুইটা নামিয়া আসিল। সে দুইটা যেন অসম্ভব বকমের ভারী হইয়া উঠিয়াছে। নত চোখে সে বলিল—না বাপু; ছি! কি ধারার নোক তুমি?

নিতাই হাসিয়া বলিল—দাঁড়াও, দাঁড়াও, ভুলেই গিয়েছিলাম একেবারে।

—কি?

—চোখ বোজ দেখি। তা নইলে হবে না।

—কেন?

—আঃ, বোজই না কেনে চোখ। তারপর চোখ খুললেই দেখতে পাবে।

ঠাকুরঝি চোখ বন্ধ করিল; কিন্তু তবু সে তাহারই মধ্যে মিটিমিটি চাহিয়া দেখিতেছিল। নিতাই পকেটে হাত পুরিয়াছে।

—উ কি, তুমি দেখছ! নিতাই ঠাকুরঝির চাতুরী ধরিয়া ফেলিল। বোজ, খুব শক্ত করে চোখ বোজ।

পরিক্ষণেই ঠাকুরঝি অনুভব করিল তাহার গলায় কি যেন ঝুপ করিয়া পড়িল। কি? চকিতে চোখ খুলিয়া ঠাকুরঝি দেখিল, সূতার মত মিহি, সোনার মত ঝকঝকে একগাছি সূতা-হার তাহার গলায় তখনও মৃদু মৃদু দুলিতেছে।

ঠাকুরঝি বিস্ময়ে আনন্দে যেন বিবশ ও নির্বাক হইয়া গেল।

—সোনার?

—না, সোনার নয়, কেমিকেলের। সোনার আমি কোথায় পাব বল? আমি গরীব।

ঠাকুরঝির অন্তর তারস্বরে বলিয়া উঠিল—তা হোক, তা হোক, এ সোনার চেয়েও অনেক দামী। হারখানির ছোঁয়ায় বুকের ভিতরটা তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, বসন্তদিনে দুপুরের বাতাসে অশ্বত্থগাছের নূতন কচি পাতার মত।

—ওস্তাদ! ওস্তাদ!

রাজা আসিতেছে; ট্রেনখানা চলিয়া গিয়াছে, ডিউটি সারিয়া রাজা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম হইতে হাঁকিতে হাঁকিতে আসিতেছে।

ঠাকুরঝি চমকিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে নিতাইও চকিত হইয়া উঠিল। মুহূর্তে ঠাকুরঝি গলার সূতা-হারখানি খুলিয়া ফেলিল। শঙ্কিত চাপা গলায় বলিল—জামাই আসছে।

নিতাইও যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল—তা হ'লে?

পরমুহূর্তেই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, তখনও তাহার গলায় চাদর, পায়ে জুতা। খানিকটা আগাইয়া গিয়াই সে সবিনয়ে রাজাকে নমস্কার করিয়া বলিল—রাজন, আপনার শরীর কুশল তো?

রাজার চোখ বিস্ময়ে আনন্দে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল—আরে, বাপ রে, বাপ রে! গলামে চাদর—

বাধা দিয়া নিতাই বলিল—শিরোপা।

—শিরোপা!

—হাঁ। বাবুরা গান শুনে খুশী হয়ে দিলেন।

—হাঁ?

—হাঁ।

—আরে, বাপ রে, বাপ রে! রাজা নিতাইকে বুকে জড়াইয়া ধরিল, তারপর বলিল—আও ভাই কবিয়াল, আও।

—কোথায়?

—আরে, আও না। সে তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া গেল বণিক মাতুলের চায়ের দোকানে।

—মামা! বনাও চা। লে আও মিঠাই।

বেনে মামাও অবাক হইয়া গেল নিতাইয়ের পোশাক দেখিয়া। বাতে-পঙ্গু বিপ্রপদ অন্য-দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল,—আড়ষ্ট দেহখানাকে টানিয়া সে ফিরিয়া চাহিয়া নিতাইকে দেখিল, তাহারও চোখে রাজ্যের বিস্ময় জমিয়া উঠিয়াছে।

নিতাই সবিনয়ে বিপ্রপদর পদধূলি লইয়া আজ কতদিন পরে সুপ করিয়া টানিয়া লইল। তারপরে সবিনয়ে হাসিয়া বলিল—চাদরখানা বাবুরা শিরোপা দিলেন প্রভু।

বেনে মামা বলিল—আমাদিগে কিন্তু সন্দেশ খাওয়াতে হবে নিতাই।

—নিশ্চয়। খাও না মাতুল, সন্দেশ তো তোমার দোকানেই। দাম দেব।

—নেহি, হামু দেঙ্গে দাম। বানাও ঠোঙ্গা। কাঠের একটা প্যাকিং-বাক্স টানিয়া রাজা চাপিয়া বসিল, নিতাইয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া পাশের জায়গায় বসাইয়া দিয়া বলিল—বইঠ্ যাও।

এতক্ষণে বিপ্রপদ কথা বলিল, সে আজ আর রসিকতা করিল না, ঠাট্টাও করিল না, সপ্রশংস এবং সহৃদয় ভাবেই বলিল—তারপর গাওনা কি রকম হ'ল বল দেখি নিতাই ?

নিতাই উৎসাহিত হইয়া উঠিল; বিপ্রপদকে আজ জয় করিয়াছে। ইহার অপেক্ষা বড় কিছু সে কল্পনা বা কামনা করিতে পারে না। সে আবার একবার বিপ্রপদর পদধূলি লইয়া জোড়হাত করিয়া বলিল—আজ্ঞে প্রভু, গাওনা আপনার চরম। দু'দিকেই দুই বাঘা কবিয়াল—এ বলে আমাকে দেখ ও বলে আমাকে দেখ; একদিকে ছিষ্টিধর, অন্যদিকে মহাদেব। লোকে লোকারণ্যি। আর মেলাও তেমনি।

বেঁনে মামা ঠোঙায় মিষ্টি ভরিয়া হাতে হাতে দিয়া বলিল—খেতে খেতে গল্প হোক। খেতে খেতে! সকলকে ঠোঙা দিয়া সে নিতাইয়ের ঠোঙাটি অগ্রসর করিয়া ধরিল। কিন্তু নিতাইয়ের অবসর নাই—কথার সঙ্গে তাহার হাত দুইটিও নানা ভঙ্গিতে নড়িতেছে।

বিপ্রপদও এতক্ষণে ধীরে ধীরে সহজ হইয়া উঠিয়াছে, সে চট করিয়া বেনে মামার হাত হইতে ঠোঙাটি লইয়া ধমক দিয়া উঠিল—ভাগ বেটা বেরসিক কাঁহাকা! কবিরা সন্দেশ খায় কোন্ কালে ? কবিরা চাঁদের আলো খায়, ফুলের মধু খায়, কোকিলের গান খায়। তারপর নিতাইকে সম্বোধন করিয়া বলিল—হ্যাঁ, তারপর নিতাইচরণ ? একদিকে ছিষ্টিধর, একদিকে মহাদেব। লোকে লোকারণ্যি! তারপর ? বলিয়া সে দুইহাতে ঠোঙা ধরিয়া মিষ্টি খাইতে আরম্ভ করিল।

নিতাইয়ের উৎসাহ কিন্তু উহাতে দমিত হইল না। সে সমান উৎসাহেই বলিয়া গেল—একদিন, বুঝলে প্রভু, মহাদেবের নেশাটা খানিকটা বেশী হয়ে গিয়েছিল। সেদিন—মহাদেব হয়েছে কেষ্ট, ছিষ্টিধর রাধা। ছিষ্টিধর তো ধুয়ো ধরলে—"কালো টিকেয় আগুন লেগেছে—তোরা দেখে যা গো সাধের কালাচাঁদ।" গালাগালির চরম করে গেল। ওদিকে মহাদেব তখন বমি করছে। দোয়াররা সব মাথায় জল ঢালছে। আমি সেই ফাঁকে এসে ধরে দিলাম ধুয়ো—"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে ?" বাস, বুঝলেন প্রভু, বাবুভাই থেকে আরম্ভ করে সে একেবারে 'বলিহারি, বলিহারি' রব উঠে গেল। সঙ্গে সঙ্গে শিরোপা এই চাদরখানা গলার ওপরে ঝপাং করে এসে পড়ল।

কথাটা সত্য। নিতাই ধুয়াটা ধরিয়াছিল এবং লোকে সত্যই ভাল বলিয়াছে, কিন্তু শিরোপার কথাটা ঠিক নয়।

তবে শিরোপা পাইলে অন্যায় হইত না। নিতাই মেলায় গাওনা করিয়াছে ভালো। তার সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর এবং বিচিত্র বিচার-দৃষ্টি একটা নূতন স্বাদের সৃষ্টি করিয়াছিল। সত্যই তো—কালো যদি মন্দই হইবে—তবে কালো চুলে সাদা রঙ ধরিলে—মন তোমার উদাস হইয়া ওঠে কেন ? নিতাই বার বার এই প্রশ্নটির জবাব চাহিয়াছিল। ছিষ্টিধর খ্যাতিমান কবিয়াল—সে মানুষকে জানে এবং চেনে—সে এ প্রশ্নের জবাব রসিকতা করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল। গাহিয়াছিল—

"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদি ক্যানে ?
কাঁদি না রে! কলপ মাখি!
কলপ মাখি,—না হয়, বউ তুলে দেয় হ্যাঁচকা টানে।"

লোকে খুব হাসিয়াছিল বটে কিন্তু ওই অদ্ভুত প্রশ্নটির অন্তর্নিহিত সকৌতুক বিষণ্ণ তত্ত্বটি কাহারও মন হইতে মুছিয়া যায় নাই।. পালা শেষের পর বহুজন পরস্পরের মুখের কাছে হাত নাড়িয়া গাহিয়া প্রশ্ন করিয়াছে—

"কালো যদি মন্দ তবে—কেশ পাকিলে কাঁদো ক্যানে?"

পরের দিন আসরে নিতাইকে মহাদেব ইচ্ছা করিয়াই ছিষ্টিধরের মুখের কাছে আগাইয়া দিয়াছিল। সেদিন ছিষ্টিধর দ্রোণ, মহাদেব একলব্য। আগের দিন প্রচুর বমি করিয়া মহাদেবের শরীরও ভাল ছিল না, গলাটাও বসিয়া গিয়াছিল। ছিষ্টিধরের কাছে হারের ভয়ও ছিল। তাই সম্বন্ধ পাতাইবার পর মহাদেব উঠিয়া আসর বন্দনা করিয়া বলিয়াছিল—

আমার চুল পেকেছে দাঁত ভেঙেছে বয়স আমার অনেক হলো—
ব্যাধের বেটা একলব্য বয়স তাহার বছর ষোলো;
আমাকে কি মানায় তাই? তাই হে দ্রোণ মোর বক্তব্য
একলব্যের বাবা আমি নিতাই হল একলব্য।

বলি—মানাবে ভাল হে!

ইহার উত্তরে ছিষ্টিধর উঠিয়া প্রথমেই কপালে চাপড় মারিয়া গাহিয়াছিল—

—টাকা কড়ি চাই নে কো মা—তোর দণ্ডসাজা ফিরিয়ে নে
হায় মহিষের কৈলে বাছুর বধের হুকুম ফিরিয়ে নে।
নিজে বধলি মহিষাসুরে—
ছানাটাকে দিলি ছেড়ে—
আমায় বলিস বধতে তারে এ আজ্ঞে মা ফিরিয়ে নে।

তাহার পর মহাদেব এবং নিতাইকে জড়াইয়া গালাগালির আর আদি অন্ত রাখে নাই ছিষ্টিধর! মূল সুর তার ওই। নিতাই যদি মহাদেবের পুত্র হয় তবে তাহারা অন্ত্যজ ব্যাধও নয়, তাহারা অসুর; মহাদেব ব্যাটা মহিষাসুর আর নিতাইটা মহিষাসুরের বাচ্চা!

—হায় অসুরের শ্বশুরবাড়ীর ঠিক ঠিকানা নাই—
গরুর পেটে হয় দামড়া
গায়ে তাহার বাঘের চামড়া
বিধাতা সে অধোবদন—এ ব্যাটা ঠিক তাই।

সে যেন নিষ্ঠুর আক্রোশে কোপাইয়া কুচি কুচি করিয়া কাটা! মহাদেবও অধোবদন হইয়াছিল। ভাঙা গলা লইয়া জবাব দিবার তাহার উপায় ছিল না। কিন্তু নিতাই দমে নাই। সে উঠিয়া গান ধরিয়া দিয়াছিল অকুতোভয়ে। তাহার আর হার-জিতের ভয় কি? সে গান ধরিয়াছিল—

ভাণ্ড পুত্ত দ্রোণ ব্রাহ্মণ তোমার কাণ্ড দেখে অবাক হে!

—মহাশয়গণ আমাকে উনি জন্তুপুত্ত বলে গাল দিলেন। কিন্তু ওঁর জন্ম ভাণ্ডে—মাটির কলসীতে।

নারিকেলে নিন্দে করেন—ও কষুটে গুবাক হে!

—মানে সুপুরী। মশায় সুপুরী।

কিন্তু আর যোগায় নাই। ইহার পর সে উল্টা পথ ধরিয়াছিল। নিজেই হার মানিয়া লইয়া—মার খাওয়ার লজ্জাকে লঘু করিয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিল। ছড়া ধরিয়াছিল—

বাস্তন প্রধান ওহে দ্রোণাচায্য

গুরু হয়ে তোমার এ কি অন্যায় কায্য
আমি একলব্য নহি সভ্য ভব্য
না হয় ব্যাধের ছেলে বনে আমার রাজ্য
কিন্তু তোমার শিষ্য কহি সত্য ন্যায্য।
দশের সাক্ষাতে—পা নিলাম মাথাতে—

বলিয়াই ছিষ্টিধরের পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বলিয়াছিল—এখন রণং দেহি হারজিৎ হোক ধায্য। এবং একেবারে শেষ পালাতে হারিয়া নাস্তানাবুদ হইয়া সে হাত জোড় করিয়া বলিয়াছিল—

পভুগণ! শুনুন নিবেদন!
আমি হেরেছি হেরেছি সত্য এ বচন।
হেরেই কিন্তু হয় সার্থক জীবন।

ছিষ্টিধর বলিয়া উঠিয়াছিল—নিশ্চয় নিশ্চয়। তাহার কারণ,—

মুণ্ডু কাটা যায় ধূলাতে গড়ায়
জিব বাহির হয় উল্টায় নয়ন।

এবং নিজেই জিব বাহির করিয়া চোখ উল্টাইয়া ভঙ্গি করিয়া অবস্থাটা প্রকট করিয়া দেখাইয়া দিয়াছিল। লোকে হো-হো করিয়া হাসিয়া প্রায় গড়াইয়া পড়িয়াছিল। নিতাই এই হাসির রোলের উপরেও এক তান ছাড়িয়াছিল—

—আ—আহা—।

তাহার সুস্বরের সেই সুর-বিস্তার মুহূর্তে সকলের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া তাহাদের কৌতুক উচ্ছ্বাসকে স্তব্ধ করিয়া দিয়াছিল। বর্ষার জলো হাওয়ার মাতামাতির উপর ছড়াইয়া পড়া গুরুগম্ভীর জলভরা মেঘের ডাকের মত বলিলে অন্যায় বলা হইবে না, কারণ নিতাইয়ের গলাখানি তেমনই বটে। এবং গান ধরিয়া দিয়াছিল। খাঁটি গান। আপনার মনে অনেক সময় সে অনেক গান বাঁধে—গায়। তাহারই একখানি গান।

আহা—ভালবেসে—এই বুঝেছি
সুখের সার সে চোখের জলে রে—
তুমি হাস—আমি কাঁদি
বাঁশী বাজুক কদম তলে রে!
আমি নিব সব কলঙ্ক তুমি আমার হবে রাজা
(হার মানিলাম) হার মানিলাম
ভুলিয়ে দিয়ে জয়ের মালা তোমার গলে রে!
আমার ভালবাসার ধনে হবে তোমার চরণপূজা
তোমার বুকের আগুন যেন আমার বুকে
পিদীম জ্বালে রে।

উহাতেই আসরময় বাহবা পড়িয়া গিয়াছিল।

ছিষ্টিধর বলিয়াছিল—তোর এমন গলা নিতাই—তুই যাত্রার দলে-টলে যাস না কেন? কবিগান করে কি করবি?

নিতাই আবার তাহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া বলিয়াছিল—সে তো পরের বাঁধা গান গাইতে হবে ওস্তাদ।

সবিস্ময়ে ছিষ্টিধর প্রশ্ন করিয়াছিল—এ তোর গান ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ ওস্তাদ।

ছিষ্টিধর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিল—তাহার পর বলিয়াছিল—হবে, তোর হবে। কিন্তু—

—কিন্তু কি ওস্তাদ ?

—কবিয়ালিও ঠিক তোর পথ নয়। বুঝলি! কিন্তু তু ছাড়িস না। ভগবান তোকে মূলধন দিয়েছেন। খোয়াস না। বুঝলি!

ইহার পর নিতাইয়ের সেরাত্রে সে কি উত্তেজনা! সারারাত্রি জাগিয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিল। কত স্বপ্ন!

পরের দিন মেলায় বাহির হইয়া নিজেই চাদর জুতা কিনিয়া সাজিয়া-গুজিয়া, আয়নায় বার বার নিজেকে দেখিয়া, মনে মনে অনেক গল্প ফাঁদিয়া বাড়ী ফিরিয়াছিল। বাবুরা শিরোপা দিয়েছেন। সুখ্যাতির অজস্র সম্ভার সে তো দেখাইবারই নয়—তবে শিরোপাই তাহার প্রমাণ। দেখ। তোমরা দেখ!

শিরোপার গল্প শেষ করিয়া চা খাইতে খাইতে নিতাইয়ের মনে হইল ঠাকুরঝির কথা। সে কি এখনও ঘরের মধ্যে বসিয়া আছে? নিতাই তাড়াতাড়ি চায়ের কাপ হাতেই উঠিয়া আসিয়া প্ল্যাটফর্মের লাইনের উপর দাঁড়াইল। সমান্তরাল শাণিত দীপ্তির লাইন দুইটি দূরে একটা বাঁকের মুখে যেন মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে।

কই? সেখানে তো স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ চলন্ত কাশফুলের মত তাহাকে দেখা যায় না!

তবে? সে কি এখনও ঘরে বসিয়া আছে?

দোকানে বসিয়া রাজা হাঁকিতেছিল—ওস্তাদ! ওস্তাদ!

—হাঁ, আসছি, আসছি। বাড়ী থেকে আসছি একবার।

নিতাই দ্রুতপদে আসিয়া বাড়ীতে ঢুকিল। হাঁ, এখনও সে বসিয়া আছে। নিতাইকে দেখিবামাত্র সে উঠিয়া পড়িল। কোন কথা না বলিয়া সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। নিতাই তাহার হাত ধরিয়া বলিল—রাগ করেছ?

মেয়েটি মুহূর্তে কাঁদিয়া ফেলিল।

—কি করব বল? ওরা কি ধ'রে ছাড়তে চায়—

—না। আমি ব'সে রইলুম, আর তুমি গেলা ওদের সঙ্গে গল্প করতে!

—তোমার হাতে ধরছি—

ঠাকুরঝি এবার হাসিয়া ফেলিল।

—ব'স, একটুকুন চা খাও। তোমার লেগে নতুন কাপ এনেছি—এই দেখ। সে পকেট হইতে একটি নূতন স্টীলের মগ বাহির করিল।—ভুলে গিয়েছিলাম এতক্ষণ। নিতাই হাসিল।

—না। বেল্ল্যা—। বলিয়াই বেলার দিকে চাহিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।—ওগো মাগো! সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিল।

সমস্ত পথটাই সে ভাবিতেছিল এই বিলম্বের জন্য কি বলিবে! চলিতে চলিতে হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল হারের কথা। সে খুঁট খুলিয়া হারখানি বাহির করিল। গলায় পরিল। সঙ্গে সঙ্গে সব আশঙ্কার কথা ভুলিয়া গেল।

পথে একটি ছোট নদী। স্বচ্ছ অগভীর জলস্রোতে তাহার কম্পিত প্রতিবিম্বের গলায় সোনার হার ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, মেয়েটি সেই প্রতিবিম্বের দিকে চাহিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া গেল, ধীরে

ধীরে চঞ্চল জল স্থির হইল। এইবার একবার সে হার-পরা আপনাকে বেশ করিয়া দেখিয়া লইল, তারপর হারখানি খুলিয়া খুঁটে বাঁধিয়া নদী পার হইয়া গ্রামে প্রবেশ করিল।

কি বলিবে, সে এখনও স্থির করিতে পারে নাই, তবে তিরস্কার সহ্য করিতে সে আপনাকে প্রস্তুত করিয়াছে।

নিতাই এখনও দাঁড়াইয়া আছে কৃষ্ণচূড়া গাছটির তলায়। ফাল্গুনের দ্বিপ্রহরের দিক্‌চক্রবাল ধূলার আস্তরণে ধূসর হইয়া উঠিয়াছে, বাতাস উতলা হইয়াছে, সেই উতলা বাতাস ধূলা উড়াইয়া লইয়া বহিয়া যায়, যেন দূরের নদীর প্রবাহের মত। নিতাইয়ের মন এখনও চঞ্চল। সে এখনও সেই ঝাপসা আস্তরণের মধ্যে যেন একটি স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুল দেখিতে পাইতেছে। সে স্থির দৃষ্টিতে দিগন্তের দিকে চাহিয়া গুনগুন করিয়া গান ভাঁজিতেছিল। হঠাৎ তাহার মনে মনে একটা বিচিত্র কথার মালা গাঁথিয়া উঠিল। নিজেরই একসময় মনে প্রশ্ন জাগিল—কেন সে এমন করিয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকে? ওই মেয়েটি তাহার কে? মনই বলিল—কে আবার—'মনের মানুষ'। মনের মানুষের জন্তই সে পথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকে। সাধ হয় এই পথের ধারেই ঘর বাঁধিয়া বাস করে। পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, হঠাৎ এক সময়ে তাহার আসার নিশানা ঝিকমিক করিয়া উঠে। সেই কথাগুলিই সাজাইয়া গুছাইয়া সুরতরঙ্গের দোলায় আপন মনেই গুন গুন ধ্বনি তুলিয়া দুলিতে লাগিল—

"ও আমার মনের মানুষ গো!
তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধলাম ঘর!
ছটায় ছটায় ঝিকিমিকি তোমার নিশানা,
আমায় হেথা টানে নিরন্তর।"

তাহাই সে করিবে। পথের ধারে ঘর বাঁধিয়া অহরহ দাওয়ায় বসিয়া পথের পানে চাহিয়া থাকিবে। ঘর হইতে ঠাকুরঝি বাহির হইলেই তাহার মাথার ঘটিতে রোদের ছটা লাগিয়া ঝিলিক উঠিবে, সে ঘটিতে ওঠা ছটার ঝিলিক আসিয়া তাহার চোখে লাগিবে। গান বাঁধিয়া সে সুরে ভাঁজিতে লাগিল—

ও আমার মনের মানুষ গো!

আট

পথের ধারে ঘরের বদলে কুলি-ব্যারাকেই নিতাই দিবাস্বপ্ন শুরু করিল। গান গাহিয়া সে টাকা পাইয়াছে। কবিয়াল স্বষ্টিধর বলিয়াছে তাহার হইবে। সুতরাং তাহার আর ভাবনা কি?

ট্রেনভাড়া সমেত নিতাই পাইয়াছিল ছয়টি টাকা। কিন্তু ট্রেনভাড়া তাহার লাগে নাই। এই ব্রাঞ্চ লাইনটিতে নিতাই অনেকদিন কুলিগিরি করিয়াছে – গার্ড, ড্রাইভার, চেকার সকলেই তাহাকে চেনে, রাজার জন্ত তাহাকে সকলেই ভাল করিয়াই জানে, সেই জন্ত ট্রেনভাড়াটা তাহার লাগে নাই, ছয়টা টাকাই বাঁচিয়াছিল। জুতা চৌদ্দ আনা, চাদর বারো আনা, দেশলাই বিড়ি আনা দুইয়েক—এই এক টাকা বারো আনা বাদে চার টাকা চার আনা সম্বল

লইয়া নিতাই ফিরিয়াছে। প্রত্যাশা আছে, আবার শীঘ্রই দুই-একটা বায়না আসিবে।' নিতাইয়ের ধারণা যাহারা তাহার গান শুনিয়াছে তাহাদের মুখে মুখে তাহার নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে—

—"নতুন একটি ছোকরা, মহাদেবের দলে দোয়ারকি করেছিল, দেখেছ ?

—হ্যাঁ! হ্যাঁ! ভাল ছোকরা। বেড়ে মিষ্টি গলা।

—উঁহু। শুধু গলাই মিষ্টি নয়, কবিয়ালও ভাল। এবার মহাদেবের মান রেখেছে ওই। মহাদেব তো বেহুঁশ, ও-ই গান ধরলে—'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ ক্যানে'। তাতেই আসর একেবারে গরম হয়ে উঠল। দাও জবাব—কালো যদি মন্দ তবে কালো চুলের এত গরব কেন ? এত ভালবাস কেন ? পাকলেই বা মন খারাপ কেন ?

—বল কি! ওই ছোকরার বাঁধা গান ওটা ?

—হ্যাঁ।

—তা হ'লে আমাদের মেলাতে ওই ছোকরাকেই আন।"

নিতাই মনে মনে নিজের দরও ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। মহাদেব আট টাকা লইয়া থাকে, ছিষ্টিধর দশ টাকা; নিতাই পাঁচ টাকা হাকিবে, চার-টাকা-রাত্রিতে রাজী হইবে। এখন একজন ঢুলি চাই। রাজনের ছেলে যুবরাজকে দিয়া কাঁসী বাজানোর কাজ দিব্য চলিবে। এবার সে আরও ভাল গান বাঁধিয়াছে। সুরও হইয়াছে তেমনি। 'ও আমার মনের মানুষ গো—তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধিলাম ঘর; ছটায় ছটায় ঝিকিমিকি তোমার নিশানা, আমায় হেথা টানে নিরন্তর।' ইহাতেই মাত হইয়া যাইবে। একবার সুযোগ পাইলে হয়। মুস্কিল এখানেই। কবির পালায় এমন গান গাহিবার সুযোগ সহজে মেলে না। তবুও আশা সে রাখে। এই কারণেই ঢং ঢং করিয়া ট্রেনের ঘণ্টা পড়িলেই সে তাড়াতাড়ি আসিয়া স্টেশনে বসে। ট্রেনের প্রতি যাত্রীকে সে লক্ষ্য করিয়া দেখে। মেলা-খেলা লইয়া যাহারা থাকে, তাহাদের চেহারার মধ্যে একটা বিশিষ্ট ছাপ আছে, নিতাই সেই ছাপ খুঁজিয়া ফেরে। কেবল যায় না বেলা বারোটার ট্রেনের সময়, কারণ ওই সময়টিতে আসে ঠাকুরঝি।

* * * *

মাসখানেক পর। গভীর রাত্রি। নিতাই চুপ করিয়া বসিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল।

সেদিন তাহার হাতের সম্বল আসিয়া ঠেকিয়াছে একটি সিকিতে। তাহার মনটা অকস্মাৎ আবার ভাঙিয়া পড়িতে চাহিতেছে। কোনরূপে আর চারিটা দিন চলিবে। তার পর ? আবার কি 'মোট বহন' করিতে হইবে ?

নহিলে ? উপোস করিয়া মানুষ কয়দিন থাকিতে পারে ?

এদিকে ঠাকুরঝির কাছে দুধের দাম বাকী পড়িয়া যাইতেছে। দশ দিন আগে অবশ্য সব সে মিটাইয়া দিয়াছে, দশ দিনের দশ পোয়া দুধের দাম দশ পয়সা বাকী। নিতাই স্থির করিল, আজই সে দুধের রোজে জবাব দিবে।

পরদিন দ্বিপ্রহরে, রেল-লাইনের বাঁকের মুখে যেখানে লাইন দুইটা মিলিয়া এক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, সেইখানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। আজই তার শেষ দাঁড়াইয়া থাকা। 'ও আমার মনের মানুষ'—গান আর শেষ হইল না, হইবেও না; আজ হইতে সে ভুলিয়া যাইবে, আর গাহিবে না। ওইখানেই অকস্মাৎ এক সময়ে দেখা গেল, মাথায় ঘটি—সাদা ধপধপে কাপড় পরা ঠাকুরঝিকে।

ঠাকুরঝি আগাইয়া কাছে আসিল। তাহাকে দেখিয়া নিতাই হাসিল।

ঠাকুরঝি বলিল—না বাপু, তুমি এমন ক'রে দাঁড়িয়ে থেকো না। নোকে কি বলবে বল দেখি?

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিতাই বলিল—নোকে কি কথা বলবে জানি না। আমি তোমাকে একটি কথা বলবার নেগে দাঁড়িয়ে আছি।

নিতাই এখন ভদ্রভাষায় কথা বলিতে চেষ্টা করে, তাই ল-কারকে ন-কার করিয়া তুলিয়াছে। লোহাকে বলে নোয়া, লুচিকে বলে নুচি, লঙ্কা—নঙ্কা, লোক—নোক হইয়া উঠিয়াছে তাহার কাছে। রাজন, ঠাকুরঝি তাহার ভাষার এই মার্জিত রূপের পরম ভক্ত।

নিতাইয়ের কথা শুনিয়া ঠাকুরঝি সপ্রশ্ন ব্যগ্র দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কি কথা? অকারণে মেয়েটির বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন মুহূর্তে দ্রুত হইয়া উঠিল। কি কথা বলিবে কবিয়াল?

নিতাই বলিল—অনেক দিন থেকেই বলব মনে করি, কিন্তুক—

একটু নীরব থাকিয়া নিতাই বলিল—আর ভাই দুধের পেয়োজন আমার হবে না।

ঠাকুরঝি মুহূর্তে কেমন হইয়া গেল। একথা শুনিবে তাহা তো সে ভাবে নাই! তাহার মুখের শ্রী মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তিত হইতেছিল। বর্ষার রসপরিপুষ্ট ঘনশ্যাম পত্রশ্রীর মত তাহার সে মুখখানি মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তিত হইয়া হেমন্ত শেষের পাতার মত পাণ্ডুর হইয়া আসিল। সে হইতেছিল সম্পূর্ণভাবে তাহার অজ্ঞাতসারে। সে নির্বাক হইয়া শুধু নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াই রহিল। নিতাইয়ের কথার শেষে তাহার মুখ এবার যে পাণ্ডুর হইয়া গেল, তাহার আর পরিবর্তন ঘটিল না। অনেকক্ষণ পরে সে যেন কথা খুঁজিয়া পাইল। কথাটা নিতাইয়েরই কথা। সেই কথাটাই সে যেন কম্পিতকণ্ঠে যাচাই করিয়া লইল—আর দুধ নেবে না?

—না।

—ক্যানে? কি দোষ করলাম আমি? তাহার চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল।

নিতাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, উত্তর দিবার শক্তি তাহার ছিল না। কোনরূপে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া বলিল—মিথ্যে কথা একেই মহাপাপ, তার ওপর তোমার কাছে মিথ্যে বললে পাপের আমার পরিসীমা থাকবে না। আমার সামর্থ্যে কুলুচ্ছে না ঠাকুরঝি!

তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—দরিদ্র ছোটলোকের কবি হওয়া বড় বিপদের কথা ঠাকুরঝি।

কাতর অনুনয়ে ব্যগ্রতা করিয়া মেয়েটি বলিয়া উঠিল—তোমাকে পয়সা দিতে হবে না কবিয়াল। অকুণ্ঠিত আবেগে সে নিতাইয়ের হাত দুইটি চাপিয়া ধরিল।

নিতাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল, তারপর বলিল—না। জানতে পারলে তোমার স্বামী পেহার করবে, শাশুড়ী তিরস্কার করবে, ননদে গঞ্জনা দেবে—

ঠাকুরঝি প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—না না না। ওগো, একটি গাই আমার নিজের আছে, আমি বাবার ঘর থেকে এনেছি, সেই গাইয়ের দুধ আমি তোমাকে দোব।

নিতাই চুপ করিয়া রহিল।

—লেবে না? কবিয়াল—? মেয়েটির কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল, দৃষ্টি ফিরাইয়া নিতাই দেখিল, আবার তাহার চোখ দুইটিতে জল টলমল করিতেছে।

সান্ত্বনা দিবার জন্যই নিতাই মৃদু হাসিল। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরঝির মুখেও হাসি ফুটিয়া উঠিল। নিতাইয়ের মুখের হাসিকেই সম্মতি ধরিয়া লইয়া মুহূর্তে সে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। এবং সেই উচ্ছ্বাসেই সে পুলকিত দ্রুত লঘুপদে নিতাইকে অতিক্রম করিয়া আসিয়া নিজেই নিতাইয়ের বাসায় দুয়ার খুলিয়া ফেলিল। ঘরকন্না তাহার পরিচিত; দুধের পাত্রটি বাহির করিয়া দুধ ঢালিয়া দিয়া দ্রুততর পদে বাহির হইয়া গ্রামের দিকে পথ ধরিল।

নিতাই পিছন হইতে ডাকিল—ঠাকুরঝি!

ঠাকুরঝির যেন শুনিবার অবসব নাই, তাহার যেন কত কাজ। নিজের গতিবেগ আরও একটু বাড়াইয়া দিয়া সে চলিয়া গেল।

তখন চলিয়া গেলেও ফিরিবার পথে সে আসিয়া আবার বারান্দায় বসিয়া পা দোলাইতে দোলাইতে বলিল—দাও, চা দাও। আমার নতুন কাপে দাও।

চায়ের কাপটি নামাইয়া দিয়া নিতাই বলিল—একটি কথা শুধাব ঠাকুরঝি?

চায়ের কাপে চুমুক দিয়া ঠাকুরঝি বলিল—বল?

—আমাকে বিনি পয়সায় কেনে দুধ দেবে ঠাকুরঝি?

ঠাকুরঝি স্থিরদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিতাই আবার প্রশ্ন করিল—বল কিসের লেগে?

ঠাকুরঝি বলিল—আমার মন।

নিতাই অবাক হইয়া গেল—তোমার মন?

ঠাকুরঝি বলিল—হ্যাঁ। আমার মন।

তারপর হাসিয়া মুখ তুলিয়া সে বলিল—তুমি যে কবিয়াল! কত বড় নোক! বলিয়াই সে চায়ের কাপটি ধুইবার অছিলায় বাহির হইয়া গেল। ফিরিয়া দেখিল, নিতাই হাসিমুখে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার হাতে দুইটি গাঢ় রাঙা কৃষ্ণচূড়া ফুল। ফুল দুইটি আগাইয়া দিয়া নিতাই বলিল—নাও। কবিয়ালের হাতে ফুল নিতে হয়।

ঠাকুরঝি লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া বলিল—না।

—তবে আমিও দুধ নোব না।

ঠাকুরঝি লঘু ক্ষিপ্রহাতে ফুল দুইটি টানিয়া লইয়া এক রকম ছুটিয়াই পলাইয়া গেল।

নিতাই নূতন গানের কলি ভাঁজিতে বসিল। আজ আবার নূতন কলি মনে হইয়াছে। 'ও আমার মনের মানুষ গো।' গানটির শুধু দু'কলি আছে আর নাই; ও গানটি ভুলিবার সংকল্পই সে করিয়াছিল, কিন্তু বিধাতা দিলেন না ভুলিতে,—ঐ গানটিকে সে পুরা করিতে বসিল। বড় ভাল গান।

'ছটায় ছটায় ঝিকমিকি তোমার নিশানা'—গুন গুন করিতে করিতেই সে একখানা কাঠ উনানে গুঁজিয়া দিল। ট্রেন চলিয়া গিয়াছে, ডিউটি শেষ করিয়া এইবার রাজন চা-চিনি লইয়া আসিবে, আবার একবার চা খাইবে।

নূতন কলি আসিয়াছে। বড় ভাল কলি। নিতাই খুব খুশী হইয়া উঠিল।—

আহা—"সেই ছটাতে ঘর পুড়িল পথ করিলাম সার!"

তাই বটে, পথই সে সার করিয়াছে। কিন্তু তার পর? হ্যাঁ—হইয়াছে। পাইয়াছে, সে পাইয়াছে—সেই পথের চারিদিকেই বাঁশী বাজিতেছে—পথে দাঁড়াইয়া থাকিতে দুঃখ কষ্ট নাই।

"চারদিকে চার বৃন্দাবনে বংশী বাজে কার?"

কার আবার? সেই ব্রজের বাঁশী! সে বাঁশী যে চিরকাল বাজিতেছে। প্রেম হইলে

তবে শোনা যায়, নহিলে যায় না! সে শুনিয়াছে!

সে আজ স্পষ্ট অনুভব করিল—ঠাকুরঝিকে সে ভালবাসে।

ঠাকুরঝিও তাহাকে ভালবাসে।

গুন গুন করিয়া নিতাই আপন মনে আখর দিল—

"বংশী বাজে তার।

ও রাধা রাধা রাধা বলে—

তারপর? তারপর? আহা—! সেই বাঁশী। না। না।—হাঁ।—

"ঘর জলিল—মন হারালো ছটায় সুরে গো!

সুখের একি আকুল আতান্তর।"

আতান্তরই বটে। এ বড় আতান্তর!

অকস্মাৎ তাহার গান বন্ধ হইয়া গেল। একটা কথা মনে হইতেই গান বন্ধ করিয়া সে শিহরিয়া উঠিল।

ঠাকুরঝি ভিন্ন জাতি, অন্য একজনের সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে। এ যে মহাপাপ! ওঃ! এ বড় আতান্তর!

অনেকক্ষণ নিতাই চুপ করিয়া রহিল। নির্জনে বসিয়া সে বার বার তাহার মনকে শাসন করিতে চেষ্টা করিল। বার বার সে শিহরিয়া উঠিল। তাহার অবাধ্য মন কিছুতেই শাসন মানিতে চায় না। অবাধ্য মন লজ্জা পায় না, দুঃখিত হয় না, সে যেন কত খুশী হইয়াছে, কত তৃপ্তি পাইয়াছে! ঘরের প্রতিটি কোণে যেন ঠাকুরঝি দাঁড়াইয়া আছে—অন্ধকারের মধ্যে ক্ষারে-ধোওয়া ধপধপে কাপড় পরিয়া সে যেন দাঁড়াইয়া আছে নিতাইয়ের মনের খবর জানিবার জন্য। নিতাই অধীর হইয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের জানালাটা খুলিয়া দিল। উদাস দৃষ্টিতে সে খোলা জানালা দিয়া চাহিয়া রহিল রেলের লাইনের দিকে। রেলের সমান্তরাল লাইন দুইটা যেখানে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে মনে হয়, সেইখানে নিতাইয়ের আজ মনে হইল একটি স্থির স্বর্ণবিন্দু জাগিয়া রহিয়াছে, সে অচঞ্চল—সে নড়ে না—আগায় না, চলিয়া যায় না, স্থির। ঠাকুরঝি যেন ঘর হইতে বাহির হইয়া ওইখানে গিয়া দাঁড়াইয়া আছে। জানালা খুলিয়া দেওয়ায় রাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পথে সে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, কবিয়াল তাহাকে ডাকে কিনা!

নিতাইয়ের বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল। সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়া বসিল কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায়। রাঙা ফুলে ভরা গাছ। 'চিরোল চিরোল' পাতার ডগায় থোপা থোপা ফুল! গাছটার এমন অপরূপ বাহার নিতাই আর কখনও দেখিয়াছে বলিয়া মনে হইল না। সামনেই রেল লাইনের ওপাশে বন-আউচের গাছ—বন-আউচের মিঠা গন্ধ আসিতেছে। কদমের গাছটায় কচি পাতা দেখা দিয়াছে। বর্ষা নামিলেই কদমের ফুল দেখা দিবে। বাবুদের আমবাগানে দুইটা কোকিল পাল্লা দিয়া ডাকিতেছে; একটা 'চোখ গেল' পাখী ডাকিতেছে চণ্ডীতলার দিকে। 'মধুকুলকুলি' পাখীগুলি নাচিয়া নাচিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। রঙীন প্রজাপতির যেন মেলা বসিয়া গিয়াছে কৃষ্ণচূড়া গাছটার চারিপাশে। তাহারা উড়িয়া উড়িয়া ফিরিতেছে।

ঠাকুরঝি যেন দ্রুতপদে চলিয়া আসিতেছে এই দিকে।

নিতাইয়ের শরীর যেন কেমন ঝিমঝিম করিতেছে। সে চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিল। মনে মনে ডাকিল—এস। ঠাকুরঝি, এস। তোমার মনের কথা আমি বুঝিয়াছি। তুমি এস।

আমার পাপ হয় হোক, নরকে যাইতে হয় হাসিমুখেই যাইব, তবু তোমাকে বলিতে পারিব না—তুমি এস না। সে কি পারি? সে কথা কি মুখ দিয়া বাহির হইবার? এস তুমি, এস।

তাহার মনে হইল নষ্টচাঁদের কথা। সে চাঁদ দেখিলে নাকি কলঙ্ক হয়। নিতাই কিন্তু কখনও সে কথা মানে নাই। মনের মধ্যে তাহার আবার গান গুনগুন করিয়া উঠিল। আপনি যেন কলিটা আসিয়া পড়িল—

"চাঁদ দেখে কলঙ্ক হবে ব'লে কে দেখে না চাঁদ?"

ঠাকুরঝি তাহার সেই চাঁদ। ঠাকুরঝি যদি আর না আসে, তবে নিতাই বাঁচিবে কি করিয়া? এখানে থাকিয়া সে কি করিবে? কোথায় সুখ তবে? সে এইখানে বসিয়া ওই পথের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চোখের দৃষ্টি হারাইয়া ফেলিবে।

"চাঁদ দেখে কলঙ্ক হবে ব'লে কে দেখে না চাঁদ?"
তার চেয়ে চোখ যাওয়াই ভাল ঘুচুক আমার দেখার সাধ।
ওগো চাঁদ, তোমার নাগি—"

ও-হো-হো! গানের কলি হু-হু করিয়া আসিতেছে!

"ওগো চাঁদ তোমার নাগি—না হয় আমি বৈরাগী,
পথ চলিব রাত্রি জাগি সাধবে না কেউ আর তো বাদ।"

হায়, হায়, হায়! একি বাহারের গান! ওগো, ঠাকুরঝি। ওগো, কি মহা ভাগ্যে তুমি আসিয়াছিলে, কবিয়ালকে ভালবাসিয়াছিলে, তাই তো—তাই তো আজ এমন গান আপনি-আপনি আসিয়া পড়িল!

নিতাই উঠিল। সে চলিল ওই রেল লাইনের পথ ধরিয়া যে পথে ঠাকুরঝি আসে। কিছু দূর গিয়া পথ নির্জন হইতেই সে ওই গানটা ধরিয়া দিল।

রেল লাইনের বাঁধে ছেদ পড়িয়াছে নদীর উপর। বাঁধের মাথা হইতে পুল আরম্ভ হইয়াছে। বাঁধ হইতে নিতাই নামিল নদীর ঘাটে; নদীতে অল্প জল, এক হাঁটুর বেশী নয়। হাঁটিয়াই ঠাকুরঝি নিত্য নদী পার হইয়া আসে-যায়। নিতাই গিয়া নদীর ঘাটে দাঁড়াইল।

নিতাই চলিয়াছিল একেবারে বিভোর হইয়া। বাঁ হাতখানি গালে রাখিয়া ডানহাতের অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা আঙুল দুইটি জুড়িয়া সে যেন ঠাকুরঝিকেই উদ্দেশ করিয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিল। হয়তো সে একেবারে ঠাকুরঝির শ্বশুরবাড়িতে গিয়াই হাজির হইত। নদীর ঘাটে পা দিয়াই হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল। তাই তো, সে কোথায় যাইতেছে? এ কি করিতেছে সে? ঠাকুরঝির শ্বশুরবাড়িতে সে যদি গিয়া দাঁড়ায়, এই গান গায়, বলে—ঠাকুরঝি এ চাঁদ কে জান? এ চাঁদ আমার তুমি! তবে ঠাকুরঝির দশা কি হইবে? ঠাকুরঝির স্বামী কি বলিবে? তাহার শাশুড়ী ননদ কি বলিবে? পাড়া-প্রতিবেশী আসিয়া জুটিয়া যাইবে। তাহারা কি বলিবে? সকলের গঞ্জনার মধ্যে পড়িয়া ঠাকুরঝি—, তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল ঠাকুরঝির ছবি। দিশাহারার মত তাহার ঠাকুরঝি দাঁড়াইয়া শুধু কাঁদিবে।

ঠাকুরঝির নিন্দায় ঘর-পাড়া-গ্রাম-দেশ ভরিয়া যাইবে। ঠাকুরঝি পথ হাঁটিবে, মাথা হেঁট করিয়া পথ হাঁটিবে, লোক আঙুল দেখাইয়া বলিবে—ওই দেখ কালামুখী যাইতেছে।

কুৎসিত অভদ্র লোক ঠাকুরঝিকে কুৎসিত কুকথা বলিবে।

সে যদি ঠাকুরঝিকে মাথায় করিয়া দেশান্তরী হয়, তবুও লোকে বলিবে—মেয়েটা খারাপ, নিতাইয়ের সঙ্গে ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে। ঠাকুরঝি সেখানেও মাথা তুলিতে পারিবে না।

নিতাই নদীর ঘাটে বসিল।

আপন মনেই বলিল—আকাশের চাঁদতুমি আমার ঠাকুরঝি। তুমি আকাশেই থাক।

আঃ—আজ কি হইল নিতাইয়ের! আবার কলি আসিয়া গিয়াছে।—

"চাঁদ তুমি আকাশে থাক—আমি তোমায় দেখব খালি।
ছুঁতে তোমায় চাইনাকো হে—সোনার অঙ্গে লাগবে কালি।"

নিতাই গান ভাঁজিতে ভাঁজিতে আবার ফিরিল।

রাজা বলিল—কাঁহা গিয়া রহা ওস্তাদ?

নিতাই হাসিয়া বলিল—গান, রাজন, গান। বহুত বঢ়িয়া বঢ়িয়া গান আজ এসে গেল ভাই। তাই গুনগুন করছিলাম আর মাঠে মাঠে ঘুরছিলাম।

—হাঁ! বঢ়িয়া বঢ়িয়া গান?

—হাঁ, রাজন, অতীব উত্তম, যাকে বলে উচ্চাঙ্গের গান।

—বইঠো। তব্ ঢোলক লে আতা হাম।

রাজা ঢোল আনিয়া বসিয়া গেল।

নিতাই একমনে গাহিতেছিল—চাঁদ তুমি আকাশে থাক—

হঠাৎ বাজনা বন্ধ করিয়া রাজা বলিল—আরে ওস্তাদ, আঁখসে তুমারা পানি কাহে নিকালতা ভাই?

চোখ মুছিয়া নিতাই বলিল—হাঁ রাজন, পানি নিকাল গিয়া। কিয়া করেগা! চোখের জল যে কথা শোনে না ভাই!

পরদিন নিতাই সকাল হইতেই বসিয়া ছিল ওই কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায়। আজ সকাল হইতেই তাহার মনে হইতেছে—মনে তাহার কোন খেদ নাই, কোন তৃপ্তিও নাই। সে যেন বৈরাগীই হইয়া গিয়াছে।

কাল সমস্ত দিন-রাত্রি মনে মনে অনেক ভাবিয়াছে সে। সন্ধ্যায় গিয়াছিল রাজনের বাড়ী। রাজার স্ত্রী বড় মুখরা; ইদানীং রাজা নিতাইকে নানাপ্রকার সাহায্য করে বলিয়া সে নিতাইয়ের উপর প্রায় চটিয়াই থাকে। তবু সে গিয়াছিল। রাজা খুশী হইয়াছিল খুব। আশ্চর্যের কথা—কাল রাজার বউও তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়াছিল। ঘোমটার মধ্য হইতেই বলিয়াছিল—তবু ভাগ্যি যে ওস্তাদের আজ মনে পড়ল।

নিতাই তাহারই কাছে কৌশলে কথাপ্রসঙ্গে জানিয়াছে—ঠাকুরঝির স্বামীর সমস্ত বৃত্তান্ত।

ঠাকুরঝির স্বামীটি নাকি দিব্য দেখিতে!

—রঙ পেরায় গোরো, বুঝলে ওস্তাদ, তেমনি ললছা-ললছা গড়ন। লোকটিও বড় ভাল। দুজনাতে ভাবও খুব, বুঝলে!

অবস্থাও নাকি ভাল। দিব্য সচ্ছল সংসার। রাজার স্ত্রী বলিল—যাকে বলে 'ছছল-বছল'। আট-দশটা গাই গরু। দুটো বলদ। ভাগে চাষ-বাস করে। ঠাকুরঝির তোমাদের পাঁচজনার আশীর্বাদে সুখের সংসার।

নিতাই বলিয়াছিল—আহা! আশীর্বাদ তো চব্বিশ ঘণ্টাই করি মহারাণী।

রাজার স্ত্রী অদ্ভুত। সে এতক্ষণ বেশ ছিল, এবার ওই মহারাণী বলাতেই সে খড়ের আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। ওই—ওই কথা আমি সইতে লারি। মহারাণী। মহারাণী তো খুব। মেথরাণী, চাকরাণী তার চেয়ে ভাল। না ঘর না দুয়োর। র‍্যালের ঘরে বাস—

আজ এখান, কাল সেখান।

রাজা মুহূর্তে আগুন হইয়া উঠিয়াছিল—কেঁও হারামজাদী? কেয়া বলতা তুম?

—কেয়া বোলতা তুম কি? হক কথা বলব তার ভয় কি?

তাহার পরেই কুরুক্ষেত্র। রাজা ধরিয়াছিল তাহার চুলে। তাহাদের শান্ত করিবার জন্য নিতাই বারকয়েক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টায় কিছু হয় নাই। রাজার স্ত্রী প্রায় রাত্রি বারোটা-একটা পর্যন্ত কাঁদিয়া রাজাকে গাল দিয়াছে, নিতাইকে গাল দিয়াছে। তাহার জের টানিয়া আজ সকালেও একদফা হইয়া গিয়াছে।

নিতাইয়ের উদাসীনতা অবশ্য সেজন্য নয়।

কাল সমস্ত রাত্রি সে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া মনকে বুঝাইয়াছে। ভাল তুমি বাস, কিন্তু সে কথা মনেই রাখ, কাহাকেও বলিও না—ঠাকুরঝিকেও না। তাহার সুখের ঘরসংসার—সে ঘর তাহার নিত্যনূতন সুখে ভরিয়া উঠুক। তুমি তাহার মনের সরমের বাঁধ ভাঙিয়া তাহার সে সুখের ঘর ভাসাইয়া দিও না।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় ঠাকুরঝি আসিল ঘড়ির কাঁটার মত। রেল লাইনে জাগিয়া উঠিল সোনার বরণ একটি ঝকঝকে বিন্দু, তাহার পর ক্রমশ জাগিয়া উঠিল কাশফুলের মত সাদা একটি চলন্ত রেখা। ক্রমে কাছে আসিয়া সে হইল ঠাকুরঝি। একমুখ হাসি লইয়া ঠাকুরঝি তাহার সামনে দাঁড়াইল।

—কবিয়াল!

নিতাই অশ্রু-উদ্বেল কণ্ঠে বলিল—ঘরে বাটি আছে, দুধটা রেখে যাও।

সে বুঝিতে পারিল না কেন তাহার চোখে অকারণে জল আসিতে চাহিতেছে।

—না। তুমি এস। আমি অত সব লারব বাপু! আর—

—কি আর?

—রোদে এলাম, বসব একটুকুন।

—না ঠাকুরঝি। এমন ভাবে আমার ঘরে বসা ঠিক নয়। দেখ পাঁচজনে দুষ্য ভাববে।

ঠাকুরঝি স্তব্ধভাবে স্থিরদৃষ্টিতে নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিতাই বলিল—বিশ্রাম করবে যদি তো তোমার দিদির বাড়ী রয়েছে। আমি একা বেটা-ছেলে বাড়ীতে থাকি। পাঁচজনের দুষ্য ভাবার তো দোষ নাই। দেখ তুমিই বিবেচনা ক'রে দেখ ঠাকুরঝি! তাহার মুখে নিরুপায় মানুষের সকরুণ হাসি ফুটিয়া উঠিল।

ঠাকুরঝি হনহন করিয়া চলিয়া গেল।

নিতাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

* * *

দিন এমনি ভাবেই চলিতে আরম্ভ করিল। নিতাই উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকে। গানও আর তেমন গায় না। ঠাকুরঝি আসে, সেও আর নিতাইয়ের সঙ্গে কথা বলে না। দ্রুতপদে আসিয়া দাঁড়াইয়া, দুধের বাটিতে দুধ ঢালিয়া দেয়, চলিয়া যায়।

ইহারই মধ্যে নিতাই একদিন বলিল—শোন।

ঠাকুরঝি শুনিতে পাইল, কিন্তু দাঁড়াইল না। একবার মুখ ফিরাইয়া নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়াই আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

নিতাই আবার ডাকিল—যেও না, শোন। ঠাকুরঝি!

ঠাকুরঝি এবার দাঁড়াইল।

—শোন, এদিকে ফেরো।

ঠাকুরঝি ফিরিয়া দাঁড়াইল। নিতাইয়ের চোখেও মুহূর্তে জল আসিয়া পড়িল। সে তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া ইঙ্গিত করিয়া বলিল—না, না। যাও তুমি। বলব, আর একদিন বলব।

ঠাকুরঝি আর দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল।

দিন কয়েক আবার সেই আগের মত চলিল। কেহ কাহারও সঙ্গে কথা বলে না। একদিন ঠাকুরঝি দুধ ঢালিয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত পরে বলিল—সেদিন যে কি বলব বলেছিলে—বললে না?

নিতাই বলিল—বলব।

—বল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিতাই বলিল—আর একদিন বলব ঠাকুরঝি।

ঠাকুরঝি একটু হাসিল। সে হাসি দেখিয়া নিতাইয়ের বুক একটা প্রচণ্ড দীর্ঘনিঃশ্বাসে আলোড়িত হইয়া উঠিল। ঠাকুরঝি সঙ্গে সঙ্গে ফিরিল, বাড়ী হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

নিতাইয়ের বুক-ভরা দীর্ঘনিঃশ্বাসটা এতক্ষণে ঝরিয়া পড়িল। যে কথাটা বলা হইল না সেই কথা গান হইয়া বাহির হইয়া আসিল।

"বলতে তুমি ব'লো নাকো, (আমার) মনের কথা থাকুক মনে।
(তুমি) দূরে থাকো সুখে থাকো আমিই পুড়ি মন-আগুনে!"

অনেকদিন পরে নিতাইয়ের মনে গান আসিয়াছে; দুঃখের মধ্যেও নিতাই খুশী হইয়া উঠিল। গুন গুন করিয়া গান ধরিয়া নিতাই চলিল বাবুদের বাগানের দিকে। বাবুদের বাগানে তাহার গানের অনেক সমঝদার আছে। বাগানের প্রতিটি গাছ তাহার সমঝদার শ্রোতা। এই বাগানেই সে প্রথম-প্রথম কবিগান অভ্যাস করিত। গাছগুলি হইত মজলিসের মানুষ। তাহাদের সে তাহার গান শুনাইত। আজও বাগানে আসিয়া সে গান ধরিল, ওই গানটাই ধরিল—

"সাক্ষী থাক তরুলতা, শোন আমার মনের কথা,
এ বুকে যে কত বেথা—বোঝ বোঝ অনুমানে।
আমিই পুড়ি মন-আগুনে।"

গান শেষ করিয়া সে চুপ করিয়া বসিল। নাঃ, এমনভাবে আর দিন কাটে না। এই মনের আগুনে সে আর পুড়িতে পারিবে না। শুধু মনের আগুনই নয়, পেটের আগুনের জ্বালা, সেও তো কম নয়! রোজগার গিয়াছে; পুঁজি প্রায় ফুরাইয়া আসিল। রোজগারের একমাত্র পথ মোটবহন, কিন্তু কবিয়াল হইয়া তো ঐ কাজ সে করিতে পারিবে না। অন্তত এখানে সে পারিবে না। এখান হইতে তাহার চলিয়া যাওয়াই ভাল। তাই করিবে সে। কালই গিয়া মা চণ্ডীকে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিবে—মা গো, তোমার অভাগা ছেলে নিতাইচরণকে কবিয়াল করিলে, কিন্তু তাহার মনের দুঃখ পেটের দুঃখ বুঝিলে না। কোন উপায় করিলে না। সে চলিল, তাহাকে বিদায় দাও তুমি। তাহার মনে পড়িয়া গেল অনেক দিনের আগের একটা শোনা গান, বাউলেরা গাহিত, ক্ষুদিরামের ফাঁসির গান—

"বিদায় দে মা ফিরে আসি।"

ওই প্রথম কলিটা লইয়া তাহার পাদপূরণ করিতে করিতে সে ফিরিয়া আসিয়া চুপ করিয়া বসিল।

"বিদায় দে মা ফিরে আসি :
বলতে কথা বুক ফাটে মা চোখের জলে ভাসি।"

স্তব্ধ হইয়া সে বসিয়া ছিল। তাহার সে স্তব্ধতা ভাঙিল রাজনের ক্রুদ্ধ চীৎকারে। সে সচকিত হইয়া উঠিল। রাজা কাহাকে দুর্দান্ত ক্রোধে ধমক দিতেছে—চোপ রহো!

পরক্ষণেই স্ত্রী-কণ্ঠে তীক্ষ্ণ কর্কশ ধ্বনি ধ্বনিত হইয়া উঠিল—চা-চিনি নিয়ে যাবে! কেনে? কিসের লেগে? লাজ নাই, হায়া নাই, বেহায়া, চোখখেগো মিনসে!

আর কথা শোনা গেল না, শোনা গেল দুপ-দাপ শব্দ, আর স্ত্রীকণ্ঠে আর্ত চীৎকার। রাজা নীরবে স্ত্রীকে প্রহার করিতেছে, রাজার স্ত্রী উচ্চ চীৎকারে কাঁদিতেছে। নিতাই ছি-ছি করিয়া সারা হইল। নাঃ, এই চায়ের পর্বটা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

—ওস্তাদ! ওস্তাদ! স্ত্রীকে প্রহার করিয়া সেই মুহূর্তটিতেই রাজা আসিয়া ঘরে ঢুকিল। —বানাও চা!—পন্‌রা ষোলা আদমীকে মাফিক। প্রায় পোয়াখানেক চা, আধসেরটাক চিনি সে নামাইয়া দিল। রাজার স্ত্রীর দোষ কি? এত অপব্যয় কেহ চোখে দেখিতে পারে? আর এত চা-চিনি হইবেই বা কি?

নিতাই গম্ভীরভাবে বলিল—রাজন!

রাজন নিতাইয়ের কথায় কানই দিল না, সে বাসার বাহিরে চলিয়া গেল, দুয়ারের সামনে দাঁড়াইয়া হাঁকিল—হো ভেইয়া লোক হো! হাঁ হাঁ, হিঁয়া আও। চলে আও সবলোক, চলে আও।

নিতাই বিস্মিত হইয়া উঠিয়া আসিল।

মেয়ে-পুরুষের একটি দল আসিতেছে। ঢোল, টিনের তোরঙ্গ, কাঠের বাক্স, পোঁটলা— আসবাবপত্র অনেক। মেয়েদের বেশভূষা বিচিত্র, পুরুষগুলিরও বিশিষ্ট একটা ছাপ-মারা চেহারা। এ ছাপ নিতাই চেনে।

—চা দাও ভাই, মরে গেলাম মাইরি! কথাটা যে বলিল, সে ছিল দলের সকলের পিছনে, দলটি দাঁড়াইতেই সে আসিয়া সকলের আগে দাঁড়াইল। একটি দীর্ঘ কৃশতনু গৌরাঙ্গী মেয়ে। অদ্ভুত দুইটি চোখ। বড় বড় চোখ দুইটার সাদা ক্ষেতে যেন ছুরির ধার,—সেই শাণিত-দীপ্তির মধ্যে কালো তারা দুইটা কৌতুকে অহরহ চঞ্চল। বৈশাখের মধ্যাহ্ন রৌদ্রের মধ্যে যেন নাচিয়া ফিরিতেছে মধুপ্রমত্ত দুইটা কালো পতঙ্গ—মরণজয়ী দুইটা কালো ভ্রমর।

রাজনের মুখের দিকে চাহিয়া মেয়েটা আবার বলিল—কই হে, কোথায় তোমার ওস্তাদ না ফোস্তাদ?

রাজন নিতাইকে দেখাইয়া বলিল—ওহি হামারা ওস্তাদ।

নিতাই অবাক হইয়া গিয়াছিল, সে ইহাদের সকল পরিচয় দেখিয়াই চিনিয়াছে,—ঝুমুরের দল। কিন্তু ইহারা আসিল কোথা হইতে? সে কথা নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিতে হইল না। রাজা নিজেই বলিল—

ট্রেনসে জোর করকে উতার লিয়া। হিঁয়া গাওনা হোগা আজ। তুমকো ভি গাওনা করনে হোগা ওস্তাদ।

মেয়েটা ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল—ও হরি, এই তুমারা ওস্তাদ নাকি? অ-মা-গ-অ! বলিয়াই সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; সে হাসির আবেগে তাহার দীর্ঘ কৃশ-তনু থরথর

করিয়া কাঁপিতে লাগিল। মেয়েটা শুধু মুখ ভরিয়া হাসে না, সর্বাঙ্গ ভরিয়া হাসে। আর সে হাসির কি ধার! মানুষের মনের মনকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ধূলায় ছুঁড়িয়া ছিটাইয়া ফেলিয়া দেয়।

নয়

জলের বুক ক্ষুর দিয়া চিরিয়া দিলেও দাগ পড়ে না, চকিতের মতন শুধু একটা রেখা দেখা দিয়াই মিলাইয়া যায় আর ক্ষুরটাও জলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। তেমনি একটি মৃদু হাসি নিতাইয়ের মুখে দেখা দিয়া ওই তরঙ্গময়ী কৃশতনু মেয়েটার কলরোল-তোলা হাস্যস্রোতের মধ্যে হারাইয়া গেল। নিতাইয়ের হাসি যেন ক্ষুর; কিন্তু ওই মেয়েটা যেন আবেগময়ী স্রোতোস্বিনী, তাহাকে কাটিয়া বসা চলে না। মেয়েটা বরং নিতাইয়ের হাসিটুকুর জন্য তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিল। সে কিছু বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু তাহার পূর্বেই নিতাই সবিনয়ে সমস্ত দলটিকে আহ্বান জানাইয়া বলিল—আসুন, আসুন, আসুন।

নিতাই বাড়ীর মধ্যে আগাইয়া গেল—সকলে তাহার অনুসরণ করিল। নিতাইয়ের বাসা —রেলওয়ে কুলি-ব্যারাক। লাইন কনস্ট্রাক্শনের সময় এখানেই ছিল ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের বড় অফিস, তখনকার প্রয়োজনে এই সমস্ত ব্যারাক তৈয়ারী হইয়াছিল, এখন সব পড়িয়াই আছে। দিব্য তকতকে সিমেন্ট বাঁধানো খানিকটা বারান্দা, এক টুকরা বাঁধানো আঙিনা; সেই দাওয়া ও আঙিনার উপরেই দলটি বসিয়া পড়িল।

দলটি একটি ঝুমুরের দল। বহু পূর্বকালে ঝুমুর অন্য জিনিস ছিল, কিন্তু এখন নিম্নশ্রেণীর বেশ্যা গায়িকা এবং কয়েকজন যন্ত্রী লইয়াই ঝুমুরের দল। আজ এখান, কাল সেখান করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, গাছতলায় আস্তানা পাতে, কেহ বায়না না করিলেও সন্ধ্যার পর পথের ধারে নিজেরাই আসর পাতিয়া গান-বাজনা আরম্ভ করিয়া দেয়। মেয়েরা নাচে, গায়—অশ্লীল গান। ভন্‌ভনে মাছির মত এ রসের রসিকরা আসিয়া জমিয়া যায়।

আসরে কিছু কিছু পেলাও পড়ে। রাত্রির আড়াল দিয়া মেয়েদের দেহের ব্যবসাও চলে। তবে ইহাই সর্বস্ব নয়, পুরাণের পালাগানও জানে, তেমন আসর পাইলে সে গানও গায়। যন্ত্রীদের মধ্যে নিতাইয়ের ধরণের দুই-একজন কবিয়ালও আছে, প্রয়োজন হইলে কবিগানের পাল্লায় দোয়ারকিও করে, আবার সুবিধা হইলে নিতাইয়ের মত কবিয়াল সাজিয়াও দাঁড়ায়।

দলটি ঘরে ঢুকিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া বলিল—বাঃ! গাছতলায় পথের ধারে আস্তানা পাতিয়া যাহারা অনায়াসে দিন রাত্রি কাটাইয়া দেয়, এমন বাঁধানো আঙিনা ও দাওয়া পাইয়া তাহাদের কৃতার্থ হইবার কথা—কৃতার্থ ই হইয়া গেল তাহারা। খুশী হইয়া তালপাতার চ্যাটাই বিছাইতে শুরু করিল। দীর্ঘ কৃশতনু মুখরা মেয়েটি কেবল সিমেন্ট বাঁধানো দাওয়ার উপর উঠিয়া সটান উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল, ঠাণ্ডা মেঝের উপর মুখখানি রাখিয়া শীতল স্পর্শ অনুভব করিয়া বলিল—আঃ! তাহার সে কণ্ঠস্বরে অসীম ক্লান্তি ও গভীর হতাশার কারুণ্য। সে যেন আর পারে না।

—বসন! মেয়েদের মধ্যে একজন প্রৌঢ়া আছে, দলের কর্ত্রী, সে-ই বলিয়া উঠিল—বসন, জর গায়ে ঠাণ্ডা মেঝের উপর শুলি কেন? ওঠ, ওঠ।

মেয়েটির নাম বসন্ত। বসন্ত সে কথার উত্তর দিল না, কণ্ঠস্বর একটু উচ্চ করিয়া বলিল—কই হে, ওস্তাদ না ফোস্তাদ! চা দাও-ভাই।

নিতাই চায়ের জল তখন চড়াইয়া দিয়াছে, সে বলিল—এই আর পাঁচ মিনিট। কিন্তু তোমার জ্বর হয়েছে—তুমি ঠাণ্ডা মেঝের ওপর শুলে কেন? একটা কিছু পেতে দোব?—মাদুর?

বসন্ত চোখ মেলিল না, চোখ বুজিয়াই খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—ওলো, নাগর আমার পীরিতে পড়েছে। নাগর শুধু নাগর নয়, পথের নাগর, দেখবামাত্র প্রেম! দরদ একেবারে গলায় গলায়। সঙ্গে সঙ্গে তাহার তরুণী সঙ্গিনীর দলও খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঠাকুরঝির সেই নতুন মগটিতে চা ঢালিয়া নিতাই সেই মগটি বসন্তের মুখের সম্মুখে নামাইয়া দিয়া বলিল—বুঝে খেয়ো, চায়ের সঙ্গে যোগবশের রস দিয়েছি। কবিয়াল নিতাই রসের কারবারী, রসিকতার এমন ধারালো প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাত্র পাইয়া সে মুহূর্তে মাতিয়া উঠিল।

চায়ের গন্ধ পাইয়া ও স্টিলের মগের শব্দ শুনিয়া তৃষ্ণার্তের মত আগ্রহে বসন্ত ইতিমধ্যেই উঠিয়া বসিয়াছিল, সে মুখ মচকাইয়া হাসিয়া নিতাইয়ের মুখের দিকে বড় বড় চোখ দুইটা মেলিয়া চাহিয়া বসিল—বল কি নাগর! পীরিতে কুলোল না, শেষে যোগবশ!

অপর সকলকে চা পরিবেশন করিতে করিতে নিতাই গান ধরিয়া দিল—

"প্রেমডুরি দিয়ে বাঁধতে নারলেম হায়,
চন্দ্রাবলীর সিঁদুর শ্যামের মুখচাঁদে!
আর কি উপায় বৃন্দে—এইবার এনে দে এনে দে—
বশীকরণ লতা— বাঁধবে ছাঁদে ছাঁদে।"

গানটা কিন্তু নিতাইয়ের বাঁধা নয়, নিতাইয়ের আদর্শ কবিয়াল তারণ মোড়লের বাঁধা গান; নিতাইয়ের মুখস্থ ছিল।

ঝুমুর দলের মেয়ে, সমাজের অতি নিম্নস্তর হইতে ইহাদের উদ্ভব, আক্ষরিক কোন শিক্ষাই নাই; কিন্তু সঙ্গীতব্যবসায়িনী হিসাবে একটা অদ্ভুত সংস্কৃতি ইহাদের আছে। পালাগানের মধ্য দিয়া ইহারা পুরাণ জানে, পৌরাণিক কাহিনীর উপমা দিয়া ব্যঙ্গ শ্লেষ করিলে বুঝিতে পারে, প্রশংসা সহানুভূতিও উপলব্ধি করে। নিতাইয়ের গানের অর্থ বসন্ত বুঝিতে পারিল, তাহার চোখ দুইটা একেবারে শাণিত ক্ষুরের মত ঝকমক করিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই মুখ নামাইয়া চায়ের কাপে চুমুক দিল।

পুরুষদলের একজন বলিল—ভাল। ওস্তাদ, ভাল!

অন্যজন সায় দিল—হ্যাঁ, ভাল বলেছ ওস্তাদ।

—হ্যাঁ। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অন্য একটি মেয়ে বলিল—হ্যাঁ, ময়না বলে ভাল। নিতাইয়ের গানের অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গ, এক বসন্ত নয়—মেয়েদের সকলেরই গায়ে লাগিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে বসন আবার বলিয়া উঠিল—"উনোন ঝাড়া কালো কয়লা—আগুন তাতে দিপি দিপি! ছেঁকা লাগে!"

নিতাই হাসিয়া বলিল—না ভাই, ছেঁকা কি দিতে পারি! আর তোমার সঙ্গে আমার কি পীরিত হয়, না হতে পারে? তুমি ফোটা ফুল আমি ধুলো। ফুলের পথের নাগর তো ধুলো।—বলিয়াই গুনগুন করিয়া ধরিয়া দিল—

ফুলেতে ধূলাতে প্রেম হয় নাকো ফুল ফোটার কালে!
ফুল ফোটে সই আকাশমুখে চাঁদের প্রেমে হেলেদুলে।
ধূলা থাকে মাটির বুকে, চরণতলে অধোমুখে
ফুল ঝরিলে করে বুকে
সেই লেখা তার পোড়া কপালে।

বল বটে কিনা?

বসন্ত বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। লোকটা কি?

প্রৌঢ়া বিচারকের মতো স্মিতহাসি হাসিয়া বলিল—তা তোদের হার হল বাছা। জবাব তোরা দিতে নারলি। তা বাবা কি এ সব গান মুখে মুখে বেঁধে সুর দিয়ে গাইছ?

নিতাই সবিনয়ে বলিল—খানিক আদেক চেষ্টা করি। দু'চারটে আসরে কবি-গানও করেছি। গানটা আমার বাঁধাই বটে।

প্রৌঢ়া বলিল—পদখানি তো খড় ভাল বাবা!

নিতাই হাতজোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিল—তাঁর দয়া।

বসন্ত কোন কথা বলিল না, চা-টুকু নিঃশেষে পান করিয়া মগটা নামাইয়া দিয়া আবার সে মাটিতে লুটাইয়া শুইয়া পড়িল। রাজা সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকিল, তাহার দুই হাতে হাঁড়ি-মালসা, বগলে শালপাতার বোঝা। মিলিটারী রাজা—হুকুমের সুরেই ব্যবস্থা জানাইয়া দিল—ভেইয়া লোক, ও-হি বটতলামে জায়গা সাফ হো গিয়া, আব খানা-উনা পাকা লিজিয়ে।

এক সময় রাজাকে একা পাইয়া নিতাই চুপি চুপি প্রশ্ন করিল—রাজন, এই সব খরচপত্র করছ—

রাজার সময় অত্যন্ত কম এবং সংসারে গোপনও কিছু নাই। সে বাধা দিয়া স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠেই—বলিল—সব ঠিক হ্যায় ভাই, সব ঠিক হ্যায়। বেনিয়া মামা আট আনা দিয়া, কয়লাওয়ালা চার আনা, মুদী আট আনা, মাস্টারবাবু আট আনা, গুদামবাবু আট আনা,—গাডবাবু আট আনা, মালগাড়ীকে 'ডেরাইবর' আট আনা, হামারা এক রুপেয়া; বাস, জোড় লেও। তুমারা এক রুপেয়া,—উলোককে আড়াই রুপেয়া, বারো আনাকে চাউল ডাউল। বাস্, হো গিয়া।

সঙ্গে সঙ্গেই সে চলিয়া গেল, ওদিকে শান্টিং লাইন হইতে একখানা গাড়ী কুলিরা ঠেলিয়া প্রায় পয়েণ্টের কাছে লইয়া গিয়াছে।

নিতাই গাছতলায় আসিয়া দাঁড়াইল; ভ্রাম্যমান সম্প্রদায়টি ইতিমধ্যেই অত্যন্ত ক্ষিপ্র নিপুণতার সহিত গাছতলায় সংসার পাতিয়া ফেলিল; উনান পাতিয়া তাহাতে আগুন দিল, একটি মেয়ে জল আনিল, একজন তরকারি কুটিতে বসিল, প্রৌঢ়া উনানের সম্মুখে বসিয়া মাটির হাঁড়ি ধুইয়া ফেলিয়া চড়াইয়া দিল কিছুক্ষণের মধ্যে। পুরুষেরা তেল মাখিতে বসিল; মেয়েদের স্নান তখন হইয়া গিয়াছে, সকলেরই ভিজা খোলা চুল পিঠে পড়িয়া আছে, প্রান্তে একটি করিয়া গেরো বাঁধা। সেখানে ধারে কাছে কেহ নাই কেবল সেই কৃশতনু গৌরাঙ্গী ক্ষুরধার মেয়েটি। নিতাইকে ডাকিয়া প্রৌঢ়া তাহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া বলিল—ব'স বাবা, ব'স।

পুরুষ কয়জন প্রায় একসঙ্গেই বলিয়া উঠিল—তাই তো, আপনি দাঁড়িয়ে কেন গো? বসুন!

উনানে একটা কাঠ গুঁজিয়া দিয়া প্রৌঢ়া বলিল—খাসা গলা আমার বাবার। তারপর মুখের দিকে চাহিয়া স্মিতহাসি হাসিয়া বলিল—এই 'নাইনেই' থাকবে বাবা? না, কাজকম্মও করবে—এও করবে?

—এই 'নাইনেই' থাকবারই তো ইচ্ছে; তা দেখি।

—বিয়ে-টিয়ে করেছ? ঘরে কে আছে?

—বিয়ে! নিতাই হাসিল, হাসিয়া বলিল—ঘরে মা আছে, বুন আছে; মা বুনের কাছেই থাকে। আমি একা।

—তবে আমাদের দলে এস না কেনে?

নিতাই কিন্তু এ কথার উত্তর চট্ করিয়া দিতে পারিল না। সম্মতি দিতে গিয়া মনে পড়িয়া গেল রাজাকে—মনে পড়িয়া গেল ভুঁইচাঁপার শ্যামল সরস ডাঁটাটির মত কোমল শ্রীময়ী ভক্ত মেয়েটি—ঠাকুরঝিকে। সে চুপ করিয়াই রহিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া প্রৌঢ়া আবার প্রশ্ন করিল—কি বলছ বাবা?

—বাবা ভাবছে তোমার মনের মানুষের কথা। সঙ্গে সঙ্গে খিল-খিল হাসি। নিতাই পিছন ফিরিয়া দেখিল, ভিজা কাপড়ে দাঁড়াইয়া সদ্যঃস্নাতা বসন্ত। মেয়েটা স্নান করিয়া চুল গা মোছে নাই, চুল পর্যন্ত ঝাড়ে নাই। ভিজা চুল হইতে তখনও জল গড়াইয়া পড়িতেছে। নিতাই অবাক হইয়া গেল।

—বউ কেমন হে? বশীকরণের লতায় ছাঁদে ছাঁদে বেঁধেছে বুঝি!

নিতাই এতক্ষণে সবিস্ময়ে বলিল—জ্বর গায়ে তুমি চান ক'রে এলে?

—ধুয়ে দিয়ে এলাম। চন্দ্রাবলীর প্রেমজ্বর কিনা! বলিয়াই সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সিক্তবাসের স্বচ্ছতার আড়ালে তাহার সুপরিস্ফুট সর্বাঙ্গও হাসিয়া উঠিল। নিতাইয়ের লজ্জা হইল।

প্রৌঢ়া বলিল—তাই তো বটে! চান করে এলি? ছাড়, ছাড়, ভিজে কাপড় ছাড় বসন। তুই কোন্ দিন মরবি ওই ক'রে।

বিচিত্র হাসিয়া বসন বলিল—ফেলে দিও টেনে। তা ব'লে চান না ক'রে থাকতে পারি না। চান না করলে—মা-গো! গায়ে যা বাস ছাড়ে।

একটি তরুণী মুচকি হাসিয়া বলিল—চুল ফেরে না লতায় পাতায়, তা বল!

বসন হাত দিয়া মাথার চুলে চাপ দিতে দিতে বলিল—আমার তো আর কেশ দিয়ে নাগরের পা মুছতে হয় না, তা চুল না ফিরিয়ে করব কি?

বহুপরিচর্যাই ইহাদের ব্যবসা, কিন্তু নারীচিত্তের স্বভাবধর্মে একটি বিশেষ অবলম্বন ভিন্নও ইহারাও থাকিতে পারে না; সঙ্গের পুরুষগুলির মধ্যেই দলের প্রত্যেক মেয়েটিরই প্রেমাস্পদ জন আছে। সেখানে মান-অভিমান আছে, সাধ্য-সাধনাও আছে। কিন্তু বসন্তের প্রেমাস্পদ কেহ নাই, সে কাহাকেও সহ্য করিতে পারে না। কেহ পতঙ্গের মত তার শাণিত দীপ্তিতে আকৃষ্ট হইয়া কাছে আসিলে মেয়েটার ক্ষুরধারে তাহার কেবল পক্ষচ্ছেদই নয়, মর্মচ্ছেদও হইয়া যায়। তাই বসন্ত সঙ্গিনীকে এমন কথা বলিল। ফলে ঝগড়া একটা বাধিয়া উঠিবার কথা; আহত মেয়েটি ফণা তুলিয়াও উঠিয়াছিল; কিন্তু দলের নেত্রী প্রৌঢ়া মাঝখানে পড়িয়া কথাটা ঘুরাইয়া দিল। হাসিয়া বলিল—ও বসন, শোন শোন, দেখ আমাদের ওস্তাদকে পছন্দ হয় কিনা!

তাহার কথা শেষ হইল না, বসন্তের উচ্চ উচ্ছল হাসিতে ঢাকা পড়িয়া গেল। নিতাই

থামিয়া উঠিল। প্রৌঢ়া ধমক দিয়া বলিল—মরণ! এত হাসছিস কেনে?

হাসি থামাইয়া বসন্ত বলিল—মরণ তোমার নয়, মরণ আমার!

—কেন?

—মা গো! ও যে বড্ড কালো; মা—গ!

সকলে নির্বাক হইয়া রহিল।

বসন্ত আবার বলিল—কালো অঙ্গের পরশ লেগে আমি সুদ্ধ কালো হয়ে যাব মাসী। মুখ বাঁকাইয়া সে একটু হাসিল, তারপর আবার বলিল—যাই, শুকনো কাপড় পরে আসি। 'নিমুনি' হ'লে কে করবে বাবা! সে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া গেল।

একটি মেয়ে বলিল—মরণ তোমার; গলায় দড়ি।

প্রৌঢ়া ধমক দিল—চুপ কর বাছা। কোঁদল বাঁধাস নে।

মেয়েটি একেবারে চুপ করিল না, আপন মনেই মৃদুস্বরে গজগজ করিতে আরম্ভ করিল। নিতাই আপন মনে মুচকি মুচকি হাসিতেছিল। হাসিতেছিল ওই গৌরগরবিনীর রকম সকম দেখিয়া। মেয়েটা ভাবে তাহার ওই সোনার মত বরণের ছটায় দুনিয়ার চোখ ধাঁধিয়া গিয়াছে। সবাই উহাকে পাইবার জন্য লালায়িত। হায়! হায়! হায়!

প্রৌঢ়া আবার কথাটা পাড়িল—বলি হাঁ গো, ও ছেলে!

—আমাকে বলছেন?

—হ্যাঁ। ছেলেই বলবো তোমাকে। অন্য লোক বলে—ওস্তাদ। রাগ করবে না তো বাবা?

—না-না। রাগ করব কেনে! মাসীর এ কথাটি তাহার বড় ভাল লাগিল।

—কি বলছ? এই 'নাইনেই' যখন থাকবে, তখন এস না আমাদের সঙ্গে।

—না। নিতাইয়ের কণ্ঠস্বর দৃঢ়।

সকলেই চুপ করিয়া রহিল। নিতাই উঠিল,—তা হ'লে আমি যাই এখন; আমাকেও রান্নাবান্না করতে হবে।

—ওহে কয়লা-মাণিক! বসন্তর কণ্ঠস্বর। নিতাই ফিরিয়া চাহিল। ইতিমধ্যেই বসন্ত বিন্যাস করিয়া চুল আঁচড়াইয়াছে—বিন্যাস করিবার মত চুলও বটে মেয়েটির। ঘন একপিঠ দীর্ঘ কালো চুল! কপালে সিঁদুরের টিপ, পরনে ধপধপে লাল নক্সিপাড় মিলের শাড়ী।

বসন্ত হাসিয়া বলিল—তোমার নাম দিয়েছি ভাই কয়লা-মাণিক। কালো মাণিক কি বলতে পারি? সে হাতজোড় করিয়া কালো-মাণিককে প্রণাম করিল।

নিতাই হাসিয়া বলিল—ভাল ভাল! তা বেশ তো! ময়লা-মাণিক বলতেও পার।

—সে ওই কয়লাতেই আছে। বসন্ত মুখ বাঁকাইয়া হাসিল।

নিতাই বলিল—তা' আছে কিন্তু ময়ে—ময়ে—মিল নাই। ওতে কথাটা মিষ্টি হয়। গানের কান আছে তাই বললাম। কালা হলে বলতাম না। বল কি বলছ?

—আমার একটি কাজ করে দেবে?

—কি, বল?

—চার পয়সার মাছ এনে দেবে? আমার আবার মাছ নইলে রোচে না। দেবে এনে?

—দাও। নিতাই হাত পাতিল। কিন্তু বসন্ত পয়সা দিতে হাত বাড়াইতেই সে আপনার

হাতখানি অল্প সরাইয়া লইল, বলিল—আলগোছে ভাই, আলগোছে।

—কেনে? চান করতে হবে নাকি? মেয়েটার ঠোঁটের কোণ দুইটা যেন গুণ-দেওয়া ধনুকের মত বাঁকিয়া উঠিল।

নিতাই হাসিয়া বলিল—কয়লার ময়লা লাগবে ভাই, তোমার রাঙা হাতে।

বসন্তের হাতের পয়সা আপনি খসিয়া নিতাইয়ের হাতে পড়িয়া গেল। মুহূর্তে ধনুকের গুণ যেন ছিঁড়িয়া গেল। তাহার অধরপ্রান্ত থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পরমমুহূর্তেই সে কম্পন তাহার বাঁকা হাসিতে রূপান্তর গ্রহণ করিল। দেখিয়া নিতাইয়ের বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না। মনে হইল মেয়েটা যেন গল্পের সেই মায়াবিনী। প্রতিদ্বন্দ্বী সাপ হইলে সে বেজী হয়; বিড়াল হইয়া বেজীরূপিণী তাহাকে আক্রমণ করিলে বেজী হইতে সে হয় বাঘিনী। কান্না তাহার বাঁকা হাসিতে পাল্টাইয়া গেল মুহূর্তে। হাসিয়া সে বলিল—সেই জন্যে আলগোছে দিলাম।

জেলে-পাড়ার পথে নিতাইয়ের মনে গান জাগিয়া উঠিল। নূতন গান। মনে মনে ভাবিয়া সে ওই মেয়েটার একটা তুলনা পাইয়াছে। শিমুলফুল। গুন-গুন করিয়া সে কলি ভাঁজিতে আরম্ভ করিল—আহা!

'আহা—রাঙাবরণ শিমুলফুলের বাহার শুধু সার।'

দশ

সন্ধ্যায় রাজা বেশ সমারোহ করিয়া আসর পাতিল। রাজা পরিশ্রম করিল সেনাপতির মত; বিপ্রপদ বসিয়া ছিল রাজা সাজিয়া। বেচারা বাতব্যাধিতে আড়ষ্ট শরীর লইয়া নাড়া-চাড়া করিতে পারে না, চীৎকারেই সে সোরগোল তুলিয়া ফেলিল। অবশ্য কাজও অনেকটা হইল। মুদী, কয়লাওয়ালা বিপ্রপদর ব্যঙ্গশ্লেষের ভয়ে শতরঞ্চি বাহির করিয়া দিল, বণিক মাতুল তাহার পেট্রোম্যাক্স আলোটা আনিয়া নিজেই তেল পুরিয়া জ্বালিয়া দিল। লোকজনও, মন্দ কেন—ভালই হইল। সম্ভ্রান্ত ভদ্র ব্যক্তিরা কেহ না আসিলেও দোকানদার শ্রেণীর লোকেরাই হংসশ্রোতার মত যথাসাধ্য সাজিয়া-গুজিয়া জাঁকিয়া বসিল, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা একেবারে ভিড় জমাইয়া চারিদিক ঘিরিয়া দাঁড়াইল। মাঝখানে আসর পড়িল ঝুমুর নাচের; নিতাই প্রত্যাশা করিয়াছিল উহাদের দলের কবিয়ালের সঙ্গে একহাত লড়িবে অর্থাৎ গাওনার পাল্লা দিবে। অনেক ঝুমুর দলের সঙ্গে এক একজন নিম্নস্তরের কবিয়াল থাকে—স্বতন্ত্রভাবে গাওনা করিবার যোগ্যতা না-থাকা হেতু ওই ঝুমুর দলকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহারা। পথে কোন গ্রামে বা মেলায় এমনি ধারার ঝুমুর দলের দেখা পাইলে পাল্লা জুড়িয়া দেয়। মেলায় ঝুমুরের সহিত কবির আসর যোগ হইলে আসরও জোরালো হয়। এ দলেরও এমন একজন কবিয়াল আছে। কিন্তু সে আজ দলের সঙ্গে আসে নাই। কাজের জন্য পিছনে পড়িয়া আছে। দলটার গন্তব্যস্থান আলেপুরের মেলা। কথা আছে, দুই দিন পরে সে সেইখানে গিয়া জুটিবে। নহিলে নিতাই একটা আসর পাইত। কবিয়ালের অভাবে আসর বসিল

শুধু নাচগানের। ঢোল, ডুগি তবলা, হারমোনিয়ম, একটা বেহালা লইয়া ঝুমুর দলের পুরুষেরা আসর পাতিয়া বসিল। তাহাদের তেল-চপচপে চুলে বাহারের টেরী, গায়ে রংচঙে ছিটের ময়লা জামা। মেয়েদের গায়ে গিল্‌টির গয়না—কান, ঝাপটা, হার, তাগা, চুড়ি, বালা; পরনে সস্তা কাপড়ের বাতিল ফ্যাশানের বডিস, রঙিন কাপড়। কেশবিন্যাসের পারিপাট্যে আধুনিকতা অনুকরণের ব্যর্থ অপকৃষ্ট ভঙ্গি। ঠোঁটে-গালে লালরঙ, তার উপর সস্তা পাউডার এবং স্নো'র প্রলেপ, পায়ে আলতা, হাতেও লাল রঙের ছোপ। দর্শকদের মনে কিন্তু ইহাতেই চমক লাগিতেছে। মেয়েগুলির মধ্যে বসন্তই ঝলমল করিতেছে, মেয়েটার সত্যই রূপ আছে। তার সঙ্গে রুচিও আছে। মেয়েটা সাজিয়াছে বড় ভাল। কবিয়াল নিতাই ফরসা কাপড় জামার উপর চাদরখানি গলায় দিয়া ঝুমুর দলেরই গা ঘেঁষিয়া বসিল। মুখে তাহার গৌরবের হাসি। এ আসরে সে বিশিষ্ট ব্যক্তি কারণ সে কবিয়াল!

গাঁওনা আরম্ভ হইল। খেমটার অনুকরণে নাচ ও গান। মেয়েরা প্রথমে গান ধরে, মেয়েদের পরে দোয়ারেরা সেই গানেরই পুনরাবৃত্তি করে, মেয়েরা তখন নাচে। একালে খেমটা নাচের প্রসার দেখিয়া তাহাদের ঝুমুর নাচ ছাড়িয়া এই ধরিয়াছে। কিছুটা অবশ্য ঝুমুরের রঙ রাখিয়াছে। সেটুকু সবই অশ্লীলতা।

প্রৌঢ়া মধ্যস্থলে পানের বাটা লইয়া বসিয়াছিল, সে নিতাইকে বলিল—বাবা, তুমিও ধর।

নিতাই হাসিল। কিন্তু দোয়ারদের সঙ্গে সে গান ধরিল না। প্রথম গানখানা শেষ হইতেই মেয়েরা বিশ্রামের জন্য বসিল। সঙ্গে সঙ্গে নিতাই উঠিয়া পড়িল। কবিয়ালের ভঙ্গিতে চাদরখানা কোমরে বাঁধিয়া সে হাতজোড় করিয়া বলিল—আমি একটি নিবেদন পাই।

চারিদিকে নানা কলরব উঠিয়া পড়িল।

—সঙ নাকি?

—ব'স ব'স!

—এই নিতাই!

একজন রসিক বলিয়া উঠিল—গোঁফ কামিয়ে এস! গোঁফ কামিয়ে এস!

অকস্মাৎ সকল কলরবকে ছাপাইয়া রাজা হুঙ্কার দিয়া উঠিল—চোপ সব, চোপ।

বিপ্রপদও একটি ধমক ঝাড়িল—অ্যা—ও!

সকলে চুপ করিয়া গেল। নিতাই সুযোগ পাইয়া বলিল—আমি একপদ গাইব আপনাদের কাছে।

—লাগাও ওস্তাদ, লাগাও। রাজার কণ্ঠস্বর।

নিতাই গান ধরিয়া দিল। বাঁ হাতটি গালে দিয়া, ডান হাতটি মুখের সম্মুখে রাখিয়া অল্প ঝুঁকিয়া আরম্ভ করিল—

"আহা রাঙাবরণ শিমুলফুলের বাহার শুধু সার—
ওগো সখি দেখে যা বাহার।"

কলিটা প্রথম দফা গাহিয়া ফেরতার সময় সে হাতে তালি দিয়া তাল দেখাইয়া বলিল—এই—এই,—এই বাজাও তবলাদার!—বলিয়াই সে আবার ধরিল—

"শুধুই রাঙা ছটা, মধু নাই এক ফোঁটা, গাছের অঙ্গে কাঁটা খরধার।
মন-ভোমরা যাস্ নে পাশে তার।"

নিতাইয়ের কণ্ঠস্বরখানি মধুর এবং ভরাট, এক মুহূর্তে মানুষের মন দখল করিয়া লয়।

লইলও তাই। লোকের আপত্তি গ-য়ে গোমাতার মত গানে, কিন্তু এখানে তাহার আভাস না পাইয়া লোকে জমিয়া বসিল।

রাজা বাহবা দিয়া উঠিল—বাহা রে ওস্তাদ, বাহা রে!

বিপ্রপদও দিল—বহুত আচ্ছা।

বণিক মাতুল বলিল—ভাল, ভাল।

লোকেও বাহবা দিল।

নিতাই উৎসাহে মৃদু মৃদু নাচিতে আরম্ভ করিল। একবার চারিদিকে দৃষ্টি বুলাইয়া লইল, মুখে তাহার মৃদু হাসি। রাজার পিছনেই রাজার স্ত্রী, তাহার পাশে ঠাকুরঝি। শ্রদ্ধান্বিত বিস্ময়ে সে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। মুহূর্তের জন্য নিতাই গান ভুলিয়া গেল, ঠাকুরঝিকে অবহেলা দেখাইলেও ঠাকুরঝি তাহাকে অবহেলা করে নাই। তাহার গৌরবের গোপন অংশ লইতে সে আসিয়াছে। মুহূর্তের জন্য সে গানের খেই হারাইয়া ফেলিল।

ঝুমুর দলের ঢুলীটা সুযোগ পাইয়া ঢোলে কাঠি মারিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ এই কাটল। অর্থাৎ নিতাইয়ের তাল কাটিয়া গেল। মুহূর্তে নিতাই সজাগ হইয়া গান ছাড়িয়া দিয়া হাতে তালি দিয়া বলিল—গান নয়, এবার ছড়া।

হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ বলিয়া তালি মারিতে মারিতে পুনরায় ধরতার মুখে ধরিয়া দিল—

"ফল ধরে না ধরে তুলো, চালের বদলে চুলো—"

সঙ্গে সঙ্গে সে নাচিতে শুরু করিল। পরের কলি ভাবিবার এই অবকাশ। নাচিতে নাচিতে সে ফিরিয়া চাহিল—আসরের দিকে। ঝুমুর দলের মেয়েগুলি মুখ টিপিয়া হাসিতেছে—কেবল বসন্তর চোখে খেলিতেছে ছুরির ধার। নিতাই তাহার দিকে চাহিয়াই ছড়া কাটিল—

"ফুলের দরে তা বিকালো, মালা হ'লো গলার।"

নিতাইয়ের সঙ্গে চোখোচোখি হইতেই বসন্ত যেন ক্ষেপিয়া গেল। সে উঠিয়া দাঁড়াইল, প্রৌঢ়াকে বলিল—আমি চললাম মাসী। শিমুল ফুলের অর্থ সে বুঝিয়াছে।

—কোথায়?

—বাসায়, ঘুমুতে।

—ঘুমুতে!

—হ্যাঁ।

—তুই কি ক্ষেপেছিস নাকি? ব'স।

—না। এ আসরে আমি গান গাই না। যে আসরে বাঁদর নাচে সে আসরে আমি নাচি না।

বেশ উচ্চকণ্ঠেই কথা হইতেছিল। নিতাই মুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া গেল। দর্শকেরা অধিকাংশই চীৎকার করিয়া উঠিল—এই, এই, তুমি থাম।

চটিয়া উঠিল রাজা, সে উঠিয়া দাঁড়াইল—কেয়া?

বসন্ত কোনও উত্তরই দিল না, কেবল একবার ঘাড় বাঁকাইয়া নিতান্ত তাচ্ছিল্যভরে একটা চকিত দৃষ্টি হানিয়া আসর হইতে বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিল। চারিদিকে একটা রোল উঠিল, কেহ নিতাইয়ের উপর চটিয়া চীৎকার শুরু করিল, কেহ অর্থের চুক্তিতে আবদ্ধ ঘৃণিত পথচারিণী মেয়েটার দুর্বিনীত স্পর্ধায় ক্রুদ্ধ হইয়া আস্ফালন তুলিল। কিন্তু মেয়েটা কোন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিল না; সম্মুখের মানুষটিকে বলিল—পথ দাও তো ভাই।

সে পথ ছাড়িয়া দিত কি দিত না কে জানে, কিন্তু সে কিছু করিবার পূর্বেই পিছন হইতে

সম্মুখে আসিয়া পথ-রোধ করিয়া দাঁড়াইল নিতাই। হাত জোড় করিয়া সে হাসিমুখে বিনয় করিয়া বলিল—আমার দোষ হয়েছে। যেও না তুমি, ব'স। আমার মাথা খাও!

বসন্ত কথার উত্তর দিল না, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া আসরে বসিল। গোলমাল একটু স্তিমিত হইতেই সে উঠিয়া গান ধরিল। গানখানি বাছাই করা গান। ভদ্রজনের আসরে যেখানে খেউর গাওয়া চলে না সেইখানে গাওয়ার জন্য তাহাদের ভাণ্ডারে মজুত আছে। গানখানি বসন্তর বড় প্রিয়; নাচের সঙ্গে কোথায় যেন যোগ আছে। বাছিয়া তাই সে এই-খানাই ধরিল—

ঝুম ঝুমাঝুম বাজে লো নাগরী;
নূপুর চরণে মোর। ও সে থামিতে না চায় গো।
তোরা আয় গো!
জল ফেলে কাঁখে তুলে নে গো সখি গাগরী।
রজনী হইল ভোর;—আয় সখি আয় গো; নিশি যে ফুরায় গো!
নূপুর চরণে মোর থামিতে না চায় গো!
ঝুম ঝুমাঝুম, ঝুমাঝুম ঝুমাঝুম!

ঝুম ঝুমাঝুমের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করিল নাচ। আসরটা স্তব্ধ হইয়া গেল। এমন কি ক্রুদ্ধ রাজা পর্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গেল। মেয়েটার রূপ আছে, কণ্ঠও আছে। ছুরির ধারের মত উচ্চ সু-কণ্ঠ। তাহার উপর মেয়েটা যেন গান ও নাচের মধ্যে নিজেকে ঢালিয়া দিয়াছে। দ্রুত হইতে দ্রুততর তানে লয়ে সঙ্গীত ও নৃত্য শেষ করিয়া মুহূর্তে একটি পূর্ণচ্ছেদের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইল; এতক্ষণে আসরে রব উঠিল—বাহবার রব। চারিদিক হইতে 'পেলা' পড়িতে আরম্ভ হইল—পয়সা, আনি, দোয়ানি, সিকি, দুইটি আধুলি; দোকানী ঘনশ্যাম দত্ত একটা টাকাই ছুঁড়িয়া দিল। মেয়েটার সেদিকে লক্ষ্য করিবার বোধ হয় অবসর ছিল না, তাহার সর্বাঙ্গে ঘাম দেখা দিয়াছে, বুকখানা হাপরের মত হাঁপাইতেছে; গৌরবর্ণ মুখখানা রক্তোচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। প্রৌঢ়া নিজে উঠিয়া পেলাগুলি কুড়াইয়া লইল।

চারিদিক হইতে রব উঠিল—আর একখানা, আর একখানা!

নিতাই বসন্তর দিকে চাহিল, চোখে চোখে মিলিতেই নমস্কার করিয়া সে তাহাকে অভিনন্দিত করিল।

প্রৌঢ়া বসন্তর গায়ে হাত দিয়া বলিল—ওঠ্! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শিহরিয়া উঠিল,—এ কি বসন, জ্বর যে আজ অনেকটা হয়েছে!

হাসিয়া বসন বলিল—একটুকুন মদ থাকে ত দাও।

সামান্য আড়াল দিয়া খানিকটা নির্জলা মদ গিলিয়া সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু প্রথমবারের মত গতি বা আবেগ কিছুই আনিতে পারিল না, সে হাঁপাইতেছিল, গতির মধ্যে ক্লান্তির পরিচয় সুপরিস্ফুট। গান ধরিয়াও গাহিতে পারিল না; দোহারেরা গাহিল। তেহাই পড়িতেই নাচ শেষ করিয়া সে শিথিল ক্লান্ত পদক্ষেপে আসর হইতে বাহির হইয়া গেল। কেহ কোন কথা বলিল না, যেন তাহাদের দাবি ফুরাইয়া গিয়াছে, চোখের উপর দেনা-পাওনার ওজন-দাঁড়িতে তাহার দুইখানা গান ও নাচের ভার তাহাদের পেলার ভারকে তুচ্ছ করিয়া পাথরের ভারে মাটির বুকে চাপিয়া বসিয়াছে। পথের ধারে যাহারা দাঁড়াইয়া ছিল তাহারা আরও একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া পথ পরিষ্কার করিয়া দিল।

প্রৌঢ়া নিতাইকে বলিল—দেখ তো বাবা! আচ্ছা একগুঁয়ে মেয়ে!

নিতাইও বাহির হইয়া আসিল। চারিদিকে চাহিয়া সে বসন্তর সন্ধান করিল। মনে মনে এই মেয়েটির কাছে সে হার মানিয়াছে। 'শিমুল' ফুল বলা তাহার অন্যায় হইয়াছে—অন্যায় নয়, অপরাধ। নূতন গানের কলি তাহার মনের মধ্যে গুনগুনানি আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু বসন্ত গেল কোথায়? ঝুমুর দলের বাসা তো এই বটগাছতলা। গাছতলাটায় একখানা চ্যাটাইয়ের উপর বসিয়া আছে একটা পুরুষ—দলের মধ্যে শক্তিশালী পুরুষটা। মহিষের মত প্রচণ্ড আকার, তেমনি কালো, রাঙা গোল চোখ; বোবার মত নীরব; তৃষ্ণার্ত মহিষ যেমন করিয়া জল খায়—তেমনি করিয়া মদ খায়, সারাদিন শুইয়া থাকে, সন্ধ্যার পর হইতে পড়ে তাহার জাগরণের পালা। আগুন জ্বালিয়া আগুনের সম্মুখে বসিয়া লোকটা জিনিসপত্র আগলাইতেছে। সেখানে নিতাই দেখিল বসন্ত নাই। সে জ্যোৎস্নালোকিত চারিদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিল। এ কি! তাহার বাসার দরজায় কয়জন লোক দাঁড়াইয়া কেন? সে আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল—কে?

—আমরা।

নিতাই চিনিল, ব্যাপারী কাসেদ সেখের ছেলে—নয়ান ওরফে ননাইয়ের দল। সে প্রশ্ন করিল—কি? এখানে কি?

—মেয়েটা তোর বাসায় এসে ঢুকেছে।

—এসেছে তা'—তোমরা দাঁড়িয়ে কেনে?

দলকে দল অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল।

নিতাই বলিল—যাও তোমরা এখান থেকে। নইলে হাঙ্গামা হবে। আমি রাজাকে ডাকব, কনেস্টবল আছে—তাকে ডাকব। নয়ান সেখ নিতাইকে গ্রাহ্য করে না, কিন্তু রাজাকে গ্রাহ্য করে; সে তবুও বলিল—শোন্ না, তোকে বকশিশ করব। নেতাই!

নিতাই একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি হানিয়া বাড়ী ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু কোথায় বসন্ত? কোথাও তো নাই। কিন্তু ঘরের দরজার শিকল খোলা। দরজায় হাত দিয়া সে দেখিল—হ্যাঁ, দরজা ভিতর হইতে বন্ধ।

নিতাই ডাকিল—ওহে ভাই, শুনছ? আমি—আমি।

—কে?

—তোমার 'কয়লা-মাণিক'।

—কে! ওস্তাদ?

—ওস্তাদ কি ফোস্তাদ যা বল তুমি।

এবার দরজাটা খুলিয়া গেল। নিতাই ঘরে ঢুকিয়া দেখিল—বসন্ত ততক্ষণে আবার শুইয়া পড়িয়াছে। তাহারই বিছানাটা পাড়িয়া দিব্য আরাম করিয়া শুইয়াছে। বসন্তই বলিল—দরজাটা বন্ধ ক'রে দাও।

—বাইরের দরজা বন্ধ আছে।

—পাঁচিল টপকে ঢুকবে ভাই—বন্ধ কর। বসন্ত ক্লান্ত অথচ বিচিত্র হাসি হাসিল। নিতাই তাহার কপালে হাত দিয়া চমকাইয়া উঠিল—এ কি? এ যে অনেকটা জ্বর!

—মাথাটা একটু টিপে দেবে?

হাসিয়া নিতাই মাথা টিপিতে বসিল। বসন্ত হাসিয়া বলিল—না, তুমি ফোস্তাদ নও, ভাল ওস্তাদ—গানখানি কিন্তুক খাসা। তোমার বাঁধা?

—হ্যাঁ। কিন্তু ও গানটা বাতিল করে দিলাম!

—কেনে ? চোখ বন্ধ করিয়াই বসন্ত প্রশ্ন করিল।

—ওটা আমার ভুল হয়েছিল।

মেয়েটি কোন উত্তর দিল না, শুধু একটু হাসিল।

—আবার নতুন গান বাঁধছি। সে গুন গুন করিয়া আরম্ভ করিল—

"করিল কে ভুল, হায় রে !
মন-মাতানো বাসে ভ'রে দিয়ে বুক
করাত-কাঁটার ধারে ঘেরা কেয়াফুল।"

বসন্তর মুখে নিঃশব্দ মৃদু হাসি দেখা দিল, বলিল—তারপর ?

—তারপর এখনও হয় নাই।

—গানটি আমাকে নিকে দিয়ো।

—আমার গান তুমি নিকে নেবে ? গাইবে ?

—হ্যাঁ।

জানালার দিকে চাহিয়া নিতাই বলিল—আজই শেষ করব।—কে ? কে ?

জানালার পাশ হইতে কে সরিয়া যাইতেছে ! বসন্ত হাসিয়া বলিল—আবার কে ! যত সব নরুকেদের দল।

নিতাই কিন্তু ওই কথা মানিয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি আসিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল। সে যাহা দেখিয়াছে সে-ই জানে। হ্যাঁ—ওই যে দুধবরণ কোমল জ্যোৎস্নার মধ্যে মানুষটি রেল লাইনের দিকে চলিয়াছে। দ্রুত চলন্ত কাশফুলের মত চলিয়াছে। মাথায় কেবল স্বর্ণবিন্দুটি নাই। ঠাকুরঝি !

এগারো

জ্যোৎস্নার রহস্যময় শুভ্রতার মধ্যে দ্রুত চলন্ত কাশফুলটি যেন মিশিয়া মিলাইয়া গেল। নিতাই কিন্তু স্তব্ধ হইয়া জানালার ধারে দাঁড়াইয়াই রহিল। চোখে তাহার অর্থহীন দৃষ্টি, মনের চিন্তা অসম্বন্ধ অস্পষ্ট, বুকের মধ্যে শারীরিক অনুভূতিতে কেবল একটা গভীর উদ্বেগ !—সে যেন পাথর হইয়া গিয়াছে। এই বিপুল জ্যোৎস্নাময়তার মধ্যে ঠাকুরঝি হারাইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সবই যেন হারাইয়া গেল।

তাহার ভাব দেখিয়া মুখরা স্বৈরিণী অসুস্থ দেহেও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়া বসিল।

জীবনের অভিজ্ঞতা তাহার যত জটিল, তত কুটিল। পথচারিণী নিম্নশ্রেণীর দেহব্যবসায়িনীর রাত্রির অভিজ্ঞতা ! সে অভিজ্ঞতায় নিশাচর হিংস্র জানোয়ারের মত মানুষই সংসারে ষোল আনার মধ্যে পনেরো আনা তিন পয়সা ; সেই অভিজ্ঞতায় শঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া বসন্ত উঠিয়া বসিল। সে ভাবিল, যে দলটি বাড়ীর দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছিল, তাহারাই বোধহয় দলপুষ্ট হইয়া নিঃশব্দ লোলুপতায় নখর দন্ত মেলিয়া বাড়ীর চারপাশ ঘেরিয়া ফেলিয়াছে। আক্রমণের চেষ্টা করিতেছে। উৎকণ্ঠিত হইয়া চাপা কণ্ঠে সে প্রশ্ন করিল—কি ?

নিতাই তবুও উত্তর দিল না। সে যেমন স্তব্ধ নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তেমনিই

দাঁড়াইয়া রহিল। ঠাকুরঝির রাগ তো সে জানে! খানিকটা গিয়াই সে দাঁড়ায়, পিছন ফিরিয়া তাকায়, ইঙ্গিতে বলে—আমায় ডাক, ডাকিলেই ফিরিব। আজ আর কিন্তু দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল; এই রাত্রে একাই সে চলিয়া গেল। মধ্যরাত্রির নিস্তরঙ্গ স্তব্ধ জ্যোৎস্নার মধ্যেও একটা ভয় আছে। সে ভয় সে করিল না।

বসন্ত এবার উঠিয়া আসিয়া নিতাইয়ের পাশে দাঁড়াইল, জ্বরোত্তপ্ত হাতে নিতাইয়ের হাত ধরিয়া প্রশ্ন করিল—কই ?

এতক্ষণে সচকিত হইয়া নিতাই ফিরিয়া চাহিল। রূপে গুণে ক্ষুরধার স্বৈরিণীর কৃশ মুখে, ডাগর দীপ্ত চোখে অপরিমেয় ক্লান্তি—গভীর উৎকণ্ঠা। নিতাই সে মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহকোমল না হইয়া পারিল না। সস্নেহে হাসিয়া সে বসন্তর কপালে মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—এত জ্বর, তুমি উঠে এলে কেনে ? চল শোবে চল। উঃ! ধান দিলে যেন খই হবে, এত তাপ!

—নচ্ছারগুলো ঘুরছে চারিদিকে ? ছুরি ছোরা নিয়ে জুটেছে ?

—নচ্ছারগুলো! নিতাই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল। বসন্তর ভাবনার পথে যাহারা বিচরণ করিতেছিল, তাহাদের সে কল্পনা করিতেই পারিল না।

এবার বসন্তর ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—খাপ হইতে ক্ষুরের ধার উঁকি মারিল, সে প্রশ্ন করিল—তবে ? কি ? কে গেল ? কি দেখছ তুমি ?

চকিতেই নিতাই এবার বসন্তর কল্পনার কথা বুঝিল, হাসিয়া সে বলিল—না, তারা নয়। ভয় নাই তোমার। এস, শোবে এস। সে তাহাকে আকর্ষণ করিল।

—কে যে গেল! কাকে দেখছিলে ? কে উঁকি মেরে গেল ?

—কে চিনতে পারলাম না।

—চিনতে পারলে না ?

—না।

—তবে এমন ক'রে দাঁড়িয়ে আছ যে ? যেন কত সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে তোমার ?

বসন্তর শাণিত দৃষ্টি অন্ধকারের মধ্যেও যেন জ্বলিতেছিল।

নিতাই কোন উত্তর দিল না, শুষ্ক হাসিমুখে সে বসন্তর দিকে চাহিয়াই রহিল।

বসন্ত অকস্মাৎ খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল—তীক্ষ্ণ দ্রুত হাসি। হাসিয়া বলিল—আ মরণ আমার! চোখের মাথা খাই আমি! যে উঁকি মারলে তার মাথায় যে ঘোমটা ছিল! ও—! আমাকে দেখে—

আবার সেই খিলখিল হাসি।

নিতাইয়ের পা হইতে মাথা পর্যন্ত ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। বসন্ত হাসিতে হাসিতে ঘরের খিল খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

নিতাই ডাকিল—বসন! ও ভাই! বসন!

দুয়ারের বাহির হইতে উত্তর আসিল—বসন নয় হে, কেয়াফুল, কেয়াফুল! টেনো না, করাত-কাঁটার ধারে সর্বাঙ্গে ছ'ড়ে-ছিঁড়ে যাবে!

নিতাই তবুও বাহিরে আসিল।

স্বৈরিণী তখন কাসেদ সেখের ছেলে নয়ানের সঙ্গে কথা বলিতেছে।

এ অবস্থায় নিতাই ডাকিতে গিয়াও পারিল না, লজ্জাবোধ হইল। আপনার দুয়ারটিতেই সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ওদিকে স্টেশনের ধারে ঝুমুরের আসরে গান হইতেছে।

আলোর ছটা গাছের ফাঁকে ফাঁকে আসিয়া এখানে ওখানে পড়িয়াছে। এদিকটা প্রায় জন-হীন স্তব্ধ, পশ্চিম আকাশে চাঁদ অস্তে চলিয়াছে, পূর্বদিকের আকাশে অন্ধকার ঘন হইয়া উঠিতেছে। স্বৈরিণী মেয়েটার কিন্তু কোন লজ্জা নাই; খিলখিল হাসির মধ্যে কথা শেষ করিয়া—ঘন অন্ধকারে কাসেদের ছেলে নয়ানের সঙ্গে ওই পূর্বদিকের গভীরতর অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। নিতাই আকাশের দিকে তাকাইয়া একা দাঁড়াইয়া রহিল। থাকিতে থাকিতে আবার তাহার মনে নূতন গান গুনগুন করিয়া উঠিল। ভগবান মানুষের মন লইয়া কি মজার খেলাই না খেলেন! এক ঘটে, মানুষ তাঁহার ছলনায় অন্য দেখে। ঠাকুরঝি বসন্তকে দেখিয়া চলিয়া গেল, বসন্ত ঠাকুরঝিকে দেখিয়া চলিয়া গেল। সে গুনগুন করিয়া তাই লইয়াই গান বাঁধিতে বসিল।—

"বঙ্কিমবিহারী হরি বাঁকা তোমার মন!"

ঘটনার মধ্যে সে যেন নিয়তির খেলা বা দৈবের অদ্ভুত পরিহাস দেখিতে পাইয়াছে আজ। ঠিক তাহার অচ্ছুৎ জন্মের মতই এ পরিহাস নিষ্ঠুর। সে তাই গানের মধ্যে হরিকে স্মরণ না করিয়া পারিল না।

ভোরবেলাতে রাজার হাঁক-ডাকে নিতাইয়ের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে ঘরে আসিয়া গান বাঁধিতে বাঁধিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। চেতনা হইবামাত্র সেই অসমাপ্ত গানের কলিটাই প্রথমে গুঞ্জন করিয়া উঠিল তাহার মনে—

"বঙ্কিমবিহারী হরি বাঁকা তোমার মন,
কুটিল কৌতুকে তুমি হয়কে কর নয়—অঘটন কর সংঘটন।

রাজা হাঁকডাক শুরু করিয়াছে। সে হাঁকডাকের উচ্ছ্বাসটা যেন অতিরিক্ত। নিতাইয়ের মনে হইল হয়তো নূতন কোন অভিনন্দন লইয়া রাজন তাহার দুয়ারে আসিয়াছে—ধৈর্য তাহার আর ধরিতেছে না। স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হাসিমুখে সে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। বাহিরে দাঁড়াইয়া রাজা—তাহার পিছনে ঝুমুরের দলের প্রৌঢ়া। রাজা সটান ঘরের ভিতরে আসিয়া চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া সকৌতুকে কাহাকে যেন খুঁজিতে আরম্ভ করিল।

নিতাই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—কি?

—কাঁহা? কাঁহা হ্যায় ওস্তাদিন?

—ওস্তাদিন?

হা-হা করিয়া হাসিয়া রাজা বলিল—সব ফাঁস হো গয়া ওস্তাদ, সব ফাঁস হো গয়া। কাল রাতমে—সে হা-হা করিয়াই সারা হইল। কথা আর শেষ করিতে পারিল না।

নিতাই তবুও কথাটা বুঝিতে পারিল না।

বুঝাইয়া দিল প্রৌঢ়া। সে এতক্ষণ দুয়ারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল, এবার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া হাসিয়া বলিল—আ মরণ! ও বসন্ত! বেরিয়ে আয় না লো, এই ট্রেনেই যাব যে আমরা!

নিতাই বলিল—সে তো এখানে নাই!

—নাই! সে কি? সে আসর থেকে বেরিয়ে এল, তুমি এলে সঙ্গে সঙ্গে। আমি বলেও দিলাম তোমাকে। তারপর আমি খোঁজও করলাম; শুনলাম, তোমার ঘরেই—

নিতাই বলিল—হ্যাঁ, কজন লোক বিরক্ত করছিল ব'লে আমার ঘরেই এসেছিল। আমি এসে দেখলাম শুয়ে আছে, গায়ে অনেকটা জ্বর। কিন্তু খানিক পরেই বেরিয়ে সেই লোকের সঙ্গেই চলে গেল।

প্রৌঢ়া চিন্তিত হইয়া উঠিল ; রাজার কৌতুক-হাস্য স্তব্ধ হইয়া গেল।

নিতাই বলিল—কাসেদ সেখের ছেলে নয়ানের সঙ্গে গিয়েছে। ওই ঝোঁপ মত বটগাছটার তলাতেই যেন কথা কইছিল। আসুন দেখি।

তাহারা আগাইয়া গেল।

সেখানেই তাহাকে পাওয়া গেল। সে হতচেতনের মত অসম্বৃত দেহে পড়িয়া ছিল।

বিপুলপরিধি ছায়ানিবিড় বটগাছটির তলদেশটা ছায়ান্ধকারের জন্য তৃণহীন পরিষ্কার ; সেইখানেই মাটির উপর বসন্ত তখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছে। কেশের রাশ বিস্রস্ত অসম্বৃত, সর্বাঙ্গ ধূলায় ধূসর, মুখের কাছে কতকগুলো মাছি ভন ভন করিয়া উড়িতেছে ; পাশেই পড়িয়া আছে একটা খালি বোতল, একটা উচ্ছিষ্ট পাতা। কাছে যাইতেই দেশী মদের তীব্র গন্ধ সকলের নাকে আসিয়া ঢুকিল।

প্রৌঢ়া বলিল—মরণ! এই করেই মরবে হারামজাদী! বসন, ও বসন!

রাজা হাসিয়া বলিল—বহুত মাতোয়ারা হোগেয়া।

নিতাই দ্রুত সেখান হইতে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিল এক কাপ ধূমায়মান চা হাতে লইয়া। দুধ না দিয়া কাঁচা চা, তাহাতে একটু লেবুর রস। কাঁচা চায়ে নাকি মদের নেশা ছাড়ে। মহাদেব কবিয়ালকে সে কাঁচা চা খাইতে দেখিয়াছে। বসন্ত তখন উঠিয়া বসিয়াও ঢুলিতেছে অথবা টলিতেছে। প্রৌঢ়া বলিতেছে—এ আমি কি করি বল দেখি?

—এই চা-টা খাইয়ে দিন, এখুনি ছেড়ে যাবে নেশা।

চা খাইয়া সত্যই বসন্ত খানিকটা সুস্থ হইল। এতক্ষণে সে রাঙা ডাগর চোখ মেলিয়া চাহিল নিতাইয়ের দিকে।

প্রৌঢ়া তাড়া দিয়া বলিল—চল এইবার।

নিতাই বলিল—চান করিয়ে দিলে ভাল করতেন। সোরও হত, আর সর্বাঙ্গে ধুলো লেগেছে—

তাহার কথা ঢাকা পড়িয়া গেল বসন্তর মত্ত কণ্ঠের খিলখিল হাসিতে। সে টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, নিতাইয়ের সম্মুখে আসিয়া জড়িত-কণ্ঠে বলিল—মুছিয়ে দাও না নাগর, দেখি কেমন দরদ!

নিতাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল—হাসিয়া কাঁধের গামছাখানি লইয়া সযত্নে বসন্তর সর্বাঙ্গের ধূলা মুছাইয়া দিয়া বলিল—আচ্ছা, নমস্কার তা হ'লে।

প্রৌঢ়া তাহাকে ডাকিল—বাবা!

নিতাই ফিরিল।

—আমার কথাটার কি করলে বাবা? দলে আসবার কথা?

নিতাই কিছু বলিবার পূর্বেই নেশায় বিভোর মেয়েটা আবার আরম্ভ করিয়া দিল সেই হাসি। সে হাসি তাহার যেন আর থামিবে না।

বিরক্ত হইয়া প্রৌঢ়া বলিল—মরণ! কালামুখে এমন সর্বনেশে হাসি কেনে? বুক ফেটে মরবি যে!

সেই হাসির মধ্যেই বসন্ত কোনরূপে বলিল—ওলো মাসী লো—কয়লা-মাণিকেরও মনের মানুষ আছে লো! কাল রাতে—হি-হি-হি—হি-হি-হি—হি-হি-হি—

রাজা এবার অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মেয়েটাকে একটা ধমক দিয়া উঠিল—কেঁও এইসা ক্যাক্

ফ্যাক্ করতা হ্যায় ?

বসন্তর চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে আবার হাসিতে আরম্ভ করিল—হি-হি-হি—হি-হি-হি—

ওদিকে স্টেশনে ট্রেনের ঘণ্টা পড়িল ; স্টেশন-মাস্টার নিজে ঘণ্টা দিতে দিতে হাঁকিতেছিল—রাজা ! এই রাজা !

রাজা ছুটিল, নতুবা একটা অঘটন ঘটা অসম্ভব ছিল না।

নিতাই হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, আসুন তা হ'লে। সঙ্গে সঙ্গে সেও আপনার বাসার দিকে ফিরিল।

প্রৌঢ়া এবার কঠিন-স্বরে বলিল—বসন ! আসবি, না এইখানে মাতলামি করবি ?

বসন্ত ক্লান্তিতে শিথিল পদে চলিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু হাসি তাহার তখনও থামে নাই।

সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া ইশারা করিয়া সে চীৎকার করিয়া বলিল—চললাম হে !

* * * *

নিতাই আসিয়া বসিল কৃষ্ণচূড়া গাছটির তলায়।

ওদিকে ট্রেনটা ছাড়িয়াছে।

ট্রেনটা স্টেশন হইতে ছাড়িয়া সশব্দে সম্মুখ দিয়া পার হইয়া যাইতেছিল। কামরার পর কামরা। একটা কামরায় ঝুমুরের দলটাকে দেখা গেল। বসন্ত মেয়েটি একধারে দরজার পাশেই জানালায় মাথা রাখিয়া যেন একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছে।

অদ্ভুত মেয়ে ! নিতাই হাসিল। ঝুমুর সে অনেক দেখিয়াছে ! কবিগান করিতে ইহাদের সঙ্গে মেলা-মেশাও অনেক করিয়াছে, কিন্তু এমন নিষ্ঠুর ব্যবসায়িনী ক্ষুরধার মেয়ে সে দেখে নাই। ক্ষুরধার নয়, জ্বলন্ত। মেয়েটা যেন জ্বলিতেছে। তবে মেয়েটার গুণ আছে, রূপও আছে। আশ্চর্য মেয়ে ! গত রাত্রের গানটা তাহার গানটা তাহার মনে পড়িয়া গেল—

"করিল কে ভুল—হায় রে !
মন-মাতানো বাসে ভরে দিয়ে বুক
করাত-কাঁটার ধারে ঘেরা কেয়াফুল।
করিল কে ভুল ! হায়রে !"

ট্রেনটা চলিয়া গেল। নিতাই বসিয়াই রহিল। চাহিয়া রহিল রেল-লাইনের বাঁকে যেখানে সমান্তরাল লাইন দুইটি এক বিন্দুতে মিশিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় সেইখানের দিকে। বসন্ত তো চলিয়া গেল, আর হয়তো কখনও দেখাই হইবে না। অদ্ভুত মেয়ে ! ক্ষণে ক্ষণে মেয়েটার এক একটি রূপ ; এক রাত্রে উহাকে লইয়াই তিন-তিনখানা গান মনে আসিয়াছে। সে খানিকটা উদাস হইয়া রহিল। অকস্মাৎ কোথা হইতে একটা সচেতনতা আসিয়া তাহাকে নাড়া দিল। ওইখানেই বাঁকের ওই বিন্দুটিতে এক সময় একটি স্বর্ণবিন্দু ঝকমক করিয়া উঠিবে, তাহার পর দেখা যাইবে—ওই স্বর্ণবিন্দুটির নীচে চলন্ত একটি কাশফুল। স্বর্ণবিন্দু-বিচ্ছুরিত জ্যোতিরেখাটির মধ্যে মধ্যে এক একটি চকিত চমকে চোখে লাগিয়া চোখ ধাঁধিয়া দিবে। অসমাপ্ত গানগুলি তাহার অসমাপ্তই রহিল, পথের উপর স্থিরদৃষ্টি পাতিয়া নিতাই যেন প্রত্যাশা-বিভোর হইয়া বসিয়া রহিল।

ঠাকুরঝি কখন আসিবে ? কই, ঠাকুরঝি আসিতেছে কই ?

ওই কি ? না, ও তো নয় ! নিতান্তই চোখের ভ্রম। মনের প্রত্যাশিত কল্পনা—এই দিকের

আলোর মধ্যেও মরুভূমির মরীচিকার মত মধ্যে মধ্যে স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। এমনি দেখা যায়, আবার মিলাইয়া যায়। নিতাই হাসিল। এই তো বেলা সবে দশটা। ঠাকুরঝি আসে ঘড়ির কাঁটাটির মত বারোটার ট্রেনটির ঠিক আগে।

তবু সে উঠিয়া গেল না। গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া ঘুমাইতে চেষ্টা করিল। ঘণ্টাগুলো আজ যেন যাইতেই চাহিতেছে না।

ওই! হ্যাঁ, ওই আসিতেছে। চলন্ত সাদা একটি রেখার মাথায় স্বর্ণাভ একটি বিন্দু। কিন্তু না, ও তো নয়, রেখাটির গতি-ভঙ্গি তো তেমন দ্রুত নয়, রেখাটিও তেমন সরল দীঘল নয়!

ওই আর একটি রেখা, এও নয়।

নিতাইয়ের ভুল হয় নাই। রেখাগুলি নিকটবর্তী হইলে সেগুলি নারীমূর্তি হইয়াই উঠিল, মাথায় তাহাদের ঘটিও ছিল। তাহারাও এ গ্রামে দুধ লইয়া আসে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই ঠাকুরঝি নয়। একে একে তাহারা সকলেই গেল। কিন্তু ঠাকুরঝি কই? কই?

বেলা বারোটার ট্রেন চলিয়া গেল।

রাজা আসিয়া ডাকিল—ওস্তাদ!

সচকিত হইয়া নিতাই হাসিয়া বলিল—রাজন!

—কেয়া ধ্যান করতা ভাই, হিঁয়া বইঠ্‌কে? নয়া কুছ গীত বানায়া—?

—না তো—। অপ্রস্তুতের মত নিতাই শুধু খানিকটা হাসিল।

—তুমারা উপর হাম গোসা করেগা।

—কেন রাজন, কেন? কি অপরাধ করলাম ভাই?

—ওহি ঝুমুরওয়ালী বোলা তুমারা দিলকে আদমী, মনকে মানুষ—

নিতাই হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর রাজার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—চল, চা খেয়ে আসি। চা খাওয়া হয় নাই, ঠাকুরঝি আজ আসে নাই দুধ নিয়ে। ঝুমুরওয়ালীর কথায় তুমি বিশ্বাস করেছ? হ্যাঁ রাজন—আছে আমার মনের মানুষ। আমার মনের মানুষ তুমি রাজন, তুমি।

—হাম? রাজা বিকট হাসিতে স্থানটি উচ্চকিত করিয়া দিল। সে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—চুমু খাগা ওস্তাদ? আবার সেই বিকট হাসি। সে হাসির প্রতিধ্বনিতে আকাশ হাসিতে লাগিল, বাতাস হাসিতে লাগিল।

বারো

একদিন, দুইদিন, তিনদিন।

পর পর তিনদিন ঠাকুরঝি আসিল না। চতুর্থ দিনে উৎকণ্ঠিত হইয়া নিতাই স্থির করিল, আজ ঠাকুরঝি না আসিলে ঠাকুরঝির গ্রামে গিয়া খোঁজ করিয়া আসিবে।

বারোটার ট্রেন চলিয়া গেল, সেদিনও ঠাকুরঝি আসিল না। অন্যান্য মেয়েরা যাহারা দুধ দিতে আসে, তাহারা আসিয়া ফিরিয়া গেল। নিতাইয়ের বার বার ইচ্ছা হইল—উহাদের কাছে সংবাদ লয়, কিন্তু তাহাও সে কিছুতেই পারিল না। কেমন সঙ্কোচ বোধ করিল।

নিজেই সে আশ্চর্য হইয়া গেল—বার বার মনে হইল, কেন সঙ্কোচ, কিসের সঙ্কোচ ? কিন্তু তবু সে-সঙ্কোচ নিতাই কাটাইয়া উঠিতে পারিল না। চুপ করিয়া সে আপনার বাসায় আসিয়া ভাবিতে বসিল। কোন অজুহাতে ঠাকুরঝির শ্বশুরগ্রামে যাইলে হয় না? ভাবিয়া চিন্তিয়া সে ঠিক করিল—হাঁস, মুরগী অথবা ডিম কিনিবার অছিলায় যাইবে। ঠাকুরঝির শ্বশুরের হাঁস মুরগী আছে সে জানে। সংসারের তুচ্ছতম সংবাদটি পর্যন্ত ঠাকুরঝি তাহাকে বলিয়াছে। দেওয়ালে কোথায় একটি স্চ গাঁথা আছে, নিতাই সেটি গিয়া স্বচ্ছন্দে—চোখ বন্ধ করিয়া লইয়া আসিতে পারে।

—ওস্তাদ রয়েছ নাকি ? রাজার কণ্ঠস্বর।

নিতাই আশ্চর্য হইয়া গেল, রাজা বাংলায় বাত বলিতেছে! বিস্মিত হইয়া সে হিন্দীতে উত্তর দিল—রাজন, আও মহারাজ, কেয়া খবর ?

রাজা আসিয়া খবর দিল—বিষণ্ণভাবে বাংলাতেই বলিল—খারাপ খবর ওস্তাদ, ঠাকুরঝিকে নিয়ে তো ভারি মুশকিল হয়েছে ভাই।

নিতাইয়ের বুকের ভিতরটা ধড়াস করিয়া উঠিল। সে কোন প্রশ্ন করিতে পারিল না, উৎকণ্ঠিত স্তব্ধমুখে রাজার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—আজ দিন তিনেক হ'ল, কি হয়েছে ভাই, ওই ভাল মেয়ে—লক্ষ্মী মেয়ে, শ্বশুর-শাশুড়ী ননদ-মরদ সবারই সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করছে—মাথামুড় খুঁড়ছে। কাল রাত থেকে আবার মূর্ছা যাচ্ছে। দাঁত লাগছে, হাত-পা কাঠির মত করছে।

অপরিসীম উদ্বেগে নিতাইয়ের বুকের ভিতরটা অস্থির হইয়া উঠিল। রাজার হাত দুইখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—তুমি দেখতে যাবে না রাজন ?

রাজা বলিল—বউ গেল দেখতে, ফিরে আসুক। আমি ও-বেলায় যাব।

—আমিও যাব।

নিতাইয়ের চোখে জল আসিয়া গেল, মাথা নীচু করিয়া সে তাহা গোপন করিল।

রাজা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বড় ভাল মেয়ে ওস্তাদ। আবার কিছুক্ষণ পর রাজা বলিল—ওঃ, ঠাকুরঝির মরদটি যা কাঁদছে! হাউ হাউ করে কাঁদছে। ছেলেমানুষ তো, সবে ভাব-সাবটি হয়েছে ঠাকুরঝির সঙ্গে। বেচারা! রাজা একটু ম্লান হাসি হাসিল।

টপ টপ করিয়া দুই ফোঁটা জল নিতাইয়ের চোখ হইতে এবার ঝরিয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়ি খেলাচ্ছলে আঙুল দিয়া জলের চিহ্ন দুইটা বিলুপ্ত করিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে ডাকিল—রাজন!

—ওস্তাদ!

—ডাক্তার-বদ্যি কিছু দেখানো হয়েছে ?

হতাশায় ঠোঁট দুইটা দুইপাশে টানিয়া রাজা বলিল—এতে আর ডাক্তার-বদ্যি কি করবে ওস্তাদ ? এ তোমার নিঘ্যাত অপদেবতা, না হয় ডান ডাকিনী, কি কোন দুষ্ট লোকের কাজ!

কথাটা নিতাইয়ের মনে ধরিল। চকিতে মনে হইল, তবে কি ওই ক্ষুরধার মেয়েটার কাজ! ঝুমুর দলের স্বৈরিণী—উহাদের তো অনেক বিদ্যা জানা আছে, বশীকরণে উহারা তো সিদ্ধহস্ত।

রাজা বলিল—মা কালীর থানে ভরনে দাঁড় করাবে আজ ঠাকুরঝিকে। কি ব্যাপার বিত্তান্ত আজই জানা যাবে।

আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া রাজা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং নিতাইয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—আও ভেইয়া, থোড়াসে চা পিয়েগা।

এতক্ষণে সে হিন্দী বলিল, অনেকক্ষণ পর রাজা যেন সহজ হইয়া উঠিয়াছে।

* * *

রাজার বাড়ীতেই নিতাই বসিয়া ছিল। রাজার স্ত্রী ঠাকুরঝির শ্বশুরবাড়ীতে গিয়াছে। এখনও ফেরে নাই। ভরন শেষ হইলেই সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিবে—সেই সংবাদের প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠিত ও ব্যগ্র হইয়া নিতাই বসিয়া রহিল। রাজা দুঃখ কষ্ট শোক সন্তাপের মধ্যেও রাজা। সে প্রচুর মুড়ি, বেগুনি, আলুর চপ্, কাঁচালঙ্কা, পেঁয়াজ, তাহার সঙ্গে কিছু সন্দেশ আনিয়া হাজির করিল।

নিতাই বলিল—এ সব কি হবে? এ সমারোহ তাহার ভাল লাগিতেছিল না।

—খানে তো হোগা ভেইয়া; পেট তো নেহি মানেগা জী! লাগাও খানা। তারপর সে চীৎকার আরম্ভ করিল—এ বাঁচ্চা! এ বেটা!

ডাকিতেছিল সে ছেলেটাকে। রাজার ছেলের ধরণটা অনেকটা সে আমলের যুবরাজের মতই বটে, দিনরাত্রিই সে মৃগয়ায় ব্যস্ত, একটা গুলতি হাতে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায়। শালিক, চড়ুই, কোকিল, কাক—যাহা পায় তাহাই হত্যা করে। হত্যার উদ্দেশ্যে হত্যা। খাওয়ার লোভ নাই। কখনও কখনও পাখীর বাচ্চা ধরিয়া পোষে এবং তাহার জন্য ফড়িং শিকার করিয়া বেড়ায়। যুবরাজ বোধ হয় আজ দূরে কোথাও গিয়া পড়িয়াছিল, সাড়া পাওয়া গেল না। রাজা চটিয়া চীৎকার করিয়া হাঁক দিল—এ শূয়ার কি বাচ্চা, হারামজাদোয়া—

তবুও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। রাজা নিতাইকে বলিল—কিধর গিয়া ওস্তাদ। তারপর হাসিয়া বলিল—উ বাতঠো—কেয়া বোলতা তুম ওস্তাদ? কেয়া?—তেপান্তরকে মাঠকে উধার—কেয়া? মায়াবিনী, না কেয়া?

এমন ধারার চীৎকারে সাড়া না পাইলে নিতাই বলে—যুবরাজ বোধ হয় তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে মায়াবিনী ফড়িং কি পক্ষিণীর পেছনে ছুটেছে রাজন।

আজ কিন্তু নিতাইয়ের ও-কথাও ভাল লাগিল না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে একটু ম্লান হাসি হাসিল, সে কেবল রাজার মনরক্ষার জন্য!

রাজাও আর ছেলের খোঁজ করিল না, দুইটা পাত্র বাহির করিয়া আহার্য ভাগ করিয়া একটা নিতাইকে দিয়া, অপরটা নিজে টানিয়া লইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। বলিল—যানে দেও ভেইয়া শূয়ার-কি বাচ্চেকো। নসীবমে ভগবান উস্‌কো নেহি দিয়া, হাম কেয়া করেগা?

নিতাই স্তব্ধ হইয়া রহিল। সে ভাবিতেছিল ঠাকুরঝির কথা। চোখের সম্মুখে হেমন্তের মাঠে প্রান্তরে ফসলে ঘাসে পীতাভ রং ধরিয়াছে, তাহার প্রতিচ্ছটায় রৌদ্রেও পীতবর্ণের আমেজ। আকাশ হইতে মাটি পর্যন্ত পীতাভ রৌদ্র ঝলমল করিতেছে। চারিপাশে দূরান্তরের শূন্যলোক যেন মৃদু কম্পনে কাঁপিতেছে বলিয়া মনে হইল। তাহারই মধ্যে চারিদিকেই নিতাই দেখিতে পাইল স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুল। এদিকে, ওদিকে, সেদিকে—সব দিকেই। কোনদিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলেই মনে হইল কম্পমান দূর দিগন্তের মধ্যে একটি স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুল দুলিতেছে, কাঁপিতেছে।

ক্ষুধার্তগ্রাসে রাজা খাওয়া শেষ করিয়া বলিল—খা লেও ভাই ওস্তাদ।

ম্লান হাসিয়া নিতাই বলিল—না।

—দূর, দূর ; খা লেও। পেটমে যানেসে গুণ করেগা। তবিয়ৎ ঠিক হো যায়েগা।

—তবিয়ৎ ভালই আছে রাজন, কিন্তু মুখে রুচবে না।

—কাহে ? মুখমে কেয়া হুয়া ভাই ?

রাজার হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া নিতাই যেন অকস্মাৎ বলিল—রাজন সেদিন তুমি আমাকে শুধিয়েছিলে আমার মনের মানুষের কথা।

—হাঁ। রাজা কথাটা বুঝিতে পারিল না, সে ওস্তাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—আমার মনের মানুষ, রাজন, ওই ঠাকুরঝিই। ঠাকুরঝি আমার মনের মানুষ। বলিতে বলিতে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

রাজার খাওয়া বন্ধ হইয়া গেল, বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে কবিয়ালের দিকে সে চাহিয়া রহিল। সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। অন্য সময় হইলে সে হয়তো বিকট হাস্যে কথাটা এই মুহূর্তে পৃথিবীময় প্রচার করিয়া দিত, কিন্তু ঠাকুরঝির জন্য তাহার বেদনাভারাক্রান্ত মন আজ তাহা পারিল না। স্তব্ধ হইয়া দুজনেই বসিয়া রহিল।

কতক্ষণ পরে কে জানে চীৎকার করিতে করিতে প্রবেশ করিল রাজার স্ত্রী।

ব্যগ্র উৎকণ্ঠিত নিতাই প্রশ্ন করিতে গিয়া তাহার মনের মধ্যে গুঞ্জিত শত প্রশ্নের মধ্য হইতে কম্পিত কণ্ঠে কোনমতে উচ্চারণ করিল, কেবল একটি কথা—কি হ'ল ?

রাজার স্ত্রী যেন অগ্নিস্পৃষ্ট বিস্ফোরকের মত ফাটিয়া পড়িল—ডাইন, ডাকিন, রাক্ষস—

তারপর সে অশ্লীল কদর্য অশ্রাব্য বিশেষণে নিতাইকে বিপর্যস্ত করিয়া দিল। এবং নিতাইয়ের মুখের উপর আঙুল দেখাইয়া বলিল—তুই, তুই, তুই ! তোর নজরেই কচি মেয়েটার আজ এই অবস্থা ! এত লোভ তোর ? তোর মনে এত পাপ ?

অজস্র ক্রুদ্ধ অভিসম্পাত ও অশ্রাব্য গালিগালাজের মধ্য হইতে বিবরণটা জানা গেল। আজ ঠাকুরঝিকে কালী মায়ের ভরনে দাঁড় করানো হইয়াছিল। সকাল হইতে উপবাসী রাখিয়া দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে তাহাকে একখানা মন্ত্রপূত পিঁড়ির উপর দাঁড় করাইয়া সম্মুখে প্রচুর ধূপ-ধুনা দিয়া কালী মায়ের দেবাংশী একগাছা ঝাঁটা হাতে তাহার সামনে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিয়াছিল—কালী, করালী, নরমুণ্ডমালী ! ভূত, পেরেত, ডাকিনী, যোগিনী, হাকিনী, শাকিনী, রাক্ষস, পিচাশ, যে মন্দ করেছে মা তাকে তুমি নিয়ে এস ধরে ! তার রক্ত তুমি খাও মা।

ঠাকুরঝি থরথর করিয়া কাঁপিয়াছিল।

—বল্ বল্ ? কে তোকে এমন করলে বল্ ? দোহাই মা কালীর !

ঠাকুরঝি তবুও কোন কথা বলে নাই, কেবল উন্মাদের মত দৃষ্টিতে চাহিয়া যেমন কাঁপিতে-ছিল তেমনি কাঁপিয়াছিল। এবার বজ্রনাদে দুর্বোধ্য অনুস্বার-বহুল মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবাংশী সপাসপ্ মন্ত্রপূত ঝাঁটা দিয়া তাহাকে প্রহার করিয়াছিল। তখন অস্থির অধীর ঠাকুরঝি বলিয়াছিল—বলছি বলছি, আমি বলছি।

সে নাম করিয়াছে নিতাইয়ের ; বলিয়াছে—ওস্তাদ, কবিয়াল। আমাকে লালফুল দিলে। তারপর সে উদ্ভ্রান্ত মৃদুস্বরে গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল—

"কাল চুলে রাঙা কোসম হেরেছ কি নয়নে ?"

রাজার স্ত্রীর মনে পড়িয়াছিল—নিতাইয়ের বাসায় জানালা দিয়া দেখা ছবি—নিতাই

ঠাকুরঝির চুলে ফুল গুঁজিয়া দিতেছিল। সে কথাটা সমর্থন করিয়া সচীৎকারে সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

বাকীটা ঠাকুরঝিকে আর বলিতে হয় নাই। রাজার স্ত্রী চীৎকার করিয়াই সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। অবশেষে এখানে আসিয়া নিতাইকে গালিগালাজে—শরবিদ্ধ ভীষ্মের মত জর্জরিত করিয়া তুলিল।

অন্যদিন হইলে রাজা স্ত্রীর চুলের মুঠা ধরিয়া কঞ্চির প্রহারে মুখ বন্ধ করিত। আজ কিন্তু সেও যেন পঙ্গু হইয়া গেল। নিতাই মাথা হেঁট করিয়া যেমন বসিয়া ছিল তেমনি ভাবেই বসিয়া রহিল। গালিগালাজ অভিসম্পাত বিশেষ করিয়া ঠাকুরঝি যাহা বলিয়াছে সেই কথা শুনিয়া—সে যেন পাথর হইয়া গিয়াছে।

কতক্ষণ পর ট্রেনের ঘণ্টার শব্দে রাজা সচেতন হইয়া উঠিল। তাহাকেও সচেতন করিয়া দিল। ট্রেনের ঘণ্টা পড়িয়াছে। তিনটার ট্রেন। রাজা স্টেশনে যাইবে, সে নিতাইকে ডাকিল। উঠো ভাই ওস্তাদ, কি করবে বল? হম ইস্টিশনমে যাতা হ্যায়! নিতাই উঠিয়া আসিয়া বসিল কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায়। উদাসীন স্তব্ধ নিতাই ভাবিতেছিল, পথের কথা। কোন্ পথে গেলে সে এ লজ্জার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবে, কোন্ পথে গেলে জীবনে শান্তি পাইবে সে?

ঠিক এই মুহূর্তেই একটি লোক আসিয়া দাঁড়াইল তাহার সম্মুখে—এই যে ওস্তাদ!

নিতাই নিতান্ত উদাসীনের মতই তাহার দিকে চাহিল। মুহূর্তে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল—তুমি?

লোকটি বলিল—হ্যাঁ আমি। তোমার কাছেই এসেছি।

—আমার কাছে?

—হ্যাঁ। বড় দায়ে পড়ে এসেছি ভাই। বসন পাঠালে।

—বসন?

—সেই ঝুমুর দলের বসন।

লোকটি সেই ঝুমুর দলের বেহালাদার।

আরও ঘণ্টা কয়েক পর।

হেমন্তের ধূসর সন্ধ্যা; সন্ধ্যার ম্লান রক্তাভ আলোর সঙ্গে পল্লীর ধোঁয়া ও ধূলার ধূসরতায় চারিদিক যেন একটা আচ্ছন্নতায় ঢাকা পড়িয়াছে। ওদিকে সন্ধ্যার ট্রেনখানা আসিতেছে। পশ্চিমদিক হইতে পূর্বমুখে। যাইবে কাটোয়া। সিগন্যাল ডাউন করিয়া রাজা লাইনের পয়েণ্টে নীল বাতি হাতে দাঁড়াইয়া আছে। অন্ধকারের মধ্যে নিঃশব্দে আসিয়া দাঁড়াইল নিতাই।

—রাজন!

রাজা ফিরিয়া দেখিল—নিতাই। তাহার পায়ে ক্যাম্বিসের জুতা, গায়ে জামা, গলায় চাদর, বগলে একটি পুঁটলি। রাজা বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল—কাঁহা যায়েগা ওস্তাদ?

পাঁচটা টাকা তাহার হাতে দিয়া নিতাই বলিল—দুধের দাম, ঠাকুরঝিকে দিও।

রাজা ফিস্ ফিস্ করিয়া অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে বলিল—ঠাকুরঝিকা জাত মে জাত দেগা ওস্তাদ?

নিতাই বিস্মিত হইয়া রাজার দিকে চাহিল।

—ঠাকুরঝিকে সাদী হাম বাতিল কর দেগা। তুমারা সাথ ফিন সাদী দেগা। 'সাগাই' দে দেগা।

নিতাই মাথা নীচু করিয়া কিছুক্ষণ মাটির দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর মুখ তুলিয়া হাসিয়া কেবল একটি কথা বলিল—ছি!

—ছি কাহে?

—মানুষের ঘর কি ভেঙে দিতে আছে রাজন? ছি!

রাজা একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়াই রহিল।

নিতাই বলিল—তুমি বিশ্বাস কর রাজন, আমি কবিগান করি, কিন্তু মন্ত্রতন্ত্র কিছু জানি না, কিছু করি নাই। তবে হ্যাঁ, টান—একটা ভালবাসা হয়েছিল। তা বলে ঠাকুরঝিকে নষ্টও আমি করি নাই।

সন্ধ্যার অন্ধকার চিরিয়া বাঁকের মুখে ট্রেনের সার্চ-লাইট জ্বলিয়া উঠিল। ট্রেনটা ওদিক হইতে স্টেশনে ঢুকিতেছে। নিতাই দ্রুতপদে স্টেশনের দিকে চলিল। এতক্ষণে এই সার্চ-লাইটের আলোতে নিতাইয়ের বেশভূষা ও বগলের পুঁটলি যেন রাজার চোখে খোঁচা দিয়া বুঝাইয়া দিল নিতাই কোথাও চলিয়াছে। এতক্ষণ কথাটা তাহার মনে হয় নাই। এবার সে হাঁকিয়া প্রশ্ন করিল—কাঁহা যায়েগা ওস্তাদ?

ওদিকে ট্রেনটা সশব্দে কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল, সেই শব্দের প্রচণ্ডতায় নিতাই কিছু বলিল কিনা রাজা বুঝিতে পারিল না। ট্রেনখানা স্টেশনে প্রবেশ করিলে পয়েণ্ট ছাড়িয়া রাজা ছুটিয়া প্লাটফর্মে আসিল।

—ওস্তাদ!—ওস্তাদ!

তখন নিতাই গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়াছে। গাড়ীর কামরা হইতে মুখ বাড়াইয়া নিতাই উত্তর দিল—রাজন!

উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে রাজন প্রশ্ন করিল—কাঁহা যায়েগা ভাই?

স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসিয়া নিতাই বলিল—বায়না এসেছে ভাই। আলেপুরের মেলায়।

আলেপুরে মহাসমারোহে নূতন মেলা হইতেছে। কিন্তু বায়না কখন আসিল? রাজার মনে চকিতে একটা সন্দেহ জাগিয়া উঠিল। ঠাকুরঝির দুধের দাম পাঁচ টাকা মিটাইয়া দিয়া সে বায়না লইয়া কবিগান করিতে চলিয়াছে! মিথ্যা কথা। সে বলিল—ঝুট বাত।

—না রাজন। এই দেখ, লোক।

রাজা দেখিল, সেই ঝুমুর দলের বেহালাদার। দলনেত্রী প্রৌঢ়া মেলায় গিয়াছে, সেখান হইতে নিতাইয়ের কাছে লোক পাঠাইয়াছে। তাহাদের দলের কবিয়াল পলাইয়া গিয়াছে। বসন ঝগড়া করিয়া তাহাকে লাথি মারিয়াছে।

নিতাই বলিল—আলেপুর, আলেপুর থেকে কান্দরা, কান্দরা থেকে কাটোয়া, কাটোয়া থেকে অগ্রদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ থেকে—

ট্রেনের বাঁশী তাহার কথাটাকে ঢাকিয়া দিল।

বাঁশী থামিল, ট্রেন চলিতে আরম্ভ করিল। রাজা ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিতে ছুটিতে প্রশ্ন করিল—অগ্রদ্বীপসে কাঁহা? দুনিয়া ভোর কি তুমারা বায়না আয়া হ্যায়? উতার আও ওস্তাদ, উতার আও।—রাজার কণ্ঠের আর্তমিনতি মুহূর্তের জন্য নিতাইকে বিচলিত করিয়া তুলিল। পরক্ষণেই সে আত্মসম্বরণ করিয়া হাসিল। মনে মনেই বলিল—হ্যাঁ, দুনিয়া ভোর বায়না আয়া হ্যায় রাজন।

ইতিমধ্যেই কিন্তু ট্রেন প্লাটফর্ম পার হইয়া দ্রুতগতিতে বাহির হইয়া গেল।

তেরো

ট্রেনখানা পূর্ব মুখের বাঁকটা ঘুরিয়া ফিরিল দক্ষিণমুখে। এ সেই বাঁকটা যেখানে ঠাকুরঝি আসিলে তাহার মাথার ঘটিটি রোদের ছটায় ঝিকমিক করিয়া উঠিত। গাড়ীখানা দক্ষিণমুখে চলিতেছে। এবার বাঁ পাশে পড়িল পূর্বদিগন্ত। পূর্বদিগন্তে তখন শুক্লপক্ষের চতুর্দশীর চাঁদ উঠিতেছিল। আকাশে পাতলা মেঘের আভাস রহিয়াছে, কুয়াসার মত পাতলা মেঘের আবরণ। তাহার আড়ালে চাঁদের রঙ ঠিক গুঁড়া হলুদের মত হইয়া উঠিয়াছে। নূতন বরের মত চাঁদ যেন গায়ে হলুদ মাখিয়া বিবাহ-বাসরে চলিয়াছে! নিতাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাঁদের দিকেই চাহিয়া রহিল। ছোট লাইনের ট্রেনগুলি বড় বেশী দোলে, আর শব্দও করে বড় লাইনের ট্রেনের চেয়ে অনেক বেশী—শূন্য কুম্ভের মত। যে লোকটি নিতাইকে লইতে আসিয়াছিল, সে ঝুমুর দলের বেহালাদার। কিন্তু বাজনাও সে জানে। সে বেশ খানিকটা নেশার আমেজে ছিল, ট্রেনের এই অত্যধিক শব্দে এবং ঝাঁকুনিতে বিরক্ত হইয়া সে বলিল—এ যে ঝাঁপতাল লাগিয়ে দিলে ওস্তাদ। এবং ট্রেনের শব্দের সঙ্গে মিলাইয়া বেঞ্চ বাজাইয়া বাজনা আরম্ভ করিয়া দিল। দেখাদেখি ওপাশের বেঞ্চে দুইটা ছোট ছেলে ট্রেনের শব্দের মর্মার্থ উদ্ধার আরম্ভ করিল। একজন বলিল—কাঁচা-তেঁতুল—পাকা-তেঁতুল। কাঁচা-তেঁতুল—পাকা-তেঁতুল।

নিতাইয়ের মন কিন্তু কিছুতেই আকৃষ্ট হইল না। চাঁদের দিকে চাহিয়া সে ভাবিতেছিল—ঠাকুরঝির কথা, রাজনের কথা, যুবরাজের কথা, বণিক মাতুলের কথা, বিপ্রপদর কথা, কৃষ্ণচূড়া গাছটির কথা, স্টেশনটির কথা, গ্রামখানির কথা। মধ্যে মধ্যে ইচ্ছা হইতেছিল—পরের স্টেশনেই সে নামিয়া পড়িবে।

স্টেশন পার হইয়া গেল, কিন্তু সে নামিতে পারিল না। হঠাৎ একসময়ে সে অনুভব করিল—নিজের অজ্ঞাতসারেই তাহার চোখ কখন জলে ভরিয়া উঠিয়াছে, সে কাঁদিতেছে। চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি ম্লান হাসিয়া এতক্ষণে সে সচেতন হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই স্বাভাবিক সুকণ্ঠে সে গান ধরিল—আহা! বার দুই-তিন তা-না-না করিয়া সুর ভাঁজিয়া গান ধরিল—

"চাঁদ তুমি আকাশে থাক আমি তোমায় দেখব খালি।
ছুঁতে তোমায় চাইনাকো হে চাঁদ, তোমার সোনার অঙ্গে লাগবে কালি।"

বাজনদারটা নেশার মধ্যেও সজাগ হইয়া বসিয়া বলিল—বাহবা ওস্তাদ! গলাখানা পেয়েছিলে বটে বাবা! বলিয়াই সে ধরতার মুখে বেঞ্চে একটা প্রকাণ্ড চাপড় মারিয়া বলিল—হেঁই—তা—তেরে কেটে—তা—তা!

গাহিতে গিয়া নিতাই পরের কলি বদলাইয়া দিল। মন যেন গানে ভরিয়া উঠিয়াছে, সুরে ফেলিলেই সে গান হইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে—

"না না, তাও করো মার্জনা—আজ থেকে আর তাও দেখব না—
জানতাম নাকো এই কু-চোখের দিষ্টিতে বিষ দেয় হে ঢালি।"

স্টেশনের পর স্টেশন অতিক্রম করিয়া ট্রেন চলিয়াছিল। নিতাই গানখানা বার বার ফিরাইয়া ফিরাইয়া গাহিয়া চলিয়াছে। গাহিয়া যেন তাহার তৃপ্তি হইতেছে না।

ট্রেনটা খট্ খট্ শব্দে লাইনের জোড়ের মুখ অতিক্রম করিয়া একটা স্টেশনে আসিয়া ঢুকিল।

স্টেশনের জমাদার হাঁকিতেছে—কান্দরা, রামজীবন পু—র্। বাজনদার জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া স্টেশনটার চেহারা দেখিয়াই ব্যস্ত হইয়া বলিল—ওই, এরই মধ্যে চলে আইচে লাগচে। নামো—নামো—ওস্তাদ নামো।

নিতাই নামিল, কিন্তু গান বন্ধ করিল না। গলা নামাইয়া মৃদুস্বরে গাহিতে গাহিতেই সে স্টেশন পার হইয়া পথে নামিল—

"তাই চলেছি দেশান্তরে আঁধার খুঁজেই ফিরব ঘুরে,
কাকের মুখে বার্ত্তা দিও—ষোল কলায় বাড়ছ খালি।"

স্টেশন হইতে মাইল দুয়েক হাঁটা-পথে চলিয়া নিতাইয়ের মনের অবসাদ অনেকখানি কাটিয়া আসিল। রাসপূর্ণিমায় আলেপুরের মেলা বিখ্যাত মেলা। কাতারে কাতারে লোক যায় আসে। চতুর্দশীর প্রায় পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নার মধ্যেও দুই মাইল দূরবর্তী মেলাটার উপরের আকাশখণ্ড আলোর আভায় ঝলমল করিতেছে। ইহার পূর্বেও নিতাই দেখিবার জন্য এ মেলায় আসিয়াছে। কেবল আলো—আলো আর আলো, সেই আলোর ছটায় উজ্জ্বল পণ্যসম্ভারভরা সারি সারি দোকান, আর পথে ঘাটে মাঠে শুধু লোক—লোক আর লোক। মেলাটার স্থানে স্থানে নানা আনন্দের আসর—যাত্রা, কবি, পাঁচালী, ঝুমুর। চারিপাশে কাতারে কাতারে দর্শক। এমনই একটি আসরে আজ তাহাকে গান করিতে হইবে। কবি ও ঝুমুর দল এক হইয়া অপর একটি এমনিই দলের সহিত পাল্লা দিয়া গান করিবে। সঙ্গের লোকটি বলিয়াছে, তাহাকেই মুখপাত—অর্থাৎ মুখপাত্র হিসাবে গান করিতে হইবে। তাহাদের যে লোকটা এমন আসরে গান করিত, সে লোকটা বসন্তের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া তাহার প্রণয়িনীকে লইয়া অন্যদলে চলিয়া গিয়াছে। তাহার গলাও একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, লোকটাও ছিল দুর্দান্ত মাতাল, গান বাঁধিবার ক্ষমতাও তাহার আর তেমন ছিল না। গতকাল একটা গানের সুরতাল লইয়া বসন্তের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়াছিল। দুজনেই ছিল মত্তাবস্থায়। শেষ পর্যন্ত লোকটা বসন্তকে অশ্লীল গাল দেওয়ায় বসন্ত তাহার পিঠে লাথি বসাইয়া দিয়াছিল। ফলে লোকটা তাহার প্রণয়িনী মেয়েটাকে লইয়া অন্য দলে চলিয়া গিয়াছে। কবিয়াল এবং ভালো গানেওয়ালা না হইলে মেলায় চলিবে না। উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রৌঢ়া নিতাইকে স্মরণ করিয়াছে। মানসম্মানের সমস্ত ভরসা এখন নিতাইয়ের উপর। সেইজন্য একান্ত অনুরোধ জানাইয়া ঝুমুর দলের নেত্রী প্রৌঢ়া তাহার কাছে লোক পাঠাইয়াছে।

মনে মনে একটা খুব ভাল ধুয়া রচনা করিতে করিতে নিতাই পথ চলিতেছিল—মনটা ছিল মনে নিবদ্ধ, দৃষ্টি ছিল আকাশে নিবদ্ধ, ওই আলোকোজ্জ্বল আকাশের দিকে। ঠাকুরঝি, রাজন, যোবরাজ, কৃষ্ণচূড়ার গাছ সমস্তই সম্মুখের ওই ভাস্বর আলোকে আলোকিত তাহার নিজের দেহের পিছনে দীর্ঘ ছায়ার অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছে। সে যত সম্মুখে আগাইয়া চলিয়াছে, পশ্চাতের ছায়া দৈর্ঘ্যে পরিধিতে তত বড় এবং ঘন হইয়া উঠিতেছে—সেই ক্রমবর্ধমান ছায়ার অন্ধকারে পিছনটা ক্রমশ যেন বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে!

তাহার মনকে টানিতেছে মেলার আসর। ঠাকুরঝির চিন্তা, সেখানকার সকলের চিন্তাকে দুঃখকে ছাপাইয়া মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা উত্তেজনা জাগিয়া উঠিতেছে। আজ সে কবিয়াল হইয়া আসরে নামিবে। চণ্ডীমায়ের মেলায় মহাদেবের সঙ্গে পাল্লা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে এক আর এ এক। আজ সে সত্যই কবিয়াল বলিয়া স্বীকৃত হইয়া মেলায় গাওনা করিতে চলিয়াছে। এমন ভাগ্য যে তাহার কখনও হইবে, সে ভাবে নাই।

সে গাহিবে বসন্ত নাচিবে। অপর মেয়েগুলিকে সে নাচিতে দিবে না। আসরে বসিয়া তাহারা দোয়ারকি করিবে। এই সব কল্পনা করিতে ক'রিতে তাহার মনে একটা কলিও আসিয়া গেল।

"ব্রজ-গোকুলের কূলে কালো কালিন্দীরই জলে—
হেলে দোলে ওরে সোনার কমলা।
কালো হাতে ছুঁয়ো নাকো, লাগিবে কালি—
ওহে কুটিল কালা।"

সঙ্গে সঙ্গে সুরে ফেলিয়া সে গুন গুন করিয়া গান ভাঁজিতে আরম্ভ করিয়া দিল। অপর দলের কবিয়াল নাকি বেজায় রঙদার লোক, গোড়া হইতেই রঙ তামাসা আরম্ভ করিয়া দেয়। রঙের জোরেই সে আসর জিতিয়া লয়। নিতাই কিছুতেই প্রথম হইতে রঙ আরম্ভ করিবে না। মানুষ কেবল মদই ভালবাসে, দুধে তাহার অরুচি—এ-কথা সে বিশ্বাস করে না। যদি অরুচি দেখে তবে মদই সে দিবে। দেখাই যাক না।

হঠাৎ একটা লোকের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা খাইয়া নিতাইকে দাঁড়াইতে হইল। মেলার অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে, পথের জনতা ঘন হইয়া উঠিয়াছে। কবিয়ালির চিন্তায় বিভোর হইয়াই নিতাই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলিতেছিল, হঠাৎ বাঁকের মুখে লোকটার সহিত ধাক্কা বেশ একটু জোরেই লাগিয়া গেল। লোকটা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—কানা নাকি। একেবারে হন্তে হয়ে ছুটেছে!

নিতাই অবনত হইয়া হাতজোড় করিয়া বলিল—তা অন্যায় হয়ে গিয়েছে ভাই।

লোকটা অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া বলিল—অঃ, একেবারে ঠাঁই করে লেগেছে—

নিতাই বলিল—তবে দোষ একা আমার নয়, বেবেচনা ক'রে দেখুন।

লোকটা এবার হাসিয়া ফেলিল।

এই অন্ধকা'র মোড়টা ফিরিয়াই মেলা। সারা মেলাটার বিভিন্ন পটি অতিক্রম করিয়া তাহারা মেলার বিপরীত প্রান্তে আসিয়া পড়িল। এখানে আলোকের সমারোহটা কম, কিন্তু লোকের ভিড় বেশী। মেলার এই প্রান্তে একটা গাছের তলায় খড়ের ছোট ছোট খান-কয় ঘর বাঁধিয়া ঝুমুরের দলটি আস্তানা গাড়িয়াছে। আশেপাশে এমনি আরও গোটাকয়েক ঝুমুরের দলের আস্তানা। একপাশে খানিকটা দূরে জুয়ার আসর। তাহারই পর চতুষ্কোণ আকারের একটা খোলা জায়গায় সারি সারি খড়ের ঘর বাঁধিয়া বেশ্যাপল্লী বসিয়া গিয়াছে। সে যেন একটা বিরাট মধুচক্রে অবিরাম গুঞ্জন উঠিতেছে।

মধ্যে মধ্যে নেশায় উন্মত্ত জনতা উচ্ছৃঙ্খল কোলাহলে ফাটিয়া পড়িতেছে। তেমনি একটা কোলাহলে নিতাইয়ের গানের কলি দুইটা গোলমাল হইয়া গেল।

বসন্তদের ঝুমুরদলের আস্তানায় ঘরগুলার সামনে গাছতলায় চ্যাটাই পাতিয়া লণ্ঠনের আলোয় প্রৌঢ়া সুপারি কাটিতেছিল—জন-দুইয়েক রান্নায় ব্যস্ত ছিল। একটা খড়ের কুঠরীতে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে, মেয়েপুরুষের সম্মিলিত হাসির উচ্ছ্বাসে ঘরখানা উচ্ছ্বসিত। তাহার মধ্যে নিতাই চিনিল—বসন্তর হাসি; এমন ধারালো খিল-খিল হাসি বসন্ত ভিন্ন কেহ হাসিতে পারে না, অন্তত ঝুমুর দলের কোন মেয়ে পারে না।

নিতাইকে দেখিয়াই প্রৌঢ়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া দাঁড়াইল—এস, এস, বাবা এস। আমি তোমার পথ চেয়ে রয়েছি।

রন্ধনরতা মেয়ে দুইটি রান্না ছাড়িয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল,—হাসিমুখে বলিল—এসে গিয়েছ—লাগছে!

নিতাই হাসিয়া বলিল—এলাম বৈকি।

প্রৌঢ়া বলিল—ওলো, বাবাকে আমার চা ক'রে দে। মুখে হাতে জল দাও বাবা।

একটি মেয়ে বলিল—খুব ভাল করে গান করতে হবে কিন্তুক।

অন্য মেয়েটি ছুটিয়া গিয়া আলোকোজ্জ্বল কুঠুরীটার দুয়ারে দাঁড়াইয়া বলিল—ওলো বসন, কবিয়াল আইচে লো! তোর কালো-মাণিক!

নিতাই হাসিয়া সংশোধন করিয়া দিল—কালো-মাণিক লয়, কয়লা-মাণিক।

বসন্ত ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল—তাহার পা টলিতেছে, ডাগর চোখের পাতা ভারী হইয়া নামিয়া আসিতে চাহিতেছে, নাকের ডগায় চিবুকে কপালে ঘাম দেখা দিয়াছে। সে আসিয়া দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল—না, তুমি আমার কালো-মাণিক। আমার মনে রেখেছ তুমি, ছিদ্দ কুম্ভে জল রেখেছ—তুমি আমার কালো-মাণিক।

নেশার প্রভাবে বসন্তর কণ্ঠস্বর স্বভাবতই খানিকটা আবেগময় হইয়াছিল—কিন্তু সে আবেগ, শেষ কথা কয়টি বলিবার সময় যেন অনেক গুণে বাড়িয়া গেল।

প্রৌঢ়া রহস্য করিয়া বলিল—তা ব'লে যেন কাঁদতে বসিস না বসন, নেশার ঘোরে!

নেশায় অর্ধনিমীলিত চোখ দুইটি আবার বিস্ফারিত করিয়া বসন এবার খানিকক্ষণ প্রৌঢ়ার দিকে চাহিয়া বলিল—আলবৎ কাঁদব, কালো-মাণিকের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ভাসিয়ে দোব। এমন যত্ন ক'রে কে চা ক'রে দেয়—কে গায়ের ধুলো মুছিয়ে দেয়? আজ সারারাত কাঁদব—। বলিতে বলিতেই সে আপনার ঘরের দুয়ারের কাছে আসিয়া বলিল—এই নাগরেরা, যাও, চলে যাও তোমরা। আর আমোদ নেহি হোগা!

প্রৌঢ়া শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া গিয়া বসন্তর হাত ধরিয়া বলিল—এই বসন! বসন! ছি! করছিস কি? খদ্দের লক্ষ্মী—তাড়িয়ে দিতে নাই।

বসন প্রৌঢ়ার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল—তা বলে আমি কাঁদতেও পাব না মাসী, আমি কাঁদতেও পাব না?

নিতাই উঠিয়া আসিয়া বলিল—না কাঁদবে কেনে? ছি!

—তবে তুমিও এস! তুমি গান করবে আমি নাচব।

—আচ্ছা, আচ্ছা। প্রৌঢ়া বলিল—যাবে। এই এল, চা খেয়ে জিরুক খানিক, তারপর যাবে; তু চল ততক্ষণ।

—চা? না, চা খাবে কি! চা খাবে কেনে? খুব ভাল মদ আছে—মদ খাবে! এস। বসন্ত নিতাইয়ের হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিল।

নিতাই হাত টানিয়া লইয়া বলিল—ছাড়।

—না।

—মদ আমি খাই না।

—খেতে হবে তোমাকে। আমি খাইয়ে দোব।

—না।

বসন্ত ঘাড় বাঁকাইয়া নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—আলবৎ খেতে হবে তোমাকে।

প্রৌঢ়া বলিল—মাতলামি করিস না বসন, ছাড়, ঘরে যা।

তেমনি বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গি করিয়া চাহিয়া বসন নিতাইকে বলিল—যাবে না তুমি? মদ খাবে না?

—না।

—আমার কথা তুমি রাখবে না?

—এ কথাটি রাখতে পারব না ভাই।

বসন্ত নিতাইকে ছাড়িয়া দিল। তারপর টলিতে টলিতে ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিয়া বলিল—বন্ধ কর দেও দরজা।

প্রৌঢ়া আক্ষেপ করিয়াই বলিল—মেয়েটা ওই মদ খেয়েই নিজের সর্বনাশ করলে। এত মদ খেলে কি শরীর থাকে!

নিতাই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। যে মেয়েটি চা করিতে গিয়াছিল, সে একটা কলাইকরা গ্লাসে চা আনিয়া বলিল—নাও, চা খাও ওস্তাদ।

হাসিয়া নিতাই চায়ের গ্লাসটি লইয়া বলিল—লক্ষ্মী দিদি আমার, বাঁচালে ভাই!

প্রৌঢ়া হাসিয়া বলিল—বাঃ, বেশ হয়েছে। নির্মলা, তু ওস্তাদকে দাদা বলে ডাকবি। ভাইদ্বিতীয়েতে ফোঁটা দিবি ওস্তাদকে, কিন্তুক কাপড় লাগবে!

নিতাই পরম প্রীত হইয়া বলিল—নিশ্চয়!

অপর মেয়েটি রান্নাশাল হইতেই বলিল—তা হলে আমি কিন্তুক ঠাকুরঝি সম্বন্ধ পাতালাম।

প্রৌঢ়া খুশী হইয়া সায় দিয়া বলিল—বেশ বলেছিস ললিতে, বেশ বলেছিস! বসন তোকে দিদি বলে।

নিতাইয়ের হাত হইতে চায়ের গ্লাসটা খসিয়া পড়িয়া গেল—ঠাকুরঝি! ঠাকুরঝি!

* * * *

রাত্রির অগ্রগতির সঙ্গে সে এক বীভৎস দৃশ্য। নিতাইয়ের কাছে এ দৃশ্য অপরিচিত নয়। মেলা উৎসবের আলোকোজ্জ্বল সমারোহের একটি বিপরীত দিক আছে। সে দিকটা সহজে মানুষের চোখে পড়ে না। আলোকের বিপরীত অন্ধকারে ঢাকা সে দিক। গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা বিপরীত দিকটিতে মাটির তলায় সরীসৃপের মত মানুষের বুকের আদিম প্রবৃত্তির ভয়াবহ আত্মপ্রকাশ সেখানে। অবশ্য নিতাইয়ের যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে জন্ম, সে পারিপার্শ্বিকও অবস্থাপন্ন সভ্যসমাজের ছায়ায় অন্ধকারে ঢাকা বিপরীত দিক। সভ্যসমাজের আবর্জনা ফেলার স্থান। সেখানেও অনাবিষ্কৃত চির-অন্ধকার—মেরুলোকের মত চির অন্ধকার। এ ধরনের বীভৎসতার সঙ্গে তাহার পরিচয় না-থাকা নয়। তবুও এমন করিয়া প্রত্যক্ষ মুখোমুখি হইয়া সে কখনও দাঁড়ায় নাই। সে হাঁপাইয়া উঠিল।

নির্মলা এবং ললিতার ঘরেও আগন্তুক আসিয়াছে। মত্ত জড়িত কণ্ঠের অশ্লীল হাস্য-পরিহাস চলিতেছে।

বসন্তর ঘর হইতে সে লোক দুইটা চলিয়া গিয়াছে, আবার নূতন আগন্তুক আসিয়াছে।

প্রৌঢ়া দলের পুরুষগুলিকে লইয়া মদ খাইতে বসিয়াছে। নিতাইকে আবার একবার চা দেওয়া হইয়াছে। সে ভাবিতেছিল ঠাকুরঝিকে। ইচ্ছা হইতেছিল—এখনই এখান হইতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া সে পলাইয়া যায়। কলঙ্ক তো তাহার হইয়াই গিয়াছে, সে কলঙ্কের ছাপ ঠাকুরঝির অঙ্গেও লাগিয়াছে। হয়তো তাহার স্বামী এজন্য তাহাকে পরিত্যাগই করিবে—বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবে। দশের ভয়ে তার বাপও হয়তো তাহাকে,বাড়ীতে স্থান দিবে না। আজ তাহার সব লজ্জা শেষ হইয়া গিয়াছে। ঘর ভাঙিতে আর বাকী নাই। ভাঙিয়াই

গিয়াছে। তার আর ভয় কেন? আজ তো নিতাই গিয়া ঠাকুরঝির হাত ধরিয়া বলিতে পারে—"এস, আজ হইতে তোমারও যে গতি, আমারও সেই গতি।" নিতাই চঞ্চল হইয়া উঠিল। আবার অনেকক্ষণ ভাবিয়া সে স্থির করিল—চলিয়াই সে যাইবে, ইহাদের এই মেলার গানের আসর সারিয়া চলিয়া যাইবে। কিন্তু গ্রামে নয়, অন্য যেখানে হোক—এত বড় দুনিয়ায় যেদিকে মন চায় সেই দিকে চলিয়া যাইবে। মুহূর্তে পূর্বের চিন্তা কল্পনা সব তাহার পাল্টাইয়া গিয়াছে—না না, সে হয় না। ঠাকুরঝির ভাঙা ঘর আবার জোড়া লাগিবে, তাহার সুখের সংসার আবার সুখে ভরিয়া উঠিবে।

ঠাকুরঝি তাহাকে ভুলিয়া যাক। না দেখিলেই ভুলিয়া যাইবে। সন্তান-সন্ততিতে তাহার কোল ভরিয়া উঠুক, সুখে সম্পদে সংসার উথলিয়া পড়ুক, স্বামী সন্তান সংসার লইয়া সে সুখী হোক।

চৌদ্দ

বিগত রাত্রিটা প্রায় বিনিদ্র চোখেই সে যাপন করিয়াছিল। কিছুতেই ঘুম আসে নাই। ভোরে উঠিয়াই সে ঝুমুর দলের আস্তানা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। একটা প্রকাণ্ড দীঘিকে মাঝখানে রাখিয়া দীঘির চারিপাশে মেলা বসিয়াছে। রাসপূর্ণিমায় রাসোৎসব মেলা; দীঘির পূর্ব দিকে রাধাগোবিন্দের মন্দির; পাশেই সেবাইত বৈষ্ণব বাবাজীর আখড়া; মুখ হাত ধুইয়া নিতাই সেই রাধাগোবিন্দের মন্দিরে গিয়া বসিল। রাসমঞ্চে অষ্টসখীপরিবৃতা রাধাগোবিন্দকে তাহার বড় ভাল লাগিল। সেখানেই বসিয়া সে গান রচনা আরম্ভ করিয়া দিল। রাধাকৃষ্ণের যুগল-রূপের স্তবগান। প্রথমে গুন গুন করিয়া গানখানি রচনা শেষ করিয়া—বেশ গলা ছাড়িয়া গান আরম্ভ করিল। মিষ্ট গলার গানে বেশ কয়েকজন লোকও জমিয়া গেল। আখড়ার মোহন্তও বাহির হইয়া আসিলেন।

নিতাই গাহিতেছিল—

"আশ মিটায়ে দেখ রে নয়ন যুগল-রূপের মাধুরী!"

মোহন্ত চোখ বুজিয়া ঘাড় নাড়িয়া তাল দিতে দিতে একজনকে বলিলেন—খোল আন তো বাবা।

মোহন্ত খোল লইয়া নিজেই সঙ্গত আরম্ভ করিয়া দিলেন। গান শেষ হইলে বলিলেন—তোমার কণ্ঠটি তো বড় ভাল! পদাবলী জান বাবা?

নিতাই পদাবলী কথাটা বুঝিল না। বিনীত ভাবে প্রশ্ন করিল—আজ্ঞে!

—মহাজন পদাবলী বাবা—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাসের পদ?

নিতাই হাত জোড় করিয়া বলিল—প্রভু, অধীনের অধম নীচ কুলে জন্ম। এ সব কি করে জানব বাবা!

হাসিয়া মোহন্ত বলিলেন—জন্ম তো বড় নয় বাবা, কর্মই বড়, মহাপ্রভু আমার আচণ্ডালে কোল দিয়েছেন।

মুহূর্তে নিতাইয়ের চোখ দুইটা জলে ভরিয়া উঠিল, বলিল—কর্মও যে অতি হীন প্রভু; ঝুমুর দলে—বেশ্যাদের সঙ্গে থাকি, কবিগান করি।

—কবিগান কর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু।

—যে গান তুমি গাইলে, সে কি তোমার গান?

মাথা নত করিয়া সলজ্জ হইয়া নিতাই বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মোহন্ত সাধুবাদ দিয়া বলিলেন—ভাল ভাল! চমৎকার গান! তারপর বলিলেন—কর্ম তোমার তো অতি উচ্চ কর্মই বাবা। তোমার ভাবনা কি! যাঁরা কবি, তাঁরাই তো সংসারে মহাজন, তাঁরাই তো সাধক। কবির গানে ভগবান বিভোর হন। চণ্ডীদাসের পদাবলী শুনে মহাপ্রভু ভাবে বিভোর হয়ে নাচতেন।

টপ্‌ টপ্‌ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল নিতাইয়ের চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল, সে বলিল—কিন্তু সঙ্গ যে অতি নীচ সঙ্গ বাবা, বেশ্যা—

মোহন্ত হাসিয়া হাত তুলিয়া ইঙ্গিতে নিতাইকে বাধা দিলেন, বলিলেন—প্রভুর সংসারে নীচ কেউ নাই বাবা। নিজে, পরে নয়—নিজে নীচ হলে সেই ছোঁয়াচে পরে নীচ হয়। নীল চশমা চোখে দিয়েছ বাবা? সূর্যের আলো নীলবর্ণ দেখায়। তোমার চোখের চশমার রঙের মত তোমার মনের ঘৃণা পরকে ঘৃণ্য করে তোলে। মনের বিকারে এমন সুন্দর পৃথিবীর উপর রাগ করে মানুষ আত্মহত্যা করে মরে। আর বেশ্যা? বাবা, চিন্তামণি বেশ্যা—সাধক বিল্বমঙ্গলের প্রেমের গুরু। জান বাবা, বিল্বমঙ্গলের কাহিনী?

নিতাই বিল্বমঙ্গলের কাহিনী জানিত। গ্রামের বাবুদের থিয়েটারে বিল্বমঙ্গল পালা সে দেখিয়াছে। সে বলিল—হ্যাঁ। কাহিনীটা সব তাহার মনে পড়িয়া গেল।

মোহন্ত সস্নেহে বলিলেন—তবে?

নিতাই ফিরিয়া আসিল—অদ্ভুত এক মন লইয়া। ঝুমুর দলের মেয়েগুলি গানবাজনায় নাচে সুরে তালে পারদর্শিনী বলিয়া কবিয়াল নিতাই বাহিরে তাহাদের খাতির করিত, কিন্তু মনের গোপন কোণে ঘৃণাই সঞ্চিত ছিল। আজ এই মুহূর্তে সেটুকুও যেন মুছিয়া গেল। মনটা যেন তাহার জুড়াইয়া গিয়াছে। ফিরিবার পথে বার বার তাহার চোখে জল আসিল। কাপড়ের খুঁটে সে চোখ মুছিল-আর মনে মনে বাবাজীকে প্রণাম করিল। মনে মনে সংকল্প করিল গোবিন্দের প্রসাদের সঙ্গে সে বাবাজীর প্রসাদকণাও চাহিয়া লইবে।

ঝুমুর দলের আস্তানায় আসিয়া সে অবাক হইয়া গেল। মনে হইল, এও বুঝি গোবিন্দের কৃপা।

আশ্চর্য! আজিকার প্রভাতের এই স্থান ও পাত্র-পাত্রীগুলির রূপের সহিত গতরাত্রির স্থান ও পাত্র-পাত্রীগুলির এতটুকু মিল নাই। সমস্ত স্থানটা গোবরমাটি দিয়া অতি পরিপাটীরূপে নিকাইয়া ফেলা হইয়াছে। গাছতলায় একটি কলার পাতায় অনেকগুলি ফুল, মেয়েগুলি স্নান সারিয়া জলসিক্ত চুল পিঠে এলাইয়া দিয়া শান্তভাবে বসিয়া আছে; সকলের পরনেই লালপাড় শাড়ী—একটি নিবিড় এবং গভীর শান্ত পবিত্রতার আভাস যেন সর্বত্র পরিস্ফুট।

বসন্ত পিছন ফিরিয়া বসিয়া ছিল, নির্মলা ও ললিতা বসিয়া ছিল এইদিকে মুখ ফিরাইয়া। তাহারা অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—বেশ মানুষ যা হোক তুমি। এই এত বেলা পর্যন্ত কোথা ছিলে বল দেখি?

বসন্ত মুখ ফিরিয়া চাহিল। নিতাই মৃদু হাসিল। বসন্ত মুখ ফিরাইয়া লইল এবং পরক্ষণেই সে উঠিয়া রান্নাশালে চলিয়া গেল। নিতাই আসিয়া নির্মলা ও ললিতার কাছে বসিয়া বলিল—বাঃ, ভারি ভাল লাগছে কিন্তুক; চারিদিক নিকানো, তোমরা সব স্নান করেছ, লালপেড়ে কাপড় পরেছ—

হাসিয়া নির্মলা বলিল—আজ যে লক্ষ্মীপুজো গো দাদা !

—লক্ষ্মীপুজো ?

—হ্যাঁ। পূর্ণিমে বেরস্পতিবার, আমাদের বারমেসে লক্ষ্মীপুজো আজ।

নিতাই অবাক হইয়া গেল। এতদিন মেলামেশা করিয়াও এ কথাটা সে জানিত না। ইহাদেরও ধর্মকর্ম আছে। সে প্রশ্ন করিল—কখন হবে লক্ষ্মীপুজো ?

—সেই সন্ধ্যেবেলায়। আজ তোমার পালা আরম্ভ হতে সেই ল'টার আগে লয়।

প্রৌঢ়া বলিল—বাবা আমার ভক্তিমান লোক। ভাল লোক।

ললিতা বিচিত্র হাসি হাসিয়া বলিল—লোক ভাল, কিন্তু পাল্লা মোগলের। খানা—

প্রৌঢ়া ইঙ্গিত করিয়া বলিল—চুপ।

বসন্ত আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার হাতে একটি গ্লাস। গ্লাসটি বাড়াইয়া দিয়া বলিল—লাও।

নিতাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—কি ?

মুখ মচকাইয়া বসন বলিল—মদ লয়, ধর !

নিতাই গ্লাসটি লইয়া দেখিল—সদ্য প্রস্তুত ধূমায়িত চা।

ললিতা হাসিয়া বলিল—বুঝে-সুঝে খেও ভাই জামাই ; বশীকরণের ওষুধ দিয়েছে।

বসন্ত চলিয়া যাইতেছিল, সে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল—আগুন পোড়ারমুখে।

নিতাই হাসিয়া কথাটা নিজের গায়ে লইয়া বলিল—তাই দাও ভাই, কয়লার ময়লা ছুটে যাক। আগুনের পারা বরণ হোক আমার। জান তো ?

"আগুনের পরশ পেলে কালো কয়লা রাঙা বরণ।"

ললিতা খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল—যাও কেনে, আগুনের শীষ তো জ্বলছেই, গায়ে গায়ে পরশ নিয়ে আগুন ধরিয়ে নিয়ে এস।

বসন্তের চোখে ছুরির ধার খেলিয়া গেল, কিন্তু পরমুহূর্তে সে হাসিয়া বলিল—মদ জ্বলে দেখেছিস ? বলিয়া নিজের দেহখানা দেখাইয়া সে বলিল—এ হ'ল মদের আগুন। বলিয়া সে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

নিতাইয়ের মনে পড়িল গত রাত্রির কথা ; সে হাসিল।

ইহার মধ্যে নিতাই বসন্তের হইয়া গিয়াছে। বসন্ত জানিয়াছে নিতাই তাহার।

মেয়েদের সেদিন সমস্ত দিন উপবাস। সে উপবাস তাহারা নিষ্ঠার সহিত পালন করিল। সন্ধ্যায় ফলমূল, সন্দেশ, দুধ, দই, নানা উপচারে ও ফুল, ধূপ, দীপ নানা আয়োজনে পরম ভক্তির সহিত তাহারা লক্ষ্মীপুজা করিল। পূজা শেষে প্রৌঢ়াকে কেন্দ্র করিয়া এক একটি সুপারি হাতে ব্রতকথা শুনিতে বসিল। নিতাই অদূরেই বসিয়া ছিল। অপর পুরুষগুলি দূরে মদ্যপান করিতে বসিয়াছে। মদ খাইতে খাইতেই তাহারা রাত্রির আসরের জন্য সাজসজ্জা করিতেছে। বেহালাদার বেহালার পরিচর্যায় ব্যস্ত ; বার্নিশের শিশি, তার, রজন লইয়া বসিয়াছে। দোহারটা ঢুলীর সহিত তাল লইয়া তর্ক বাধাইয়াছে। হাতে তাল দিতেছে, আর বলিতেছে—এই—এই—এই ফাঁক। বাজনদার আপন মনেই বাজাইয়া চলিয়াছে। সে দোহারের কথা গ্রাহ্যও করিতেছে না।

মহিষের মত লোকটা মদের ঝোঁকে ঝিমাইতেছে। সম্মুখে জ্বলিতেছে ধুনী। অগ্নিকুণ্ডে মোটা মোটা কাঠের চ্যালা গুঁজিয়া দেওয়া হইয়াছে। ধোঁয়ার সঙ্গে লাল আগুনের শিখা জ্বলিতেছে। লোকটা ঝুমুর দলের পাহারাদার। চুপ করিয়া বসিয়া আছে। অদূরে মেয়েদের

আসর। তাহারই কেন্দ্রস্থলে বসিয়া প্রৌঢ়া ব্রতকথা বলিতেছিল।

* *

ব্রতকথা শেষ হইল। হুলুধ্বনি দিয়া সকলে লক্ষ্মীকে প্রণাম করিল। তারপর প্রসাদ লইয়া চলিয়া গেল যে যাহার আপন ঘরে। অর্থাৎ ওই খড়ের কুটরিতে। প্রৌঢ়া পুরুষদের ডাকিয়া বলিল—যাও সব, প্রসাদ লাও গা। অর্থাৎ নাও গে যাও।

নিতাই একটা গাছতলায় বসিয়া ছিল। বসন নিজের ঘরে ঢুকিবার মুখে দুয়ারে দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিল—শোন।

—আমাকে বলছ ?

—হ্যাঁ।

আজ এই নিষ্ঠাবতী বসন্তর কাছে যাইতে নিতাইয়ের এতটুকু সঙ্কোচ হইল না। ঘরে ঢুকিয়া সে পরমাত্মীয়ের মত স্নেহমধুর হাসি হাসিয়া বলিল—কি বলছ বল।

বসন্ত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ চোখ নামাইয়া মৃদু মিষ্ট স্বরে বলিল—একটু প্রসাদ খাও। বলিয়াই সে পরিপাটি করিয়া ঠাঁই করিয়া একখানি পাতায় ফলমূল সন্দেশ সাজাইয়া দিল। বসনের এই নূতন রূপ দেখিয়া নিতাই মুগ্ধ হইয়া গেল ; সেই বসন এমন হইতে পারে !

নিতাই আসনের উপর বসিয়া পড়িল। খাইতে খাইতে বলিল—জয়-জয়কার হোক তোমার।

বসন বলিল—এক টুকরো পেসাদ রেখো যেন।

চকিত হইয়া নিতাই বলিল—পেসাদ ?

—হ্যাঁ, নাগরের পেসাদ খেতে হয়। সে হাসিল। বসনের মুখে এমন হাসি নিতাই কখনও দেখে নাই। সে অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বসন জিনিসপত্র গুছাইবার অজুহাতে তাহার দিকে পিছন ফিরিল। গুনগুন করিয়া সে গান করিতেছিল। নিতাই সে গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল।

'তোমার চরণে আমারই পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি,
জাতিকুলমান সব বিসর্জিয়া নিশ্চয় হইনু দাসী।'

বা! বা! বা! এমন গান! নিতাই উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল।

'কহে চণ্ডীদাস—'

—কি ? কি ? বসন! চণ্ডীদাস কি ?

দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বসন বলিল—মহাজনের গান—চণ্ডীদাসের পদ যে।

—চণ্ডীদাসের পদ তুমি জান ?

—জানি। বসন্ত হাসিল।—আমাদের গানের খাতায় কত পদ লেখা আছে।

পনেরো

রাত্রি নয়টার পর দুই দলে পাল্লা দিয়া গান আরম্ভ হইল। কিন্তু তাহার মধ্যে চণ্ডীদাসের গান, মহাজনের পদ নাই। আকাশ আর পাতাল। রাত্রির আলোকোজ্জ্বল মেলার নৈশ-আনন্দ-সন্ধানী মানুষের জনতার মধ্যে নগ্ন জীবনের প্রমত্ত তৃষ্ণার গান। বক্ষোভাণ্ডের মধ্যে প্রবৃত্তির উত্তাপে আনন্দরস গাঁজিয়া যেন স-ফেন মন্থরসে পরিণত হইয়াছে।

প্রথম আসর পাইয়াছিল বিপক্ষ দল। সে-দলের কবিয়ালটি রঙ-তামাশায় দক্ষ লোক। আসরে নামিয়াই সে নিজে হইল বৃন্দে দূতী—নিতাইকে করিল কৃষ্ণ; পালা ধরিল মানের। অভিমানিনী নায়িকার দূতীরূপে সে গানে কৃষ্ণকে গালাগালি আরম্ভ করিল। ধূয়া ধরিল—

"কা-দা জা-মের বো-দা—কষের রসে ওলো মজেছে কালা,
আমের গায়ে মিছে—ধরিল রঙ—মিছে সুবাস ঢালা।
চন্দ্রাবলী কাদা জাম—
রাধে আমার পাকা আম—"

তাহার পরেই সে আরম্ভ করিল খেউড়। চন্দ্রাবলীর রূপ গুণ কাদা জামের সহিত তুলনা উপলক্ষ্য করিয়া সে বসনের রূপ-গুণের অশ্লীল বিকৃত ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া দিল। তবে লোকটার ছন্দে দখল আছে, আসরটাকে অশ্লীল রসে মাতাল করিয়া তুলিল। এ দলের পুরানো কবিয়াল বসন্তের চড় খাইয়া যে দল ত্যাগ করিয়াছে, সেই লোকটাই বসন্তের প্রতিটি দোষ ও খুঁতের সংবাদ ওই দলের কবিয়ালকে দিয়াছে। কবিয়ালটা বসন্তের দিকে আঙুল দেখাইয়া চন্দ্রাবলীর খেউড় গাহিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অশ্লীল ভঙ্গিতে নৃত্য শুরু করিল বিপক্ষ দলের মেয়েগুলি। তাহারা পর্যন্ত বসন্তের দিকে আঙুল দেখাইয়া নাচিল।

নিতাই শঙ্কিত হইয়া উঠিল। এই খেউড়ের আসরে তাহার গান জমিবে না, জমাইতে সে পারিবে না। খেউড় তাহার যেন আসে না। মুখে যেন বাধে। কিন্তু শঙ্কা তাহার নিজের পরাজয়ের জন্য নয়। সে বসন্তর কথা ভাবিয়াই শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল। যে মেয়ে বসন্ত! একদণ্ডে সে আগুন হইয়া উঠে। আসরেই সে একটা কাণ্ড না করিয়া বসে! বার বার সে বসন্তর মুখের দিকে চাহিতেছিল। কিন্তু এই পাল্লার ক্ষেত্রে আশ্চর্য ধৈর্য বসন্তের; চুপ করিয়াই বসন্ত বসিয়া আছে—যতবার নিতাইয়ের চোখে চোখ মিলিল, ততবার তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে হাসির অর্থ বুঝিতে নিতাইয়ের ভুল হইল না, হাসিয়া বসন্ত ইঙ্গিতে বলিতে চাহিতেছিল—শুনছ? এর শোধ দিতে হবে; নিতাইয়ের মনে পড়িল গতরাত্রের কয়টি কথা, বসন্ত তাহাকে প্রথম সম্ভাষণেই বলিয়াছে—কয়লা-মানিক লয়, তুমি আমার কালোমাণিক। আমার ছিদ্র কুম্ভে জল রেখেছ, আমার মান রেখেছ তুমি।

বসন্তকে আজ বড় ভাল দেখাইতেছে। নাচের আসরের সাজসজ্জা করিবার তাহার অবকাশ হয় নাই; এলোচুলই পিঠের উপর পড়িয়া আছে, লালপেড়ে তসরের শাড়ীখানিই সে একটু আঁটসাট করিয়া পরিয়াছে; সকলের চেয়ে ভাল লাগিতেছে তাহার চোখের সুস্থ দৃষ্টি। মেয়েরা আজ কেহই মদ খায় নাই, সেও খায় নাই। কিন্তু আশ্চর্য! বসনের চোখের দৃষ্টিই সকলের দৃষ্টির চেয়ে সাদা মনে হইতেছে। অদ্ভুত দৃষ্টি বসন্তের! চোখে মদের নেশার আমেজ ধরিলে তাহার দৃষ্টি যেন রক্তমাখা ছুরির মতো রাঙা এবং ধারালো হইয়া উঠে। আবার সুস্থ

বসন্তের চোখ দেখিয়া মনে হইতেছে—এ চোখ যেন রূপার কাজললতা।

বিপক্ষ দলের ওস্তাদ গান শেষ করিয়া বসিল। আশেপাশে শ্রোতার দল জমিয়াছিল, পচা মাছের বাজারে মাছির মত। পয়সা-আনি-দুয়ানি-সিকি-আধুলিতে প্যালার থালাটা ততক্ষণে একেবারে ভরিয়া উঠিয়াছে, গোটা টাকাও পড়িয়াছে দুই-তিনটা। গান শেষ হইতেই শ্রোতারা হরিবোল দিয়া উঠিল—হরি হরি বল ভাই। বিচিত্র, ইহাই উহাদের সাধুবাদ!

পাশেই সস্তা তেলেভাজা ও মাংসের দোকান—মদও বিক্রী হয় গোপনে—সেখানে আর এক দফা ভিড় জমিয়া গেল—এবং দলের দুইটা মেয়েকে লইয়া দোকানের ভিতর চেয়ার টেবিলে আসর করিয়া বসাইয়া কয়েকটি শৌখিন চাষী খাবার খাইতে বসিয়া গেল।

কপালে হাত ঠেকাইয়া মা-চণ্ডীকে প্রণাম করিয়া নিতাই উঠিল। কিন্তু হাত-পা তাহার ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে। গলা যেন শুকাইয়া যাইতেছে;—এই এত বড় মত্ত-তৃষাতুর জনতা, ইহাদের কি দিয়া সে তৃপ্ত করিবে? অনেক ভাবিয়া সে গান ধরিল—

"মদ সে সহজ বস্তু নয়,
চোখেতে লাগায় ধাঁধাঁ—কালোকে দেখায় সাদা—
রাজা সে খানায় পড়ে রয়!"

কবিয়ালদের সকলের চেয়ে বড় বুদ্ধি হইল কূটবুদ্ধি; এবং বড় শক্তি হইল গলাবাজি, অর্থাৎ জোর করিয়া আপন বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। হয়-কে নয় এবং নয়-কে হয় করিয়া গলার জোরেই কবিয়ালরা জিতিয়া যায়। বুদ্ধি করিয়া অশ্লীল রসের গালিগালাজ বাদ দিয়া নিতাই সেই চেষ্টা করিল। সে ধরিল—

"বৃন্দে তুমি নিন্দে আমার কর অকারণ,
নয় অকারণ—কারণ খেয়ে মত্ত তোমার মন।"

'নতুবা ওগো মাতাল বৃন্দা, তুমি নিশ্চয় চন্দ্রাবলীর নিন্দা করিতে না। চন্দ্রাবলী কে? যে রাধা, সেই চন্দ্রাবলী। যে কালী, সেই কৃষ্ণ। চন্দ্রাবলীর দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ। আগে তেঁতুল খাও, মাথায় জল দাও—নেশা ছুটাও, তারপর চন্দ্রাবলীর দিকে চাও। দেখিবে চন্দ্রাবলীর মধ্যে রাধা, রাধার মধ্যেই চন্দ্রাবলী। রাধাতন্ত্রের মানের পালার দশ পৃষ্ঠার দশম লাইন পড়িয়া দেখিও।' তারপর সে আরম্ভ করিল—চন্দ্রাবলীর রূপবর্ণনা। অর্থাৎ বসন্তের রূপকেই সে বর্ণনা করিল। একেবারে সপ্তম স্বর্গের বস্তু করিয়া তুলিল। বসন্ত নাচিতেছিল। সুস্থ দেহমনে আজ সে বড় ভাল নাচিতেছিল;—কিন্তু রূপ-যৌবন আজ কামনায় লাস্যে তীব্র ও তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে নাই। সেটা নেশার অভাবেও বটে এবং নিতাইয়ের গানে ঐ রসের অভাবেও বটে। শুধু বসন্তের নাচই নয়, ক্রমে ক্রমে আসরটা ধীরে ধীরে ঝিমাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল; জনতা কমিয়া আসিতে শুরু হইল। দুই-চারিজন যাইবার সময় বলিয়া গেল—দূর!

তাহাদের থালায় প্যালা পড়িল না বলিলেই হয়।

প্রৌঢ়া কয়েকবার নিম্নস্বরে নিতাইকে বলিল—রঙ চড়াও, ওস্তাদ, রঙ চড়াও!

ঢুলিদার বসন্তের কাছে গিয়া বলিল—একটুকুন হেলেদুলে, চোখ একটুকুন খেলাও!

বসন্ত চোখ খেলাইবে কি, চোখ ভরিয়া তার বার বার জল আসিতেছে। হেলিয়া দুলিয়া হিল্লোল তুলিবে কি, দেহ যেন অবসাদের ভারে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। আসরে নামিয়া শ্রোতাদের এমন অবহেলা তাহাকে বোধ করি কখনও সহ্য করিতে হয় নাই। নিতাইয়ের গানের তত্ত্বকথায় বিরক্ত হইয়া তাহার দিকে লোকে ফিরিয়াও চাহিতেছে না। নিতাইয়ের ধর্মকথার জ'লো রসে তাহার নাচে রঙ ধরিতেছে না। সর্বোপরি দলের পরাজয়টাই তাহার কাছে মর্মান্তিক হইয়া

উঠিতেছে। নিম্নশ্রেণীর দেহব্যবসায়িনী রূপ-পসারিনী তাহারা, দেহ ও রূপ লইয়া তাহাদের অহঙ্কার আছে, কিন্তু সে শুধু অহঙ্কারই—জীবনের মর্যাদা নয়। কারণ তাহাদের দেহ ও রূপের অহঙ্কারকে পুরুষেরা আসিয়া অর্থের বিনিময়ে পায়ে দলিয়া চলিয়া যায়। পুরুষের পর পুরুষ আসে। দেহ এবং রূপকে এতটুকু সম্ভ্রম করে না, রাক্ষসের মত ভোগই করে, চলিয়া যাইবার সময় উচ্ছিষ্ট পাতার মত ফেলিয়া দিয়া যায়। তাই ইহাদের জীবনের সকল মর্যাদা পুঞ্জীভূত হইয়া আশ্রয় লইয়াছে নৃত্যগীতের অহঙ্কারটুকুকে আশ্রয় করিয়া। ওই দুইটা বস্তুই যে তাহাদের জীবনের একমাত্র সত্য—সে কথা তাহারা বুঝে। তাহারা বেশ ভাল করিয়াই জানে যে, ভাল নাচগানের যে কদর—তাহা মেকী নয়। হাজার মানুষ চুপ করিয়া শোনে তাহাদের গান, বিস্ফারিত মুগ্ধদৃষ্টিতে দেখে তাহাদের রূপের মধ্যে বিচিত্র এক অপরূপের অভিব্যক্তি। মরুভূমির মত জীবনের ওইটুকুই তাহাদের একমাত্র শ্যামল সজল আশ্রয়কুঞ্জ। এই শ্রেষ্ঠত্ববোধেই তাহারা অগণ্য শ্রোতার উপস্থিতিকে নগণ্য করিয়া মাথা তুলিয়া নাচে, গায়। সমাজে গণ্যমান্য প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন লোকের সঙ্গেও অকুণ্ঠিত দাবিতে গানের তাল মান লইয়া তর্ক করে। খেউড় কবির দলের অপরিহার্য অঙ্গ, বিশেষ করিয়া ঝুমুরযুক্ত কবির দলের পক্ষে। খেউড় না জানিকে এ দলে গাওনা করার অধিকারই হয় না। মাসী বলে—কত বড় বড় মুনি-ঋষি কামশাস্ত্রে হার মানিয়া—শেষ তাহাদের কাছে শিষ্যত্ব লইয়াছে। তাহা হইলে খেউড় ছোট জিনিস কিসে? আজ দলের পরাজয়ের সঙ্গে—সেই মর্যাদা ধূলায় লুটাইয়া পড়িতেছে বলিয়া অবসাদে বসন্ত যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছে। জিতিতে হইলে কবিয়াল ও নাচওয়ালী দুজনকে একসঙ্গে জিতিতে হইবে। একজন জিতিবে, একজন হারিবে—তাহা হয় না।

কোনমতে গান শেষ করিয়া পরাজয়ের বোঝার ভারে মাথা হেঁট করিয়া নিতাই বসিল। ঢোলের বাজনায় তেহাই পড়িল—বসন্তও নাচ শেষ করিল। নাচ শেষ করিয়া আসরে সে আর বসিল না; শ্রান্ত অথচ ক্ষুব্ধ পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল। প্রৌঢ়া দলনেত্রী তাহার দিকে চাহিয়া কেবল প্রশ্নের সুরে ডাকিয়া বলিল—বসন?

বসন ফিরিয়া দাঁড়াইল—বলিল শরীর খারাপ করছে, মাসী।

প্রৌঢ়া হাসিল, বলিল—দেখ না, দোসরা আসরে বাবা আমার কি করে!

বসন্ত নিতাইয়ের দিকে একবার ফিরিয়া চাহিল। নিতাই দেখিল—সে চোখে তাহার ক্ষুরের ধার। পরমুহূর্তেই বসন্ত বাহির হইয়া গেল।

প্রৌঢ়া কিন্তু অদ্ভুত। সে যেন এতটুকু বিচলিত হয় নাই। দলের বেহালাদারকে নির্বিকার ভাবেই বলিল—প্যালার থালাটা আন।

লোকটি প্যালার থালা আনিয়া নামাইয়া দিয়া বলিল—কয়েকটা দোয়ানীর বেশী আর পড়ে নাই। সবসুদ্ধ দু টাকাও হইবে না।

প্রৌঢ়া বলিল—গুনে দেখ কত আছে। তারপর সে পানের বাটাটা টানিয়া লইয়া বলিল—মেলার আসর, রঙ-তামাসা-খেউড়ী-খোরাকী লোকেরই ভিড়! নইলে বাবার গানে আর ওই ফচকে ছোঁড়ার গানে? গান তো বোঝ তুমি, তুমিই বল কেনে?

বেহালাদার বলিল—তা বটে। তবে রঙেরই আসর যখন, তখন না গাইলে হবে কেনে বল? রঙের গানও তো গান।

প্রৌঢ়াকে স্বীকার করিতে হইল। সে বলিল—একশো বার! রঙ ছাড়া গান না গান ছাড়া রঙ! একটা মোটা পান মুখে পুরিয়া সে আবার বলিল—ওস্তাদের মার শেষ আসরে। দেখ না, বাবা আমার কি করেই দেখ না!

নিতাই চুপ করিয়া বসিয়া ভবিতেছিল।

নির্মলা, ললিতা মেয়ে দুইটির মুখেও হাসি নাই, পরস্পরে তাহারা মুখভার করিয়াই কথা বলিতেছে—বোধ হয় এই হারজিতের কথাই হইতেছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিতাই মাথা হেঁট করিল। সকলের লজ্জা যেন জমিয়া জমিয়া বোঝা হইয়া তাহার মাথার উপর প্রচণ্ড ভারে চাপিয়া বসিতেছে। শুধু তো লজ্জাই নয়, দুঃখেরও যে তাহার সীমা ছিল না। খেউড় যে তাহার কিছুতেই আসিতেছে না!

* * *

ওদিকে বিপক্ষ দলের ঢুলী বাজনা আরম্ভ করিয়া দিল; লোকটার বাজনার মধ্যে যেন জয়ের ঘোষণা বাজিতেছে। বাজানোর ভঙ্গির মধ্যেও হাতের সদম্ভ আস্ফালন। ও-দলের কবিয়াল বোধ হয় বাহিরে ছিল—সে একেবারে নাটকীয় ভঙ্গীতে একটা ছড়া কাটিতে কাটিতে ছুটিয়া আসরে আসিয়া প্রবেশ করিল—

"হায়—হায়—হায়—হায় কালাচাঁদ বলে গেল কি?"

'কুকুরী আর ময়ূরী, সিংহিনী আর শূকরী, শিমূলে আর বকুলে, কাকে আর কোকিলে, ওড়না আর নামাবলী, রাধা আর চন্দ্রাবলী—তফাৎ নাইক, একই!' ইহার পরই সে আরম্ভ করিল অশ্লীলতম উপমা। সঙ্গে সঙ্গে আসরে যেন বৈদ্যুতিক স্পর্শ বহিয়া গেল। লোকে হরিবোল দিয়া উঠিল। এবার লোকটা একটু থামিয়া সুর ভাঁজিয়া গান ধরিল—

"আ—কালাচাঁদের কালো মুখে আগুন জেলে দে গো—
টিকেয় আগুন দিয়ে রাধে তামুক খেয়ে লে গো!"

অর্থহীন উপমায় যে-কোন প্রকারে কতকগুলা গালিগালাজ দিয়া এবং অশ্লীল কদর্য ভাব ও উপমার অবতারণা করিয়া সে আসরটাকে অল্প সময়ের মধ্যেই জমাইয়া তুলিল।

নিতাই আসর হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

ও-দলের একটা মেয়ে নাচিতে নাচিতে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া নিজেই আখর দিয়া গাহিয়া উঠিল—

"ধর ধর ধর কালাচাঁদে, পলায়ে যে যায় গো!
একা আমি ধরতে লারি সবাই মিলে আয় গো!"

আসরে একটা তুমুল হাসির রোল পড়িয়া গেল। নিতাই কিন্তু তাহাতেও রাগ করিল না। সে হাসিমুখেই মেয়েটির এই তীক্ষ্ণ উপস্থিত বুদ্ধির জন্য আন্তরিক প্রশংসা করিয়া বলিল—ভাল, ভাল! ভাল বলেছ তুমি!

* * *

আসর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নিতাই ঝুমুর দলের আস্তানায় বসন্তের খুপরির দুয়ারে দাঁড়াইল। খড়ের আগড়টা আধখোলা অবস্থায় রহিয়াছে। ভিতরে একটা লণ্ঠন মৃদুশিখায় জ্বলিতেছে। বাহিরে খোলা আকাশের তলায় উঠানে বিস্তীর্ণ অন্ধকারের মধ্যে সেই একটা অগ্নিকুণ্ডই উজ্জ্বলতর হইয়া জ্বলিতেছে এবং তাহারই সম্মুখে মহিষের মত প্রচণ্ডকায় লোকটা পূর্ণ-উদর হিংস্র কোন পশুর মত বাসা আগলাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে। পদশব্দে সে ফিরিয়া চাহিল, এবং নিতাইকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আবার মুখ ফিরাইয়া ঝিমাইতে লাগিল। নিতাই বসন্তের ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইল, ঢুকিতে সাহস করিল না। দেহ-ব্যবসায়িনীর ঘর! সে বাহির হইতেই ডাকিল—বসন?

—কে? ঘরের ভিতর হইতে বিরক্তিভরা কণ্ঠস্বরে বসন্ত উত্তর দিল।

—আমি নিতাই। রসিকতা করিয়া 'কয়লা-মাণিক' বলিতে তাহার মন উঠিল না।

—কি ?

—ভেতরে যাব ?

—কি দরকার ?

—একটু'ন কাজ আছে।

মুহূর্তে বসন্ত নিজেই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অধীর অস্থির ক্ষুব্ধ পদক্ষেপে সে ঘরের ভিতর হইতে নিতাইয়ের সম্মুখে আসিয়া ঝলকিয়া উঠিল, ঠিক খাপ হইতে একটানে বাহির হইয়া আসা তলোয়ারের মত। বাহিরের অগ্নিকুণ্ডের আলোর রাঙা আভা পূর্ণ দীপ্তিতে তাহার সর্বাঙ্গে যেন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া ঝলকিয়া উঠিল। নিতাই দেখিয়া শঙ্কিত হইল। আজিকার অপরাহ্নের পূজারিণী, শান্ত স্নিগ্ধ নম্র সে বসন্ত আর নাই, এ সেই পুরানো চেনা বসন্ত। তাহার সর্বাঙ্গে ক্ষুরের ধার ঝলসিয়া উঠিয়াছে। রাঙা আলোর প্রতিচ্ছটায় সে যেন রক্তাক্ত। সে ফিরিয়া আসিয়া মদ খাইয়াছে। চোখে ছটা বাজিতেছে।

বসন্ত বলিল—আমি যাব না। আমি যাব না। কেনে এসেছ তুমি ?

নিতাই কোন উত্তর দিতে পারিল না। শঙ্কিত দৃষ্টিতে বসন্তর মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অকস্মাৎ কঠিনতম আক্রোশে বসন্ত তাহার গালে সজোরে একটা চড় বসাইয়া দিল, বলিল —ন্যাকার মত আমার সামনে তবু দাঁড়িয়ে! কেনে, কেনে, কেনে? প্রশ্নই করিল, কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা করিল না। মুহূর্তে যে অধীর অস্থির গতিতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল সেই গতিতেই সে ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া গেল। এই আঘাত করিয়াও যেন তাহার ক্ষোভ মেটে নাই। ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া সে নিজের কপালে কয়টা চাপড় মারিল; তাহার শব্দটাই সে কথা বলিয়া দিল।

নিতাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর সেই আগলদার লোকটার কাছে আসিয়া ডাকিয়া বলিল—পালোয়ান!

লোকটা দলের মধ্যে পালোয়ান বলিয়া পরিচিত। নেশায় ভাম লোকটা রাঙা চোখ তুলিয়া তাহার দিকে শুধু চাহিল মাত্র, কথার উত্তর দিল না। সম্মুখের কয়টা দাঁত শুধু বাহির হইয়া পড়িল।

নিতাই বলিল—তোমার কাছে মাল আছে ? মদ ?

নিরুত্তর লোকটা এদিক-ওদিক হাতড়াইয়া একটা বোতল বাহির করিয়া আগাইয়া দিল। বোতলটা হাতে করিয়াও নিতাই একবার ভাবিল—তারপর এক নিঃশ্বাসে খানিকটা গিলিয়া ফেলিল। বুকের ভিতরটা যেন জ্বলিয়া গেল; সমস্ত অন্তরাত্মা যেন চিৎকার করিয়া উঠিল; দুর্দমনীয় বমির আবেগে—সমস্ত দেহটা মোচড় দিয়া উঠিল, কিন্তু প্রাণপণে সে আবেগ সে রোধ করিল। ধীরে ধীরে আবেগটা যখন নিঃশেষিত হইল তখন একটা দুর্দান্ত অধীরতাময় চঞ্চল অনুভূতি তাহার ভিতরে সদ্য জাগিয়া উঠিতেছে। সে তখন আর এক মানুষ হইয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীও আর এক পৃথিবী হইয়া যাইতেছে। আশ্চর্য!

সব যেন দুলিতেছে: ভিতরটা জ্বলিতেছে; দুনিয়া যেন তুচ্ছ হইয়া যাইতেছে! এখন সে সব পারে। সে-কালের ভীষণ বীরবংশী বংশের রক্তের বর্বরত্বের মৃতপ্রায় বীজাণুগুলি মদের স্পর্শে—জলের স্পর্শে মহামারীর বীজাণুর মত, পুরাণের রক্তবীজ হইয়া অধীর চঞ্চলতায় জাগিয়া উঠিতেছে।

আবার সে খানিকটা মদ গলায় ঢালিয়া দিল।

দ্বিতীয়বার আসরে যখন সে প্রবেশ করিল তখন তাহার রূপটাই পাল্টাইয়া গিয়াছে। সে আর এক মানুষ হইয়া উঠিয়াছে। নীতিকথাগুলো ভুলিয়াছে, পাপপুণ্য লইয়া হিসাব-নিকাশ ভুলিয়াছে, হা-হা করিয়া অশ্লীল ভঙ্গিতে হাসিতে ইচ্ছা হইতেছে।

হইবে না কেন? সামাজিক জীবনে মানুষের যাহা কিছু পাপ, যাহা কিছু কদর্য, যাহা কিছু উলঙ্গ অশ্লীল তাহাই আবর্জনা-স্তূপের মত যেখানে জমা হয়, সেই বিষাক্ত পরিবেশের মধ্যে তাহার জন্ম। দারিদ্র্য ও কঠিন দাসত্বের অনুশাসনের গণ্ডীর ভিতর বহু যুগ যাহারা বাস করিয়া আসিতেছে, সে তাহাদেরই সন্তান। মা সেখানে অশ্লীল গালিগালাজে শাসন করে, উচ্ছ্বসিত স্নেহে অশ্লীল কথায় আদর করে, সন্তানকে সকৌতুকে অশ্লীলতা শিক্ষা দেয়। অশ্লীলতা, কদর্য ভাষা, ভাব নিতাইয়ের অজানা নয়। কিন্তু জীবনে সামান্য শিক্ষা এবং কবিয়ালির চর্চা করিয়া সে-সব সে এতদিন ভুলিতে চাহিয়াছিল। সে-সবের উপর একটা অরুচি, একটা ঘৃণা তাহার জন্মিয়াছিল। কিন্তু আজ বসন্তের কাছে আঘাত খাইয়া সেই আঘাতে ক্ষোভে নির্জলা মদ গিলিয়া সে উন্মত্ত হইয়া গেল। মদের নেশার মধ্যে দুরন্ত ক্ষোভে অর্জন-করা সব কিছুকে ভুলিয়া সে উদ্গীরণ করিতে আরম্ভ করিল জান্তব অশ্লীলতাকে। ছন্দ এবং সুরে তাহার অধিকার ছিল, কণ্ঠস্বর তাহার অতি সুমিষ্ট; দেখিতে দেখিতে আসর জমিয়া উঠিল।

আসরে ঢুকিবার মুখেই সে কবিয়ালসুলভ নাটকীয় ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে দোহারদের ডাকিয়া কহিল—দোহারগণ!

সবিস্ময়ে সকলে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। ওই অপ্রস্তুত হওয়ার পর নিতাই যে আবার ফিরিবে এ প্রত্যাশা কেহ করে নাই। তাহারা সাড়া দিতে ভুলিয়া গেল।

ভুলিল না মাসী। সে চতুরা। সে মুহূর্তে সাড়া দিল—বল ওস্তাদ!

নিতাই বলিল—

ধন্ম কথায় যখন মন ওঠে না—বসে না—তখন দিতে হয় গাল!
ছুঁচের মত মিহি ধারে যখন কাজ হয় না তখন চালাতে হয় ফাল!
যখন ঠাণ্ডা জলে গলে না ডাল—
তখন কষে দিতে হয় তেঁতুল কাঠের জ্বাল!

ওদিকের কবিয়ালটা রসিকতা করিয়া বলিয়া উঠিল—বলিহারি কালাচাঁদ, টিকেয় আগুন দিয়েছ লাগছে; তেতেছ!

নিতাই বলিল—এমন তেমন তাতা নয় বিন্দে, জ্বলছি! সেই জ্বালাতে তোকে বলছি—শোন! সহজে তো তুই শুনবি না!—দোহারগণ!

—হাঁ—হাঁ!

নিতাই শুরু করিল—

বুড়ী দূতী নেড়ী কুত্তি জুত্তি ছাড়া নয় সায়েস্তা।
ছড়ির বাড়ি মারলে ভাবে একি আমার সুখ অবস্থা!

বুড়ীকে ছড়ি মেরে কিছু হয় নাই। এবার লাগাও জুতি—লাগাও পয়জার! তারপর প্রৌঢ় লোকটার মুখের দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—বুড়ীর কোঁচকা মুখে টেরীর বাহার দেখুন, তেলকের বাহার দেখুন—

এ বুড়ো বয়সে বৃন্দে কোঁচকা মুখে রসকলি কাটিস নে!

রসের ভিয়েন জানিস নেকো গেঁজলা তাড়ি ঘাঁটিস নে।

তারপর তার মুখের কাছে আঙুল নাড়িয়া বলিল—

ফোকলা মুখে লম্বা জিভে ঝরা লালা চাটিস নে!

আসরে হৈ-হৈ পড়িয়া গেল। আসর জমিয়া গিয়াছে। সে নিজেও সেই জমজমাটের মধ্যে হারাইয়া গিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

সে গান ধরিল—

বুড়ী মরে না—মরণ নাই!
হায়—হায়!

গানের সঙ্গে সে নাচিতে লাগিল।

বুড়ী খানকী নেড়ী কুটনী মরে নাই, মরে নাই
ও হায়, তার মরণ নাই—মরণ নাই!

তাহার পর একটার পর একটা অশ্লীল বিশেষণ তাহার মুখ হইতে বাহির হইতে লাগিল। শ্রোতাদের অট্টহাসিতে রাত্রিটা যেন কাঁপিতেছে, সমস্ত আসর এবং আলো তাহার চোখের সম্মুখে দুলিতেছে। একটা মানুষ দুইটা বলিয়া বোধ হইতেছে। ওই তো দুইটা ললিতা; ওই তো বাজাইতেছে দুইটা বায়েন; মাসীও দুইটা হইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। অকস্মাৎ একসময়ে সে দেখিল—বসন্তও দুইটা হইয়া নাচিতেছে! বাহবা—বাহবা—সে কি নাচ! বসন্ত কখন আসিয়া আসরে নামিয়া নাচিতে শুরু করিয়া দিয়াছে।

চরমতম অশ্লীলতায় আসরটাকে আকণ্ঠ পঙ্ক-নিমগ্ন করিয়া দিয়া টলিতে টলিতে সে বসিল। এবার তাহাদের প্যালার থালাটা ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহার গান শেষের সঙ্গে সঙ্গেই এবার বিপুল কলরবে হরিধ্বনি উঠিল।

প্রৌঢ়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল—বাবা আমার! এই দেখ, মাল না খেলে কি মেলা-খেলায় গান হয়? যে বিয়ের যে মন্তর! বসন, বাবাকে আমার আর এক পাত্য দে। গলা শুকিয়ে গিয়েছে।

বসন! এতক্ষণে নিতাই স্থির দৃষ্টিতে বসন্তের মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিল।

নিতাইয়ের চোখ রক্তমাখা, পায়ের তলায় সমস্ত পৃথিবী দুলিতেছে; শঙ্কা, সঙ্কোচ, সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছে জয়ের আনন্দের উচ্ছ্বাসে। বসন্ত অসঙ্কোচ দৃষ্টিতে নিতাইয়ের চোখে চোখ মিলাইয়া চাহিয়া রহিল। সে চোখে তাহার কামনা ঝরিতেছে। নিতাইয়ের বুকেও কামনা সাড়া দিয়া উঠিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য বসন্ত! সে হাসিতেছে। কিছুক্ষণ পূর্বে সে নিতাইয়ের গালে চড় মারিয়া যে নিষ্ঠুর অপমান করিয়াছে, তাহার জন্য এখন সে একবিন্দু লজ্জাও বোধ করিতেছে না; বরং উচ্ছ্বসিত আনন্দে তাহার চোখ-মুখ ঝলমল করিতেছে। নিতাইয়ের গরবে সে গরবিনী হইয়া উঠিয়াছে।

—দাও, পাত্য দাও। নিতাই হাসিল।

—এস, ঘরে এস, ভাল মদ আছে—বেলাতী। বসন্ত তাহার হাত ধরিয়া গরবিনীর মত তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল।

ঘরে কাচের গেলাসে বিলাতী মদের সঙ্গে জল মিশাইয়া বসন্ত নিতাইকে দিল। নিঃশব্দে গেলাসটি শেষ করিয়া নিতাই বসনের দিকে চাহিয়া হাসিল। এ বসন্ত যেন নূতন বসন্ত; নিতাইয়ের নেশার ঘোর ঝলমল করিয়া উঠিল।

সে আবার হাত বাড়াইল। তাহার তৃষ্ণা জাগিয়াছে। বলিল—দাও তো, আমাকে আর

এক গেলাস দাও।

বসন্ত হাসিয়া আবার অল্প একটু তাহাকে দিল। সেটুকুও পান করিয়া নিতাই বলিল—দাঁড়াও, তোমাকে একটুকুন দেখি।

বসন হাসিয়া বলিল—না, চল আসরে চল।

—না। দাঁড়াও। সে বসন্তর হাত চাপিয়া ধরিল।

বসন্ত দাঁড়াইল। নিম্নশ্রেণীর দেহব্যবসায়িনী; পথে পথে ব্যবসায়ের বিপণি পাতিয়া যাহাদের ব্যবসায় করিয়া ঘুরিতে হয়—লজ্জা তাঁহাদের থাকে না, থাকিলে চলে না। পথে নামিয়া লজ্জাকে প্রথম পথের ধূলায় হারাইয়া দিয়া যাত্রা শুরু করে। বসন্ত তাহাদের মধ্যেও আবার লজ্জাহীনা। সেই বসন্তের মুখ তবু আজ রাঙা হইয়া উঠিল।

এবং আরও আশ্চর্যের কথা; মুহূর্ত পরেই তাহার চোখে জল দেখা দিল। সে কাঁদিয়া ফেলিল। নিতাই সবিস্ময়ে বলিল—তুমি কাঁদছ কেনে?

মুখ ফিরাইয়া লইয়া বসন্ত বলিল—না, আমাকে তুমি দেখো না। এক পা সে পিছাইয়াও গেল। সঙ্গে সঙ্গে দুই পা আগাইয়া আসিয়া নিতাই বলিল—কেন?

বসন্ত বলিল—আমার কাশরোগ আছে। মধ্যে মধ্যে কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠে। সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় জর হয় দেখ না? টপ টপ করিয়া বসন্তের চোখ হইতে এবার জল ঝরিয়া পড়িল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সে আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া হাসিল।

—হোক। নিতাইয়ের বুকখানা তখন ফুলিয়া উঠিয়াছে; উচ্ছৃঙ্খল বর্বর, বীরবংশীর সন্তান রূঢ়তম পৌরুষের ভয়াল মূর্তি লইয়া অগ্রসর হইয়া আসিল। সে রূপ ঠাকুরঝি কখনও সহ্য করিতে পারিত না। কিন্তু বসন্ত ঝুমুর দলের মেয়ে, তার রক্তের মধ্যে বর্বরতম মানুষের ভীষণতম ভয়াল মূর্তি সহ্য করিবার সাহস আছে। নিতাইকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বিষণ্ণ দৃষ্টিতে প্রসন্ন মুখে সে তাহার প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। এবং নিতাইয়ের বাহুবন্ধনের মধ্যে নির্ভয়ে নিজেকে সমর্পণ করিয়া পিষ্ট হইতে হইতে সে মৃদুস্বরে গাহিল:

"বঁধু তোমার গরবে গরবিনী হাম গরব টুটাবে কে!
তেজি' জাতি কুল বরণ কৈলাম তোমারে সঁপিয়া দে'।"

নিতাইয়ের বাহুবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল। গান শুনিয়া সে মুগ্ধ হইয়া গেল—এ কি গান! তাহার নেশা যেন ফিকা হইয়া যাইতেছে। এ কি সুর! তাহার স্খলিত হাত দুইখানা বসন্ত নিজেই নিজের গলায় জড়াইয়া লইয়া আবার গাহিল—

"পরাণ-বঁধুয়া তুমি,
তোমার আগেতে মরণ হউক এই বর মাগি আমি।"

অপূর্ব! অপূর্ব লাগিল নিতাইয়ের; চোখ তাহার জলে ভরিয়া উঠিল। ধরা গলায় সে প্রশ্ন করিল—কোথা শিখলে এ গান? এ কোন্ কবিয়ালের গান?

হাসিয়া বসন্ত দুইটি হাত জোড় করিয়া প্রণাম করিয়া গাহিল—

"যে হোল সে হোল—সব ক্ষমা কর বলিয়া ধরিল পায়,
রসের পাথারে না জানে সাঁতার ডুবল শেখর রায়।"

গান শেষ করিয়া সে বলিল—মহাজনের পদ গো!

অধীর মত্ততার মধ্যেও নিতাইয়ের অন্তরের কবিয়াল জাগিয়া উঠিল। সে বসন্তের দুই হাত নিজের গলায় জড়াইয়া লইয়া ধরিয়া বলিল—আমাকে শেখাবে?

বসন্ত আবেগভরে নিতাইয়ের মুখ চুমায় চুমায় ভরিয়া দিল।

ষোল

সকালে নিতাই যখন উঠিল, তখন তাহার জিভের ডগা হইতে বুকের ভিতর পর্যন্ত তেতো হইয়া উঠিয়াছে; কপাল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত জ্বালা করিতেছে। নিজের নিশ্বাসেরই একটা বীভৎস দুর্গন্ধ নিজের নাকে আসিয়া ঢুকিতেছে। সর্বাঙ্গ যেন ক্লেদাক্ত উত্তাপে উত্তপ্ত, বিষে বিষাক্ত! শীতের প্রারম্ভে—তাহার উপর সকালবেলা—এই শীতের সকালেও তাহার মৃদু-মৃদু ঘাম হইতেছে। মাথার মধ্যে অত্যন্ত রূঢ় একটা যন্ত্রণা। সমস্ত চেতনা যেন গ্রীষ্মদ্বিপ্রহরের উত্তপ্ত মাঠের ধূলায় আচ্ছন্ন আকাশের মত ধূসর—এবং মাঠের মরীচিকার মত কম্পমান। পেট জ্বলিতেছে, বুক জ্বলিতেছে, ভিতরটা শুকাইয়া যেন কাঠ হইয়া গিয়াছে।

বসন্ত ঘরের মধ্যেই ছিল, সে আপন মনে অন্য কাজ করিতেছিল। কয়েকদিনের বসবাসের জন্য তৈরী খড়ের ঘর, সেই ঘর সে গোছগাছ করিয়া পরিপাটি করিয়া সাজাইতে অকস্মাৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভোরে উঠিয়াই ঘরকন্নার কাজগুলা যেন তাহাকে দুই হাত মেলিয়া হাতছানি দিয়া ডাকিয়াছে। মেলায় সে কয়েকখানা ছবি কিনিয়াছিল, নূতন আমলের সাধারণ দেশীয় লঘুরুচি শিল্পীদের হাতের বিলাতী বর্ণসমাবেশে আঁকা—জার্মানিতে ছাপা রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলার ছবি। দুখানা উলঙ্গ মেমসাহেবের ছবি। ছবিগুলি সে ঘরের বাঁশের খোঁটার গায়ে টাঙাইতেছিল। নিতাইকে উঠিতে দেখিয়া সে মৃদু হাসিয়া বলিল—উঠলে?

ওই হাসি এবং এই প্রশ্নেই নিতাইয়ের আজ রাগ হইয়া গেল—রাঙা চোখে কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া সে তিক্ত-কণ্ঠে উত্তর দিল—হ্যাঁ।

কণ্ঠস্বরের রূঢ়তায় বসন্ত প্রথমটা তাহার দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল, তারপর হাসিল, বলিল—শরীর খারাপ হয়েছে, না? হবে না? প্রথম দিনেই যে মদটা খেলে! মুখ হাত ধোও, চা খাও, খেয়ে চান কর। কাঁচা চা ক'রে দি। তুমি সেদিন দিয়েছিলে আমাকে, ভারি উপকার হয়েছিল।

নিতাই কথার উত্তর দিল না, টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল। তাহার পায়ের তলার মাটি এখনও যেন কাঁপিতেছে।

প্রাতঃকৃত্য সারিয়া সে যখন ফিরিল, তখন সে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছে। দীঘির ঘাটে মাথার যন্ত্রণা উপশমের জন্য বার বার মাথা ধুইয়া ফেলিয়াছিল। ভিজা চুল হইতে তাহার সর্বাঙ্গে জলধারা ঝরিতেছিল, সে ধারাগুলি পড়িতেছিল যেন উত্তপ্ত লোহার পাত্রে জলবিন্দুর মত। বসন্ত তখন একগাদা কাপড় লইয়া কাচিবার জন্য বাহির হইতেছিল। নিতাইকে দেখিয়া সে কাপড় রাখিয়া তাড়াতাড়ি চা করিয়া দিল। লেবুর রস দিয়া কাঁচা চা নিতাইয়ের বড় ভাল লাগিল। চায়ের বাটিটা শেষ করিয়া সে আবার ঘরের মেঝেয় বিছানো খড়ের উপরেই শুইয়া পড়িল। শুইবামাত্র নিতাই আবার ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঠিক ঘুম নয়, অশান্ত তন্দ্রা। তাহারই মধ্যে নিতাই শুনিতে পাইল বসন্ত বলিতেছে—খড়ের ওপরেই শুলে?

সে চোখ মেলিয়া চাহিল। একগাদা ভিজা কাচা কাপড় কাধে ফেলিয়া আপাদমস্তক-সিক্ত বসন্ত দুয়ারের গোড়ায় দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছে।

—ওঠ, একটা মাদুর পেতে একটা বালিশ দি। অ ভাই নির্মলা, তোর দাদাকে একটা মাদুর আর-একটা বালিশ দিয়ে যা, আমার সর্বাঙ্গ ভিজে।

নিতাই চোখ বুজিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল—না।

বসন্ত এবার আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া শাসনের সুরে বলিল—না নয়, ওঠ,, ওঠ।

নিতাই এবার উঠিয়া বিস্ফারিত চোখে বসন্তর দিকে চাহিল।

—কই? দাদা কই? বলিয়া হাসিমুখে নির্মলা মেয়েটি আসিয়া ঘরে ঢুকিল। সযত্নে মাদুর ও বালিশ পাতিয়া দিতে দিতে বলিল—ওঃ, দাদা আমার আচ্ছা দাদা! যে গান কাল গেয়েছে!

নিতাইয়ের এতক্ষণে গত রাত্রির কথা মনে পড়িল। মস্তিষ্কের মধ্যে একটা বিদ্যুৎচমক খেলিয়া গেল।

এই মুহূর্তেই ও-পাশের খড়ের ঘর হইতে দলের নেত্রী প্রৌঢ়া বাহির হইয়া আসিল।—বাবা আমার উঠেছে? পরমুহূর্তেই সে শিহরিয়া বলিয়া উঠিল—ও মা-গো। তোর কি কাণ্ড বসন? এই ক'দিন জ্বর ছেড়েছে, আর আজ এই সকালেই তু এমনি করে জল ঘাঁটছিস!

মৃদু হাসিয়া বসন্ত বলিল—সব কাচতে হ'ল মাসী। এইবার চান করব।

—কাচবার কি দরকার ছিল?

নির্মলা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল—পিরীতি সামান্য নয় মাসী। দাদা কাল বমি ক'রে বিছানা-পত্য ভাসিয়ে দিয়েছে।

প্রৌঢ়াও এবার মৃদু হাসিল, বসন্তকে বলিল—যা যা, ভিজে কাপড় রেখে চান করে আয়। কাপড় ছেড়ে বরং ও-গুলো মেলে দিবি।

দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া নিতাই প্রশ্ন করিল—আমি বমি করেছি?

নির্মলা আবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঘাড় হেঁট করিয়া নিতাই ভাবিতেছিল—ঘরের এই দুর্গন্ধ তাহা হইলে তাহারই বমির দুর্গন্ধ! অনুভব করিল, তাহার সর্বাঙ্গে ওই বমির ক্লেদ লাগিয়া আছে। সেই গন্ধই নিশ্বাসের সঙ্গে তাহার ভিতরটাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে! নিজের অঙ্গের ক্লেদ এইবার এক মুহূর্তে তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল।

—মাথা ধরেছে, লয় গো দাদা? তুমি শোও, আমি খানিক মাথা টিপে দি! নির্মলা তাহার কপালে হাত দিল। বড় ঠাণ্ডা আর নরম নির্মলার হাতখানি। কপাল যেন জুড়াইয়া গেল। ভারি আরাম বোধ হইতেছে। কিন্তু নিতাই স্নান না করিয়া আর থাকিতে পারিতেছে না। সে উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল—না চান করব আমি।

বসন্ত কাপড়গুলি রাখিতেছিল, সে বলিল—নির্মলা, ওই দেখ, 'বাসকো'র পাশে ফুলেল তেলের বোতল রয়েছে, দে তো ভাই বার ক'রে। তারপর সে নিতাইকে বলিল—বেশ ভাল ক'রে তেল মাখো। দেহ ঠাণ্ডা হবে, শরীলের আরাম পাবে। আর সাবান লাও তো তাই লাও।

—না। বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। ইচ্ছা হইতেছে তাহার জলে ডুবিয়া মরিতে! চীৎকার করিতে ইচ্ছা হইতেছে।

সে যখন স্নান করিয়া ফিরিল, তখন বসন্ত স্নান করিয়া কাপড়চোপড় ছাড়িয়া বাক্স লইয়া কিছু করিতেছিল। নিতাই ঘরে ঢুকিতেই সে হাসিয়া বলিল—আজ কেমন সাজব, তা দেখবে। ওই দেখ, আয়না আছে, চিরুনি আছে, স্নো আছে, মুখে লাও খানিক।

স্নান করিয়া নিতাই সুস্থ হইয়াছে বটে কিন্তু মনের অশান্তি ইতিমধ্যে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ছি! এ সে করিয়াছে কি! ছি! ছি! ছি! স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিবার পথে সে সংকল্প করিয়া আসিয়াছে, আজই সে পলাইয়া যাইবে। ইহারা যাইতে দিবে না, সুতরাং পলাইয়া যাওয়া ভিন্ন উপায় নাই। জিনিসপত্র পড়িয়া থাক, 'বাজার ঘুরিয়া আসি' বলিয়া সে বাহির হইয়া চলিয়া যাইবে। অন্য জিনিসপত্রের জন্য দুঃখ নাই। কিই বা জিনিসপত্র! কয়েক-খানা কাপড় দুইটা জামা একটা কম্বল, দুইটা কাঁথা বালিশ। দুঃখ কেবল তাহার দপ্তরটির জন্য। দপ্তর তো তাহার এখন নেহাৎ ছোটটি নয় যে গায়ের জোরে আলোয়ানের আড়াল দিয়া বগলে পুরিয়া লইয়া পালাইবে। রামায়ণ, মহাভারত এবং আরও অনেক পুরাণ লইয়া তাহার দপ্তরটা অনেক বড় হইয়া গিয়াছে। মেলায়, বাজারে—যেখানে সে গিয়াছে—দুই-একখানা করিয়া বই কিনিয়াছে। কবিগান, পাঁচালী, তর্জার গান, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, মনসার ভাসান, চণ্ডীমাহাত্ম্য, সত্যপীরের গান, কবিকঙ্কণ চণ্ডী, অন্নদামঙ্গল—অনেক বই সে কিনিয়াছে। বাবুদের পাড়ায় ছেঁড়া পাতা কুড়াইয়া পড়িয়া ভাল লাগিলে সংগ্রহ করা তাহার একটা রোগ ছিল। সেগুলিও আছে। বাবুদের থিয়েটারের আশপাশ ঘুরিয়া কয়েকখানা আদি-অন্তহীন নাটকও তাহার সংগ্রহে আছে। এ ছাড়া নিজের লেখা গানের খাতা, সেও যে এখন অনেক হইয়াছে—সব গানই সে এখন খাতায় লিখিয়া রাখে।

একখানা কাপড় তুলিয়া ধরিয়া দেখাইয়া বসন্ত বলিল—উলঙ্গবাহার শাড়ী। এই কাপড় আজ পরব।

কথাটার ইঙ্গিত নিতাই বুঝিল। অর্থাৎ বসন্ত আজ প্রায় নগ্নরূপে নৃত্য করিবে। সে শিহরিয়া উঠিল।

বসন্ত বলিল—দেখব আজ কার জিত হয়, তোমার গানের, না আমার নাচের।

নিতাই আয়না-চিরুনিটা রাখিয়া দিয়া জামা পরিতে আরম্ভ করিল। মুহূর্তে সে দ্বিধাশূন্য হইয়াছে, থাক তাহার দপ্তর পড়িয়া—সে চলিয়া যাইবে। এখানে সে থাকিতে পারিবে না।

—জামা পড়ছ যে? যাবে কোথা?

—এই আসি।

বসন্ত নিতাইয়ের আকস্মিক ব্যস্ততা দেখিয়া বিস্মিত হইল, বলিল—মানে?

—এই একটুকুন বাজার ঘুরে আসি।

—না। এখন বাজারে যেতে হবে না। একটুকুন ঘুমিয়ে লাও। ওই দেখ খানিকটা মদ ঢেলে রেখেছি, খাও, খোঁয়ারি ছেড়ে যাবে।

—না। আমি একবার মন্দিরে যাব।

—মন্দিরে?

—হ্যাঁ।

—এই বলছ বাজার, এই বলছ মন্দির। কোথা যাবে ঠিক করে বল কেনে?

—বাজারে যাব। রাধাগোবিন্দের মন্দিরেও যাব!

—চল। আমিও যাব।

নিতাই বিব্রত হইয়া চুপ করিয়া বসন্তর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

রূপোপজীবিনীর কিন্তু অদ্ভুত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—নিতাইয়ের মুখের দিকে সে চাহিয়া ছিল, হাসিয়া বলিল—কি ভাবছ বল দেখি?

নিতাই উত্তর দিল না।

বসন্ত এবার বলিল—আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে মন সরছে না ? লজ্জা লাগছে ?

নিতাই প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। অতর্কিত আকস্মিক প্রশ্নে সে চকিত হইয়া উঠিল; অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিল—না—না—না। কি বল্‌ছ তুমি বসন! এস—এস।

বসন্ত বলিল—মুখ দেখে কিন্তু তাই মনে হচ্ছে আমার, তুমি যেন পালাতে পারলে বাঁচ। কে যেন তোমাকে দড়ি বেঁধে টানছে। আচ্ছা, বাইরে চল তুমি, আমি কাপড় ছেড়ে যাই।

নিতাই অবাক হইয়া গেল। বসন্তর চোখের দৃষ্টি তো ছুরি নয়—স্‌চ, একেবারে বুকের ভিতর বিঁধিয়া ভিতরটাকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পায়। সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কেমন করিয়া বসন্তকে এড়াইয়া চলিয়া যাইবে সে তা-ই ভাবিতে আরম্ভ করিল।

ওদিকে নির্মলা, ললিতা তাহাদের প্রিয়জন বেহালাদার ও প্রধান দোহারকে লইয়া তখন মদের আসর পাতিয়া বসিয়া গিয়াছে। মহিষের মত বিরাটকায় লোকটা—প্রৌঢ়া দলনেত্রীর মনের মানুষ। লোকটা অদ্ভুত। ঠিক সেই একভাবেই বসিয়া আছে, অনাদি অনন্তর মত। উহাকে দেখিয়া নিতাই তাহার সমস্ত কথা স্মরণ না করিয়া পারে না। লোকটা কথাবার্তা বলে না, আমড়ার আঁটির মত সৌষ্ঠবহীন রাঙা চোখ মেলিয়া চাহিয়াই থাকে। রাক্ষসের মত খায়; প্রায় সমস্ত দিনটাই ঘুমায়, রাত্রে আকণ্ঠ মদ গিলিয়াও ঠায় জাগিয়া বসিয়া থাকে। তাহার সামনেই থাকে একটা আলো—আর একটা প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড। এই ভ্রাম্যমান পরিবারটির পথে-পাতা ঘরের গণ্ডির ভিতর রূপ ও দেহের খরিদ্দার যাহারা আসে তাহাদের দৃষ্টি তাহার উপর না পড়িয়া পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুর্দান্ত মাতালগুলা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহাকে দেখিয়া—অনেকটা শান্ত প্রকৃতিস্থ হইয়া ভদ্র সুবোধ হইয়া উঠে। লোকটা ভাম হইয়া একটা মদের বোতল লইয়া বসিয়া আছে, নির্বিকার উদাসীনের মত। রান্নাশালার চালায় প্রৌঢ়া তেলেভাজা ভাজিতে বসিয়াছে।

ওই এক অদ্ভুত মেয়ে! মুখে হাসি লাগিয়াই আছে, আবার মুহূর্তে চোখ দুইটা রাঙা করিয়া এমন গম্ভীর হইয়া উঠে যে, দলের সমস্ত লোক ত্রস্ত হইয়া পড়ে। আবার পরমুহূর্তেই সে হাসে। গানের ভাণ্ডার উহার পেটে। অনর্গল ছড়া, গান মুখস্থ বলিয়া যায়। গৃহস্থালি লইয়া চব্বিশ ঘণ্টাই ব্যস্ত। উন্মত্ত বুনো একপাল ঘোড়াকে রাশ টানিয়া চালাইয়া লইয়া চলিয়াছে। রথ-রথী-সারথি সবই সে একাধারে নিজে।

নির্মলা হাসিয়া ডাকিল—এস গো দাদা, গরীব বুনের ঘরে একবার এস।

হাসিয়া নিতাই বলিল—কি হচ্ছে তোমাদের ?

—কালকে নক্ষীর বার গিয়েছে, পারণ করছি সকালে। বসন কই ? সে আসছে না কেনে ? মদের বোতলটা তুলিয়া দেখাইয়া সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নিতাই সবিনয়ে নীরবে হাত দুইটি কেবল জোড় করিয়া মার্জনা চাহিল।

বেহালাদার হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ। তাকেই ডাক। কান টানলেই মাথা আসবে।

নিতাইয়ের পিছনেই বসন্তের সকৌতুক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল—ম্যাথা এখন পুণ্যি করতে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে কানকেও যেতে হবে। তবে যদি কেটে লাও কানকে, সে আলাদা কথা!

বসন্তর কথা কয়টি নিতাইয়ের বড় ভাল লাগিল। বাঃ, চমৎকার কথাটি বলিয়াছে বসন! খুশী হইয়া নিতাই পিছন ফিরিয়া দেখিল—গতকালকার ভক্তিমতী পূজারিণীর সাজে সাজিয়া বসন্ত দাঁড়াইয়া আছে। বসন্ত হাসিয়া বলিল—চল।

পথের দুইধারেই দোকানের সারি।

বসন্ত সামগ্রী কিনিল অনেক। ফলমূল মিষ্টিতে পুরা একটা টাকাই সে খরচ করিয়া ফেলিল। একটা সিকি ভাঙাইয়া চার আনার আধলা লইয়া নিতাইয়ের হাতে দিয়া বলিল—পকেটে রাখ।

নিতাই আবার চিন্তাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল—এ বাঁধন কেমন করিয়া কাটিয়া ফেলা যায়, সেই কথা। মন্দির হইতে ফিরিলেই তাহাকে লইয়া আবার সকলে টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিবে। বসন্তও তখন আর এ বসন্ত থাকিবে না। হিংস্র দীপ্তিতে তখন বসন্ত ক্ষুরধার হইয়া উঠিবে। বসন্তের রাত্রির রূপ তাহার তাহার চোখের উপর ভাসিতেছে। সে ঠিক করিল, ফিরিবার পথে বসন্তকে বাসায় পাঠাইয়া দিয়া পথ হইতেই সে সরিয়া পড়িবে। অজুহাতের অভাব হইবে না। তাহার কোন গ্রামবাসীর সন্ধান করিবার জন্য মেলাটা ঘুরিবার একটা অজুহাত হঠাৎ তাহার মনে আসিয়া গেল, সে সেটাকে আঁকড়াইয়া ধরিল। এই অবস্থায় বসন্ত আধলাগুলি তাহার হাতে দিতেই ভ্রূ তুলিয়া সে প্রশ্ন করিল—কি হবে?

—ও মা গো! রাজ্যের কানা খোঁড়া মন্দিরের পথে বসে আছে। দান করব। মৃদু হাসিয়া নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া সে বিস্ময়ের ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল—কি ভাবছ তুমি বল দেখি?

ব্যস্ত হইয়া নিতাই অভিনয় করিয়া হাসিয়া বলিল—কিছু না!

—কিছু না?

নিতাই আবার অভিনয় করিয়া বলিল, ভাবছি তোমাকে চিনতে পারলাম না। নিতাই হাসিল।

সে অভিনয়ে বসন্ত ভুলিল, বলিল—আমার ভারি মায়া লাগে গো! আহা! কি কষ্ট বল দিকিনি কানা খোঁড়া রোগা লোকদের? বাপ রে! বলিতে বলিতে সে যেন শিহরিয়া উঠিল। নিতাই সত্যই এবার অবাক হইয়া গেল। একি! বসন্তের চোখ দুইটা জলে ভরিয়া উঠিয়া সে টলমল করিতেছে!

চোখ মুছিয়া বসন্ত আবার হাসিয়া বলিল—সে হাসি বিচিত্র হাসি, এমন হাসি নিতাই জীবনে দেখে নাই—হাসিয়া বসন্ত বলিল—আমার কপালেও অনেক কষ্ট আছে গো! কাল তো তোমাকে বলেছি, আমার কাসির সঙ্গে রক্ত ওঠে। কাসের ব্যামো! এত পান-দোক্তা খাই তো ওই জন্যে। রক্ত উঠলে লোকে বুঝতে পারবে না। আর আমিও বুঝতে পারব না। দেখলেই ভয়, না দেখলেই বেশ থাকি। দলের কেউ জানে না, জানে কেবল মাসী। কিন্তু এখনও নাচতে গাইতে পারি, চটক আছে, পাঁচটা লোক দেখে বলেই দলে রেখেছে। যেদিন পাড় হয়ে পড়ব, সেদিন আর রাখবে না, নেহাৎ ভাল মানুষের কাজ করে তো নোক দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে। নইলে, যেখানে রোগ বেশী হবে, সেইখানেই ফেলে চলে যাবে, গাছতলায় মরতে হবে। জ্যান্ততেই হয়তো শ্যালকুকুরে ছিঁড়ে খাবে।

নিতাই শিহরিয়া উঠিল। বলিল—বসন!

বসন বলিল—সত্যি কথা কবিয়াল—এই আমাদের নেকন। তবে আমার নেকন আরও খারাপ। তুমি সেই ইস্টিশানে গেয়েছিলে—'ফুলেতে ধুলোতে প্রেম'।—কবিয়াল, তখন ধুলোর সঙ্গে মাটির সঙ্গে প্রেম হবে আমার। আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল—দুব্বো ঘাসের রসে আর কতদিন উপকার হবে!

রোজ সকালে বসন্ত দূর্বাঘাস থেঁতো করিয়া রস খায়। অত্যন্ত গোপনে সে এই কাজটি

করে। নিয়মিত খাওয়া হয় না। তাহার অনিয়মিত উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রায় সম্ভব হইয়া উঠে না! মধ্যে মধ্যে প্রৌঢ়া মনে করাইয়া দেয়—বসন, সকালবেলায় দূৰ্ব্বোর রস খাস তো?

বসন্ত কখনও কখনও সজাগ হইয়া উঠে, কখনও বা ঠোঁট উল্টাইয়া বলে—ম'লে ফেলে দিয়ো মাসি। ও আমি আর পারি না।

আবার কাসি বেশী হইলেই সে সভয়ে গোপনে দূর্বাঘাস সংগ্রহ করিতে ছোটে। ঘাস ছেঁচিতে ছেঁচিতে আপন মনেই কাঁদে।

মন্দিরের পথে চলিতে চলিতেই কথা হইতেছিল। সমস্ত কথা শুনিয়া নিতাইয়ের মনটা উদাস হইয়া উঠিল। একটা সুগভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস তাহাব বুক হইতে ঝরিয়া পড়িল। এমন হাসিতে হাসিতে বসন্ত তাহার কাসির অসুখের কথাগুলো বলিল যে নিতাইয়ের মনে হইল, বসন্তের ওই ক্ষীণ হাসিতে ঈষৎ বিস্ফারিত ঠোঁট দুইটির কোলে-কোলে লাল কালির কলমে টানা রেখার মত রক্তের টকটকে রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'ফেলিয়া চলিয়া যাইবে; গাছতলায় মরিতে হইবে। জীবন্তেই হয় তো শেয়াল-কুকুরে ছিঁড়িয়া খাইবে!' সে ছবিগুলা যেন তাহার মনের মধ্যে ফুটিতে লাগিল। অগ্র-পশ্চাৎ তাহার সব ভুল হইয়া গেল। পলাইবার কথা তাহার মনে রহিল না। অজুহাতটার কথাও ভুলিয়া গেল। শুধু নীরবে মাথা হেঁট করিয়া বসন্তের সঙ্গে মন্দিরের দিকে চলিতে আরম্ভ করিল।

কিছুক্ষণ পরেই বসন্ত আবার কথা বলিল—তাহার সে বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর আর নাই; কৌতুক-সরস কণ্ঠে মৃদু হাসিয়া বলিল—গাঁটছড়া বাঁধবে নাকি? গাঁটছড়া?

কথাটা বসন নেহাৎ ঠাট্টা করিয়াই বলিল। আশ্চর্য বসন! এইমাত্র নিজের মরণের কথা এত করিয়া বলিয়া ইহারই মধ্যে সে-সব সে ভুলিয়া বসিয়া আছে।

নিতাই তাহার মুখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিল। স্থির দৃষ্টিতে বসন্তকে কিছুক্ষণ সে দেখিল। শাণিত-ক্ষুরের মত ঝকঝকে ধারালো বসন্তের ধার ক্ষয় হইয়া একদিন টুকরা-টুকরা, হয়ত গুঁড়া হইয়া যাইবে উখায় ঘষা ইস্পাতের গুঁড়ার মত।

বসন্ত হাসিয়া বলিল—দেখছ?

—হ্যাঁ!

—কি দেখছ? কেয়াফুলও শুকোয়। চোখের কোণে কালি পড়েছে!

বসন্তের মুখে তখনও হাসির রেখা। সে হাসি আশ্চর্য হাসি।

নিতাই মুখে কোন উত্তর দিল না। হাত বাড়াইয়া বসন্তের আঁচলখানি টানিয়া লইয়া নিজের চাদরের খুঁটের সঙ্গে বাঁধিতে আরম্ভ করিল।

বসন্ত চমকিয়া উঠিল—ও কি করছ? সে এক বিচিত্র বেদনার্ত উত্তেজনাভরে সে আপনার কাপড়ের আঁচলখানা আকর্ষণ করিয়া বলিল—না না, না। ছি! ও আমি ঠাট্টা করে বলেছিলাম। তুমি কি সত্যি ভাবলে নাকি?

প্রসন্ন হাসিতে নিতাইয়ের মুখখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, সে বলিল—গিঁট আগেই পড়ে গিয়েছে বসন। টেনো না। আমি যদি আগে মরি, তবে তুমি সেদিন খুলে নিও এ গিঁট; আর তুমি যদি আগে মর, তবে সেই দিন আমি খুলে নোব গিঁট।

বসন্তের মুখখানি মুহূর্তে কেমন হইয়া গেল।

ঠোঁট দুইটা, শীতশেষের পাণ্ডুর অশ্বত্থপাতা উতলা বাতাসে যেমন থরথর করিয়া কাঁপে, তেমনি করিয়া কাঁপিতে লাগিল। তাহার রক্তাভ সুগৌর মুখখানা যেন সঙ্গে সঙ্গে সাদা হইয়া

গিয়াছে। গরবিনী দর্পিতা বসন্ত যেন এক মুহূর্তে কাঙালিনী হইয়া গিয়াছে।

নিতাই এবার হাসিয়া বলিল—এস এস, আমার আর তর সইছে না। ঠাকুরের দরবারে রাগ করে না।

—রাগ? বসন্ত বলিল—আমার রাগ সইতে পারবে তো তুমি?

—পায়ে ধরে ভাঙাব! নিতাই হাসিল।—এস এস।

বাসায় ফিরিতেই একটা কলরব পড়িয়া গেল। নির্মলা-ললিতাদের মদের নেশা তখন বেশ জমিয়া আসিয়াছে। ফুলের মালা গলায় গাঁটছড়া বাঁধিয়া নিতাই ও বসন ফিরিবামাত্র তাহাদের দেখিয়া তাহারা হুলুধ্বনি দিয়া হৈ-হৈ করিয়া উঠিল। গাঁটছড়াটা খুলিবার কথা নিতাই বা বসন দুইজনের কাহারও মনে হয় নাই।

নিতাই হাসিতে লাগিল। আশ্চর্য, সে লজ্জা পাইল না- কোন গ্লানিও অনুভব করিল না।

আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য, লজ্জা পাইল বসন্ত। গাঁটছড়াবাঁধা নিতাইয়ের কাঁধের চাদরখানা টানিয়া লইয়া সে লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে ঘরের মধ্যে গিয়া ঢুকিল।

সতেরো

ভ্রাম্যমাণ নাচ-গানের দল। নাচ ও গানের ব্যবসায়ের সঙ্গে দেহের বেসাতি করিয়া বেড়ায়—গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে। কবে কোন্ পর্বে কোথায় কোন্ মেলা হয়, কোন্ পথে কোথা হইতে কোথায় যাইতে হয়—সে সব ইহাদের নখদর্পণে। বীরভূম হইতে মুর্শিদাবাদ, পদব্রজে, গরুর গাড়িতে, ট্রেনে তারপর নৌকায় গঙ্গা পার হইয়া—রাজসাহী, মালদহ, দিনাজপুর পর্যন্ত ঘুরিয়া আষাঢ়ের প্রারম্ভ পর্যন্ত বাড়ি ফেরে।

প্রৌঢ়া বলে—আগে আমরা পদ্মাপারে নিচের দিকেও যেতাম। পদ্মাপারে বাঙাল দেশে আমাদের ভারি খাতির ছিল।

নির্মলা প্রশ্ন করে—পদ্মাপার তুমি গিয়েছ মাসী?

নির্মলার কথা শেষ হইতে না হইতে মাসী পদ্মাপারের গল্প বলিতে বসে। বলে—যাইনি? বাপরে, সে কি ধুম!

তারপর বেশ আরাম করিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া সুপারী কাটিতে কাটিতে বলে—বাতের ত্যাল খানিক মালিশ ক'রে দে দিখি; পদ্মাপারের কথা বলি শোন।

আপসোসের দীর্ঘনিঃশ্বাস্ ফেলিয়া বলে—আঃ মা, তোরা আর কি দেখলি—কি-ই বা রোজগার করলি আর কি-ই বা খেলি। সে 'ছ্যাশ' কি! সোনার 'ছ্যাশ'! মাটি কি! বারোমাস মা-নক্ষী যেন আঁচল পেতে বসে আছেন। সুপুরী কিনতে হয় না মা। সুপুরীর বন। যাও—কুড়িয়ে নিয়ে এস। ডাব নারিকেল—আমাদের 'ছ্যাশে'র তালের মতন। দু-ধারি পাটের 'ক্ষ্যাত'।

সে হাত দুইখানা দীর্ঘ ভঙ্গিতে বাড়াইয়া দিয়া সুবিস্তীর্ণ পাট চাষের কথা বুঝাইয়া দিতে

চেষ্টা করে। তারপর আবার বলে—এক এক পাটের ব্যাপারী কি! পয়সা কত! এই বড় বড় নৌকো। ব্যাপারীদের নজর কি, হাত দরাজ কত। প্যালা দেয় আধুলি, টাকা; সিকির কম তো লয়। আর তেমন কি খাবার সুখ! মাছই কত রকমের। ইলিশ-ভেটকি—কত মাছ মা—'অছল্যি' মাছ! আঃ তেমনি লঙ্কা খাবার ধুম!

ললিতা বলে—আমাদের একবার নিয়ে চল মাসী ওই ছ্যাশে।

মাসী বলে—মা, সি রামও নাই আর সি অযুধ্যেও নাই। সি ছ্যাশে আর আমাদের সে আদরও নাই মা। সি কালে আমরা যেতাম—পালাগান গাইতাম। পদাবলীর গান—আমাদের সি কালের ওস্তাদেরা আবার বেশ রসান দিয়ে পালাগান 'নিকতো'—সে-সব গান আমরা গাইতাম। যে যেমন আসর আর কি! তেলক কাটতে হ'ত, গলায় কণ্ঠি পরতে হ'ত। আবার বাজারে হাটে হালফেশানী গান হ'ত। আজকাল আর পালাগান কে শোনে বল? নইলে পালাগান নিয়েই তো ঝুমুর!

বেহালাদার মাসীর কথা শুনিতে শুনিতে বলিল—উ ছ্যাশের মাঝিদের গান শুনেছ মাসী?

—শুনি নাই? ভারি মিষ্টি সুর। প্রৌঢ়া নিজের মনেই গুন গুন করিয়া সুর ভাঁজিতে আরম্ভ করিল। বার দুয়েক ভাঁজিয়া নিজেই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উঁহু, আসছে না ঠিক।

বেহালাদার কি মনে করিয়া বার দুয়েক বেহালার উপর ছড়ি টানিল, প্রৌঢ়া বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ হ্যাঁ! ওই বটে। কিন্তু বেহালাদার সঙ্গে সঙ্গেই থামিয়া গেল।

নির্মলা সুরটি শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল, বেহালাদার থামিয়া যাইতেই সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল—ওই এক ধারার মানুষ! বাজাতে আরম্ভ করে থেমে গেল!

নির্মলার প্রিয়জন বেহালাদার একটু বিচিত্র ধরণের মানুষ; সারাদিন বেহালাটি লইয়া ব্যস্ত। ছড়িতে রজন ঘষিতেছে, বেহালার কান টানিয়া টানিয়া তার ছিঁড়িতেছে আবার তার পরাইতেছে। কখনও ঝাড়িতেছে, কখনও মুছিতেছে। মাঝে মাঝে কখনও সযত্ন-সঞ্চিত বার্নিশের শিশি হইতে বার্নিশ লইয়া মাখাইতে বসে। কিন্তু বড় একটা বাজায় না। আসরে বাজায়, বাসায় নতুন গানের মহলা বসিলেও বাজায়, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সারাদিন যে মানুষটা বেহালা লইয়াই বসিয়া থাকে সে কখনও আপন মনে কোন গান বাজায় না ইহাই সকলের আশ্চর্য লাগে। ছড়ি টানিয়া সুর বাঁধিতে বাঁধিতেই জীবন কাটিয়া গেল। তবে এক-একদিন, সেও কচিৎ, গভীর রাত্রে সবাই যখন ঘুমায়, সে বেহালা বাজাইতে বসে। সেও একটি গান! এবং তেমন দিনটিরও একটি লক্ষণ আছে। সেদিনের সে লক্ষণ নিতাই আবিষ্কারও করিয়া ফেলিয়াছে। নিতাই পূর্ব হইতেই বুঝিতে পারে। নির্মলার ঘরে আগন্তুক আসিয়া যেদিন সারারাত্রির মহোৎসব জুড়িয়া দিবে সেই দিন; নিতাই বুঝিতে পারে যে আজ বেহালাদার বেহালা বাজাইবে।

সে এক অদ্ভুত গান। নিতাই বাজনায় সে গান শুনিয়াছে। অন্ধকারে কোন গাছতলায় একা বসিয়া বেহালাদার সে গান বাজায়। কিন্তু কেহ কাছে আসিয়া বসিলেই বেহালাদার বেহালাখানি নামাইয়া রাখে। এমন রাত্রে, অর্থাৎ নির্মলার ঘরে মহোৎসবের রাত্রে নিতাই এই গানটি শুনিবার জন্য ঘুমের মধ্যেও উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। নিস্তব্ধ রাত্রে বেহালার সুর উঠিবামাত্র তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায়। কিন্তু সে ওঠে না, শুইয়া শুইয়াই শোনে। একমাত্র মহিষের মত লোকটাকেই বেহালাদার গ্রাহ্য করে না। লোকটা যেন লোকই নয়, একটা জড়-পদার্থ। লোকটাও চুপচাপ রাঙা চোখ দুইটা মেলিয়া নেশা-বিহ্বল দৃষ্টিতে অন্ধকারের দিকে

চাহিয়া থাকে।

ললিতার প্রিয়জন দোহার লোকটি অত্যন্ত তার্কিক, তর্ক তাহার অধিকাংশ সময় ওই বাজনদার লোকটির সঙ্গে। বাজনার বোল ও তাল লইয়া তর্ক তাহাদের লাগিয়াই আছে। মধ্যে মধ্যে ললিতার সঙ্গেও ঝগড়া বাধিয়া যায়। ললিতা তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দেয়, লোকটা মাসীর কাছে নালিশ করে, মাসীর বিচারে পরাজয় যাহারই হউক, সে-ই ললিতার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া বলে—দোষ হইছে আমার, ঘাট মানছি আমি। আর কখুনও এমন কর্ম করব না। কান মলছি আমি। লোকটা সত্যই কান মলে।

নির্মলা ও বসন্ত লোকটার নাম দিয়াছে—'ছুঁচো! ছি-চরণের ছুঁচো।' কথাটা অবশ্য আড়ালে বলিতে হয়, নহিলে ললিতা কোঁদল বাধাইয়া তুমুল কাণ্ড করিয়া বসে। দোহার লোকটি কিন্তু রাগে না, হাসে।

বাজনদারটির প্রিয়তমা কেহ নাই। জুটিলেও টেঁকে না। লোকটির কেমন স্বভাব—যে নারীটির সহিত সে প্রেম করিবে, তাহারই টাকা-পয়সা সে চুরি করিয়া বসিবে। লোকটি প্রৌঢ়। নির্মলা, ললিতা দুইজনেই এক এক সময় তাহার প্রিয়তমা ছিল। কিন্তু ঐ কারণেই বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেছে। লোকটা কিন্তু বাজায় খুব ভাল—যেমন তাহার তালজ্ঞান, বাজনার হাতটিও তেমনি মিঠা। কতবার চুরি করিয়া ঝগড়া করিয়া দল হইতে চলিয়া গিয়াছে, আবার কিছুদিন পর ফিরিয়া আসিয়াছে। লোকটা অতিমাত্রায় চরিত্রহীন। রাত্রে বাজনা বাজায়, দিনে সে ঘুরিয়া বেড়ায় নারীর সন্ধানে।

নির্মলা ললিতা নিতাইয়ের এক নাম দিয়াছে। বলে—'বসন্তের কোকিল'।

বসন্ত নিতাই দুজনেই হাসে।

নূতন জীবনে এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নিতাইয়ের দিন কাটিতে লাগিল। জীবন-স্রোতের টানে কোথা হইতে সে কোথায় আসিয়া পড়িল, ঠাকুরঝি কোথায় ভাসিয়া গেল, রাজা কোথায় থাকিল—এ সব ভাবিতে গেলে তাহার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠে, ছুটিয়া পলাইয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু বসন্তের মুখপানে চাহিয়া সে তাহা পারে না। যে গিঁটটা সে বাঁধিয়াছিল সে গিঁটটা যেন অহরহই বাঁধা আছে, খুলিতেছে না। ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়া, একহাতে চোখের জল মুছিয়া, অন্য হাতখানি কবিগানের সঙ্গে দর্শকের দিকে বাড়াইয়া দিয়া সে নিস্পৃহ নিরাসক্তির এমন একটি আবরণ তৈয়ারী করিয়া লইয়াছে যে, সব কিছুই তাহার সহ্য হইল, অথচ সহনশীলতার গণ্ডী তাহাকে কোনপ্রকারে কোনদিকে সঙ্কুচিত করিল না। বসন্তকে সে ভালবাসিল। দুই হাত দিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিল, কিন্তু ঠাকুরঝিকে সে ভুলিল না। বসন্তের ঘরে যেদিন মানুষ আসে সেদিন এক গাছতলায় শুইয়া মনে মনে ঠাকুরঝির সঙ্গে কথা কয় অথবা বিরহের গান বাঁধে। অহরহই তাহার মনের মধ্যে ঘোরে গানের কলি। বসন্তের কোকিল নাম দেওয়ায় সে একটা গান বাঁধিয়াছে, কবিগানের পাল্লার আসরে যে কোন রকমে খাপাইয়া লইয়া সেই গানটি সে গাহিবেই গাহিবে—

"তোরা—শুনেছিস কি—বসন্তের কোকিল-ঝঙ্কার!
বাঁশী কি সেতার—তার কাছে ছার—
সে গানের কাছে সকল গানের হার।"

'কোকিল' নামটাই তাহার চারিদিকে রটিয়া গিয়াছে। 'কালো-কোকিল'। ওই নামেই সে এখন চারিদিকে পরিচিত।

ইহারই মধ্যে সে অনেক শিখিয়াছে, অনেক সংগ্রহ করিয়াছে। প্রাচীন প্রসিদ্ধ কবিয়াল-গণের অনেক প্রসিদ্ধ পালাগানের লাইন তাহার মুখস্থ। হরুঠাকুর, গোপাল উড়ে, ফিরিঙ্গী কবিয়াল অ্যাণ্টনী সাহেব, কবিয়াল ভোলা ময়রা হইতে নিতাইয়ের মনে মনে বরণ করা গুরু কবিয়াল তারণ মণ্ডল পর্যন্ত কবিয়ালদের গল্প গান সে সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছে। অবসর সময়ে কত খেয়ালই হয় নিতাইয়ের। বসিয়া বসিয়া ঝুমুর দলের মেয়েদের 'লক্ষ্মীর কথা'টিকে সে একদিন পয়ার ছন্দে কবিতা করিয়া ফেলিয়াছে।

লক্ষ্মীর বারের দিন সে বসন্তকে অবাক করিয়া দিল। বসন্ত যখন ব্রতের কথা শোনা শেষ করিয়া ঘরে আসিয়া সযত্নে ঠাঁই করিয়া নিতাইকে প্রসাদ খাইতে দিল, তখন নিতাই বলিল—কথা শোনা হয়ে গেল?

—হ্যাঁ।

—তবে আমার কাছে একবার শুনে লাও।

সবিস্ময়ে বসন্ত বলিল—কি?

—লক্ষ্মীর কথা! বলিয়াই নিতাই হাতখানি বসন্তের দিকে প্রসারিত করিয়া কবিগানের ছড়া বলার সুরে আরম্ভ করিয়া দিল—

"নমো নমো লক্ষ্মী দেবী—নমো নারায়ণী—
বৈকুণ্ঠের রাণী মাগো—সোনার বরণী।
শতদল পদ্মে বৈস—তেঁই সে কমলা।
সামান্য সহে না পাপ—তাই তো চঞ্চলা।"

বসন্ত অবাক হইয়া গিয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল—কোথা থেকে যোগাড় করলে? নতুন পাঁচালীর বই কিনেছ, তাতেই আছে বুঝি?

নিতাই কথার জবাব না দিয়া শুধু হাসিতে লাগিল।

—বল কেনে?

—আগে শোনই কেনে। ভনিতেতেই সব পাবে।

"অধম নিতাই কবি বসন্তের কোকিল—
লক্ষ্মীর বন্দনা গায় শুনহ নিখিল!"

মুখরা দর্পিতা বসন্ত উল্লাসে বিস্ময়ে অধীর হইয়া ছুটিয়া গিয়া সকলকে ডাকিয়া আনিল—ওগো মাসী, নক্ষীর পাঁচালী নিকেছে!

মাসী জিজ্ঞাসা করিল—কি? কে?

বসন্ত হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—নক্ষীর পাঁচালী! লিখেছে তোমার জামাই!

সেদিন সন্ধ্যায় নিজের ঘরে সে আসর করিয়া সকলকে ডাকিয়া কবিয়ালের পাঁচালী শুনাইয়া তবে ছাড়িল। নিতাইকে বলিল—বেশ সুর করে বল!

নিতাইয়ের পাঁচালী শুনিয়া দলের সকলে বিস্মিত হইয়া গেল। সত্যই পাঁচালীটি ভাল হইয়াছিল। তাহা ছাড়া তাহাদের পরিচিত কবিয়ালেরা কবিগান করে, ছড়া কাটে, দুই-চারিটা গানও লেখে, কিন্তু এমনভাবে ধর্মকথা লইয়া কেহ পাঁচালী রচনা করে না। সেকালের বড় বড় কবিয়ালরা করিয়া গিয়াছে, তাই আজ পর্যন্ত চলিয়াছে, ভনিতার সময়ে—সেই সব কবিয়ালদের উদ্দেশে—ইহারা প্রণাম জানায়। সকলে বিস্মিত হইল যে নিতাই তেমনি পাঁচালী রচনা করিয়াছে। এবং সেই দিন হইতেই তাহার সম্ভ্রম আরও বাড়িয়া গেল।

নিতাইয়ের পাঁচালীই এখন এই দলটিতে ব্রতকথা দাঁড়াইয়াছে। শুধু এই দলেই নয়, আর

পাঁচ-সাতটা দলের ওস্তাদ এই পাঁচালী লিখিয়া লইয়া গিয়াছে। পূর্ণিমায় বৃহস্পতিবারে যখন মেয়েরা বসিয়া তাহার রচনা করা লক্ষ্মীর পাঁচালী বলে, তখন নিতাই বেশ একটু গম্ভীর হইয়া উঠে। মনে মনে ভাবে, আর কী এমন রচনা করা যায়,যাহা দেশে দেশে লোকের মুখে মুখে ফেরে।

তাহার দপ্তরটিও ক্রমশ বড় হইয়া উঠিল। অনেক নূতন বই সে মেলায় কিনিয়াছে। আজকাল কলিকাতা হইতেও বই আনায়। এই সন্ধানটি শিখাইয়াছে দলনেত্রী ওই মাসী। মাসী অনেক জানে। নিতাই এক এক সময় অবাক হইয়া যায়। সে তাহাকে সত্যই শ্রদ্ধা করে। 'বিদ্যাসুন্দরে'র সন্ধান তাহাকে মাসীই দিয়াছিল। বসন্ত একদিন চুল বাঁধিতে বাঁধিতে খোপা না বাঁধিয়াই বেণী ঝুলাইয়া কি কাজে বাহিরে আসিয়াছিল। নিতাই বলিয়াছিল —বিনুনীতেই তোমাকে মানিয়েছে ভাল বসন, খোপা আর বেঁধো না।

মাসী সঙ্গে সঙ্গে ছড়া কাটিয়া দিয়াছিল—

"বিননিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়,
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।"

নিতাই বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে মাসীর দিকে চাহিয়াছিল। তাহার চোখের দৃষ্টি দেখিয়া হাসিয়া মাসী বলিয়াছিল—'বিদ্যেসোন্দর' জান বাবা? রায় গুণাকরের 'বিদ্যেসোন্দর'?

বসন্ত, ললিতা, নির্মলা ধরিয়া বসিয়াছিল—আজ কিন্তু 'বিদ্যেসোন্দর' বলতে হবে মাসী।

—সব কি মনে আছে মা! ভুলে গিয়েছি।

—তবে সেই তোমার কথাটি বল। সেটি তো মনে আছে! বসন্ত হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছিল।

—মেলেনী মাসীর কথা? মাসী হাসিয়া আরম্ভ করিয়াছিল—

"কথায় হীরার ধার—হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম।"

মাসী গড় গড় করিয়া বলিয়া যায়—

"বাতাসে পাতিয়া ফাঁন্দ কোন্দল ভেলায়।
পড়শী না থাকে পাছে কোন্দলের দায়।"

নিতাই মাসীর কাছে বসিয়া বিনয় করিয়া বলিয়াছিল—আমাকে বলবে মাসী, আমি খাতায় লিখে রাখব?

—আমার তো সব মনে নাই বাবা। তুমি বিদ্যেসোন্দর বই আনাও কেনে। বটতলার ছাপাখানায় লিকে দাও, ডাকে চলে আসবে। তুমি দাম দিয়ে ছাড়িয়ে লেবে। বটতলার ঠিকানা পাজিতে পাবে।

বিদ্যাসুন্দরের সঙ্গে সে অন্নদামঙ্গল পাইয়াছে। বইয়ের পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দেখিয়া দাশু রায়ের পাঁচালী, উদ্ভট-কবিতার বইও আনাইয়াছে। দাশু রায় পড়িয়া তাহার মনের একটা সংশয় কাটিয়াছে। "ননদিনী, ব'লো নাগরে। ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক-সাগরে।" এবং "গিরি, গৌরী আমার এসেছিল,—স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করায়ে চৈতন্যরূপিণী কোথায় লুকাল," দাশু রায়ই লিখিয়াছেন; আবার খেউড়েও দাশু রায় চরম লেখা লিখিয়া গিয়াছেন। আসরে খেউড়ের পালা গাহিবার আগে সে দাশু রায়কে স্মরণ করিয়া মনে মনে প্রণাম করে।

খেউড় আর তাহাকে খুব বেশী গাহিতে হয় না, গাহিতেও আর সঙ্কোচ হয় না। কিছু-দিনের মধ্যেই কবিয়াল এবং কবিগান-শ্রোতাদের মধ্যে তাহার বেশ একটা সুখ্যাতি রটিয়া

গিয়াছেণ তাহার ফলে লোকে এখন তাহার গান মন দিয়া শোনে ; অশ্লীল খেউড়, গালি-গালাজের উত্তরে সে চোখা-চোখা বাঁকা রসিকতায় গান আরম্ভ করিলে লোকে এখন তাহারই তারিফ করে। কিছুদিন আগে একটা আসরে এমনি এক কবিয়ালের সঙ্গে আসর পড়িয়াছিল। লোকটা বুড়া হইয়াছে, তবুও যত তাহার টেরির বাহার তত লোকটা অশ্লীল। খেউড়ে নাকি বুড়ার নাম-ডাক খুব। লোকে তাহাকে 'খেউড়ের বাঘ' বলে।

সেও একটা ঝুমুর দলের সঙ্গে থাকে। বুড়াই আগে আসর লইয়া নিতাইকে কালাচাঁদ খাড়া করিয়া নিজে বৃন্দে সাজিয়া বসিল। সেই সম্বন্ধ পাতাইয়াই চন্দ্রাবলী অর্থাৎ বসন্তকে বুড়া গালিগালাজ দিতে আর বাকী রাখিল না। তাহার সঙ্গে কৃষ্ণ হিসাবে নিতাইকে যেন জীবন্ত মাটিতে পুঁতিতে চাহিল। এই সম্বন্ধটা কবির পাল্লায় বড় সুবিধার সম্বন্ধ। বিশেষ যে আগে আসরে নামে, সে বৃন্দা হইয়া প্রতিপক্ষকে কালাচাঁদ করিয়া গালিগালাজের বিশেষ সুবিধা করিয়া লয়। তাহা ছাড়া প্রথম আসরে যেদিন বসন্ত তাহাকে চড় মারিয়াছিল, সেদিন প্রতি-পক্ষ কবিয়াল নিতাইয়ের সঙ্গে এই সম্বন্ধ পাতাইয়াই তাহাকে যে জব্দ করিয়াছিল, সে কথাও কাহারও অজানা নাই। তাই প্রায় ক্ষেত্রেই সুবিধা পাইলেই প্রতিপক্ষ এই সম্বন্ধ পাতাইয়া বসে। লোকটা আসরে নামিয়াই খেউড় আরম্ভ করিল। নিতাইয়ের চেহারা, বসন্তের চেহারা লইয়া এবং অশ্লীল গালিগালাজ করিয়া আসর শেষ করিল।

নিতাই আসরে নামিতেই প্রৌঢ়া বলিল—বাবা, সেই পুরনো পালা। খানিকটা রঙ চড়াবে নাকি?

নিতাই হাসিয়া বলিল—চড়াব বইকি! দেখি এক আসর, তারপর হবে। বলিয়াই সে আরম্ভ করিল। গানটা সেই পুরানো গান।

"এ বুড়ো বয়সে বৃন্দে—কুঁচকো মুখে—আর রসকলি কাটিস নে।
রসের ভিয়েন না জানিস যদি—গেঁজলা তাড়ি ঘাঁটিস্ নে।
শোনের নুড়ি পাকা চুলে—কাজ নেই আর আলবোট তুলে—
ও তোর—ফোক্‌লা দাঁতে—পড়ছে লালা—জিভ দিয়ে আর চাটিস্ নে।
—ও—হায়,—বুড়ি মরে না—মরণ নাই—
ও—ভয়ে যম—আসে নাকো—ও—তাই মরণ নাই।"

—ভয় কিসের? দোহারগণ, জান তোমরা যমের ভয়টা কিসের?

একজন বলিল—অরুচি, যমের অরুচি।

—উঁহু।

অন্য একজন বলিল—পাছে সেখানে পেজোমি করে, তাই।

—উঁহু। বলি চন্দ্রাবলী জান?

বসন্ত বিব্রত হইল, কি বলিলে কবিয়ালের মনোমত হইবে বা সুবিধা হইবে সে জানে না, তবু সে ঠকিবার মেয়ে নয়, সে বলিল—বুড়ী পাছে যমের সঙ্গে পিরীত করতে চায়, তাই সে ওকে নেয় না।

নিতাই বাহা-বাহা করিয়া উঠিল। লোকেও একেবারে হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল। ঠিক ঠিক। বলিয়াই সে গান ধরিয়া দিল—

"ও পাছে, পিরীত করিতে চায়—যম ওরে নেয় না তাই—
ও তোর পায়ে ধরি—ওরে বুড়ি—ফোকলা দাঁতে হাসিস নে।
যমকে ভালবাসিস্ নে।"

নিতাইয়ের মিলের বাহারে, মিঠাগলার মাধুর্যে, ব্যঙ্গ-শ্লেষের তীক্ষ্ণতায় জমিয়া উঠে বেশ। সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত নাচে। বসন্তও আজকাল তেমন অশ্লীল ভঙ্গি করিয়া নাচে না, তবে নাচে সে বিভোর হইয়া। লোকে পছন্দ করে। জনতার এক একটা অংশ অবশ্য অশ্লীল ইঙ্গিত করিয়া চীৎকার করে, কিন্তু বেশী অংশ তারিফই করে। দুই-দশজন ভদ্রলোককেও ক্রমে জমিতে দেখা যায় নিতাইয়ের পালার আসরে। নিতাইও অবসর বুঝিয়া গানকে আনিয়া ফেলে মিষ্ট রসের খাতে।

সে গান ধরে—

"(তোমায়) ভালোবাসি ব'লেই তোমার সইতে নারি অসৈরণ,
নইলে তোমায় কটু বল্বার চেয়ে ভাল আমার মরণ।"

সে আরম্ভ করে, তুমি বৃন্দে—তুমিই তো আমার প্রেমের গুরু—তুমিই তো আমাকে রাধাকে চিনাইয়াছ—তুমিই তো রচনা করিয়াছ—পূর্ণিমায় পূর্ণিমায়—কুঞ্জশয্যা, আমাদের সম্মুখে রাখিয়া—তুমিই তো গাহিয়াছ—যুগল-রূপের মাধুরী—! ওগো দূতী—সেই তোমার এই বৃদ্ধ বয়সে এই মতিভ্রম দেখিয়া মনের যাতনায় তোমাকে কটু কথা বলিয়াছি। তুমি নিজেই একবার ভাবিয়া দেখ তোমার নিজের কথা।

"রসের ভাণ্ডারী তুমি—কথা তোমার মিছরীর পানা
সেই তুমি আজ হাটে বেচ—সস্তা খেউড় ঘুগনীদানা।"

আসরের মোড় ফিরাইয়া দেয় নিতাই।

বসন্ত রাগ করে। কেন শেষকালে লোকটাকে এমন ধারার মিষ্ট কথা বলিলে ?

সে বলে—ওকে বিঁধে বিঁধে মারতে হ'ত। খাতির কিসের ?

নিতাই হাসিয়া বলে—বসন, নরম গরম পত্রমিদং, বুঝলে ? নরম গরম—মিঠে কড়া—বুঝলে কিনা—ওতেই আসর মাৎ। তারপর বুঝাইয়া বলে—লোকটার বয়েস হয়েছে—প্রাণে দুঃখ দিলে কি ভাল হ'ত ? তুমিই বল।

বসন্ত ইহার পর চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। নিতাই হাসিয়া বলে—রাগ করলে বসন ?

বসন্ত হাসিয়া বলে—না।

—তবে ?

—তবে ভাবছি, তুমি আমাকে সুদ্ধ নরম ক'রে দিলে।

নিতাই হাসে।

বসন্ত বলে—সে চড় মনে পড়ে ?

—সে চড় না খেলে কোকিল তোমার ডাকতে শিখত না। ও আমার গুরুর চড়।

বসন্ত আজ তাহার গলা জড়াইয়া ধরে। নিতাই তাহার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া দেয়।

খেউড়, যাহাকে বলে কাঁচা খেউড় অর্থাৎ নগ্ন অশ্লীলতার গান,—সেও তাহাকে গাহিতে হয়। দুই একটা স্থানে, গভীর রাত্রে এমন গান না গাহিলে চলে না। শ্রোতারা দাবী করে। আবার এমনও আসর আসে যেখানে এই বুড়ার মত প্রতিদ্বন্দ্বীরা হটিয়া হটিয়া গিয়া নিজেরা আস্তাকুঁড়ে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে নিতাইকেও টানিয়া আনে। আসর ও প্রতিদ্বন্দ্বী দেখিয়া গোড়াতেই তাহা বুঝা যায়। একটা পালাগানের পরেই সেদিন তাহার চেহারাটা হইয়া উঠে থমথমে। চোখ দুইটা হইয়া উঠে উগ্র। প্রথম হইতেই সে স্তব্ধ হইয়া যায়। দলের লোকেরাও বুঝিতে পারে, আজ লাগিল। বসন্ত এবং প্রৌঢ়া বুঝিতে পারে সর্বাগ্রে।

প্রৌঢ়া বলে—বসন! ইঙ্গিত করিয়া সে হাসে।

বসন্ত উত্তর দেয়—হ্যাঁ মাসী।

সে আসর হইতে বাহির হইয়া যায়, সেখান হইতে নিতাইকে ডাকে—শোন।

প্রৌঢ়া তাহাকে সচেতন করিয়া দেয়—বাবা! ডাকছে তোমাকে। বাবা গো!

নিতাই চমকিয়া উঠে। তারপর গম্ভীর মুখেই বাহিরে যায়, বসন্তের কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া হাত বাড়ায়। সে জানে কিসের জন্য বসন্ত তাহাকে ডাকিয়াছে। গ্লাস পরিপূর্ণ করিয়া বসন্ত মদ ঢালিয়া তাহার হাতে তুলিয়া দেয়। নিঃশেষ করিয়া গ্লাস ফিরাইয়া দিয়া নিতাই আসিয়া আসরে বসে আর এক চেহারা লইয়া।

তারপর রাত্রির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আসর মাতিতে থাকে—খেউড়ে অশ্লীলতায়। প্রতি আসরের পূর্বেই বসন্ত পরিপূর্ণ গ্লাস মদ তুলিয়া দেয় তাহার হাতে। সে খায়। মধ্যে মধ্যে নিজে ঢালিয়া বসন্তকে খাওয়ায়। বসন্তর মুখেও হাসি ফুটিয়া উঠে। সেদিন আসরে আর কিছু বাকী থাকে না। নিতাইয়ের রক্তের মধ্যে, মস্তিষ্কের মধ্যে সেদিন মদের বিশেষ স্পর্শ পাইয়া জাগিয়া উঠে—তাহার জন্মলব্ধ বংশধারার বিষ; সমাজের আবর্জনা-স্তূপের মধ্য হইতে যে বিষ শৈশবে তাহার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল, সে বিষ তাহার মধ্যে জাগিয়া উঠে রক্তবীজের মত। ভাষায়—ভাবে—ভঙ্গীতে অশ্লীল কদর্য কোন কিছুই তাহার মুখে বাধে না। শুধু তাই নয়—সেদিন সে এমন উগ্র হইয়া উঠে যে, সামান্য কারণেই যে কোন লোকের সহিত ঝগড়া বাধাইয়া তাহাকে মারিতে উদ্যত হয়।

প্রৌঢ়া সেদিন দলের লোককে সাবধান করে। বলে—হাতী আজ মেতেছে বাবা। তোরা একটুকুন সমীহ ক'রে স'য়ে থাক। তোরা সব কত সময়ে কত বলিস। ও তো সব সয়।

নির্মলা হাসিয়া বলে—মাউতকে (মাহুত) বল মাসী।

প্রৌঢ়া হাসে—সে বসন্তের দিকে চায়। বসন্তও হাসে। এমন দিনে বসন্তের সে হাসি অদ্ভুত হাসি।

বসন্তের মুখে এই হাসি দেখিয়া নির্মলা খিলখিল করিয়া হাসে; বলে—কি লো হাসতে গিয়ে যে গলে পড়েছিস বসন।

বসন্তের মস্তিষ্কেও মদের নেশা—চোখ তাহার ঢুলঢুল করে। সে তবুও হাসে কারণ এমন দিনটি তাহার বহু প্রত্যাশার দিন। এমন দিনেই নিতাই—বসন্তকে পরিপূর্ণভাবে ধরা দেয়। বসন্তকে লইয়া সে অধীর হইয়া উঠে।

সবল বাহুর দোলায় বসন্তকে তুলিয়া লইয়া দোলায়; কখনও কখনও শিশুর মত উপরের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া আবার ধরিয়া লয়। মাথার উপরে বসন্তকে তুলিয়া লইয়া নিজে নাচে। বসন্ত নির্জীবের মত ক্লান্ত হইয়া এলাইয়া পড়িলে তবে তাহার নিষ্কৃতি। তবুও এমন দিনটি বসন্তের বহু প্রত্যাশার দিন।

সহজ শান্ত নিতাই আর এক মানুষ—সে আদরে যত্নে বসন্তকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া রাখে, কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকে বসন্তের নাগালের বাহিরে।

তখন বসন্ত আপনা হইতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলে সে তাহাকে টানিয়াও লয় না, আবার ঠেলিয়া সরাইয়াও দেয় না। তাহার মাথায় কিংবা পিঠে হাত বুলাইয়া দেয়—বসন্ত যেন কত ছেলেমানুষ। কিন্তু তাহাকে উপেক্ষাও করা যায় না—এমন পরম সমাদর আছে তাহার মধ্যে।

বসন্ত ছুতানাতা করিয়া অভিমান করে, কাঁদে।

নিতাই হাসিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দেয়। বলে—তুমি কাঁদলে আমি বেথা পাই বসন। তার পর গুন গুন করিয়া গান ধরে—

"তোমার চোখে জল দেখিলে সারা ভুবন আঁধার দেখি !
তুমি আমার প্রাণের অধিক জেনেও তাহা জান নাকি ?"

সঙ্গে সঙ্গে বলে—বল সত্যি কি না !

বসন্ত মনে মনে খুশী হয়। মুখে তাহার হাসি ফোটে। নিজেই চোখ মুছিয়া সে বলে—বলব না। হঁ্যা, কোকিল বটে আমার! বাহারের গান হয়েছে। শেষ কর। নিকে রাখ।

কিন্তু শেষও হয় না, লিখিয়া রাখাও হয় না। অসমাপ্ত গানগুলা হারাইয়া যায়।

এই সেদিন একদিন—নিতাই যে গানটি গাহিল, সে গানটি শুনিয়া বসন্তের কান্না দ্বিগুণ হইয়া উঠিল।

নিতাইয়ের মনে পড়িয়া গেল বসন্তর সেই প্রথম রূপ। বসন্তর চোখে সে কি প্রখর চাহনি সে দেখিয়াছিল। আজ সেই বসন্তই কাঁদিতেছে।

নিতাই হাসিয়া গান ধরিয়া দিল—

"সে আগুন তোমার গে-লো কোথা শুধাই তোমারে ?
ও তোমার নয়নকোণে আগুন ছিল জ্বলত ধিকি ধিকি হে,
আয়নাতে মুখ দেখতে গিয়ে—দেখো নি কি সখি হে ?
ও হায়—সে আগুন আজ জল হ'ল কি পুড়াইয়ে আ-মারে ?
শুধাই তোমারে !"

গান শুনিয়া বসন্তের কান্না দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া তবে বসন্ত ক্ষান্ত হইল।

পরদিন সকালে উঠিয়াই কিন্তু বলিল—গানটি শেষ কর, আমি শিখে তবে উঠব। তারপর বলিল—তোমাকে চড় মেরেছিলাম, সে কথা তুমি ভোল নাই তা হ'লে ?

নিতাই বলিল—ভগবানের দিব্যি বসন—

বাধা দিয়া বসন্ত বলিল—না না। আমি ঠাট্টা করছিলাম। আবার হাসিয়া বলিল—এই তো, তুমিও তো ঠাট্টা বুঝতে পার না।

বসন্তও তাহাকে অনেক শিখাইয়াছে। সে তাহাকে টপ্পাগান শিখাইয়াছে। টপ্পাগান নিতাইয়ের বড় ভাল লাগে। এই তো গান। পদাবলীর 'পিরীতি' এক, আর টপ্পার ভালবাসা অন্য জিনিস—একেবারে খাঁটি ঘরোয়া পিরীতি। টপ্পার সঙ্গে নিধুবাবুর নামও সে জানিয়াছে। বসন্তই বলিয়া দিয়াছে। মনে মনে সে নিধুবাবুকে হাজার বলিহারি দেয়। এই না হইলে গান !

"তারে ভুলিব কেমনে।
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপন জেনে।"

কিংবা—

"ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসি নে।
আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর জানি নে।"

আহা হা! এ যেন মিছরীর পানা। নিতাই মিছরীর পানার সহিত তুলনা দেয়। নিতাইয়ের সাধ, সে এমনই গান বাঁধিবে—সে মরিয়া যাইবে, নূতন কবিয়াল নূতন ছোকরারা তাহার গান গাহিবে আর বলিবে—বাহবা! বাহবা! বাহবা!

অহরহই তাহার মনে গানের কলি গুন গুন করে।

আবার মধ্যে মধ্যে নিতাই কেমন উদাসীন হইয়া উঠে। মনে পড়িয়া যায় সেই রেলস্টেশন। সেই তাহাকে।

গ্রামপথে চলিবার সময় দ্বিপ্রহরে—দূরে পথের বাঁকে—হঠাৎ রোদের ছটায় ঝকমক করিয়া উঠে স্বর্ণবিন্দুর মত একটি বিন্দু। বাংলা দেশে পল্লীগ্রামে—এই সময়টাই জলখাবারের সময়, গরু খুলিবার বেলা, এই সময়েই কৃষকবধূরা মাঠে যায় পুরুষের জলখাবার লইয়া, গৃহস্থঘরে দুধের যোগান দিবার সময়ও এই। মাঠের পথে—গ্রামের পথে—ঘটি মাথায় চলন্ত কৃষকবধূদের রৌদ্রচ্ছটা প্রতিবিম্বিত ঝকমকে বিন্দুটি দেখিলেই নিতাইয়ের মন উদাস হইয়া উঠে।

তাহার মনে পড়ে সেই কাশফুলের মাথায় সোনার টোপর। ঠাকুরঝি! সঙ্গে সঙ্গে সব বিস্বাদ হইয়া যায়। এসব তাহার আর কিছুই ভাল লাগে না। ইচ্ছা হয় এইখান হইতেই সে ছুটিতে আরম্ভ করে, ফিরিয়া যায় তাহার সেই গ্রামে। কৃষ্ণচূড়ার তলাটিতে বসিয়া রেললাইনের বাঁকের দিকে তাকাইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে তাহার সেই পুরানো বাঁধা গান—"ও আমার মনের মানুষ গো, তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধিলাম ঘর।"

—নাঃ!

পরক্ষণেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে—নাঃ। চাঁদ, তুমি আকাশে থাক। ঠাকুরঝি তুমি সুখে থাক। সংসার তোমার সুখের হোক।

আর ফিরিয়া যাইবারই বা তাহার সময় কই? পাঁচদিন আবার আসর বসিবে, এবার আর ঝুমুরদলের কবিয়ালের সঙ্গে পাল্লা নয়। আসল কবিয়ালের সঙ্গে পাল্লা। তারণ কবিয়াল, মহাদেব কবিয়াল, নোটন কবিয়ালের মত দস্তুরমত কবিয়ালের সঙ্গে পাল্লা হইবে। একটা মেলার আসরে কবিয়াল হিসাবে পাল্লা দিবার জন্য তাহাকে শুধু বায়না করিতে আসিয়াছিল। ঝুমুরদলের সঙ্গে কোন সংস্রবই নাই। তবু সে বলিয়াছে—উহারা ভিন্ন তাহার দোহারের কাজ কেহ করিতে পারিবে না। সুতরাং উহারাও যাইবে।

এ বায়নার পর দল চলিবে ধূলিয়ান অঞ্চলের দিকে। সে চলিয়া গেলে কি করিয়া চলিবে? দলটা কানা হইয়া যাইবে যে। সে যে তাহারই বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে॥ তা ছাড়া—বসন্ত আছে। বসন্তকে সে কথা দিয়াছে। সে যতদিন বাঁচিয়া আছে ততদিন সে তো তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। মনে পড়ে গাঁটছড়া বাঁধার কথা। কথা আছে—যে কেহ একজন মরিলে তবে এ গাঁটছড়া খুলিয়া লইবে অপর জন। ভাবিতে ভাবিতেও সে শিহরিয়া উঠে। বসন্তের মৃত্যুকামনা করিতেছে সে? না না। ঠাকুরঝি, তুমি দূরেই থাক—সুখেই থাক—তোমার সঙ্গে দেখা হয়তো হইবে না। সে বসন্তের কালো-কোকিল—যেখানে বসন্ত সেইখানে ছাড়া অন্য কোথাও যাইতে পারে না সে। বসন্ত বাঁচিয়া থাক—সে সুস্থ হইয়া উঠুক—বসন্তকে লইয়াই এ জীবনটা সে কাটাইয়া দিবে। এই তো কয়দিনের জীবন। কয়টা দিন। ইহার মধ্যে—বসন্তকে ভালবাসিয়াই কি ভালবাসার শেষ করিতে পারিবে সে? ইহার পর আবার ঠাকুরঝিকে ভালবাসিবে? এমনি করিয়াই তো একদিন ঠাকুরঝিকে ছাড়িয়া—তাহাকে ভালবাসার লীলাটা অসমাপ্ত রাখিয়া—চলিয়া আসিয়া বসন্তকে পাইয়াছে, তাহাকে ভালবাসিতে শুরু করিয়াছে। আবার বসন্তকে ছাড়িয়া ঠাকুরঝির কাছে? না। এই ভাল।

তবুও তাহার ভাল লাগে না। সে দল হইতে বাহির হইয়া গিয়া মাঠে বসিয়া থাকে।

কখনও আপনিই একসময় চকিত হইয়া উঠিয়া ফিরিয়া আসে, কখনও বা দল হইতে কেহ যায়, ডাকিয়া আনে।

বসন্ত বলে—এই দেখ, এইবার তুমি ক্ষেপে যাবে।

নিতাই নিবিষ্টচিত্ততার মধ্যেই হাসে—কেনে ? কি হ'ল ?

—সকাল থেকে মাঠে মাঠে ঘুরে এলে। খেতে-দেতে হবে না ?

—ভারি ভাল কলি মনে এসেছে বসন। শোন—

—না, এখন নাও দিকিনি !

—না। আগে শোন। বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে সুর ভাঁজিয়া আরম্ভ করে—

"এই খেদ আমার মনে মনে।
ভালবেসে মিটল না আশ—কুলাল না এ জীবনে।
হায়, জীবন এত ছোট কেনে ?
এ ভুবনে ?"

মুহূর্তে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল। বসন্ত স্থির দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া গান শুনিতেছিল। গানটা শুনিয়া সে যেন পাথর হইয়া গেল।

নিতাই সচকিত হইয়া প্রশ্ন করিল—বসন ! কি হ'ল বসন ? বসন !

ধীরে ধীরে দুই চোখের কোণ হইতে দুটি জলের ধারা গড়াইয়া আসিল বসনের। সে বলিল—এ গান তুমি কেনে লিখলে কবিয়াল ?

—কেনে বসন ?

ক্লান্ত বিষণ্ণ কণ্ঠে সে বলিল—আমি তো এখন ভাল আছি কবিয়াল—তবে তুমি কেনে লিখলে, কেনে তোমার মনে হ'ল জীবন এত ছোট কেনে ?

অকারণে নিতাইয়ের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল।

আঠারো

সত্যই বসন এখন ভাল আছে। অনেক ভাল আছে। দেহের প্রতি যত্ন তাহার এখন অপরিসীম। মদ এখন সে খুব কমই খায়। দূর্বাঘাসের রস আগে নিয়মিত খাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। এখন নিয়মিত সকালে উঠিয়াই দূর্বাঘাসের রসটি খাইয়া তবে অন্য কাজে সে হাত দেয়। স্বাস্থ্যও তাহার এখন ভাল হইয়াছে। শীর্ণ রুক্ষ মুখখানি অনেকটা নিটোল হইয়া ভরিয়া উঠিয়াছে, রুক্ষ দীপ্ত গৌরবর্ণে একটু শ্যাম আভাস দেখা দিয়াছে। কথার ধার আছে, জ্বালা নাই। এখন আর সে তেমন তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে খিলখিল করিয়া হাসে না। মুচকিয়া মৃদু মৃদু হাসে।

ললিতা নির্মলা ঠাট্টার আর বাকি রাখে না। বসন্ত যখন নিতাইয়ের কোন কাজ করে তখন ললিতা নির্মলাকে অথবা নির্মলা ললিতাকে একটি কথা বলে—'হায়—সখি,—অবশেষে।'

অর্থাৎ যে পিরীতিকে এককালে বসন্ত মুখ বাঁকাইয়া ঘৃণা করিত, সেই পিরীতিতেই সে পড়িল অবশেষে।

বসন্ত রাগে না, মুচকি হাসিয়া শুধু বলে—মরণ।

প্রৌঢ়াও হাসে। মধ্যে মধ্যে সেও তুই চারিটা রহস্য করিয়া থাকে।

—বসন, ফুল তবে ফুটল। কোকিল নাম পাল্টে ওস্তাদের নাম দে বসন ভোমরা। কোকিলও কালো, ভোমরাও কালো।

বসন্ত হাসে।

শুধু একটা সময়, বসন্ত—পুরানো বসন্ত। সেটা সন্ধ্যার পর। সন্ধ্যার পর হইতেই সে উগ্র হইয়া উঠে। এটা তাহাদের দেহের বেসাতির সময়। সন্ধ্যার অন্ধকার হইলেই ক্রেতাদের আনাগোনা শুরু হয়। মেয়েরা গা ধুইয়া প্রসাধন করিয়া সাজিয়া গুজিয়া বসিয়া থাকে। তিনজনে তখন তাহারা বসে একটি জায়গায়। অথবা আপন আপন ঘরের সম্মুখে পিঁড়ি পাতিয়া বসে—মোট কথা এই সময়ের আলাপ-রঙ্গরহস্য সবই মেয়েদের পরস্পরের মধ্যে আবদ্ধ। পুরুষদের সঙ্গে ভাবটা যেন ছাড়াছাড়া। মেয়েরা ইঙ্গিতময় ভাষায় অশ্লীল ভাবের রঙ্গরহস্য করে নিজেদের মধ্যে।

নির্মলা মৃদুস্বরে ডাকে—নি-ব, নি-স, নি-ন্ত। অর্থাৎ নি শব্দটাকে যোগ করিয়া সে ডাকে—বসন্ত।

বসন্ত উত্তর দেয়—নি-কি ? মানে—কি ?

ওই নি শব্দটাকে যোগ করিয়া তারপর চলে অশ্লীল রহস্য! কোন এক দিনের ব্যভিচার-বিলাসের গল্প। সকলেই তাহারা হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে। যেন সম্মুখের দেহব্যবসায়ের আসরের জন্য মনটাকে তাহারা শানাইয়া লয়। এই কাজ হইতে তাহাদের নিষ্কৃতি নাই। একদিকে মাসী দেয় না, অন্যদিকে চিরজীবনের অভ্যাস—সেও দেয় না। উপায় নাই।

পুরুষেরাও এ সময়ে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আসন পাতে। তাহাদেরও যেন সাময়িক ভাবে মেয়েগুলির সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়া যায়। একান্ত নির্লিপ্তের মত তাহারা বসিয়া থাকে।

নিতাই একটা নিরালা জায়গা বাছিয়া বসে, আপনার লণ্ঠনটি জ্বালিয়া দপ্তর খোলে, লেখে, পড়ে। বসন্তের ঘরে আগন্তুকদের মত্ত কণ্ঠের সাড়া জাগে—নিতাই রামায়ণ পড়ে। কৃষ্ণলীলা পড়ে। গানও রচনা করে—

"আর কতকাল মাকাল ফলে ভুলবি আমার মন ?"

অথবা—

"আমার কর্মফল
দয়া ক'রে ঘুচাও হরি—জনম কর সফল !"

কখনও সে বসিয়া ভাবে। ভাবে, বড় বড় কবিয়ালদের কথা—যাহারা সত্যকারের কবিয়াল। ঝুমুরের আসরে যাহারা গান গায় না। তেমন বায়না ইদানীং তাহার ভাগ্যেও তুই-একটা করিয়া জুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইবার তাহার এ দল হইতে বাহির হইয়া পড়া উচিত। এক বাধা বসন্ত। বসন্ত যে রাজী হয় না! সে সবই বুঝিতে পারে। তবুও সে এ দল ছাড়িয়া যাইতে পারে না। আশ্চর্য! সে আপন মনেই একটু হাসে।

—কি রকম ? হাসছ যে আপন মনে!

নিতাই চাহিয়া দেখে—বেহালাদার তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিতেছে। সে বসিয়া আছে অল্প দূরে। বেহালাদার বসিয়া আপনার বেহালাখানিকে লইয়া পড়িয়াছে। সুর বাঁধিতেছে। সে সুর-বাঁধা যেন তাহার ফুরাইবার নয়। সুর বাঁধিয়া একবার ছড়ি টানিয়াই আবার তার-বাঁধা কানটায় মোচড় দেয়। তার কাটিয়া যায়। বেহালাদার নতুন তার পরাইতে বসে। ছড়িতে রজন ঘষে। বেহালাখানাকে ঝাড়ে। মাঝে মাঝে বার্নিশের শিশি

হইতে বার্নিশ লইয়া বার্নিশ মাখায়।

নির্মলার ঘরে কলরব উঠে।

বেহালাদার বেহালায় ছড়ি চালায়। রাত্রি একটু গভীর না হইলে—বাজনা তাহার ভাল জমে না। বারোটা পার হইলেই তাহার যেন হাত খুলিয়া যায়। একটা অদ্ভুত বাজনা সে বাজায়। লম্বা টানা একটা সুর। সুরটা কাঁপিতে কাঁপিতে বাজিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে এমন বিষম কোমলের ধাপে খাদে নামিয়া আসে যে, শরীর সত্যই ঝিমঝিম করিয়া উঠে। মনে হয় যেন সমস্ত নিঝুম হইয়া গিয়াছে, চারিদিক যেন হিম হইয়া গেল। যে শোনে তাহার নিজের শরীরের হাতপায়ের প্রান্তভাগও যেন ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মনের চিন্তা-ভাবনাও যেন অসাড় হইয়া যায়।

দোহারটা তর্ক করে বাজনাদারের সঙ্গে।

বাজনাদারটার উপরে কোন কিছুরই ছায়া পড়ে না। তাহার কেহ ভালবাসার জন নাই। সে হা-হা করিয়া হাসে—বাজনা বাজায়। দোহারটার তর্কের জবাব দেয়। মধ্যে মধ্যে মেয়েদের ঘরে গিয়া মদ খাইয়া আসে। বেহালাদারের জন্য মদ লইয়া আসে। তারপর ঘুম পাইলেই বিছানা পাড়িয়া শুইয়া পড়ে।

দোহারটি ললিতার ঘরে গিয়া ললিতার সঙ্গে ঝগড়া বাধাইবার চেষ্টা করে।

মহিষের মত লোকটা ধুনির সম্মুখে বসিয়া থাকে। প্রৌঢ়া ঘরগুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া বসিয়া সুপারি কাটে। লোকজন আসিলে মেয়েদের ডাকিয়া দেখায়, দরদস্তর করে, টাকা আদায় করে। গোপনে মদ বিক্রী করে। প্রৌঢ়ার এই সময়ে মূর্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট। গম্ভীর, কথা খুব কম কয়, চোখের ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত হইয়া ভ্রূকুটি উদ্যত করিয়াই রাখে; দলের প্রত্যেকটি লোক সন্ত্রস্ত হয়। বসন্ত উগ্র হইয়া দেহের খরিদ্দারের সঙ্গে ঝগড়া করে। প্রৌঢ়া মাসী আসিয়া দাঁড়ায়, বসন্তকে সে প্রায় ধমক দেয়।—এই বসন! কি ব্যাপার? ঝগড়া করছিস কেনে?

—বেশ করছি। মদ খেতে বলছে, আমি মদ খাব না।

—এক-আধটু খেতে হবে বৈকি। তা না হ'লে হবে কেনে? নোকে আসবে কেনে?

—না আসে, না-ই এল। আমার ঘরে নোক এসে দরকার নাই।

—দরকার নাই!

—না।

—বেশ, কাল সকালে তুমি ঘর চলে যেয়ো। আমার এখানে ঠাঁই হবে না।

শুধু বসন্তই নয়, নির্মলা ললিতাও মধ্যে মধ্যে ক্লান্ত হইয়া হাঁপাইয়া পড়ে। তাহারাও বলে—দরকার নাই, আর পারি না। মাসীর কিন্তু ক্লান্তি নাই, সে অনড়। তাহার সেই এক উত্তর—তাহ'লে বাছা তোমাদের নিয়ে আমার দল চলবে না। তোমরা পথ দেখ। ঝুমুর দলের লক্ষ্মী ওইখানে। ও পথ ছাড়লে চলবে না।

সকলকেই চুপ করিতে হয়, বসন্তকেও হয়। আবার এটাও আশ্চর্যের কথা যে, যে ব্যবসাটা তাহারা ছাড়িতে চায়, যে জীবনে বিষ আছে বলিয়া মনে হয়, সেই ব্যবসায় ও সেই জীবনে ভাটা পড়িয়া আসিলে, মন্দা পড়িলে তাহাদেরই আর ভাল লাগে না, তাহারাই চিন্তিত হইয়া পড়ে। আপনাদের মধ্যেই আলোচনা হয়।

দুর, দুর, রোজগার নাই, পাতি নাই, লোক নাই, জন নাই—কিছু নাই। সব ভোঁ ভোঁ। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন বলে—ঠিক বলেছিস ভাই, ভাল লাগছে না মাইরী!

—ললিতে !

—কি ?

—এ কেমন জায়গা বল তো ?

—কে জানে ভাই। পাঁচটা টাকা রেখেছিলাম—নাকছাবি গড়াব ব'লে, চার টাকা খরচ হয়ে গেল। বসন !

বসন চুপ করিয়াই থাকে। তাহার দেহ-মন দুই-ই ক্লান্ত। নির্মলা ললিতা আবার ডাকে। —কি লো চুপ করে রয়েছিস যে! তারপর বলে—তোর ভাই অনেক টাকা।

কোন দিন ইহার উত্তরে বসন ফোঁস করিয়া উঠে। ঝগড়া বাধিয়া যায়। কোন দিন বিষণ্ন-হাসি হাসিয়া উঠিয়া যায়। মেয়েটার মতিগতি কখন যে অস্থির, কখন যে শান্ত বুঝিয়া ওঠা দায়। ঝগড়া বাধিলে নিতাইকে আসিয়া থামাইতে হয়। বসনকে ঘরে লইয়া গিয়া বুঝাইয়া শান্ত করে। শান্ত হইলে প্রশ্ন করে—কেন এমন কর বসন ?

বসন বিছানায় মুখ গুঁজিয়া শুইয়া পড়িয়া বলে—জানি না।

নিতাই তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দেয়।

খুব বেশী মন্দা পড়িলে—মাসী নূতন পথ ধরে। মেয়েদের ডাকিয়া বলে—আজ সাজগোজ কর দেখি ভাল ক'রে। গাঁয়ের বাজারে বেড়াতে যাব।

অর্থাৎ মেয়েগুলিকে বাজারের পথে পথে ঘুরাইয়া দেখাইয়া আনিবে।

মেয়েরা উৎসাহিত হইয়া সাবান লইয়া পুকুরঘাটে যায়। স্নো, সিঁদুর, পাউডার, টিপ লইয়া সাজিতে বসে। হাঙ্গামা হয় বসনকে লইয়া। সে কোনদিন যাইতে চায়—কোনদিন চায় না। মাসী ইহার ওষুধ জানে। সে আগে হইতেই বসনকে খানিকটা মদ খাওয়াইয়া রাখে। অবশ্য মদ খাওয়াইবার জন্য অনেক ছলনা করিতে হয়, ভুলাইতে হয়।

ধোয়া ধপ্‌ধপে কাপড় পরনে প্রৌঢ়া গালে একগাল পান পুরিয়া মেয়েদের সঙ্গে বাহির হয়।

মেয়েদের এই দেহের বেসাতির উপার্জনেও প্রৌঢ়ার ভাগ আছে। এই উপার্জন তিন ভাগ হইবে। দুই ভাগ পাইবে উপার্জনকারিণী মেয়েটি, এক ভাগ পাইবে ওই প্রৌঢ়া—এই নিয়ম। গানের আসরের উপার্জনও এমনি ভাগ করিয়া বিলি হয়। আসরের উপার্জন হয় আট ভাগ—আট ভাগ হইতে—এক ভাগ হিসাবে—মেয়ে তিনটি পায় তিন ভাগ—এক ভাগ প্রৌঢ়ার—দুই ভাগ কবিয়ালের, এক ভাগ বেহালাদারের—এক ভাগ আধ ভাগ হিসাবে দোহাররা ও বাজনদার পায়। উপার্জন যে লোক হইতে হইবে না—প্রৌঢ়া তাহাকে দলে রাখিবে না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে উপার্জনের পথগুলির দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। কোন দিক হইতে ক্ষীণতম সাড়া পাইলেই সে মিষ্টিমুখে সরস বাক্যে সাদর আহ্বান জানাইয়া বলে—কে গো বাবা? এস, এগিয়ে এস। লজ্জা কি ধন? ভয় কি? এস এস। আগন্তুক আগাইয়া আসিলে সে একটা মোড়া পাতিয়া বসিতে দেয়, পান দিয়া সম্মান করিয়া বলে—পানের জন্য দু আনা পয়সা দাও বাবা! দিতে হয়।

পয়সা কয়টা খুঁটে বাঁধিয়া তবে মেয়েদের ডাকে—ওলো বসন, নির্মলা ইদিকে আয়। বলি ললিতে, ক'ভরি সোনা কানে পরিছিস লো ?

এমনি একদিন।

মাসী তাহাকে ডাকিল—বসন! শোন, একটি লোক তোকে ডাকছে লো, বলছে সে তোকে চেনে।

বসন্ত সেদিন বলিল—আমার গা কেমন করছে মাসী। শরীর ভাল নাই।

—শরীরে আবার কি হ'ল তোর? কিছু হয় নাই, শোন ইদিকে। একটু মদ খেলেই চাঙ্গা হয়ে উঠবে শরীর। শোন, ইদিকে আয়।

আহ্বান—আদেশ। উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। বসন্ত বাহির হইয়া আসিল। পরিচ্ছন্ন বেশভূষা, গায়ে সুগন্ধি মাখিয়া একটি রীতিমত ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ছিল। মাসী বলিল—দেখি, তোর গা দেখি!···ওমা, গা যে দিব্যি—আমার গা তোর চেয়ে গরম। ওগো বাবা, মেয়ের আমার শরীর খারাপ, একটু মদ খাওয়াতে হবে। সহসা কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া হাসিয়া বলিল—আমার কাছেই আছে।

রূপোপজীবিনী নারীর আজীবনের বহু ভোগের নেশা। সুরুচিসম্পন্ন বেশভূষা, সুশ্রী লোকটিকে দেখিয়া বসন্তের মনে অভ্যাসের নেশা জাগিয়া উঠিল। কটাক্ষ হানিয়া মুচকি হাসিয়া বসন্ত তাহাকে হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া গেল।

মাসীও হাসিল। সে তো জানে, এ বিষ একবার ঢুকিলে—প্রেমের অমৃত সমুদ্রেও তাহাকে শোধন করা যায় না। বসন্তের শরীর ভাল হইয়া গিয়াছে।

লোকটা চলিয়া গেলে বসন্তেরও নেশা ছুটিয়া যায়। মদের নেশার প্রতিক্রিয়ার মতই একটা প্রতিক্রিয়া জাগিয়া ওঠে। নেশার ভান করিয়া সে পড়িয়া রহিল, কাঁদিল। এমন ক্ষেত্রে সে কল্পনা করে, কালই সে নিতাইকে লইয়া এখান হইতে চলিয়া যাইবে। আজও করিল। কিন্তু যাওয়া সহজ কথা নয়, কোথায় যাইবে? ওই মাসী—ওই নির্মলা—ওই ললিতা ছাড়া—কে কোথায় আপন জন আছে তাহার? এই দুনিয়া-জোড়া পথ ছাড়া ঘর কোথায় তাহাদের?

দিন সাতেক পর।

বসন্ত থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া মাসীকে বলিল—মাসী!

বসন্তর কণ্ঠস্বরে মাসী চমকিয়া উঠিল। এ যে দীর্ঘকাল পরে পুরানো বসন্তর কণ্ঠস্বর!—কি, বসন?

কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বসন্ত—সেই পুরানো বসন্ত বলিল—ওষুদ, মাসী। আমার ব্যামো হয়েছে।

—ব্যামো?. কাসি?

—না না না। বসন্তর চোখে ছুরির ধার খেলিতেছিল—সে দৃষ্টির দিকে চাহিয়াই প্রৌঢ়া নিজের ভুল বুঝিল,—সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া আশ্বাস দিয়া মাসী বলিল—তার জন্যে ভয় কি? আজই তৈরী করে দেব। তিন দিনে ভাল হয়ে যাবে, মাছটা খাস না।

ইহাদের জীবনের এই একটা অধ্যায়। এ অধ্যায় অনিবার্য, আসিবেই। মানুষের জীবনে কোন্ কালে কেমন করিয়া এ ব্যাধির উদ্ভব হইয়াছিল—সে তত্ত্ব বিশেষজ্ঞের গবেষণার বিষয়। ইহাদের জীবনে কিন্তু এ ব্যাধি অনিবার্য। শুধু অনিবার্যই নয়, এই ব্যাধিতে জর্জরিত হইয়াই সমস্ত জীবনটা কাটাইতে হয় ইহাদের। এই জর্জরতার বিষই মানুষের মধ্যে ছড়াইতে ছড়াইতে তাহারা পথ চলে। ডাক্তারও দেখায় না, কবিরাজও না। 'নিজেরাই চিকিৎসা করে। ধরা-বাঁধা হাতুড়ে চিকিৎসা। চিকিৎসা অর্থে—ব্যাধিটা বাহ্যিক অন্তর্হিত হয়; কিন্তু রক্তস্রোতের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া ফেরে। ফলে ভাবী জীবনে অকস্মাৎ কোন একটা ব্যাধি আসিয়া হতভাগিনীদের জীবনটাকে পথের ধূলার উপর আছাড় মারিয়া অর্ধমৃত করিয়া দিয়া চলিয়া যায়'। সে-সব কথা ইহারা ভাবে না। এইটাই যে সে-সব ব্যাধির হেতু তাহাও তাহারা

বুঝে না। শুধু ব্যাধি হইলে তাহারা সাময়িক ভাবে আকুল হইয়া উঠে।

বসন্তও আকুল হইয়া মাসীর কাছে আসিয়া পড়িল। মাসী রোগের চিকিৎসা জানে।

সংবাদটায় ইহাদের মধ্যে লজ্জার কিছুই নাই। শুধু ছোঁয়াচ বাঁচাইবার জন্য সাবধান হয়, রোগগ্রস্তার গামছা কাপড়ের ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া চলিলেই হইল। তাহারই মধ্যে খানিকটা ঘৃণার বা অস্পৃশ্যতা-দোষের আভাস ফুটিয়া উঠে।

গামছা-কাপড় সাবধান করিয়া নির্মলা ললিতা আসিল।

বসন্ত কাহারও দিকে ফিরিয়া চাহিল না।

নির্মলা পাশে বসিয়া বলিল—চুল বাঁধা রাখতে নাই। খুলে দি আয়।

নিতাই, গত রাত্রের কয়েকটা উচ্ছিষ্ট পাত্র ছিল, লইয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল।

বসন্ত নির্মলাকে বলিল—বারণ কর।

সে আজ নিতাইয়ের সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথা বলিতে পারিতেছে না।

নির্মলা বলিল—দাদা—দাদা—

নিতাই হাসিয়া বলিল—কেনে ব্যস্ত হচ্ছ বসন? কিছু ভয় ক'রো না তুমি। আমার কিছু হবে না।

নির্মলা অবাক হইয়া গেল।

তিন দিনের স্থলে নয়দিন কাটিয়া গেল। বসন্ত বিছানায় পড়িয়া ছটফট করিতেছিল। সর্বাঙ্গ তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটকে ভরিয়া গিয়াছে, দেহে কে যেন কালি ঢালিয়া দিয়াছে। গভীর রাত্রে আলো জ্বালিয়া শিয়রে বসিয়া নিতাই বাতাস করিতেছিল। এমন ক্ষেত্রে রুগ্ণ মেয়েগুলির দুর্দশার সীমা থাকে না। ভালবাসার পাত্র পুরুষেরা তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করে, কেহ কেহ হয়তো দল ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। রোগগ্রস্তা একা পড়িয়া থাকে। যেটুকু সেবা—যেটুকু যত্ন জোটে, সেটুকু করে ওই দলের মেয়েরাই। নিতাই কিন্তু বসন্তর শিয়রে বসিয়া আছে—প্রশান্ত হাসিমুখে।

সেদিন।

বাহিরে রাত্রি তখন নিঃশব্দ গতিতে প্রথম প্রহর পার হইয়া দ্বিতীয় প্রহরের সমীপবর্তী হইয়া আসিয়াছে। অকস্মাৎ রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠিল একটি সুর। জাগিয়া বসিয়াই নিতাই মধ্যে মধ্যে ঢুলিতেছিল। সুরের সাড়ায় সে জাগিয়া উঠিল৭ একটু না হাসিয়া সে পারিল না। খেয়ালী বেহালাদার বেহালা বাজাইতেছে। আজ নির্মলার ঘরে বীভৎস উৎসবের আসর বসিয়াছে। বেহালাদারের আজ খেয়াল জাগিবার কথাই বটে। সন্ধ্যা হইতেই সে আজ এই সুর শুনিবার প্রত্যাশাও করিয়াছিল। বড় মিঠা হাত। কিন্তু অদ্ভুত সুর। বেহাগের আমেজ আছে। শুনিলেই মনে হয়, গভীর গাঢ় অন্ধকার রাত্রে সব যেন হারাইয়া গেল।

—আঃ ছি! ছি! ছি!—বসন্ত জাগিয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিল।

চকিত হইয়া নিতাই বলিল—কি বসন? কি হচ্ছে?

—আঃ! বারণ কর গো! বাজাতে বারণ কর।

—ভাল লাগছে না?

হাঁপাইতে হাঁপাইতে বসন্ত বলিল—নাঃ, নাঃ। আমার হাত-পা যেন হিম হয়ে আসছে।

ছড়ির টানে একটি দীর্ঘ করুণ সুর কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওই রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে যেন মিশিয়া এক হইয়া যাইতেছে। রাত্রি যেন কাঁদিতেছে।

উনিশ

পুরা একমাস লাগিল। একমাস পর বসন্ত রোগশয্যা হইতে কোনরূপে উঠিয়া বসিল। কিন্তু বসন্তকে আর সে বসন্ত বলিয়া চেনা যাইতেছিল না। ঘৃণিত কুৎসিত ব্যাধি তাহার বিষাক্ত জিহ্বার হিংস্র লেহনে বসন্তের অনুপম দেহবর্ণের উজ্জ্বলতা, লাবণ্য সব কিছু নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হয়—সর্বাঙ্গে কে যেন কয়লার গুঁড়া মাখাইয়া দিয়াছে। মাথার সে চিকণ কালো দীর্ঘ চুলের রাশি হইয়া উঠিয়াছে কর্কশ পিঙ্গলাভ। শুধু বর্ণই নয়—তাহার দেহের গন্ধ রস সবই গিয়াছে। তাহার দেহে একটা উৎকট গন্ধ, রস-নিটোল কোমল দেহখানা কঙ্কালসার। বসন্তের গরব-করা রূপসম্পদের মধ্যে অবশিষ্ট আছে শুধু ডাগর দুইটি চোখ। শীর্ণ শুষ্ক মুখে চোখ দুইটা যেন আরও ডাগর হইয়া উঠিয়াছে। স্তব্ধ নিশ্চল হইয়া সে বসিয়া থাকে। চোখ দুইটা জলজল করিয়া জ্বলিতেছিল—ভস্মরাশির মধ্যে দুই টুকরা জলন্ত কয়লার মত।

সেদিন মাসী বলিল—বসন, বেশ ভাল ক'রে 'ত্যালে হলুদে' মেখে চান কর আজ।

বসন্ত নিষ্পলক চোখে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়াছিল, সে কোনো উত্তর দিল না, একটু নড়িল না, চোখের একটা পলক পর্যন্ত পড়িল না।

মাসী আবার বলিল—রোগের গন্ধ মরবে, অঙ্গের কালচিটে খসখসে বদছিরি যাবে, শরীরে আরাম পাবি।

বসন্ত তবু তেমনি নীরবে বসিয়া রহিল।

মাসী এবার তাহার কাছে বসিয়া তাহাকে টানিয়া লইল—গায়ের কাপড় খুলিয়া দিয়া সর্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিল; ললিতাকে ডাকিয়া বলিল—ললিতে, বাটিতে করে খানিক তেল গরম করে দে তো মা! আর খানিক হলুদ। তারপর সে ডাকিল নিতাইকে—বাবা! বাবা কোথা গো?

নিতাই ঘরের মধ্যে বসন্তর রোগশয্যা পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত ছিল। বিছানাপত্রগুলি বাহিরে আনিয়া রোদে ফেলিয়া দিয়া বলিল—আমাকে বলছ মাসী?

হাসিয়া প্রৌঢ়া বলিল—বাবা মানুষের একটাই গো বাবা! সে আমার তুমি। ভাল বাবা তুমি, মেয়ে ডাকছে—বুঝতে লারছ?

হাসিয়া নিতাই বলিল—বল।

—বসনের চিরুনি আর তেলের শিশিটা দাও তো বাবা, মাথায় জট বেঁধেছে—আঁচড়ে দি।

বসন্ত এতক্ষণে কথা বলিল—বিছানার দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—ওসব কি হবে?

ঘরের মধ্যে তেলের শিশি ও চিরুনির সন্ধানে যাইতে যাইতে নিতাই বলিল—কাচতে হবে।

তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বসন্ত চীৎকার করিয়া উঠিল—না! বলিয়াই সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে কান্না তাহার আর থামে না।

নিতাই আশ্চর্য মানুষ! সে হাসিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিল—মাসী যা বলছে তাই শোন বসন। এ সব এখন তুমি ভেবো না।

বসন্ত কেবল কাঁদিয়াই চলিল।

নিতাই আবার বলিল—আমারও তো মানুষের শরীর! আমার রোগ হ'লে, তুমি সুদে-আসলে পুষিয়ে দিয়ো। আমি না হয় মহাজনের মত হিসেব ক'রে শোধ নেব। না কি বল মাসী?

সে হাসিতে হাসিতে বিছানাগুলা লইয়া চলিয়া গেল।

ললিতা, নির্মলা গালে হাত দিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল। প্রৌঢ়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বসন আমাদের ভাগ্যিমানী।

রোগ-ক্লেদ ভরা বিছানা-কাপড়—সমস্ত ক্ষারে সিদ্ধ করিয়া নিতাই কাচিয়া পরিষ্কার করিল। ললিতা নির্মলা দেহোপজীবিনী। তাহাদের জীবনে প্রেম শরতের মেঘ, আসে, চলিয়া যায়। যদি বা কোনটা কিছুদিন স্থায়ী হয়—তবে হেমন্তের শীতের বাতাসের মত দেহোপজীবিনীর দেহে দুর্দশার আভাস আসিবামাত্র—সেও চলিয়া যায়। নির্মলার এ ব্যাধি হইয়াছে তিনবার, ললিতার হইয়াছে দুইবার। রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র তাহাদের ভালবাসার জন পলাইয়াছে। নির্মলার একজন প্রেমিক আবার—রোগের সুযোগে—তাহার যথাসর্বস্ব লইয়া পলাইয়াছিল। আজ নিতাইয়ের আচরণ দেখিয়া তাই তাহারা অবাক হইয়া গেল। শুধু নিজেদের নয়—তাহাদের সমব্যবসায়িনীদের জীবনেও এমন ঘটনা তাহারা দেখে নাই।

বিছানা-কাপড় পরিষ্কার করিয়া ফিরিয়া নিতাই দেখিল, বসন্ত তেমনি চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সে তাহার দিকে চাহিয়া খানিকটা আশ্বস্ত হইল। তেলহলুদ মাখিয়া স্নান করিয়া বসন্ত খানিকটা শ্রী ফিরিয়া পাইয়াছে; মাথায় চুল আঁচড়াইয়া প্রৌঢ়া একটি এলোখোঁপা বাঁধিয়া দিয়াছে—কপালে একটি সিঁদুরের টিপও দিয়াছে।

রোগক্লিষ্টা হতশ্রী বসন্ত সুস্থ হইয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত সুস্থির হইয়াছে দেখিয়া নিতাই সত্যই খুশী হইল। বলিল—বাঃ, এই তো বেশ মানুষের মত লাগছে!

বসন্ত হাসিল। তারপর ফেলিল একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস। নিতাইয়ের কথাগুলা যেন বসন্তর ওই হাসির ধারের মুখে কাটিয়া খান খান হইয়া ওই দীর্ঘনিঃশ্বাসের ফুৎকারে কোথায় উড়িয়া গেল। বসন্তর হাসির মধ্যে যত বিদ্রূপ তত দুঃখ। তাহা দেখিয়া নিতাই বিচলিত না হইয়া পারিল না।

কোনক্রমে আত্মসম্বরণ করিয়া নিতাই বলিল—আমি মিথ্যে বলি নাই বসন। তোমার রং ফিরেছে—দুর্বল হোক, চেহারার রোগা-রোগা ভাব গিয়েছে—বিশ্বাস না হয়, আয়নায় তুমি নিজে দেখ। সে না ভাবিয়া চিন্তিয়া আয়নাখানা পাড়িয়া আনিয়া বসন্তর সম্মুখে ধরিয়া দিল।

মুহূর্তে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

বসন্তর বড় বড় চোখের কোণ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝরিয়া, শুষ্ক কালো বারুদের মত—তাহার দেহে যেন আগুন ধরাইয়া দিল। মুহূর্তে বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্র গতিতে নিতাইয়ের হাত হইতে আয়নাটা ছিনাইয়া লইয়া বসন্ত তাহার দিকে ছুঁড়িয়া মারিল। সে যেন পাগল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দুর্বল হাতের লক্ষ্য—আর নিতাইও মাথাটা খানিকটা সরাইয়া লইয়াছিল—তাই সে আঘাত হইতে বাঁচিয়া গেল। আয়নাটা ছুটিয়া গিয়া একটা বাঁশের খুঁটিতে লাগিয়া—তিন-চার টুকরা হইয়া ভাঙিয়া পড়িল।

নিতাই একটু হাসিল। সে কাচের টুকরা কয়টা কুড়াইতে আরম্ভ করিল।

সেই মুহূর্তেই একটি কঠিন কণ্ঠস্বর রণ রণ করিয়া বাজিয়া উঠিল।—বসন!

নিতাই মুখ তুলিয়া দেখিল, মাসী। গম্ভীর কঠোরস্বরে মাসী আবার বলিল—বসন!

বসন্ত তেমনি নীরবে অচঞ্চল ; চোখের দৃষ্টি তাহার স্থির নিষ্পলক।

—বলি, রোগ না হয় কার ? তোর একার হয়েছে ? জানিস—এই মানুষটা না থাকলে তোর হাড়ির ললাট ডোমের দুগ্‌গতি হ'ত ?

বসন্ত তবু উত্তর দিল না। আর মাসীর এ মূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া উত্তর করিবার শক্তি বা সাহস হইবার তাহার কথাও নয়। এ মাসী আলাদা মাসী। নিষ্ঠুর কঠোর শাসনপরায়ণা দলনেত্রী। মেয়েরা হইতে পুরুষ—এমন কি তাহার নিজের ভালবাসার জন—ওই মহিষের মত বিশালকায় ভীষণদর্শন লোকটা পর্যন্ত প্রৌঢ়ার এই মূর্তির সম্মুখে দাঁড়াইতে ভয় পায়। নিতাইও এ স্বর, এ মূর্তির সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া গেল, কাচ কুড়াইতে কুড়াইতে স্তব্ধ হইয়া মাসীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। এ মূর্তি সে আজ প্রথম দেখিতেছে।

মাসী আবার কঠোরতর স্বরে ডাকিল—বসন ! কথার জবাব দিস না যে বড় !

বসন্ত এবার দাঁড়াইল, নিষ্পলক চোখে স্থির দৃষ্টি মাসীর দিকে ফিরাইয়া চাহিয়া রহিল। সঙ্গে সঙ্গে নিতাই আসিয়া দাঁড়াইল—দুইজনের মাঝখানে। মাসীর চোখ দুইটা ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে—রাত্রির অন্ধকারে বাঘিনীর চোখের মত। বসন্তর চোখে আগুন—তাহার চেতনা নাই—কিন্তু ভয়ও নাই—শুধু দাহিকাশক্তি লইয়া সে জ্বলিতেছে। নিতাই সবিনয়ে হাসিয়াও দৃঢ় স্বরে বলিল—বাইরে যাও মাসী। ছি ! রোগা মানুষ—

—রোগা মানুষ ! রোগ সংসারে আর কারও হয় না ? ওর একার হয়েছে ? ঝাঁটা মেরে—

—ছি মাসী, ছি !

—ছি কেনে—ছি কেনে শুনি ?

—রোগা মানুষ। তা ছাড়া তোমার কাছে অপরাধ তো কিছু করে নাই।

—আমার দলের লোকের ওপর করেছে। এতে আমার দল থাকবে কেনে ? তুমি আমার দলের লোক, কবিয়াল।

নিতাই শান্ত দৃঢ় কণ্ঠে—একটু হাসিয়াই বলিল—তা বটে ! তবে বসনের জন্যেই তোমার দলে আছি মাসী। নইলে—। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল—যাও, তুমি বাইরে যাও।

প্রৌঢ়া নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিল। এ দলের প্রত্যেকটি লোক আপনার অজ্ঞাতসারেই প্রৌঢ়ার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লয়। দলনেত্রী এ কথাটা ভাল করিয়াই জানে। দলের সর্ববিষয়ে তাহার ব্যবস্থার অধিকার, প্রতিটি কপর্দক তাহার হাত দিয়া বিতরণের বিধি —তাহার আসন, তাহার সাজ-সরঞ্জামের আভিজাত্য, প্রত্যেক জনকে তাহার অধীন অনুগত করিয়া তোলে। নিজের যৌবনে—তাহার দলনেত্রীর দলের সে নিজেও এমনই করিয়া আনুগত্য স্বীকার করিয়া আসিয়াছে। তাহার দলেও এতদিন পর্যন্ত সকলেই তাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া আসিতেছে। আজ তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ ক্ষেত্রে তাহার দুর্দান্ত রাগ হইবার কথা, সুক্রোধে ওই ভীষণদর্শন লোকটাকে আহ্বান করাই উচিত। কিন্তু নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দুইটার একটাও তাহার মনে হইল না। মনে হইল—এ লোকটি তাহার আনুগত্য কোনদিনই স্বীকার করে নাই এবং আজও সে যে তাহাকে লঙ্ঘন করিল তাহারও মধ্যে রূঢ় কিছু নাই, উদ্ধত কিছু নাই, অস্বাভাবিকও কিছু নাই। নিতাই কোনমতেই তাহার কোন অপমানই করে নাই।

তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—আশী-

র্বাদ করি—বাবা, তুমি চিরজীবী হও। মাসী ছেড়ে আজ তোমার সঙ্গে মা-বেটা সম্বন্ধ পাতাতে ইচ্ছে করছে। তা হ'লে শেষকালটার জন্যে আর ভাবনা থাকে না।

নিতাই হাসিয়া বলিল—মা-মাসী তো সমান কথা গো! এখন ঘরে যাও, বউ-বেটার ঝগড়া মা-মাসীকে শুনতে নাই।

আর কোন কথা না বলিয়া সে অনুরোধ মানিয়া লইল, চলিয়া গেল।

নিতাই এবার বসন্তর দিকে ফিরিয়া বলিল—ছি! রোগা শরীরে কি এত রাগ করে? রাগে শরীর খারাপ হয় বসন!

অকস্মাৎ বসন্ত সেই মাটির উপরেই উপুড় হইয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

সস্নেহে নিতাই বলিল—আজ সকাল থেকে এমন করে কাঁদছ কেন বসন?

বসন্তর কান্না বাড়িয়া গেল; সে কান্নার আবেগে শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

নিতাই তাহার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিল—কাল কলকাতায় ওষুদের দোকানে চিঠি লিখেছি। সালসা আনতে দিয়েছি তিন শিশি। সালসা খেলেই শরীর সেরে উঠবে, রক্ত পরিষ্কার হবে—সব ভাল হয়ে যাবে।

শ্বাসরোধী কান্নার আবেগে বসন্ত কাসিতে আরম্ভ করিল। কাসিয়া খানিকটা শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিয়া অবসাদে নির্জীবের মত পড়িয়া রহিল। ধীরে ধীরে একটা আঙুল দিয়া কি যেন দেখাইয়া দিল।

—কি?

এতক্ষণ পরে বসন্ত কথা বলিল—অদ্ভুত হাসিয়া বলিল—রক্ত।

—রক্ত?

—সেই কালরোগ। বসন্ত আবার হাসিল। এতক্ষণ ধরিয়া এই কথাটা বলিতে না পারিয়াই সে কাঁদিতেছিল। কথাটা বলিয়া ফেলার সঙ্গে সঙ্গে কান্নাও তাহার শেষ হইয়াছে।

নিতাই স্থির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল—তোলা শ্লেষ্মার মধ্যে টকটকে রাঙা আভাস সুস্পষ্ট। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

বসন্ত দুই হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—কেনে তুমি দলে এসেছিলে তাই আমি ভাবছি। মরতে তো আমার ভয় ছিল না। কিন্তু আর যে মরতে মন চাইছে না। রোগক্লিষ্ট শীর্ণ মুখে মৃদু হাসি মাখিয়া সে একদৃষ্টে নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিতাইও নিজের দুই হাতের বন্ধনের মধ্যে দুর্বল শিশুর মত তাহাকে গ্রহণ করিয়া বলিল—ভয় কি? রোগ হ'লেই কি মরে বসন? শরীর সারলেই—ও রোগও ভাল হয়ে যাবে।

এবার সে এক বিচিত্র হাসি হাসিয়া বসন্ত নীরবে শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া দিল—না না না।

কিছুক্ষণ পরে মুখ ফুটিয়াই বলিল—আর বাঁচব না!

তারপর হঠাৎ বলিয়া উঠিল—আমি জানতাম কবিয়াল। যেদিন সেই গান্ তোমার মনে এসেছে—সেই দিনই জেনেছি আমি।

—কোন্ গান বসন?

—জীবন এত ছোট কেনে—হায়!

ঝর ঝর করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল।

নিতাইয়ের চোখেও এবার জল আসিল। সঙ্গে সঙ্গে অসমাপ্ত গানটা আবার মনে গুঞ্জন করিয়া উঠিল—

এই খেদ মোর মনে,
ভালবেসে মিটল না আশ, কুলাল না এ জীবনে
হায়! জীবন এত ছোট কেনে,
এ ভুবনে?

তারপর?

তারপর আর হয় নাই। অসমাপ্ত হইয়াই আছে। নিতাই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। কবে শেষ হইবে কে জানে।

বসন্তই আবার কথা বলিল—আমি জানতে পেরেছি। বেহালাদার রাত্রে বেহালা বাজায়, আগে কত ভাল লাগত। এখন ভয় লাগে। মনে হয়, আমার আশেপাশে দাঁড়িয়ে কে যেন বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। অহরহ মনে আমার মরণের ভাবনা। মনের কথা কি মিথ্যে হয়? তার ওপর ওই গান তোমার মনে এসেছে! কি করে এল?

বসন্তের মনের কথা হইয়া উঠিল দৈববাণীর মতই সত্য, মিথ্যা নয়।

দিন কয়েক পরেই সন্ধ্যার দিকে বসন্তের গায়ে স্পষ্ট জর ফুটিয়া উঠিল। সে নিতাইকে ডাকিয়া তাহার হাতে হাত রাখিয়া বলিল—দেখ কত গরম!

নিতাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বসন্ত হাসিয়া বলিল—হায় জীবন এত ছোট কেনে, এ ভুবনে কবিয়াল!

কথাটা হইতেছিল একটা ছোটখাটো শহরের, শহরের নামটাই বলি না কেন, কাটোয়া। কাটোয়ার এক প্রান্তে জীর্ণ একটা মাটির বাড়ি তাহারা ভাড়া লইয়াছিল। নিতাই বলিল—ললিতাকে একবার ডাকি, তোমার কাছে বসুক। আমি একজন ডাক্তারকে ডেকে আনি।

—না। আকুল হইয়া বসন্ত বলিয়া উঠিল—না।

—এই আধ ঘণ্টা। আমি দণ্ডের মধ্যে ফিরে আসব।

—না গো—না। যদি কাসি ওঠে? যদি রক্ত দেখতে পায়? তবে এই পথের মধ্যেই ফেলে আজই এখুনই পালাবে সব। যেও না, তুমি যেয়ো না।

নিতাই অগত্যা বসিল। রক্ত উঠার কথা আজও সকলের কাছে লুকানো আছে।

জরটা যেন আজ বেশী-বেশী বাড়িতেছে। অন্য দিন রাত্রি প্রহরখানেক হইতেই খানিকটা ঘাম হইয়া জর ছাড়ে, বসন্ত অনেকটা সুস্থ হয়। আজ ঘামও হয় নাই—সে সুস্থও হইল না। মধ্যে মধ্যে জরজর্জর অসুস্থ বিহ্বল ব্যগ্র দৃষ্টি মেলিয়া সে চারিপাশে খুঁজিয়া নিতাইকে দেখিতেছিল—আবার চোখ বন্ধ করিয়া এ-পাশ হইতে ও-পাশে ফিরিয়া শুইতেছিল। অস্থিরতা আজ অতিরিক্ত।

নিতাই সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়াছিল। তাই যতবার সে চোখ মেলিয়া তাহাকে খুঁজিল, ততবার সে সাড়া দিয়া বলিল—আমি আছি। এই যে আমি!

রাত্রি তখন শেষ প্রহর। নিতাই তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

রাত্রির শেষ প্রহর অদ্ভুত কাল। এই সময় দিনের সঞ্চিত উত্তাপ নিঃশেষে ক্ষয়িত হইয়া আসে, এবং সমস্ত উষ্ণতাকে চাপা দিয়া একটা রহস্যময় ঘন শীতলতা ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠে। সেই স্পর্শ ললাটে আসিয়া লাগে, চেতনা যেন অভিভূত হইয়া পড়ে। ধীরসঞ্চারিত নৈঃশব্দ্যের মধ্য দিয়া একটা হিমরহস্য সমস্ত সৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, নিস্তরঙ্গ বায়ুস্তরের মধ্যে নিঃশব্দ-

সঞ্চারিত ধূমপুঞ্জের মত। মাটির বুকের মধ্যে, গাছের পাতায় থাকিয়া যে অসংখ্য কোটি কীট-পতঙ্গ অবিরাম ধ্বনি তুলিয়া থাকে, তাহারা পর্যন্ত অভিভূত ও আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে রাত্রির এই শেষ প্রহরে। হতচেতন হইয়া এ সময় কিছুক্ষণের জন্য তাহারাও স্তব্ধ হয়। মাটির ভিতরে রন্ধ্রে রন্ধ্রে এই হিম-স্পর্শ ছড়াইয়া পড়িতে চায়। জীব জীবনের চৈতন্য-লোকেও সে প্রবেশ করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে অবশ করিয়া দেয়। আকাশে জ্যোতির্লোক হয় পাণ্ডুর; সে লোকেও যেন হিম-তমসার স্পর্শ লাগে। কেবল অগ্নিকোণে—ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলে শুকতারা—অন্ধ রাত্রিদেবতার ললাটচক্ষুর মত। সকল ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন-করা রহস্যময় এই গভীর শীতলতায় নিতাইকে ধীরে ধীরে চাপিয়া ধরিল। নিতাই শত চেষ্টা করিযাও জাগিয়া থাকিতে পারিল না। আচ্ছন্নের মত দেওয়ালের গায়ে একসময় ঢলিয়া পড়িল।

অকস্মাৎ তাহার চেতনা ফিরিল বসন্তের আকর্ষণে। বসন্ত কখন উঠিয়া বসিয়াছে। দুই হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সে ডাকিতেছে—ওগো! ওগো!

সে কি আর্তবিহ্বল তাহার কণ্ঠস্বর!

—কি বসন? কি? উঠে বসলে কেনে? শোও, শোও। বসন্তর হাত দুইটি হিমের মত ঠাণ্ডা; পৃথিবীর বুক ব্যাপ্ত করিয়া যে হিমানীপ্রবাহ ভাসিয়া উঠিয়াছে, সেই হিমানীপ্রবাহ যেন সরীসৃপের মত বসন্তের হাতের মধ্য দিয়া নিঃশব্দ সঞ্চারে তাহার সর্বদেহে সঞ্চারিত হইতেছে। বসন্তর সর্বাঙ্গে ঘাম!

—বারণ কর! বারণ কর!

—কি?

—বেহালা! বেহালা বাজাতে বারণ কর গো!

—বেহালা? কই? নিতাই বেশ কান পাতিয়া শুনিল। কিন্তু রাত্রির স্তব্ধ শেষ প্রহরেও—তাহাদের দুই জনের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া—আর কোন ধ্বনি সে শুনিতে পাইল না।

—আঃ, শুনতে পাচ্ছ না? ওই যে, ওই যে! কেবল বেহালা বাজছে, কেবল বেহালা বাজছে।

চকিতের মত একটা কথা নিতাইয়ের মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল।

বসন্তর দেহের স্পর্শ ই তাহাকে সে কথাটি সম্পর্কে সচেতন করিয়া তুলিল। মণিবন্ধে নাড়ীর গতি অনুভব করিয়া নিতাই সকরুণ দৃষ্টিতে বসন্তর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—গোবিন্দের নাম কর বসন—

—কেনে? বসন্ত তাহার বিহ্বল চোখ দুইটা নিতাইয়ের মুখের উপর স্থাপন করিয়া অস্থির কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—কেনে?

কেন, সে কথা নিতাই কিছুতেই বলিতে পারিল না।

মৃত্যুকালীন অস্থিরতার মধ্যেও হঠাৎ কয়েক মুহূর্তের জন্য শান্ত স্থির হইয়া বড় বড় চোখ আরও বড় করিয়া মেলিয়া বসন্ত প্রশ্ন করিল—আমি মরছি?

নিতাই ম্লান হাসিমুখে তাহার কপালে হাত বুলাইয়া দিয়া এবার বলিল—ভগবানের নাম—গোবিন্দের নাম করলে কষ্ট কম হবে বসন।

—না। ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িয়া বসন্ত বলিল—না। কি দিয়েছে ভগবান আমাকে? স্বামীপুত্র ঘরসংসার কি দিয়েছে? না।

নিতাই অপরাধীর মত চুপ করিয়া রহিল। ভগবানের বিরুদ্ধে যে নালিশ বসন্ত করিল, সে নালিশের সব দায়দাবী, কি জানি কেন, তাহারই মাথার উপর যেন চাপিয়া বসিয়াছে বলিয়া সে অনুভব করিল।

বসন্ত এপাশে ফিরিয়া তাহারই দিকে চাহিয়া বলিল—গোবিন্দ, রাধানাথ, দয়া ক'রো। আসছে জন্মে দয়া ক'রো।

তাহার বড় বড় চোখ দুইটা জলে ভরিয়া টলমল করিতেছিল, বর্ষার প্লাবনে ডুবিয়া-যাওয়া পদ্মের পাপড়ির মত। নিতাই সযত্নে আপনার খুঁটে সে জল মুছাইয়া দিয়া একটু ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল—বসন! বসন!

—না, আর ডেকো না। না। বলিতে বলিতেই সে আবার অধীর আক্ষেপে শূন্য বায়ুমণ্ডলে কিছু যেন আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য হাত দুইটা প্রসারিত করিয়া নিষ্ঠুরতম যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিল।

পরক্ষণেই সে নিতাইয়ের কোলে ঢলিয়া পড়িয়া গেল।

গঙ্গার তীরবর্তী শহর। গঙ্গার তীরবর্তী শ্মশানেই, নিতাই-ই বসন্তর সৎকার করিল। সাহায্য করিল দলের মেয়েরা। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, পুরুষেরা শব স্পর্শ পর্যন্ত করিল না। এক্ষেত্রে আপন আপন জাতি সম্বন্ধে তাহারা সচেতন হইয়া উঠিল। দোহার—ললিতার ভালবাসার মানুষ—সে মুখ ফুটিয়া বলিল—ওস্তাদ, যা করছে ওরাই করুক। করলে তো অনেক। আবার কেনে?

নিতাই হাসিল, প্রতিবাদ করিল না। কিন্তু তাহার পরামর্শ গ্রাহ্য করিবার লক্ষণও দেখাইল না। তার্কিক দোহার লোকটি ছাড়িল না, বলিল—হাসির কথা নয় ওস্তাদ। পরকালে কি জবাব দেবে বল!

নিতাই হাসিয়া বলিল—কোন জবাব দেব না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকব ভাই।

বেহালাদারটি হাসিয়া বাধা দিয়া বলিল—যাক ভাই, ও কথা যাক। বলিয়াই সে বেহালায় ছড়ির টান দিল।

চিতার উপর শবদেহ চাপাইবার পূর্বে প্রৌঢ়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আঃ! বসন আমার সোনার বসন। দুই ফোঁটা চোখের জলও তাহার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল। পাশেই বালুচরের উপর বসিয়া ছিল নির্মলা এবং ললিতা। নিঃশব্দ কান্নায় তাহাদের চোখ হইতে শুধু জল ঝরিয়া পড়িতেছিল অনর্গল ধারায়।

নিতাই দেহটা চিতার উপর চাপাইবার উদ্যোগ করিল, প্রৌঢ়া বলিল—দাঁড়াও বাবা দাঁড়াও। সে আসিয়া বসন্তর আভরণ খুলিতে বসিল। নিম্নশ্রেণীর দেহোপজীবিনীর কি-ই বা আভরণ! কানে দুইটা ফুল, নাকে একটা নাকছাবি, হাতে দুইগাছা শাঁখা বাঁধা, তাহার উপর বসন্তর গলায় ছিল একছড়া হালকা বিছাহার।

নিতাই হাসিল। বলিল—খুলে নিচ্ছ মাসী?

মাসী কেবল তাহার মুখের দিকে একবার চাহিল, তারপর আপনার কাজে মন দিল। গহনাগুলি আঁচলে বাঁধিয়া সে বলিল—বুকের নিধি চলে যায় বাবা, মনে হয় দুনিয়া অন্ধকার, খাদ্য বিষ, আর কিছু ছোঁব না—কখনও কিছু খাব না। আবার এক বেলা যেতে না যেতে চোখ

মেলে চাইতে হয়, উঠতে হয়, পোড়া পেটে দুটো দিতেও হয়, লোকের সঙ্গে চোখ জুড়তে হয়। বাঁচতেও হবে, খেতে পরতেও হবে—এগুলো চিতেয় দিয়ে কি ফল হবে বল? বক্তব্য শেষ করিয়া হাসিয়া সে হাতের গহনাগুলির দিকে চাহিয়া বলিল—এগুলি আবার আমার পাওনা বাবা।

নিতাই আবার একটু হাসিল, হাসিয়া সে বসন্তর নিরাভরণ দেহখানি চিতায় চাপাইয়া দিল।

প্রৌঢ়া বলিল, কপালে হাত দিয়া আক্ষেপ করিয়াই বলিল—আমার অদেষ্ট দেখ বাবা। আমিই হলাম ওয়ারিশান। প্রৌঢ়ার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

ললিতা, নির্মলা অদূরে সজল চোখে উদাস দৃষ্টিতে বসন্তর চিতার দিকে চাহিয়া ছিল। বসন্তর বিয়োগে বেদনা তাহাদের অকৃত্রিম, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তটিতে তাহারা ভাবিতেছিল নিজেদের কথা। তাহাদেরও হয়তো এমনি করিয়া যাইতে হইবে, মাসী এমনি করিয়াই তাহাদের দেহ হইতে সোনার টুকরা কয়টা খুলিয়া লইবে। বহুভাগ্যে যদি বুড়া হইয়া বাঁচে, তবে ওই মাসীর মতই তাহারাও হয়তো দলের কর্ত্রী হইবে। তখন—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। কল্পনা তাহাদের ততদূর গেল না, আশার চেয়ে নিরাশাই তাহাদের জীবনে বড়। শুধু তাহাই নয়, নিরাশ পরিণাম কল্পনা করিতেই এই মুহূর্তটিতে বড় ভাল লাগিতেছে। তাহারাও এমনি করিয়া মরিবে, মাসী বাঁচিয়া থাকিবে।

*　　*　　*

সৎকার শেষ করিয়া ফিরিয়া নিতাই দেখিল, মহিষের মত লোকটা বসন্তর ঘরে আড্ডা গাড়িয়া বসিয়া আছে। বসন্তর জিনিসপত্রগুলি ইহারই মধ্যে এক জায়গায় স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইয়া গিয়াছে।

আবারও নিতাই একটু হাসিয়া ঘরের একপাশে একটা মাদুর বিছাইয়া চিতাগ্নির উত্তাপজর্জর, পরিশ্রমক্লান্ত দেহখানা ছড়াইয়া দিল।

সে ভাবিতেছিল মরণের কথা।

মরণ কি? পুরাণে পড়া মরণের কথা তাহার মনে পড়িল। মানুষের আয়ু ফুরাইলে ধর্মরাজ যম তাঁহার অনুচরগণকে আদেশ দেন ওই মানুষের আত্মাটিকে লইয়া আসিবার জন্য। ধর্মরাজের অদৃশ্য অনুচরেরা আসিয়া মানুষের অঙ্গুলিপ্রমাণ আত্মাকে লইয়া যায়। ধর্মরাজের বিচারালয়ে ধর্মরাজ তাহার কর্ম বিচার করেন, তাহার পর স্বর্গ অথবা নরকে তাহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়া যায়। বিভিন্ন কর্মের জন্য বিভিন্ন পুরস্কার, বিভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থাও সে পড়িয়াছে। নিতাইকেও একদিন সেখানে যাইতে হইবে। বসন্তর সঙ্গে তাহার কর্মের পার্থক্যই বা কোথায়? তাহা সে খুঁজিয়া পাইল না। এবং তাহাতে সে একটা আশ্চর্য সান্ত্বনা পাইল। কারণ বসন্ত যেখানে গিয়াছে, সেখানেই সে যাইবে। সে হয়তো অনন্ত নরক।

তা হোক। সেদিন তো আবার তাহার সহিত দেখা হইবে। কিছুক্ষণ পর মনটা আবার হায় হায় করিয়া উঠিল; আজ কিছুতেই তাহার মন ভরিতেছে না। তাহার কোলের উপরেই যে বসন্ত লুটাইয়া পড়িয়া মরিল, সে যে নিজহাতে তাহার দেহখানা পুরাইয়া ছাই করিয়া দিয়াছে কিছুক্ষণ আগে। আর যে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে আর বসন্তকে কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

এই একটা কথাই বার বার মনে ঘুরিতেছে।

বসন্ত চলিয়া গেল। সমস্ত পৃথিবী খুঁজিয়া আর তাহাকে পাওয়া যাইবে না। সেই বসন্ত। ঝক্‌মকে ক্ষুরের মত মুখের হাসি, আগুনের শিখার মত তাপ, তেমনি রঙ তেমনি রূপ,

বসন্তকালের কাঞ্চনগাছের মতই বসনের বেশভূষার বাহার। সেই বসন চলিয়া গেল! গায়ের গহনাগুলা প্রৌঢ়া টানিয়া খুলিয়া লইল, সে নিজে তাহার দেহখানা আগুনে তুলিয়া দিল, বসন একটা প্রতিবাদও করিল না।

মরণ সত্যসত্যই অদ্ভুত। গহনার উপর বসন্তর কত মমতা। সেই গহনা প্রৌঢ়া খুলিয়া লইল। বসন্ত একটা কথাও বলিল না। দেহের জন্য বসন্তর কত যত্ন, এতটুকু ময়লা লাগিলে সে দশবার মুছিত, এতটুকু যন্ত্রণা তাহার সহ্য হইত না—সেই দেহখানা আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, কিন্তু তাহার মুখের এতটুকু বিকৃতি হইল না। দুঃখ, কষ্ট, লোভ, মোহ এক মুহূর্তে মরণ সব ঘুচাইয়া দিল। মরণ অদ্ভুত! থাকিতে থাকিতে তাহার মনে সেই গানের কলিগুলা গুন গুন করিয়া জাগিয়া উঠিল।—

এই খেদ মোর মনে মনে
ভালবেসে মিটল না আশ—কুলাল না এ জীবনে।
হায়! জীবন এত ছোট কেনে!
এ ভুবনে?

বসন বলিয়াছিল—কবিয়াল—তোমার গান আমার জীবনে ফলে যায়। এ গান তুমি কেনে বাঁধলে কবিয়াল! গানটা বসনের জীবনে সত্য হইয়া গেল। হায়! হায়! বসন কি মরিয়া শান্তি পাইয়াছে? এ জগতের যত তাপ—যত অতৃপ্তি সব কি ও জগতে গিয়া জুড়াইল? জীবনে যা পাওয়া যায় না—মরণে কি তাই মেলে? সুর গুন গুন করিয়া উঠিল।

জীবনে যা মিটল না কো মিটবে কি হায় তাই মরণে?

মেটে? তাই মেটে? বসন কি মরণের পরেও বসন হইয়া আছে? এ আকাশে যে চাঁদ ডোবে—সে চাঁদ কি সেখানকার আকাশে ওঠে? এ ভুবনে যে ফুলটি ঝরিয়া পড়ে, সে ফুল কি সে ভুবনে—পারিজাত হইয়া ফুটিয়া ওঠে? এ জীবনের ও জগতের যত কান্না সে কি অনাবিল আনন্দে খিল খিল করিয়া হাসি হইয়া বাজিয়া ওঠে ওপারে—সে জগতে? ওঠে? ওঠে?

এ ভুবনে ডুবল যে চাঁদ সে ভুবনে উঠল কি তা?
হেথায় সাঁঝে ঝরল যে ফুল হোথায় প্রাতে ফুটল কি তা?
এ জীবনের কান্না যত—হয় কি হাসি সে ভুবনে?
হায়? জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভুবনে?

হঠাৎ একটা কলহ-কোলাহলে তাহার গানের তন্ময়তা ভাঙিয়া গেল। মনটা ছি-ছি করিয়া উঠিল। বাহিরে দলের লোকেদের মধ্যে চেঁচামেচি শুরু হইয়া গিয়াছে। নির্মলা তীক্ষ্মস্বরে চীৎকার করিতেছে। সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ব্যাপারটা শুনিয়া সে আরও মর্মাহত হইল। ঝগড়া বাধিয়াছে বসনের স্থান পূরণ লইয়া। ছি! ছি! ছি!

বসন্ত আজই মরিয়াছে, দুপুরবেলা পর্যন্ত দেহটাও তাহার ছিল। এখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, ইহারই মধ্যে দল হইতে বসন্ত মুছিয়া গেল। তাহার স্থান কে লইবে সেই সমস্যা এখনই পূরণ না করিলেই নয়! প্রৌঢ়া বসন্তর জিনিসপত্র লইয়া আপনার ঘরে পুরিয়া খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থায় ব্যস্ত। ললিতা, নির্মলা আজ নিজেরা খরচ দিয়া মদ কিনিয়া খাইতে বসিয়াছে। ইহারই মধ্যে বেহালাদার, দোহার ও ঢুলীটা আলোচনা করিতেছিল, কোন্

ঝুমুর-দলে সে গানে-নাচে-রূপে-যৌবনে সেরা মেয়ে কে আছে! সর্ববাদিসম্মতভাবে 'প্রভাতী' নাম্নী কে একজন তরুণীর নাম স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে; মেয়েটা নাকি বসন্ত অপেক্ষা আরও ভাল এই কারণে যে তাহার বয়স বসন্তের চেয়ে অনেক কম। দোহার বলিতেছে তাহাকেই আনা উচিত। তাহাতে বিশ ত্রিশ বা পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত লাগে তাহা দিয়াও তাহাকে দলে আনা উচিত। না হইলে এমন যে দলটা এ দলটাও অচল হইয়া যাইবে।

ঢুলীটা এই কথায় বলিয়াছে—চিঁড়ে রসস্থ না হলে গলা দিয়ে নামে না। শুধু কবিয়ালের গান কেউ শুনবে না। ললিতা নির্মলা মুখপাত হ'লে চোখ বুজে গান শুনতে হবে।

ললিতা নির্মলা ফোঁস করিয়া উঠিয়া ঝগড়া শুরু করিয়া দিয়াছে। একে রূপোপজীবিনী নারী তার উপর মদের নেশা। রূপের নিন্দা শুনিয়া গালিগালাজে স্থানটা অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছে।

নিতাইয়ের ভাল লাগিল না। সে ধীরে ধীরে অলক্ষিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। লক্ষ্যহীনভাবে চলিতে চলিতে কখন একসময় আসিয়া দাঁড়াইল গঙ্গার ধারে, শ্মশানে। সেইখানে সে বসিল।

* * *

সামনে জনশূন্য শ্মশান। একটা চিতা হইতে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠিতেছে। এখানে ওখানে ছাইয়ের গাদা। গঙ্গার ওপারে পূর্বদিকে সন্ধ্যা নামিয়াছে। দগ্ধ দেহের গন্ধে এখানকার বাতাস ভারী। ইহারই মধ্যে চুপ করিয়া সে বসিয়া রহিল।

এত কাছে হইতে এমন করিয়া একা বসিয়া দুচোখ ভরিয়া নিতাই জীবনের ওপারকে কখনও দেখে নাই। জীবনের ওপারে মৃত্যুপুরী, মরণ ওখানে বসিয়া আছে।

পাড়ায়—গ্রামে মানুষ মরিয়াছে, সে শুনিয়াছে। মরণ সম্বন্ধে সকল মানুষের মতই একটা ভয়—একটা সকরুণ অসহায় দুঃখই এতকাল তাহার ছিল। এই প্রথম বসন্ত তাহার কোলের উপর মরিয়া মরণের সঙ্গে একটা প্রত্যক্ষ পরিচয় করাইয়া দিয়া গেল। মনে হইতেছে বসন্তর হাতে কপালে হাত রাখিয়া সে যেন মরণের ছোঁয়াচ অনুভব করিতে পারিত। কপালে হাত রাখিয়া কতদিন সে চমকিয়া উঠিয়াছে। এমন ছ্যাঁক করিয়া একটা স্পর্শ লাগিত যে না চমকিয়া পারিত না। আর কাল রাত্রে তো মরণ যেন বসন্তকে লইয়া তাহার সঙ্গে কাড়াকাড়ি করিয়া গেল।

বসন্ত কিন্তু মরিতে ভয় পায় নাই, তবে বাঁচিতে তাহার সাধ ছিল। অনেক গোপন সাধ তাহার ছিল। হঠাৎ মনে হইল—বসন্তের আত্মা যদি—। দেহ ঘর সংসার স্বজন পৃথিবী হারাইয়া অসহায় মানুষের আত্মা তো দেহের মমতায় অনেক সময় কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফেরে। গভীর নিশীথ রাত্রে বসন্ত যদি আসে চিতার পাশে তাহার অনেক সাধের অনেক রূপের দেহখানির সন্ধানে? বুকখানা তাহার স্পন্দিত হইয়া উঠিল।

সে একেবারে আসিয়া বসিল—শ্মশানের ভিতর বসন্তের চিতার পাশটিতে। রাত্রির তখন সবে প্রথম প্রহর। সব স্তব্ধ। সব অন্ধকার। শুধু ঝিঁ ঝিঁ পোকা ডাকিতেছে। শহরের আলো, কোলাহল অনেকটা দূরে। নিতাই চিতার পাশে বসিয়া মনে মনে বলিল—বসন এস! ...বসন এস!...বসন এস!

বসন্ত কিন্তু আসিল না।

সমস্ত রাত্রি শ্মশানে শিয়াল, শকুন, কুকুর প্রভৃতি শ্মশানচারীদের মধ্যে কাটাইয়া দিল, তাহারা একে একে আসিল, কলহ করিল, খেলা করিল, চলিয়া গেল। গঙ্গার জলে কত জলচর

সশব্দে ঘাই মারিল, কিন্তু বসন্তর দেখা মিলিল না। সারারাত্রি বালুচরের ধার ঘেঁষিয়া গঙ্গা কলকল করিয়া বহিয়া গেল। কলকল কুলকুল শব্দ কখনও উঁচু কখনও মৃদু; আকাশে দুই-তিনটা তারা খসিয়া গেল; গঙ্গার ওপারে সড়কটায় কত গরুর গাড়ী গেল; গাড়ীর নীচে ঝুলানো আলো দুলিয়া দুলিয়া একটা আলো তিন-চারিটার মত মনে হইল; সারারাত্রি জোনাকীগুলা জ্বলিল, নিবিল; গঙ্গার কিনারার জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া শিয়ালগুলা বালুর চরের উপর ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইল; গাছে শকুন কাঁদিল, চিতার কাছে কতকগুলা বসিয়া রহিল উদাসীর মত। নিতাই বসিয়া বসিয়া সব দেখিল, মুহূর্তের জন্য কোন কিছুর মধ্যে বসন্তর আভাস মিলিল না, বসন্ত বলিয়া কিছুকে ভ্রম পর্যন্ত হইল না, আকাশের তারাগুলা পূব হইতে পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল, বড় কাস্তেটা পাক খাইয়া ঘুরিয়া গেল, বিছের লেজটা গঙ্গার পশ্চিম পাড়ের জঙ্গলের মধ্যে ডুবিয়া গেল; পূব আকাশের শুকতারা উঠিল। নিতাই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

গঙ্গার পূর্ব পাড়ের ঢালু চরটা প্রায় ক্রোশখানেক চওড়া, তার ওপারে সারি-সারি গ্রাম, গ্রামের গাছপালাগুলার মাথায় আকাশে ক্রমে ফিকে রঙ ধরিল, কল-কল কল-কল করিয়া পাখীগুলা একবার রোল তুলিয়া ডাকিয়া উঠিল। রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। নাঃ, বসন্ত দুনিয়া হইতে মুছিয়াই গিয়াছে। হঠাৎ তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। সে চোখ বন্ধ করিয়া আত্মসম্বরণ করিতে চেষ্টা করিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটিল। খোলা চোখের সামনে যে বসন্ত কোথাও ছিল না, নিতাই চোখ বুজিতেই সেই বসন্ত আশ্চর্য স্পষ্ট হইয়া মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। মনে হইল, বসন্ত যেন তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।—বসন্ত! বসন্ত!

চোখ খুলিতেই নিতাইয়ের ভ্রম ভাঙিয়া গেল। ইহারই মধ্যে আকাশে অন্ধকারের ঘোর আরও কিছুটা কাটিয়াছে। নিতাইয়ের সম্মুখে গঙ্গা, শ্মশান, গাছপালা, চিতার আঙরা। কুকুরের পালগুলাও দেখা যাইতেছে। উদাস মনে আবার সে চোখ বুজিল। অদ্ভুত! এ কি! আবার বসন্তকে সে দেখিতে পাইতেছে। বসন্ত আসিয়াছে। চোখ বন্ধ করিলেই সে দেখিতেছে স্পষ্ট বসন্তর ছবি; ছবি নয় যেন সত্যকারের বসন্ত, সে হাসিতেছে, সে কথা বলিতেছে। পুরানো কথার পুনরাবৃত্তি নয়, বসন্ত নূতন ভঙ্গিতে কত নূতন কথা বলিতেছে, নূতন বেশভূষায় সাজিয়া নূতন রূপে দেখা দিতেছে।

নিতাই খুশী হইয়া উঠিল। থাকিতে থাকিতে নূতন কলি তাহার মনে জাগিয়া উঠিল।—

"মরণ তোমার হার হল যে মনের কাছে
ভাবলে যারে কেড়ে নিলে সে যে দেখি মনেই আছে
মনের মাঝেই বসে আছে।
আমার মনের ভালবাসার কদমতলা—
চার যুগেতেই বাজায় সেথা বংশী আমার বংশীওলা।
বিরহের কোথায় পালা—
কিসের জ্বালা?
চিকন-কালা দিবস নিশি রাধায় যাচে।"

মনখানি তাহার পরিপূর্ণ মন হইয়া উঠিল। এ যে কেমন করিয়া হইল তাহা সে জানে না, তবে হইল। বসন্ত তাহার হারায় নাই। পরিপূর্ণ মনেই সে গঙ্গার ঘাটে নামিয়া মুখ-হাত ধুইল, তারপর ফিরিল বাসার দিকে।

বাসায় তখন বাঁধাছাঁদার তোড়জোড় পড়িয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া সকলে হৈ-চৈ করিয়া উঠিল—এই যে! এই যে!

দোহারটি রসিকতা করিয়া বলিল—আমি বলি, ওস্তাদ বুঝি বিবাগী হয়ে গেল।

নিতাই মৃদু হাসিয়া ছড়ার সুরে তাহারই পুরানো একটা গানের দুইটি কলি আবৃত্তি করিয়া দিল—

"সে বিনে প্রাণে বাঁচিনে—ভবনে ভুবনে রহি কেমনে?
আমি যাব সেই পথে, যে পথ লাগে ভাল নয়নে।"

ললিতা ঠোঁটে পিচ কাটিয়া বলিল—বল কি বোনাই, অঙ্গে তবে তোমার ছাই কই?

নির্মলা কিন্তু আসিয়া সস্নেহে তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিল—ব'স দাদা, আমি চা ক'রে দি।

বাজনদারটি আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—কাল ছিলে কোথা বল তো? কার বাড়ীতে? সে কেমন হে? অর্থাৎ তাহার ধারণা নিতাই কাল রাত্রে বসন্তকে ভুলিবার জন্য শহরের কোন দেহব্যবসায়িনীর ঘরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছিল।

বেহালাদার ধমক দিল—থাম হে, থাম তুমি। যেমন তুমি নিজে, তেমনি দেখ সবাইকে। ব'স ওস্তাদ, ব'স। নিতাই হাসিয়া বসিল।

প্রৌঢ়া এতক্ষণ কাজে ব্যস্ত ছিল। একজন পুরনো কাপড়ের ব্যবসায়ীর সঙ্গে বসন্তর কাপড়গুলি বেচিবার বন্দোবস্ত করিতেছিল। দাম-দস্তর শেষ করিয়া সে বাহিরে আসিল। নিতাইকে বলিল—ওগো বাবা, এই বেলাতেই উঠছি। গুছিয়ে তোমার জিনিসপত্তর বেঁধে-ছেঁদে নাও।

নির্মলা একটি বাটিতে তেলমাখা মুড়ি নামাইয়া দিয়া বলিল—চায়ের জল ফুটছে, ততক্ষণে মুড়ি কটি খেয়ে নাও। কাল তো সারারাত খাও নাই।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নিতাই বলিল—বোন নইলে ভায়ের দুঃখ কেউ বোঝে না।

—আর মাসী বেটীর কথা বুঝি ভুলেই গেলে বাবা? প্রৌঢ়া আসিয়া একটি মদের বোতল, গোটা দুয়েক গত রাত্রের সিদ্ধ ডিম, খানিকটা মাংস আনিয়া নামাইয়া দিল।—কাল রাত থেকে আনিয়ে রেখেছি। খাও, শরীলের জুৎ হবে।

নিতাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—মা-মাসীকে কি কেউ ভোলে, না ভোলা যায়? চিরদিন তোমার কথা মনে থাকবে মাসী।

প্রৌঢ়া হাসিয়া বলিল—তুমি খাও, আমি আসছি।

প্রৌঢ়া চলিয়া যাইতেই ঢুলীটা আরও কাছে আসিয়া বসিল। নিতাই হাসিয়া বলিল—নাও, নাও, ঢেলে লাও, আরম্ভ কর।

কৃতার্থ হইয়া মদ ঢালিতে ঢালিতে চুপি চুপি বলিল—বসনের কাপড়চোপড় বিক্রী হয়ে গেল।

নিতাই কোন উত্তর দিল না।

অভিযোগ করিয়া ঢুলীটা আবার বলিল—গয়না দু-এক পদ রেতে খুলে লাও নি কেনে, বল দেখি? এমুনি মুখ্যুমি করে, ছি!

নিতাই বোতল দেখাইয়া বেহালাদার ও দোহারকে বলিল—এস, লাও।

তাহারাও এবার অপরিমেয় সহানুভূতির সঙ্গে কাছে আসিয়া ঘেঁষিয়া বসিল। কিছুক্ষণ পরেই বেহালাদার সচকিত হইয়া বলিল—ওই! বোতল শেষ হয়ে গেল! তুমি? তুমি তো কই—

নিতাই হাসিয়া বলিল—তা হোক, দরকার নাই।

—তুমি খাবে না?

—নাঃ।

সকলে অবাক হইয়া গেল।

নিতাই বলিল বেহালাদারকে—তোমার কাছে একটি জিনিস শিখবার সাধ ছিল। রাত্রে বেহালায় তুমি যে সুরটি বাজাও ওই সুরটি বেহালায় তুলতে শিখবো। গলায় পারি, বেহালায় শিখব।

বেহালাদার বলিল—নিশ্চয়। তোমাকে শেখাব না ওস্তাদ? দেখ দেখি! তিন দিনে শিখিয়ে দোব।

নিতাই হাসিয়া বলিল—তিন দিন আর পাব কোথায় তোমাকে?

—কেনে? সবিস্ময়ে প্রশ্নটা করিল দোহার। বেহালাদার স্থির দৃষ্টিতে নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। সে আঁচ করিয়াছে।

নিতাই হাসিয়া বলিল—আজই আমি চলব।

—সে তো আমরাও। তুমি—

দোহারের মুখের উপর হাত দিয়া বেহালাদার বলিল—থাম তুমি থাম।

নিতাই কিন্তু দোহারের কথা ধরিয়াই জবাব দিল—হ্যাঁ যাব সবাই, তোমরা এক পথে, আমি আর এক পথে।

বেহালাদার তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিল, শুধু বলিল—ওস্তাদ!

নিতাই একটু চুপ করিয়া রহিল, কথার উত্তর দিল না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বেশ গলা ছাড়িয়া গান ধরিয়া দিল;—মনে নূতন পদ আসিয়াছে।

"বসন্ত চলিয়া গেল হায়,
কালো কোকিল আজি কেমনে গান গায়
বল—কেমনে থাকে হেথায়!"

হঠাৎ বেহালাদার বেহালাটা টানিয়া লইয়া বলিল—শোন ওস্তাদ, শোন, সেই সুর তোমাকে শোনাই, শোন। এসেছে।

সে ছড়ি টানিল—লম্বা টানা সুর। সেই সুর!

ইহারই মধ্যে আসিয়া হাজির হইল মাসী।

—বাবা!

নিতাই হাত তুলিয়া ইসারায় জানাইল—এখন নয় একটু পরে। কিন্তু বেহালাদার থামিয়া গেল। সে মাসীর মুখ দেখিয়া থামিয়া গিয়াছে।

মাসী বলিল—কি শুনছি বাবা?

—কি মাসী?

—তুমি—? তুমি চলে যাবে? আমাদের সঙ্গে যাবে না?

—না মাসী। খেলার একপালা শেষ হল। এবার নতুন পালা।

—অন্য দলে—?

—না মাসী। এবার পথের পালা। এবার পথে পথে।

প্রৌঢ়া অনেক বুঝাইল। অনেক প্রলোভন দেখাইল। বসন্তর গহনা কাপড়-চোপড়ের

দামের অংশ পর্যন্ত দিতে চাহিল। আরও বলিল—বসনের চেয়ে ভাল নোক আমি দলে আনছি বাবা। আমি কথা দিচ্ছি, তোমার কাছেই সে থাকবে।

নিতাই বলিল—না মাসী, আর নয়।

নির্মলা কাঁদিল।

নিতাইও একবার চোখ মুছিয়া বলিল—না ভাই, তুমি কেঁদো না, তুমি কাঁদলে আমি বেথা পাব।

বেহালাদার বলিল—তুমি বিবাগী হবে ওস্তাদ?

নিতাই ও প্রশ্নের জবাবে তাহার দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাই তো। বসন্তের সঙ্গে যে গাটছড়া ও গিঁট সে বাঁধিয়াছিল, সে গিঁট খুলিয়া গিয়াছে। বসন্ত আজ তাহাকে মুক্তি দিয়াছে। এবার একটা নতুন ডাক যেন সে শুনিয়াছে। পথে পথে চলো মুসাফের। বেহালাদারের প্রশ্নে তাহার মনে অকস্মাৎ সুরটি বাজিয়া উঠিল।—বিবাগী?

বৈরাগ্যই তাহার ভাল লাগিল।

একুশ

ঝুমুরের দল ধরিল দেশের পথ।

নিতাই কোন পথে কোথায় যাইবে তাহা ঠিক করে নাই, তবে ওই দলটির সঙ্গে থাকিবে না তাহা ঠিক, সেই কারণে দলের বন্ধন কাটাইবার অন্য একটা পথ ধরিল। কাটোয়া হইতে ছোট লাইন ধরিয়া ইহারা চলিল মল্লারপুরের দিকে। নিতাই বড় লাইন ধরিয়া উত্তর মুখে চলিল। শেষ মুহূর্তে ঠিক করিয়া ফেলিল সে কাশী যাইবে।

নির্মলা অনেকখানি কাঁদিল। মেয়েটা তাহাকে দাদা বলিত। দাদা বলিয়া নিতাইয়ের জন্য কাঁদিতে তাহার সঙ্কোচের কোন কারণ ছিল না।

শেষ মুহূর্তে ললিতাও কাঁদিল। বলিল—জামাই, সত্যিই ছাড়লে!

প্রৌঢ়া বর্তমানের আশা ছাড়িয়াও কিন্তু ভবিষ্যতের আশা ছাড়ে নাই। সে বলিল—চিরকাল তো মানুষের মন বিবাগী হয়ে থাকে না বাবা। মন একদিন ফিরবে, আবার চোখে রঙ ধরবে। ফিরেও আসবে। তখন যেন মাসীকে ভুলো না। আমার দলেই এসো।

বেহালাদার ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—আচ্ছা।

মহিষের মত লোকটাও কথা বলিল—চললে? তা—। খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল—সন্ন্যেসী হওয়ার কষ্ট অনেক হে। ভিখ্ করে পেট ভরে না—তা নইলে—বেশ, এস তা হ'লে।

তাহারা যাইবে ছোট্ট লাইনের ট্রেনে—যে লাইনের উপর নিতাইয়ের নিজের বাড়ী। ওই লাইনের ট্রেনেই নিতাই আসিয়াছিল—গ্রাম ছাড়িয়া। সেই ছোট গাড়ীতেই চড়িয়া মাসী বলিল—এস বাবা, এই গাড়ীতেই চড়। এই নাইনেই তো বাড়ী। মন খারাপ হয়েছে—বাড়ী ফিরে চল বাবা।

বাড়ী! নিতাই চমকিয়া উঠিল। বাড়ী! স্টেশন! সেই কৃষ্ণচূড়ার গাছ! সেই রেল লাইনের বাঁক! সেই স্বর্ণশীর্ষবিন্দু কাশফুল! সোনার বরণ ঝকঝকে ঘটি মাথায় ক্ষার-ধোওয়া মোটা খাটো কাপড় পরা অতি কোমল কালো মেয়েটি! সেই তাহার ঠাকুরঝি! ঠাকুরঝি।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল সেই কতকালের পুরানো গান—

"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?
কালো চুলে রাঙা কুসুম হেরেছ কি নয়নে?"

নিতাইয়ের মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। অদ্ভুত হাসি। কত কথা মনে পড়িতেছে, কত কথা—কত পুরানো গান!

তবুও নিতাই বার বার ঘাড় নাড়িয়া নীরবেই জানাইল—না। না। না। না।

তাহার মনের মধ্যে সেই গানের কলি গুঞ্জন করিতেছিল—"চাঁদ তুমি আকাশে থাক।" মনে ঘুরিতেছিল—"তাই চলেছি দেশান্তরে—।"—সে আবার একবার ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না। ঠাকুরঝি এতদিনে ভাল হইয়াছে, ঘরসংসার করিতেছে। সে গিয়া আর নূতন অশান্তির সৃষ্টি করিবে না। না। না সে যাইবে না। সে যাইবে না।

নিতাই নীরবেই বিদায় লইল। এই বিদায় তাহার শোকাচ্ছন্ন মনকে আরও উদাস করিয়া তুলিল। দলের প্রত্যেক জনটির মুখ তাহার চোখের সম্মুখে ক্ষণে ক্ষণে জাগিয়া উঠিতেছিল—বিদায়-ব্যথা-কাতর ম্লান মুখ। কাহারও সহিত কোনদিন তাহার ঝগড়া হয় নাই কিন্তু তাহারা যে এত ভাল—এ কথা আজিকার দিনের এই মুহূর্তটির আগে কোনদিন কোন একটিবারের জন্যও মনে হয় নাই। বরং সে সময় তাহাদের দোষগুলাই অনেক বড় হইয়া তাহার চোখে পড়িয়াছে। মাসীকে দেখিয়া মনে হইত মুখে মিষ্টি কথা বলিলেও সমস্ত অন্তরটা বিষে ভরা, মিথ্যা ছাড়া সত্য বলিতে জানে না। পৃথিবীতে খাদ্য এবং অর্থ ছাড়া আর কিছুকে ভালবাসে না মাসী। আজ মনে হইল—না, না, মাসী—মাসীরই মত, মায়েরই মত ভালবাসিত তাহাকে। তাহার চোখের ওই কয় ফোঁটা জল বসন্তের মরণকালের ভগবানের নামের মতই সত্য।

নির্মলা চিরদিন ভাল। মায়ের পেটের বোনের মতই ভাল।

ললিতার চোখা চোখা ঠাট্টাগুলি—শ্যালিকার মুখের ঠাট্টার মতই মিষ্ট ছিল।

বেহালাদারের কথা মনে করিয়া তাহার চোখে জল আসিল। কানের কাছে বাজিয়া উঠিল সেই সুর।

সেই সুরটাই ভাঁজিতে ভাঁজিতে সে ফিরিয়া বসিল গঙ্গার ঘাটে। গঙ্গায় স্নান করিয়া সে মনে মনে একখানি গঙ্গা স্তব রচনা করিবার চেষ্টা করিল। হইল না। ঘাটের উপরেই একটা গাছের তলায় আসিয়া সে বসিল। কিন্তু কোথায় সে যাইবে? পথে পথে ভিক্ষা করিয়া ফিরিবে বাউল দরবেশের মত? না। এ কল্পনা তাহার ভাল লাগিল না। তবে? কি বা করিবে—কোথায়ই বা যাইবে? হঠাৎ তাহার মনে হইল—হায় হায় হায়, হায় রে পোড়া মন! এই কথা কি ভাবিতে হয়? ঠাকুর, ঠাকুরের কাছেই যাইবে সে! গোবিন্দ! বিশ্বনাথ! প্রভু, প্রভুর কাছে যাইবে সে! মায়ের কাছে যাইবে! মা অন্নপূর্ণা! রাধারাণী রাধারাণী রাধারাণী! সে সেই সব দেবতার দরবারে বসিয়া গান গাহিবে—মহিমা কীর্তন করিবে—ভগবানকে গান শুনাইবে—শ্রোতারা শুনিয়া চোখের জল ফেলিবে—সঙ্গে সঙ্গে তাহাকেও কিছু কিছু দিয়া যাইবে—তাহাতেই তাহার দিন গুজরান হইবে। তাহার ভাবনা কি? হায় রে পোড়া মন—এতক্ষণ তুমি এই কথাটাই ভাবিয়া পাইতেছিলে না? এখান হইতে কাশী, বাবা বিশ্বনাথ—মা অন্নপূর্ণা। কাশী হইতে অযোধ্যা, সীতারাম—সীতারাম! সীতারামের রাজ্য হইতে রাধাগোবিন্দ, রাধারাণী—রাধারাণীর রাজ্য বৃন্দাবন।

তারপর মথুরা—না, না, মথুরা সে যাইবে না। রাধারাণীকে কাঁদাইয়া রাজ্যলোভী শ্যাম রাজা হইয়াছে সেখানে, সে রাজ্যে নিতাই যাইবে না। মথুরা হইতে বরং কুরুক্ষেত্র—হরিদ্বার।

হরিদ্বারের পরেই হিমালয়—পাহাড় আর পাহাড়। ছেলেবেলায় পড়া ভূগোল মনে পড়িল—পৃথিবীর মধ্যে এত উঁচু পাহাড় আর নাই—হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর। হিমালয়ের মধ্যেই মানস-সরোবর। সেখান পর্যন্তও নাকি মানুষ যায়। নিতাই মানস-সরোবরে স্নান করিবে। তারপর জনশূন্য হিমালয়ের কোথাও একটা আশ্রয় বানাইয়া সেইখানেই থাকিয়া যাইবে। নিত্য নূতন গান রচনা করিবে—গাহিবে, পাহাড়ের গায়ে খুদিয়া খুদিয়া লিখিয়া রাখিবে। সে মরিয়া যাইবে—তাহার পর যাহারা সে-পথ দিয়া যাইবে তাহারা সে গান পড়িবে আর মনে মনে নিতাই-কবিকে নমস্কার করিবে।

শেষ বৈশাখের দ্বিপ্রহর। আগুনের মত তপ্ত ঝড়োহাওয়া গঙ্গার বালি উড়াইয়া হু-হু করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। দুই পায়ের শস্যহীন চরভূমি ধূসরবর্ণ—যেন ধু ধু করিতেছে। মানুষ নাই, জন নাই; কেবল দুই-চারিটি চিল আকাশে উড়িতেছে—তাহারাও যেন কোথায় কোন দূর-দূরান্তরে চলিয়াছে। সব শূন্য—সব উদাস—সব স্তব্ধ—একটা অসীম বৈরাগ্য যেন সমস্ত পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। নিতাই সেই অগ্নিগর্ভ রৌদ্রের মধ্যেই বাহির হইয়া পড়িল। "চলো মুসাফের বাঁধো গাঁঠোরী—বহুদূর যানা হোগা।" কাশী! সে স্টেশনে ফিরিয়া বড় লাইনে কাশীর টিকিট কাটিয়া ট্রেনে চড়িল।

নিতাই আসিয়া উঠিল কাশীতে।

ব্রিজের উপর ট্রেনের জানালা দিয়া কাশীর দিকে চাহিয়াই সে মুগ্ধ হইয়া গেল। বাঁকা চাঁদের ফালির মত গঙ্গার সাদা জল ঝক্‌ঝক্ করিতেছে—সমস্ত কোল জুড়িয়া মন্দির, মন্দির আর ঘাট, আরও কত বড় বড় বাড়ী। নিতাইয়ের মনে হইল মা-গঙ্গা যেন চোখঝলসানো পাকা বাড়ীর কণ্ঠি গাঁথিয়া গলায় পরিয়াছেন। ট্রেনের যাত্রীরা কলরব তুলিতেছে—জয় বাবা বিশ্বনাথ—অন্নপূর্ণামায়ী কি জয়!

সেও তাহাদের কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নিজের কণ্ঠস্বর মিশাইয়া দিল। জয়ধ্বনির সুরের সঙ্গে সুর মিশাইয়া দিল। জয় বাবা বিশ্বনাথ! অন্নপূর্ণামায়ী কি জয়!

স্টেশনে নামিয়া কিন্তু অকস্মাৎ একসময় তাহার মনের ছন্দ কাটিয়া গেল। সে যেন হুঁচোট খাইয়া দাঁড়াইয়া গেল। সে বিব্রত এবং বিহ্বল হইয়া অনুভব করিল সে কোন্ বিদেশে আসিয়া পড়িয়াছে!

বাংলা দেশের শেষ হইতেই সে একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছিল। ট্রেনে ক্রমশই ভিন্ন-ভাষাভাষী ভিন্ন বেশভূষায় ভূষিত লোকের ভিড় বাড়িতেছিল। কাশীতে নামিয়াই সে ভিন্ন ধরণের মানুষের মেলার মধ্যে মিশিয়া গিয়া এক সময় প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিল যে, এখানকার মানুষের জীবনের ছন্দের সঙ্গে তাহার জীবনের ছন্দ কোনখানে মিলিতেছে না। তাহার উপর কাশী-কাশী-কাশী—তাহার কল্পনার কাশী কোথায়? সে তো এই দোকানদানিভরা বিকি-কিনির কোলাহলে মুখর এই নগরীটি নয়! কোথায় সেই বিশ্বনাথের কাশী?

বিহ্বলের মতই সে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিহ্বলের মত চারিদিকে চাহিতে চাহিতে এক পথ হইতে অন্য পথে চলিতেছিল। কতক্ষণ চলিয়াছিল তাহার ঠিক ছিল না। অবশেষে একখানা একায় উঠিয়া সে একাওয়ালাকে কোনমতে বুঝাইল যে সে বিশ্বনাথের মন্দিরে যাইবে। একাওয়ালাই তাহাকে একটা চৌরাস্তায় নামাইয়া দিয়া বলিল—এই দিকে যাও! সেই পথে কয়েক পা অগ্রসর হইয়া অকস্মাৎ তাহার মুখ চোখ আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। পূজার থালা হাতে ধপধপে সাদা থান পরিয়া একটি মহিলা যাইতেছিলেন। সে আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহার দিকে আগাইয়া

গেল। তাহার মনে হইল—এ যে তাহাদের গ্রামের সেই রাঙা মা-ঠাকরুণ। হ্যাঁ—তিনিই তো! তেমনি ঝলমলে সম্ভ্রম-ভরা ভঙ্গিতে কাপড় পরিয়াছেন, মাথায় তেমনি আধ-ঘোমটা, মাথার চুলগুলি তেমনি ছোট করিয়া ছাঁটা—অবিকল তিনি। হারাইয়া-যাওয়া ছেলে যেন মাকে খুঁজিয়া পাইয়াছে এমনিভাবেই নিতাই আশ্বস্ত এবং উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। ছুটিয়া আসিয়া সে তাঁহার আগে গিয়া জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল।

না, রাঙা মা-ঠাকরুণ নন, তবে ঠিক রাঙামায়ের মতই। ইনি যে তাহাদের দেশের অন্য কোন গ্রামের আর কোন রাঙামা—তাহাতে নিতাইয়ের আর সন্দেহ রহিল না। এবং সত্য-সত্যই সে হিসাবে তাহার ভুল হইল না।—তিনি বাঙালী বিধবা এবং যাঁহারা গ্রামে মা-ঠাকরুণ হইয়া দাঁড়ান তাঁহাদেরই একজন বটেন। পতিপুত্রহীনা বাঙালী বিধবা কাশীতে বিশ্বনাথকে আশ্রয় করিয়া মণিকর্ণিকার ঘাটের দিকে তাকাইয়া আছেন। জীবনের বোঝা নামাইবেন সেইখানে। মন্দিরে পূজা সারিয়া তিনি বাড়ী ফিরিতেছিলেন। নিতাই আসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—মা-ঠাকরুণ!

তিনি থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। প্রথমে ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়া প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—কে তুমি বাবা?

নিতাই গড় হইয়া প্রণাম করিয়া বলিল—আজ্ঞে মা, আমি এখানে বড় 'বেপদে' পড়েছি।

'বেপদ' শব্দটি তাহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিল। শব্দটি শুনিয়া তিনি বুঝিলেন লোকটি পল্লীর মানুষ এবং একেবারে নূতন এখানে আসিয়াছে।

তিনি প্রসন্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন—কি বিপদ বাবা?

—আমি এখানকার কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছি না মা! তার ওপর গরীব 'নোক', আশ্রয় নাই; নতুন এসেছি।

হাসিয়া তিনি বলিলেন—বুঝেছি এস, আমার সঙ্গে এস। স্টেশন থেকে আসছ বুঝি?

—হ্যাঁ মা! পথে পথে নিতাই যেন বাঁচিয়া গেল।

তাহার এই নূতন মা,—তাঁহাকে সে নূতন মাই বলিল; তিনি নিতাইকে নিজের বাসায় লইয়া গেলেন। মানুষটি বড় ভাল।

নিতাই মনে মনে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল। ভাগ্যবিধাতাকে বলিল—প্রভু, তোমার মত দয়াল আর হয় না। অধমের ওপর দয়ার তোমার শেষ নাই। নইলে এমন বিদেশে বিভুঁয়ে এসেও মা যশোদার মত মায়ের আশ্রয় পেলাম কি ক'রে?

এই নূতন মা তাহাকে নিজের বাসায় লইয়া গেলেন। কোন এক আদিঅন্তহীন আঁকাবাঁকা গলির ভিতর তাঁর বাসা—একখানি ঘর, এক টুকরা বারান্দা। আর রান্না করিবার জন্য ছোট আর একটা বারান্দার একটা কোণ। নিতাই সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—আমি বরং বাড়ীর বাইরে বসি। জাতে আমি বড় নীচু।

—কেন বাবা? এই বারান্দায় ব'স। হ'লেই বা নীচু জাত।

নিতাইয়ের চোখে জল আসিয়া গেল। সত্যই মা যশোদা। বৃন্দাবনের মায়েরা—যশোমতীর দেশের মায়েরা কেমন তা সে জানে না, কিন্তু তাহার দেশের মায়েরা ছাড়া যশোদার মত মা অন্য কোন দেশে আছে বলিয়া তাহার মনে হয় না। সে দেখিয়াছে এই দেশের কত লোক —হিন্দুস্থানী কথা যাহারা বলে—তাহারা তাহাদের দেশে যায়—অনায়াসে এক বৎসর, দুই বৎসর এক নাগাড়ে কাটাইয়া দেয়, কই মাকে দেখিবার জন্য তো তাহারা ছুটিয়া যায় না! মায়েরাও নিশ্চয় দেশে দিব্য থাকে! যে যশোদা গোপালকে এক বেলার জন্য গোষ্ঠে পাঠাইয়া

কাঁদিতে বসিতেন, সে যশোদার মত মা তাহারা কি করিয়া হইবে? তা ছাড়া এমন মিষ্ট কথা—আহা-হা-রে!—মা গো মা! না—কি বাবা গোপাল! এমন ডাক—এমন সাড়া—আর কোথায় মেলে?

মা তাহাকে একে একে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—কি নাম, কোথা ঘর, কোথা পোস্টাপিস, কোন্ জেলা? অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়ীতে কে কে আছে বাবা? মা, ভাই, বিয়ে করনি বাবা? নিতাইয়ের মনে পড়িয়া গেল ঠাকুরঝিকে, মনে পড়িয়া গেল বসন্তকে। সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—না।

নূতন মা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—তোমাদের গ্রামে কত ঘর ব্রাহ্মণ—কত ঘর কোন্ জাত আছে বাবা মাণিক? তোমাদের কোন্ স্টেশন? তোমাদের ওদিকে গেল বার ধান কেমন হয়েছিল বাবা? ধান ছাড়া আর কোন ফসল হয়? বর্ষা কেমন হয় বাবা? বাদলা হয় ঘন-ঘন?

মায়ের চোখ দুইটি স্বপ্নাতুর হইয়া উঠিল।

—বর্ষায় কাদা কেমন হয় বাবা? তোমাদের দেশের ডাবের গাছ বেশী, না তালের গাছ বেশী? ডাবের দর কি রকম? মাছ কেমন—কোন্ মাছ বেশী? তোমাদের দেশের মুড়ি কেমন হয় বাবা?

নিতাই একে একে জবাব দিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তাহারও মনে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল এক একটি ছবি।

—তোমাদের গ্রামের কাছে নদী আছে বাবা? বড় দীঘি আছে গ্রামে? আঃ, কতদিন দীঘির জলে স্নান করি নাই! দীঘিতে পদ্মফুল ফোটে? শালুক সব গ্রামেই আছে। নীল শালুক আছে বাবা তোমাদের গ্রামে? কলমীশুশুনীর শাক হয় বাবা?

মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন ফুরাইয়া যায়। মা চুপ করিয়া থাকেন উদাস মনে। বোধ হয়, তাঁহারও মনে পড়ে দেশের কথা। আবার হঠাৎ মনে পড়ে কোন একটা নূতন কথা, সেইটার পিছনে পিছনে আসিয়া দাঁড়ায় আবার এক ঝাঁক প্রশ্ন।

—তোমাদের ওদিকে সজনের ডাঁটা হয়? 'নজনে' আছে? পানের বরজ আছে? কেয়া-র গাছ আছে তোমাদের গ্রামে, সাপ থাকে গোড়ায়? গোখরো কেউটে সাপ খুব বেশী ওদিকে, না? নদীর ধারে শামুকভাঙা কেউটে থাকে? গাঙ-শালিক আছে। 'বউ কথা কও' পাখী আছে? থাকবেই তো। 'চোখ গেল' অনেক আছে, না? 'কৃষ্ণ কোথা রে' পাখী? অনেকে বলে 'গেরস্তের খোকা হোক', গায়ের রঙ হলুদ, মাথাটি কালো, ঠোঁটটি লাল টুকটুকে, আমরা বলি—'কৃষ্ণ কোথা রে' পাখী। বেনে বউও বলি—আছে?

হঠাৎ মায়ের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। তিনি চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন কিছুক্ষণ। দেখিতে দেখিতে ফোঁটা দুই জল যেন আপনা-আপনি চোখ কাটিয়া বাহির হইয়া টপ টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িল।

নিতাই কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না। কিন্তু 'কৃষ্ণ কোথা রে' পাখীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া চোখে জল আসিল দেখিয়া তাহার মনে হইল—বোধহয় তাহার কৃষ্ণও কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

মা বলিলেন—মা যশোদা গোপালের জন্য কাঁদছিলেন আর হলুদ বাটছিলেন। বাটা হলুদ নিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই গড়লেন এক পাখী। সেই পাখীর মাথায় ঝরে পড়ল—তাঁর চোখের এক ফোঁটা জল! সেই জলের তাপে পুড়ে তার মাথাটি হয়ে গেল কালো—আর জলের সঙ্গে ছিল

যে চোখের রক্ত, সেই রক্তে তার ঠোঁট হয়ে গেল লাল। পাখীটিকে ছেড়ে দিয়ে বললেন— পাখী, তুই দেখে আয় আমার কৃষ্ণ কোথায়। পাখী ডেকে ডেকে ফিরতে লাগল—'কৃষ্ণ কোথা রে?' 'কৃষ্ণ কোথা রে?' চিরকাল সে ডেকেই ফিরছে।

নিতাইয়ের চোখ দিয়াও জল ঝরিতে আরম্ভ করিল।

মা বলিলেন—আমার কৃষ্ণও চলে গেছে বাবা। ব্রহ্মাণ্ডেও আর কেউ নেই। তাই এসেছি বাবার চরণে। নইলে দেশ ছেড়ে—। অর্ধপথেই থামিয়া মা চোখ মুছিলেন। আবার প্রশ্ন করিলেন—তুমি কাশী এসেছ তীর্থ করতে? এই বয়সে তীর্থ? কিছু মনে ক'রো না বাবা— তোমাদের জাতের কেউ তো এমন ভাবে আসে না! তাই জিজ্ঞাসা করছি।

হাত দুটি জোড় করিয়া নিতাই বলিল—পূর্বজন্মের কর্মফল—হয়তো আমার কর্মফের, নইলে—। নিতাই কথাটা শেষ না করিয়াই চুপ করিল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন—কি বলছিলে বাবা?

নিতাই একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আপনার কাছে লুকোব না মা। আমার বাবা, দাদা, ভাই, মামা, মেসো এরা সব চুরি-ডাকাতি করত। জেলও খাটত। সেই বংশে আমার জন্ম মা। আমি—বলিয়া সে থামিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত পরে সে আবার বলিল—বলিতে সে বোধহয় সঙ্কোচ অনুভব করিতেছিল, সসঙ্কোচেই বলিল—দেশে কবিগান শুনেছেন মা? দুই কবিয়ালে মুখে মুখে গান বেঁধে পাল্লা দিয়ে গান করে?

—শুনেছি বইকি বাবা। কত শুনেছি। আমাদের গাঁয়ে নবান্নের সময় বারোয়ারী অন্নপূর্ণাপূজো হ'ত। কবিগান হ'ত পূজোয়। দুর্গাপূজোয় হ'ত যাত্রাগান, কৃষ্ণযাত্রা—শখের যাত্রা। নীলকণ্ঠের গান—"সাধে কি তোর গোপালে চাই গো? শোন যশোদে!" সে সব গান কি ভুলবার! মনসার ভাসান গান হ'ত মনসাপূজোয়। চব্বিশ প্রহরের সময় কীর্তন হ'ত! বাউল বৈরেগীরা খঞ্জনী একতারা নিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষে করত—"আমি যদি আমার হতাম কুড়িয়ে পেতাম হেমের ঘড়া।" আহা-হা! বাবা সেই কীর্তন-গানে শুনেছিলাম— "অমিয় মথিয়া কেবা লাবনি তুলিল গো তাহাতে গড়িল গোরাদেহ"—গোরাচাঁদের দেহ অমৃত ছেঁকে তৈরী হয়েছে। এ সব গান যে অমৃত-ছাঁকা জিনিস বাবা। কবিগান শুনেছি বইকি!

নিতাই চুপ করিয়া গেল। ইহার পর আর নিজেকে কবিয়াল বলিয়া পরিচয় দিতে সাহস হইল না।

বিধবাই জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি কবির দলে থাকতে বাবা? নিজে কবিগান করতে?

হাত জোড় করিয়া নিতাই বলিল—হ্যাঁ মা, অধম একজন কবিয়াল। তবে মা বড় দরের কবিয়াল আমি নই। আমি ঝুমুর দলের সঙ্গে থেকে গান করতাম।

—তা হোক না বাবা! কবিয়াল তো বটে! তা তীর্থ করতে বেরিয়েছ বুঝি?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া নিতাই বলিল—আর ফিরব বলে বেরুই নাই মা। ইচ্ছে আছে ভগবানের দরবারে পথে পথে গান করব, তাতেই দিন কটা কেটে যাবে আমার।

বিধবা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—তাতে তো তুমি সুখ পাবে না বাবা। তুমি কবিয়াল—গান গাইবে—লোককে আনন্দ দেবে, হাসাবে, কাঁদাবে, মেডেল পাবে, কত লোক কত প্রশংসা করবে—তবে তো তোমার আনন্দ হবে, সুখ হবে! বলিতে বলিতে তিনি হঠাৎ থামিয়া গেলেন।—সুখ সংসারে মেলে না বাবা। যদি মেলে, যদি বিশ্বনাথ দেন তো তোমার আপন কাজের মধ্যেই পাবে।

অপরাহ্ণে সে মায়ের কাছ হইতে বিদায় হইল। ইহারই মধ্যে সে তাহার সকল কথাই বলিল। রাজার কথা, বিপ্রপদর কথা। এমন কি বসন্তের কথাও বলিল। বলিল না শুধু ঠাকুরঝির কথা। শুধু তাই নয়, তাঁহাকে সে গানও শুনাইল।

মায়ের বৃত্তান্তও সে সব জানিল। আপনার জন মায়ের কেউ নাই, একমাত্র সন্তানকে হারাইয়া মা এখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। দেশ হইতে জ্ঞাতিরা যাহারা তাঁহার শ্বশুরের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাইয়াছে, তাহারা মাসে দশটি করিয়া টাকা পাঠায়, তাও অনিয়মিত। মা হাসিয়া বলিলেন—পেটের জন্যে ঝগড়া করতে ইচ্ছে হয় না বাবা, লজ্জা হয়। আহার কমিয়ে আধপেটা অভ্যেস করলে এক মাসের খোরাকে দুমাস যায়। তার মধ্যে উপোস করতে পারলে—বিধবার উপোস তো অনেক।

নিতাই অধীর হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ওঃ—সে মায়ের এই আধপেটা অন্নের ভাগ লইয়াছে! মা তাহাকে হাসিমুখে দিয়াছেন। ওঃ! সে বলিল—আমি এইবার উঠি মা! থাকলে আবার আসব।

নিতাই প্রণাম করিল, দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া বলিল—আপনি দু'পা পিছিয়ে যান মা। আমি ওই ঠাঁইটির ধুলো নেব।

মা বলিলেন—তুমি আমার পা ছুঁয়েই নাও বাবা। আমি তো চান করব এখুনি।

—না। নিতাই তাহার পা ছুঁইল না।

মা বলিলেন—অনেক সত্র আছে; জায়গা মিলবে। আমার ঘর এই তো দেখছ—তা ছাড়া এ বাড়ীতে আর দশজন থাকে। সবাই মেয়েছেলে এখানে—

নিতাই হাসিয়া বলিল—দেবতার দেখা খানিকক্ষণের জন্যই বটে মা। চিরকালের পুণ্যি তো আমার নয় মা অন্নপূর্ণা। আপনি আমার সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণা।

মা বলিলেন—তোমার কচি বয়স, তুমি কবিয়াল—তুমি দেশে ফিরে যাও বাবা। চমৎকার তোমার গলা। গানও তোমার ভাল। দেশে তোমার কদর হবে। এ তো বাংলা গানের দেশ নয় বাবা। অবিশ্যি গঙ্গার ঘাটে—ঘাট তো এখানে অনেক আর বাঙালীও অনেক—সেখানে বসে গান করলে অনেক শুনবার লোক পাবে—কিছু কিছু হয়তো পাবেও। কিন্তু সংসারে পেট চলাই তো সব নয় বাবা। একটু বিষণ্ণ হাসির সঙ্গে কথাটি শেষ করিলেন মা।

এই কথাটায় নিতাই একটু ক্ষুণ্ণ হইল। এই লইয়া মা তাহাকে দুইবার কথাটা বলিলেন।

সন্ধ্যায় বিশ্বনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া মায়ের কথার সত্যতা কিন্তু সে অনুভব করিল। ঘটনাটা ঘটিল এইরূপে। প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া মন্দিরশীর্ষের ধ্বজা ও কলসের দিকে সে তাকাইয়া ছিল। সোনার পাত দিয়া মোড়া মন্দির। আকাশে ছিল পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্নার ছটায় ঝলমল করিতেছিল।

চারিদিকে আরতি ও শৃঙ্গার-বেশ দর্শনার্থীর ভিড়। হাজার কণ্ঠে বিশ্বনাথের জয়ধ্বনি, সেই ধ্বনির সঙ্গে সে নিজের কণ্ঠও মিশাইয়া দিল—জয় বিশ্বনাথ!

তারপর সে মনে মনে গান রচনা আরম্ভ করিল—

"ভিখারী হয়েছে রাজা মন রে আমার দেখ্ রে নয়ন মেলে
সাতমহলা সোনার দেউল গড়েছে সে শ্মশান ফেলে।"

গুন্‌গুন্ করিয়া সুর ভাঁজিয়া গানখানি রচনা শেষ করিয়া সে গলা চড়াইয়া গান আরম্ভ করিল—আহা! প্রাণ ঢালিয়া সে গাহিতেছিল।

গান শেষ হইলে—অল্প কয়েকজন লোক, যাহারা শেষে আসিয়া জমিয়াছিল—তাহাদের

একজন তাহাকে কিছু বলিল—তাহার বক্তব্য সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া নিতাই সবিনয়ে বলিল—কি বললেন প্রভু ? আমি বুঝতে পারতা নাই।

একজন হাসিয়া বাংলায় বলিল—তুমি বুঝি সবে এসেছ দেশ থেকে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—উনি বলছেন হিন্দী ভজন গাইতে। তোমার এমন মিষ্টি গলা, তোমার কাছে হিন্দী ভজন শুনতে চাইছেন।

—হিন্দী ভজন ? নিতাই জোড়হাতে বিনয় করিয়া বলিল—আজ্ঞে প্রভু, আমি তো হিন্দী ভজন জানি না।

বাঙ্গালীটি হিন্দী-ভাষী প্রশ্নকারী লোকটিকে যাহা বলিল, আন্দাজে নিতাই সেটা বুঝিল ; বোধ হয় বলিল—হিন্দী ভজন ও জানে না।

জনতার অধিকাংশই এবার চলিয়া গেল। যেন তাহার মধ্যে উপেক্ষা ছিল বলিয়া নিতাইয়ের মনে হইল।

* * *

মন্দির হইতে সরাসরি আসিয়া সে গঙ্গার ঘাটে হাজির হইল।

চোখ তাহার জুড়াইয়া গেল। আহা, এ যে দিন-রাত্রি মেলা লাগিয়াই আছে। আর এ কি বিচিত্র মেলা ! মা গঙ্গাকে সামনে রাখিয়া এ যেন ভবের খেলার হাট বসিয়া গিয়াছে ! একদিকে মণিকর্ণিকা অন্যদিকে রাজা হরিশ্চন্দ্রের ঘাটে শ্মশানচুল্লী জ্বলিতেছে অবিরাম ; ধ্বনি উঠিতেছে রাম-নাম সত্য হ্যায়। লোকে বলে এখানে যাহারা ভস্ম হইল তাহারা শিবলোকে চলিয়া গেল। শিবরাম ! শিবরাম ! শিবশম্ভু ! কি তাহার মনে হইল, দশাশ্বমেধ হইতে পথের জনকে শুধাইয়া শুধাইয়া আসিয়া উঠিল মণিকর্ণিকার ঘাটে। মণিকর্ণিকার ঘাটে আসিয়া হঠাৎ সে পুঁটুলিটা খুলিয়া বাহির করিল একটা পিতলের আংটি। অংটিটা বসনের। বসনের এই একটিমাত্র স্মৃতিচিহ্ন তাহার কাছে আছে। সেইটিকে এই রাজা মণিকর্ণিকার ঘাটে গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিবে। এই পুণ্যে বসনের সকল পাপ মুছিয়া যাক।

বসন তুমি স্বর্গে যাও।

কিন্তু ফেলিতে গিয়াও সে ফেলিতে পারিল না। হাত গুটাইয়া কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে প্রায় ছুটিয়া পলাইয়া আসিল। বসনের আর কিছু নাই। শুধু এইটুকু ! না—থাক এটুকু। থাক। তাহার জীবনের শেষ পর্যন্ত থাক। ওঃ ! বসন দিন-দিন হারাইয়া যাইতেছে। কাশী আসিয়া অবধি বসনকে তাহার বোধ করি মনেই পড়ে নাই। স্বপ্নও দেখে নাই। কাটোয়ার ঘাটে বসিয়া সে চোখ বুজিলেই বসনকে দেখিয়াছিল। গান বাঁধিয়াছিল—

"মরণ তোমার হার হ'ল যে মনের কাছে !
ভাবলে যারে—কেড়ে নিলে—সে যে আমার মনেই আছে, মনেই আছে !"

কিন্তু কই ? ওঃ ! মনের কদমতলাও শুকাইতে শুরু করিয়াছে। বসনের মুখটা পর্যন্ত ঝাপসা হইয়া গিয়াছে। চোখ দুইটা তাহার জলে ভরিয়া উঠিল। মনের মধ্যে সেই গানটি আবার গুন্‌গুন্ করিয়া উঠিল—

এই খেদ মোর মনে।
ভালবেসে মিটল না সাধ কুলাল না এ জীবনে।
হায়। জীবন এত ছোট কেনে—?
এ ভুবনে ?

আংটিটা সে হাতের কড়ে আঙুলে পরিয়া ফিরিয়া আসিল। দশাশ্বমেধ ঘাটে আসিয়া বসিল। ধীরে ধীরে মনটা তাহার জুড়াইয়া আসিল। বড় ভাল স্থান এই দশাশ্বমেধ ঘাট। এত বড় তীর্থ আর হয় না। কত দেশের কত মানুষ। কত পাঠ। কত গান। কত দান। কত ভিক্ষা। কত কামনা। কত দুঃখ। এদিক হইতে ওদিক পর্যন্ত ঘাটটা কত প্রশস্ত! মনে হইল—এই ভাল। বাকী দিনগুলা এই ঘাটে ঘাটে বাসা বাঁধিয়া গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়াই কাটাইয়া দিবে।

পরদিন অপরাহ্ণে সামনে গামছা পাতিয়া ঘাটের এক পাশে বসিয়া সে গান ধরিয়া দিল—

এই খেদ মোর মনে।

কণ্ঠস্বর তাহার অতি মিষ্ট। লোক জমিল। পয়সাও কিছু পড়িল। কিন্তু গান শেষে একজন বলিল—কাশীতে এসে এ খেদ কেন হে ছোকরা?

একজন মহিলা বলিলেন—হ্যাঁ বাবা, ভাল গান গাও। মহাজনের পদ গাও। রাম-প্রসাদের গান—কমলাকান্তের গান—এই সব গান।

সে এবার ধরিল—

"আমার কাশী যেতে মন কই সরে?
সর্বনাশী এলোকেশী—সে যে সঙ্গে সঙ্গে ফেরে!"

গান শেষ করিবার সঙ্গে সঙ্গে মন যেন তাহার বিকল হইয়া গেল। তাহার সমস্ত অন্তরটা এক গভীর বেদনার উদাসীনতায় ভরিয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল গ্রামের মা চণ্ডীকে। রামপ্রসাদের এলোকেশীর মত মা চণ্ডী আজ এই কাশীতে আসিয়া তাহার আশেপাশে ফিরিতেছেন। মায়ের পিছু পিছু যেন বসন ফিরিতেছে; ঠাকুরঝি ফিরিতেছে; রাজন ফিরিতেছে। বিপ্রপদ ফিরিতেছে। মাসী বেহালাদার—ভিড় করিয়া ফিরিতেছে। কাশীর চেয়ে তাহার গ্রাম ভাল। কাশীতে জীবনের জন্য খেদ করিবার অধিকার নাই। কিন্তু জীবনের জন্য খেদ না করিয়া সে বাঁচিবে কি করিয়া? নিতাই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যা। এখানে এখন প্রচণ্ড গরম। ঘাটে ও ঘাটের উপর পথে দলে দলে লোক আসিতেছে যাইতেছে, আলাপ-আলোচনা চলিতেছে—কিন্তু সব কথাই যেন নিতাইয়ের নিকট হইতে বহুদূরের কথা বলিয়া মনে হইতেছে, স্বরধ্বনির রেশই কানে আসিতেছে, কিন্তু শব্দের অর্থের কথা অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য। কাছে থাকিয়াও মানুষগুলিও যেন অনেকদূরের মানুষ।

ভাল লাগিতেছে না। এ তাহার ভাল লাগিতেছে না। হোক কাশী; বিশ্বনাথের রাজত্ব; স্বর্গের সিংহ-দরজা, তবু তাহার ভাল লাগিতেছে না। ভিক্ষা তাহার ভাল লাগিতেছে না। মহাজনের পদ তাহার ভাল জানা নাই। আর নিজের গান ছাড়িয়া ওসব গান যত ভাল হোক গাহিয়া কাল কাটাইবার কল্পনাও করিতে পারে না সে। নিজের যেন ওরকম পদ ঠিক আসেও না। তাহার উপর, সে ভিক্ষা বৃত্তিতেও ঠিক আনন্দ পাইতেছে না। কোথায় আনন্দ! সে অন্তত পাইতেছে না। কবিগানের আসর। ঝলমলে আলো। হাজারো লোক। ভাল লাগিতেছে না তাহার।

মনে পড়িল মায়ের কথা কয়টি। কবিয়াল তুমি, দেশে ফিরে যাও। স্তব্ধ হইয়া অনেক-ক্ষণ সে বসিয়া রহিল। কতক্ষণ পরে—তাহার খেয়াল ছিল না—অকস্মাৎ সে অনুভব করিল—জনকোলাহল স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। সচেতন হইয়া—চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—লোকজন নাই; বোধ হয় যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে। ঘাটের উপর দুই-চারিজন লোক ঘুমে

অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে। সেও ঘাটের উপর শুইয়া পড়িল। এই গভীর রাত্রে অচেনা শহরে পথ চিনিয়া যাওয়া সম্ভবপর হইবে না। আর কোথায়ই বা যাইবে? চারিদিক নিস্তব্ধ। কেবল ঘাটের নীচে গঙ্গাস্রোতের নিম্ন কলস্বর ধ্বনিত হইতেছে। সেই শব্দই সে শুনিতে লাগিল। অপরিচয়ের পীড়ায় পীড়িত অস্বচ্ছন্দ তাহার মন অদ্ভুত কল্পনাপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছিল—গঙ্গার স্রোতের শব্দ শুনিতে শুনিতেও নিতাইয়ের মনে হইল—গঙ্গাও যেন দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলিতেছে। কাটোয়ায়, নবদ্বীপেও তো সে গঙ্গার শব্দ শুনিয়াছে; কাটোয়ায়, যে-দিন বসন্তর দেহ পোড়াইয়াছিল, সে দিন তো গঙ্গা স্পষ্ট ভাষায় কথা বলিয়াছিল। এখানকার সবই কি দুর্বোধ্য ভাষায় কথা কয়?

আবার তাহার মায়ের কথা মনে পড়িল। সমস্ত দিনের মধ্যে পাখীর ডাক সে অনেক শুনিয়াছে, কিন্তু 'বউ কথা কও' বলিয়া তো তাহাদের কেউ ডাকে নাই; 'চোখ গেল' বলিয়া তো কোন পাখী ডাকে নাই—'কৃষ্ণ কোথা রে' বলিয়াও তো কোন পাখী কাঁদিয়া ফেরে নাই এখানে। কাকের স্বর পর্যন্ত কেমন ভিন্ন রকম! মা তাহাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই ঠিকই।

অকস্মাৎ তাহার মনে হইল—বিশ্বনাথ? বিশ্বনাথই যে এই রাজ্যের রাজা; তবে তিনিও কি—এই দেশেরই ভাষা বলেন? তাঁহার এই ভক্তদের মতই তবে কি তিনি তাহার কথা—তাহার বন্দনা বুঝিতে পারেন না? হিন্দী ভজন? হিন্দী ভজনেই কি তিনি বেশী খুশী হন? 'মা অন্নপূর্ণা'—তিনিও কি হিন্দী বলেন? ক্ষুধার সময় তিনি যদি নিতাইকে প্রশ্ন করেন—তবে কি ওই হিন্দীতে কথা বলিবেন? তবে? তবে? তবে সে কাহাকে গান শুনাইবে? আবার তাহার মনে পড়িল—তাহাদের গ্রামের 'মা চণ্ডী'কে, সঙ্গে সঙ্গে 'বুড়াশিব'কে। পাগলিনী ক্ষ্যাপা মা। ভাঙড় ভোলা!

"ওমা দিগম্বরী নাচ গো।"

সঙ্গে সঙ্গে বেহারার কাঁধে চড়িয়া ক্ষ্যাপা মা নাচে।

"হাড়ের মালা গলায় ভোলা নাচে থিয়া থিয়া।"

ভোলানাথ নাচে, তাহার সঙ্গে গাজনের ভক্তেরা নাচে। হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে লোক আশেপাশে যাহারা দাঁড়াইয়া থাকে—তাহারাও মনে মনে নাচে। আবার সর্বনাশী এলোকেশীর মত মা চণ্ডী আসিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইলেন। তাঁহার সঙ্গে সবাই। সবাইকে মনে পড়িল।

প্রথমেই মনে পড়িল ঝুমুর দলটিকে—নির্মলা বোনকে মনে পড়িল—ললিতাকে মনে হইল, মাসী আসিয়া 'বাবা' বলিয়া তাহার চোখের সামনে দাঁড়াইল। বেহালাদার, দোহার, বাজনদার, রাজন, বণিক মাতুল, বিপ্রপদ ঠাকুর, সকলে দূরে যেন ভিড় জমাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঠাকুরঝিকে মনে পড়িল, কৃষ্ণচূড়ার গাছতলায় পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ওই যে!—গ্রামের ধারের নদী ও নদীর ধারে চরভূমিতে তরির চাষ, বিস্তীর্ণ মাঠ, বৈশাখে মাঠের ধূলা, কালবৈশাখীর ঝড়, কালো মেঘ, ঘনঘোর অন্ধকার, সেই চোখ-ধাঁধানো বিদ্যুৎ—সেই কড়্ কড়্ শব্দে মেঘের ডাক—ঝর্ ঝর্ বৃষ্টি—সব মনে হইল। পূর্ণিমায় ধর্মরাজ-পূজার উৎসব। ঢাক শিঙা কাঁসির বাজনার সঙ্গে ফুলের মালা গলায় ভক্তদলের নাচ। গভীর রাত্রে বাগান হইতে ভক্তদলের ফল সংগ্রহ; কত কথা মনে পড়িল;—বাবুদের পুরানো বাগানে গাছের কোটরে অজগরের মত গোখুরার বাস; গোখুরাগুলা ডালে ডালে বেড়ায়, দোল খায়; কিন্তু ভক্তেরা যখন 'জয় ধর্মরাজো' বলিয়া রোল দিয়া গাছে চড়ে, তখন সেগুলা সন্তর্পণে কোথায়

গিয়া লুকাইয়া পড়ে। বাগানের সেই পুরানো বটগাছতলায় অরণ্যষষ্ঠীর দিন মেয়েদের সমারোহ মনে পড়িল। আল-পথ ধরিয়া বিচিত্র বর্ণের কাপড়চোপড় পরা সারিবন্দী মেয়েদের যাওয়ার ছবি নিতাইয়ের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। আল-পথের দু'ধারে লক্‌লকে ঘন-সবুজ বীজ-ধানের ক্ষেত ; মাঝখান দিয়া পথ। আষাঢ় আসিতেছে। আকাশে হয়তো ইহারই মধ্যে মেঘ দেখা দিয়াছে, শামলা রঙের জলভরা মেঘ। ভাবিতে ভাবিতে নিতাইয়ের 'বার-মেসে' গানের কথা মনে হইল।

বৈশাখে সূর্যের ছটা—
যত সূর্য-ছটা, কাটফাটা, তত ঘটা কালবৈশাখী মেঘে—
লক্ষ্মী মাপেন বীজ-ধান্য চাষ-ক্ষেতের লেগে।
পুণ্য ধরম মাসে—
পুণ্য—ধরম মাসে—ধরম আসে— পূর্ণিমাতে (সবে) পূজে ধর্মরাজায়—
আমার পরাণ কাঁদে, হায় রে বিধি কাঠের মতন বক্ষ ফেটে যায়।
তারপরে জ্যৈষ্ঠ আসে—
জ্যৈষ্ঠ এলে, বৃক্ষতলে, মেয়ের দলে অরণ্যষষ্ঠী পূজে।
জামাই আসে, কন্যা হাসে—সাজেন নানা সাজে।
দশহরায় চতুর্ভুজা—
দশহরায় চতুর্ভুজা গঙ্গা পূজা, এবার সোজা মাঠ ভাসিবে বন্যায়—
আমার পরাণ কাঁদে, হায় রে বিধি—চোখের জলে বক্ষ ভেসে যায়।

এমনি করিয়া আষাঢ়ের রথযাত্রা—বর্ষার বাদল—অম্বুবাচীর লড়াই, শ্রাবণের রিমিঝিমি বর্ষণ মাথায় করিয়া ধানভরা ক্ষেত পার হইয়া সেই বাবাজীর আখড়ায় ঝুলন-উৎসব দেখার স্মৃতি হইতে চৈত্রের গাজন পর্যন্ত মনে করিয়া করিয়া সে এক নূতন বারমেসে গান মনের আবেগে রচনা করিয়া ফেলিল—

বছর শেষে—চৈত্র মাসে—
বছর শেষে চৈত্র মাসে, দিব্য হেসে বসেন এসে অন্নপূর্ণা পূজোর টাটে।
ভাণ্ডার পরিপূর্ণ, মাঠ শূন্য, তিল পুষ্প ফুটছে শুধু মাঠে—
তেল নাহি হায় শিবের মাথায়, ভরল জটায়—অঙ্গেতে ছাই গাজনে ভূত নাচায়।
আমার পরাণ কাঁদে—হায় রে বিধি—পক্ষ মেলে উড়ে যেতে চায়॥

অধীর হইয়া সে প্রভাতের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। বারবার এখানকার নূতন-মাকে মনে মনে উদ্দেশ করিয়া বলিল—তুমি আমাকে ছলনা করেছ মা! সেখানকার মা তুমি, আমাকে ফেরাবার জন্য আগে থেকে এখানে এসে বসে আছ! তোমার আজ্ঞা আমি মাথায় নিলাম। শিরোধার্য করলাম।

* * *

মাসখানেক কোনরকমে কাশীতে কাটাইয়া নিতাই আবার একদিন ট্রেনে চড়িয়া বসিল। কোন রকমেই সে এখানে থাকিতে পারিল না।

এই এক মাস সে ভাল করিয়া ঘুমায় নাই। তাহার সঙ্গে উৎকণ্ঠার, উদ্বেগের তাহার অবসান হইয়াছে। ঘুম যেন তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে। মোগলসরাই জংশনে কোনরূপে উঠিয়া ট্রেন পালটাইয়া নূতন গাড়ীতে উঠিয়া সে বাঁচিয়া গেল। ছাদের সঙ্গে ঝুলানো বেঞ্চগুলার একটা খালি ছিল, সেই বেঞ্চে উঠিয়াই সে শুইয়া পড়িল। আঃ—নিশ্চিন্ত! সোনার দেশে আপন

মায়ের কোলে ফিরিয়া চলিয়াছে সে।

পরদিন সকালে যখন তাহার ঘুম ভাঙিল তখন মনে হইল অতি পরিচিত জন কেহ তাহাকে ডাকিতেছে। পরিচিত কেহ ভারি মিষ্টস্বরে যেন তাহাকে ডাকিল—

—ওঠ, ওঠ, ওঠ!

—কে, কে?

নিতাই ধড়্ মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিল।

না, চেনা কেহ নয়, তাহাকে নয়। নীচের বেঞ্চে একজন লোক গোটা বেঞ্চটা জুড়িয়া শুইয়া আছে, তাহাকেই কতকগুলি নবাগত যাত্রী ডাকিতেছে—ওঠ—ওঠ।

নিতাই হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। আঃ, গাড়ীটা চেনামুখে যেন ভরিয়া গিয়াছে। সব চেনা, সব চেনা! নিতাই তাড়াতাড়ি উপর হইতে নীচে নামিয়া—সবিনয়ে আগন্তুক যাত্রীদলের এক-জনকে বলিল—মালগুলো ওপরে তুলে দি?

—দাও তো দাদা, দাও তো।

—বেঁচে থাক বাবা; বড় ভাল ছেলে তুমি। এক বৃদ্ধ তাহাকে আশীর্বাদ করিল।

মালগুলা তুলিয়া দিয়া নিতাই জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল। ইস্টিশানের বাহিরের দিকে চাহিয়া তাহার চোখ জুড়াইয়া গেল। সব চেনা—সব চেনা! আঃ—তবে তো দেশে আসিয়া পড়িয়াছে! জানালার বাহিরে বাংলা দেশ। সব চেনা। রাণীগঞ্জ পার হইল। এইবার বর্ধমান। বাহিরে আকাশে ঘন মেঘ করিয়াছে।

বর্ধমানে গাড়ী বদল করিয়া—ঘণ্টা দুয়েক মাত্র, তাহার পরই সে গ্রামে গিয়া পড়িবে। মা চণ্ডী, বুড়ো শিব!

মা চণ্ডী বুড়োশিবের দরবারে বসিয়াই সে ভগবানকে গান শুনাইবে। তীর্থে তীর্থে মেলায় মেলায়—তারকেশ্বরে—কালীঘাটে গিয়া গান শুনাইয়া আসিবে। দেশের জেলায় জেলায় ঘুরিয়া দেশের লোককে গান শুনাইয়া ফিরিবে। সে নিশ্চয় করিয়া জানে যে তাহাদের গান শুনাইয়া পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে। সে এবার নিজেই কবির দল করিবে, এখন তাহার নাম হইয়াছে, বায়নার অভাব হইবে না। কবিয়াল নিতাইচরণের নামে দেশের লোকও ভাঙিয়া আসিবে। মেলা-খেলায় গালাগাল খেউড় নইলে চলে না। তাহার মধ্যেও কৌতুক আছে, তবু সে ভালবাসার গানকেই বড় করিবে। বসন্তকে হারাইয়া সে বুঝিতে পারিয়াছে সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া ওই একই খেদ। জীবন এত ছোট কেনে? ভালবাসিয়া সাধ কেন মেটে না, ছোট এতটুকু জীবনের পরিসরে ভালবাসিয়া কেন কুলায় না? ভালবাসার গান। খেদের গান। এই খেদ মোর মনে।—সেই খেদের গান!—বসন্তের নাম করিয়া গান।

কোকিল কি বসন্তকে ভুলিতে পারে?

এক্সপ্রেস ট্রেনটা থামিয়া গেল। একটা বড় স্টেশনে আসিয়া পড়িয়াছে।

বর্ধমান! বর্ধমান!

* * * *

বর্ধমান হইতে লুপ লাইনের ট্রেন। নিতাই আবার সেই ট্রেনে চড়িয়া বসিল। মনে মনে তখন তাহার গান রচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। গ্রামে পৌছিয়াই সে সর্বাগ্রে মা চণ্ডীর দরবারে যাইবে প্রণাম করিতে। সেই প্রণাম করিবার জন্য সে গান রচনা শুরু করিয়াছে। এই গান গাহিয়াই সে মাকে প্রণাম করিবে। জয়ন্তী মঙ্গলা কালী নয়, সে নিজের গান গাহিয়াই মাকে প্রণাম করিবে।

'সাড়া দে মা—দে মা সাড়া,
ঘরপালানো ছেলে এলো—বেড়িয়ে বিদেশ-বিভুঁই পাড়া।
তোর সাড়া না পেলে পরে মা, কিছুতে যে মন ভরে না,
নাচ-দুয়ারে পা সরে না, চোখে বহে জলের ধারা।'

আকাশ জুড়িয়া ঘন কালো মেঘ। হু-হু করিয়া ভিজা জলো বাতাস বহিতেছে। আঃ, দেহ জুড়াইয়া যাইতেছে। মাটির বুক আর দেখা যায় না; লক্‌লকে কাঁচা ঘাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। ওঃ—ইহারই মধ্যে এদিকটায় বর্ষা নামিয়া গিয়াছে। চষা ক্ষেতগুলির কালো মাটি জলে ভিজিয়া আদরিণী মেয়ের মত তুলিয়া ধরিতে যেন গলিয়া পড়িতে চাহিতেছে। টেলিগ্রাফের খুঁটির উপর একটা ভিজা কাক পাখা দুটা অল্প বিছাইয়া দিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বসিয়া আছে, মনের আনন্দে ভিজিতেছে। কচি নতুন অশথ-বট-শিরীষের পাতাগুলি ভিজা বাতাসে কাঁপিতেছে। লাইনের দুধারের ঝোপগুলিতে থোপা থোপা ভাঁট ফুল ফুটিয়াছে। আহা-হা! ওই দূরে নালার ধারে একটা কেয়া-ঝোপ বাতাসে দুলিতেছে। কেয়া-ঝোপটার বাহার খুলিয়াছে সব চেয়ে বেশী। সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহার বসন্তকে মনে পড়িয়া গেল,

"করিল কে ভুল—হায় রে,
মন-মাতানো বাসে ভরে দিয়ে বুক
করাত কাঁটার ধারে ঘেরা কেয়া-ফুল!"

ঝম্‌-ঝম্‌ শব্দে ট্রেন চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও নামিয়াছে। মধ্যে মধ্যে মেঘের উপর ঘনাইয়া আসিতেছে সন্ধ্যাবেলার কাজলদীঘির জলের রঙের মত রঙ; বৃষ্টি জোর হইতেছে, অমনি চারিদিক ঝাপসা। ওঃ, এদিকটায় প্রচুর বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। মাঠ জলে থৈ থৈ করিতেছে। ব্যাঙের গ্যাঙোর গ্যাঙোর ডাক ট্রেনের শব্দকে ছাপাইয়াও কানে আসিতেছে। এদিকে কাড়ান লাগিয়া গেল।

ঘং-ঘং গম্‌-গম্‌ শব্দে ট্রেনখানা ধ্রুপদ ধামারে গান ধরিয়া দিল। নদীর পুল! গেরুয়া রঙের জলে সাদা সাদা ফেনা ভাসিয়া চলিয়াছে। এপার হইতে ওপার পর্যন্ত লাল জল থৈ থৈ করিতেছে। জল ঘুরপাক খাইতেছে, আবার তীরের মত সোজা ছুটিয়া চলিয়াছে। দুপাশে কাশের ঝাড়, ঘন সবুজ। অজয়! অজয় নদী! দেশে আসিয়া পড়িয়াছে। দেশ, তাহার গাঁ! তাহার মা!

'তোর সাড়া না পেলে পরে মা, কিছুতে যে মন ভরে না
চোখের পাতায় ঘুম ধরে না, বয়ে যায় মা জলের ধারা।'

এইবার বোলপুর—তারপর কোপাই, তারপর, তারপর জংশন; ছোট লাইন। ঘটো-ঘটো ঘটো-ঘটো ঘং-ঘং ঘং-ঘং। সর্বাঙ্গে দুরন্ত দোলা দিয়া নাচাইয়া ছোট লাইনের গাড়ীর চলন; হায়-হায়-হায়-হায়! সঙ্গে সঙ্গে নিতাইয়ের বুকের ভিতর নাচিতেছে নিমাইয়ের মন। ছেলেমানুষের মত নাচিতেছে। চোখ ভাসাইয়া জল আসিতেছে অজয়ের বানের মত। মা গো—মা, আমার মা। আমার গাঁ। ওই যে—সেই 'নিমচের জোল' 'উদাসীর মাঠ';—ওই সে কাশীর পুকুর;—ওই যে সেই কালী-বাগান—যে বাগানের গাছগুলি ছিল তাহার কবি-জীবনের গানগুলির প্রথম শ্রোতার দল!

গাড়ীটা ঈষৎ বাঁকিল—ইস্টিশানে ঢুকিতেছে। ওই যে, ওই যে।—গাড়ী থামিল।

ট্রেন চলিয়া গিয়াছে।

নিতাই দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চারিদিকে বিস্মিত একটি জনতা। নিতাই এমনটি প্রত্যাশা করে নাই। এত স্নেহ, এত সমাদর তাহার জন্য সঞ্চিত হইয়া আছে এখানে? রাজার মুখে পর্যন্ত কথা নাই। বেনে মামা, দেবেন, কেষ্ট দাস, রামলাল, কয়েকজন ভদ্রলোক পর্যন্ত তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে সেই কৃষ্ণচূড়ার গাছটি। ফুলের সময় শেষ হইয়া আসিয়াছে, ঘন সবুজ চিরোল চিরোল পাতায় ভরিয়া উঠিয়াছে; তবু দুই-চারিটি ফুল যেন নিতাইয়ের জন্যই ধরিয়া আছে। নিতাইয়ের চোখে জলের ধারা। নিতাই কাঁদিতেছে; কাঁদিতেছে বিপ্রপদ ঠাকুরের মৃত্যুকে উপলক্ষ করিয়া। বিপ্রপদ ঠাকুর মরিয়া গিয়াছে।

বিপ্রপদর জন্য নিতাইয়ের কান্নায় সকলে বিস্মিত হইয়া গিয়াছে। কথাটা কৌতুকের কথা। কিন্তু নিতাইয়ের ওই নীরব বিগলিত অশ্রুধারা এমন একটি অনুচ্ছ্বসিত প্রশান্ত মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার কান্নাকে উপহাস করিবার উপায় ছিল না। নিতাইয়ের কবিয়ালির খ্যাতি দেশে সকলেই শুনিয়াছে, তাহার জন্য সকলে তাহাকে শ্রদ্ধা না হোক প্রশংসাও করে মনে মনে; কিন্তু এ তাহা নয়, তাঁহারও অতিরিক্ত কিছু। তাহার চোখের ওই দর-বিগলিত ধারার সেই মহিমাতেই নিতাই মহিমান্বিত হইয়া সকলের চেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছে। বিপ্রপদকে হারাইয়াই সে শুধু কাঁদে নাই, তাহাদের সকলকে ফিরিয়া পাইয়াও কাঁদিতেছে।

কতক্ষণ পর।

নিতাই আসিয়া বসিল সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায়। রাজাকে ডাকিয়া পাশে বসাইল। লাইন যেখানে বাঁকিয়াছে, দুটি লাইন যেখানে একটি বিন্দুতে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে মনে হয়, সেইখানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিতাই বলিল—রাজন! ভাই!

—ওস্তাদ! ভেইয়া!

—ঠাকুরঝি?

—ওস্তাদ!

—রাজন!

—ঠাকুরঝি তো নাই ভাইয়া!

—নাই?

—নাই! উতো মর গেয়ি। রাজার মত শক্ত মানুষের ঠোঁট দুইটিও কাঁপিতে লাগিল। বলিল—ঠাকুরঝি ক্ষেপে গিয়েছিল ওস্তাদ। তোমার যাবার পরে—

রাজার চোখ হইতে জল পড়িতে আরম্ভ করিল। ঠাকুরঝি নাই। ঠাকুরঝি মরিয়াছে! পাগল হইয়া ঠাকুরঝি মরিয়াছে! এই কয়টা কথাই নিতাইয়ের কাছে অনেক কথার তুফান হইয়া উঠিল। বুকের মধ্যে ঝড় বহিল, চোখ ফাটিয়া জল আসিল। মনে পড়িল—জীবন এত ছোট কেনে? তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া রাজা বলিল—ওস্তাদ, ভাইয়া, রোতা হ্যায়? কাঁদছ? ঠাকুরঝির জন্যে?

চোখ মুছিয়া, বিচিত্র হাসি হাসিয়া ফেলিয়া নিতাই বলিল—গান শোন রাজন, গান শোন। গুন গুন করিয়া ভাঁজিয়া লইয়াই সে গলা ছাড়িয়া গাহিল—

'এই খেদ আমার মনে—
ভালবেসে মিটল না সাধ, কুলাল না এ জীবনে!

হায়—জীবন এত ছোট কেনে ?
এ ভুবনে ?'

রাজা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—হায় হায় হায় রে ! বল ওস্তাদ, জীবন এত ছোট কেনে ? হায় হায় হায়।

নিতাই বলিল—তাই যদি জানব রাজন !—আবার তাহার চোখ হইতে জল ঝরিতে শুরু হইল। আবার কাঁদিল। নিতাইয়ের চোখ হইতে আবার অনর্গল ধারায় জল পড়িতে আরম্ভ হইল।

কান্নার মধ্যেই আবার তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। না—ঠাকুরঝি মরে নাই, সে যে স্পষ্ট দেখিতেছে, ওই যেখানে রেলের লাইন দুটি একটি বিন্দুতে মিলিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে দক্ষিণ মুখে নদী পার হইয়া, সেইখানে মাথায় সোনার টোপর দেওয়া একটি কাশ ফুল হিল-হিল করিয়া দুলিতেছে, আগাইয়া আসিতেছে যেন ! সে আছে, আছে। এখানকার সমস্ত কিছুর সঙ্গে সে মিশিয়া আছে। এই কৃষ্ণচূড়ার গাছ। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল—এইখানে বসন আসিয়া প্রথম দিন শুইয়া বলিয়াছিল—কই হে ! ওস্তাদ না—ফোস্তাদ ! চকিতের মত মনেও হইল—বসনও যেন শুইয়া আছে ! আঃ ! ঠাকুরঝি, বসন—দুইজনে যেন পাশাপাশি দাঁড়াইয়া আছে। মিশিয়া একাকার হইয়া যাইতেছে।

নিতাই উঠিল, বলিল—চল।

—কাঁহা ভাইয়া ?

—চণ্ডীতলায়। চল, মাকে প্রণাম করে আসি।

রাজার মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল—গড়াগড়ি দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করব মাকে।

তাহার সর্বাঙ্গ যেন এখানকার ধূলামাটির স্পর্শের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। মায়ের দরবারে মাকে গিয়া শুধাইবে—মাগো—জীবন এত ছোট কেনে ?

স্বর্গ-মর্ত

উৎসর্গ

ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্ত

অনুজপ্রতিমেষু

এক

সুবলপুরে গোপাল ঠাকুরের আখড়ায় জন্মাষ্টমীতে খুব সমারোহ।

গোপাল ঠাকুর—নাড়ুগোপাল মূর্তি। আখড়ার সেবায়েৎ ব্রজদাসী বষ্টুমী। যেমন ঠাকুরটি সুন্দর—তেমনি শ্রীমতী সেবায়েৎটি। বয়স চুয়াল্লিশ-পয়তাল্লিশ হইয়াছে, পনেরো ষোল বৎসরের একটি সন্তানের জননী—তবু তাহার শান্ত স্নিগ্ধ শ্রীতে মালিন্যের ছাপ স্পর্শ করে নাই। দেখিলে মনে হয় তিরিশ বৎসরের একটি যুবতী মেয়ে, লালপেড়ে অর্থাৎ লাল পাড়ওয়ালা কাপড় পরিলে লক্ষ্মী ঠাকরুণটির মত মনে হইত; গ্রামের লোকেরাই বলে এ-কথা।—ব্রজদাসী তাহাতে লজ্জা পায়। বলে—ও কথা বলবেন না। আমাকে শুনতে নাই। আমি বষ্টুমী।

থান কাপড় পরিয়া কপালে তিলক নাকে রসকলি কাটিয়া ব্রজদাসী ঘন-শ্যাম-পল্লব ঘেরা আখড়াটিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। আখড়াটি যেন স্নিগ্ধ হইয়া থাকে। তেমনি চমৎকার মানুষ। গোপালজীর সেবা লইয়াই আছে।

জ্বালা শুধু ছেলে দুলালকে লইয়া।

এমন মা—তাহার এমন ছেলে! লোকে আড়ালে বিস্ময় প্রকাশ করে। বিস্ময়ের কথাই বটে; সব দিক দিয়াই মায়ের সঙ্গে ছেলের এমন গরমিল দেখা যায় না।

এমন সুন্দর মায়ের শ্রী, এমনি ছোটখাটো গড়নের মা—তাহার ছেলের চেহারা যেমন কর্কশ তেমনি কালো, আকারেও তেমনি স্থূল এবং প্রকাণ্ড। পনের-ষোল বছরের ছেলেটাকে বিশ বছরের জোয়ান বলিয়া ভ্রম হয়। স্বভাবে মা এমনি স্নিগ্ধ এমন ভালো মানুষ—আর দুলাল এমন দৃঢ়, এমন দুর্দান্ত, এমন উদ্দাম—যে মা ও ছেলেকে একসঙ্গে দেখিবামাত্র লোকের মুখে-চোখে সবিস্ময় প্রশ্ন জাগিয়া উঠে, কপালে সারি সারি জিজ্ঞাসার রেখা দেখা যায়—ভাবে এই মায়ের এই ছেলে? পরমুহূর্তেই আপন মনেই তাহারা হাসে—তাহাদের মনই উত্তর দেয়—অদৃষ্ট! গোটা গ্রামের লোকে ভয় করে। আড়ালে কেহ বলে—দানো, কেহ কেহ বলে—কালাপাহাড়!

কালাপাহাড় তাহাতে সন্দেহ নাই। নহিলে বষ্টুমের ছেলে এমন সুন্দর আখড়ায় মানুষ হইয়া মোটর বাসের ড্রাইভারি শিখিতে যায়।

ব্রজদাসী সবই জানে সবই তাহার কানে আসে কিন্তু সে চুপ করিয়া থাকে। কি বলিবে সে? তাহার নিজের অন্তরেই যে এ লইয়া দুঃখ জমিয়া জমিয়া পাহাড় হইয়া আছে। মধ্যে মধ্যে আপন মনেই আক্ষেপ করিয়া অতি মধুর মৃদুস্বরে গুন গুন করিয়া মহানন্দের পদাবলীর একটা কলি গাহিয়া নিজেকে বোধ হয় সান্ত্বনা দেয় অথবা সৃষ্টি-রহস্যতত্ত্ব স্মরণ করিয়া মনে মনে ম্লান হাসি হাসে—'সুখ দুখ দুটি ভাই।' কখনও গায় সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু—, তারপর শিহরিয়া উঠিয়া চুপ করিয়া যায়। মনে মনে বলে—হে গোপাল, হে গোবিন্দ—ক্ষমা কর প্রভু! আমার এ ঘর দুঃখে ভরিয়া দিয়াছ—আর যেন আগুনে পুড়াইয়া দিও না। একবার ঘর পুড়িয়াছে—আর না।

জন্মাষ্টমীর আগের রাত্রে ভোরবেলা ব্রজদাসী গোবিন্দ স্মরণ ভুলিয়া এই সবই ভাবিতেছিল। তাহার অদৃষ্ট আর হতভাগা দুলালের—।

হঠাৎ একটা অমানুষিক ক্রুদ্ধ চীৎকারে ভোর রাত্রির নিথর স্তব্ধতা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

আখড়ার ঘন বৃক্ষপল্লবের মধ্যে কয়টা পাখী পাখা ঝটপট করিয়া উঠিল সেই শব্দে; ব্রজদাসীর ঘরের চাল হইতে একটা টিকটিকি সম্ভবতঃ চকিত হইয়া মাটিতে ঝপ করিয়া পড়িয়া গেল। ব্রজদাসী চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল—দুলাল!

আখড়ার ঠিক নিচে ডাহুকী নদীর নালাটায় সাঁতার জল; সেখানে একটা প্রচণ্ড আলোড়নের শব্দ উঠিতেছে। ওই ছোট নালাটার মধ্যে যেন সমুদ্র মন্থন চলিতেছে। ঘরের কোণে হারিকেন আলোটা তুলাইয়া জ্বালিয়া রাখিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে; ব্রজদাসী লণ্ঠনটা তুলিয়া দম বাড়াইয়া লইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।—দুলাল!

নালাটায় নামিবার জন্য আখড়ার একটি ছোট বাঁধানো ঘাট আছে। ঘাটের মাথায় গিয়া ব্রজ দাঁড়াইল। কিছুই দেখা যায় না, জলটায় উথল-পাতাল চলিতেছে। হঠাৎ জলের উপর মাথা তুলিয়া দুলাল আলোর ছটা দেখিয়াই বোধ করি চীৎকার করিয়া বলিল—ছোরা, ছোরাটা আন মা! জলদি!

—দুলাল—

—আঃ! ছোরা, আমার ছোরাটা জলদি। কুমীর। ধরেছি বেটাকে আমি কায়দা ক'রে।

দুলাল ঘাটে আসিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাঁধে কুমীরটা কামড়াইয়া আছে। দুলাল তাহাকে চিৎ করিয়া বগলে চাপিয়া ধরিয়াছে। ছোট মেছো কুমীর। কিন্তু তবুও কুমীর। ব্রজ কাঁপিতে কাঁপিতেই ছুটিয়া গিয়া দুলালের ছোরাটা আনিয়া ঘাটে নামিয়া গেল। দুলাল তখন সেটাকে মাটিতে চিৎ করিয়া ফেলিয়া হাঁটু ও হাত দিয়া টিপিয়া ধরিয়া আছে; সরীসৃপগুলো চিৎ হইয়া পড়িলেই শক্তিহীন হইয়া পড়ে, লেজটা দিয়া আছাড় মারিবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে।

দুলাল হাত বাড়াইয়া বলিল—দে।

ছোরাটা লইয়া সরীসৃপটার গলার নিচে বসাইয়া দিয়া লম্বা করিয়া পেটের দিকে টানিয়া দিয়া দুলাল লাফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া—আ—প্‌ বলিয়া আবার একবার হাঁক মারিয়া উঠিল। মাথাটা ঝাড়িল, লম্বা চুলগুলা ছোট ছোট জটার মত ঝাপট খাইয়া দুলিয়া উঠিল। কাঁধের ক্ষতস্থান হইতে গাঢ় লালরক্ত গড়াইয়া পড়িতেছে।

ব্রজর হাত-পা যেন অবশ হইয়া গিয়াছে।

দুলাল ব্রজর হাত হইতে লণ্ঠনটা লইয়া তুলিয়া ধরিয়া কি যেন দেখিল, তাহার পর বলিল —ঠিক আছে। ওই গিয়ে লেগেছে বাঁকের মাথায়।

একটা বাঁকের বাঁশের দুইপ্রান্তে সরু দড়িতে গাঁথা গোটা বিশেক পাকা তাল। জন্মাষ্টমীর দিন আখড়ায় উৎসব। এ আখড়ার শ্রেষ্ঠ উৎসব। দুলাল রাতদুপুরে উঠিয়া তাল কুড়াইতে গিয়াছিল। ফিরিবার পথে এই বিপদ। সাধের বিপদ।

লোকেও বলিল—ব্রজদাসীও অস্বীকার করিতে পারিল না। নিজেকেও ব্রজদাসী ধিক্কার দিল। কেন সে দুলালকে তালের জন্য তিরস্কার করিয়াছিল। আগের দিন ভোরবেলা দুলাল মটরবাসের কাজে বাহির হইবার জন্য সাজিতেছিল—সেই সময়টিতে ব্রজ স্নান সারিয়া দাওয়ায় উঠিয়া বলিয়াছিল—আচ্ছা দুলাল, আমার কি সব পণ্ডশ্রম হ'ল রে! আমার জীবনের সব ঘিটাই আগুন মনে করে কি ভস্মে ঢাললাম রে!

ভ্রূ কুঁচকাইয়া দুলাল বলিল—কেন? কি হ'ল কি?

—কাল না জন্মাষ্টমী? তোকে না বলেছিলাম—দুলাল, বারোটা মাস তিরিশ দিন যা

করিস বৈষ্ণবের ছেলে হয়ে জন্মাষ্টমীর সময় ছুটো দিন ওসব লোহালক্কড় ঘাঁটতে যাস না। কত লোক আসবেন ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, ভক্ত মহান্ত সন্ন্যাসী আসবেন এখানে, তার উদ্যোগ আছে আয়োজন আছে—

—বাজে বকিস না বাপু। উয্যুগ তো গোটাকতক তাল আর তেল ময়দা চালগুঁড়ো। তেল ময়দা দোকানে মিলবে—তালও চাইলে লোকে দেবে, চাল গুঁড়ো করে নে। ব্যাস—ভারি জন্মাষ্টমী—তাতে আবার কাজ কামাই!

—তুলাল! কি বলছিস? জিভে তোর আটকাচ্ছে না?

—না।

—ওরে হতভাগা, ওরে পাষণ্ড, ওরে নাস্তিক! আমি মরলে যে তোকেই এসব করতে হবে রে!

—না। ওসব আমি করব না। কুড়োজালি নিয়ে—বাঘা ছাপ কেটে—ও আমার দ্বারা হবে না।

—মরে যা। মরে যা। তুই মরে যা।

—তুই মরে যা। তুই মরে যা। তুই মরে যা। আমি মরব কেন?

—তাই মরব।

—হ্যাঁ—তাই মরে থাকিস। আমি ফিরে এসে রাতে তোকে সমাজ দেব—দিয়ে ড্যাং ড্যাং করে বেরিয়ে যাব। নিশ্চিন্দি।

—চলে যাবি? আমার গোপালের কি হবে?

—হবে—ওই মাটির ডেলা নাড়ু হাতে ধরে যেমন আছে—তেমনি ধরে থাকবে। আর মহান্তর অভাব হবে না। জমি আছে আখড়া আছে—গাঁয়ের লোকে ভোগ দেয় ভক্তি করে—কত জনা ছুটে আসবে।

সে আর কথা না বলিয়া কাঁধে হালফেশানী ঝোলাটা ঝুলাইয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছিল। ঝোলাটার মধ্যে তুলালের হরেক রকম জিনিস থাকে। ঝোলাটায় হাত দিতে তুলালের নিষেধ আছে। সে বলে, তোর ভাঁড়ারে আমি তো হাত দিই না, আমার ভাঁড়ারে তুই হাত দিবি কেন। হাত দিতে যাস না—বলে দিলাম।

—কি বললি? তুলালের মুখের দিকে ব্রজদাসী একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকে, সে দৃষ্টি বাহ্যতঃ প্রশান্ত স্থির—কিন্তু অতল জল দহের মত গভীর; তুলাল না হইয়া অন্য কেহ হইলে দৃষ্টির সে গভীরতা অনুভব করিয়া শিহরিয়া উঠিত। তুলাল শিহরিয়া উঠে না—সে বলে—এমন ক'রে তাকিয়ে থেকে কি হবে বল?

ব্রজদাসী নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায় দেবপূজার কাজে। থাক, জানিয়া তাহার কাজ নাই, জানিতে সে চায় না, কখনও জানিতে চাহিবে না। মধ্যে মধ্যে সে ক্ষোভের হাসি হাসে; তোর টাকাকড়ি যা আছে তোরই থাক, সে ব্রজদাসী চায় না! গোপালের অনুগ্রহে তাহার অভাব কিছুর নাই!

সেদিন সন্ধ্যায় তুলালের ফিরিবার কোন লক্ষণ না দেখিয়া ব্রজ খানিকটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। রাত্রি প্রথম প্রহর পার হইলেই—তুলালের কর্কশ কণ্ঠের গানের সাড়া মাঠ হইতে ভাসিয়া আসে। প্রায় পোয়াখানেক দূরে মোটা কর্কশ গলায় তুলাল গাহিলে ব্রজ আখড়ায় বসিয়া শুনিয়া উনান ধরাইয়া ভাতের জল বসাইয়া দেয়। তুলাল বাড়ী ফিরিয়া ওই নালার ঘাটে বসিয়া সাবান মাখিয়া স্নান করে—আধঘণ্টা ধরিয়া লম্বা চুলগুলি আঁচড়ায়, তারপর মায়ের

হাতের তৈয়ারী খাঁটি ঘি মাখিয়া গরম ভাত খায় আর বলে—এইটি পৃথিবীতে আর কেউ করবে না, এই গরম ভাত আর ঘি—আঃ, এ যেন অমৃতি!

ব্রজদাসী বলে—আমার কর্মফল আর তোর কপাল, বুঝলি! নইলে ঘরে যার মাখনচোরা ননীগোপাল—তার ঘরের ছেলে হয়ে তুই এক কড়ি ঘি ভাত খেয়ে বলছিস—অমৃতি! তোর যদি সুমতি হ'ত—তবে গোপালের প্রসাদ ছানা-ক্ষীর-মাখন—এ যে তুই দু'বেলা খেতিস বাবা!

যাক্ সে সব কথা।

ব্রজদাসী দুলালের গানের সাড়া না পাইয়া উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। নির্দিষ্ট সময় পার হইয়া গেল, ব্রজ আসিয়া আখড়ায় ঢুকিবার পথের মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আজ কৃষ্ণা সপ্তমী, চৌদ্দদণ্ড পরে চাঁদ উঠিবে। এই দণ্ড দুয়েক আগে প্রথম প্রহরের শেয়াল ডাকিয়াছে, পেঁচাগুলো চেঁচাইয়া একপাক উড়িয়া গাছ বদল করিয়াছে, এখন রাত্রি সাড়ে আটদণ্ড কি নয় দণ্ড হইবে; চারিদিকে এখন গাঢ় অন্ধকার; তাহার উপর আকাশে মেঘ করিয়া রহিয়াছে। দুয়ারে দাঁড়াইয়া ব্রজ নিরুপায় হইয়া অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল। মনে মনে আপসোস করিতেছিল—মহেশ মণ্ডলকে কেন বলিল না! আখড়ায় সন্ধ্যায় গ্রামের প্রবীণেরা আসে অল্পবয়সীও আসে; আখড়ায় নামগান হয়; প্রথমে হয় নাম-সংকীর্তন, তারপর গ্রামের প্রধান ব্যক্তি এই আখড়ার সবচেয়ে বড় ভক্ত বড় সহায় মহেশ মণ্ডল খোল লইয়া বসিয়া বলে—আজ মা-জী একখানি নয়, দুখানি পদ গাইতে হবে।

• ব্রজদাসী বোষ্টুমীর যেমন কণ্ঠস্বর তেমনি পদাবলী সঙ্গীতে পারদর্শিতা। বড় বৈষ্ণব ভক্তের কাছে তাহার গান শিখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল।

মহেশ মণ্ডল খোল বাজায়, ব্রজদাসী পদাবলী গায়।

এই কিছুক্ষণ আগে—দণ্ড তিনেক আগে মজলিস ভাঙিয়াছে—তাহারা উঠিয়া গিয়াছে; মণ্ডল তাহার পরেও কিছুক্ষণ ছিল। জন্মাষ্টমীর আয়োজনের কথা বলিয়া সমস্ত কিছুর ভার লইয়া বাড়ী গিয়াছে।

মণ্ডল একবার জিজ্ঞাসাও করিয়াছিল—দুলাল ফিরবে কখন?

—পঁহর পার হবে—আর ফিরবে। গানে সাড়া উঠল বলে। ষাঁড়ের মত চেঁচাতে চেঁচাতে আসবে।. ব্রজ হাসছিল। সম্ভবতঃ বেদনার হাসি।

মহেশ মণ্ডলও একটু লজ্জিত হইয়া হাসিল।

ব্রজ বলিয়াছিল—আপনি মিথ্যে লজ্জা পাচ্ছেন মোড়ল। আমার অদৃষ্ট!

মহেশ বলিয়াছিল—আমি বুঝিয়ে বলব ওকে একদিন।

—না। দৃঢ় কণ্ঠে ব্রজ জবাব দিয়াছিল।

মহেশ মণ্ডল আর ও কথাই তুলিল না, জন্মাষ্টমীর কথায় ফিরিয়া আরও দুই চারিটা কথা বলিয়া চলিয়া গিয়াছে।

আঃ—ব্রজ যদি তখন মণ্ডলকে বলিত সে আসুক—একটু বসুন আপনি! তাহা হইলে আর এমন উৎকণ্ঠার বোঝা বুকে লইয়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত না।

ঠিক এমনি সময়ে একটা বোঝা মাথায় করিয়া দুলাল ফিরিয়াছিল।

ঘি-তেল-ময়দা-চালগুঁড়া দোকান হইতে কিনিয়া মাথায় করিয়া লইয়া আসিয়াছে। সমস্ত লইয়া ওজন পনের-বিশ সের হইবে। ষোল বছরের দুলাল দুই তিন ক্রোশ পথ এই বোঝা

বহিয়া আনিয়াছে। মানগোবিন্দপুরের বাজার এখান হইতে পাকা দুই ক্রোশ পথ।

বোঝাটা নামাইয়া দুলাল বলিয়াছিল—এই নে। তোর গোপাল কত খাবে খাক। এক ঘুমের পর উঠে ওই চাঁদ রায়ের দীঘির পাড়ের তাল এক বোঝা কুড়িয়ে এনে দোব।

ব্রজ খুশী হইয়াছিল।

দুলাল তাহার উপার্জন করিয়া গোপালের ভোগের জন্ম এত সামগ্রী কিনিয়া আনিয়াছে—ইহাতে তাহার আনন্দ হৃদয় ছাপাইয়া উপচাইয়া পড়িতেছিল। ইচ্ছা করিতেছিল সকলকে ডাকিয়া দেখায়। মহেশ মণ্ডল মহাশয়কে ডাকিয়া দেখাইবার ইচ্ছা যেন কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সম্বরণ করিতেই হইল। দুলাল বলিল—ঘাড়টা একটু টিপে দে ত মা। ওঃ—অভ্যেস নাই, বইতে গিয়ে দম বেরিয়ে গিয়েছে।

চাঁদ রায়ের বাঁধের তাল এ অঞ্চলে বিখ্যাত। কিন্তু গ্রামের বাহিরে মাঠের মধ্যে চাঁদ রায়ের বাঁধে রাত্রে কেহ তাল কুড়াইতে যায় না। ওখানে যাইতে হইলে শ্রাবণ ভাদ্র মাসে এই ভরা নালাটা পার হইতে হয়, তাহার উপর চাঁদ রায়ের বাঁধের দক্ষিণ পাড়ের জঙ্গলটার নামই হইল বাঘতলার জঙ্গল; গত একশত বৎসরের মধ্যে দুই-দুইবার এ অঞ্চলে বাঘ আসিয়াছিল এবং দুই-বারই ওই একই জায়গায় বাসা গাড়িয়াছিল। বাঘ অবশ্য রোজ আসে না এবং আসিলে মানুষের অজানা থাকে না, ডাক দিয়া সে জানাইয়া দেয়, গরু, ছাগল মারিবার সময় দেখাও দেয়, রাত্রে ফেউ ডাকে, বাঘের গায়ের বোটকা গন্ধ বেশ খানিকটা দূর হইতেই পাওয়া যায়; তবুও গ্রাম্য মানুষেরা বলে—"বাবা সাবধানের বিনাশ নাই। কাজ কি গিয়ে রাত্রিকালে? মনে কর, সনদে পর্যন্ত বাঘ আসে নাই, কিন্তু সনদের পর যে আসবে না তা কে বললে? এই তো আট কোশ তফাতে গঙ্গা আর ময়ূরাক্ষী মিশেছে, সেখানে ঝাউবনে বাঘের তো বারো মাসের বাসা; বর্ষার সময় ঝাউবন জলে ডুবলে এদিক ওদিক ছটকে বেরোয়। সনদের পর বেরিয়ে আট কোশ রাস্তা আসতে কতক্ষণ ওদের কাছে? এক লাফে কমসে কম দশ হাত তো মারবেই!"

বাঘের পর সাপের ভয়ও আছে। কিন্তু রাঢ়ের এ অঞ্চলটায় মানুষ সাপকে ভয় করে না; প্রাচীন কাল হইতেই মানুষ এবং সাপে প্রায় একসঙ্গেই বাস করিয়া আসিতেছে। গ্রামে যেমন কুকুর বিড়াল থাকে, গৃহস্থের আঙিনায় ঘুরিয়া বেড়ায়, সাপও ঠিক তেমনি। ভয় করে না—কিন্তু তা বলিয়া রাত্রে বন জঙ্গল মাঠের মধ্যে লোকে সাধ করিয়া যায় না।

চাঁদ রায়ের বাঁধের বিখ্যাত তালগাছটা—তালের চারিটা আঁটি, প্রকাণ্ড বড়—যেমন তার মিষ্টতা—তেমনি প্রচুর মাড়ি অর্থাৎ রস। ভোর না হইতেই চারিপাশের পাঁচ-ছয়খানা গ্রামের ছেলেরা ছুটিয়া আসে। এবং প্রতিদিনই ছোট হোক বড় হোক—একটা মারামারি কাণ্ড ঘটিয়া থাকে। সেই কারণে দুলাল তৃতীয় প্রহর রাত্রে উঠিয়া চাঁদ রায়ের বাঁধে তাল কুড়াইতে গিয়াছিল। ব্রজদাসী তাহাকে বার বার বারণ করিয়াছিল—এই দেখ চাঁদ রায়ের বাঁধে যেন যাবি না!

দুলালের মধুমাখা বাক্য! সে তাহার মোটা নাকটা তুলিয়া দাঁতগুলা বাহির করিয়া অদ্ভুত ভঙ্গিতে বলিয়াছিল—আচ্ছা!

—আচ্ছা নয়, মনে থাকে যেন!

উত্তরে আর একবার আগের মত মুখভঙ্গি করিয়া টর্চ এবং বাঁকটা লইয়া সেই মধ্যরাত্রে গোটা গাঁয়ের ঘুম ভাঙাইয়া মোটা গলায় গান গাহিতে গাহিতে বাহির হইয়া গিয়াছিল। যেমন দুলাল—তেমনি তার গান; কি যে ঐ গানের অর্থ ব্রজদাসী তাহা বুঝিতে পারে না। শুধু আতঙ্কিত

হইয়া শরীর মন শিহরিয়া উঠে। দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া একটা কলি নিস্তব্ধ রাত্রিকে আলোড়িত করিয়া ভাসিয়া আসিতেছিল, একটা কলি গাহিতে গাহিতেই দুলাল চলিতেছিল—

আগুন জ্বালা—আগুন জ্বালা—আগুন জ্বালা!

শুনিয়া ক্লান্ত হইয়া ব্রজ হাসিয়াছিল—আগুন জ্বালাইয়া ব্রজদাসীকে পুড়াইয়া খাক করিলি—আর কেন? আরও আগুন জ্বালাইতে সাধ! কাহাকে পোড়াইবি হতভাগা? নিজেই পুড়িয়া মরিবি। থাক—আর থাক, আর আগুনে কাজ নাই। তার পর বিছানায় শুইয়া ভাবিতেছিল দুলালকে লইয়া তাহার দুর্ভোগের কথা। হঠাৎ চীৎকার উঠিল, একটা অমানুষিক ক্রুদ্ধ চীৎকার। ব্রজ মুহূর্তে উঠিয়া বসিল। চীৎকার করিয়া উঠিল—দুলাল!

* * * *

লণ্ঠনের আলোয় দুলালের দিকে আতঙ্ক এবং বিস্ময়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে সে চাহিয়া দেখিতেছিল। রক্তাক্ত দেহে দৈত্যের মত দুলাল দাঁড়াইয়া আছে। নিজের ক্ষতের দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই—পেট চেরা কুমীরটার মৃত্যু-আক্ষেপ দেখিয়া হি-হি করিয়া হাসিতেছে। ছোট একটা মেছো কুমীর! কিন্তু ছোট হইলেও কুমীর। তাহার শক্ত মোটা কাঁটা ভরা লেজটা আছড়াইয়া ঘাটের বাঁধানো ঠাঁইটুকুকে যেন চুরমার করিয়া দিবে। গলা হইতে লেজের গোড়া পর্যন্ত পেটটা চিরিয়া দিয়াছে দুলাল। রক্তে ঘাটটা লাল হইয়া গিয়াছে। কতক্ষণ পরে ব্রজদাসীর মনের সাড় ফিরিয়া আসিল। সে আসিয়া দুলালের হাত ধরিয়া বলিল—দেখি দেখি!

—কি?

—তোর কাঁধ বেয়ে যে রক্ত গড়াচ্ছে, পিঠটা যে ভেসে যাচ্ছে!

তাচ্ছিল্যভরে দুলাল বলিল—বেটা আমাকে কাতলা মাছ মনে করেছিল। শা—লা! বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা! বেটার ময়ূরাক্ষীতে পেট ভরে নি, 'ডাউকিতে' এসেছিল, সেখানে সুবিধে হয় নি, এসেছ এই 'বাউকি'তে—তাও দুলালের ঘাটে! হুঁ—হুঁ বাবা হামারা নাম বিরিজ নন্‌দন—ডাণ্ডা চলে মেরা দনাদন্—দনাদন্! খচ্ করে কামড়ে ধরলে বেটা। ওপারে যেই জলে পড়েছি—অমনি বেটা কোথা ছিল—শুঁসিয়ে এসে ধরলে কাঁধে। ছামনে পড়েছিল—তাই পিছন থেকে পায়ে ধরলে কায়দা করত আমাকে।

—উঠে আয়!

—দাঁড়া। এ বেটাকে নিয়ে যাব। বেটার চামড়া ছাড়িয়ে নিতে হবে—

—দুলাল—ওসব অনাচার করিস না। রাত পোয়ালে জন্মাষ্টমী, গোপালের সেবার আখড়া—

—আচ্ছা—আচ্ছা। বাইরে রেখে দোব। সকালে দুই গাঁয়ের বাইরে নিয়ে গিয়ে—যা করবার করব।

সে দুই হাতে কুমীরটাকে তুলিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়িল।

ব্রজদাসী শঙ্কিত হইয়া প্রায় চীৎকার করিয়া ডাকিল—কি হল? দুলাল?

দুলাল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—কিছু না। সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতখানা বাড়াইয়া দিয়া বলিল—ধর দিকিনি!

কোনমতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—বেটা বেশ জখম করেছে। খুব রক্ত পড়েছে, নয়? চল উপরে চল! আখড়ায় উঠিয়া আসিয়া দাওয়ার উপরেই সে শুইয়া পড়িল।

ব্রজদাসী শুকনা কাপড় আনিতে ঘরের ভিতর গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া ডাকিল—দুলাল!

দুলাল সাড়া দিল না।

—দুলাল! ব্রজদাসী তাহার গায়ে হাত দিয়া ডাকিল।

দুলাল তখন জ্ঞান হারাইয়াছে।

দুই

রাঢ়ের উত্তরাঞ্চল। ময়ূরাক্ষীর একটি শাখানদী নাম ডাহুকী; ডাহুকীর ক্রোশখানেক উত্তরে একখানি চাষীর গ্রাম। গ্রামের মধ্য দিয়া ডাহুকীর চেয়েও ছোট একটি প্রবাহিণী বহিয়া গিয়া পড়িয়াছে ডাহুকীতে। ওটার নাম 'বহুকী'—লোকে বলে বউকী। বউকীর একেবারে কূলের উপর আখড়াটি।

পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—কালই বলবান। কালের গ্রাসে সবই বিলুপ্ত হইয়া যায়। যদুপতির সে সমৃদ্ধ মথুরাপুরীও নাই, রঘুপতি রামচন্দ্রের সে অযোধ্যাও আজ মাটির তলায়, মাটির সঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছে।

মানগোবিন্দপুরের বৈষ্ণব সাধক নরোত্তম দাস বাবাজী কিন্তু হাসিয়া বলেন—আছে বাবা আছে। মথুরাপুরীও আছে ব্রজধামও আছে, আযোধ্যাও আছে। বাইরে নাই ভিতরে আছে। মানুষের মনের পৃথিবীতে আছে বাবা। আমি তো বাবা যখন ব্রজদাসীর এই ধামটিতে ঢুকি—আমার মনে হয় নন্দমহারাজের পুরীতে এসে ঢুকলাম।

একটু হাসিয়া বলেন—মনে হয় নন্দমহারাজ বুঝি কোথাও গিয়েছেন—হয়তো নবলক্ষ গোধনের গো-শালা তদারক করছেন—কি বিচুলি কাটাচ্ছেন—যশোমতী একা পুরীর মধ্যে গোপালের ভাবনায় ভোর হয়ে বসে আছেন।

ব্রজদাসী মানুষজনের সম্মুখে লজ্জা পায়। তাহার সুন্দর মুখখানি রাঙা হইয়া উঠে। কেহ থাকিলে সে হাতজোড় করিয়া বলে—প্রভু এ-বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় আমাকে বলে দেন। আমি বুঝতে পারছি—আমি ডুবেছি।

—না ব্রজদাসী তুমি উঠছ।

—না। আমার পরকাল গিয়েছে বাবাজী। ইহকালও যেতে বসেছে। আমাকে আপনি মুক্তির পথ দেখিয়ে দেন। দুলাল আমার কাল—সকল কাল খেয়ে আমাকে অকূল পাথারে ডুবিয়ে দিলে।

জন্মাষ্টমীর দিন নরোত্তম বাবাজীর কাছে এই আবেদন জানাইতে গিয়া সে কাঁদিয়া আকুল হইয়া গেল। বলিল—এই দেখুন! এই দেখুন! এ আমি কি করব বলুন!

দুলাল যন্ত্রণায় এবং জ্বরে বেহুঁস হইয়া পড়িয়াছিল।

—তাই তো ব্রজ; জ্বরে যন্ত্রণায় এ যে বেহুঁস। জন্তু-জানোয়ারের দাঁতে নখে বিষ আছে। ডাক্তার ডেকে দেখানো উচিত মনে হচ্ছে। আমি মহেশকে বলি—সে ডাক্তার ডাকুক, মানগোবিন্দপুরের সুধীর ডাক্তারকেই খবর দিক। আর—

ব্রজ সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নরোত্তম দাস বাবাজীর মুখের দিকে চাহিল।

বাবাজী বলিলেন—জন্মাষ্টমীর আয়োজন আমরাই পাঁচজনে করে নিচ্ছি। তোমার মন আজ চঞ্চল হয়ে রয়েছে—তুমি দুলালের কাছেই বসে থাক। ওর কাছে একজন কারুর থাকা দরকার। কাজ করবার লোকের তো অভাব নেই।

তা নাই।

জন্মাষ্টমী-পর্বে গোবর্ধনপুরের এই গোপালের আখড়ায় সমারোহ হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সাধু মহান্ত অনেকে আসিয়া থাকেন। বিংশ শতাব্দীর এই আমলেও এই অঞ্চলটিতে প্রাচীন কালের জীবনসঙ্গীত জাগিয়া উঠে খোলকরতালের ধ্বনিতে—নাম-সংকীর্তনের সুরের মধ্যে। বারো বৎসর এই গোপালের আখড়ার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, বারো বৎসরের প্রতি জন্মাষ্টমীতেই উৎসব হইয়া আসিতেছে। ইহার আগে জন্মাষ্টমীর উৎসব হইত মানগোবিন্দপুর নরোত্তম দাস বাবাজীর আখড়ায়। নরোত্তম দাস বাবাজীই গোবর্ধনপুরের আখড়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। মহেশ মণ্ডল বাবাজীর শিষ্য—সে-ই আখড়ার ঘরদুয়ার করিয়া দিয়াছে—কিছু জমিও দিয়াছে। আখড়ার প্রতিষ্ঠা করিয়া গোপালের সেবা পরিচালনা করিবার জন্য ব্রজদাসীকে আনিয়া আখড়ার সকল ভার অর্পণ করিয়াছেন। ব্রজদাসীই জোড়হাত করিয়া বাবাজীকে বলিয়াছিল—প্রভু—জন্মাষ্টমী তো নন্দপুরের উৎসব, বংশীবটেরও নয়, কদম্বতলেরও নয়, রাধা-মাধবের কুঞ্জগৃহেরও নয়, মথুরাপুরের তো নয়ই। আপনার এ আখড়া তো তাই। বংশীধারীর শ্রীমতীকে বামে নিয়ে অধিষ্ঠান এখানে। এখানে মা যশোদা গোপালকে কোলে নিয়ে বসবেন—কোনখানে—কোন্ মুখে? শ্যামের কি আমার লজ্জা হবে না?

নরোত্তম দাস বাবাজীর সাধক জীবন বিচিত্র। তিনি জন্মবৈষ্ণব নন। বৈদ্য ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম;—শিক্ষায় দীক্ষায় প্রথম বয়সে উগ্র আধুনিক, উচ্চ রাজকর্মচারীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, হঠাৎ স্ত্রী-বিয়োগের পর তিনি সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করিয়া মানগোবিন্দপুরে এক আখড়া করিয়া সেইখানে বৈষ্ণব সাধনায় বসিয়া গিয়াছেন। তিনি এখানে আসিয়া বসিবার পর হইতেই এ অঞ্চলের বৈষ্ণব পর্ব-পার্বণগুলি বেশ জাঁকিয়া উঠিয়াছে। অঞ্চলটাই অবশ্য বৈষ্ণবভাবের দেশ। অজয়ের কূল ধরিয়া পশ্চিমে জয়দেব কেঁদুলী হইতে গঙ্গা ও অজয়ের সঙ্গমস্থল পর্যন্ত অঞ্চলটি অতি প্রাচীন বৈষ্ণবের দেশ। আকাশের চাঁদকে লজ্জা দিয়া নবদ্বীপে শচীমায়ের কোলে গৌরতনু শিশুর আবির্ভাব যেদিন হয়—সেদিনও মানুষ বুঝিতে পারে নাই এই শিশুর পদরেখা ধরিয়া নূতন ভাব ভাগীরথী উদ্ভূত হইয়া গোটা দেশটা ভাসাইয়া দিবে। কিন্তু অজয়ের কূলের এই অঞ্চলের সাধক কবি তাহার বহুকাল পূর্বে ধ্যান-কল্পনায় এ প্লাবন যেন প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—দেখিয়াছিলেন মাটিতে চাঁদ নামিয়া আসিল—জ্যোৎস্নায় পৃথিবী সত্য সত্যই ভাসিয়া গেল। নানুরের সাধক কবি চণ্ডীদাস গাহিয়াছিলেন—'আজ কে গো মুরলী বাজায়—এ ত কভু নহে শ্যামরায়।' শুধু তাই নয় বৈষ্ণবভাবের নব অভ্যুত্থানের পর এখানে মহাজন ভক্ত দলে দলে যেন মিছিল করিয়া আবির্ভূত হইয়াছে। অজয়ের দশকোশের মধ্যে ময়ূরাক্ষী। ময়ূরাক্ষীর উত্তরে একচক্রা মহাপ্রভু নিত্যানন্দের জন্মস্থান। কাছাকাছি বীরচন্দ্রপুরকে লোকে বলে গুপ্ত বৃন্দাবন। এ অঞ্চলে প্রতি পাঁচখানি গ্রামে একটি করিয়া বৈষ্ণবের আখড়া। মাটির দেওয়াল, খড়ের চালে ছাওয়ানো আখড়া; যদুপতির পাথরে গড়া বিরাট রাজপ্রাসাদ নয় যে, কাল ভাঙিয়া দিলে আর গড়া যায় না, সে ভাঙা পাথরের স্তূপই সরানো অসম্ভব হইয়া উঠে। মাটির আখড়া কাল ভাঙে—জলে গড়িয়া পড়ে, ইঁদুরে গোড়ায় গর্ত কাটিয়া তলাটা ফোঁপরা করিয়া দেয় তখন একদিন ধ্বসিয়া পড়ে, ভূমিকম্পে ফাটে—ভাঙে, মানুষ ওই ভাঙা দেওয়ালেই জল ঢালিয়া কাদা করিয়া

আবার দেওয়াল দেয়, লোকের কাছে ভিক্ষা করিয়া খড বাঁশ মাথায় করিয়া আনে, দেওয়ালের উপর চাল তুলিয়া সযত্নে নিজের হাতে রাঙা মাটি দিয়া নিকাইয়া, আল্পনা আঁকিয়া মনোমন্দিরের অধীশ্বরকে হাত জোড করিয়া বলে—আমার মনোমন্দিরে অধিষ্ঠিত হও। নরোত্তম দাস বলেন—তাই তো বলি বাবা, মথুরাপুরীর ইট-কাঠ-পাথর ভেঙেছে কাল, মাটি চাপা দিয়েছে, আসল মথুরা যেমনকার তেমনি আছে। কালের সঙ্গে কালাচাঁদের খেলা চলেছে বাবা!

জন্মাষ্টমীর উৎসব লইয়া ব্রজদাসীর কথা শুনিয়া তিনি একটু হাসিয়া বলিয়াছিলেন—তাই হবে। যশোমতী যেখানে গোপালকে নিয়ে গরবিনীর মত বসে থাকেন—সেই পুরীতেই হবে জন্মাষ্টমীর পালন।

তিনি একটু হাসিলেন। অর্থপূর্ণ হাসি। ব্রজদাসী লজ্জিত হইয়া মাথার ঘোমটা ঈষৎ টানিয়া দিয়াছিল; বলিয়াছিল—ও কথা বললে আমি লজ্জা পাই প্রভু।

—না। ঘাড় নাড়িয়া বাবাজী বলিয়াছিলেন—আনন্দ যখন হৃদয় ছাপিয়ে পড়ে ব্রজদাসী—তখন এমনি এক-একটা মধুর ভাবের রূপ নিয়ে বাইরে প্রকাশ পায়। কখনও লজ্জা—কখনও বিনয়—কখনও কিছু। তুমি ব্রজদুলালের মা যশোদা—তোমার গোপালের আখডাতেই তো জন্মাষ্টমীর সত্য ক্ষেত্র; তাই হবে।

তখন হইতে এই বারো বৎসর ধরিয়া এই আখডাতেই জন্মাষ্টমীর সমারোহ হইয়া আসিতেছে। বৈষ্ণব মহান্তেরা আসেন—সারাদিন থাকেন—সন্ধ্যার পূর্বেই চলিয়া যান—আপন আপন আখড়ার পার্বণ পালনের জন্য। দুপুরে ব্রজদাসী কীর্তন গায়। এ সজ্জন সমাগমের প্রধান আকর্ষণ ব্রজদাসীর গান।

* * * *

নরোত্তম বাবাজী বলিলেন—তুমি দুলালের শিয়রে বসে থাক। কাজ করবার লোকের অভাব হবে না।

ব্রজদাসী বসিয়াই ছিল। দুলাল কাতরাইতেছে।

ভাদ্রমাস, পল্লীগ্রামে বলে পচা ভাদর, এ সময়ে যত মাছি—তত মশা। ভন ভন করিয়া মাছি উড়িয়া বেড়াইতেছে। দুলালের পায়ে বসিয়া তাহাকে আরও অস্থির করিয়া তুলিতেছে। ব্রজদাসী উঠিয়া গিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল। অন্ধকার ঘরে বসিয়া থাকিতে তাহার কান্না পাইল। দুলাল যদি না-বাঁচে!

মাথায় কলঙ্কের পসরা তুলিয়া লইয়া দুলালকে সে কোলে পাইয়াছে।

ষোল বৎসর পূর্বের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল।

অপরূপ একটি সুখনীড়।

হঠাৎ সে নীড় তাহার ভাঙিয়া গেল। তাহার বৈষ্ণব তাহাকে পরিত্যাগ করিল। তখন তাহার বয়স আটাশ। কৈশোরে যৌবনে—যে রূপ তাহার ছিল সে রূপে তখন মালিন্য পড়িয়াছে। এই অপরাধে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া নূতন বৈষ্ণবী যুবতী ঘরে আনিয়া তুলিল। লজ্জায়-অভিমানে ধিক্কারে ক্ষোভে সেও ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল।

কোথায় বাহির হইয়াছিল—তাহার কোন স্থিরতা ছিল না। পথে বাহির হইয়া চলিয়াছিল। পথের পর পথ পিছনে ফেলিয়া চলিয়াছিল। গৃহস্থের দুয়ারে দুয়ারে গান গাহিয়া ভিক্ষা করিত। গান ছিল মূলধন। গান শুনিয়া লোকে কাঁদিত, তাহাকে ছাড়িতে চাহিত না, বলিত—আর একখানা গাও। ব্রজদাসী না বলিত না, আবার গান ধরিত, গান শেষ করিয়া বলিত—এইবার আসি।

গৃহস্থের গৃহিণী-বধূ-কন্যা সকলের সমস্বরে সস্নেহে নিমন্ত্রণ জানাইত—আবার এসো যেন।

ব্রজদাসী হাত জোড় করিয়া বলিত—আসব, ফেরবার সময় আসব মা।

—কবে? কবে ফিরবে?

—কালও ফিরতে পারি, আবার দেরিও হতে পারে।

—যবেই ফেরো, এসো যেন।

—আসব বৈ কি। আপনাদের দোরই যে আমাদের ভাণ্ডার মা।

গ্রাম হইতে বাহির হইয়া মাঠ পার হইয়া গ্রামান্তরে প্রবেশ মুখে এদেশের ছায়াঘন পুষ্করিণীর ঘাটে নামিয়া মুখ হাত ধুইয়া বিশ্রাম করিত; দুপুর হইলে কাঠ কুটা কুড়াইয়া ইট বা মাটির ঢেলা দিয়া উনান পাতিয়া ছোট পিতলের বক্‌নো চড়াইয়া দিত। ঝুলিতেই থাকিত ভাণ্ডার। ন্যাকড়ার খুঁটে বাঁধা নুন, কয়েকটা লঙ্কা, শিশিতে তেল, ভিক্ষার চাল, দুইটা আলু একটা বেগুন। রান্না চড়াইয়া সে ভাবিত অদৃষ্টের কথা। অতীত কালের কথা স্মরণ করিত—চোখ দিয়া জল গড়াইত। গুন গুন করিয়া আপন মনেই গান করিত—

সখি বলিতে বিদরে হিয়া
আমার বঁধুয়া আন বাড়ী যায় আমার আঁঙিনা দিয়া!

রাত্রে সজ্জন গৃহস্থবাড়ীতে আশ্রয় ভিক্ষা করিয়া রাত্রি কাটাইয়া—আবার প্রভাতে যাত্রা শুরু করিত। পথে হাটবাজার পড়িলে সেইখানেই আসর পাতিয়া বসিয়া যাইত। চারিপাশে ভিড় জমিত। নানা জনে নানা কথা বলিত। কুৎসিত ইঙ্গিত অশ্লীল মন্তব্য। কিন্তু সে মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া গান ধরিত—

কানু সে জীবন জাতি প্রাণধন
এ দুটি নয়নতারা।

গাহিতে গাহিতে সে গানের মধ্যেই নিজেকে ডুবাইয়া দিত।

গঞ্জে গুরুজন বলে কুবচন
সে মোর চন্দন চুয়া
শ্যাম অনুরাগে অঙ্গ বেচিয়াছি
তিল তুলসী দিয়া।

গানের মহিমায় মানুষগুলির মনে উচ্ছৃঙ্খলতা, কুৎসিত লালসা আপনিই শান্ত হইয়া আসিত। ভাবান্তর ঘটিত। মুহূর্তপূর্বে যাহারা কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়াছিল তাহারাই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিত, যাহারা অশ্লীল মন্তব্য করিয়াছিল—তাহারাই বলিত—আহা-হা! ভণিতায় আসিয়া মহাজনের নাম উচ্চারণ করিয়া সে যখন কপালে হাত ঠেকাইয়া প্রণাম জানাইত—তখন তাহারাও তাহার সঙ্গে প্রণাম জানাইত।

কোন কোন শ্রোতা তারিফ করিয়া বাহবা দিত—বাঃ বাঃ! চমৎকার!

মধুর হাসিয়া সে নমস্কার জানাইয়া বলিত—আপনাদের দয়া প্রভু!

রসিকজনে ইহার পরও বলিত—বাঃ—বষ্টুমীর গান যেমন মিষ্টি, হাসিও তেমন মিষ্টি।

সে আরও একটু মিষ্টি হাসিয়া মাথার থানকাপড়ের অবগুণ্ঠন আরও খানিকটা দিয়া বলিত—বৈষ্ণবীর ওই তো সম্বল প্রভু!

বিদায় লইয়া হাসিতে হাসিতে আবার সে পথ চলিত।

হঠাৎ একদিন এক গাছতলায় বসিয়া তাহার কান্না পাইল। এমন করিয়া সে আর কত ঘুরিবে? এমন করিয়া কি ঘোরা যায়? ঘরে বিতৃষ্ণা জন্মিয়া মনের ক্ষোভে সে পথে বাহিয়া

হইয়াছিল—কিন্তু সে পথও যে আর সহ্য হইতেছে না! মনের ক্ষোভ যেন জুড়াইয়া আসিয়াছে। তবে?

কোথায় যাইবে সে?

দিনে বিশ্রামের ক্ষণে গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া চোখ বুজিয়া ভাবিত, রাত্রে অন্ধকারে চোখ চাহিয়া সে ভাবিত—কোথায়—কোথায় যাইবে সে?

অকস্মাৎ একদিন যেন সে ডাক শুনিল, হঠাৎ তাহার মনে হইল—সে বৃন্দাবন যাইবে। মনে মনে নিজেকেই বলিল—হায় রে পোড়া কপাল আমার! কোথায় যাইব এ কথা নাকি ভাবিতে হয়!

জয় রাধাগোবিন্দ! বলিয়া সে সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে সময়টা ছিল মধ্য-রাত্রি। বেশ মনে আছে। গৃহস্থবাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিল। ইচ্ছা হইয়াছিল সেই মুহূর্তেই পথে বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা পারে নাই! গৃহস্থবাড়ী—গৃহস্থ দরজা বন্ধ করিয়া ঘুমাই-তেছে, সে দরজা খুলিয়া যাইবে কি করিয়া? চোর বদমাসের কথা দূরে থাক—দরজা খোলা পাইয়া কুকুর বিড়াল ঢুকিলে অনিষ্ট হইবে—সে অপরাধের দায় যে পড়িবে তাহার উপর! সমস্ত রাত্রিটা বসিয়া কত কল্পনা করিয়াছিল।

পদব্রজেই সে শ্রীধাম বৃন্দাবন যাইবে।

দেবতার চরণে গিয়া গড়াইয়া পড়িবে। জয় রাধাগোবিন্দ! নিজেকে সে বিসর্জন দিবে। গুনগুন করিয়া গাহিয়াছিল—

কি আর বলিব আমি!
তোমার চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি।

কথা মনে করিতে করিতে হাসি পাইল ব্রজদাসীর। উপহাসের হাসি! নিজেকেই উপহাস করিল সে। যেমন তাহার সংকল্প তেমনি তাহার কপাল। পায়ে হাঁটিয়াই যাত্রা শুরু করিয়া-ছিল। কি সে তাহার উৎসাহ! সকল দুঃখই যেন সে ভুলিয়া গিয়াছিল। মধ্যে মধ্যে অবশ্য ভাঙা ঘরের জন্য ক্ষোভ জাগিত। কেন জাগিত কেমন করিয়া জাগিত সেদিন বুঝিতে পারিত না—আজ পারে। মনের পাপ! মনে পড়ে—একদিন এক গৃহস্থবাড়ীতে গিয়া আশ্রয় লইয়া-ছিল। অপরূপ সুখের সংসার। কর্তা গিন্নী ছেলে বউ নাতিতে জমজমাট, হাসি কান্না রসিকতা তামাসা ঝগড়ায় বাড়ীটা অহরহ যেন সুখে কল্ কল্ করিতেছে। হাসিতে তো সুখ থাকেই, রসিকতা তামাসাও সুখেরই কথা—কান্না ঝগড়াও এ বাড়ীতে সুখের। মায়ে ছেলেতে, স্বামী স্ত্রীতে ছলনার কলহ, ছোট শিশুগুলিকে ধমক দিয়া কাঁদানো দেখিয়া সুখে আনন্দে তাহারও অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। মনে আছে—ছেলের মুখখানি দুই হাতে নিজের মুখের সামনে ধরিয়া মা-কে ধমক দিতে দেখিয়াছিল—এ—রে ছে—লেঃ! এঃ—!

শিশুটি ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে মা হাসিয়া সারা হইয়া গোটা বাড়ীর সকলকে ডাকিয়া দেখাইয়াছিল—দেখ গো—আমার ঠোঁট ফুলিয়া কান্না দেখ!

ঠিক এই সময়টিতেই গিন্নী উপর হইতে চীৎকার করিতে করিতে নামিয়া আসিতেছিলেন—

—না—না—না! এ বাড়ীতে আমি জলগ্রহণ করব না।

পিছনে পিছনে ছেলে আসিতেছিলেন—সমান চীৎকার করিয়া সে বলিতেছে—জল খাবে না?

—না।

—খাবে না ?

—না। না—না—না।

—আচ্ছা। আমার দোষ নাই তা' হলে।

—বড় খোকা! খবরদার!

—কিছুতেই না। আমি কোন কথা শুনব না।

—না। ভালো হবে না। বড় খোকা!

—তোমার ও চোখরাঙানিকে আর আমি ভয় করি না। বলিয়াই সে মাকে ছোট মেয়ের মত কোলে তুলিয়া লইল। – গোটা পাড়ায় তোমাকে ঘুরিয়ে আনব আমি, চীৎকার ক'রে বলব—"খুকী আমার রাগ করেছে—জল খাবে না গো! পথে ব'সে মাখবে ধুলো ঘর যাবে না গো!"

মা হাসিয়া ফেলিয়া বলিয়াছিল—ওরে দুশমণ—ওরে দুষ্টু—ছাড় ছাড়। নামিয়ে দে; নামিয়ে দে! পড়ে যাব! মাথা ঘুরচে আমার!

ছেলে মায়ের কথা না মানিয়া পাক কয়েক বন বন করিয়া ঘুরিয়া লইয়াছিল—আনি-মানি জানি না, পরের ছেলে মানি না!

নামাইয়া দিতেই মা ছোট্ট মেয়ের মত হাসিয়া সারা!

সেদিন রাত্রে তাহাদের দাওয়ায় শুইয়াছিল, সমস্ত রাত্রি ঘুমাইতে পারে না। সারারাত্রি নিজের দুঃখে কথাগুলি আপনি জাগিয়া উঠিয়াছিল, খাতকের ঘরে মহাজনের মত আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ডাকিতে হয় নাই, তাড়াইয়া দিতেও পারে নাই।

পরদিন সকালে বিদায় লইবার সময় বধূটি বলিয়াছিল—আজ থেকে যাও।

—না মা!

—কেন ? কাল কি কষ্ট পেয়েছ ? অসুবিধে হয়েছে ?

—কষ্ট ? অসুবিধে ? আমার ? হাসিয়া ব্রজদাসী বলিয়াছিল—পৃথিবী যার অন্ধকার মা—তার আবার কষ্ট! না—কষ্ট নয়। কিন্তু অন্ধকারে আর থাকতে পারছি না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া এক মুহূর্ত পরে আবার বলিয়াছিল,—অকারণে বলিয়াছিল নিজের দুঃখের কথা—না বলিয়া যেন স্বস্তি পায় নাই, বলিয়াছিল,—চাঁদে গ্রহণ লাগে, রাহু এসে চাঁদকে গেলে, চাঁদ আবার মুক্ত হয়, কিন্তু যার কপালে চাঁদ নিজেই হয়ে যায় রাহু—তার কি আকাশপানে তাকিয়ে থাকলে চলে ? তাকে তখন খুঁজতে হয়—কোথায় কোন্ জগতে আছে নতুন চাঁদ। আমি তাই চলেছি।

কথায় বাধা দিয়া এবার গৃহিণী নথ নাড়িয়া বলিয়াছিলেন—কিছু মনে করো না বষ্টুমী, তোমার মুখের হাসি দেখে মনে হচ্ছে মা—চাঁদকে তুমিই গিলে খেয়েছ—তোমার ঠোঁটের হাসিতে যেন প্রতিপদের চাঁদ উঁকি মারছে! সকলে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়াছিল। বৈষ্ণবী লজ্জা পাইয়াছিল। তাহার মুখখানা লাল হইয়া উঠিয়াছিল। তবু সে দমে নাই। উত্তর সঙ্গে সঙ্গেই দিয়াছিল। বলিয়াছিল—ও মা তোমার চোখের ভুল। চাঁদের হাটে তুমি বাস কর মা—কর্তা চাঁদ, ছেলে চাঁদ, নাতি চাঁদ,—তোমার কপালে চাঁদ—কোলে চাঁদ—আশে চাঁদ—পাশে চাঁদ; আমার ঠোঁটের হাসিতে যদি চাঁদের ফালিই দেখতে পেয়ে থাক মা—তবে সে চাঁদ নয়—তোমার চাঁদের ছটা বেজেছে সেখানে।

আমার প্রভু তোমার চাঁদের হাট অক্ষয় করুন মা, তোমার চাঁদের হাটের ছটা আমার হাসিতে ফুটে উঠেছে—সে আমার মহাভাগ্য মা। ওরই আলোতে পথ দেখে আমি চলে যাব

—সেই চাঁদের চরণতলে—যে চাঁদে গ্রহণ লাগে না, যে চাঁদের ক্ষয় বৃদ্ধি নেই। কপালে হাত ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিয়াছিল—আমার শ্যামচাঁদ—বৃন্দাবনের অক্ষয় পূর্ণিমার চাঁদ!

স্বামী পুত্র নাতি বধূ কন্যা লইয়া ভরা সংসার তুলিয়া কথা—রহস্যচ্ছলে বলিলেও বাংলা দেশের মেয়েদের সহ্য হয় না। কথাটা বলিয়া ব্রজ পরমুহূর্তেই শিহরিয়া উঠিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গেই সে খঞ্জনীতে ধ্বনি তুলিয়া বলিয়াছিল—যাবার সময় গান গেয়ে যাই মা শোন!

"ও কাল কালিন্দী কূলে—ও কেলি কদম্ব মূলে—
ও সই—! এ কি অপরূপ কাল শশী!"

গান শেষ করিয়া—মার্জনা চাহিয়া—ভিক্ষা লইয়া সে উঠিয়া পড়িয়াছিল, পাছে আরও কথা বাড়ে তাই বলিয়াছিল—যেতে যে হবে অনেক দূর মা! তার ওপর সময় নষ্ট কবা বারণও বটে।

—কোথায় যাবে? কত দূর?

—কত তা জানি না। তবে অনেক দূর। যাব বৃন্দাবন।

—বৃন্দাবন! সে কি?

—হ্যাঁ মা। সেই তো একমাত্র অক্ষয় চাঁদের পুরী! অন্ধকারে আমি হাঁপিয়ে উঠেছি মা। সংসার আমার অন্ধকার!

মনে আছে বিদায় লইয়া সে সেদিন যতখানি তাহার শক্তি ততখানি দ্রুতপদে চলিতে শুরু করিয়াছিল। ঠিক যেন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়াছিল।

আজ সে বেশ বুঝিতে পারে সেই সুখের সংসারটি দেখিয়া ঈর্ষার তাড়নায় এমন নিজের দুঃখে কাতর হইয়াছিল, বৃন্দাবনের মুখে এমন করিয়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া যায় নাই। ওই গৃহস্থ বাড়ীটি হইতে ছুটিয়া পলাইয়াছিল। হয়তো ছুটিতে ছুটিতে একদিন বৃন্দাবনেই গিয়া উঠিত। কিন্তু—। মর্মান্তিক দুঃখের হাসি ফুটিয়া উঠিল ব্রজদাসীর মুখে।

পথের মধ্যে দুলাল তাহার বুক জুড়িয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

ঝাঁপ দিয়া পড়াই বটে।

তাহার মনে আছে একবার একটা গিরগিটি তাহার গায়ে পড়িয়াছিল। সন্ধ্যার সময় গাছতলা দিয়া চলিবার পথে অতর্কিতে একেবারে গাছের উপর হইতে ঝপ্ করিয়া তাহার কাঁধের উপর পড়িয়াছিল। সে কি আতঙ্ক—সে কি অন্তরাত্মার চমক! যাহার এমন ভাবে কখনও কিছু পড়ে নাই সে মর্মান্তিক মুহূর্তের অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিবে না। ঠিক এমনি করিয়াই দুলাল তাহার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

সে কি দিন!

জংশন স্টেশনের লম্পট বাঙালী সাহেবকে মনে করিতে তাহার সমস্ত শরীর আজও হিম হইয়া যায়।

ভাবনায় ছেদ পড়িল ব্রজদাসীর।

ঘরের দরজা ঠেলিয়া নরোত্তমদাস বাবাজী প্রবেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক ঝলক রৌদ্র আসিয়া ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। ব্রজদাসী চমকিয়া উঠিল। মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া সচেতন হইয়া বসিল।

বাবাজী বলিলেন, মৃদঙ্গ নোব। বরাবরই তো এ সময়ে কীর্তন হয়। এবার একবার নিয়মরক্ষাও তো করতে হবে। সুবলপুরের মহান্ত গাইবেন, ওকেই বললাম।

দেওয়ালের গায়ে সযত্নে কাপড় ঢাকিয়া খোলখানি তোলা থাকে। বাবাজী খোলখানি

নামাইয়া লইয়া চলিয়া গেলেন। দরজা বন্ধ করিয়া দিতে ভুলিলেন না।

অন্ধকার হইয়া গেল ঘরখানা।

দুলাল একবার নড়িয়া চড়িয়া শুইল। সম্ভবতঃ আলোর ছটায় তাহার ঘোর ভাঙিয়াছিল। ব্রজ আবার দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই সে চঞ্চল হইয়া নড়িয়া চড়িয়া বসিল। আজ জন্মাষ্টমী। এই আখড়া প্রতিষ্ঠার প্রথম বৎসর হইতেই এই দিনটিতে সে দুপুরে পদাবলী গান করে। ভক্ত রসিকেরা শুনিয়া থাকেন। তাহার গোপাল শোনেন। এ বৎসর—! না সে হইবে না। শুধু তো তাহার নিজের অপরাধের কথাই নয়, দুলালের মঙ্গল অমঙ্গলও আছে যে। যে দুলালের মুখ চাহিয়া এই ভাবে সে বসিয়া থাকিবে—এই অপরাধের শাস্তি তাহাকে দিতে, যদি শাস্তিদাতা দুলালের উপর আঘাত হানেন! দুলালই যে তাহার জীবনমন্দিরের চূড়া! সোনার নয় পিতলের কলঙ্কবর্ণ লোহার চূড়াই বটে, কিন্তু বজ্রাঘাত হইলে যে চূড়ার উপরেই হয়!

ব্রজদাসী শিহরিয়া উঠিল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই সভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল। দুলালের দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া সন্তর্পণে পাটের কাপড়খানি টানিয়া লইয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

আখড়ার উঠানে ছোট একটি আচ্ছাদন ইতিমধ্যেই তৈয়ারী হইয়া গিয়াছে। চারিপাশে বাঁশের খুঁটি পুঁতিয়া মাথায় আঁটি আঁটি খড় চাপাইয়া আচ্ছাদন প্রতি বৎসরই তৈয়ারী হয়। মহেশ মণ্ডলের তদারকে গ্রামের লোকেরাই এ কাজ করে। শুধু গোবর্ধনপুরের এই আখড়াতেই নয়, এ অঞ্চলের সকল আখড়াতেই এই ব্যবস্থা। আখড়ার সেবাইত মহান্ত যিনিই থাকুন আসল আখড়ার কর্তা যে গ্রামের লোকেই। আখড়া, শিবতলা, কালীতলা—এ সবের ভার গ্রামের লোকেই স্মরণাতীত কাল হইতে বহন করিয়া আসিতেছে। তাহার উপর মহেশ মণ্ডলের মত মানুষ যে গ্রামের মণ্ডল সে গ্রামের এসব কাজ এমন নিখুঁত ভাবে হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি। ব্রজ দেখিল, বাঁশের খুঁটিগুলিতে দেবদারু পাতা দিয়া মুড়িয়া দিতে পর্যন্ত ভুল হয় নাই। আমের শাখা গাঁথা লম্বা খড়ের দড়ি টাঙানো হইতেছে, উঠান ব্রজদাসী কাল সন্ধ্যাতেই নিকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহার উপর আলপনা দেওয়াও হইয়া গিয়াছে, কে দিয়াছে ব্রজ জানে না, কিন্তু যেই দিয়া থাক—ভালই দিয়াছে।

মৃদঙ্গ লইয়া নরোত্তমদাস বাবাজী বসিয়াছেন, অন্য বৈষ্ণব মহান্তরা একে একে বসিতেছেন। ব্রজ আসিয়া সকলকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

নরোত্তমদাস বাবাজী মৃদঙ্গটি সামনে রাখিয়া হাত জোড় করিয়া গোবিন্দ স্মরণ করিতেছিলেন —তিনি কথা বলিলেন না—শুধু মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল। সুবলপুরের মহান্ত বলিলেন—আপনি উঠে এলেন মা-জী!

মৃদু হাসিয়া ব্রজদাসী বলিল, এলাম। আপনারা সকলে এসেছেন—তার উপর—এ দিনটি তো বছরে একদিনই আসে।

গোপালপুরের বুড়া বৈরাগী বাউল বলিলেন—দুলাল সুস্থ আছে তো!

—নিঝুম হয়ে পড়ে আছে। রক্তপাত হয়েছে তো অনেক। বেঁচেছে সে শুধু গোবিন্দের করুণা আর আপনাদের আশীর্বাদ।

বাউল বলিলেন—মাগো! তুমি বলছ কি? করুণা হবে না গোবিন্দের? তোমার যে ওই একটি।

সুবলপুরের মহান্তের চোখ সজল হইয়া উঠিল, বলিলেন—আঃ! পিতৃহীন বালক, মায়ের এই একমাত্র ভরসা। হবে না করুণা তাঁর! ঠাকুর যে আমার অনাথের—অসহায়ের—

দুর্বলের ! আঃ !

ব্রজর প্রতিবেশিনী রামকানাইয়ের মা ঝুড়ির পিঠে পাকা তাল ঘষিয়া মাড়ি বাহির করিতেছিল, সে আর থাকিতে পারিল না—বলিয়া উঠিল, অনাথ বলছেন বলুন বাবারা বলুন—দুর্বল বলবেন না, অসহায়ও বলবেন না। বাবা, বাঘের মতন রোক্ ছেলের, তেমনি কি প্রচণ্ড জোর গায়ে! ষোল বৎসরের ছেলে আমার রামকানাইয়ের হামজুটি, রামকানাই ওর কাছে পিঁপড়ে। আবার তেমনি কি সাহস বাবা! পিথিমীর কিছুকে ভয় নাই মা। তেমনি কি মার-হাত ছেলের! সেই ছেলেবেলা থেকে। আমার রামকানাইয়ের ছামনের দুটো দাঁত কিল মেরে ভেঙে দিয়েছিল বাবা! মুখ ফুলে এই হাঁড়ি হয়ে উঠেছিল। ভাগ্যে দুধে দাঁত তখন—তাই আবার হয়েছে—নইলে ছেলে আমার চের জনমের মত ফোকলা হয়ে থাকত। হবে না কেন? মায়ের যে একদম শাসন নাই। শাসন থাকলে বোষ্টুম মহান্ত ঘরের ছেলে, আখড়ায় এমন গোপাল, মা নিজে এমন, গান শুনলে পশুপক্ষী বশ মানে—সেই মায়ের ছেলে আখড়ার সেবা আখড়ার ধর্ম বউকী জলে ভাসিয়ে দিয়ে ওই মেলেচ্ছ গাডী—লরী না হুড়ি—তাতেই কাজ করতে যায়? মা গো—গাড়ীর ধোঁয়ার গন্ধ কী? একবার আমি চেপেছিলাম—সাত কলসী বমি করে অন্নপেরাশনের ভাত তুলে তবে রক্ষে! ও ছেলেকে দুব্বল ব'ল না বাবা। ও ডারপার ছেলে ডারপারের মরণ তালগাছে চড়ে—তা এ আবার নতুন দেখালে বাবা, জলের কুমীর ডাঙায় তুলে—তাকে মেলে। ওই ছেলে দুর্বল! বাবাঃ!

মুখরা রামকানাইয়ের মা বলিয়াই চলিয়াছিল, রামকানাইয়ের মায়ের ওই স্বভাব, বলিতে শুরু করিলে থামে না, আগুন দেওয়া তুবড়ীর মত একেবারে বকিবার শক্তি ফুরাইয়া না যাওয়া পর্যন্ত বকিয়াই চলিবে। নরোত্তমদাস বাবাজী তুবড়ীর মুখে জল ঢালিয়া দিলেন। তাঁহার গোবিন্দ স্মরণ শেষ হইবামাত্র তিনি বাধা দিয়া বলিলেন—ওগো বাছা রামকানাইয়ের মা, প্রভুর ভোগের জিনিস মা। ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে প্রসাদ পাবেন। ও আয়োজন মুখ বন্ধ ক'রে করতে হয় মা। এ সময় বকতে নাই। রামকানাইয়ের উপরেও প্রভুর দয়া অনেক। দীর্ঘজীবী হবে তোমার ছেলে। চুপ ক'রে কাজ করে যাও—নইলে কি জানি বকতে বকতে মুখ থেকে আব ছিটকে পড়ে উচ্ছিষ্ট হয়ে যেতে পারে।

রামকানাইয়ের মা অবাক হইয়া গেল—বলিল—কি বাবা? কি পড়বে?

'আব' কথাটা এ অঞ্চলে অপ্রচলিত, সোজাসুজি থুথুই বলিয়া থাকে লোকে, নরোত্তমদাস বাবাজী কিন্তু থুথু কথাটা ব্যবহার করিতে পারেন নাই, বিশেষ করিয়া এমন ক্ষেত্রে অর্থাৎ ভোগের বস্তুতে থুথু পড়িবে এ কথাটা মুখে যেন বাধিয়া গিয়াছে। কিন্তু রামকানাইয়ের মা কথাটা তাঁহাকে না বলাইয়া ছাড়িল না, অপ্রসন্ন মুখেই বলিলেন—কথা বলবার সময় মুখ থেকে আব বেরোয় না। থুথু—থুথু।

রামকানাইয়ের মা এবার শিহরিয়া উঠিল। কথা বন্ধ করিয়া সে কাজ আরম্ভ করিল।

বাবাজী বলিলেন—তবে আরম্ভ কর ব্রজ; বলিয়াই তিনি মৃদঙ্গে ধ্বনি তুলিলেন। প্রথম দফা বাজনা শেষ করিয়া ছেহাই দিয়া হাতজোড় করিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন—জয় রাধে গোবিন্দ জয় গৌর নিত্যানন্দ!

তারপরই ব্রজ গান আরম্ভ করিল। প্রথমে গৌরচন্দ্রিকা তারপর কৃষ্ণলীলা। দীর্ঘ দশকুষীতে মধুর কণ্ঠে গান ধরিল—

পুরব জনম দিবস দেখিয়া
আবেশে গৌর রায়

সঙ্গীগণ লইয়া হরষিত হৈয়া
নন্দ মহোৎসব গায়—

জন্মাষ্টমী দিবসে শচীনন্দনের পূর্বজন্ম স্মৃতি মনে জাগিয়া উঠিয়াছে। তিনি ভাবে বিভোর হইয়া সেই দিনের মহোৎসবের কথা স্মরণ করিতেছেন। স্মরণ করিতেছেন ব্রজপুরের আনন্দ। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী রাত্রি ঘন দুর্যোগে আচ্ছন্ন, সমস্ত পৃথিবী দুর্যোগের বিভীষিকায় আচ্ছন্ন ত্রস্ত, তাহারই মধ্যে কারাগার অপার্থিব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, পিতা বসুদেব কারাগার হইতে সদ্যোজাত শিশুকে লইয়া যমুনার পাথার পার হইয়া বৃন্দাবনে আসিয়া সদ্যপ্রসূতি মা যশোমতীর কোলের পাশে তাহাকে রাখিয়া গিয়াছেন। যশোমতী প্রভাতে উঠিয়া আপন শিশু জ্ঞানে তাঁহার মুখ দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া উঠিয়াছেন। সমগ্র ব্রজমণ্ডলে পরমোৎসবের সাড়া জাগিয়া উঠিয়াছে। শচীনন্দনের মনে পড়িতেছে মা যশোদার আনন্দবিভোর মুখমণ্ডল। মনে পড়িতেছে মাতৃবক্ষের অমৃত স্বাদের স্মৃতি॥

ঘৃত ঘোল দধি গো-রস হলদি
অবনী মাঝারে ঢালি—
কান্ধে ভার করি তাহার উপরি
নাচে গোরা বনমালী।

নিজেই তিনি আজ কাঁধে দই ঘোলের ভার লইয়া নাচিতেছেন, যেমন নাচিয়াছিল সেদিন ব্রজপুরের গোপেদের দল।

ব্রজর মনে পড়িতেছিল নিজের কথা।

সেই দুর্যোগ রাত্রিতে পথে গাছের তলায় দুলালকে কোলে পাইয়া নির্নিমেষ নেত্রে সে পূর্ব দিগন্তের পানে চাহিয়াছিল। রাত্রির অবসান হইল, সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া দৃষ্টি ফিরাইয়া চাহিয়াছিল একরাত্রি বয়স্ক শিশুটির মুখের দিকে। মনে পড়িতেছে সেই ক্ষণের মনের অবস্থার কথা।

ওদিকে বৈষ্ণব মণ্ডলী—গ্রামের শ্রোতৃমণ্ডলী স্তব্ধ হইয়া গান শুনিতেছেন। একটি ভাবাবেশ যেন অন্তরলোক হইতে পৌষ-প্রত্যূষের পৃথিবীর বুক হইতে জাগিয়া ওঠা কুয়াসার মত ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে।

অকস্মাৎ একটা ক্রুদ্ধ আর্ত চীৎকারে সকলে চমকিয়া উঠিল—একটা আগুনের তড়িৎগতি হল্কা বহিয়া কুয়াসামণ্ডলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দিল। ব্রজ চমকিয়া উঠিল।

দুলাল টলিতে টলিতে বাহির হইয়া আসিয়াছে, দাঁতে দাঁত টিপিয়া ক্রুদ্ধ চীৎকার করিয়া সব ছিঁড়িয়া খুঁড়িয়া দিতে চাহিতেছে।

—গান—গান—গান। আমোদ। আমি মরে গেলাম—আর সর্বনাশী রাক্ষুসী—তুমি গান গেয়ে ঠাকুরপূজো করছ!

দুলালের ক্রোধ বুনো মহিষের মত, তাহার কণ্ঠস্বরও বন্য পশুর মত কর্কশ, উচ্চ। রাগ হইলেই তাহার দাঁত বাহির হইয়া পড়ে, দাঁতে দাঁত ঘষে। দুলালের ক্রোধে ক্ষোভের চেয়ে হিংস্রতার পরিমাণ বেশী।

মহান্ত নরোত্তমদাস বলিলেন, ব্রজ ওঠ তুমি, আমি অনুমতি করছি।

ব্রজ উত্তর দিল না, সে গাহিয়াই চলিল। তখন সে নূতন পদ ধরিয়াছে, সমগ্র পৃথিবী নবজাত যশোদানন্দনকে বন্দনা করিতেছে—

জয় ব্রজরাজ কোঙর—
গোকুল উদয়গিরি-চান্দ উজোর।
কোটি ইন্দু জিনি মুখ, তনু জলধর—
একত্রে উদয়ে আলো করিয়াছে ঘর।

সে গাহিয়াই চলিল।

দুলাল দাওয়া হইতে একরূপ লাফ দিয়া পড়িল, নিচে পড়িয়া বসিয়া পড়িল—আবার উঠিল—সকল শক্তি একত্রিত করিয়া আখড়া হইতে বাহির হইয়া গেল।

—চললাম আমি।

ব্রজ তবু উঠিল না। সুবলপুরের মহান্ত সব চেয়ে বেশী চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন—গানের মধ্যে তিনি ব্রজদাসীকে ডাকিতে পারিলেন না—কিন্তু অগ্রসর হইয়া সামনে আসিয়া বসিলেন—মূল গায়কের কাজ তিনিই করবেন। ব্রজ গান গাহিতে গাহিতেই ঘাড় নাড়িল—না।

বাহির হইবার পথে হরিবোলা পাল দুলালকে ধরিল—দুলাল—বাবা!

এক ঝটকায় তাহার হাত ছাড়াইয়া দুলাল গর্জন করিয়া উঠিল—এ্যাও!

সে চলিয়া গেল।

ব্রজ তবু উঠিল না। সে গাহিয়া চলিল—

ও থল কমল জিনি চরণ রাতুল
হেরিয়া উদ্ধব পঁহু চিত মন ভুল।

তিন

ব্রজ গান শেষ করিয়া প্রণাম করিল। তারপর উঠিয়া ঘরের দিকে চলিয়া গেল কাপড় ছাড়িতে। একবার ফিরিয়া দেখিল না, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিল না—দুলাল কোথায় গেল।

যাক—যেখানে গিয়াছে যাক্। একমাত্র ভাবনা অসুস্থ শরীর, এই ঘণ্টা কয়েক আগে কুমীরের সঙ্গে লড়াই করিয়াছে—জলের কুমীর—বনের বাঘ—গর্তের সাপ অপেক্ষমাণ যম। হোক ছোট—তবু তাকে যমই বলিতে হইবে। তাহার পরিচয় তো দুলালের কাঁধের নীচে পিঠের উপর ধারালো দাঁতের চিহ্ন বর্তমান, রক্তপাতে তো সে সত্য লেখা হইয়া রহিয়াছে। ঘরের বিছানায় রহিয়াছে, দাওয়া নিকানো হইয়াছে তবু লাল রক্তের দাগ মুছে নাই। ঘণ্টাখানেক পর হইতে তো অজ্ঞানের মত পড়িয়া ছিল। ভাবন ওইটুকু। কিন্তু সে ভাবনাও আর সে ভাবিবে না। যেখানে গিয়াছে যাক, যা হইবার হোক, সে খুঁজিবেও না, ভাবিবেও না।

এ কি বন্ধন, নাগপাশ; ভগবান তাহাকে নাগপাশে বাঁধিয়াছেন। সে পাশ যদি আজ নিজে ছাড়িয়া যায় যাক। কালনাগের বিষে শরীর তাহার জর্জর হইয়া গেল!

মহেশ মণ্ডল অগ্রসর হইয়া আসিল—বলিল—ভেবো না—মা-জী। সে বাগ্দী বুড়ীর বাড়ী গিয়ে উঠেছে। আমি ডাক্তার নিয়ে আসছি—পথে দেখি টলতে টলতে চলেছে। গিয়ে বাগ্দী দিদির দাওয়ায় শুয়ে বললে—আমাকে মরতে ঠাঁই দিবি একটুকু—বাগ্দী দিদি? •

ব্রজ বলিল—থাম মোড়ল। আমাকে আর শুনিও না, ওর নাম আমি শুনতে চাই না, ওর মুখ দেখতে চাই না। তুমি—। সে আরও কিছু বলিতে গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল।

বেচারী মহেশ বিষণ্ণ হাসিয়া মাথা হেঁট করিয়া সরিয়া আসিল।

নরোত্তম দাস বাবাজী হাসিয়া বলিলেন—থাক মহেশ। ব্রজ আজ অত্যন্ত দুঃখ পেয়েছে। সে বেশ ভালো আছে তো? ডাক্তার দেখানো হয়েছে? না, দেখালে না?

—হ্যাঁ। ওখানেই ডাক্তারকে নিয়ে দেখালাম। আমাকে দেখে ভয়ানক চীৎকার। ডাক্তারবাবুকে দেখে ঠাণ্ডা হল। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে খুব পরিচয় তো। ডাক্তার বললেন—ওর জন্যে দিন একটা দুটো আইডিনের তুলি আমাকে দিতে হয়। কিছু-না-কিছু ক'রে রক্তপাত করবেই ও। বেশ ক'রে ধুয়ে—ভাল করে বেঁধে-ছেঁদে দিলেন। বললেন—ভয় নেই।

—ভাল। সন্ধ্যেবেলা আমি নিজে গিয়ে ফিরিয়ে আনব।

—না। ব্রজদাসী ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

বাবাজী বলিলেন মহেশ মণ্ডলকে, মৃদুস্বরে বলিলেন—তাই তো মহেশ, ব্রজদাসীর জীবনটা অশান্তিময় করে দেবে বলে মনে হচ্ছে। ও ছেলে আর যে বাগ মানবে বলে মনে হচ্ছে না। তাই তো—আমরা—। বাবাজী কথা শেষ করিলেন না, কিন্তু যাহা বলিতে চাহিয়াছিলেন মহেশের কাছে সে অজ্ঞাত রহিল না।

মহেশ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। মৃদুস্বরেই সে বলিল—আমি কি বলব প্রভু ভেবে পাই না। ভগবান—। আর সে বলিতে পারিল না। কয়েক মুহূর্ত পর গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল—মা-জী ছিলেন, ওঁর সামনে আমি বলতে পারি নাই। চণ্ডালের মত কথাবার্তা বাবা। ভগবানকে কটুবাক্য। গোপাল বিগ্রহকে সে—।

চুপ করিয়া গেল মহেশ।

দুলাল চীৎকার করিয়া বলিয়াছে—আমি যাচ্ছি ম'রে—যন্ত্রণায় ছটফট করছি আর একটা মাটির ঠাকুর নিয়ে মা হয়ে যে মাতামাতি করে সে রাক্কুসী। মনে হয় ওই ঠাকুর—

শিহরিয়া উঠিয়া মহেশ দুলালকে বলিয়াছিল—না—না—না, ও কথা ব'ল না বাবা। বলতে নাই। ছি!

—ছি! বড় বড় দাঁত বাহির করিয়া দুলাল বলিয়াছিল—ছি! আচ্ছা—আচ্ছা! ঠাকুর বেঁচে থাক্। খুব ননী মাখন খাক। রাক্কুসী ওই মাটির ডেলা বুকে চাপিয়ে যাক স্বগ্যে। আমি ম'রে খালাস পাই।

বিষণ্ণ হাসিয়া উদাস দৃষ্টিতে বাবাজী আকাশের দিকে চাহিলেন। বলিলেন—আমিই দায়ী একরকম মহেশ। ছেলেটাকে যদি আমি—

—না। দায়ী আপনি নন প্রভু। দায়ী আমার অদৃষ্ট—আর দায়ী হতভাগার—।

—না—না—না। ওসব কথা তুমি মুখে এনো না ব্রজ। আর আমি বলছি আর একটু বয়স হ'লেই ও ঠিক হয়ে যাবে। এ বয়সটারই হ'ল ওই ধর্ম।

—না। ঠিক হবে না বাবা। এ বয়সের কথা বলছেন—মানলাম। কিন্তু ছেলেবেলায় সেই চার পাঁচ বছর বয়সে—কোন্ ধর্মে ও ছেলে ঠাকুরকে মন্দ কথা বলত—ভাঙতে যেত বলুন তো? জন্ম থেকে ওর ঠাকুরের উপর একটা আক্রোশ!

হঠাৎ ব্রজদাসীর ঠোঁট দুটি অবরুদ্ধ আবেগের তাড়নায় থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, কয়েক মুহূর্তের জন্য সে চোখ না বুজিয়া পারিল না, যেন মানুষের দিকে তাকাইয়া থাকিবার

মত শক্তির সম্বল শেষ হইয়া গিয়াছে। কয়েক মুহূর্ত পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে চোখ মেলিয়া মাটির দিকে চাহিয়া বলিল—এ কি আমার শাস্তি বলুন তো? আমার গোবিন্দ—আমার গোপাল—তাঁর উপর যার—

আবার তাহার ঠোঁট কাঁপিতে লাগিল—আর সে আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না, ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

বাবাজী হাসিলেন। এটুকু যেন তাঁর মুদ্রাদোষ। সুখেও হাসি—দুঃখেও হাসি। চোখে জল পড়ে—মুখে হাসি ফুটিয়া উঠে। সে হাসি যে দেখে তাহার কান্না পায়।

মহেশ মণ্ডল বোধ হয় আর সহ্য করিতে পারিল না—সে চলিয়া গেল।

ব্রজও চোখ মুছিয়া চলিয়া গেল রাত্রের অনুষ্ঠান আয়োজনের কাজে। উনান ধরিয়া উঠিয়াছে। ময়দা গুড় তালের মাড়ি সবই প্রস্তুত। তালের বড়াগুলি ভাজিয়া ফেলিতে হইবে। সে বুক বাঁধিয়াছে। জয় গোবিন্দ! গোবিন্দ থাকিতে দুঃখ কিসের? যার গোবিন্দ আছেন—তার সব আছেন।

রাত্রে নরোত্তম দাস বাবাজী গোপালের পূজা করিয়া জন্মাষ্টমীর কথা পাঠ করিতে বসিলেন। প্রথম প্রহরের পূজা পাঠ শেষ হইয়া গেল। বাবাজী বলিলেন—উপবাস করে আছ ব্রজ, এইবার তুমি একটু বিশ্রাম করো। ঘুমুতে নেই তবু একবার গড়াও।

—হ্যাঁ।

—আমি সন্ধ্যাতেও লোক পাঠিয়েছিলাম। সে ভাল আছে। একটু সকৌতুক হাসি হাসিয়া বলিলেন—কি বলেছে জান? বলেছে তোমরা কেন এসেছ হে বাপু? সেই গোপাল-ঠাকুরের সেবায়েত মহন্তিনীকে পাঠিয়ে দিয়ো। তার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে তবে যাব। নইলে আমি মরি সেও ভাল—কিছুতেই যাব না। কাল সকালে একবার যাবে, গেলেই চলে আসবে। গাড়ীর জন্যে—

বাধা দিয়া ব্রজদাসী বলিল—না।

বাবাজী হাসিলেন।

—আমি যাব না প্রভু। আমার বন্ধন কেটেছে—এ আমার উপর গোবিন্দের দয়া, আপনি প্রভু, গোপালের সেবার ভার থেকে আমায় মুক্তি দিন, আমি চলে যাই। পথ চলতে চলতে মাঝপথে বাঁধা পড়েছে, বাঁধন খুলেছে, আমি চলব—আর একবার চলব। এ বড় শাস্তি—এ বড় পাপ!

—ছি ছি ব্রজ! এ কথা বলো না। বলতে নাই।

—আছে। একশো বার আছে। আমি যে হাড়ে হাড়ে যন্ত্রণা পেয়ে বুঝলাম প্রভু।

—আজ এখন ও কথা থাক। কাল হবে।

—না আর না। সে অলস অবসাদে দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়া যেন এলাইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পর ভাদ্র মাসের অসহ্য গুমোট গরমে প্রায় অধীর হইয়া দাঁড়াইল। উঠানে নামিয়া পড়িল।

আঃ—ছি ছি! কি ওটা? একটা পাতা। কিসের পাতা? ছি ছি—আবার স্নান করিতে হইবে!

গামছাখানা টানিয়া ঘাড়ে ফেলিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। বাহিরে আসিয়া সে যেন বাঁচিল। তবু খানিকটা বাতাসের স্পর্শ যেন পাওয়া যাইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল পাতা ছোঁয়া পড়াটাও যেন ভাল হইয়াছে। ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া দেহখানা জুড়াইবার সুযোগ

মিলিয়াছে। সারাটা দেহ যেন জ্বালা করিতেছে। আগুনের আঁচে সব যেন ঝলসিয়া গিয়াছে। আশ্চর্য! ব্রজদাসী নিজেই একটু হাসিল। এক-একদিন কি যে হয় ভগবান জানেন! নহিলে এ আগুনের আঁচ আর কি এমন আঁচ! বাবাজীর আখড়ায় দোলের সময় যে সমারোহ হয় সে সমারোহকে ধনী জমিদার বাড়ীর বড় বড় যজ্ঞির সঙ্গে তুলনা করা যায়। বড় বড় জোল উনান কাটিয়া রান্না, একটা উনানে আটটা হাঁড়ি চাপে। ময়রার দোকানের উনানের মত উনানে ব্যঞ্জন রান্না হয়। সেই উনানে উদয়াস্ত রান্নার কাজ করে ব্রজদাসী। বাবাজী বলেন—ব্রজ, তোমার হাতের ব্যঞ্জন ছাড়া প্রভু তো ভোগে অমৃত স্বাদ পাবেন না! তুমি যে গোপালের সেবা কর, তুমি যে সাক্ষাৎ যশোমতী গো।

সাক্ষাৎ যশোমতী। নরোত্তম দাস বাবাজী হয়তো রহস্য করেন। এতদিন কথাটা মনে হইলে সে খুশী হইত। মনে মনে শিহরিয়া উঠিত। বার বার বলিত—বাবাজী স্নেহে অন্ধ। তিনি যা বলেন তার অপরাধ যেন তাহাকে স্পর্শ না করে। দুলালের যেন অমঙ্গল না হয়। আজ সে মনে মনে স্থির করিল এবার বাবাজীর কথার প্রতিবাদ করিবে। বলিবে—না—এমন রহস্য আর করবেন না প্রভু!

হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার পায়ের দুইপাশের ক্ষেতের ধান জড়াইয়া যাইতেছে; ভাবিতে ভাবিতে কখন সে মাঠে আসিয়া পড়িয়াছে। এ কি? স্নান করিতে কোথায় চলিয়াছে সে? এ যে গ্রাম পার হইয়া আউশের মাঠে আসিয়া পড়িয়াছে। ওই তো চাঁদরায়ের বাঁধ! বাঁধের ওপারে বাগ্দীপাড়া। কপালে তাহার কুঞ্চনরেখা জাগিয়া উঠিল। দুর্দান্ত লক্ষ্মী-ছাড়াকে একবার দেখিয়া আসিবে নাকি? ওই তো বাঁধের ওপারে খানকয়েক ধানক্ষেত পার হইয়াই—।

ছি! ছি! না—। কখনই যাওয়া উচিত নয় তার। যে ছেলে তাহার ইষ্টদেবতার অপমান করে—যে ভগবানকে অবহেলা করে—তাহার মুখ দেখা তাহার উচিত নয়। বন্ধন ছিঁড়িয়াছে ভালই হইয়াছে।

হঠাৎ অন্ধকার নিস্তব্ধ মাঠখানা যেন চমকিয়া উঠিল। কাহার কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

—ওরে! ওরে!

কে কাহাকে ডাকিতেছে? চেনা গলা!

—ওরে অ দুলালে! শুনছিস?

—আ—প!

—ও—এই শরীর নিয়ে যাবি কোথা? তোর মাকে আমি বলব কি?

—বলিস মরে গিয়েছি!

—ওরে হতভাগা, মরবি তো এইখানে মর না কেনে? মরতে যাবি কোথা?

—আমি চল্লাম আপনার আস্তানায়। বাসের আড্ডায়। সেইখানেই মরব।

—অ দুলালে—ওরে—অ।

বাগ্দী বুড়ী চীৎকার করিতেছে। দুলাল বুড়ীর ঘর হইতেও চলিয়া যাইতেছে। বাসের আড্ডায় চলিয়াছে। নিতান্ত দুর্মতি না হইলে এমন ইচ্ছা মানুষের হয় না। ক্রোশ-দেড়েক পথ যাইতে হইবে। এত রক্তপাত হইয়াছে তবুও ভ্রূক্ষেপ নাই দুর্দান্তের!

ওই চাঁদ রায়ের বাঁধের পাশ দিয়া দুর্দান্ত আসিতেছে। ব্রজদাসী শক্ত হইয়া দাঁড়াইল। পরমুহূর্তে ই ধান ভরা ক্ষেতের মধ্যে বসিয়া পড়িয়া আত্মগোপন করিল। যাক, তাহাকে দেখিতে

পাইলে দুর্দান্তটা ভাবিবে সে তাহারই খোঁজে আসিয়াছিল!

বিড় বিড় করিয়া বকিতে বকিতে দুলাল চলিয়াছে।

—যাব, চলেই যাব। যাবার পথে তোর সঙ্গে একবার বোঝাপড়া করে তবে যাব। হাঁ বোঝাপড়া করব—ভাল ক'রে বোঝাপড়া করব—শেষ বোঝাপড়া করব। ই—তুইও বেজ বষ্টুমী—আমিও বাবা বিরিজ নন্দন—হাঁ—হাঁ—

—কি বোঝাপড়া করবি? বলি দাঁত কিস্ কিস্ ক'রে বোঝাপড়া করবি বলে তুই যে ফাঁকা মাঠে সাপের মত গজরাচ্ছিস—তা আমার সঙ্গে তোর বোঝাপড়ার আছে কি? ব্রজ আর থাকিতে পারিল না, ধানক্ষেতের মধ্য হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কথাগুলি বলিয়া উঠিল। রাগে আক্ষেপে অভিমানে কণ্ঠস্বর তাহার বিচিত্র। স্পর্শ তাহার সুস্পষ্ট।

দুলালও চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছিল।

ভয় দুলালের নাই। ভয় সে পায় নাই। অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতার বিস্ময়ে সে চমকিয়া উঠিল। এই মাঠের মধ্যে অন্ধকার রাত্রে কোথা হইতে আসিল রাক্ষসী? পরমুহূর্তেই সে বিস্ময় কাটাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—যাব না, আমি যাব না তোর বাড়ী! কেন এসেছিস তুই? আমি চলে যাব। যেদিকে মন যায় আমি চলে যাব।

—আমি তোকে নিয়ে যেতে আসি নাই। আমি এসেচি চান করতে।

—চান করতে? আমি বুঝি না কিছু? চান করতে এসেছিস মাঠে—ধানক্ষেতে চান করতে এসেছিস?

—ধানক্ষেতে নয় রে মুখপোড়া—চাঁদ রায়ের বাঁধে—

—চাঁদ রায়ের বাঁধে! গাঁয়ে এত পুকুর থাকতে, ঘরের দোরে বউকীর ঘাট থাকতে—চাঁদ রায়ের বাঁধে? যা যা—তুই চলে যা, আমি যাব না—

পিছনের অন্ধকার হইতে বাগ্দীবুড়ী বলিল—ওই দেখ মা—ওই দেখ। কি বজ্জাদ কি নেমকহারাম তোমার ছেলে মা! আমার ঘরে এল—বলে—'আমাকে মরতে টুক্‌চে ঠাঁই দিবি!' আমি বলি—ষাঠ্, ষাঠ্, ষাঠ্—মরবি কেনে ভাই। বলে—অমন যার মা—তার মরণই ভাল! রাক্ষুসী—ডাকিনী—সে মা কত যে বললে—সে আর কত বলব! তা'পরেতে মা—মোড়ল ডাক্তার আনলে—ডাক্তার দেখলে—চলে গেল; হঠাৎ সনদে থেকে আমাকে গাল পাড়তে লাগল। বলে—কি বিছেনা দিয়েছিস, আমার সর্বাঙ্গে ফুটছে। বলে—কি গন্ধ তোর ঘরের! খেতে দিলাম দুধ। তা' বলে—আমি কি গরুর বাছুর যে দুধ খাব আমি? বললাম—হা রে যখন ছোট ছিলি তখন আমি ভাত দিয়েছি—খেয়েছিস—এখন বড় হয়েছিস—আজ তোকেও জাতবিচার করতে হবে—আমাকেও করতে হবে। আমি কি বলে ভাত দোব? আর ভাত খেলে—খারাপ হবে যে। ডাক্তার কি বলে গেল? বলে, মা—আমাকে যত গালাগাল ডাক্তারকেও তত গালাগাল।

দুলাল আর সহ্য করিতে পারিল না—চীৎকার করিয়া উঠিল—বেশ করেছি—খুব করেছি। তিনকুলখাগী বুড়ী মরণ নাই তোর, আমি বলছি—তোর মরণ কোন কালে হবে না। পঙ্গু হবি—হাত পা পড়ে যাবে, তুই পড়ে থাকবি আর চিঁ চিঁ করে চেঁচাবি—এ'ক মুঠো ভাঁত এ'ক টুঁকুন জল—

বুড়ীও চীৎকার করিয়া উঠিল—ওরে—ও তিরদশে—ওরে ও বাঁশবুকো—ওরে ও যমের অরুচি—

ব্রজদাসী আবার ছুটিয়া আসিয়া বুড়ীর হাতে ধরিল—আমি তোমার হাতে ধরছি—আমি

তোমার কাছে ঘাট মানছি—তুমি আমার মায়ের মত। বড় যত্ন করেছ একদিন—তোমাকে ও ভালবাসে—

—না ওকে আমি ভালবাসি না। এক মুঠো ভাত চাইলাম—তা' দিলে না।

হাসিয়া ব্রজদাসী বলিল—রাত্রে ভাত না হলে ওর পেট ভরে না মা, সে তুমি লুচি পুরি মিষ্টি রাজভোগ দাও না কেন—ঠেলে ফেলে দিয়ে বলবে—ভাত দে—ভাত! দুধ দিলে বলবে—আমি কি গরুর বাছুর? লুচি পুরি দিলে বলবে—আমি কি বামুনের বিধবা?

দুলাল চীৎকার করিয়া উঠিল—তোর কি? তাতে তোর কি? আমার যা রুচি হবে তাই খাব। তোর ওই গোপালের লুচি পেসাদ যদি না খাই আমি! ননী ছানা যদি মুখে না রোচে আমার?

ব্রজদাসী এবার গর্জিয়া উঠিল—দুলাল!

—কি? দুলাল কাউকে ভয় করে না।

বাগ্দীবুড়ী এবার হাতজোড় করিয়া বলিল—হেই মা হেই—ভাই, আর তোমরা রাত-দুপুরে ঝগড়া ক'র না। আর আমার বুড়ো বয়সে এইখানে দাঁড়িয়ে থাকবার ক্ষমতা নাই। দোহাই তোমাদের। যাও বাড়ী যাও। তাই দাও গে মা—একটু একমুঠো ভাত ফুটিয়ে দাও গে।

ব্রজ বলিল—না মা, ওকে বলতে হবে, ঠাকুরকে এমন কুবাক্য বলবে না। তা নইলে—

—তা নইলে—

ব্রজ যে কি করিবে সে কথা ভাবিয়া পাইল না, দুলালও তাহাকে ভাবিবার সে সময় দিল না—দাঁত বাহির করিয়া তর্জনী নাড়িয়া আস্ফালন করিয়া বলিল—তোকেও বলতে হবে, ঠাকুরের পেসাদ খা, 'চরণোদক' খা, উপোস কর—এই সব বলে জ্বালাবি না। তুই মা—তোর ঠাকুর, সেই খাতিরে পেনাম সকাল সনধে করব—এই পর্যন্ত। হ্যাঁ। আর আমি মরব—আর তুই ঠাকুরের ছামনে গিয়ে তে—নে—নে ক'রে গান ধরবি—তা' হবে না।

—ওরে হতভাগা—

—খবরদার বলছি রাক্কুসী—খবরদার—হতভাগা আমাকে বলবি না তুই! কিসের লেগে হতভাগা হ'তে যাব আমি? হতভাগা! তুই হতভাগী, তুই কপালখাগী! তুই হতচ্ছাড়ী!

বুড়ী হাসিয়া ফেলিল—বলিল—আচ্ছা ভাই আচ্ছা—তুমি ভাগ্যিমান পুরুষ—তুমি—

—নিশ্চয়! হতভাগা! হতচ্ছাড়া! খবরদার ওসব বলবি না আমাকে!

—বেশ বলব না। চল—বাড়ী চল।

—ভাত দিতে হবে।

—দোব।

—তবে ধর আমাকে।

—ধরতে হবে? এই যে এখুনি চলে যাচ্ছিলি—বাসের আড্ডায়—পাকা দেড় কোশ পথ!

—না পারতাম রাস্তায় মরে পড়ে থাকতাম। কাল সকালে খবর পেয়ে গিয়ে বুক চাপড়ে কাঁদতিস—ওরে দুলাল বাবারে—

—ঠাস ক'রে এক চড় দোব তোর মুখে।

—তবে ধর না কেন আমাকে!

ব্রজদাসী হাসিবে, না কাঁদিবে—ভাবিয়া পায় না। সেই রাত্রে আখড়ায় ফিরিয়া ভাত চড়াইয়া দিল। ভাত নামাইয়া সে যখন দুলালকে ডাকিল তখন কিন্তু দুলাল সাড়া দিল না।

অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। গায়ে হাত দিয়া ডাকিতে গিয়া সে চমকিয়া উঠিল।—গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে।

জ্বর আসিয়াছে। প্রায় বেহুঁশ হইয়া পড়িয়াছে। চোখ মেলিবার চেষ্টা করিয়াও চোখ মেলিতে পারিতেছে না।

চার

দুই মাস পর দুলাল চোখ মেলিল।

দুই মাসের মধ্যে তাহার চেতনা ছিল না। লাল চোখ মেলিয়া বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া প্রলাপ বকিয়াছে। কুমীরের দাঁতের ক্ষতের প্রদাহ—তাহার সঙ্গে কোন জ্বরের বিষ দুই মিশিয়া রোগের একটা জট পাকাইয়া উঠিয়াছিল। সে প্রায় যমে মানুষে টানাটানি।

দুই মাস ব্রজদাসী মাথার শিয়রে বসিয়া শুধু গোপালকে ডাকিয়াছে। তাহার দৃঢ় ধারণা—গোপালের প্রতি অবজ্ঞার অপরাধের দণ্ড নামিয়া আসিয়াছে অমোঘ বিধানে। ডাক্তার দেখানোর ত্রুটি ছিল না, নরোত্তম দাস বাবাজী সে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—মহেশ মণ্ডল দিবা-রাত্রি ডাক্তারের নির্দেশমত ওষুধ খাওয়াইয়াছে সেবা করিয়াছে; ব্রজদাসী শুধু চরণোদকের পাত্র লইয়া শিয়রে বসিয়া তাহার প্রভুকে ডাকিয়াছে আর যখন দুলাল জল চাহিয়াছে তখনই চরণোদক মুখে দিয়া তবে জল দিয়াছে।

আশ্চর্য দুলালের চরিত্র, চরণোদক মুখে দিলেই সে মুখ বিকৃত করিয়াছে। বলিয়াছে—আঃ!

অল্প জ্ঞান যখন ফিরিল—তখন বলিয়াছে—আঃ কি জল! গন্ধ। মিষ্টি। আঃ! ওষুধ আর দিয়ো না! আঃ!

ফুল এবং নৈবেদ্যে মিষ্ট আস্বাদ রোগের মধ্যেও তাহার বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছে।

ব্রজদাসী সকাতরে মনে মনে প্রার্থনা জানাইয়াছে—ক্ষমা করো। অবোধ অজ্ঞান!

দুই মাস পর ভোরবেলা সেদিন দুলাল অকাতরে ঘুমাইতেছিল। মধ্যরাত্রি হইতে কেমন নিঝুম হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রজ ভাবিতেছিল অন্যরূপ। বাহিরে মহেশ মণ্ডল শুইয়াছিল, শঙ্কিত হইয়া ব্রজ তাহাকে ডাকিল—মোড়ল!

মহেশ নাড়ী দেখিতে পারে। পল্লীগ্রামে মণ্ডলদের এ বিদ্যাটি অবশ্যই জানিতে হয়। মহেশ এ বিদ্যাটি ভাল করিয়াই শিখিয়াছিল। সে সন্ধ্যা হইতেই ব্যাপারটা অনুমান করিয়াছিল। সাতদিন আজ, জ্বরের মাত্রা ক্রমশঃ কম হইয়া আসিতেছে। আজ জ্বর অল্পই আছে সমস্ত দিন। হয়তো ডাক্তারী যন্ত্র থারমোমিটারের হিসাবে একশো, কি—কিছু বেশী হইবে।

ব্রজদাসীর শঙ্কিত আহ্বানে বিস্মিত হইয়া সে উঠিয়া বসিল—প্রশ্ন করিল—কি—মা—কী?

—একবার দেখ দিকি। এ যে—শাকগাছটার মত নেতিয়ে পড়েছে।

মহেশ উঠিয়া আসিয়া নাড়ী দেখিয়া—মৃদু হাসিয়া বলিল—ভয় নাই। নাড়ী ঠিক আছে, চমৎকার আছে। জ্বরটা আজ ত্যাগ করবে। ঘুমুচ্ছে—সুস্থ হচ্ছে কিনা! কোন ভাবনা করো না।

—ঠিক বলছ ?

হাসিয়া মহেশ বলিল—ভাবনার কিছু থাকলে—আমি এমন করে হেসে কথা বলতে পারি মা-জী ? কোন চিন্তা নাই। তুমি ঘুমাও; আমি বলছি। আমি বরং থাকি।

—না।

ব্রজদাসী তবুও নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। মহেশ মণ্ডল যাহা বলিয়াছে—সে-কথা সে অবিশ্বাস করে না, মহেশের কথা অবিশ্বাস করা যায় না, তবুও দুর্দান্ত দুলাল—এমন নিস্তেজ হইয়া গেল কেন ? মৃত্যু, সে বড় রহস্যপূর্ণ; বিচিত্র তাহার গতি-বিধি; তাহাকে চেনা যায় না, জানা যায় না, কখন কোন্ দিক হইতে কেমন ভাবে অতর্কিত একটি ফুৎকারে প্রদীপ নিভাইয়া দেওয়ার মত মানুষের জীবন শেষ করিয়া দেয় কেউ বলিতে পারে না। সে দুলালের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

কার্তিক মাস—শীতের আমেজ পড়িয়াছে, শেষরাত্রে কাপড়খানা ভাল করিয়া টানিয়া গায়ে দিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়াছিল; বাহিরটা নিস্তব্ধ—অতি মৃদু একটা সন্‌সন্ শব্দ—আর তাহার সঙ্গে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাইতেছে।

—মা!

ব্রজদাসী চমকিয়া উঠিল; দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে—কখন চোখের পাতা দুইটি আপনি নামিয়া আসিয়া জুড়িয়া গিয়াছে; তন্দ্রা আসিয়াছিল। ক্ষীণ দুর্বল কণ্ঠে দুলাল এই মুহূর্তটিতেই ডাকিল—মা!

ব্রজদাসী বিস্ফারিত নেত্রে দুলালের দিকে চাহিল—বুকের ভিতরটায় যেন পাহাড়ের চূড়া হইতে পাথর খসিয়া গড়াইয়া চলিয়াছে—সব গুঁড়াইয়া দিতেছে। দুলাল আবার ডাকিল—মা!

দুলালের চোখ দুইটি শরতের আকাশের মত ঘোর-মুক্ত—পরিচ্ছন্ন, মালতী ফুলের পাপড়ির মত শুভ্র প্রসন্ন; ব্রজদাসীর মুখের পানে—গাঢ় অনুরাগে একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকার মধ্যে চৈতন্য প্রদীপ শিখার মত জ্বলিতেছে। ব্রজদাসী দুলালের কপালের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া গাঢ় আবেগে আপনার ঠোঁট দুটি চাপিয়া ধরিল। শীতল স্নিগ্ধ কপালখানি! সে ডাকিল— দুলাল!

দুলাল এবার দুই হাত তুলিয়া মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিল।

ব্রজদাসী অঝোরঝরে কাঁদিতেছিল।

দুলাল বলিল—কাঁদিস না। বড় অসুখ করেছিল আমার—নয়!

ব্রজদাসী শুধুই কাঁদিল, কথার উত্তর দিতে পারিল না।

দুলাল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—সেই আমাকে কুমীরে ধরেছিল, জন্মাষ্টমীর দিন। সেই আমি বাগ্দীবুড়ীর বাড়ী গিয়েছিলাম রাগ ক'রে। হুঁ। ওঃ! আচ্ছা—সেই কুমীরটাকে মেরেছিলাম—সেটা কি হ'ল ? তার চামড়াটা ?

—তার চামড়াটা! এবার ব্রজ চোখ মুছিয়া হাসিল।

দুলাল বলিল—তার চামড়াটা যদি নষ্ট হয়ে থাকে তো ভাল হবে না।

—আচ্ছা পাগল তুই কিন্তু দুলাল!

—কেন ?

—তোর এই অসুখ—যমে-মানুষে টানাটানি—আমি তোকে দেখব—না—তোর কুমীরের চামড়ার ব্যবস্থা করব ? তা ছাড়া বাবা—বৈষ্ণবের ঘর—গোপালের আশ্রম, এখানে কি ওসব চামড়াটামড়া নিয়ে—অনাচার করতে পারি ?

দুলাল আজ কিন্তু ফোঁস করিয়া উঠিল না। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—ওঃ—বেটার মেছো কুমীর—আমার পিঠে দাগ করে দিলে, আর—

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া গভীর আক্ষেপ করিয়া বলিল—কুমীরের চামড়ায় আচ্ছা জুতো হয়। মিলিটারী বেটাদের কাছে বিক্রী করলে—ওঃ—সে মেলাই টাকা হত।···আচ্ছা—পচে-খসে একটুকুও পড়ে নাই? বেটার দাঁতগুলো কি হল? দাঁতগুলো!

—সে আমি জানি না দুলাল, আমাকে আর জ্বালাস না।

—সকাল হোক, আমি দেখব—কিছু-মিছু পড়ে আছে কিনা।

ব্রজ শিহরিয়া উঠিল।—তুই উঠবি! উঠতে পারবি?

—তা পারব। তুই ধরবি আমাকে। তা পারব? সে কনুইয়ে ভর দিয়া তখনই উঠিবার চেষ্টা করিল।

তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া ব্রজ বলিল—খবরদার দুলাল! ওরে আজ দু'মাস তুই বিছানায় শুয়ে আছিস! জ্ঞান ছিল না!

—দু—মা—স! দুলালের চোখ দুইটা বড় হইয়া উঠিল। লে বাবাঃ! আঃ—তা' হ'লে আমার চাকরিমাকরি কিছুই নাই আর!

—না থাকে নাই—তার জন্যে দুঃখু করেও কাজ নাই। তুই এখন সেরে ওঠ!

একটু নীরব থাকিয়া ব্রজ আবার বলিল—নিজে এত দুঃখ পেলি বাবা, আমাকে এত দুঃখ দিলি—আজ দু'মাস ঠায় তোর শিয়রে বসে আছি—প্রতিক্ষণে মনে হয়েছে আমার চন্দ্র-সুয্যি যেন এই নিভে গেল, এতেও যদি তোর জ্ঞান না হয় দুলাল—তবে আর তোকে কি বলব আমি, বল? তুই বৈষ্ণবের ছেলে, ঘরে গোপালজীর সেবা, তুই তাঁকে মানিস না, তাঁর সেবাতে তোর মন নাই, কলকারখানা, কোথায় মটর, কোথায় হাঙ্গামা-হুজ্জোত—এই নিয়ে তোর মাতামাতি! ওরে—এসব তোর সইবে কেন? তুই ভাল হয়ে ওঠ,—নিজের ধম্মে থাক বাবা, আমার প্রাণটা জুড়োক—তোর মঙ্গল হবে—ভাল হবে।

ব্রজদাসীর কণ্ঠস্বরে সে কি কাকুতি! দুলালের মনে হইল মান-গোবিন্দপুরের বাজারের ভিক্ষুক মেয়েগুলোর ভিক্ষা চাওয়ার মধ্যেও এমন কাকুতি থাকে না, তাহাদের কণ্ঠস্বরও এমন সকরুণ নয়! কালাপাহাড় দুলাল, দানো দুলাল তাহার চোখও সজল হইয়া উঠিল—সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া চোখ বুজিল।

ব্রজদাসী তাহার কপালে হাত বুলাইতে লাগিল।

সকাল বেলা চোখে আলো লাগিয়া দুলালের ঘুম ভাঙিল। আবার সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ব্রজদাসী উঠিয়া স্নান সারিয়াছে; দুই মাস পর আজ পরিপাটী করিয়া গোপালের ঘর মার্জনা করিয়া ধুইয়া মুছিয়া একটি প্রসাদী করবী ফুল লইয়া দরজা খুলিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেই দুলালের ঘুম ভাঙিল। মাথার শিয়রে বসিয়া ব্রজ বলিল—মনে মনে গোপালকে প্রণাম কর বাবা! আশীর্বাদী দোব।

দুলাল মায়ের মুখের দিকে চাহিল। একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

এমন নিষ্পলক দৃষ্টি দেখিয়া ব্রজদাসী শঙ্কিত হইয়া ডাকিল—দুলাল! তাহার ভয় হইল, আবার রোগের কোন নূতন উপসর্গ দেখা দিল নাকি!

দুলাল ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে উত্তর দিল—কি?

—এমন ক'রে চেয়ে রয়েছিস কেন বাবা?

—তোর কি চেহারা হয়েছে! তোরও জ্বর হচ্ছে নাকি?

ব্রজ কাঁদিয়া ফেলিল—সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট দুইটির প্রান্তে প্রান্তে বিচিত্র হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

দুলাল বলিল—এঃ, মুখখানা কালিমাখা হয়ে গিয়েছে!

—হোক। নে, এখন আশীর্বাদ নে। গোপালকে মনে মনে প্রণাম কর।

দুলাল প্রতিবাদ করিল না। হাতদুইটি কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিল। ব্রজদাসী ফুলটি কপালে ঠেকাইয়া দিয়া বলিল—মনে মনে বল—আমার অপরাধ হয়ে থাকলে—তুমি মার্জনা কর!

—এই দেখ! এত সব আমি বলতে পারব না।

—না—তোকে বলতে হবে! জানিস—উনিই তোকে বাঁচিয়েছেন? ডাক্তার বদ্যির সাধ্যি ছিল না।

—এই দেখ!

—নইলে আমি মাথা খুঁড়ব তোর পায়ে!

—মাথা খুঁড়বি?—আমার পায়ে?

—হ্যাঁ। আমার যে কথা সেই কাজ! বল—

—আচ্ছা। তাই বলছি।

—বল।

—বলেছি। মনে মনে বলেছি।

—না—আমাকে শুনিয়ে বল।

—সে—আমি পারব না। কক্ষনো না।

ব্রজদাসী বলিল—তোকে পারতে হবে দুলাল। আমাকে জিজ্ঞেসা করছিলি—আমার চেহারা এমন হ'ল কেন? আমার জ্বর হচ্ছে কিনা? জ্বর নয়—জ্বালা, তোর শিয়রে দু'মাস জেগে বসে থেকেছি আর দুশ্চিন্তার জ্বালায় জ্বলে আমার এই অবস্থা হয়েছে। তুই বিশ্বাস কর—ঘরের কোণে কোণে,—আমার মনে হ'ত, কালো-কালো কি দাঁড়িয়ে থাকত, ভয় পেতাম, গোপালকে ডাকতাম আর কাঁদতাম;—সঙ্গে সঙ্গে দেখেছি—ছায়াগুলো মিলিয়ে যেত। তোকে বলতে হবে। বল।

দুলাল কেমন হইয়া গেল। সে হাত জোড় করিয়া মৃদুস্বরে কথাগুলি বলিয়া গেল। শেষ করিয়া সে লজ্জায় সারা হইয়া গিয়া বলিল—ধেৎ! বললাম—মনে মনে বলেছি। তা মানবে না। এইসব আবার মুখ ফুটে বলা যায় নাকি?

সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

ব্রজদাসী হাসিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অন্ন-পথ্যের দিন ব্রজদাসী প্রথমেই দুলালের হাতে তুলিয়া দিল—গোপালের নৈবেদ্যের একটি আতপ-কণিকার প্রসাদ। বলিল—আগে প্রসাদ মুখে দে! প্রসাদী হাত মাথায় বুকে পেটে বুলিয়ে নে।

দুলাল ভক্তি সহকারেই প্রসাদ-কণিকা লইয়া - ভাতের থালাটি টানিয়া লইল। পুরানো মিহিচালের ভাত, নিরামিষ ঝোল একটু। দুলালের মনে হইল অমৃত।

ব্রজদাসী ছোট একটি পাথর বাটীতে একটু আমসত্ব গুলিয়া নামাইয়া দিল। বলিল—বাতাস দেব ভাতে? গরম রয়েছে অনেকটা!

দুলাল চোখ বুজিয়া রসাস্বাদন করিয়া খাইতেছিল। সে এ কথার জবাব না দিয়া হঠাৎ

বলিল—বুঝলি মা, অনেক ভাবলাম এ ক'দিন।

—কি?

—তোর কথাই শুনব। বুঝলি!

ব্রজদাসী কথাটা ঠিক ধরিতে পারিল না, তবুও তাহার মন এ কথায় যেন আনন্দে ডগমগ করিয়া উঠিল। ছোট এতটুকু কথা, কিন্তু আজ ব্রজদাসীর কাছে কথাটা অনেক। দুলাল আজ অন্নপথ্য করিতেছে, মন তাহার প্রসন্ন হইয়াই ছিল, সেই প্রসন্নতার উপরে আনন্দের স্পর্শ যেন দীঘির শান্ত কালো জলে দক্ষিণা বাতাসের প্রবাহে হিল্লোল বহাইয়া দিল। আলোর ছটায় একটা ঝিকিমিকি তুলিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। কৌতুক-চঞ্চল হইয়া ব্রজদাসী কথাটা সঠিক না বুঝিয়াও ছেলেকে ঠাট্টা করিয়া বসিল—বলিল—আঃ—হায়—হায়—রে! সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেলিতে ভুলিল না।

দুলাল সবিস্ময়ে ভ্রূ কুঁচকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি?

আবার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ব্রজদাসী বলিল—আর আমি বাঁচব না! বুঝতে পারছি দিন আমার ফুরিয়েছে! এইবার আমি মরব।

—কেন? মরবি কেন? হ'ল কি যে মরবি?

—তুই যে আমার কথা শুনবি! আর আমি বাঁচি? এত সুখ আমার ভাগ্যে ভোগ করা আছে?

দুলাল রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিল। সে কোন কথা না বলিয়া গ্রাসের পর গ্রাস মুখে তুলিয়া চলিল।

ব্রজদাসী হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ পরে দুলাল বলিল—যা—তবে তোকে আমি বলব না কথাটা!

—কথা শুনবি মায়ের তার আর বলবি কি?

—বলতাম। তা' আর বলব না। তোর ভারী বাড় বেড়েছে। সব তাতেই ঠাট্টা।

—আচ্ছা—আচ্ছা। আর ঠাট্টা করব না। কি বলছিলি বল।

—না। কিছুতেই বলব না।

ব্রজদাসী খুব গ্রাহ্য করিল না। এ কথা দুলালের মুখে তো নতুন নয়। রাত্রি করিয়া বাড়ী ফেরা লইয়া মায়ে-পোয়ে ঝগড়া দুই-চারিদিন অন্তর নিয়মিতই হইয়া থাকে। ব্রজ যেদিন কাঁদে—সেদিন দুলাল ওই কথাই বলে—আচ্ছা—আচ্ছা। তোর কথাই শুনব। সকাল-সকালই বাড়ী ফিরব। দিন তিনেক, বড় জোর চার পাঁচ দিন সকাল সকাল ফিরিয়া আবার সেই যথা-নিয়মে এক প্রহর রাত্রি শেষ করিয়া বাড়ী ফিরিতে শুরু করে দুলাল। ব্রজদাসী এঁটো বাসন লইয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। দুলাল রাগ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরেই চেঁচামেচি শুরু করিয়া দিল।—আমার পকেটে যে সিগারেট ছিল কি হ'ল? নতুন বাক্স ছিল। জন্মাষ্টমীর দিন ঘরে থাকব বলে কিনে এনেছিলাম। কি হ'ল?

ব্রজ আসিয়া কুলুঙ্গী হইতে ন্যাকড়ার একটা মোড়ক খুলিয়া বাক্সটা বাহির করিয়া দিয়া বলিল—এই নাও বাবা। ও জিনিস তোমার নেবে কে? বর্ষার বাতাস লেগে মিইয়ে যাবে বলে—আমি ন্যাকড়ায় জড়িয়ে রেখেছিলাম।

দুলাল এবার খুশী হইয়া উঠিল। রাগটাও তাহার খুব অকৃত্রিম ছিল না। রাগের কথাও কিছু ব্রজদাসী বলে নাই, তবে দুলালকে লজ্জা দিয়াছিল, লজ্জা পাইয়াই দুলাল রাগ করিয়া সে লজ্জা ঢাকিতে চাহিয়াছিল। এবার সে খুশী হইবার সুযোগ পাইয়া—খুব বেশী রকমে খুশী হইয়া

উঠিল, মায়ের হাতখানা ধরিয়া টানিয়া বলিল—লক্ষ্মী মা রে আমার—লক্ষ্মী মা!

—ছাড়—ছাড়।

—ব'স—ব'স—। শোন সেই কথাটা।

—বল্।

—অনেক ভেবে দেখলাম—এ—কদিন। বুঝেছিস! তোর কথাই ভাল। বোষ্টুমের ছেলে—নিজের জাত-ধর্ম মেনেই চলা উচিত। ও ভগবান বল্ ভূত বল্ বুঝলি কিনা—আছে বললেই আছে—নাই বললেই নাই।

ব্রজ ছেলেকে আর বলিতে দিল না, গভীর আবেগে তাহার মাথাটা বুকে চাপিয়া ধরিল।

—আঃ, আমাকে বাঁচালি বাবা, আমাকে বাঁচালি!

দুলাল আনন্দে হাসিল। স্বভাব মত হা-হা—করিয়া হাসিল না, নিঃশব্দে হাসিল।

ব্রজ বলিল—দেখবি, তোর ভাল হবে। পরে বুঝতে পারবি।

আবার বলিল—ভগবান—গোবিন্দ—শ্যাম—ওঁর চরণ ছাড়া আশ্রয় আছে আর?

আবার বলিল—ভগবান আছেন। নাই—একথা যে বলে তার চেয়ে দুর্ভাগা আর নাই দুলাল! মা-মরা ছেলেও তো সংসারে বাঁচে। সংসারে যারা ভগবান মানে না—তাদের বাঁচা ওই মা-মরা ছেলের মত বাঁচা!

কথাটা বলিয়াই ব্রজদাসী শিহরিয়া উঠিল। বলিয়া উঠিল—গোবিন্দ গোবিন্দ! জয় রাধে গোবিন্দ!

দুলাল বলিল—তুই তা হলে মরে ছিলি এতদিন? আজ বাঁচলি!

দুলাল ব্রজদাসীর মুখের দিকে চাহিল।

—আমি তো জানতাম না এতদিন ভগবানকে! এতদিন তা হ'লে ভূত হয়ে ছিলি। আজ আবার বাঁচলি!

ব্রজ হাসিল। বলিল—হ্যাঁ। সে নামের যে গুণই ওই। 'নামের গুণে গহন বনে মৃততরু মুঞ্জরে।'

দুলাল হঠাৎ বলিল—আমি কিন্তু সিগরেট খাব। বলতে পাবে না বষ্টুমের ছেলে খেতে নাই।

—না রে না। তা বলব না। বৈষ্ণব মহান্তেতে গাঁজা খায়। খেতে বারণ শুধু মদ।

—তা জানি। তবে তোমার ওই গুরুটি, ওই নরোত্তম দাস বাবাজী ওটি যে কঠিন লোক। উনি যে পান পর্যন্ত খান না। তার চেলা হয়েছ—বিশ্বাস কি—কোন দিন বলতে পার।

—না তা বলব না। ব্রজ হঠাৎ ছুটিয়া গেল, চড়াই পাখীর ঝাঁক নামিয়া পালংশাকের কচি পাতাগুলি কাটিতে শুরু করিয়াছে।—ওরে বাপ্ রে—বাপ্ রে।

ব্রজ ছুটিয়া ছুটিয়া ছোট মেয়েটির মত চড়ুই পাখী তাড়াইয়া বেড়াইতে লাগিল। মনের আনন্দ আজ তাহার আগুন দেওয়া তুবড়ির ফুলের মতই উচ্ছ্বসিত বেগে উপরে উঠিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে রূপালী সোনালী ফুলের মত।

সন্ধ্যায় দুলালকে সে আসরে নিজের পাশে লইয়া বসিল। আরতির সময় তাহার হাতেই দিল কাঁসর। দুলাল বিপদে পড়িল। ব্রজদাসীর ছেলে হইয়াও তাহার তাল-জ্ঞান নাই। কোনমতেই ঠিক সময় সমান রাখিয়া ঘা মারিতে পারে না।

মহেশ হাসিল। কাঁসরখানা দুলালের হাত হইতে লইয়া গোবিন্দ পালের হাতে দিল।—বাজাও। ও আমারই মত তালকানা!

আরতির শেষে কীর্তন গানের সময়ও ব্রজদাসী তাহাকে পাশে লইয়া বসিল। গানের সময় দুলাল মায়ের পাশে থাকিতে ভালবাসে। গান তাহার আসে না, কণ্ঠস্বর কর্কশ, তাল-জ্ঞান নাই—তবু ব্রজদাসী গাহিলে সে নীরব হইয়া শোনে—আর আপন মনেই দোলে, এ দোলাটা কিন্তু ঠিক তালে তালে দুলিয়া যায় সে, বিন্দুমাত্রও ভুল হয় না।

গান শেষ হইলে ব্রজদাসী মহেশ মণ্ডলকে বলিল—তুমি একটু থেকে যেয়ো মোড়ল। আমার ক'টা কথা আছে।

সকলে চলিয়া গেলে ব্রজ গোপালের মন্দিরের দরজায় বসিয়া বলিল—দুলাল আমার কাছে কথা দিয়েছে মোড়ল—সে আর ওসব বাস-টাসের চাকরি করবে না।

মহেশ বলিল—আমি তো অনেক আগেই বলেছি মা-জী, ওই দিকেই যখন ওর মতি তখন চাকরি না করে—একখানা বাস কিনে—

—না মোড়ল। দুলাল আমার ভগবানের সেবাই মাথায় তুলে নেবে। ওসব চাকরি ছেড়ে দেবে, এখন আখড়াতে আমার কাছেই কিছুদিন সেবার খুঁটিনাটি শিখুক, তারপর মান-গোবিন্দপুর পাঠিয়ে দেব—কি নবদ্বীপে পাঠিয়ে দেব—সেখানে দীক্ষা নিয়ে পড়াশুনো করে ফিরবে। কিন্তু তার আগেই আমি ওর বিয়ে দিতে চাই মোড়ল—

বিয়ে? দুলালের—! মহেশ যেন কথা বলিতে গিয়াও পারিল না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল। ভগবান তোমার ইচ্ছাই সব।

ব্রজ বলিল—না, ওসব কথা শুনব না আমি। ভাল একটি মেয়ে দেখে মালাচন্দনের ব্যবস্থা কর। ওকে আমি ভাল করে বাঁধব।

মহেশ চুপ করিয়া রহিল।

ব্রজ বলিল—না, চুপ ক'রে থাকলে হবে না। তুমি যা ভাবছ তা আমি জানি। কিন্তু যে ক'রে হোক এটি করতেই হবে।

—বাবাজীকে আমি শুধাব ব্রজ।

—আমি কলঙ্কের পশরা মাথায় তুলে নিয়েছি মোড়ল। আবার ওর জন্যে যে জাতের মেয়ে হোক, তাকে বউ ক'রে ঘর করতে রাজী আছি। টাকা দিয়ে কিনে আনতে হয় কিনে আন তুমি। সংসারে দুলালের মত আরও অনেকেই তো জন্মায় মোড়ল। শুধু মেয়েটি একটু সুশ্রী হ'লেই হ'ল। এ আমি করব। বাবাজী বারণ করলেও আমি শুনব না। আর তুমি যদি না এগিয়ে এস এ কাজে, তবে আমিই পা বাড়াব। আমিই খুঁজে আনব মেয়ে।

মহেশ মাথা হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। এত কথার পরেও হাঁ-না কিছু বলিল না—অথবা বলিতে পারিল না। ব্রজদাসী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলিল—আজ আমার ইচ্ছে হচ্ছে কি জান? পর-মুহূর্তেই সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া বলিল—থাক্, পৃথিবীতে আমাকে যে যত দুঃখ দেয় দিক, আমি কাউকে দুঃখ দেব না। আচ্ছা তুমি এখন এস মোড়ল। দুলাল একা আছে, আমি যাই।

সে উঠিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া দিল।

পাঁচ

ব্রজদাসী মহেশ মণ্ডলকে বলিল—কলঙ্কের পশরা মাথায় লইয়া সে দুলালকে কোলে পাইয়াছে, কিন্তু সে কলঙ্কের সত্য মূল্য কি সে কথা ব্রজদাসী জানে। লোকে সত্য জানে না—তবে অনুমান করে। অনুমান কেন ব্রজ নিজেই বলিয়াছিল একদিন—"বৈষ্ণবীর দেহ-মন প্রভুর চরণে উৎসর্গ করতে হয়; এ দেহ শুধু গন্ধপুষ্প ফুটে ভক্তির চন্দনে লিপ্ত হয়ে তাঁর চরণতলে পড়ে শুকিয়ে যায়। এতে তো ফল হবার কথা নয় বাবা। কিন্তু"—বিচিত্র হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছিল—বলিয়াছিল—"কিন্তু আমার ভাগ্য অদ্ভুত আর প্রভুর লীলা অদ্ভুত—তাই সেই পুজো করা ফুলে ফল ধরল! কি করব বলুন বাবা! তবে হঁ্যা—মানুষকে দেখলাম—মানুষই দেবতা—আপনাদের মাঝেই আমার প্রভুর বাস—তাই করুণার অভাব হল না, কোনদিন দুঃখ পেলাম না; কোনদিন আপনারা জিজ্ঞাসা করলেন না, ওগো বোষ্টমের মেয়ে এ তোমার কেমন ধারা, এ কি আচরণ, প্রভুর চরণে সকল ফল সমর্পণ হ'ল তোমাদের ধর্ম কিন্তু তোমার কোলে ফল? ছি—ছি—ফল সঁপতে গিয়ে ফল চুরি করেছ তুমি।" আবার বলিয়াছিল—"শুধু তাই নয় বাবা—ধিক্কার দেওয়া দূরের কথা, পাপের ফল বিষ হল ব'লে—দূরে ফেলে দেওয়া দূরের কথা, আপনারা সমাদর ক'রে মাথায় ক'রে নিলেন। আপনারাই আমার দেবতা। শুধু যার পাপে আজ আমার—" বলিতে বলিতে থামিয়া গিয়াছিল, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়াছিল—"না, আজ কাউকে দোষ দেব না বাবা, নিজেকেও গাল দেব না, ভুল—পাপ হয় মানুষের মনের ভুলে; সে ভুলের সাজা ভগবান মানুষকে দেন না—সে সাজা মানুষ নিজেই নেয়; আমি যেমন নিচ্ছি, সেও তেমনি নিচ্ছে। আমার প্রভু তাকে মার্জনা করুন। হে গোবিন্দ—তুমি তাকে মার্জনা করো।" হাত জোড় করিয়া সে প্রণাম জানাইয়াছিল প্রভুর চরণে।

ব্রজদাসী তাহার ধর্ম অনুযায়ী তাহার অন্তরের উপলব্ধি মত কথাটা সত্যই বলিয়াছিল। এ গ্রামে গোলের আখড়া স্থাপন করিয়া যেদিন নরোত্তম দাস বাবাজী তাহাকে আখড়ায় সেবার ভার ও সর্বময় কর্তৃত্ব দিয়াছিলেন সেদিন ব্রজদাসী মনে মনে শঙ্কিত হইয়াছিল; ভাবিয়াছিল এই লইয়া গ্রামে এবং গ্রামান্তরের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা কুৎসিত আন্দোলন হইবে। বাবাজী এবং মহেশ মণ্ডলকে সে ব্যাকুল হইয়া বলিয়াছিল—না কাজ নাই। আমি বরং আখড়ায় দাসীর মত থাকব। আমার কলঙ্ক আমি সইতে পারব। কিন্তু ওই দুগ্ধপোষ্য শিশু, ও যদি মনে হয় দুঃখ পায়—ব্রজদাসী কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল।

নরোত্তম দাস বাবাজী হাসিয়া বলিয়াছিলেন—তুমি মিথ্যে ভয় করছ ব্রজ। একটা কথা তুমি জান না। কিম্বা ইচ্ছে করে ভুলে যাচ্ছ। তুমি এখানকার লোকের চিত্ত জয় করে বসে আছ। প্রভু আমার শ্রেষ্ঠ চিত্রকর ব্রজদাসী, কলঙ্ক তোমার মাথায় দিয়েছেন—তোমাকে আরও মনোরমা করবার জন্যে। চাঁদের অঙ্গে কলঙ্কের জন্যেই চাঁদকে লোকে বেশী ভালবাসে। তোমার রূপ আর কণ্ঠ দিয়ে তুমি মানুষের মন জয় করেছ—তোমার কলঙ্ক নিয়ে লোকে কথা কয় আড়ালে—কিন্তু তার জন্যে ঘৃণার চেয়ে করুণা পাও বেশী। দু চার জন আপত্তি হয়ত করবে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই খুশী হবে। তুমি দেখো।

বাবাজীর কথাই সত্য হইয়াছিল—গ্রামান্তরের দুই-চারিজন মহান্ত আসে নাই প্রতিষ্ঠা উৎসবে, তা ছাড়া সকলেই আসিয়াছিল। খুশী হইয়াছিল।

ব্রজদাসী সেই সাহসে বলিল—'আমি নিজে খুঁজে আনব মেয়ে।' দুলালকে সে বাঁধিবে। বৈষ্ণবী ব্রজদাসীর চোখে একটি ছবি ভাসিয়া উঠে। তাহার বাপের আখড়ায় উঠানের মধ্যস্থলে একটি বকুল গাছ ছিল, সেই গাছটার দুই পাশে ছিল দুইটি লতা, মাধবী আর মালতী। বকুলের কাঠ শক্ত কাঠ, সেই কাঠের কাণ্ডটায় ওই লতা দুইটি এমন পাকে পাকে জড়াইয়াছিল যে গাছটা লোহার শিকলে বাঁধা মানুষের মত আড়ষ্ট হইয়া ছিল, সারাটা কাণ্ডের উপরের মোটা ডাল-গুলিতে লতার পাক কাটিয়া কাটিয়া বসিয়া গিয়াছিল। সে শুধু লজ্জা পায় নিজের কাছে, ধিক্কার দেয় নিজেকে, মনে হয় সে জড়াইয়া ধরিতে পারে নাই—তাই তাহার পাক খসিয়া পড়িয়াছে; তাহাকে পথে বাহির হইতে হইয়াছে। সে তাই মনে মনে সংকল্প করিল—শক্ত মেয়ে, যে মেয়ে পাক দিয়া জড়াইয়া ধরিতে পারিবে এমন মেয়ে সে খুঁজিয়া আনিবে। যাহার রূপে থাকিবে ফুলের মাধুরী—বেষ্টনে থাকিবে মাধবীলতার পাকের দৃঢ়তা। একবার জড়াইয়া ধরিতে পারিলেই ব্রজদাসী নিশ্চিন্ত। ইহাতে নরোত্তম দাস বাবাজী নিষেধ করিলেও সে শুনিবে না। মহেশ মণ্ডলের উপর তাহার রাগ হইয়া গেল—তাহার কথা সে মনেই আনিল না।

দুলাল সম্পর্কে তাহার একটি কল্পনা আছে। সন্তান সম্পর্কে বৈষ্ণব মায়ের অতি স্বাভাবিক—অতি সাধারণ কল্পনা একটি।

জাতিধর্ম, কৌলিক সাধনা, নিজের জানা ও চেনা পৃথিবীর সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ মানুষের ছবি—এই সমস্তের সঙ্গে মিলাইয়া সে রচনা করিয়াছিল তাহার সাধ। দুলাল তাহার গুরুগিরি করিবে। একজন গোস্বামী মহান্ত হইবে। নরোত্তম দাস বাবাজী তাহার গুরুতুল্য, কিন্তু নরোত্তম দাস বাবাজী তাহার আদর্শ নয়। নরোত্তম দাস বাবাজীর খানিকটা সে যেন বুঝিতে পারে না, ধরিতে পারে না। ইংরাজী লেখাপড়া জানা এতবড় চাকুরে সব ছাড়িয়া মনেপ্রাণে বৈষ্ণব হইয়াছেন—বেশ-ভূষায় কথায়-বার্তায় ভাবে-ভঙ্গিতে সে আমলের সব কিছু পরিত্যাগ করিয়াছেন—তবুও যেন কোথায় খানিকটা কিছু আছে সেটুকু ব্রজদাসী তাহাদের বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। সেটুকু বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠে যখন বাবাজীর ছেলে বাপের সঙ্গে দেখা করিতে আসে। তখন আর একটা মানুষ বাহির হইয়া আসে বাবাজীর ভিতর হইতে। বাবাজীর আখড়াতে তখন ঢুকিতে ভয় হয় ব্রজদাসীর। তাই নরোত্তম দাস বাবাজী তাহার কল্পনা নয়।

বহুদিন পূর্বে নবদ্বীপ ধামে সে দেখিয়াছিল এক তরুণ গোস্বামীকে। কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ, সুস্থ সুন্দর দেহ, তেমনি কমনীয় কান্তি, বড় বড় চোখে প্রশান্ত দৃষ্টি, কামানো মুখ, কামানো মাথা, গলায় মোটা তুলসীর কণ্ঠী, কপালে তিলক, নাকে রসকলি—সে যেন মানুষটি স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে কলহকোলাহলের মধ্যে ভাষার মধু বিলাইয়া দিতে। সে কি মধু—কণ্ঠস্বরে মধু—উচ্চারণে মধু—ভঙ্গিতে মধু—তেমনি কি বাছাই করা মধুর প্রতিটি শব্দ! এক সন্তানহারা মাকে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে দেখিয়াছিল, তাঁহারও চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, মধ্যে মধ্যে দুই-চারিটি কথা বলিতেছিলেন। পরের দিন দেখিয়াছিল—জননীটির কোলে মাথা দিয়া তিনি শুইয়া আছেন; সন্তানহারা মা—হারানো সন্তানকে যেন ফিরিয়া পাইয়াছেন, সস্নেহে হাত বুলাইতেছেন গুরুর সর্বাঙ্গে। বৈষ্ণবের মেয়ে সে সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করে এই তত্ত্বে। বুদ্ধি দিয়া বিচার বা যাচাই করিতে কোন দিন যায় নাই, একজনকে সাধনার সঙ্গী করিতে গিয়া সে ঠকিয়াছে, তবু সে বিচার করে নাই, হৃদয় দিয়া বিশ্বাস করিয়াছে - যে তাহাকে ঠকাইয়াছে, ঠকিয়াছে সেই; ঠকিয়া যে দুঃখ সে পাইয়াছে, সে দুঃখ সোনা হইয়া জমা হইয়া আছে তার বুকে। এই হৃদয়ের বিশ্বাস-বলেই ওই গুরুটিকেই তাহার

সুন্দর মনে হইয়াছে—পবিত্রতম মানুষ মনে হইয়াছে—কতবার নিজেকেই শুনাইয়া বলিয়াছে—যে ছেলে-হারানো মায়ের খালি বুক ভরিয়া দিতে পারে—পুত্রশোকের শূল-বিদ্ধ চোখের অশ্রুধারার ছিদ্রপথ অমৃত-কাজল পরাইয়া নিরাময় নিরশ্রু করিয়া তুলিতে পারে, তাহার চেয়ে বড় কে—এর চেয়ে মধুর মানুষ কে ?

তাহার দুলাল এমনি একটি মানুষ হইবে। এমনি গুরু গোস্বামী ! দুলালের রং কালো। রূপের দিক দিয়া তাঁহার সঙ্গে তুলনা করা যায় না, কিন্তু এমনি শিক্ষা—এমনি স্বভাব—এমনি হৃদয় যদি তাহার হয়, তবে এই কালো মানুষের মধ্যেই রূপ ফুটিয়া উঠিবে নীল কাচের বাতি-দানের, স্নিগ্ধ শান্ত কোমল, এমনি নমনীয় এমনি কমনীয়—মাড়াইয়া গেলেও ফুটিয়া ব্যথা দিবে না ; অথচ আসল স্থান হইবে তাহার মানুষের মাথার উপর। কল্যাণের আশীর্বাদ বর্ষণ করিবে সে অজস্র ধারায়। লেখাপড়া শিখিবে, চরিতামৃত পড়িবে, ভাগবত পাঠ করিবে, লোকে মুগ্ধ হইয়া শুনিবে। দুলালের কণ্ঠস্বর ভাল নয়, গানের গলা তাহার হইবে না এটা সে বুঝিয়াছে—কিন্তু পদাবলী কণ্ঠস্থ থাকিবে, গাহিতে না পারুক, সুরের রেশ গলায় আনিয়া আনিয়া আওড়াইয়া যাইতে তো পারিবে। দুঃখী জনকে বলিতে তো পারিবে—'মহাজনের বাক্য মা, সংসারের এই তো সার সত্য। চণ্ডীদাস প্রভু'—দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিবে—'সব মহাজনের সেরা মহাজন বলেছেন কি জান ?

সুখ দুখ—দুটি ভাই।
কহে চণ্ডীদাস—শুন বিনোদিনী
সুখ দুখ দু'টি ভাই।
সুখের লাগিয়া—যে করে পিরীতি
দুখ যায় তার ঠাঁই ॥

তাহার পর নবদ্বীপের সেই গোস্বামী প্রভুর মতই বিচিত্র হাসি হাসিয়া বলিবে—'মা গো, অন্ধকারে মানুষ থাকতে পারে না। রাত্রে ভাবে কখন দিনমণির উদয় হবে। আলো ফোটে—পৃথিবীতে জীব-জন্তু কীট-পতঙ্গ মানুষ কলরব করে ওঠে কি আনন্দ—কি আনন্দ বলে, বৃক্ষ-লতায় ফুল ফুটে ওঠে। মা, ভেবে দেখ, অন্ধকার তখন সকলের দেহকে ঘিরে-জড়িয়ে ধরে, দেখো মা, তুমি চলবে—তোমার পিছনে পাশে চলবে তোমার ছায়া, গাছের তলায় দাঁড়াবে ছায়া—সে তো এই অন্ধকারই মা। আরও ভেবে দেখ—ওই আলোই তাকে কোটায়। সুখ আর দুখ—আলো আর অন্ধকার—যমজ দু'টি ভাই। এড়ানো যায় না মা।' কথাগুলি সেই নবদ্বীপের কথা—ব্রজদাসীর আজও কণ্ঠস্থ হইয়া আছে।

এমনি কল্পনা সে করে তাহার দুলাল সম্পর্কে। গোস্বামী হইলে কি নাম হইবে দুলালের সে পর্যন্ত সে ঠিক করিয়া রাখিয়াছে—'গোপালদাস গোস্বামী !'

ব্রজদাসীর সেই পুরানো কল্পনা আজ আবার নূতন করিয়া মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। চোখে তাহার জল আসিল। বৈষ্ণবী সে—সে তো জানে বহুভাগ্যের এই মানব জন্ম সার্থক-অসার্থক হয় জীবনের কর্মফলে। হতভাগ্য দুলাল, এই বহুভাগ্যের মানব জন্মে সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছে পাপের পথে। পাপ তাহার রক্তের কণায় কণায় বন্যার জলের আবিলতার মত মিশিয়া রহিয়াছে, প্রবল বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। সেই বেগের মুখে বাঁধ দিয়া ব্রজদাসী তাহাকে সরোবরের মত বাঁধিবে। ধীরে ধীরে সমস্ত আবিলতা ময়লা মাটি—থিতাইয়া নিচে বসিয়া যাইবে, জীবনের রক্তধারা হইবে নির্মল—কাজল দীঘির জলের মত শান্ত স্নিগ্ধ স্বচ্ছ, তখন তাহাতে ফুটিবে—ওই যে পাপ—ওই পাপের পাঁক হইতে ফুটিয়া উঠিবে পদ্ম। এই প্রবল

বন্যার মুখে সে দিবে মাটির বাঁধ। মনে পড়ে তাহার প্রথম জীবনের গুরুর কথা। বাউল বলিত—জান গো—এই মাটি আর তোমরা কোন প্রভেদ নাই। প্রভু আমার বৈকুণ্ঠ থেকে নেমে এলেন প্রেম—শান্তি—মুক্তির ধারার মত। ধরবে কে তাঁকে? মা গঙ্গা স্বর্গ থেকে নেমে এলেন—মাথা পেতে তাকে ধরলেন—ভোলা মহেশ্বর। আমার প্রভুকে কে ধরবে? তাঁকে ধরলেন—মা যশোদা, কোল পেতে দিলেন। তারপর? কোলেই ত তিনি বাঁধা থাকবেন না! তাঁকে দুই হাত বাড়িয়ে দুই তীরের মত ধরবে কে? ধরলেন শ্রীমতী! জয় রাধা! জয় রাধা! জয় রাধা! গোবিন্দ আমার মুক্তি শান্তি প্রেমের স্রোত—রাধা আমার তীর। তাই তো যত ভাঙনের দুঃখ আমার শ্রীমতীর বুকে গিয়ে লাগে।

দুলালকে সে কোল পাতিয়া ধরিয়াছে। এইবার চাই তাহাকে বাঁধিবার মত দুখানি হাত। একটি কিশোরী মেয়ে। কণ্ঠস্বর হইবে মিষ্টি। রূপসী মিলিবে না—কিন্তু শ্রীমতী মেয়ে খুঁজিলে মিলিবে! মাজিয়া ঘষিয়া সে তাহার রূপকে বাহির করিবে।

নিজের যৌবন-কালের কথা মনে পড়ে।

রাধা গোবিন্দকে কেন্দ্র করিয়া সে কি আনন্দ, সে কি লীলা মাধুরীর রসের তন্ময়তা! দোল যাত্রায়—বাসন্তী পূর্ণিমায়। পুষ্পসজ্জা—রঙের পিচকারী লইয়া খেলা, ঘোর বর্ষায়—শ্রাবণ পূর্ণিমায় মেঘ ঢাকা চাঁদের কুয়াসার মত জ্যোৎস্নায় ঘরের মধ্যে ঝুলনা ঝুলাইয়া খেলা—সে সব এক স্বর্গ-সুখের স্মৃতি! ভাবিতে গেলে আজও শরীর যেন আবেশ-বিবশ হইয়া যায়, চোখে জল আসে। সেই রসাস্বাদনের মধ্য দিয়া দুলালকে সে রাধাশ্যামকে চিনাইয়া দিবে। একবার চিনাইয়া দিতে পারিলে—আর ভয় নাই। মানুষের মন ভ্রমরের মত—পদ্মের সন্ধান যতক্ষণ না পায় ততক্ষণ সে ছুটিয়া বেড়ায় ফল ফসলের ক্ষেতে-ক্ষেতে। কিন্তু পদ্মের সন্ধান পাইলে সে আর ফেরে না। ওই পদ্মবনেই গুন গুন করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়—ক্লান্ত হইলে ওই পদ্মপাতায় ঘুমাইয়া পড়ে। পদ্ম তুলিতে গিয়া কত পদ্মদলের মধ্যে মরা ভ্রমর ব্রজ দেখিয়াছে!

পরদিন হইতেই সে মেয়ের খোঁজ শুরু করিল।

দুলালকে খাওয়াইয়া সে বলিল—তুই থাক বাছা, নিজেই একটু চা করে খাস। আমি আজ একবার ঘুরতে যাব।

—ঘুরতে যাবি? কোথা?

ব্রজ কথাটা ভাঙিল না। বলিল—এই বাবা, পাঁচটা গেরস্ত বাড়ীতে মায়েদের সঙ্গে ভাবসাব আছে; ভালবাসেন, দয়া করেন,—তোর আজ দু'মাসের ওপর অসুখ—যেতে পারি নাই। একবার যাই ঘুরে আসি—দেখা ক'রে আসি।

দুলালের ভুরু দুইটা কুঁচকাইয়া উঠিল—মায়ের এই ধরণ এই প্রবৃত্তিটা সে মোটেই বরদাস্ত করিতে পারে না। 'ভালবাসেন—' বেশ কথা, দয়া করেন কি! দয়ার কি ধার ধারে তাহারা? কি প্রয়োজন দয়ার? কি অভাব আছে তাহাদের? আর অভাবই যদি থাকে—তবে সে অভাবের জন্য পরের কাছে হাত পাতিবে কেন? এইজন্যই—এইজন্যই তাহার মাথা ন্যাড়া করিয়া তিলক কাটিয়া কণ্ঠী পরিয়া মহান্ত হইতে ঘোরতর আপত্তি। এই করিয়া—এমনই অভ্যাস হইয়াছে তাহার মায়ের—যে—অভাব না থাকিলেও ভিক্ষা না করিলে তাহার তৃপ্তি হয় না। —হরি বলিলেই এক মুঠা চাল,—ওই একমুঠা চালের জন্য তাহার মায়ের লোভের অন্ত নাই।

ব্রজ হাসিয়া বলিল—খোকনের আমার মা দু'দণ্ড বাইরে গেলেই সব অন্ধকার। বেশী দেরি করব না আমি! বিকেলেই ফিরব। এসে সন্ধ্যে জ্বালব, আরতি আছে—

—না—না। দুলাল গর্জন করিয়া উঠিল।—তার জন্যে নয়।

—তবে কি?

আমার মাথা—আর তোর মুণ্ড। যেতে পাবি না তুই। ভিক্ষে করবি কি? কিসের জন্যে ভিক্ষে করবি? অভাব কি তোর?

—ভিক্ষে বৈষ্ণবের ধর্ম দুলাল। অভাবের জন্য নয় বাবা। রাজা রাজ্যপাট ছেড়ে ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে প্রভুর নাম নিয়ে পথে বের হন। ও না হ'লে তাঁকে বুকের মধ্যে পাওয়া যায় না। তাঁরও দয়া হয় না।

—যা—যা বাপু, যেখানে যাবি! যা করবি কর গে। কানের কাছে তত্ত্বকথা বকিস না।

সে একটা সিগারেট ধরাইয়া টানিতে শুরু করিল।

ব্রজদাসী ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, কয়েক মুহূর্ত দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিল, তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বাহির হইয়া গেল।

দুলাল একা বসিয়া ওই কথাই ভাবিতে লাগিল। গোটা আখড়াটা যেন রাত্রির পৃথিবীর মত স্তব্ধ, ঘুমাইয়া পড়িয়াছে যেন। গরগিলের মধ্যে দুই চারিটা পাখী কল কল করিতেছে আর গোটা-চারেক কাঠবিড়ালী চিক্ চিক্ শব্দ করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে। মধ্যে মধ্যে দুইটা কাক সুযোগ-মাফিক ছোঁ মারিয়া কাঠবিড়ালীগুলিকে ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। আশ্চর্য চাতুর্যের সঙ্গে কাঠবিড়ালীগুলি আত্মরক্ষা করিয়া চলিয়াছে; কাক ছোঁ মারিবার সঙ্গে সঙ্গেই খানিকটা সরিয়া গিয়া কোন গাছের আড়ালে বা লাফ দিয়া গাছটার কাণ্ডের উপর উঠিয়া পড়িয়া লেজ ফুলাইয়া দাঁত দেখাইয়া খানিকটা নাচিয়া ছুটিয়া পলাইতেছে।

দুলাল ভাবিতেছিল—বৈষ্ণব মহান্ত হওয়ার কথা। ন্যাড়া মাথায় এক গোছা টিকি, গলায় তুলসীর মালা, নাকে কপালে তিলক সমেত নিজের রূপ কল্পনা করিতে গিয়াই তাহার মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে। পরনে খাটো থানকাপড়ের বহির্বাস। দূর! কিম্বা মাথায় লম্বা চুল রাখিয়া দাড়ি গোঁফ রাখিয়া আলখাল্লা পরিয়া কিম্ভূত-কিমাকার চেহারা করিয়া;—দূর!

আর এই ইনাইয়া বিনাইয়া কথা বলা—যাহার সঙ্গে দেখা হইবে তাহাকেই সবিনয়ে প্রণাম করিয়া প্রভু বলিয়া সম্বোধন করা;—দূর!

এক একবার এক একটা ছবি কল্পনা করিল—আর সরবে 'দূর—দূর' করিল—পাগলের মত। তাহাতে কাক দুইটা পলাইয়া গেল।

দুলালের কল্পনা—মায়ের কল্পনার বিপরীত।

সে বাসের ড্রাইভার হইবে। মোটর চালানো ইতিমধ্যেই সে শিখিয়া ফেলিয়াছে। আজ চার বৎসর ধরিয়া গাড়ীর কাদামাটি ধুইয়াছে, ড্রাইভার মহাবীর প্রসাদের কত সেবা করিয়াছে, এঁটো বাসন ধুইয়াছে, পা টিপিয়াছে, তবে মহাবীর তাহাকে মোটর চালানো শিখিবার সুযোগ দিয়াছে। মনে আছে তাহাদের বাস্ একবার দুমকা রিজার্ভ গিয়াছিল। ফিরিবার পথে সাঁওতাল পরগণার সুন্দর নির্জন পথে মহাবীর খালি বাসখানা প্রথম তাহার হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিল। ওঃ, সে কি আনন্দ—সে কি স্ফূর্তি। বিলকুল দুনিয়া যেন লাট্টুর মত তাহার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। হু-হু করিয়া পাশের মাঠ পিছনে ছুটিয়া চলিল। অদ্ভুত একটা আনন্দ।

এ সব ছাড়াও আছে।

এ আখড়া হইতে বাহির হইয়া ডাহুকী বহুকী পার হইয়া ক্রোশ খানেক মাঠের পরে এক বিচিত্র পৃথিবীর সন্ধান সে পাইয়াছে, চঞ্চল দুরন্ত কোলাহল-মুখর উগ্র যুদ্ধমান এক পৃথিবী।

কিছু-না-কিছু সেখানে অহরহ লাগিয়াই আছে। এই শান্ত নির্জীব, দীনতায় নত, ভীরু গ্রামগুলি হইতে সে সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র ; একেবারে পৃথক পৃথিবী।

সেখানে প্রায় প্রত্যেকটি আবর্তের মধ্যে দুলাল আছেই। সেখানে দুলাল—দুলাল নয়, সে সেখানে বিরিজনন্দন ;—নামটা সে নিজেই লইয়াছে! ব্রজদাসীর বেটা সে বিরিজনন্দন।

—মা-জী! মা-জী রয়েছেন? মহেশ মণ্ডল আসিয়া আখড়ায় প্রবেশ করিল।

দুলাল চমকাইয়া উঠিল।—কে? পরক্ষণেই মহেশ মণ্ডলকে দেখিয়া সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। এই লোকটাকে সে দু-চক্ষে দেখিতে পারে না। এই মহেশ মণ্ডলকে আর ওই নরোত্তমদাস বাবাজীকে।

এক এক সময় মনে হয়—দুই জনকেই সে খুন করিয়া ফেলে।

লোক দুইটাকে লইয়া তাহার সম্পর্কে লোকে কুৎসিত কথা বলে। বলে, উহাদের একজন কেহ তাহার জন্মদাতা!

কথাটা শুনিলে কি মনে হইলে—তাহার আর দিগ্‌বিদিক জ্ঞান থাকে না। একবার এই গ্রামের জগৎ মণ্ডলের টুঁটি টিপিয়া ধরিয়াছিল। লোকটা কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়া বলিয়াছিল—মটরেয় ড্রাইভারি শিখে একটা মটর কিনে ফেলবি—দুলাল।

দুলাল বলিয়াছিল—চাট্টিখানি কথা নয়—। মটর কেনা সোজা ব্যাপার বুঝি? দাম জান? ধান বেচে হয় না।

—হয় রে হয়। মহেশ মণ্ডলের ধান কত দেখেছিস তো? মোড়লকে বললেই মোড়ল দেবে একটা বাখার ছেড়ে, তোর মাকে বলিস—বলবে মোড়লকে—

সঙ্গে সঙ্গে দুলাল তাহার টুঁটি টিপিয়া ধরিয়াছিল।

দুলাল এই কারণেই ওই বাবাজীকে আর মণ্ডলকে দুই চক্ষে দেখিতে পারে না। মনে হয় উহারাই তাহার জীবনের সব চেয়ে বড় শত্রু।

ব্রজদাসী ভাবে—মুখেও সে সকলের কাছে বলে—মানুষেরা এত ভাল যে সমস্ত জীবন তাহাদের দাসীত্ব করিলেও তাহাদের জীবনের ঋণ মিটিবে না। দুলালকে কোলে লওয়ার মত এত বড় অপরাধ—দুলালের জন্মের অপরাধ—ক্ষমা করিয়াছে মানুষেরা।

ব্রজদাসীর কথা আংশিক ভাবে সত্য।

ক্ষমা করিয়াছে, ব্রজদাসীকে স্নেহ সকলেই করে—তবু কথাটা তাহারা মধ্যে মধ্যে বলে।

ব্রজদাসী জানে সে কথা। জানিয়াও ঐ কথা বলে।

দুলাল কিন্তু ভাবে বিপরীত কথা। সে বলে হারামজাদার দল সব। শূয়ারের বাচ্চা, কুত্তার বাচ্চা! সামনে বলতে সাহস নাই কিন্তু আড়ালে অহরহ ঐ কথা—ঐ চিন্তা ওদের। ক্ষমা! ক্ষমা না—ওই বোষ্টমী বেটীর মুণ্ডপাত। বেটীর মুণ্ড ধুলোয় লুটিয়েই আছে। লাথি মেরে যায় লোকে—বেটী ভাবে—আশীর্বাদ করছে। আমার কাছে কিন্তু ওসব চলবে না বাবা। হাম হ্যায়, ব্রিজনন্দন, মারে গা ডাণ্ডা—দনাদন্,—দনাদন্! দুনিয়া ছোটলোকের দুনিয়া, শেয়ালে ভরা জঙ্গল ; এখানে যারা বাঘ তাদেরই বিপদ। শেয়ালদের ভালবাসলেই সর্বনাশ। ফেলবে ফাঁদে, তারপর হুক্কাহুয়া করে মনের আনন্দে চেঁচাবে আর ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। মারো থাবা শেয়ালদের, ব্যাস ঠাণ্ডা রহেগা। হাম ব্রিজনন্দন—হাম বাঘ—কেয়া নাম হ্যায়—শের হ্যায়!

এ অহঙ্কার দুলাল করিতে পারে।

দেহে তার প্রচণ্ড শক্তি। যোল বছরের দুলালকে বিশ-বাইশ বছরের জোয়ান বলিয়া ভ্রম হয়।

মনে তাহার ভয় বলিয়া কোন উপলব্ধি নাই। শৈশব হইতে সে অন্ধকার ঘরে একা পড়িয়া থাকিত। ব্রজদাসী যাইত ভিক্ষায়। বাল্যকালটা তাহার বাগ্দীদের ছেলেদের সঙ্গে জাহ্নবীর তীরের জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিয়া কাটিয়াছে। বাগ্দী বুড়া রতন ক্ষ্যাপার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়াছে। বাগ্দীবুড়ার ক্ষ্যাপা মায়ের আশ্রমে মড়ার খুলি ছড়ানো থাকিত; সে তাহারই মধ্যে বসিয়া থাকিত, মড়ার খুলি লইয়া খেলা করিত, কতদিন ওখানেই ঘুমাইয়া পড়িত।

দেহে যাহার প্রচণ্ড শক্তি, মন যাহার ভয়-লেশহীন—সে নিজেকে বাঘের সঙ্গে তুলনা করিলে—আত্মগৌরবের জন্য নিন্দনীয় হইতে পারে কিন্তু মিথ্যা গৌরব করার জন্য উপহাসের পাত্র হয় না! লোকে দুলালের অহঙ্কারে ক্ষুব্ধ হয়—বিরক্ত হয় কিন্তু হাসিতে পারে না।

মহেশ মণ্ডল আসিতেই দুলাল ভুরু কুঁচকাইয়া ফিরিয়া চাহিল—বলিল, বাড়ীতে নাই।

মহেশ যেন একটু বেশী রকম নিরাশ হইল। বোধ হয় খুব বেশী উৎসাহ লইয়া কোন কথা বলিতে আসিয়াছিল। একটুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল বেচারা, তাহার পর বলিল—গেলেন কোথা?

—কে জানে! ভিখারীর বেটী ভিখারী, 'স্বভাব যায় না মলে, ইল্লোত যায় না ধুলে'—ভিখ মাগতে বেরিয়েছে।

মহেশ আসিয়া দুলালের কাছে বসিল। সস্নেহে বলিল—আঃ—কি দেহ কি হয়ে গিয়েছে! বড় ফাঁড়া গেল তোর। যাক্—প্রভুর দয়ায় বেঁচে উঠেছিস—এই ভাগ্যি।

দুলাল শুধু বলিল—হুঁ।

মহেশ আবার একটু হাসিয়া বলিল—মা-জী তাহলে কন্তের খোঁজে বেরিয়েছেন!

—কিসের খোঁজে?

—কন্তের খোঁজে। কাল রাত্রে আমাকে বললেন—দুলালের আমি মালাচন্দন দোব—মোড়ল—আপনি একটি কন্তে দেখে দেন। আমি নিজেও খুঁজব—আপনিও দেখুন।

দুলাল ক্রোধে এবং বিস্ময়ে চোখ দুইটাকে বিস্ফারিত করিয়া একদৃষ্টে মহেশ মণ্ডলের দিকে চাহিয়া রহিল।

মহেশ বলিল—তা' আমি ভেবে দেখলাম—মা-জীর এ সংকল্প—ভাল,—খুব ভাল—

দুলাল অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল—এ্যাই-ও, তুমি চুপ কর বলছি।

মহেশ চমকিয়া উঠিল। মহেশ মণ্ডল বিশাল পুরুষ, তাহার দুর্দান্ত সাহস, ভয় পাইয়া চমকায় নাই সে, অতর্কিতে এমন চীৎকার শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল।

দুলাল আবার চীৎকার করিয়া উঠিল—চলে যাও, চলে যাও—আখড়া থেকে তুমি চলে যাও বলছি।

—কি হ'ল কি তোর?

—কিছু হয় নি।

—তবে এমন চেঁচাস কেন?

—বিয়ে আমি করব না। খবরদার ওসব কথা বলবে না।

—বিয়ে করবি না?—অবাক হইয়া গেল মহেশ মণ্ডল।

—না—না—না।

পরক্ষণেই সে উঠিয়া পড়িল। ঘরের ভিতর ঢুকিয়া নিজের ঝোলাটা ঝুলাইয়া জামাটা গায়ে দিতে-দিতেই সে আখড়া ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

মহেশ বিস্মিত বিব্রত দুইই হইল—জিজ্ঞাসা করিল—তা' চললি কোথারে বাপু ?

—মানগোবিন্দপুর।

—ওই ! এই রোগা শরীর নিয়ে, দুলাল ওরে—

—এ্যার্ত্‌। পেছন থেকে মেলা ফ্যাচ ফ্যাচ করো না বলছি !

দুলাল আর দাঁড়াইল না। সে মাঠের পথে বাহির হইয়া গেল।

বিয়ে ! বিয়ে একটা তিলক-ফোঁটা-কাটা বোষ্টুম মেয়েকে ? সে দুলাল কখনও করিতে পারিবে না। কখনও করিবে না। দুরন্ত, দুর্দান্ত, প্রচণ্ড, অবুঝ দুলাল। মানগোবিন্দপুরের ওই বিচিত্র পৃথিবীতে দিবানিদ্রার অবসরে ওই পৃথিবীর স্বপ্ন দেখিতে শুরু করিয়াছে।

প্রথম দিকে মানগোবিন্দপুরের বাস ড্রাইভার মহাবীরপ্রসাদের চঞ্চলা মেয়েটাকে দেখিয়া তাহাকেই বিবাহ করিবার কল্পনা করিয়াছিল। তারপর মানগোবিন্দপুর হইতে বাসের সঙ্গে জেলার শহরে যাইতে শুরু করিল। সেখানে দেখিল, মেয়েরা বেণী ঝুলাইয়া ইস্কুলে চলিয়াছে। অপরূপ মনে হইল। মনে হইল এ মেয়েরা বুঝি চাঁদের দেশ হইতে নামিয়া আসিয়াছে। দুলাল নিজের যোগ্যতা বিবেচনা করিল না, তাহার জাতি কুল মান মর্যাদা কোন কিছুরই বিচার করিল না, মনে মনে সংকল্প করিল এমনই একটি মেয়েকে সে বিবাহ করিবে ! কেমন করিয়া এমন একটি মেয়েকে বিবাহ করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর তাহাও সে ভাবিল না ! শুধু সে মাথায় লম্বা চুল রাখিল, তেল না দিয়া সে চুলের বোঝাকে রুক্ষ করিল, মধ্যে মধ্যে মাথা ঝাঁকি দিয়া চুলগুলাকে নাড়া দিয়া বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিয়া নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনোহর মনে করিল। এবং প্রকৃতিতে সে আরও উগ্র হইবার চেষ্টা করিল ; প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল পৃথিবীতে সে-ই শ্রেষ্ঠ সাহসী।

তারপর একদিন ওই মেয়েগুলি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইয়া গেল তার দৃষ্টিতে। সেদিন তাহার দৃষ্টিপটে এক নূতন ছবির ছাপ পড়িয়া গেল।

শোভাদিদি কলিকাতার ট্রেনে নামিয়া বাসে আসিয়া উঠিলেন। রুক্ষ চুলে এলো খোঁপা বাঁধিয়াছেন, দীর্ঘ ট্রেনের পথে চুলগুলি অবিন্যস্ত হইয়া হাওয়ায় উড়িতেছে। মুখে কোন প্রসাধন-মার্জনা নাই, তবু সে মুখে যেন কিসের একটি দীপ্তি ঝলমল করিতেছে। চোখে নীল চশমা, পরনে খদ্দরের ব্লাউস, খদ্দরের শাড়ী, কাঁধে একটা রঙীন খদ্দরের ঝোলা, পায়ে ফিতা-বাঁধা চপ্পল। মেয়েটিকে দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া গেল। এ মেয়ে কোথা হইতে আসিল ? এ কেমন মেয়ে ! গল্পে আছে রূপ-সরোবরের কথা। গাঁয়ের মেয়ে বনের ধারে কাঠ কুড়াইত, সেখানে ছিলেন এক মুনি ; তপস্যামগ্ন মুনির চারিদিকে উইপোকার ঢিপি বাঁধিয়াছে, চুলে জটা বাঁধিয়াছে,—সে জটার উপর মাকড়সার জাল বুনিয়াছে, তবু তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই। গাঁয়ের মেয়ে তাঁহাকে দেখিয়া প্রথমটা অবাক হইল, তারপর ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া চারিপাশের আবর্জনা ঘুচাইয়া, আঁচল ভিজাইয়া জল আনিয়া উইপোকার মাটি ছাড়াইয়া মুনির অঙ্গ ধুইয়া মুছিয়া দিল, মাথার জটার উপর হইতে ছাড়াইয়া দিল মাকড়সার জাল। তারপর প্রণাম করিয়া কাঠ কুড়াইয়া বাড়ী ফিরিল। পরদিন আবার আসিয়া আবার সব মার্জনা করিয়া প্রণাম করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। এমনি নিত্য সেবা করিতে লাগিল গাঁয়ের মেয়ে। তারপর একদিন মুনির ধ্যান ভাঙিল। প্রসন্ন হাসি হাসিয়া মুনি বলিলেন "তোমার সেবায় আমি বড় সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি বর দিলাম তুমি হবে দেশের রাজরাণী।" কালো গাঁয়ের মেয়ে লজ্জা পাইল। নিজের কালো রঙের দিকে চাহিয়া দীঘির জলে দেখা নিজের মুখের ছবি মনে করিয়া বড় দুঃখেও হাসিল। মুনি বুঝিলেন তাঁহার মনের কথা। বলিলেন—

"রূপের জন্য দুঃখ তোমার? যাও এই পথে নিবিড় বনে চলে যাও, দেখবে এক সরোবর। সেখানে গিয়ে স্নান কর। একবার স্নানে চাঁদের মত লাবণ্য ঝরে পড়বে তোমার রূপ থেকে। সে রূপ যদি তোমার মনোমত না হয় তবে তুমি দ্বিতীয়বার স্নান করবে, তোমার অঙ্গ থেকে সূর্যের আলোর দীপ্তি ঝরে পড়বে!" হইয়াছিলও তাই। তবে এ মেয়েও কি সেই মেয়ে? শ্যামলা রঙ—সামান্য সাধারণ বেশভূষা, কিন্তু এ কি দীপ্তি!

দুলাল বার বার মাথার চুলে ঝাঁকি দিয়া প্রচণ্ড উৎসাহে হাঁক দিতে শুরু করিয়াছিল—চলো—মানগোবিন্দপুর। চলে তুফান মেল!

একটা মণখানেক ওজনের ঝুড়ি লইয়া বাসের মাথায় তুলিতে স্টেশনের কুলিটা হিমসিম খাইয়া মাটিতে নামাইয়া বলিয়াছিল—একলা লারব বাবু! এই বোঝা কি আলগোছে উঁচু করে একলা তোলা যায়?

দুলাল ছাদের উপর হইতে লাফ দিয়া প'ড়িয়া বলিয়াছিল—যায় না? এই দেখ! বলিয়া দাঁতে দাঁত টিপিয়া হেঁচকা টান মারিয়া বোঝাটা দুই হাতে উপরে ঠেলিয়া তুলিয়া মহাবীরকে বলিয়াছিল—পাকড়ো ভাই মহাবীর!

কিন্তু ভাগ্য দুলালের! মেয়েটি কালো চশমার মধ্য দিয়া যেমন সামনের দিকে স্থির হইয়া বসিয়া ছিলেন তেমনিই বসিয়া রহিলেন। একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না।

দুলালের ক্ষোভের সীমা ছিল না।

মানগোবিন্দপুরে আসিয়া তাহার সে ক্ষোভ মিটিল। নিজেই সেই সূর্যের দেশের মেয়ে বলিয়াছিলেন—তোমার নাম দুলাল তো! দুলাল বলেই তো ডাকছিল তোমাকে!

অবাক হইয়া গিয়াছিল দুলাল।—হ্যাঁ।

—তুমি রাধাচরণবাবুকে চেন?

উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল দুলাল। হ্যাঁ। আপনি সেখানে যাবেন? তাঁর বাবার আখড়ায়?

—না। তিনি যেখানে থাকেন।

নরোত্তম দাস বাবাজীর ছেলে রাধাচরণ।

বাপ সরকারী চাকরি পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব হইয়াছেন। ছেলে রাধাচরণ গুপ্ত মানগোবিন্দপুরেই বাসা করিয়া চরকায় সুতা কাটে, লোকজন জড়ো করিয়া সভাসমিতি করে। কংগ্রেসের পাণ্ডা। তাহার চেহারা এমনি রুক্ষ—এমনি দীপ্ত।

নরোত্তম দাস বাবাজীর প্রতি দুলালের দুরন্ত ক্রোধ কিন্তু রাধাচরণকে সে ভালোবাসে। এই মেয়ের সর্বাঙ্গে যেমন সূর্যের দীপ্তি তেমনি তাহার রুক্ষ চেহারাতেও আছে অগ্নিশিখার দীপ্তি এবং উত্তাপ। ভয়ও করে। গম্ভীর রাধাচরণ তাহাকে কটু কথা বলে না, কিন্তু দৃষ্টি তাহার অত্যন্ত প্রখর।

মেয়েটি দুলালকে বলিয়াছিল—তোমার নাম রাধাচরণবাবু আমাকে বলে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন তাকে বললেই সে ঠিক পৌঁছে দেবে।

দুলাল কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বলিয়াছিল—ওদিকে না—এই ঘাসে ঘাসে আসুন। বেজায় ধুলো এখানে। বর্ষার সময় এ সব জায়গায় যা কাদা!

—খুব কাদা হয়—না?

—খুব। পথে এক একদিন বাস নিয়ে জান বেরিয়ে যায়। একবার একটা গরু আধখানা ডুবে গিয়েছিল কাদায়। শেষে পেটের তলায় বাঁশ দিয়ে ঠেলে তুলি। একদিকে আমি আর একদিকে দুজন। আমার কাঁধের চামড়া ফেটে গিয়েছিল।

—তোমার গায়ে খুব জোর। আজও তুমি বোঝাটা যা তুললে—

—ওর আর কি ওজন! দু-মণে বস্তা ঘাড়ে নিয়ে ইষ্টিশান থেকে বাস পর্যন্ত দিব্যি চলে আসি। জানেন—আমার ইচ্ছা আছে—একদিন মটর আটকে দেখব। শুনেছি—সার্কাসে সব মটর আটকায়!

রাধাচরণের বাসায় তাহারা আসিয়া পড়িয়াছিল। মেয়েটি তাহাকে পয়সা দিতে চাহিয়াছিল—একটি দু-আনি; দুলাল ছুটিয়া পলাইয়া আসিয়াছিল—না—।

সেই দিন অপরাহ্নে আবার সে আসিয়াছিল—একটা মরা গোখুরা সাপ লইয়া। সাড়ে তিন হাত লম্বা—প্রকাণ্ড বিষধর। বাসের গ্যারেজে কখন ঢুকিয়া বসিয়াছিল, দুলালই সেটাকে মারিয়াছিল। রাধাচরণকে দেখাইতে আসিয়াছিল। রাধাচরণকে নয়—ওই মেয়েটাকে। মেয়েটির নাম শোভা। 'সকালে' রাধাচরণের মুখে নামটা শুনিয়াছিল—বিকালে আসিয়া সে নিজেই সম্পর্ক পাতাইয়া ডাকিল—শোভাদি, দেখুন কত বড় সাপ মেরেছি!

মেয়েটি রাধাচরণকে ইংরাজীতে কি কয়টা কথা বলিয়াছিল।

রাধাচরণ হাসিয়া ইংরাজীতে কি উত্তর দিয়াছিল। তারপরই মেয়েটি বলিয়াছিল—তোমার গায়ে খুব জোরও আছে—সাহসও আছে খুব, কিন্তু লেখাপড়া করেছ কতটা?

—লেখাপড়া?

—হ্যাঁ।

—লেখাপড়া বেশী জানি না।

—শিখবে লেখাপড়া?

—উঁহু। ও—হবে না আমার!

—হবে, হবে। আমার কাছে যখন হোক একঘণ্টা ক'রে পড়ে যাবে। কেমন?

রাজী হইয়াছিল দুলাল। আসিতও রোজ। কিন্তু লেখাপড়া হয় নাই। লেখাপড়া না-হোক, শোভাদিদির সঙ্গে আলাপ হইয়াছে। শোভাদিদি স্বর্গের দেশের মেয়ে।

শোভাদিদিকে সে ভক্তি করে, নাম উঠিলেই দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করে—বলে—ওরে বাপরে! এর চেয়ে স্পষ্ট এবং গভীর ভাবে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিবার মত ভাষা দুলালের নাই। শোভাদিদি নয়; কিন্তু বিবাহের কথা মনে হইলেই সে কল্পনা করে ওই শোভাদিদির মত একটি দীপ্তিমতী মেয়ে তাহার গলায় মালা দিতেছে!

দুলালের কল্পনা আকাশে ফুল ফুটাইয়া চলে। তাহার কাছে অসম্ভব কিছু নাই। বাস ছুটিয়া চলে, বাসের ফুটবোর্ডে দাঁড়াইয়া চলিতে চলিতে অকস্মাৎ সে স্তব্ধ হইয়া যায়—কল্পনা করে—সে ওই রাধাচরণদাদার মত হইয়াছে; মাথায় গান্ধী-টুপী, পরনে খদ্দর, রুক্ষ চুল। রাধাচরণের চেয়েও সে বড় হইয়াছে। রাধাচরণ চরকা কাটিয়া মিটিং করিয়া জেল খাটিয়া এমন হইয়াছে—দুলাল চরকা কাটিবে না, ওসব নয়—সে বোমা পিস্তল ছুঁড়িয়া জেল খাটিয়া ফিরিয়া আসিবে। একদিন—শোভাদিদির মত কোন মেয়ে আসিয়া হাজির হইবে।—আপনি দুলালবাবু? আমি কলকাতা থেকে এসেছি।

মা বলিবে—ওটি কে রে দুলাল?

দুলাল হাসিয়া বলিবে—উনি আমার কাছে এসেছেন মা।

সেদিন কয়েকজন মিলিটারী অফিসার আসিয়াছিল। রেল হইতে নামিয়া তাহাদেরই বাসখানা লইয়া একটা ডাঙ্গা দেখিয়া গিয়াছে। এরোপ্লেনের ঘাঁটি করিবার কথা হইতেছে। যুদ্ধ চলিতেছে। জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ—জাপানীর সঙ্গে যুদ্ধ। দুলাল পিছনে বসিয়া অদ্ভুত অসম্ভব

কল্পনা করিয়া চলিয়াছিল। এরোপ্লেনের ঘাঁটি হইবে। একদিন রাত্রে চুপি চুপি আসিয়া বোমা পিস্তল মারিয়া সব জখম করিয়া এরোপ্লেন দখল করিবে। উহাদের পোশাক পরিয়া এরোপ্লেন উড়াইয়া বোমা মারিয়া গিয়া নামিবে এক দুর্গম অরণ্যের মধ্যে। প্রতি রাত্রে হানা দিবে। ক্রমে সেই বনের মধ্যে আসিয়া জুটিবে রাধাচরণ, শোভাদিদি, তাহাদের সঙ্গে আরও কত তরুণ-তরুণী। ইংরাজকে কৌৎ করিয়া একদিন তাহারা দেশে ফিরিবে। বাড়ীতে আসিবে। মিলিটারী পোশাক তাহার পরনে, সঙ্গে তাহার বধূ। ওই সূর্যের দেশের মেয়ে। গ্রামের লোকে চিনি-চিনি করিয়াও চিনিতে পারিবে না। সবাই সবিস্ময়ে দূরে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া দেখিবে। মা মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিবে—বলিবে—কে বাবা তুমি ?

দুলাল কৌতুক করিবে—বলিবে—তুম্ ব্রজভাসী হ্যায়। ওই—উল্লু দুলাল তুমাহারা লেড়কা হ্যায় ?

—হ্যাঁ বাবা।

হা হা করিয়া দুলাল তখন হাসিয়া উঠিবে। মাথার টুপিটা ছুঁড়িয়া দিবে বধূর হাতে। মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিবে—মা গো, চিনতে তো পারলে না। আমিই সেই উল্লুক দুলাল।

—দুলাল! আমার দুলাল!

—হ্যাঁ গো। হ্যাঁ গো। হ্যাঁ গো!

—ওটি ? ওটি কে দুলাল ? লক্ষ্মীর মত মেয়েটি কে বাবা ?

—বউ, তোমার বউ গো।

—আমার বউ!

অবাক হইয়া যাইবে তাহার মা।

দুলালের কল্পনায় অসম্ভব কিছু নাই। তবুও একদিন বাস্তব সংসারবোধ সজাগ হইয়া উঠে। সেদিন ওই কল্পনা করিতে সঙ্কোচ হয়। সেদিন প্রচণ্ড উগ্রতায় সকলের সঙ্গে ঝগড়া করে। কিছুই ভাল লাগে না। অবসর পাইলেই সে সে-দিন সকলের কাছ হইতে দূরে যায়। শোভা-দিদির কাছেও যায় না। কোন নির্জন স্থানে গাছতলায় শুইয়া পড়ে। সেও ভাল লাগে না। বাহিরের প্রকৃতি তাহাকে বাস্তব সংসার মনে করাইয়া দেয়। সে তখন গামছায় মুখ ঢাকা দেয়। চোখ মুছিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার কল্পনার অদ্ভুত রাজ্যের দুয়ার খুলিয়া যায়। সে-দিন সে ভাবে 'কুছ পরোয়া' নেই হ্যায়। সে ডাকাত হইবে। ডাকাতি করিবে।—লাঠি হাতে ডাকাত নয়। মোটর ট্যাক্সি লইয়া ডাকাতি। রিভলবার দেখাইয়া ট্যাক্সিওয়ালাকে ঘায়েল করিয়া নিজেই লইবে স্টিয়ারিং। তারপর—কোন জুয়েলারির দোকানে—কি কোন বড় গদীতে—কি ব্যাঙ্কে—হানা দিয়া লাখ টাকা লইয়া গাড়ী ছাড়িয়া দিবে। হু-হু করিয়া ছুটিবে গাড়ী। কল্পনায় গাড়ী ছোটে। হঠাৎ চোখে পড়ে—পথ ধরিয়া আসিতেছে এক মেয়ে, চোখে কালো গগল্‌স্, রুখু চুল, সর্বাঙ্গে ধূসর লাবণ্যের দীপ্তি। সে সজোরে ব্রেক কষিয়া গাড়ী থামায়। খেলার পুতুলের মত মেয়েটিকে গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া আবার গাড়ী ছাড়ে। ছোটে গাড়ী, ছোটে, ছোটে! এক নির্জন স্থানে—বনের মধ্যে গাড়ী থামায়। প্রথমেই সে লুণ্ঠন করা সম্পদ আর রিভলবারটা ফেলিয়া দেয় মেয়েটির পায়ের কাছে। বলে—যা হয় কর তুমি! তোমার হাতেই আমার জীবন-মরণ।

মনে মনে উৎসাহে সে উচ্ছ্বসিত হইয়া লাফাইয়া উঠিয়া পড়ে। নির্জন স্থানটায় অকারণে বিকৃত মস্তিষ্কের মত একটা চীৎকার করিয়া গাছের পাখী, কাঠবিড়ালীদের সচকিত করিয়া দেয়।

পাখীরা শব্দ করিয়া উড়িয়া যায়, নিশ্চিন্ত বিচরণরত কাঠবিড়ালীগুলা লেজ উঁচু করিয়া চিক্ চিক্ শব্দ করিয়া লাফ মারিয়া গাছে উঠিয়া পড়ে—দুলালহা হা করিয়া হাসে।

সে দিন, একদিন ঠিক এমনই মুহূর্ত্তে মানগোবিন্দপুরের একটা বসতি-ঘন পাড়া হইতে সচকিত কলরব ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল—আগুন—আগুন!

মাথার লম্বা চুলে ঝাঁকি দিয়া দুলাল ঘাড় ফিরাইয়া দেখিল—দূরে কুণ্ডলী পাকাইয়া কালো ধোঁয়া উঠিতেছে। এ্যা-র্ত্ত—বলিয়া একটা চীৎকার করিয়া দুলাল ছুটিল। চৈত্রের শেষ অপরাহ্ণ বেলা। শীতান্তে আগুন জরা পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যের তেজে লেলিহান—প্রখর। লোকজন অনেক জমিয়াছে। রাধাচরণ, শোভাদিদি আসিয়া হাজির হইয়াছেন।

—জল! জল! জল!

জল আসিয়াছে। কিন্তু আগুন যেখানে জ্বলিতেছে—সেখানে কেহ যাইতেছে না। লাফ দিয়া দুলাল চালে উঠিয়া পড়িল। নিজের মাথায় এক হাঁড়ি জল ঢালিয়া লইয়া আগাইয়া গেল।—লে আও জল। আর দা একখানা।

খানিকটা জল দিয়া নিভাইয়া, বাকীটা দায়ের কোপে কাটিয়া চালাখানাকে ঘরের ভিতরে ফেলিয়া দিয়া আগুনকে ঘরের চারিখানা দেওয়ালের মধ্যে বন্দী করিয়া ফেলিল। তারপর দেওয়ালে দাঁড়াইয়া বলিল—এইবার ঢালো জল।

একবার নয়, তিন-চারবার নিজেকে ভিজাইয়া লইয়াছিল সে। তবুও সর্বাঙ্গ ঝলসিয়া গিয়াছিল, বিশ-পঁচিশটা ছোট বড় ফোস্কা পড়িয়াছিল; তিন-চার জায়গা কাটিয়াও গিয়াছিল। শোভাদিদি নিজের হাতে ওষুধ লাগাইয়া দিয়াছিলেন; প্রসন্নতায়—বিস্ময়ে—প্রশংসায় শোভা-দিদিকে যে কি সুন্দর তাহার লাগিয়াছিল সেদিন! তিনি সেদিন বলিয়াছিলেন—দুলাল সত্যিই একটা বীরপুরুষ!

দুলালের ইচ্ছা হইয়াছিল এ্যা-র্ত্ত বলিয়া সে একটা চীৎকার করিয়া ওঠে!

বিয়ে! বিয়ে একটা তিলক-ফোঁটা-কাটা বোষ্টুম মেয়েকে!

রাগে মাথায় চুল ঝাঁকি দিতে দিতে সে মাঠের পথে মানগোবিন্দপুরের দিকে চলিল। নিজেও সে ওই ফোঁটা-তিলক কাটিয়া মাথা ন্যাড়া করিয়া খাটো থানকাপড়ের বহির্বাস পরিয়া মহান্ত সাজিতে পারিবে না।

অভ্যাসমত সে মাঠের মধ্যে চীৎকার করিয়া উঠিল—এ্যা-র্ত্ত।

আঃ! খুব সহজে পরিত্রাণ পাইয়াছে কিন্তু। অসুখে ভুগিয়া এক মুঠা ভাত খাইয়া এমনই তাহার মোহ হইয়াছিল যে মাকে সে বৈষ্ণব মহান্ত হইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বসিয়াছিল।

—দুলাল! দুলাল! মহেশ মণ্ডল পিছন হইতে ডাকিল। মণ্ডল অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। বেচারী একটি ভাল মেয়ের সন্ধান পাইয়া খুশী মনেই ব্রজদাসীকে খবর দিতে আসিয়াছিল। আনন্দের উচ্ছ্বাসেই সে দুলালের কাছে কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছে। দুলালের মনের এই অদ্ভুত কল্পনাবিলাসের কথা তাহার জানাও ছিল না। সে ভাবিয়াছিল দুলাল এ খবরে পুলকিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু এ কি বিপরীত কাণ্ড হইয়া গেল! মণ্ডল ব্যাপারটা ঠিক বুঝিতে পারিল না। হইল কি? দুলাল বাহির হইয়া গেল—সে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল। তারপর ব্যাকুল হইয়া ছুটিল—দুলাল—অ দুলাল!

দুলাল মাঠে ঘুরিয়া দাঁড়াইল। ওই লোকটা তাহার পিছনে ছুটিয়াছে! ওই লোকটা তাহার দুই চক্ষের বিষ! কার্তিক শেষের রবি-ফসলের চষা মাঠের চ্যাঙড় তুলিয়া লইয়া দুলাল

পাগলের মত ছুঁড়িতে আরম্ভ করিল।

মহেশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

একটা মাটির চ্যাঙড় আসিয়া লাগিল তাহার পায়ে। মহেশ মণ্ডলও প্রচণ্ড বলশালী ব্যক্তি। তাহার দেহও বিশাল দেহ। আঘাত কম হয় নাই, কিন্তু মহেশ শুধু একবার মুখ বিকৃত করিল মাত্র। যন্ত্রণায় রাগও হইল। ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া ছেলেটাকে ধরিয়া হাতখানা মুমড়াইয়া ভাঙিয়া দেয়। না—গলা টিপিয়া শেষ করিয়া দিয়া আদালতে গিয়া হাতজোড় করিয়া বলে—ধর্মাবতার—

কিন্তু মা-জীর মুখ মনে পড়িয়া গেল। সে মাথা হেঁট করিয়া ফিরিয়া আসিল। মা-জী ফিরিয়া আসুক!

ছয়

ব্রজদাসী পুলকিত চিত্তেই বাড়ী ফিরিতেছিল। একটি ভালো মেয়ের সন্ধান সে পাইয়াছে। এ মেয়ের সঙ্গে দুলালকে বাঁধিতে পারিলে দুলাল বাঁশীর সুরে মুগ্ধ সাপের মত স্থির হইয়া দুলিতে দুলিতে ঘুমাইয়া পড়িবে—তাহাতে তাহার সংশয় ছিল না।

আপন মনেই সে পথ চলিয়াছিল। আশপাশের দিকে লক্ষ্য পর্যন্ত ছিল না। মন তাহার আপনার মধ্যেই মগ্ন হইয়াছিল। ওই মেয়েটির কথাই সে ভাবিতেছিল। গোকুলবাড়ী গাঁয়ের ভোলাদাসী কলিকাতায় ঝি-গিরি করে। পনের-ষোল বৎসর আগে চার বছরের ছেলে লইয়া বিধবা হইয়াছিল, পেটের দায়ে স্থানীয় বাবুদের বাড়ী কাজ লইয়া তাদের সঙ্গে কলিকাতা গিয়াছিল। কলিকাতা ভাল করিয়া চিনিয়া শুনিয়া বাবুদের বাড়ীর কাজ ছাড়িয়া ঠিকা ঝিয়ের কাজ করে, আজও করে। ছেলেটা না-থাকিলে হয়তো দেশের সঙ্গে সম্পর্কও রাখিত না। এখন ছেলে বড় হইয়াছে, গোকুলপুরে ঘরদুয়ার করিয়া সে এখন দেশেই থাকিতে চায়। কিন্তু বিপদ হইয়াছে একটা মেয়ে লইয়া। ভোলাদাসী বলে মেয়েটি তাহার নয়, তাহাদের ঠিকা-ঝিয়ের আস্তানার এক বান্ধবী সখির মেয়ে। সখিটি মরিবার সময় তিন মাসের মেয়েটিকে ভোলাসাদীর হাতে তুলিয়া দিয়া গিয়াছে—বলিয়া গিয়াছে—সই, তোমার ছেলে আছে, এটি তোমার মেয়ে হ'ল। এটিকে তুমি দেখো। সেই মেয়ের বয়স আজ বারো বছর। ভোলাদাসী এখন বিপদে পড়িয়াছে। ভোলাদাসী ওই মেয়ে লইয়া যে বৎসর প্রথম গ্রামে আসে—তখনই সমাজে নানা কথা উঠিয়াছিল। ভোলাদাসীর কথা শুনিয়া সাধারণ লোকে মুখ টিপিয়া হাসিয়াছিল। সমাজপতিরা মুখ গম্ভীর করিয়া হরিনাম স্মরণ করিয়াছিল। এইখানেই শেষ হয় নাই, ভোলাদাসীকে সমাজ একঘরে করিয়াছিল। সেদিন ভোলাদাসী সমাজকে গ্রাহ্য করে নাই। মেয়েটাকে লইয়া নাক উঁচু করিয়া কলিকাতা চলিয়া গিয়াছিল; ছেলেকে রাখিয়া গিয়াছিল নিজের বাপ-ভাইয়ের কাছে। এখন ভোলাদাসীর বড় বাসনা—ছেলের বিবাহ দিয়া বউ ছেলে লইয়া ঘরসংসার করে। ঘর সে করিয়াছে, ভাল কোঠা ঘর, টিনের চাল, পাকা মেঝে; কলিকাতা হইতে কত ছোটখাটো আসবাব আনিয়া ঘর সাজাইয়াছে। কিন্তু বিপদে পড়িয়াছে ওই মেয়েকে লইয়া। মেয়ের মত পালন করিয়া আজ কোথায় ফেলিয়া দিবে? পরের মেয়ে—বুকে তুলিয়া মানুষ করিয়া

আজ যে আপন সন্তানের বেশী হইয়া উঠিয়াছে সে। অথচ ওই মেয়ে ঘরে থাকিতে সমাজ তাহাকে গ্রহণ করিবে না। তাহার ছেলের হাতেও কোন গৃহস্থ মেয়ে দিতে চাহিতেছে না।

সন্ধান পাইয়া সে গোকুলপুরের মণ্ডলকে গিয়া ধরিয়াছিল—এই সম্বন্ধটি আপনি ক'রে দেন মণ্ডল ; প্রভু আপনার ভাল করবেন।

মণ্ডল মহাশয় মুখ ভার করিয়াছিল।

ভোলাদাসী আজ অনেকগুলি টাকা লইয়া দেশে ফিরিয়াছে—মহাজনী করিতে আরম্ভ করিয়াছে, অহঙ্কার তার অনেক। চালচলন কথাবার্তায় সে গোটা গ্রামখানাকেই অবজ্ঞা করিয়া চলে। কথায় কথায় বলে—'টাকা বেটা, পাথর কাটা'। একমাত্র ওই মেয়েটির ঠেকায় সমাজে ঠেকিয়া আছে। মেয়েটিকে যদি কোনমতে কাহারও হাতে সমাজ-সম্মত উপায়ে তুলিয়া দিতে পারে তবে আর তাহাকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারা যাইবে না। তবে মুখভারের এইটাই একমাত্র কারণ নয়, আরও একটা কারণ আছে। মণ্ডল বৈষ্ণবী ব্রজদাসীকে শ্রদ্ধা করে—স্নেহ করে। সেই কারণে ওই ভোলাদাসীর মত বিলাসিনী গোপন-দেহপসারিনীর ওই পাপের ফলকে গ্রহণ করিতে দিতে তাহার আপত্তি আছে। সে মুখ ভার করিয়া বলিয়াছিল—আপনি এই কথা বলছেন মা-জী ? আপনি ত সব জানেন।

ব্রজ সবিনয়ে হাসিয়া বলিয়াছিল—শুনেছি অনেক কথাই মণ্ডল মশাই, কিন্তু শোনা কথা—সব সময়ে সত্যি তো হয় না !

—আপনার শোনা কথা—আমরা যে চোখে দেখেছি। ও পাপ আপনি ঘরে ঢোকাবেন না। আপনারা অবিশ্যি বৈষ্ণব, আপনাদের ধর্মে মহাপ্রভুর দয়ায় সকল জনের ঠাঁই আছে ; জাত-জন্ম সমস্ত কিছুর যত পাপই থাকুক না কেন—সবই ঘুচে যায় আপনাদের ধর্মের পুণ্যে, কিন্তু এ মেয়ের পাপ ঘুচবে না—এ আমি জোর গলা ক'রে বলতে পারি।

ব্রজ মিথ্যা কথা বলিয়াছিল—কিন্তু আমি যে স্বপ্নাদেশ পেয়েছি বাবা !

—স্বপ্নাদেশ !

—হ্যাঁ বাবা। কাল মহেশ মণ্ডল মশায়ের সঙ্গে দুলালের বিয়ের কথা বলেছিলাম। কিছুদিন থেকে ওর বিয়ে দোব-দোব ভাবছি। কিন্তু এত বড় অসুখটা গেল, ও-কথা ভাববার সময় ছিল না। দুলাল পথ্যি করেছে, আবার কথাটা মনে হ'ল। মণ্ডল মশায়ের সঙ্গে কথাবার্তা বললাম কাল। তারপর রাত্রে শুয়ে ঘুমিয়েছি—স্বপ্ন দেখলাম, একটি ছোট ছেলে, কালো রঙ, হাতে পাঁচন লাঠি, মাঠের ধারে বসে আছে, গরু চরাচ্ছে ; আমি যাচ্ছি মেয়ে খুঁজতে। সেই ছেলেটি বললে—মা-জী, এই সামনের গাঁয়ে ভোলাদাসীর মেয়েটির সঙ্গে ছেলের বিয়ে দাও। বেশ মেয়ে গো। ভাল মেয়ে। তবে মায়ের আওতায় আছে, মায়ের 'ছোঁয়া' তার ওপর পড়েছে তাই মনে হচ্ছে খারাপ। তুমি ওকে নিয়ে যাও মা-জী, গোপালের প্রসাদ খাইও, তিন বেলা প্রণাম করিও—দেখবে ওর আসল চেহারা বেরিয়ে পড়বে। পতিতকে উদ্ধার করো, প্রভু তোমার ভাল করবেন !

এক বিশ্বাসে এতগুলি মিথ্যা কথা বলিয়া ব্রজদাসী শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল—এর পর আমি কি না এসে পারি, আপনিই বলুন !

মণ্ডল অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। প্রবীণ মানুষ ; স্বপ্নাদেশ তাহার কাছে অবিশ্বাস্য নয় এবং দৈবলীলার প্রকাশ-বৈচিত্র্যেও তাহার গভীর বিশ্বাস, তাহার উপর এই ভক্তিমতী ভালমানুষ বৈষ্ণব মেয়েটি এ অঞ্চলে এমনই শ্রদ্ধা ও স্নেহের পাত্রী যে তাহাকে সে মিথ্যাবাদিনীও ভাবিতে পারিল না। কিন্তু এ প্রস্তাবে সায় দিতেও তার মন সরে না।

ব্রজ নিজেও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া না থাকিয়া পারে নাই। মনে মনে নিজের কাছেই তাহার লজ্জার সীমা ছিল না। কিন্তু তাহার যে উপায় নাই। দুলালকে যে তাহার বাঁধিতেই হইবে! গোবিন্দ জানেন—অপরাধ তাহার নাই—কিন্তু দুলালের জন্ম যে অপরাধের মধ্যে। জন্মের অপরাধে সে পতিত ; পাপ তাহার জীবনকে এমন উচ্ছৃঙ্খল করিয়া তুলিয়াছে। মুক্তি আছে প্রভুর চরণাশ্রয়ে। সেই আশ্রয় তাহাকে গ্রহণ করাইতে হইবে। তাহার একমাত্র উপায় উহাকে তাহার ওই প্রভুর সংসার ওই আখড়ার ঘরকন্নায় আবদ্ধ করা। ভোলাদাসীর মেয়েটিও পতিত—একই অপরাধে অপরাধিনী সে। দুই পতিতকে একসঙ্গে বাঁধিয়া দিবে সে—ফেলিয়া দিবে তাহাদের প্রভুর চরণাশ্রয়ে। ইহার জন্য সে মিথ্যা কথাটা বলিয়া গেল—একেবারে পাকা মিথ্যাবাদিনীর মত ; এতগুলা মিথ্যা বলিয়া সে নিজেই অবাক হইয়া গেল—কেমন করিয়া এমন নিপুণভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া কথাগুলা বলিল! সঙ্গে সঙ্গে লজ্জাও পাইল। কিন্তু উপায় কি ? যে শাস্তি যে দণ্ড তাহার প্রভু তাহাকে দিবেন—সে পরমানন্দে হাসিমুখে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিবে, আক্ষেপ করিবে না—শুধু দুলাল উদ্ধার পাক। শুধু তো উদ্ধারই নয়, দুলাল একান্তভাবে তাহার হইয়া—তাহার সংসার—তাহার বুক জুড়িয়া থাক।

কিছুক্ষণ পর মণ্ডল বলিল—গোবিন্দের ইচ্ছা মা-জী। এর ওপর আমি আর কি বলব! তা হ'লে চলুন। আপনাকে নিয়ে যাই—ভোলাদাসীর বাড়ী। দেখুন—সে আবার কি বলে! আদেশ আপনার ওপর হয়েছে, তার ওপর তো হয় নাই। তা-ছাড়া সে তো আপনার-আমার মত নয়। সে কলকাতায় থাকে। সে—

মণ্ডল কথাটা বলিতে গিয়া চুপ করিয়া গেল। এই ভক্তিমতী বৈষ্ণবীর সম্মুখে কুৎসিত মন্তব্য প্রকাশ করিতে গিয়া সঙ্কোচে জিভ যেন আপনি গুটাইয়া গেল।

ভোলাদাসীর অর্থের অহঙ্কার মণ্ডলের সহ্য হয় না—সেজন্য সে বেশ খানিকটা তাহার উপর বিরক্ত এ কথা সত্য—কিন্তু অন্য দিকটায় মণ্ডল মিথ্যা অপবাদ দেয় নাই। ব্রজ ভোলাদাসীর বেশভূষা দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। বৈধব্যের নিরাভরণতাকে যে এমন বিলাস-সজ্জায় পরিণত করা যায়—এ ধারণাই তাহার ছিল না। শৌখীনহাতা ধোয়া সেমিজের উপর চুল-পাড় মিহি ধুতি পরিয়া ঝকঝকে পানের বাটা পাড়িয়া পান সাজিতেছিল। চুলে পাক ধরিয়াছে ভোলাদাসীর—কিন্তু এমন চলকো করিয়া কান ঢাকিয়া এলোখোঁপা বাঁধিয়াছে যে ব্রজ লজ্জা অনুভব করিল। একবার মনেও হইল—না—কাজ নাই, ফিরিয়া যাই। কিন্তু ওপাশের দাওয়ায় রন্ধনরত কিশোরী মেয়েটাকে দেখিয়া সে সমস্ত বিতৃষ্ণা উপেক্ষা করিল। চমৎকার মেয়েটি। রূপ আছে, সে রূপে পারিপাট্যও আছে ; ভালো করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিল—রান্নার কাজে মেয়েটির ক্ষিপ্র নৈপুণ্যও আছে। শুধু তাই নয়—আচার আছে মেয়েটির। কাঁচা তরকারির পাত্রটা তুলিয়া কড়াইয়ে তুলিবার পূর্বে এঁটো হাতটা ধুইয়া লইল। আরও লক্ষ্য করিল—ভিজে হাত সে কাপড়ের আঁচলে মুছিল না। মণ্ডল এবং ব্রজদাসীকে দেখিয়া গায়ের কাপড় সে ঠিক করিয়া লইল কিন্তু হাতের হলুদ-মসলা-মাখা দিকটা দিয়া নয়, হাতের চেটোর উল্টো পিঠ দিয়া কাঁধের উপর ভাঁজ করা আঁচলখানা অনাবৃত হাতের উপর নামাইয়া লইল। বেশ মেয়ে। আচার যখন আছে, পরিচ্ছন্নতা যখন আছে তখন আশা আছে। আচার থাকিলে ভক্তি আসিবে। মাটি পরিমাটি করিয়া খুঁড়িয়া চষিয়া বীজ পুঁতিলে অঙ্কুর মেলিতে দেরি হয় না। ব্রজদাসীর বাউল গুরু বলিতেন—"মানুষের মন হ'ল মাটি—আচার হ'ল তার

চষা-খোঁড়া; ওইটুকু না হ'লে ভক্তির সাধ্বী লতার বীজ গজায় না।"

ব্রজদাসী শক্ত হইয়া দাঁড়াইল।

মণ্ডল বলিল—ভোলাদাসী, ইনি হলেন গোবর্ধনপুরের গোপালজীর আখড়ার মা-জী।

ভোলাদাসী বলিল—কি ভাগ্যি আমার! ওঁর গানের কথা বলতে লোকে পঞ্চমুখ। আমার কপাল, আমি শুনি নাই। আসুন—আসুন। ওঁর কল্যাণে আপনার পায়ের ধুলো পড়ল আমার বাড়ীতে—সে আমার আরও ভাগ্যি।

ভোলাদাসীর তরিবৎ কথা-বার্তা ভদ্রলোকের মত। সে আসন পাতিয়া দিল।

মণ্ডল বলিল, গান নয় ভোলাদাসী। কথা আছে।

মণ্ডল বলিল—তোর এতে ভালো হবে, ভোলাদাসী।

ভোলাদাসী বুদ্ধিমতী; সে এক মুহূর্তে সব বুঝিয়া লইল। সে বলিল—সে তো আমার ভাগ্যি। মেয়ের ভাগ্যি, আমার ভাগ্যি। মেয়েকে পেটে ধরিনি—কিন্তু একমাসের মেয়ে কোলে নিয়ে এত বড় করে তুলেছি। ওকে নিয়ে আমার কলঙ্কের সীমা নাই তবু ওকে ফেলতে পারি নি। ভেবে আকুল হচ্ছিলাম—কোথা কার হাতে দোব ওকে! তা দুখের শেষে সুখ—পারুলের আমার খুব কপাল।

তারপর হাসিয়া বলিল—তেমনি ভাল কপাল আমার, এমন বেয়ান পাব।

মণ্ডল বলিল—তা' হলে তোমরা দুজনে কথাবার্তা বল। আমি এখন যাই।

মণ্ডল চলিয়া গেলে ভোলাদাসী পান-দোক্তা মুখে পুরিয়া বলিল—এইবার ভাই খোলাখুলি কথা! কি বল?

পানের পিচ ফেলিয়া বলিল—কিছু মনে করো না ভাই; কুচুক্কুরে মোড়ল চলে গিয়েছে—সোজাসুজি কথা বলব। রাগ কর—দোষ ধর—নিজের ঘরে গিয়ে পেট ভরে ভাত খেয়ো, প্রাণ-ভরে গাল দিয়ো আমাকে। আমার কথা তুমি জান, এ অঞ্চলে আমার নামে অনেক রটনা অনেক গুজব! আর—

বেশ একটু সরস হাসি হাসিয়া ভোলাদাসী বলিল—তুমিও ভাই আজ পনের-ষোল বছর এখানে এসেছ, তোমার কথাও লোকে বলে, বারো মাস দেশে না থাকি—মাঝে মাঝে আসি, সে সব কথা আমিও শুনেছি। রাগ ক'রো না যেন। তোমার দুলালের বাপের কথা নিয়ে সে-সব অনেক কথা! তা ভাই এক পথের রাহী আমরা—পথের ফেরের কথা দুজনেই জানি। মেয়ে আমারই—সে কথা তোমার কাছে লুকোব না! অল্প বয়সে বিধবা হয়ে খেটে খেতে পথে নেমেছিলাম, গায়ের জ্বালায় কাদা মেখেছি, সেই কাদায় শালুক ফুলের মত মেয়ে আমার অঙ্গে ফুটে উঠল। নিজে ভাই অনেক রোজগার করেছি, সুখও করেছি, কিন্তু মেয়েকে সে পথ দেখাতে মন সরে না। নইলে ও তো আমার নম্বুরী নোট—বাজারে ছাড়লে আমি তো আঁচল ভরে টাকা পাই!

কথাবার্তা শুনিয়া ব্রজদাসীর সমস্ত শরীর যেন কেমন হিম হইয়া গিয়াছিল। বিশেষ করিয়া ভোলাদাসী তাহাকে যখন নিজের দলে টানিয়া তার পাপের সমান ওজনের পাপ তাহার মাথায় চাপাইয়া দিয়া বলিল—"এক পথের রাহী আমরা। পথের ফেরের কথা দুজনেই জানি,"—তখন তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতে চাহিল—না—না—না—চোখ ফাটিয়া তাহার জল আসিল। কিন্তু সে শুষ্ক হাসি হাসিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় আত্মসম্বরণ করিল।

এ সমস্ত কথার জবাব সে দিল না। সে মেয়েটিকে ডাকিয়া কাছে বসাইয়া বলিল—হ্যাঁ মা—বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর ওপর তোমার ঘেন্না নাই তো ?

মেয়েটি উত্তর দিল না—মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল।

ব্রজ এইটুকুতেই সন্তুষ্ট হইল। মেয়েটির লজ্জা আছে। সে আবার প্রশ্ন করিল—কপালে তিলক কাটতে হবে—নাকে রসকলি পরতে হবে—তুমি আবার কলকাতায় মানুষ হয়েছ—লজ্জা করবে না তো ? মন উঠবে তো ? হ্যাঁ—পারুল ?

পারুল এবারও হাসিল, ওই মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল—কিন্তু এবার বোধ হয় হাসিটা বেশী, মুখে সে কাপড় চাপা দিল।

ব্রজ আরও খুশী হইল। আসলে সে খুশী হইবার জন্য মনেপ্রাণে প্রস্তুত হইয়াই ছিল। সে বুঝিতে পারিল না, মেয়েটি মায়ের মুখের দিকে চাহিয়াছিল ইঙ্গিতের জন্য এবং সেখানকার ইঙ্গিত-মতই সে নীরব হইয়া থাকিল, হাসিটা অবশ্য ইঙ্গিতে নয়—মনের কৌতুকে।

ব্রজ ভাবিল—ঠিক আছে, বিবাহ দিয়া ঘরে তুলিতে পারিলে আবার কি ? ভোলাদাসীর ছায়া মাড়াইতে দিবে না। বৈষ্ণবধর্মের দীক্ষা দিয়া জাত্যন্তর ঘটিলে ভোলাদাসীর আর কোন্ দাবী থাকিবে! আর মায়ের স্নেহ দিয়া মেয়েটিকে সংসারের সুপথের আনন্দ আস্বাদ করাইতে পারিলে—ওই মেয়েই কি আর মায়ের দিকে ফিরিয়া চাহিবে ? যে শুঁয়াপোকা পাতা খায়—গাছ নির্মূল করে, সে যখন গুটি কাটিয়া প্রজাপতি হইয়া আকাশে পাখা মেলে—সে তখন আর গাছের পাতার স্বাদে আকৃষ্ট হয় না—সে তখন সেই গাছেরই মধু আস্বাদন করিয়া ধন্য হয়। মেয়েটির শুঁয়াপোকার অবস্থা হইতে সে তাহাকে রেশম কীটের মত সযত্নে পালন করিয়া প্রজাপতি করিয়া ছাড়িয়া দিবে। 'জয় গোবিন্দ' বলিয়া সে সকল মান, অপমানবোধ দূরে সরাইয়া ভোলাদাসীর হাত দুটি চাপিয়া ধরিল—বলিল—তা হলে এই কথা ঠিক রইল।

ভোলাদাসী হাসিয়া বলিল—ঠিক রইল বই কি ভাই। না হলে কি তোমার কাছে নিজের কলঙ্কের কথা এমন করে বলতাম! আমি খুব খুশী—আমি খুব রাজী। মেয়েটাকে তোমার ঘরে পাঠালেই আমি খালাস। ছেলের বিয়ে দোব। মনে মনে এমনিই খুঁজছিলাম। তোমার ছেলের জন্মে কলঙ্ক—আমার মেয়েরও জন্মে কলঙ্ক। কেউ কাউকে ছোট ভাববে না, ঘেন্না করবে না। তার চেয়েও ভাই বড় কথা—একেই আমি মেয়ের মা, তার ওপরে এই কলঙ্ক—ছেলের মায়ের কাছে মাথা হেঁট করতে হবে না। তুমি আমার মুখে কালী দিলে আমি তোমার তোমার মুখে চুন-কালি দোব।

হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তার পর বোধ হয় ভদ্রতার খাতিরে বিনয় করিয়া বলিল—কিছু মনে করো না বেয়ান—আমার কথাবার্তা ওই এক রকম! রেখে ঢেকে কথা বলতে পারি না। পারলে—। একটা কৃত্রিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—পারলে ভাই রাজরাণী হতে পারতাম। বুঝেছ না!—সে বলব একদিন। পাকাপাকি বেয়ান হই—তারপর বলব। ওরা দুজনে একঘরে শোবে—আমরা দুজনে শুয়ে সে-সব গল্প বলব।

আবার হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ব্রজ মনে মনে ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া বলিল—তুমি আমার মান রাখ। আমাকে তুমি ধৈর্য দাও, সহ্য করবার শক্তি দাও। দুলালকে আমি ঘরে বাঁধব। তোমার চরণাশ্রয়ে ফেলে দোব।

ওখান হইতে বাহির হইয়া সে ওই সব কথাই ভাবিতেছিল। কিন্তু মন তাহার একটি

প্রবল বাসনাকে কেন্দ্র করিয়া চারিপাশে ঘুরপাক খাইয়াই ফিরিতেছিল—কেন্দ্রটির মায়া ছাড়িয়া সোজা চলিবার শক্তি তাহার ছিল না। থাকিলে ভোলাদাসীর কথাবার্তা শুনিয়া তাহারই গর্ভের ওই কন্যাটির বাহ্য সুশীলত্ব সম্পর্কে তাহার অন্ততঃ সন্দেহ জাগিত। ভাল করিয়া যাচাই করিয়া দেখিবার সঙ্কল্প করিত সে। ভোলাদাসীর মেয়েটি সুশ্রী—মেয়েটি রূপের মার্জনা জানে; তাহার রূপের একটা আকর্ষণ আছে। এ মেয়ের সঙ্গে দুলালকে বাঁধিলে দুলাল বাঁধা পড়িবে!

গোবিন্দ ভরসা! গোবিন্দের প্রতি যদি তাহার ভক্তি থাকে তবে বিষ অমৃতে পরিণত হইবে। তাহার ধর্মনিষ্ঠ বিশ্বাসী মন কত কল্পকাহিনী স্মরণ করিল। মনকে ওই বিশ্বাসে আশ্বস্ত করিয়া ছেলের বিবাহ দিয়া একটি সুখের সংসার গড়িবার কল্পনায়—মধুচক্র রচনারত মধুমক্ষিকার মত বিভোর হইয়া উঠিল।

* * * *

পথে মাঠের মধ্যে একটা গাছতলায় বসিয়া ছিল বাগ্দীবুড়ী। বটগাছ-তলায় পা ছড়াইয়া বসিয়া আপন মনে বিড় বিড় করিয়া বকিতেছিল আর বাঁ হাতের আঙুলে টানিয়া ভুরু ছিঁড়িতেছিল। আপন মনেই হিসাব করিতেছিল—কার্তিক গেল—আগন মাস এল—আউশ ধান কাটা শেষ হ'ল, খাঁ খাঁ করছে আউশের মাঠ; আমার মরণ, কাজ নাই কর্ম নাই—তাই এসেচি ধানের শীষ কুড়োতে। এইবার সব গম বুনবে, কলাই ফেলবে, আলু লাগাবে, সরষে বুনবে, আগনের শেষ থেকে হেঁওত কাটা আরম্ভ। এ মাসটা কি করব তাই ভাবছি'! কি আর করব? খাল-ডোবা দেখে মাছ কাঁকড়া ধরব। তা আবার মাছ কাঁকড়া ধরতে সঙ্গী চাই। সঙ্গী আবার কোথা পাই? আঃ—দুলাল ছোঁড়া যে বড় হয়ে গেল! এমনি সঙ্গী হয় তবে তো সুখ। শক্ত ডাঁটো ছেলে, কপাকপ মাছ ধরে, ভাগ নেয় না, দুটো রাঁধা মাছ খেয়ে খুশী। আমারও রেঁধে সুখ। তা বিধেতার যেমন বিচের, ছোঁড়া আবার বড় হয়ে গেল। এমন তেমন বড় নয়—এ্যাই বড়। শুধু বড় নয়—পাখনা গজালো। আজকাল আবার মাছ ধরবার কথায় হাসে। তেমনি কি রাগ! কুমীরে ধরল—সেই রক্তারক্তি শরীল নিয়ে আমার ঘরে এল। তা-পরেতে যমে মানুষে টানাটানি। বাঁচলি যদি তো—দশদিন চুপ করে থাক, খা—দা, শরীলটা তাজা কর! তা' না—এই শরীলে মায়ের ওপর রাগ করে—। কে গো সাদা মতন—কে গো? ভারী ত্বরিত পায়ে চলেছ, লাগছে। অ—মা-মাথায় কাপড় রয়েছে যেন? মেয়ে লোক—কে গো? আঃ—হেলে দুলে খুব হরষপরশ হয়ে চলেছ যে গো? ওগো—অ—মেয়ে! বলি এত হরষপরশ হয়ে চলেছিস কোথা গো? কে গো তুই?

ব্রজ চকিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। বুড়ীকে সে লক্ষ্যই করে নাই, বুড়ীকে দেখিয়া সে খুশী হইল, বুড়ী দুলালের শৈশবের সঙ্গিনী। কতদিন ব্রজ রহস্য করিয়া ছেলেমানুষ দুলালকে বলিত—ওই বাগ্দী বুড়ীর সঙ্গে তোর বিয়ে দোব!

বুড়ী হাসিত। দুলাল রাগ করিত।

পুলকিতচিত্ত ব্রজ রহস্য করিয়া বলিল—চিনতে পারছ না?

—না। তবে গলাটা চেনা-চেনা মনে লাগছে। কে গো তুই?

—চিনলে তো খুশী হবে না বাছা—মনে হবে এ আবাগী কোথা থেকে এল আমার মাথা খেতে।

—কে লা? তুই আমার মাথা খাবি, তোকে আমি ভয় করব! বলি তোর ঘর কোথা লো?

—আমি তোমার শাউড়ী গো!

—শাউড়ী? অ! বেশ মা! তা—। আশ্চর্য হইয়া গেল বাগ্দীবুড়ী, ব্রজর কণ্ঠস্বরে এমন আনন্দোচ্ছ্বাস কেমন করিয়া ঝরিয়া পড়ে। দুলাল যে এই প্রথম দুপুরে তাহার চোখের সামনে দিয়া রাগ করিয়া চলিয়া গেল। সে তো সেই অবধি মাঠেই আছে—কিন্তু কই দুলালকে তো সে ফিরিতে দেখে নাই।

ব্রজ কাছে আসিয়া বুড়ীর পাশে বসিয়া পড়িল। হাসিয়া বলিল—তোমার সতীনের খোঁজে গিয়েছিলাম পিসী, তুমি তো বাছা আমার ঘরেও এলে না, সেবা-যত্নও করলে না। তাই নতুন বউয়ের খোঁজে বেরিয়েছিলাম। বেটার আমার আবার বিয়ে দিচ্ছি। তুমি যেন রাগ-রোষ ক'র না বাপু।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে ব্রজর মুখের দিকে চাহিয়া বুড়ী বলিল—বেটার বিয়ে দেবে, কনে খুঁজতে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ পিসী। তা ভালো মেয়ের খোঁজ পেয়েছি।

—তাই দাও, কোন রকমে সাতপাক ঘুরিয়ে দাও। ছোড়া ফাঁদে-পড়া ঘুঘুর মত মজাটা দেখুক। তা সে ফিরল কখন? কি রাগ মা? মাঠে তখন ধান কুড়ুচ্ছি। হন হন ক'রে যাচ্ছে, বললাম—কে রে? কে? তা বললে তোর যম! ফের ফ্যাচ ফ্যাচ করবি তো তোকে মেরেই ফেলব। গলার আওয়াজে বুঝলাম—দুলাল। বললাম—হ্যাঁরে দুলো, এত বড় অসুখ গেল, এই সাতদিন আগে তোকে বিছানায় শুয়ে থাকতে দেখে এলাম, এর মধ্যে যাবি কোথা? তোর কথা শুনে মনে হচ্ছে যেন রাগ করে যাচ্ছিস! আমার মুখের কাছে দু'হাত নেড়ে দাঁত-কষকষ ক'রে বললে—বেশ করছি। তোর কি? আমি বললাম—তা বেশ ভাই, বেশ। আমার কিছু না নয়। কিন্তু রোগা শরীল নিয়ে যাবি কোথা রাগ ক'রে, চল—আমার বাড়ী চল। সে তো তোর গোঁসাঘর। বললে—নাঃ। ব'লে মা হন হন করে চলে গেল। কিন্তু ফিরতে তো দেখলাম না!

ব্রজর আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সে কি? দুলালকে খাওয়াইয়া নিজে দুটো মুখে দিয়া বাহির হইয়াছে। প্রসন্নমুখে দুলালকে সে সিগারেট খাইতে দেখিয়া আসিয়াছে। ইহার মধ্যে দুলাল রাগ করিবে কার উপর? সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। বলিল—কি বলছ পিসী? দুলাল? দুলাল রাগ ক'রে গিয়েছে? তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—হ্যাঁ! দেখা হয় নাই? আমি কি বসে ব'সে ঘুমাচ্ছিলাম নাকি—স্বপন দেখছিলাম নাকি?

ব্রজ তবু বলিল—তা দেখ নাই, তবে তুমি কাকে দেখে কাকে ভেবেছ! দুলাল নয়?

—আমি কাকে দেখে কাকে ভেবেছি? আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছে? আমায় বাহাত্তুরে ধরেছে? আমাকে কানা বলছ নাকি? তা কানা না হয় হয়েছি, চোখে না হয় ঝাপসাই দেখি, কিন্তু কালাও হয়েছি নাকি? বলি—হ্যাঁ গো—দুলালের পিছু পিছু মোড়ল এল, ডাকলে—

—কে? মহেশ মণ্ডল মশায়?

—হ্যাঁ গো। ও মা—পায়ে ঢেলা মেরে মোড়লের পা একবারে ফাটিয়ে দিয়েছে। মোড়লকে শুধালাম—কি হ'ল মণ্ডল মশায়! মোড়ল কথা ভাঙলে না, বললে—ও একটা কাণ্ড হয়ে গেল। একেই রাগী ছেলে—তার ওপর রোগা শরীল—কথায়-কথায় রাগ, বুঝলে না বাগ্দী-বউ! হেসে বললে—দেখ না—ডাকলাম—তো কেমন ঢেলা মেরেছে দেখ না! মোড়ল আরও

খানিকটা গেল। তা' পরে ফিরে এল। কই দুলাল তো ফেরে নাই।

ব্রজ আর অবিশ্বাস করিল না।

সে বুঝিয়াছে। সে যে জানে। মণ্ডলের সঙ্গে দুলালের আক্রোশ সে জানে। বিচিত্র হাসি ফুটিয়া উঠিল তাহার মুখে। মণ্ডলের সঙ্গে দুলালের কিছু হইয়াছে। মণ্ডল আখড়ার প্রতিষ্ঠাতা—তাই দুলাল রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। যাইবার সময় ঢেলা মারিয়া মণ্ডলের রক্তপাত করিয়া গিয়াছে। মণ্ডলের অদৃষ্টে হয়তো আরো আঘাত পাওনা আছে দুলালের হাতে।

ব্রজকে নীরব দেখিয়া বুড়ী সবিস্ময় প্রশ্ন করিল—তুমি কিছু জান না তা হ'লে? হ্যাঁ মা?

ব্রজ নীরবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

ক্ষীণ-দৃষ্টি বুড়ীর কাছে ইঙ্গিতের উত্তর নিরর্থক, সে মুখের কাছে মুখ আনিয়া আবার প্রশ্ন করিল—হ্যাঁ মা? তুমি কিছু জান না—নয়?

ব্রজ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—না।

সঙ্গে সঙ্গেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বুড়ী বলিল—চললে মা?

—হ্যাঁ।

—যাও তাই, বাড়ী যাও। ভেবো না, সনদে নাগাদ সে ফিরবে। নিশ্চয় ফিরবে। আমি তো তাকে ভাল ক'রে জানি। সনদে লাগলে আর মায়ের কাছ ছাড়া ভাল লাগে না, ঘুম আসে না মা। এই তো সেদিন গো,কুমীরে ধরেছিল যেদিন—সেদিন 'দিনোমান'টা বেশ রইল—বললে তোর কাছেই থাকব আমি দিদি। যা রোজগার করব তোকে দোব। সে রাক্ষুসী মায়ের মুখ দেখব না। তা পরে মা—যেই নাকি সনদে হওয়া—অমনি ওঃ-আঃ আরম্ভ করলে। আমি যত শুধাই—হ্যাঁরে দুলাল—হ'ল কি? কষ্ট হচ্ছে? তা জবাব দেয় না কথায়। শেষমেষ ঝেড়ে উঠে বললে—চললাম আমি মানগোবিন্দপুর। আমি ধরতে গেলাম—তো ঝাঁকি মেরে হাত ছাড়িয়ে চলে এল! কি করব—আমিও চললাম পিছু পিছু ওই মণ্ডলের মত। গাঁ থেকে বেরিয়ে ওদিকে থাকল মানগোবিন্দপুর—দুলাল পথ ধরল এদিকে চাঁদরায়ের বাঁধের দিকে। বুঝলাম মা—চলল বাড়ী। বাঁধ পার হয়েই তোমার সঙ্গে দেখা। সে সাঁঝ লাগলেই ঠিক ফিরবে। বুঝেছ না?—আমার বয়স অনেক হ'ল অনেক দেখলাম মা! মায়ের এক ছাওয়াল হলেই ওই ধারা। মায়ের ওপর যত টান তত রাগ—দিনে রাগ করবে রাতে সুড়সুড় করে এসে কোলের কাছটিতে ঢুকে—।

বুড়ী আপন মনেই বলিয়া চলিয়াছিল হঠাৎ এতক্ষণে খেয়াল হইল—কই শ্রোতার সাড়া-শব্দ কই? মুখ তুলিয়া সে আশপাশে চাহিয়া দেখিল। কই, কে কোথায়?

সে গোবর্ধনপুরের দিকে মুখ ফিরাইয়া ডাকিল—বেজ মা!

ছানিপড়া চোখের সম্মুখে পৃথিবীটা যেন কুয়াসাময় ঢাকা, কাছে মানুষ থাকিলে মনে হয় খানিকটা কুয়াসা যেন জমাট বাঁধিয়া নড়িতেছে। কই—তাই বা কই? সাড়াও তো দিল না ব্রজ মা!

সে এবার মানগোবিন্দপুরের দিকে মুখ ফিরাইল। এই বটগাছতলাটাকে পাঁচ-মুড়ির বটতলা বলে। এখান হইতে আলপথ গিয়াছে গোবর্ধনপুর, আরও তিনখানা গ্রামের দিকে তিনটা আলপথ চলিয়া গিয়াছে। এবার বুড়ীর যেন মনে হইল জমাটবাঁধা কুয়াসা খানিকটা নড়িতে

নড়িতে দূরের গাঢ় জমাট কুয়াসার মধ্যে মিশিয়া যাইতেছে।

ব্রজ সত্যই মানগোবিন্দপুরের পথ ধরিয়াছিল। ধৈর্যের ভিত্তি যেন নড়িয়া গিয়াছে। আর সে পারিতেছে না।

সাত

মানগোবিন্দপুরে দুলালের আড্ডা মোটরবাসের গ্যারেজে। চারিপাশে খুঁটি পুঁতিয়া তাহার উপর খড়ের চাল বাঁধিয়া প্রকাণ্ড একটা চালাঘর। চারিপাশে খুঁটিব গায়ে বাঁশের খলপা বাঁধিয়া দেওয়ালের কাজ সারা হইয়াছে। মেঝেটা বাঁধানো বটে কিন্তু তাহার উপর তেল-ধূলায় আধ-ইঞ্চি পুরু একটা আস্তরণ পড়িয়াছে। পা দিলে চট্‌চট্ করে, একটা তৈলাক্ত গন্ধ ওঠে। দিনে গ্যারেজটা খালিই থাকে, রাত্রে থাকে দুইখানা মোটরবাস; আর থাকে দুলালের তিনজন সঙ্গী—দুজন কণ্ডাকৃটার একজন ক্লীনার। বাস দুইখানার দুইপাশে খানিকটা করিয়া ফালি জায়গায় তিনখানা খাটিয়া খাড়া করা থাকে। গ্রীষ্মকালে খাটিয়াগুলাকে বাহিরে আনিয়া খোলা জায়গায় পাতিয়া শুইয়া পড়ে। বর্ষা ও শীতকালে খাটিয়াগুলা দেওয়ালের পাশে খাড়া করিয়া রাখিয়া দিয়া ঘুমাইতে যায় বাসের ভিতর। একটা ঢোলক আছে, প্রত্যেকের এক একটা বাঁশের বাঁশী আছে, দুই জোড়া মন্দিরা আছে আর আছে এক জোড়া ঘুঙুর। রাত্রি সাতটায় শেষ ট্রিপ দিয়া সদর শহর হইতে ভায়া জংসন স্টেশন মোটরবাস মানগোবিন্দপুরে ফিরিবার পর তাহাদের কনসার্ট পার্টি বসে। প্রত্যহ একজন পালা করিয়া বাঁশী বাজায়—একজন ঢোলক একজন মন্দিরা একজন ঘুঙুর হাতে বাজাইয়া সঙ্গত করে। দুলালও কনসার্ট পার্টির একজন সভ্য। কিন্তু রাত্রি সাড়ে আটটায় তাহাকে বাড়ী রওনা হইতে হয়। না হইলে মা বেটী ঘর বাহির করিয়া সারা হইবে, বেশী দেরি হইলে শেষ পর্যন্ত মাঠের প্রান্তে আসিয়া অন্ধকার মাঠের দিকে স্থির-দৃষ্টিতে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। মধ্যে মধ্যে ডাকিবে—দুলাল! মৃদুস্বরে ডাক। দুলাল জানে অন্ধকারের মধ্যে মায়ের চোখের দৃষ্টিতে ছায়া-দুলাল ভাসিয়া উঠে। মাও সে কথা জানে, তাই মৃদু স্বরে ডাকে—দুলাল! উত্তর পায় না, আবার ডাকে, দুলাল! মা জানে দুলাল চুপ করিয়া আসে না। দুলাল আসে গোটা মাঠখানা চকিত করিয়া গান গাহিয়া; অন্ততঃ আধ মাইল দূর হইতে তাহার কর্কশ কণ্ঠের গান শোনা যায়; যেদিন ঠিক সময়টিতে দুলাল ফেরে সেদিন আখড়ায় বসিয়া মা তার গান শুনিতে পায়—তবুও মা অন্ধকার নিস্তব্ধ মাঠের দিকে তাকাইয়া—চোখের ভ্রমে পড়িয়া মৃদুস্বরে ডাকিতে থাকে—দুলাল! দুলাল!

দুলাল অবশ্য এক-আধদিন নীরবে আসে।

যেদিন শোভাদিদিকে প্রথম দেখিয়াছিল সেদিন কল্পনায় বিভোর হইয়া নীরবে আসিয়াছিল। সেদিন কল্পনা করিতেছিল ওই রাধাচরণদাদার চেয়েও সে বড় স্বদেশী লোক হইয়াছে। সাহেবদের উপর বোমা মারিয়া সে কালাপানি পার হইয়া আন্দামান যাইতেছে। এ সমস্ত গল্প সে অনেক শুনিয়াছে, সেই শোনাগল্পের পথকে সে প্রশস্তত্তর করিয়া কল্পনার চতুরশ্ব রথ ছুটাইয়া দিয়াছিল। সেদিন গান গায় নাই। হঠাৎ তাহার কানে আসিয়া ঢুকিল মৃদু স্বরের ডাক—দুলাল! সে চমকিয়া উঠিল। সবিস্ময়ে চারিদিক চাহিয়া দেখিতেছিল—আবার ডাক আসিল—দুলাল! দুলালের আর ভুল হয় নাই। সে উত্তর

দিয়াছিল—মা!

—এত দেরি করে? ছি! কত রাত্রি হয়েছে বল তো?

—কত?

—প্রহর অনেকক্ষণ গড়িয়ে গিয়েছে দুলাল। কি করছিলি এতক্ষণ?

দুলাল শোভাদিদির কথা বলিতে পারে নাই, বলিয়াছিল, তোর মাথা করছিলাম। চল্ বাড়ী চল্। এই আঁধারে একলা ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে দেখ!

—ভূতের মা যে আমি, ভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকব না! মানুষ যারা হয় তারা মাকে এমন করে ভাবায় না, তাদের মাকে এমন করে অন্ধকারে মাঠের মধ্যে ভূতের মত দাঁড়িয়ে থাকতেও হয় না।

দুলাল সেদিন কল্পনায় নিজেকে এমন উঁচুতে তুলিয়াছিল যে ভূত বলিলেও রাগ করিতে পারে নাই। একটু লজ্জিতই হইয়াছিল, বলিয়াছিল—তোর খুব কষ্ট হয়েছে মা। হুঁ, অনেকটা রাত হয়েছে বটে! তারপর জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—দেরি হলে এমন করে দাঁড়িয়ে থাকিস তুই?

—থাকি বইকি, ঘরে বসে কত ভাবব? দাঁড়িয়ে থাকি এইখানে—আর কিছু নড়লেই নাম ধরে ডাকি। মনে হয় তুই আসছিস। যেদিন আসতে দেরি হবে—বলে গেলেই পারিস!

—তাই ভাল, তাই বলে যাবো।

দুলাল সেই অবধি জানে—মা তাহার মাঠের মধ্যেই দাঁড়াইয়া থাকে তাহার প্রতীক্ষায়। তাই ঠিক সাড়ে আটটায় আড্ডা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়ে। আড্ডার সকলেরই তাহাতে আপত্তি। দুলাল গানবাজনায় পারদর্শী নয়। ওই বিদ্যাটা তাহার গলায় মগজে হাতে কোথাও আসে না। কিন্তু তাহার মত গান বা বাজনা জমাইতে কেহ পারে না। সে যা মুখে তেহাই মারে, তালের মাথায় লম্বা চুল একবার সামনে কপালে মুখে ফেলিয়া একবার পিছনে ফেলিয়া মাথা নাড়িয়া সর্ব শরীর নাচায় যে—গান বা বাজনা, যাই হোক না কেন, একটা প্রবল জোর পাইয়া জমজমাট হইয়া সব কিছুতে নাচন জাগাইয়া দেয়। আড্ডার ছোকরারা বলে—শা-লা, জ্বলে গেল একেবারে।

দুলাল বলে—জ্বলবে না? কার ফুঁ দেখতে হবে!

সকলেই সে কথা বিনা প্রতিবাদে মানে। ঠিক এই কারণেই তাহাদের দুলালকে ছাড়িয়া দিতে আপত্তি। তাহারা বলে—রোজ বাড়ী যাবি কেন?

কথাগুলো তাহারা ভাঙা হিন্দীতে বলে। মহাবীরপ্রসাদ এখানকার বাস-ব্যবসায়ের প্রধান ড্রাইভার, মালিকও একজন ছাপরার লালা কায়স্থ। তাহারা এ ব্যবসায়ে লোকজন যাহা রাখিয়াছে তাহারা অন্ততঃ নামে হিন্দী-ভাষাভাষী। জন্মকর্ম সবই এ দেশে, বাপ বা পিতামহের আমল হইতে এখানেই বাস করিতেছে—তবুও তাহারা ভাঙা হিন্দী বলে, নামও রাখে ও দেশের অনুকরণে। এক দুলালই এ মাটির খাঁটি মানুষ। মহাবীরপ্রসাদ ছেলেটির তাগদ এবং হিকমত দেখিয়া উহাকে কাজ দিয়াছে। মহাবীরের গোপন উদ্দেশ্যও একটা আছে। মহাবীর এখানে যাহাকে লইয়া ঘর বাঁধিয়াছে সে তাহার বিবাহিতা স্ত্রী নয়, দেশে তাহার জমজমাট ঘরসংসার, স্ত্রী পুত্র মেয়ে জামাই জোতজমা অনেক কিছু আছে। এখানে কাজ করিতে আসিয়া একটি মেয়েকে লইয়া একটা ছোট সংসার পাতিয়াছে—তাহার ফল হইয়াছে একটি কন্যা। মহাবীর জানে দুলালেরও নাকি জন্মপরিচয়ে এমনি একটি গল্প আছে।

সেই হেতু তাহার নজর পড়িয়াছে তুলালের উপর। তুলাল কথাটা জানে না, মহাবীর এখনও কথাটি ভাঙে নাই। কিন্তু সে কথা যাক। আড্ডার সকলের প্রতিবাদে তুলাল খুশী হয়, তাহার থাকিতেও ইচ্ছা হয়। কিন্তু আশ্চর্য, তাহার অন্তরের অন্তরে যেন বিপরীত একটা প্রবলতর ইচ্ছা ঠিক সময়টিতে তাহার ঘাড় ধরিয়া আড্ডা হইতে টানিয়া তুলিয়া দেয়।

তুলাল বলে—না ভাই। মা মাঠে দাঁড়িয়ে থাকবে। জানিস না তাকে।

শিউচরণ বলে—জানছে রে বাবা জানছে, সব জানছি আমরা। কেন বাবা বিলকুল ঝুটমুট বাত বলছ! যাও ঘর যাওরে বাবা, বিরিজনন্দন—সাঁও লাগল—আঁধার নামল, শিয়াল ডাকল—বহুত রাত হল—তুমি ঘর যাও, মায়ের কোলে গিয়ে শুয়ে পড়, বাস—শুয়ে শুয়ে মায়ের মেহু খাও।

শিউচরণের কথার ভঙ্গিতে সকলেই হাসিয়া ফেলে, তুলালও হাসে; হাসিয়াই বলে—এ শালা কোনদিন মরবে রে আমার হাতে! দোব একদিন এক ডাণ্ডা বসিয়ে। ডিম ফাটা করে ফাটিয়ে দেব।

শিউচরণ মাথা নোয়াইয়া দিয়া বলে—মারো দাদা, ফাটায় দেও আমার মাথা। লেকেন তুমি ঘর যাও, তুমার ছাতি ফাটু যাচ্ছে—দাদা হো—মায়ের মেহু খানেকেলিয়ে, ও আমি জানছে রে দাদা, তুমি ঘর যাও। তারপর সে শিশুর মত কাঁদিতে শুরু করে—ও মা গো! ওগো—মা গো! কোলে নে গো! আঁধার হল গো! কোথা গেলি গো!

শিউচা না হইয়া অন্য কেহ হইলে তুলাল মারামারি করিত, কিন্তু ওই ছোট ছেলেটার কথাবার্তা ধারাধরণ এমনি মিষ্ট যে কোনমতেই উহার উপর রাগ করা যায় না, উহার ওই কথাগুলি অন্য কেহ বলিলে ব্যঙ্গ হইয়া উঠিত—সূচের মত ধারালো সূক্ষ্ম মুখে অতর্কিতে বিঁধিয়া চকিত ক্রোধে বিচলিত করিয়া তুলিত, কিন্তু শিউচার কথাবার্তা বলার ধরণ তাহার কণ্ঠস্বর এমন যে কথাগুলি নিছক রঙ্গ হইয়া উঠে, কথাগুলির মুখ সূক্ষ্ম হইলেও এমনি নমনীয় যে গায়ে বেঁধে না—বাঁকিয়া যায়, সুড়সুড়ি দিয়া যেন হাসাইয়া দেয়। শিউচার রহস্যের রঙ্গে হাসিয়াই তুলাল সাড়ে আটটায় বাড়ী চলিয়া যায়।

আজ আড্ডায় শিউচা এবং তুই নম্বর বাস 'জয়-মা-তারা'র ড্রাইভার উপস্থিত ছিল। 'জয়-মা-তারা' চাকা খোলা অবস্থায় ইট এবং কাঠের মোটা টুকরার তোলানের উপর পড়িয়া আছে। কি-কি সব পার্টস খারাপ হইয়াছে সেগুলা না হইলে আর তাপ্পি মারিয়া চালানো অসম্ভব। স্বয়ং লালাজী কলিকাতায় গিয়াছেন পার্টস কিনিতে। ইতিমধ্যে চাকা খুলিয়া জয়-মা-তারাকে—ইট-কাঠের তোলানের উপর চাপাইয়া তলার ময়লা মাটি ছাড়ানো চলিতেছে। শিউচা গাড়ীর তলায় শুইয়া লোহার টুকরা দিয়া মাটি ছাড়াইতেছিল আর তারস্বরে গান জুড়িয়া ছিল। ড্রাইভার রামধনিয়া একটা খাটিয়ার উপর পড়িয়া ঘুমাইতেছে, মুখে রাজ্যের মাছি বসিয়াছে; সম্ভবত মদ খাইয়াছে। লোকটার চেতন নাই। তুলাল তুর্বল শরীরে ক্রোশ দেড়েক পথ হাঁটিয়া আসিয়া গ্যারেজের সামনে বসিয়া পড়িল। ডাকিল—শিউচা!

গাড়ীর তলা হইতে শিউচা জিজ্ঞাসা করিল—কে?

কণ্ঠস্বর তুর্বল হইলেও তুলালের কণ্ঠস্বর চিনিতে তাহার কষ্ট হয় নাই কিন্তু বিশ্বাস করিতে পারিল না। এত বড় অসুখ হইতে এই সবে উঠিয়াছে তুলাল, সে সংবাদ তাহারা খুব ভালো করিয়াই রাখে; সুতরাং তুলাল এখন এখানে আসিবে কেমন করিয়া? তাই সে সবিস্ময়ে

প্রশ্ন করিল—কে? সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীর তলা হইতেই যথাসম্ভব ঘাড় উঁচু করিয়া দুলালকে দেখিয়া সবিস্ময়ে বলিল—আরে তুম্! ব্রিজনন্দন!

—হ্যাঁ। বেরিয়ে আয়, জল দে দিকিনি এক গেলাস।

পিঠ ঘেঁষড়াইয়া শিউচা বাহির হইয়া আসিল। দুলালের শরীরের অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়া বলিল—আরে এমনি হালত্ হয়েছে তুহার—আঁ! এহি হাল লিয়ে বাড়ীসে আসলি কি ক'রে? আরে নিকলালি কাহে রে ভাই?

—আগে জল দে।

—আরে নেহি। এই ধূপে এত্না পথ; এহি হালত্ তুহার। আবি পানি না। থোরা ঠার্ যা।

—ওরে শালা—তেষ্টায় আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে!

—তব, চা পিয়ো।

—না। জল দে। দিবি কি না বল্?

—সোডা পিয়ো তব। ছুটিয়া চলিয়া গেল শিউচা। দুলাল চালাঘরটার ভিতর গিয়া একখানা খাটিয়া বাহির করিয়া দড়ির ছাউনির উপরেই শুইয়া পড়িল।—আঃ! এইবার নিশ্চিন্ত। উঃ—কি বিপাকেই সে পড়িয়াছিল! এই সব ফেলিয়া সে ওই পাড়াগাঁয়ের আখড়ার জঙ্গলের মধ্যে ফোঁটা-তিলক কাটিয়া—কণ্ঠী পরিয়া—মাথা ন্যাড়াইয়া—মালা জপ করিবে!

শিউচা সোডার বোতলটা ভাঙিয়া তাহার হাতে দিল—পিয়ো।

ঢক ঢক করিয়া গিলিয়া সোডার বোতলটা শেষ করিয়া দুলাল বলিল—দূরো—ঝাল্ ঝাল্—ধেৎ! তারপর বলিল—আখড়া ছোড়কে আয়া শিউচা—আর নেহি যায়ে গা।

শিউচা অবাক হইয়া গেল। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—নেহি যায়ে গা?

—নেহি! কভি নেহি! হিঁয়াই পাক্কা ডেরা গাড়েগা। বাস্। সমুচা রাত চালাও খচাখচ—ঝমাঝম্ পিঁ-পিঁ-পিঁ-পিঁ পোঁ! ধেনেকেটে—ধেনেকেটে—তা ধিন—তা ধিন—ধা!

—বহুত আচ্ছা। শিউচা নাচিয়া উঠিল। শিউচার কল্পলোকের নায়ক হইল দুলাল; সবল পরিপুষ্ট শরীর, দুর্দান্ত সাহস—এই দুইটা শিউচার নাই। দুলালের আছে প্রচুর পরিমাণে। তাহার উপর দুলাল তাহাকে ভালবাসে। সত্যসত্যই ভালবাসে।

এক সময়—অর্থাৎ পরিচয়ের প্রথম দিকে দুইজনের মধ্যে ছিল প্রবল আক্রোশ। মহাবীর ড্রাইভারের মেয়ের প্রেম লইয়া দুজনে দুজনের শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু দুলাল যেদিন প্রথম সদর শহরে গিয়া বেণী দুলাইয়া শহরের মেয়েদের ইস্কুলে যাইতে দেখিয়া ফিরিল সেইদিনই তাহার মহাবীরের কন্যার উপর আকর্ষণ ঘুচিয়া গেল এবং সেইদিনই সে শিউচাকে ডাকিয়া বলিল—এই শিউচা শোন!

হেঁট হইয়া শিউচা গাড়ীর যন্ত্রপাতি গুছাইয়া তুলিতেছিল—সেই অবস্থাতেই মাথাটা মাটির দিকে রাখিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া তাহার দিকে উদ্ধত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—কেয়া?

দুর্বল শিউচার ওই দৃষ্টি দুলাল কখনও বরদাস্ত করিতে পারে না, অনেকবার এমন ক্ষেত্রে সে লাফাইয়া গিয়া শিউচার মাথাটা মাটিতে ঠুকিয়া দিয়াছে, অথবা পিছনে মারিয়াছে লাথি। শিউচাও সঙ্গে সঙ্গে হাঁকড়াইয়াছে—চাকা হইতে টায়ার খোলা ইস্পাতের চেপ্টা ডাণ্ডাটা।

সেদিন দুলাল সে সব কিছু করিল না—তাহার পরিবর্তে গম্ভীরভাবে শিউচাকে ডাকিয়া বলিল—শুনে যা বলছি। এদিকে আয়। শোন। ভয় নাই। শুনে যা।

বিস্মিত হইয়া শিউচা কাছে আসিল এবং দুলালের অভয় দেওয়াকে তুচ্ছ করিবার জন্যই বোধ হয়—একেবারে মুখের কাছে বুকটা উঁচাইয়া দিয়া বলিল—কি ?

এক কথায় দুলাল মহাবীরের কন্যাকে শিউচাকে দান করিয়া দিল—যাঃ তোকে দিলাম।

—কি ?

—ড্রাইভার সায়েবের বেটীকে। যা, তুই ওকে বিয়ে কর গে।

শিউচা অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

দুলাল একটা সিগারেট তাহার হাতে দিয়া বলিল—নে খা।

শিউচা সিগারেট ধরাইয়া প্রশ্ন করিয়াছিল—তুই ? তোর কি হ'ল ?

—সে তোকে ভাবতে হবে না। আমি বিয়ে এখন করছি না।

—এখন বিয়ে করছিস না ?

—না।

—কখন করবি ?

—সে বলব না। যখন করব তখন দেখতেই পাবি। তবে তুই পারিস তো ড্রাইভার সায়েবের মেয়েকে বিয়ে করগে। আমি ওকে বিয়ে করব না।

—তুই তো করবি না, লেকিন—ড্রাইভারের বহু যে বাঙালীন, ও যে ছাড়বে না তোকে। আর ওই মেয়েটা যে আমাকে দেখতে পারে না।

—ওরে শালা—সে তোর হাত। আমি ওকে পষ্টাপষ্টি বলে দোব। ওই যে, দাঁড়া—এখুনি বলে দিচ্ছি। এই—এই রঙ্গি—এই !

রঙ্গির ভাল নাম পুষ্পলতা। তাহার বাঙালীন মায়ের রাখা নাম, বাপ মহাবীর ছেলেবেলা হইতে রঙ্গিলা নাম রাখিয়া রঙ্গি বলিয়া ডাকে; রঙ্গি এখন বড় হইয়া রঙ্গি নামটা আদৌ পছন্দ করে না। সে মনেপ্রাণে ভাবে-ভঙ্গিতে আধুনিকা বাঙালিনী হইতে চায়; জংশন স্টেশনে মধ্যে মধ্যে সিনেমায় গিয়া ফ্যাসান শিখিয়া আসে, গান শিখিয়া আসে। রঙ্গি বলিয়া ডাকিলে সে ভয়ানক চটিয়া যায়।

রঙ্গি আড়চোখে তাকাইল—কিন্তু উত্তর দিল না।

দুলাল আবার ডাকিল—এই। এই।

—কি ? কাকে ডাকছ ? আমাকে ?

—নয় তো কাকে ? শুনতে পাও না ?

—কেন পাব না ? কিন্তু রঙ্গি কি আমার নাম ?

—আরে গেল যা !

—আরে গেল যা কিসের ? আমার নাম পুষ্পলতা। রঙ্গি বলে ডাকলে উত্তর দেব কেন আমি ?

—আচ্ছা—আচ্ছা। শোন।

—কি ? বল।

—শিউচা তোমাকে খুব ভালবাসে।

—ভাগ্।

—ভাগ্ নয়। আমি তাই বিয়ে-টিয়ে করব না, বুঝলে ? তুমি ওকেই বিয়ে কর। আমি বলছি। বুঝলে ?

—মরণ ! বলিয়া রঙ্গি চলিয়া গিয়াছে।

রঙ্গি কথাটা কানেই তুলে নাই। সে আপনার গরবেই আছে। তাহার বিশ্বাস মুখে দুলাল যা-ই বলুক—তাহার হাসিকান্নায় দুলাল মানিক মতি কুড়াইয়া পায়, ও কথাটা দুলাল শিউচাকে বোকা বানাইবার জন্য নেহাত ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছে। মহাবীর ড্রাইভারের আদরিণী মেয়ে সে, দুলারিয়া বেটীয়া, তাহাকে উপেক্ষা করে এমন সাধ্য দুলালের কি হইতে পারে? অন্ততঃ বাপের 'দুলারিয়া বেটী' রঙ্গি সে-কথা বিশ্বাস করে না।

রঙ্গি যে বিশ্বাস লইয়াই থাকুক, তাহাতে দুলালের কিছু আসে যায় না। সেও দুলাল—ব্রিজনন্দন, সে সাড়ে তিন হাত গোক্ষুর সাপ ছোট্ট একটা লাঠি দিয়া ঠেঙাইয়া মারে, সে আগুনের সঙ্গে লড়াই করে, সে এখানে কাহারও অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া কাজ করে না। সে জানে স্বয়ং মালিক লালা সাহেব তাহার কাজ দেখিয়া খুশী। মহাবীরের কথায় তাহার কাজ যাইবে না। সে শিউচাকে সরল অন্তঃকরণে সুস্থ শরীরে রঙ্গিকে দান করিয়া তাহার সহিত বন্ধুত্ব পাতাইয়া ফেলিল। প্রাণের বন্ধু করিয়া তুলিল।

তাই শিউচা আজ দুলালের সংকল্প শুনিয়া নাচিয়া উঠিল। দুলাল এখানে থাকিলে আড্ডা তাহাদের এখন জমিয়া উঠিবে।

এইবার তাহা হইলে দুলাল মদ খাইবে, গাঁজা খাইবে। মায়ের আঁচল ধরিয়া থাকিয়া দুলাল এখনও পুরা মরদ হইল না। ঘরেই আছে অথচ মদ খাইবে না। বলিবে—না ভাই—ওটি পারব না। একে বোষ্টুমের ছেলে—তার ওপর মা ভাই বড় খারাপ লোক। বকবে-ঝকবে না—কাঁদবে শুধু।

তারপর শিহরিয়া উঠিয়া বলে—কে জানে ভাই, গলায় দড়ি-কড়ি দিলে—মরে যাবে। আমার আর তখন পাপের সীমা থাকবে না।

জোর করিলে—দুলাল শক্ত হইয়া উঠে; কঠিন দৃষ্টিতে চাহিয়া বলে—না! সে 'না'-এর প্রতিবাদ দলের কোন লোক করিতে পারে না। শিউচা খুশী হইল, এবার আর দুলাল না বলিবে না।

* * *

লম্বা একটা ঘুম দিয়া দুলাল যখন উঠিল তখন অগ্রহায়ণের দিন গড়াইয়া আসিয়াছে। অপরাহ্ণ বেলার আলো কেমন নিষ্প্রভ লালচে হইয়া উঠিয়াছে। রাঢ়ের লালমাটির দেশ, লাল ধূলা উড়িয়াছে আকাশে। দুলাল আকাশের দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। এমনি সমারোহের গোধূলি ফুটিলেই তাহার মায়ের মনে গান সাড়া দিয়া ওঠে। গুন গুন করিয়া আপন মনেই গান গায় আর কাজ করিয়া ফেরে। শুধু তাই নয় ছেলেবেলায় এমন গোধূলির ক্ষণে শত অপরাধ করিয়া ফিরিলেও মা তাহার উল্লেখই করিত না। ছেলেবেলায় সে খেলিয়া বাড়ী ফিরিত—একেবারে ধূলায় ভূত হইয়া বাড়ী ফিরিত; নুনদাঁড়ি, হাডু-ডু-ডু বারচিক্ খেলায় সে ছিল সকলের ওস্তাদ; হাডু-ডু-ডু খেলায় সে যাহাকে ধরিত সঙ্গে সঙ্গে সে ধূলার উপর আছাড় খাইয়া পড়িত—তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেও পড়িত; যাহাকে ধরিত সে পড়িত চিত হইয়া আর সে পড়িত উপুড় হইয়া। নখের ডগা হইতে মাথার চুল পর্যন্ত ধূলার একটা প্রলেপ পড়িয়া যাইত। বাড়ী ফিরিবামাত্র মা প্রায় প্রত্যহ একটি কথা বলিয়া আক্ষেপ করিত—হয় তো পুত—নয় তো ভূত। আমার যেমন কপাল তেমনি হবে তো!

গরমের দিন কোন কথা না বলিয়া দুলাল লাফাইয়া গিয়া পড়িত খাঁলের জলে। জল তোলপাড় করিয়া—ব্রজদাসীর তিরস্কার শুনিয়া তবে উঠিত। শীতের দিন—মায়ের সঙ্গে ঝগড়া

বাধিত। জল গামছা নামাইয়া দিয়া ব্রজ বলিত, বেশ ভাল ক'রে মুছবি, এতটুকু ময়লা যেন না থাকে গায়ে।

নাকিসুরে দুলাল কাঁদিত—যে ঠাণ্ডা, মা-গো!

ব্রজ বলিত—কেন, ধুলো মাখবার সময় মনে পড়ে নাই মাকে?

সর্বাঙ্গ ভিজা গামছায় মুছিয়া সেই গামছা কাচিয়া তবে পরিত্রাণ পাইত দুলাল। তারপর ব্রজদাসী তাহাকে নারিকেল তেল মাখাইত। নহিলে শীতের দিন সর্বাঙ্গ ফাটিবে যে! কিন্তু রক্তসন্ধ্যা করিয়া যেদিন মনোরম গোধূলির সমারোহ ফুটিয়া উঠিত সেদিন ঘটিত অন্যরূপ। খেলা শেষের সঙ্গে সঙ্গেই খেলার উত্তেজনা কাটে না, সঙ্গীদের সঙ্গে খেলার ভুলচুকের উত্তেজিত আলোচনা করিতে করিতে দুলাল বাড়ী ফিরিত—আশেপাশে দিকে-দিগন্তরে কোথায় কি ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে খেয়াল থাকিত না, কিন্তু বাড়ীর দুয়ারে আসিয়াই বুঝিতে পারিত—আজ পৃথিবী রাঙা হইয়া উঠিয়াছে। শুনিতে পাইত আখড়ার মধ্যে তাহার মা গুন গুন করিয়া গান করিতেছে। যখন সে খুব ছোট ছিল—তখন মা তাহার এমন দিনে তাহাকে বুকে তুলিয়া ছড়া কাটিত—

ধুলোয় ধূসর নন্দকিশোর ধুলো মেখেছে গায়!

সেদিন মা নিজেই তাহার গায়ের ধুলা মুছাইয়া দিত। তারপর পড়িত তাহাকে সাজানোর পালা। স্নানের পর যেমন মুখ মুছাইয়া চুল আঁচড়াইয়া দেয়—তেমনি আর একদফা সাজাইয়া চোখে কাজল দিয়া তবে ছাড়িত। এই সমাদরের স্বাদটি তাহার কাছে মধু অপেক্ষাও মধুরতর। চোখে যেন একটা রঙ ধরিয়া যাইত।

এমন সন্ধ্যা দুলালের কাছে আজও কাম্য হইয়া আছে। মানগোবিন্দপুরে আসিয়া নূতন পৃথিবীর রঙ লাগিল তাহার মনে। মোটরবাসে চাকরি লইল। কিন্তু শীতের অপরাহ্নে যেদিন রক্তগোধূলির সমারোদ জাগিত সেদিন তাহার মন উতলা হইয়া উঠিত। কতদিন এমন হইয়াছে যে মোটরবাসের পাদানিতে দাঁড়াইয়া দুলাল গতির উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া চীৎকার করিতেছে "তুফান মেল—তুফান মেল—হট যাও—মুসাফির হট যাও; বন-বন দুনিয়া সন্ সন্ তুফান, দব্ দব জান, চলো জোয়ান";—মনের উচ্ছ্বসিত উল্লাসে; স্বতস্ফূর্ত অর্থহীন সঙ্গতিহীন ছড়া আওড়াইয়া চলিতেছে, এমন সময় হঠাৎ চোখে ধরা পড়িল—শীতের অপরাহ্নের ধূলিধূসরতায় সর্বাঙ্গে ধরিয়াছে লাল রঙ, সঙ্গে সঙ্গে দুলাল স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, মনে পড়িয়াছে মাকে, মোটরের শব্দের মধ্যে সে সেদিন মায়ের গুন গুন গান শুনিয়াছে—

"গোধূলি-ধূসর শ্যাম কলেবর
আজানুলম্বিত বনমালা।"

এমন অপরাহ্নে মানগোবিন্দপুরে থাকিলে সঙ্গে সঙ্গে সে লাফ দিয়া উঠিত। তার পরেই ভাবিয়া চিন্তিয়া মাথায় অথবা পেটে হাত দিয়া যন্ত্রণাকাতরতার ভান করিয়া বলিত—উঃ—হঠাৎ এ কি হ'ল? ওঃ—মাথার মধ্যে চিড়িক মেরে উঠল! তারপর শুইয়া পড়িত, কয়েক মিনিট পর উঠিয়া বলিত—আজ আর ডিউটি দিতে পারব না। বড্ড যন্ত্রণা। বাড়ী চললাম।

আজও রক্ত-সন্ধ্যা-রঞ্জিত গোধূলি ক্ষণটি দুলালের মনে মায়ের মুখ ভাসাইয়া তুলিল। মা এতক্ষণ বাড়ী ফিরিয়াছে নিশ্চয়, মহেশ মণ্ডলের কাছে সমস্ত কথা সে শুনিয়াছে, শুনিয়াছে—দুলাল বলিয়া গিয়াছে একটা তিলক-ফোঁটা কাটা বৈষ্ণবের মেয়ে বিবাহ করিয়া মাথা মুড়াইয়া সে বৈরাগী বাবাজী হইতে পারিবে না। শুনিয়া মা তাহার কি করিবে?

দুলাল হঠাৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। মা কি করিবে সে কল্পনা করিতে পারিতেছে না।

এতকাল মায়ের সঙ্গে তাহার কত ঝগড়াঝাঁটি হইয়াছে, কিন্তু এমন করিয়া সে কোন দিন ঘর ছাড়ে নাই।

শিউচা গরম জল করিয়া সাবান দিয়া হাত-পা-মুখের তেল কালি ধুইতেছিল—সে বলিল—ওঃ, বহুত খটমল আছে উয়ো খাটিয়ামে। নেমে বোঠ ওহি বাসকে সিটের গদীটো লে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দুলাল বলিল—তবিয়েৎ বহুত খারাপ করছে শিউচা। একটু চা খাওয়াবি ভাই!

পিছনের দিকে দেওয়ালে ঠেস দিয়া জয়তারার ড্রাইভার একটা মদের বোতল লইয়া বসিয়া ছিল, মদ পেটে পড়িলেই লোকটা গুরুগম্ভীর হইয়া উঠে, ঘোর-মাখানো চোখ মেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, সঙ্গীরা হাস্যপরিহাস করে—সে তাহাতে যোগ দেয় না, হঠাৎ পরিহাসের কথা লইয়াই এমন একটা গভীর ভাবের কথা বলিয়া ওঠে যে সমস্ত মজলিসটাই স্তব্ধ হইয়া যায়। শিউচা কিছু বলিবার পূর্বেই সে গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিল—তুম বহুত খারাব কাম কিয়া বিরিজনন্দন!

দুলাল ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। ঈষৎ ঘাড় বাঁকাইয়া চিন্তা-স্তিমিত দৃষ্টিতে মাটির দিকে চাহিয়া দেওকীনন্দন বসিয়া রহিয়াছে, ঠোঁট দুইটা দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দুই কোণ বাঁকাইয়া যেন উদ্বেলিত বেদনার উচ্ছ্বাসকে চাপিয়া রাখিয়াছে কোনমতে। দুলাল জিজ্ঞাসা করিল—কি? কি খারাব কাম করলাম? এ খাটিয়াটা তোমার নাকি?

দেওকী দৃষ্টি তুলিল না—ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—বহুত খারাবি কিয়া ভাই। সীয়ারাম, সীয়ারাম!

দুলাল আপন মনেই বলিল—মরেছে—পেটে পড়েছে আর—

দেওকী বলিয়াই চলিয়াছিল—তুমরা টাইফয়েড হুয়া, বহুত খারাব বেমার, বহুত খারাব। আঃ—আওর তুম এইসা শরীরকে হালত লেকে তুম চলা আয়া এতনা পথ, এহি ধূপ মে! বহুত খারাব।

—ভাগ্। তিক্তচিত্তে দুলাল উঠিয়া পড়িল। দোকানে গিয়া চা খাইয়া ওই খোলা মাঠটায় বসিবে। আকাশে রক্তসন্ধ্যা ক্রমশঃ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে।

দেওকী বলিল—কাঁহা যাতা হ্যায়?

দুলাল বিরক্ত হইয়া আর একবার তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল।

দেওকী বলিল—মৎ যাও। টাইফয়েড বহুত খারাব বেমার। হম জানতা হ্যায়। অব দশ রোজ তো তুম শোত রহো।

—ওরে বাবা, আমি চা খেতে যাচ্ছি। তুমি এত ভেবো না আমার জন্যে।

—আরে সীয়ারাম—সীয়ারাম, চা কেয়া পিয়েগা? মৎ পিয়ো চা। বহুত খারাব। টাইফয়েডমে চা বহুত খারাব। অম্বল হোগা—উসসে ফিন জ্বর চলা আয়েগা। বাস্, টাইফয়েড যব রিপীট করে গা—তো বাস্ হো যায়েগা খতম। মৎ পিয়ো চা।

—যাঃ গেল! এ তো বড় ফ্যাসাদে ফেললে রে বাবা। দুলাল খানিকটা ভয় বোধ হয় পাইয়াছিল। না হইলে কোন কথা না বলিয়াই সে অনেক আগেই চায়ের দোকানে গিয়া বসিত। দেওকী বলিল—এক কাম করো। দোঠো কুইনিন পিল মাঙা লেও, আওর থোড়া দারুকে সাথ খা লেও। বাস্। তবিয়ৎ ভি আচ্ছা হোগা।

—মদে আর কুইনেনে?

—হ্যাঁ। খা লেও—বাস্—তবিয়ৎ আচ্ছা হো যায়েগা।

—না।

শিউচা এতক্ষণ নীরবে মজা দেখিতেছিল, তাহার মুখ-হাত ধোওয়া পর্যন্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছিল ; মুখে মাথায় সাবান মাখিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া—পিট্‌ পিট্‌ করিয়া চাহিয়া সব দেখিতেছিল।

সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

শিউচার এই খিল খিল হাসির মধ্যে ব্যঙ্গ আছে। দুলাল এই হাসিতে জ্বলিয়া যায়। দেওকীকে সে উপেক্ষা করিয়াছিল কিন্তু শিউচার ব্যঙ্গভরা হাসি সে সহ্য করিতে পারিল না। যাহা অসহ্য তাহা উপেক্ষাও করা যায় না। সে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া একটা গর্জন করিয়া উঠিল—শিউচা!

শিউচা বলিল—কি ? চিল্লাচ্ছিস কেন ?

—হাসছিস কেন তুই ?

—তোকে দেখে আমি হাসি নাই। দেওকীর কথা শুনে হাসছি। ও জানে না, খোখারা মদ খেলে মায়েরা গোস্সা করে কান পাকড়কে।

—খবরদার !

রঙ্গিকে লইয়া আজ আর দুলালের উপর কোন অভিযোগ বা আক্রোশ না থাকিলেও দুলাল তাহাদের একজন হইয়াও বন্ধু হইয়াও তাহাদের সঙ্গে মদ খায় না—এ লইয়া একটা অভিযোগ শিউচার আছে। কিন্তু দুলালের গায়ের জোরকে শিউচা ভয় করে—তাই সাধারণতঃ চুপ করিয়া থাকে, কখনও কখনও আক্রোশটা বেশী হইলে এমনি ধারার ব্যঙ্গহাসি হাসিয়া দুলালকে 'খোখা' বলিয়া ঠাট্টা করে। দুলালও এমনি গর্জন করিয়া শিউচার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কিল-চড়-ঘুষি চালায় ; শিউচা বেচারী রসিক হইলেও দুর্বল মানুষ, দুলালের শক্তহাতের নিষ্ঠুর আঘাত সহ্য করিতে পারে না, হাত জোড় করিয়া বলে—মাফি। মাফি মাংতা হায়। এই ভাই নওজোয়ান—এ দুলাল !

জয়-পরিতৃপ্ত দুলাল শিউচার ভঙ্গি দেখিয়া এবং নওজোয়ান সম্বোধন শুনিয়া হাসিয়া ফেলে, এবং ছাড়িয়া দিয়া বলে—বলবি আর ?

—নেহি। আরে বাপ্‌—কান পাকড়তা। কভি নেহি বোলে গা!

—দেখিস! মনে থাকবে তো ?

—থাকবে রে বাবা—থাকবে। আঃ, দেখ তো ক্যায়সা জখম কিয়া! কপালে হাত বুলাইয়া ঘুষির আঘাতটা দুলালকে দেখায়।

দুলাল অনুতপ্ত হইয়া শিউচার কপালে হাত দিয়া সস্নেহে বলে—এঃ—জোর মার হয়ে গিয়েছে। তারপর বলে—তুই তো জানিস—আমার রাগ, কেন এমন ধারা রাগিয়ে দিস্ বল দি-নি ? চল টিংচার আইডিন লাগিয়ে দি!

ডাক্তারখানা হইতে আইডিন আনিয়া শিউচার কপালে লাগাইয়া দেয়। তারপর কয়েক আনা পয়সা তাহাকে দিয়া বলে—যা আধপো মালের দাম দিলাম, খেয়ে গায়ের বেথা মেরে আয়।

শিউচা কিন্তু আজ দুলালের খবরদার গর্জনকে গ্রাহ্য করিল না। রোগশীর্ণ দুলাল আজ যদি তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে তবে সে আজ শোধ লইবে। সে আরও তীক্ষ্ণ হাসি হাসিয়া বলিল—আরে বাপ্—খোখেয়াকে বহুত গোস্সা হো গিয়া। আও না—আও!

দুলালের আর সহ্য হইল না। ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া নিজের অবস্থা ভুলিয়া গেল, লাফাইয়া পড়িল শিউচার উপর। এই মুহূর্তে শিউচা এইটাই চাহিতেছিল। সে আজ অনায়াসে প্যাঁচ কষিয়া ঘাড়ের উপর হইতে দুলালকে উল্টাইয়া আছাড় মারিয়া মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকের উপর বসিল। বলিল—আব্—মেরে খোখোয়া! বিরিজনন্দন দুলালোয়া! হা—হা!

দুলাল চীৎকার করিতেছিল উন্মত্ত ক্রোধে। শিউচা ঘুষি তুলিল। সে আজ শোধ তুলিবে। সাধ মিটাইয়া শোধ তুলিবে।

হঠাৎ দেওকী ছুটিয়া আসিয়া বলিল—লেও, পিলাও দারু।

শিউচা উল্লসিত হইয়া উঠিল—ব্যাস্ ব্যাস্, পিলাও, মারো বোষ্টোমোরাকে জাত, খোখোয়াকো জোয়ান বনা দেও! পিলাও!

শিউচা দুলালের হাতখানা পা দিয়া শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিল। দুই কাঁধে দুই হাত দিয়া শক্ত করিয়া ধরিয়া দেওকীকে বলিল—লে—লে লে তু পিলা।

দুলালের দুই কষ চাপিয়া ধরিয়া দেওকী তাহার মুখে অনেকটা মদ ঢালিয়া দিল। না গিলিয়া উপায় ছিল না। শিউচা কাঁধের হাত ছাড়িয়া দিয়া নাক টিপিয়া দুলালের নিশ্বাস বন্ধ করিয়া দিল। দুলাল গিলিল।

দেওকী বলিল—বস করো—ছোড় দো।

শিউচা বলিল—আওর থোড়া।

—নেহি। ছোড় দো।

শিউচা দুলালকে ছাড়িয়া দিয়া হাততালি দিয়া নাচিতে লাগিল। আজ তাহার পরম আনন্দ। দুলালের জাত মারিয়াছে।

দুলাল চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

শিউচা এবার কাছে আসিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিল—আরে কাঁদছিস কাহে? আঁ? ক্যয়সা লাগতা দেখ তো!

—ছাই লাগছে!

—নেহি। ঝুট বোলতা তুম্।

দেওকী বলিল—আওর থোড়া পি লে ভেইয়া। সব ঠিক হো যায়েগা।

দুলাল উঠিয়া দাঁড়াইল—আমি বাড়ী যাব।

বাড়ী সে চলিয়াছিল।

বাজারের পথ দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতেই চলিয়াছিল। মনে মনে সে মায়ের নামই করিতেছিল ছোট ছেলের মত।—মা—মা গো!

মানগোবিন্দপুর আধা শহর, গ্রামের চেয়ে শহরের প্রভাবটাই বেশী। বাজারটা বড়ই ছিল, এবার যুদ্ধের মরসুমে সেটা আরও বাড়িতে শুরু করিয়াছে। ধানচালের দর চড়িতেছে—সঙ্গে সঙ্গে বাজারটা ফাঁপিতেছে। নতুন দোকান বসিতেছে। মাইল খানেক লম্বা হইয়া উঠিতেছে বাজারের পথ।

অর্ধেকটা পথ আসিয়া দুলাল থমকিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ মনে হইল তাহার দুর্বল শরীর যেন যাদুমন্ত্রে সবল হইয়া উঠিয়াছে। মাথার মধ্যে ক্রোধ আক্রোশ যেন বৈশাখের আগুনের মত উত্তপ্ত লেলিহান হইয়া জ্বলিতেছে। শিউচার টুঁটিটা ছিঁড়িয়া না দিয়া তাহার শান্তি নাই। সে ফিরিল।

হঠাৎ একটা মোড়ের মাথায় পথের ভিড়ের মধ্যে হইতে কে তাহার জামার পিছনটা চাপিয়া ধরিয়া টানিল।

—কে ? এ্যাঁ! দুলাল ফিরিয়া দাঁড়াইল।

—ওরে শত্রু—ওরে—।

ব্রজদাসী !

ব্রজদাসী পথে পথে আসিতেছে দুলালের খোঁজে। মোড়ের মাথায় পৌঁছিয়াই দেখিল—দুলাল। সে তাহার জামার পিছন দিকটা চাপিয়া ধরিয়া ডাকিল—ওরে শত্রু—ওরে রাক্ষস—! কিন্তু কথা তাহার শেষ হইল না, জিভে আটকাইয়া গেল। একটা কদর্য উৎকট গন্ধ তাহার নিশ্বাস আটকাইয়া দিল, কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিল, বোধ করি হৃৎপিণ্ডটাও মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হইয়া গেল।

পরমুহূর্তেই সে চীৎকার করিয়া উঠিল—দুলাল !

সে চীৎকারে পথের জনতা চকিত হইয়া উঠিল; মনে হইল কেউ যেন আকস্মিক মৃত্যুর অতি নিষ্ঠুর যন্ত্রণায় সংসারের আপনতম জনটির নাম ধরিয়া শেষ চীৎকার করিয়া উঠিল।

—কি হ'ল ? কে ? কে ? কার কি হ'ল ?

কেহ উত্তর দিল না। কেহ বুঝিতে পারিল না কে চীৎকার করিয়াছে। ব্রজদাসী পরমুহূর্তেই দ্রুতপদে যেন ছুটিয়া পলাইয়া চলিয়াছিল।

দুলাল দাঁড়াইয়া ছিল অসাড় নিস্পন্দ—একটা মাটির পুতুলের মত।

দুলাল এখানে সকলের পরিচিত।

দুলালের নামটাও সকলের কানে গিয়াছিল। একজন জিজ্ঞাসা করিল—কি রে দুলাল ?

দুলাল অকস্মাৎ অগ্নিস্পৃষ্ট বিস্ফোরকের মত ফাটিয়া পড়িল, একটা ক্রুদ্ধ চীৎকার করিয়া তাহার গালে একটা চড় মারিয়া বসিল।

জনতা তাহাকে আক্রমণ করিল। প্রচণ্ড কোলাহল উঠিল। কিন্তু ব্রজদাসী ফিরিয়া চাহিল না।

আট

ছুটিয়া পলাইয়াছিল।

ব্রজদাসী যেন সংসার হইতে ছুটিয়া পলাইবে। দুলাল মদ খাইয়াছে। বৈষ্ণবীর অন্তর হাহাকার করিতেছিল। ইহা অপেক্ষা দুলাল মরিল না কেন ? হায় ভগবান, হায় রাধা-গোবিন্দ—এত বড় অসুখ, দীর্ঘ দেড়মাস দিন রাত্রি শিয়রে বসিয়া এই দেখিবার জন্য ওই রাক্ষসকে—ওই শত্রুকে সে বাঁচাইয়া তুলিল! আজ ষোল বৎসর ধরিয়া তাহার ধর্ম কর্ম ইষ্ট সাধনার অবসর খণ্ডিত করিয়া একটা মাংসপিণ্ডকে সে লালন করিয়া এত বড় করিয়া তুলিল—ইহারই জন্য! চোখ দিয়া তাহার বন্যা বহিতেছিল। হে ভগবান! কি করিবে সে ? কোথায় যাইবে সে ? এ লজ্জা কোথায় রাখিবে সে ?

—ব্রজ! ব্রজদাসী! ব্রজ!

—এ্যাঁ! ব্রজ বুঝিতে পারিল না কার কণ্ঠস্বর। সে হাঁপাইতেছিল।

—ব্রজ।

ডাকিতেছিলেন—মানগোবিন্দপুরের বাবাজী। ব্রজদাসী চলিয়াছিল মাঠের পথ ধরিয়া। বাবাজীর আখড়া মাঠখানার উপরেই, এখান হইতে অল্প খানিকটা দূরে। ব্রজদাসীর গ্রামে ফিরিবার পথ কাঁচা সড়কটা ওই মাঠের ওপরেই—আখড়ার কোল ঘেঁষিয়া চলিয়া গিয়াছে। ব্রজদাসীর খেয়াল ছিল না, অথবা ইচ্ছা করিয়াই আখড়ার সান্নিধ্য এড়াইয়া মাঠে মাঠে চলিয়াছিল—সে ব্রজদাসীও জানে না, সে শুধু চলিয়াছিলই। বাবাজী মাঠের মধ্যে কি যেন করিতেছিলেন, ব্রজদাসীকে এইভাবে মাঠের পথে আত্মহারার মত ছুটিয়া যাইতে দেখিয়া ডাকিলেন।

ব্রজ বুঝিতেই পারিল না কাহার কণ্ঠস্বর।

সম্ভবতঃ চরম লজ্জায় সে বুঝিতে চাহিতেছিল না। কি বলিবে সে বাবাজীকে!

—ব্রজ!

এবার ব্রজ ফিরিয়া চাহিল।

—কি হ'ল ব্রজ? এমন ক'রে—? কথা শেষ করিতে পারিলেন না বাবাজী। ব্রজদাসীর মুখের চেহারা দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। কি হ'ল? তবে কি রোগের হঠাৎ কোন নূতন আক্রমণে দুলালের কিছু হইয়াছে?

—কি হয়েছে ব্রজ? দুলাল—

ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল ব্রজদাসী।

বাবাজী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—দুলাল ভাল আছে ব্রজ?

ব্রজ সেই মাঠের মধ্যেই বাবাজীর পায়ের উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া বলিল—দুলাল কেন মরল না প্রভু? সে কি—

—কি হ'ল ব্রজ? এ কি বলছ তুমি?

—দুলাল মদ খেয়েছে প্রভু! সে এর চেয়ে মরল না কেন? এ আমি কি করব?

চোখের জলের আর বিরাম ছিল না।

বাবাজী যেন অকস্মাৎ একটা কঠিন আঘাত পাইলেন, চমকিয়া উঠিলেন, কথা বলিতে পারিলেন না।

ব্রজ আকুল কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করিল—বলুন, আমি কি করব? আমার পরিত্রাণের উপায় বলে দিন! সে প্রত্যাশাভরা নির্নিমেষ করুণ দৃষ্টিতে বাবাজীর দিকে চাহিয়া রহিল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বাবাজী বলিলেন—পরিত্রাণ হয় তো আছে ব্রজ, কিন্তু তা তুমি পারবে?

—পারব—খুব পারব। আপনি বলুন।

—ব্রজ—গাছ জীবনের সকল রস জমিয়ে তাকে জলে রোদে পাক ক'রে বহু কষ্টে ফুল ফোটায়—সেই ফুল থেকে হয় ফল, সেই ফল বাড়ে—তারপর একদিন পাকে—খসে পড়ে; সেদিন গাছের দুঃখটা বুঝতে পার? কিন্তু ফলের সেদিন পরমানন্দ। সে স্বাধীন জীবন পেলে মাটির বুকে—নিজের বীজকে ফাটিয়ে গাছ হবে। এ সংসারের নিয়মই এই। ওর আশা তুমি ছেড়ে দাও। ওকে যেতে দাও নিজের পথে।

দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ব্রজ ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বাবাজী দাড়িতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—বৃন্দাবনে যাবে ব্রজ? যাও যদি, চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাব। সন্তানের দুঃখ বড় দুঃখ ব্রজ, আমার দুঃখ তো তুমি জান। পারবে—যাবে?

ব্রজ এ কথার জবাব দিল না, মনের আবেগে বলিল—আপনি তো অনেক জানেন, অনেক বোঝেন—বলতে পারেন এ আমার কোন্ পাপের প্রায়শ্চিত্ত ? আমি তো কোন পাপ করি নাই। তবে, তবে আমার এ শাস্তি কেন ?

বাবাজী হাসিয়া বলিলেন—শাস্তি তো নয় ব্রজ !

—শাস্তি নয় ?

—না। এই তো নারীজন্মের পরমানন্দ ব্রজ। বেদনার মধ্যে দিয়েই সন্তানের জন্ম, সে বেদনায় মনে হয় ত্রি-সংসার বিলুপ্ত হয়ে গেল—অন্ধকারে, নিজের আত্মা দু'খানা হয়ে সন্তান পায় তার আত্মা !

ব্রজ অধীর ভাবে ঘাড় নাড়িয়া অস্বীকার করিয়া বলিল—না-না—প্রভু আমি জানি না, ও আনন্দ যদি পেতাম ও যদি আমার গর্ভের সন্তান হ'ত তবে যে আজ আমি নিজেকে বুঝাতে পারতাম আমার পাপে ওর এই মতি—আমার রক্তের দোষে—ওর—

সে আবার ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া কোনমতে আত্মসম্বরণ করিয়া চোখ মুছিয়া উদাস দৃষ্টিতে দিগন্তের দিকে চাহিয়া বলিল—আজ ষোল বছর এ কথা আপনার কাছেও প্রকাশ করি নি। ও আমার গর্ভের সন্তান নয়—।

দিগন্তের দিকে চাহিয়াই সে বলিল—দিগন্তের পটভূমিতে যেন ষোল বৎসরের ইতিহাস ফুটিয়া উঠিয়াছে।

—ওকে আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। বেরিয়েছিলাম বৃন্দাবনে। পদব্রজে। বড় মনের দুঃখেই বেরিয়েছিলাম—। অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল পৃথিবী। প্রভু শ্যামচাঁদ আমাকে রূপ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। আর দিয়েছিলেন গান গাইবার কণ্ঠ। মা বলতো—আমার কোলে এসেই তোর সোনার কপালে ধুলো লাগলো রে ব্রজ, ভিখেরী বাউল বৈষ্ণবের মেয়ের গর্ভে জন্মালি—ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে ভিখারিণী তোকে সাজতেই হবে। নইলে যে রূপ তোর—যা তোর গানের কণ্ঠস্বর—তাতে রাজপুরীতে সোনার পালঙ্কে বসে তোর বীণা বাজিয়ে গান গাইতিস মা !

মেঘে ঢাকা শুক্লা তৃতীয়ার চাঁদের মত বেদনাচ্ছন্ন এক টুকরা হাসি ব্রজদাসীর ঠোঁটে ফুটিয়া উঠিল—সম্ভবতঃ মনে পড়িয়া গেল আপনার সে রূপের কথা। বলিল—তা রূপ আমার ছিল প্রভু। কপালে চাঁদ ফুটে উঠত পূর্ণিমার রাত্রে যখন চাঁদের পানে চাইতাম।

বাবাজী বলিলেন, তুমি যে দিন দুলালকে কোলে নিয়ে নবীন ক্ষ্যাপার আঙিনায় বসে গান শুনিয়েছিলে ব্রজ, সে দিন পূর্ণিমা ছিল না—সে দিন ছিল শুক্লপক্ষের একাদশী, সে দিনও তোমার কপালে চাঁদ আমি দেখেছিলাম।

—না প্রভু দেখেন নি। আপনি যখন দেখেছেন তখন রূপে আমার কার্তিকের রাত্রির ধোঁয়া ধুলোর মত কুয়াসার মত একটা ঝাপসা ছিল্‌কে পড়ে গিয়েছে। যখনকার কথা বলছি তখন কপালে আমার ফুটে উঠত শরতের চাঁদের আলোর মত ঝলমলানি। প্রভু আয়নায় নিজের মুখ দেখতাম—দেখে নিজেরই আমার আশা মিটত না। কিন্তু বিশ্বাস করুন বাউল বৈষ্ণবের মেয়ে আমি, আমি মায়ের কথা শুনে সুখ পেতাম না। আমার এক গুরু ছিলেন সাধক বৈষ্ণব—তাঁর কথায় মন আমার ভরপুর হয়ে থাকত। আমার মায়ের কথা শুনে তিনি বলতেন—এ কি কথা গো ব্রজর মা ! তুমি না বাছা বৈষ্ণবী ! এমন রূপ কি অকারণে পেয়েছে !

বৈষ্ণবের ঘর যমুনা তটের নিকুঞ্জ, নিকুঞ্জের ধারে যমুনার বুকে ফুটেছে শ্বেত কমল—ওতে হবে প্রভুর পূজা! ও হ'ল কৃষ্ণপূজার কমল, তাই জন্মেছে সাধন পথের পথিক বৈষ্ণবের ঘরে, ও যদি রাজার ছেলের গলার মালাই হবে তবে রাজবাড়ীর সরোবরে ফুটল না কেন? প্রভু তিনি গান গাইতেন "কৃষ্ণপূজার কমল কলি রাখব আমি মাথায় করে।" আমি সেই স্বপ্ন দেখতাম। মহাজনের পদাবলী তিনিই আমাকে শিখিয়েছিলেন। ওই লীলার স্বপ্ন আমাকে বিভোর করে তুলেছিল। হায় রে দুর্ভাগা মানুষ! মানুষের মধ্যে দুর্ভাগা হ'ল মেয়ে জাত প্রভু। গুরু বলতেন "কৃষ্ণপূজার কমল" কিন্তু ভাবতেন না যমুনার জলে যে কমল ফুটত—সে কখনও শুকাত না, কিন্তু মানুষের রূপ-যৌবন যায়, কমল ফুলও শুকিয়ে যায়, সেদিন প্রভুর চরণ থেকে ধুলোয় গিয়ে পড়ে! প্রভু ভালবেসেছিলেন—ওই লীলাগানের কিশোরীর ভালবাসার মত একজনকে সেই বয়সে ভালবেসেছিলাম। মনে হয়েছিল—ওর কাছে লজ্জা পায় রাজার ছেলে, ওই আমার রাজার রাজা, ওই হ'ল সকল গুণীর সেরা গুণী, ওই হ'ল—সকল পুরুষের মধ্যে পুরুষোত্তম। সেও আমাকে সেদিন বলেছিল, বৈষ্ণব সে—সব মহাজনের সেরা মহাজন—প্রভু চণ্ডীদাসের পদ গেয়ে আমাকে শুনিয়েছিল। গেয়েছিল—"ও দুটি—।"

ব্রজদাসী চুপ করিয়া গেল। আজ এই বেদনার্ত মনেও সে লজ্জা পাইল। সে সেদিন বলিয়াছিল—"ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি।"

কিছুক্ষণ পর ব্রজ বলিল—বিশ্বাস করেছিলাম। অকপটে বিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু শ্যামচাঁদ হয়তো হেসেছিলেন।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল সে। তারপর বলিল—শ্যামচাঁদকে তো চাই নি, চেয়েছিলাম তাকে, তাই প্রভু হেসেছিলেন, হয়তো বলেছিলেন—তোর কর্মফল, আমার দোষ কি? নারী হয়ে জন্মেছিস, মহাজনের পদাবলী গান করেও চোখ তোর ফুটলো না, সামান্য পুরুষে করলি পুরুষোত্তম বলে ভ্রম, তার ফল তোকে পেতে হবে—জানতে হবে মাটির পৃথিবী নারীজন্মের কোন্ দাম দেয়, সেই দাম তোকে নিতে হতে। সে দাম নিতে হ'ল, বুঝতে হ'ল একদিন। বয়স বেড়ে আসছিল—আটাশ বছর বয়স, দুলালকে পাবার মাস কয়েক আগে আমাকে সে ত্যাগ ক'রে নতুন বৈষ্ণবী নিয়ে এল ঘরে। বললে—আমার সাধনার সামনে—রূপ চাই, যৌবন চাই, তা' আজ তোমার নাই। লুকিয়ে আয়নায় মুখ দেখলাম ভাল ক'রে—দেখলাম সে মিথ্যে বলে নাই, রূপের ওপর আমার কার্তিকের সন্ধ্যার কুয়াসার ছিল্‌কের মত ছিল্‌কে পড়েছে। প্রভু—কমল ফুল শুকিয়ে গিয়েছে। তাকে কি দোষ দেব? আমিই তো নিত্য আমাদের আখড়ায় শ্রীমন্দির মার্জনা করতাম, বাসি ফুলগুলি আমিই বের ক'রে ফেলে দিতাম, বাসি ফুলের দাগ লেগে থাকলে ঘষে পরিষ্কার করতাম, নিজের হাত তাও ভাল ক'রে ধুয়ে ফেলতাম, দাগ উঠে গেলেও হাত শুঁকে দেখতাম—কোন গন্ধ উঠছে কি না। তখন বুঝলাম—নারীজন্মের দাম। এ পৃথিবীতে নারীজন্মের দাম রূপ আর যৌবন। ফুলের দল খসে যায়, তাতে ফল ধরে, বীজ হয়। সে বীজে গাছ হয় কিন্তু যে ফুল অন্তর শুদ্ধ দেবতার পায়ে না দিয়ে সেখানে ওঠে—তার না-হয় দেবতাকে পাওয়া, না হয় ফলে বীজে নূতন করে বাঁচা, তাকে ধুলোয় মিশিয়ে যেতে হয়। সেই দিনই আমি মনের ধিক্কারে বেরিয়ে পড়লাম। পৃথিবী তখন অন্ধকার। স্থির করলাম যে পুরীতে অক্ষয় চাঁদ বিরাজ করেন—যেখানে যাব। যাব বৃন্দাবনে। পদব্রজে যাব, ভিক্ষা করতে করতে চলে যাব।

নয়

তখন মনে পড়িয়াছে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীদের—সকল দুঃখের সকল সুখের পরমাশ্রয়কে। দেবতাকে ইষ্টকে মনে পড়িতেই সে তাঁহার আশ্রয় লইতে ছুটিয়া চলিয়াছে। একা চলিয়াছে। রূপ যৌবন থাকিতেও পথ চলিতে ভয় করে নাই। কাঁধে শুধু একটি ঝুলি—বগলে একটি ছোট পোঁটলা—আর একটি ঘটি।

বেদনায় মানুষ যখন আপনাকে হারায়, তখন এমন করিয়াই হারায়।

মাস খানেক পথ চলিবার পর হঠাৎ একদিন সে বিপদে পড়িল। পথ চলিতে চলিতে বড় একটা রেল স্টেশনে আসিয়া হাজির হইয়াছিল। ভিক্ষায় ভিক্ষায় কিছু টাকা তাহার ইতিমধ্যে জমিয়াছিল—সেই টাকায় একটা টিকিট করিয়া খানিকটা আগাইয়া লইবার অভিপ্রায় ছিল। যত দিন যাইতেছে—ততই পদব্রজে বৃন্দাবনে পৌছিবার উৎসাহে ভাটা পড়িতেছে। তাহার উপর সামনেই আছে বড় একটা নদী এবং জঙ্গল-সমাকীর্ণ কতকটা স্থান। জায়গাটা সম্পর্কে চুরি ডাকাতি রাহাজানির গল্প কাহিনীর মত এ-অঞ্চলে প্রচলিত। খানিকটা ট্রেনে চড়িবার সঙ্কল্প করিয়া সে নিজের উপরেই খুব খুশী হইয়া উঠিল। পথ চলিয়া ক্লান্তও হইয়াছিল। মনের ক্ষোভ, সংসারের উপর তিক্ততার পরিমাণ যতই হোক—দেহ তো রক্ত-মাংসের মানুষের।

সমস্ত দিনটা স্টেশনের বাজারটায় গান গাহিয়া ভিক্ষাও মিলিল প্রচুর। অপরাহ্ণে সে আসিয়া মুসাফেরখানায় উঠিল; স্টেশনের যাত্রীশালা। সেখানেও একদফা সে খঞ্জনী বাজাইয়া গান আরম্ভ করিল, সামনে পাতিয়া দিল নিজের ভিক্ষা-পাত্রটা।

গান শেষ হইতে ভিক্ষাপাত্রটায় পড়িল অনেক, পয়সা হইতে সিকি পর্যন্ত। হঠাৎ একটা টাকা ঠং করিয়া পড়িল। সকলেই চমকিয়া উঠিল—দাতাকে দেখিবার জন্য, বৈষ্ণবীও মুখ তুলিয়াছিল। একজন তকমা-আঁটা আর্দালি, সে বলিল—সাব বকশিশ দিয়া। আপিস মে বইঠকে গীত শুনা। সে হাসিতে লাগিল। বৈষ্ণবী টাকাটা কপালে ঠেকাইয়া সাহেবকে নমস্কার জানাইল। চাপরাসী বলিল—সাহেব হুকুম দিয়া কি—

কে একজন বলিল—বাংলাতে বল বাবা। বষ্টুমী বষ্টুমী হায়—ব্রজধামের আহিরিণী নয়। হিন্দী-মিন্দি বুঝবে না।

—হাঁ হাঁ। সাহেব হুকুম দিলো! কি—উসকে বাংলোমে লিয়ে আও, গানা শুনাও!

—সাহাব বাংলা গান শুনবে? পরমুহূর্তেই বষ্টুমী প্রশ্ন করিল—সায়েব বাঙালী নাকি তোমাদের?

মুসাফেরখানার স্টলের একটা ছোকরা বলিয়া উঠিল—আমার চেয়েও রঙ কালো গো বষ্টুমী। রোজ ওই আর্দালিটা বাজার থেকে পুঁইডাঁটা কুমড়োর ফালি নিয়ে যায় আমি দেখেছি।

বষ্টুমী হাসিয়া ফেলিল; সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িল—চল।

এদেশের মানুষ হইলে তাহার ভয় কি? তাহার কণ্ঠে প্রভুর লীলার মোহন মন্ত্র, সে মন্ত্রে, সে গানে পাষাণ গলে, পশু বশ মানে! পথে বাহির হইয়া দেখিল সে অনেক। গৃহস্থের দুয়ারে দুয়ারে গান গাহিয়া ভিক্ষা মাগিয়া শুধু তো মুষ্টিভিক্ষাই পায় নাই—ওই একমুষ্টি চালের সঙ্গে তাহাদের কত ভালবাসাই না পাইল সে।

সাহেব ? সাহেবও সে দেখিয়াছে। সদর শহরে দিন কয়েক ভিক্ষা করিয়াছে—সেখানে খাঁটি সাহেব মেকী সাহেব দেখিয়া আসিয়াছে এই দিনকয়েক আগে। মেকী সাহেবের বাংলোয় সে দেখিয়াছে—সাহেব সাজিয়া মুখে চুরুট চাপিয়া কর্তা বলিয়াছে—কেয়া মাংটা, বাগো। দিব্যি আলতা পায়ে গরদের শাড়ী পরিয়া গিন্নী বাহির হইয়া আসিয়া বলিয়াছে—মরণ! ফকীর বষ্টুম ভিক্ষে চাইতে এসেছে—তাদের কাছেও হিন্দী চালাচ্ছে ? এসো গো বাছা—এস ভিক্ষে নিয়ে যাও!

বষ্টুমী বলিয়াছিল—প্রণাম মা-ঠাকরুণ, গান শুনবেন ?

—গান ? গান জান ? গাও, গাও। শুনব বই কি ?

বষ্টুমীর মনে দুর্বুদ্ধি জাগিয়াছিল। খঞ্জনীতে ঘা দিয়া বলিয়াছিল—ব্রজেশ্বরী রাধা মান করেছেন—শ্রীগোবিন্দ নাপতানী সেজে আলতা পরাব বলে পায়ে ধ'রে মান ভাঙাচ্ছেন।

বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী

হরতিদর তিমিরমতি ঘোরং।

গানটা সে জমাইয়া ধরিয়াছিল। বাংলোর যত চাকর আর্দালি আসিয়া আনাচে কানাচে দাঁড়াইয়া গান না শুনিয়া পারে নাই। সে যাহা চাহিয়াছিল, তাহা হইয়াছিল। খোদ সাহেব আসিয়া নিজেই একটা বেতের চেয়ার টানিয়া গিন্নীর পাশে গান শুনিতে বসিয়া গিয়াছিলেন। গিন্নী নাকে কাপড় দিয়া বলিয়াছিলেন—উঃ! সাহেব চমকাইয়া উঠিয়া—ওঃ! বলিয়া হাতের চুরুটটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন! বষ্টুমী গান গাহিতে গাহিতেও না হাসিয়া পারে নাই, মুহূর্তে বুঝিয়া লইয়াছিল—চুরুটের গন্ধ গিন্নীর সহ্য হয় না। সাহেবকে চুরুট খাইতে হয়—গিন্নীর সঙ্গে আলাপের সময় বাদ দিয়া।

শেষ 'দেহি পদপল্লবমুদারম্'—কলিটি গাহিয়া গান শেষ করিতেই খাঁটি বাংলায় সাহেব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—বাঃ, চমৎকার! যেমন তোমার গলা তেমনি তোমার শুদ্ধ ক'রে গাইলে। কার কাছে গান শিখেছ ?

দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বলিয়াছিল—বাউল গুরুর কাছে প্রভু; তিনি নিজেই ছিলেন মহাজন। গুরুর নাম স্মরণ করিতে তাহার চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল। কৌতুক বোধ—রসিকতার ইচ্ছা—সব ওই দুই ফোঁটা চোখের জলের মধ্যে দুই বিন্দু অগ্নিকণার মত পড়িয়া নিবিয়া কোথায় তলাইয়া গেল; বিন্দু সিন্ধু হইয়া উঠে সময়ে সময়ে, দুই বিন্দু চোখের জল তাহার দুই সমুদ্র হইয়া উঠিল যেন!

সেদিনও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে গুরুকে স্মরণ করিয়া সে পা বাড়াইল। জয় গুরু—জয় রাধেশ্যাম! তারপর একটু হাসিয়া বসিয়াছিল—চল দেখি তোমার সাহেব কেমন ? চাপরাসীটাও কথা শুনিয়া হাসিয়াছিল।

রেলের লাইন দেখিয়া বেড়ান সাহেব। স্টেশন হইতে লাইন ধরিয়া খানিকটা গিয়া সাহেবের বাংলো। কেমন নির্জন, গাছ-পালায় ছায়াঘন। আগে আগে ল্যাইন-দেখিয়ে সাহেবেরা ছিলেন খাঁটি সাহেব, অথবা আধা সাহেব অর্থাৎ অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। এখন এদেশী লোক ওই চাকরি পাইতেছে। কিন্তু আসনের বা পদের একটা মহিমা আছে। স্টলের ছোকরা মিথ্যে বলে নাই—বাড়ীতে পুঁইডাটা কুমড়োর ফালি আসে, কিন্তু সাহেব টেবিলে বসিয়া খান। বারান্দার দরজার পাশে একটা আশ্চর্য রকমের কুকুর ঘাড় গুঁজিয়া ঘুমাইতেছিল। পায়ের শব্দে কুকুরটা মুখ তুলিয়া দেখিয়া আড়মোড়া ছাড়িয়া লইল। আর্দালিটা বলিল—যাও—যাও!

বষ্টুমী থমকিয়া দাঁড়াইল

—চলো-চলো—ডর নেহি হ্যায় !

—না।

ঠিক এই মুহূর্তে সাহেব বাহির হইয়া আসিল। আর্দালি বলিল—কুত্তা দেখকে ডরতি হ্যায় হুজুর।

সাহেব হাসিয়া কুকুরটাকে ডাকিয়া তাহার ঘাড়ে চাপড়াইয়া বলিল—দেও—সেলাম দেও !

কুকুরটা একটা পা তুলিয়া মাথাটা ঈষৎ নামাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—একেবারে নিরীহ ভেড়ার বাচ্চার মত। সাহেব বলিল—এস—তোমাকে কিছু বলবে না, সেলাম দিচ্ছ তোমাকে।

—মা-ঠাকরুণ কই ?

—আছেন—আসছেন, ভেতরে এস।

নিঃশঙ্ক মনেই বষ্টুমী বারান্দায় উঠিয়া বলিল—এইখানেই বসি।

—না, এই সামনের বসবার ঘরে !

চমৎকার সাজানো ঘর। কত আসবাব। বষ্টুমী ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিল—গিন্নী মায়ের জয় হোক। আসুন মা।

সাহেব একটা চেয়ারে বসিয়া বলিলেন—বস।

—কই, মা-ঠাকরুণ কই ?

—তুমি গান ধর না ! আসবেন, গানের সাড়া পেলেই আসবেন।

বলিয়া কুকুরটার মাথায় একটা চাপড় মারিয়া ইংরাজীতে কি বলিলেন। কুকুরটা পাশেই দিব্য শ্রোতার মত বসিয়া গেল।

বষ্টুমী আবার বলিল—মা-ঠাকরুণ কই ? কণ্ঠস্বর তাহার উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছে। এমন নিস্তব্ধ বাড়ীটায় সূচ পড়িলেও শব্দ ওঠার কথা, কিন্তু মানুষের কোন সাড়া নাই। মধ্যে মধ্যে এক-আধটা পাখী শুধু ডাকিয়া উঠিতেছে।

সাহেব এবার বলিলেন—মা-ঠাকরুণ বাড়ী নেই। তাতে কি হয়েছে ? তুমি গান শোনাও না !

—না। আমাকে তবে মিথ্যে বলে ডেকে আনলে কেন আপনার লোক ?

—উঠো না, বস।

—না। সে মুহূর্তে উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ওই প্রকাণ্ড কুকুরটা উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কঠিন দৃষ্টিতে তাহাকে যেন চোখ রাঙাইয়া শাসন করিয়া নিম্ন স্বরে একটা হিংস্র গর্জন করিয়া উঠিল—গোঁ—! গোঁ—!

সাহেব হেসে উঠল হি-হি করে। বললে—এবার নড়লেই ও তোমার কাঁধে পা তুলে দিয়ে দাঁড়াবে। বস—বস। গান শোনাও।

ভয়ে বষ্টুমীর সর্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে গেছে। সে ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল। সাহেব আবার একবার হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

মনে মনে ভগবানকে স্মরণ করিয়া সে নিজেকে সম্বরণ করিল। তারপর খঞ্জনীতে ঘা দিয়া গানও শুনাইল। গান শেষ করিয়া বলিল, এইবার আমি যাই। বলিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটাও উঠিয়া দাঁড়াইয়া আবার গোঙাইয়া উঠিল।

সাহেব হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিল—আজ তোমাকে রাত্রিটা এখানে থাকতে হবে। বুঝেছ না? খালি বাংলো, মেয়েরা কেউ নেই, রাত্রে থাকবে—গান শোনাবে—নাচতে পার—নাচতে?

সে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল—না!

সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটাও বার-দুই গম্ভীর আওয়াজ করিয়া ডাক দিল—হাউ—হাউঁ!

সাহেবও কুকুরটার সুরে সুর মিলাইয়া হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। তারপর আবার বলিল—দেখলে তো! জ্যাকের মত কুকুর আর হয় না। বুঝলি জ্যাক, এ রইল। খবরদার—চেঁচাতে দিবি না, নড়তে দিবি না। আমি চললাম এখন।

নৃশংস লোকটা—লোকটা নয়, পশুটা—ঘরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

*　　*　　*

ষোল বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল। আজ ষোল বৎসর পরেও সেই ঘটনার কথা মনে করিয়া ব্রজদাসী শিহরিয়া উঠিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। বলিল—সে দিন আমার মনে—

বাবাজী বলিলেন, থাক—ব্রজ—থাক—

—না। আজ ষোল বছর কলঙ্কের পসরা মাথায় করে লুকিয়ে রেখে এসেছি—সে কথা আজ না বলে আমি শান্তি পাচ্ছি না।—জানে দুজনে—আপনিও শুনুন। নইলে শান্তি পাব না—স্বস্তি পাব না আমি। ম্লান হাসিতে বাবাজীর মুখ সকরুণ হইয়া উঠিল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন তিনি।

আঁচলের খুঁটে চোখ মুছিয়া ব্রজ বলিল—কি করব? মনে মনে শ্যামকে ডাকলাম। বললাম—এই তোমার মনে ছিল? শেষে কি এমন ভয়ঙ্কর সাজা দেবে আমাকে? আমার গুরু একটি গল্প বলতেন। তাঁর গুরুর গল্প। তাঁর গুরুর আখড়াটা ছিল নাকি খুব জমজমাট! মহাপ্রভুর শ্রী-অঙ্গে ছিল অনেক অলঙ্কার। লোকে বলত টাকাও নাকি অনেক। একদিন রাত্রে ডাকাত পড়ল। দরজা ভাঙছিল তারা, আমার গুরুর গুরু নিজেই দরজা খুলে বেরিয়ে এসে হাতজোড় করে বললেন—এলে—এলে—শেষে এই রূপেই এলে? তারা কথা শুনতে আসে নাই—এসেছিল ডাকাতি করতে, তারা প্রথমেই তাঁকে মারলে, মাথায় লাঠি মারলে। চাইলে কোথায় কি আছে দে। তিনি হেসে বললেন—নাও, সঞ্চয়ের মতি হয়েছিল—তোমার নামে করেছি—সে সঞ্চয় নিতে তোমার এই রূপেই তো আসার কথা। এসেছ—নাও। তিনি মন্দিরের দরজা খুলে একে একে খুলে দিলেন—সব অলঙ্কার। তারা বললে—টাকা! কিছু টাকা পুঁতে রেখেছিলেন—তাও দেখিয়ে দিলেন। তারা বললে—আর? তিনি হাত জোড় করে বললেন, আর তো নাই প্রভু। তারা তা বিশ্বাস করলে না, জ্বলন্ত মশাল দিয়ে মেরে সর্বাঙ্গ পুড়িয়ে দিয়ে চলে গেল। তাতেই তিনি দেহ রেখেছিলেন। আমার গুরুকে বলেছিলেন—বাবা—এই না হ'লে আমার মুক্তি ছিল না, তাঁর চরণ পেতাম না আমি। আমার সাধনের ফাঁকি যেটুকু ছিল—সেটুকু তিনি নিজে হাতে ঘুচিয়ে দিয়ে গেলেন ওই মূর্তিতে এসে। ইদানীং আমিও এই রকম ভাবছিলাম। বড় মমতা ছিল আমার। ঘুচে গেল, ঘুচিয়ে দিলেন, এইবার তাঁর মদনমোহন রূপ দেখতে পাব আমি।

ব্রজ বলিল—সেদিন ওই গল্পটি মনে পড়েছিল। মনে হয়েছিল—দিতে তো পারি নি নিজেকে ভুলে—নিজেকে তুলে—দিতে যদি পারতাম তবে কি আর একজনকে ঘরে আনলে বলে—এমন করে চলে আসতে পারতাম? তাই কি শেষে এই ভয়ঙ্কর বেশে প্রভু আমার এই সাজা দিচ্ছেন? কেঁদে উঠেছিলাম ফুঁপিয়ে, কেঁদে গলা ছেড়ে ডেকেছিলাম—দয়া কর

গোবিন্দ—! সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা উঠল গর্জে। ভয়ে গলা বন্ধ হয়ে গেল—আমি যেন কাঠ হয়ে গেলাম।

আবার সে শিহরিয়া উঠিল। চোখের সম্মুখে সে দিন আবার ভাসিয়া উঠিল।

* * *

জীবনে সে এক যন্ত্রণার দিন। এমন নিষ্ঠুর যন্ত্রণা সে জীবনে কখনও ভোগ করে নাই। নিস্তব্ধ প্রকাণ্ড বাড়ী, চারিদিকে গাছপালার মধ্যে শুধু ঝিঁঝিঁ ডাকিয়া চলিয়াছে ওই একটানা নিম্নস্বরের ডাক—যেন একটা কান্নার প্রবাহের মত বহিয়া চলিয়াছে। ঠিক যেন তার অন্তরের কান্নার প্রতিধ্বনি। বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই—তাহার অন্তরাত্মা কাঁদিয়াই চলিয়াছে। মুখের সামনে স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া প্রকাণ্ড কুকুরটা বসিয়া আছে বিভীষিকার মত। তৃষ্ণায় তাহার বুক হইতে ওষ্ঠপ্রান্ত পর্যন্ত শুকাইয়া যেন বৈশাখের বালুচর হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কাহাকেও ডাকিবার উপায় নাই, চীৎকার করিবার উপায় নাই।

হঠাৎ একটা অঘটন ঘটিয়া গেল। অতি সামান্য—কিন্তু বৈষ্ণবীর চোখে সেটা অঘটন বলিয়াই মনে হইল। বাড়ীর পাশের জঙ্গল হইতে সামনের ঘরটার খোলা জানালা দিয়া লাফাইয়া ঘরে ঢুকিল একটা বড় বেজীর মত জানোয়ার। বৈষ্ণবী দেখিল, কিন্তু কুকুরটা দেখিতে পাই নাই। জানালাটা যে ঘরের—সেই ঘরের দিকে সে পিছনে ফিরিয়া বসিয়া আছে। শুধু নাকটা তুলিয়া ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল;—গন্ধ বৈষ্ণবীও পাইয়াছিল—সে বুঝিল—খাদ্যলোভে কোন লোভী খটাশ আসিয়া ঢুকিয়াছে। হতভাগ্য খটাশ। ও ঘরের কোন একটা জিনিস ঝন-ঝন শব্দে উল্টাইয়া ফেলিল। এবার কুকুরটা লাফ দিয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া ছুটিল। খটাশটা ছুটিয়া পলাইতেছে। কুকুরটাও ছুটিয়াছে। খটাশটার উপর একটা লাফ দিয়া পড়িল। কিন্তু খটাশটা তাহার পূর্বেই লাফ দিয়া উঠিয়া পড়িল একটা আলমারির মাথায়—সেখান হইতে লাফ দিয়া খড়ো-বাংলোটার চালের কাঠ নখ দিয়া আঁচড়াইয়া ধরিয়া ঝুলিতে লাগিল।

কুকুরটাও লাফ দিতে শুরু করিল। মুহূর্তে বষ্টমীর চেতনা ফিরিয়া আসিল। প্রাণপণে দেহের কম্পন—মনের ভয়কে লঙ্ঘন করিয়া উঠিয়া পড়িল। দুইটা ঘরের মাঝের দরজাটা টানিয়া ধরিল; বৈষ্ণবীর ভাগ্য, বন্ধ করিয়া দিতেই বিলাতি ঢংএর ছিটকানি খট্ করিয়া বন্ধ হইয়া গেল। ওদিকে কুকুরটা তখন খটাশটাকে লইয়া মাতিয়া আছে, ঘরময় লাফাইয়া লাফাইয়া বেড়াইতেছে, গোঁয়াইতেছে। খটাশটাও বোধ হয় চালের কাঠে কাঠে ছুটিয়া ফিরিতেছে। খর-খর শব্দ উঠিতেছে ঘরের চালের কাঠামোয়।

বৈষ্ণবী কোন্ পথে পলাইবে? পথ? পথ কই? পিছনের দিকে সে একটা জানালা খুলিয়া ফেলিল। জানালাগুলার শিক নাই। প্রাণপণ চেষ্টায় সে জানালার উপর উঠিয়া বাহিরে লাফাইয়া পড়িল! এইদিকেই তাহারা ঢুকিয়াছিল বাংলোয়, এটা পিছনের দিক। ছোট একটা ফটক। ফটক খুলিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। সন্ধ্যার অন্ধকার তখন ঘনাইয়া আসিয়াছে। সে অন্ধকারের মধ্য দিয়া সামনে যে দিকটা পড়িল—সেই দিকেই ছুটিল।

ছুটিয়াই চলিয়াছিল।

কতক্ষণ চলিয়াছিল—হিসাব নাই। হিসাব রাখিবার মত মনের অবস্থাও নয়। শুধু সে পলাইয়া চলিয়াছে। কুকুরটা যদি জানিতে পারিয়া ছুটিয়া থাকে পিছন-পিছন! মধ্যে একবার সে থামিয়াছিল; মাঠে একটা পুকুর দেখিয়া না থামিয়া পারে নাই। তৃষ্ণায় বুকখানা ফাটিয়া যাইবে বলিয়া মনে হইতেছিল। ছুটিয়া গিয়া ঘাটে নামিয়াছিল সে। অঞ্জলিতে ভরিয়া জলপানের বিলম্ব সহ্য হয় নাই। জন্তুর মত জলের উপর মুখ রাখিয়া চোঁ-চোঁ শব্দ তুলিয়া সে

জলপান করিয়াছিল। তাহার পর আবার চলিয়াছিল। মাঠে মাঠেই চলিয়াছিল। চলিতে চলিতে সামনে পড়িল একটি নদী। এ দেশের নদীতে বর্ষার সময় ছাড়া জল বড় একটা থাকে না। সময়টা বর্ষা নয়—ফাল্গুনের শেষ, কিন্তু তবু সে নদী পার হইল না। পা-ও আর তাহার চলিতেছে না। আর সে পারিতেছে না—আর সে পারিবে না। সে ভয়ঙ্কর কুকুরটা যদি এখানে আসিয়াও তাহাকে টুকরা-টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলে! ফেলুক ছিঁড়িয়া—আর সে পারিবে না। পাশেই একটা জঙ্গল। সে সেই জঙ্গলে ঢুকিয়া পড়িল। একটা গাছতলায় মাথা রাখিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল।

কৃষ্ণপক্ষের একাদশী। দুলালের জন্মতিথি। সে তিথি কি ভুলিবার! বাইশ দণ্ডেরও বেশী রাত্রি তখন চলিয়া গিয়াছে। কারণ আকাশে তখন চাঁদ উঠিয়াছে। ঘুম ভাঙিয়া গেল বষ্টুমীর। ক্লান্তির মধ্যেও আতঙ্কের প্রভাবে চেতনা তাহার সজাগ ছিল। ফাল্গুনের ঝরা পাতার উপর কাহার ভারী পায়ের শব্দে সে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল—কে?

মুহূর্তে কে যেন খানিকটা দূরের গাছতলায় হেঁট হইয়া কি করিতেছিল, বিদ্যুৎগতিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। বষ্টুমীও উঠিয়া দাঁড়াইল; আতঙ্কে তাহার সর্বশরীর থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। চন্দ্রালোকের রহস্যময় স্বচ্ছতার মধ্যে একটা সাদা মূর্তি দাঁড়াইয়া উঠিল। সে আবার প্রশ্ন করিতে চেষ্টা করিল—কে? কিন্তু গলার স্বর বাহির হইল না। ওদিকে মূর্তিটাও একটা অস্ফুট ভয়ার্ত চীৎকার করিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল, সামনে নদী, নদীতে ঝাঁপ দিতে ভয় করিল না। বষ্টুমী দেখিল, জ্যোৎস্নায় আলোকিত ওপারের বালুচরের উপর দিয়া মূর্তিটা চলিয়া গেল—ক্রমে বালুচরের শেষে স্থির কালো একটা কিছুর মধ্যে মিশিয়া গেল। ওটা একটা গ্রাম, গাছপালাগুলি স্থির কালো মূর্তি লইয়া জমাট বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

এদিকে একটা অদ্ভুত অবিশ্বাস্য শব্দ!

কান্নার শব্দ! শিশু-কণ্ঠের কান্নার শব্দ! গাছতলা হইতে এক-পা-এক-পা করিয়া আগাইয়া গেল বষ্টুমী। আকাশে চাঁদ—বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; জঙ্গলের ভিতরেও মধ্যে মধ্যে পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না আসিয়া মাটির উপর পড়িয়াছে। সাদা আলোর মধ্যে কালো কালো এগুলো কি? কয়লা, কাঠ-কয়লা! ওটা কি? খালি কলসী কাত হইয়া পড়িয়া আছে। রাজ্যের কাপড়-বিছানা ওই—ওই—দূরে দূরে ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। এবার বেশ সতর্ক হইয়া হেঁট হইয়া দেখিল—নজরে পড়িল—হাড়; টুকরা টুকরা হাড়ও ছড়াইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। তাই বটে! শ্মশানই বটে! কিন্তু এখানে শিশু কাঁদে কোথায়, কাঁদিবে কি করিয়া! ভয়ে তাহার শরীর আবার কাঁপিয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল ছুটিয়া পলাইয়া যায়। কিন্তু তা-ও সে পারিল না। ভয়েই পা উঠিতেছে না। একটা গাছের ডাল সে সজোর মুঠিতে আঁকড়াইয়া ধরিল; তাহার পায়ের কাছেই কান্নাটা যেন মাটি হইতে উঠিয়া আসিতেছে। একেবারে পায়ের তলায়। সভয়ে সে বসিল। তীক্ষ্ণ বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। গাছের ছায়ার তলে—একটা পোঁটলা; কান্না বাহির হইয়া আসিতেছে তাহারই ভিতর হইতে। হাত কাঁপিতেছিল; সেই হাতেই কোনমতে সে পোঁটলাটা তুলিয়া লইল। সেক্ষণের সে মন, মনের সে উদ্বেগ—সে যন্ত্রণা—সে ভয়—জীবনে তাহার অনাস্বাদিত; মন চীৎকার করিতেছিল—না—না চাই না। হাত দুইটা থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল। কিন্তু ওই পোঁটলার বাঁধন খুলিয়া শিশুটিকে না দেখিয়া তাহার পরিত্রাণ নাই, চুম্বকে এবং লোহাতে যেমন জড়াইয়া যায়—তেমনি ভাবেই হাতের সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছিল, হাত কাঁপিতেছিল। পোঁটলা কাঁপিতেছে, পড়িতেছে

না ; পড়িলে পোঁটলার সঙ্গে সে-ও উপুড় হইয়া মাটির উপর পড়িয়া যাইবে। কোনক্রমে পরিপূর্ণ চাঁদের আলোতে আনিয়া মাটিতে নামাইল—বাঁধন খুলিল।

* * *

ব্রজদাসী বলিল—প্রভু, সেদিনের সে শেষরাত্রি আমার আজও মনের মাঝে জল-জল করছে। চোখ বুজলে মনে হয়—আমি যেন সেই নদীর পাড়ে শ্মশানের বুকে দাঁড়িয়ে রয়েছি ; চারিদিকে বড় বড় গাছের বন, মাটির উপর জ্যোৎস্নার টুকরো টুকরো আলো পড়েছে। আমি ছেলেটিকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে বুকে ধরে থর থর করে কাঁপছি। অন্ধকার চোখে দেখতে পাইনি প্রভু—তবু ছেলেটিকে জড়ানো কাপড় আর ছেলেটির শরীর নেড়ে বুঝতে পারলাম—তার অঙ্গে তখনও মায়ের রক্ত মাখানো রয়েছে। কি যে হল, কি যে করব ভেবে পেলাম না। শুধু কাঁদলাম। বলুন তো প্রভু—মানুষের শিশু, কেমন করে সেই শ্মশানে তাকে ফেলে দিই ? কিন্তু আমি বৈষ্ণবী বৃন্দাবনের পথে পা বাড়িয়েছি—আমিই বা এই জীবটিকে নিয়ে কি করি ? মনে মনে বললাম—গোবিন্দ তুমি পথ বলে দাও ! গুরুকে স্মরণ করলাম—বললাম—গুরু, তুমি আমাকে রক্ষা কর !

বাবাজী বলিলেন,—গোবিন্দ তোমাকে ঠিক পথই দেখিয়েছিলেন ব্রজদাসী। গুরু তোমাকে রক্ষা করেছিলেন ; হতভাগা শিশু—মা-বাপ যাকে পরিত্যাগ করে শ্মশানে ফেলে দিলে—তাকে দেখেও যদি তুমি তুলে না নিতে—চলে যেতে বৃন্দাবনের পথে—তবে বিগ্রহই তুমি দেখতে, গোবিন্দকে তুমি পেতে না ! এ তুমি ঘরে ব'সে গোবিন্দকে পাবার পথ করেছ ব্রজ।

ব্রজ তীব্র আক্ষেপে ঘাড় নাড়িয়া কথাটা অস্বীকার করিয়া বলিল—না—না—না। এ জীবনে পেলাম না, পাব না, পাব না। তা হ'লে—ওই দুলাল—তার মতি এই হয় ? আমার দুর্মতি প্রভু, আমার লোভ বাবাজী—মনে মনে আমার বোধ হয় ছিল সন্তানের লোভ—তাই ছলনা করে গোবিন্দ আমার কোলে ফেলে দিলেন—ওই অসুর শিশুটাকে ! মুক্তির পথ আমার সামনে খোলা পড়ে ছিল, চোখে আঙুল দিয়ে—কানে খোঁচা দিয়ে আমাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। আমি তো এর জন্মদাতার হাতে জোর করে তুলে দিয়ে মুক্তি নিতে পারতাম।

বৈষ্ণবী নীরবে চোখ বুজিয়া সেই সব কথাই স্মরণ করিল। বাবাজী সস্নেহে তাহার মাথার কোঁকড়ানো চুলের রাশির উপর হাত বুলাইয়া দিলেন—বলিলেন—এমন ভাবে ভেঙে পড়ো না ব্রজ !

ব্রজ আবার ঘাড় নাড়িল।—না—না—না। বোধ হয় সান্ত্বনাকে অস্বীকার করিল, আজ সে নিজের কথা নিজের দুঃখ নিজের উপলব্ধি ছাড়া সব কিছুই অস্বীকার করিতেছে।—কেন সে সেদিন মুক্তি লয় নাই ?

* * * *

ক্লেদাক্ত শিশুকে বুকে লইয়া সে নদীর ঘাটে গিয়া নামিয়াছিল।

আঁচল ভিজাইয়া শিশুর অঙ্গের ক্লেদ মুছাইয়া দিবে। আবরণ-মুক্ত শিশুটি তখন একদিকে পৃথিবীর বায়ু-স্পর্শে থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, অন্যদিকে তারস্বরে কাঁদিতেছে। সবল শিশু !

কৃষ্ণপক্ষের একাদশী সেদিন। বৈষ্ণবী একাদশী করিয়া আছে। সামান্য ফল ও মিষ্টান্ন খাইয়াছে—সেই বেলা দ্বিতীয় প্রহরের শেষে। তিথিটা তাই অক্ষয় হইয়া রহিল তাহার মনে। একাগ্র মনে সযত্নে অনভ্যস্ত অপটু হাতে ভয়ে-ভয়ে সে শিশুর অঙ্গের ক্লেদ মুছাইতেছিল। হঠাৎ

কল-কল রবে পাখী ডাকিয়া উঠিল, বৈষ্ণবী চমকিয়া উঠিল।

আকাশে চাঁদ—পূর্বার্ধের চতুর্থ পাদ অতিক্রম করিয়াছে। পূর্ব-দিগন্তে পাণ্ডুরাভা দেখা দিয়াছে। পাখীরা প্রথম ধ্বনি দিয়া উঠিল। রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। শিশুটির মুখ অনেকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বৈষ্ণবী বিহ্বল হইয়া গিয়াছিল। সারা বুকের ভিতরটা গুরু-গুরু করিয়া উঠিতেছে। এ কি হইল? সে কি করিবে?

—কে গো? কে ওখানে? মানুষের সাড়া! বৈষ্ণবী আবার চমকিয়া উঠিল। প্রথমেই সে শিশুটিকে বুকে চাপিয়া ধরিল, ইচ্ছা হইল ছুটিয়া পলাইয়া যায়। কিন্তু তাও পারিল না, সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। সভয়ে সে চোখ তুলিয়া ওপারের দিকে চাহিল। শেষ-রাত্রির কাকজ্যোৎস্নার মত পাণ্ডুরাভার মধ্যে একটি মূর্তি ওপারে দাঁড়াইয়া আছে। চকিতের মত হইলেও—বৈষ্ণবীর মনে হইল—আকার অবয়ব ঠিক তেমনি—তাহারই মত—যে শ্মশান হইতে ছুটিয়া নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল। হ্যাঁ—ঠিক তেমনি।

বষ্টুমী বুঝিল, এ সেই লোক, যে এই শিশুকে বিসর্জন দিতে আসিয়াছিল। নিশ্চয় সে-ই ভয়ে পলাইয়া গিয়াও পলাইতে পারে নাই—আবার ফিরিয়া আসিয়াছে। ধীরে ধীরে সাহস ফিরিয়া আসিল।

বষ্টুমী বলিল—ভূত-প্রেত নই। আমি মানুষ। রাহী।

লোকটি আগাইয়া আসিল—রাহী! মেয়ে লোক—এই রাত্রে?

বষ্টুমী বলিল, এস তো এপারে। শোন তো একটু। তাহার কণ্ঠস্বরে আদেশ ছিল; সে আদেশ লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা ওই লোকটির নাই—সে বষ্টুমী জানে।

লোকটি নদীর জল ভাঙিয়া এপারে আসিয়া উঠিল। আসিয়াই বলিল—এ কি—তোমার সন্তান হল?

—হ্যাঁ। কিন্তু একটু সাহায্য করবে আমাকে? একটা গর্ত ক'রে দিতে পারবে? এটা তো শ্মশান, এটাকে—

'পুঁতে দেব' বলিতে সে পারিল না। ও-কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়া কঠিন তিরস্কার-ভরা দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া বলিল—তুমি পশু—না পাষাণ?

এমন প্রশ্নের জন্য লোকটি বোধ হয় প্রস্তুত ছিল না। সে চমকিয়া উঠিল।

বৈষ্ণবী আবার বলিল, এই বস্তুকে তুমি—। তাই শুধাচ্ছিলাম, তুমি পশু না পাষাণ?

জীবন্ত সমাধি দিতে আসিয়াছিলে, এ কথা তাহার জিভে বাধিয়া গেল।

এবার লোকটি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তুমি যা বলছ তা ঠিক। আমি দুই-ই। আমি পশু—পাষাণ দুই-ই বটে।

বৈষ্ণবী শিশুটিকে তাহার দিকে বাড়াইয়া ধরিয়া বলিল—নাও ধর।

লোকটি দু'পা পিছাইয়া গেল। কথা বলিল না, ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল—না।

* * * *

এই লোকটি মহেশ মণ্ডল।

নদীর ঘাটে বালুচরের উপর বষ্টুমীর পাশে বসিয়া অকপটে সমস্ত বলিয়া গেল।

এখানে হইতে 'দু' ক্রোশ দূরে তাহার বাড়ী। গ্রামের মণ্ডল সে। সে বলিল—লোকে আমার ভাগ্যের হিংসে করত। স্ত্রী—দুটি সন্তান নিয়ে সংসার। পনের বিঘে জমির জোত, লাখরাজ পুকুর, বাগান, গাঁয়ের মণ্ডল;—তুমি বিশ্বাস কর, আমি আমার জ্ঞানে অন্যায় করি নাই, কারও কখনও 'হ'রে-হর্মে' নিই নাই—এক ছুঁচ মাটি না, একটি কানাকড়ি না। কখনও

মিথ্যে সাক্ষী দিই নাই, কোন অখাদ্য খাই নাই। লোকে আমাকে মান্য করে। কাজেই পাঁচ-জনের চোখ আমার ওপর পড়বে যে!

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল সে। তার পর বলিল—লোকের দৃষ্টির দোষ আমি দিই না। লোকের দৃষ্টিতে কিছু হয় না সংসারে—সে আমি জানি। হয় এক নিজের কর্মফলে, আর হয় ভাগ্যদোষে। কর্মফলের আমার দোষ ছিল না, দোষ আমার ভাগ্যের। আর আমার পূর্ব-জন্মের শত্রুর দেওয়া শাস্তির ফল। সে আমার শত্রু ছিল—পূর্বজন্মে ঘোর শত্রু ছিল। সে-জন্মে অনেক দুঃখ আমি তাকে দিয়েছিলাম।

—কে? কার কথা বলছ?

—আমার পরিবার! সর্বনাশী দু'টি শিশু-সন্তান দিয়ে আমাকে হাতে-পায়ে বেঁধে হঠাৎ চলে গেল। এত বড় মানুষটা ছেলেমানুষের মত কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

কিছুক্ষণ পর চোখ মুছিয়া আবার বলিল—লোকে আমাকে আবার সংসার করতে বললে। আমি বললাম—না। বলেছিলাম বষ্টুমী,—তোমরা বরং আমার ছেলে দু'টির ভার নাও, আমি চলে যাই যে দিকে দুই চোখ যায়। সেদিন আমি মিছে কথা বলি নাই, সেদিন আমি তা যেতে পারতাম।

হুঁঃ—বলিয়া নিজের কথাকেই ব্যঙ্গ করিয়া সে খানিকটা হাসিল।

—জান—। সে আবার আরম্ভ করিল। জান, সর্বনাশী গেল—আমি মাছ খাওয়া ছাড়লাম, নিরামিষ্ খেতে আরম্ভ করলাম। থানকাপড় পরতে ধরলাম। বয়স আর আমার কত হবে? তিরিশ হ'ল এই বছর। দু' বছর আগের কথা। লোকে বললে, মহেশ সত্যি সত্যিই কোন দিন ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যাবে। আমারও মনে তাই ছিল, ভেবেছিলাম, ছেলে দু'টো একটু ডাঁটো হলেই দুটোরই বিয়ে দোব একসঙ্গে, এক-ঘরে দুই বোন দেখে বিয়ে দোব; তার পর বেরিয়ে পড়ব একদিন ভগবানের সন্ধানে। তখন কি জানি ছাই আমি এক-জনা নই, আমি দু'জনা। একজন হিসেবী আমি—আর একজন বেহিসেবী আমি। ও দু'জনে আপোস হয় না। বুঝেছ! আপোস করতে গেলেই ওই বেহিসেবী জন মরে। হিসেব করে যুক্তি ঠিক করছিলাম। দু'জনের এক-ঘরে দুই বোনকে বিয়ে দিলে ঘর আমার একখানা ভেঙে দু'খানা হবে না, আর দু'জনের একজন শ্বশুর হলে তার হাতে সম্পত্তির ভার দিয়ে গেলে আমারই মত দু'জনের সম্পত্তি রক্ষে করবে। বেহিসেবী জন ঠকল। তার পর আর কি, যত দিন যায়—তত ঘাটা পড়তে লাগল আমার বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার বাসনায়। সঙ্গে সঙ্গে সংসারের উপর হ'ল ভীষণ আক্রোশ। অন্ন তেতো মনে হ'তে লাগল, ছেলে দুটো চোখের বিষ হয়ে উঠল। বষ্টুমী, মনের মধ্যে—বুকের মধ্যে হু-হু করতে লাগল; কি যে হু-হু করতে লাগল—তা প্রথমে বুঝতে পারি নাই। বুঝলাম ক্রমে। বুঝলাম—একদিন এই নদীর চরে একজনকে দেখে। নীচু জাতের মেয়ে, বাড়ী এখান থেকে ক্রোশ-চারেক দূরে, এসেছে কুটুম-বাড়ী। আশ্চর্য মেয়ে সে। জলে চোখ দুটো যেন দুটো জল-ভরা দীঘির মত টলমল করছে। আমি একটা গাছের তলায় বসেছিলাম আর ভাবছিলাম, ভাবছিলাম—এই কথাই, কি হল আমার? সে এসে দাঁড়াল। তার দিকে চেয়ে আমার কি হয়ে গেল। সব যেন এক নিমেষে পাল্‌টে গেল। দুপুরের রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছিল—মনে হল, সে রোদে যেন সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে গেল।

সে-ও এসে বসল গাছতলায়। শুধালে—"চরণপুর কতটা পথ?"

আমি জবাব দিলাম কলের পুতুলের মত—শুধু চেয়ে রইলাম তার দিকে। দেখলাম—

দেখলাম—দেখলাম। দেখলাম আর বুঝলাম ;—পাপ বল পাপ, বুঝলাম, আমার সর্ব দেহ-মন ওরই জন্তে আকুল হয়ে উঠেছে। মাটি যেমন মেঘের জলের জন্তে তপ্ত হয়, ফেটে চৌচির হয় —আমিও হয়েছি তাই।

সে অবাক হয়ে আমার দেখা—দেখছিল। বষ্টুমী, এক ধারার মানুষ সংসারে আছে— যারা ভাল বোঝে না—মন্দও বোঝে না, শুধু অবাক হয়। সে সেই ধারার মানুষ।

লোকটি কপালে করাঘাত করিয়া বলিয়াছিল—সেদিন যদি আমার মাথায় বজ্রাঘাত হ'ত!

বষ্টুমী অবাক হইয়া গেল, লোকটির চোখের জল বাঁধভাঙা নদীর বানের মত অকস্মাৎ তাহার মুখ বুক ভাসাইয়া দিল। কিছুক্ষণ পর সে আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল—গাছতলায় ব'সে তাকে কত কথা শুধালাম। সে রাগ করলে না, সন্দেহ করলে না, হাসলে না, সামনের খাঁ-খাঁ করা মাঠের দিকে চেয়ে রইল—আর আমার কথার জবাব দিয়ে গেল। একবার শুধালাম—সামনের দিকে এমন ক'রে চেয়ে কি দেখছ বল তো? সে বললে—ও—ই—গাঁ, ও—ই মাঠ চলে গিয়েছে, ঝির ঝির ক'রে কেমন সব কি কাঁপছে!—গরু চরছে—হু—ই হোথা! গাছের মাথা নড়ছে হিল-হিল ক'রে। এই সব দেখছি। এই মানুষ সে। পরিচয় নিলাম। নিরাশ্রয় মেয়ে। বিধবা হওয়ার পর—ক'জন দুষ্টু লোকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তারাই আবার পুলিশের ভয়ে ছেড়ে দিয়ে গিয়েছে। এখন কোথাও আশ্রয় নাই। তাই আশ্রয়ের জন্তে চলেছে—কুটুম্ববাড়ী—চরণপুর।

কিছুক্ষণ পর সে উঠে চলে গেল। বললে—তারা হয় তো ঠাঁই দেবে না। তবু দেখি।

আমি কিন্তু উঠতে পারলাম না। সে চলে গেল। তবুও আমি তাকেই দেখলাম চারি-দিকে। এমন রূপ, এমন কালো জলের মত কালো রূপ আমি আর কখনও দেখি নি। বুকের মধ্যে কালবৈশাখীর গুমোট জমে উঠল। আমি বুঝলাম আমার মন কি চায়। তবু তোমাকে বলছি—আমি মনকে বুঝাবার চেষ্টা করলাম। নিজেকে শুধু নিন্দে করলাম—তিরস্কার করলাম—কত বুঝালাম। কিন্তু কোন ফল হ'ল না। একবার ভাবলাম—বিয়ে করি। ওই যে হিসেবী জন—সে বললে—ছি! এত কথা বলে শেষে লোক হাসাবে? লোকে বলবে কি? লজ্জায় মাথাটা যে কাটা যাবে! আজ তোমাকে লোকে যে প্রশংসাটা করে—তাই আর করবে? তা ছাড়া বিয়ে করলে—যাকে দেখে এমন পাগল হয়েছ—তাকে তো পাবে না।

হঠাৎ ঝড় উঠল মনে। আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। গাছতলা থেকে উঠে—সেই রৌদ্রে ছুটতে আরম্ভ করলাম। তখনও তাকে দেখতে পাচ্ছিলাম। তাকে ডাকলাম—শুনছ—দাঁড়াও! ও—। নাম জিজ্ঞাসা করিনি। ভুলে গিয়েছিলাম। তবু সে দাঁড়াল। ফিরে তাকাল। আমি তখন পাগল—।

সে থামিল—তারপর একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—

'মানুষ বড় অসহায় বষ্টুমী। জন্তু-জানোয়ার কীট-পতঙ্গ—ওদের বাসনা আছে লজ্জা নাই, সৃষ্টিকর্তার বেঁধে-দেওয়া নিয়ম আছে, কিন্তু নিজেদের তৈরী করা হাজার মাপার বেড়াজাল নাই। সেইদিন সেই মাঠের উপর আমার সব ভাসিয়ে দিয়ে তাকে নিয়ে এলাম।'

বষ্টুমীর আর শুনিতে রুচি হয় নাই, সে অধীর হইয়া উঠিল। একটা পাষণ্ড—গলায় কান্নার সুরের মত সুর ফুটাইয়া নিজের পাপের সাফাই গাহিয়া চলিয়াছে। সে চীৎকার করিয়া বলিয়াছিল—থাক। ও পাপ কথা শুনে আমার কাজ নাই। তুমি যাও—তুমি যাও আমার সামনে থেকে।

লোকটি উঠিয়া মাথা হেঁট করিয়া নদী পার হইবার জন্ম জলে নামিল।

বষ্টুমী বলিল—কাল এই ছেলে বুকে ক'রে গাঁয়ে গাঁয়ে গেরস্তের দোরে-দোরে তোমার কীর্তি দেখিয়ে—কাহিনী বলে বেড়াব আমি।

মুহূর্তে লোকটি ওই জলের মধ্যেই ঘুরিয়া দাঁড়াইল। চোখ দুইটা তাহার ধ্বক-ধ্বক করিয়া জ্বলিতেছে, দাঁতে দাঁতে টিপিয়া গিয়া চোয়ালের হাড় দুইটা শক্ত এবং উঁচু হইয়া উঠিয়া পড়িয়াছে। সে মূর্তি দেখিয়া যে কোন মানুষের ভয় পাইবার কথা। অপরিচিত দেশ—রাত্রি-কাল—একা নারী—বষ্টুমী ভয় পাইল।

দুই পা আগাইয়া আসিয়া লোকটি থমকিয়া দাঁড়াইল। সে চেহারাটা ধীরে ধীরে মিলাইয়া গেল। মাথা হেঁট করিয়া সে করুণ কণ্ঠে বলিল—বলো। আমাকে মরতে হবে। আত্মহত্যা করব।

—না। তার চেয়ে তোমার ছেলে তুমি নিয়ে যাও।

—দাও।

ছেলেটিকে লইয়া সে আবার শ্মশানের দিকে অগ্রসর হইল।

বষ্টুমী চীৎকার করিল—না।

—আমার উপায় নাই—লোকটি হাসিল। সে হাসি কান্নার চেয়েও মর্মান্তিক। ব্রজ এবার মিষ্ট কথা না কহিয়া পারিল না—বলিল—ওর মাকে গিয়ে বল—ওকে কোলে ক'রে চলে যাক দেশ ছেড়ে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মহেশ বলিল—ওর মা চলে গিয়েছে। তা নইলে আর এ পাপ করতে হবে কেন আমাকে? সে উপরের দিকে চাহিয়া গভীর বেদনায় মাথা দোলাইয়া যেন মৃত হতভাগিনীর উদ্দেশেই কিছু বলিতে চাহিল।

—চলে গিয়েছে?

—হ্যাঁ। তার কাছেই পাঠাচ্ছিলাম। মাঝখান থেকে তুমি পড়েই সব গোলমাল করে দিলে। কি করব ওকে নিয়ে আমি বলতে পার? নীচ জাতের মেয়ের গর্ভে জন্মেছে—ঘরে নিয়ে গেলে আমার মান যাবে, জাত যাবে। তা ছাড়া কে ওকে মানুষ করবে? ওর মায়ের জাতের লোকেরা—তারাও ওকে নেবে না। ও তো তাদের জাতেরও নয়।

—তুমি পশু—তুমি পাষাণ।

—হাজার বার বল। আমি নিজেও গলায় দড়ি দোব। কিন্তু একে রেখে তা তো পারব না! ওপারের গাছের ডালে দড়ি আমার বাঁধা আছে। তোমাকে দেখে ভয়ে পালিয়ে গিয়ে—তাই করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু ফিরে এলাম ওরই মায়ায়। দেখতে এসেছিলাম সাহস করে—কে ওকে নিলে!

—তুমি ওকে আমাকে দাও।

—নেবে?

—হ্যাঁ। চল তোমার গাছের ডালে বাঁধা দড়ি আমি দেখব।

ওপারের সেই স্থির কালো পুঞ্জটার দিকে সে আগাইয়া গেল। বৈষ্ণবী তাহাকে অনুসরণ করিল।

প্রাচীন কালের ঘন বাঁশবনে ঘেরা আমের বাগান একটা।

পূর্ব দিক তখন পরিষ্কার হইয়াছে। আকাশে চাঁদ নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছে। লোকটি একটি গাছের তলায় দাঁড়াইয়া বলিল—ওই দেখ!

একটি গাছের ডাল হইতে দড়ির ফাঁস সত্যই ঝুলিতেছিল।

লোকটি বলিল—সংসারে যে কলঙ্ক নিতে ভয় পায়—তাকে ওই গলায় দড়িই নিতে হয় বষ্টুমী। হয় কলঙ্কের ভয়ে কামনার গলায় দড়ি দিতে হয়—নয় কামনার তাড়নায় ছুটে শেষ পর্যন্ত কলঙ্কের ভয়ে গলায় দড়ি দিতে হয়।

বষ্টুমী বলিল—তোমার কলঙ্ক আমি নিলাম—তুমি নির্ভয়ে বাড়ী চলে যাও।

—তুমি যেন আমার সঙ্গে দেখা না করে যেয়ো না। ভগবানের দিব্যি রইল। গোবিন্দের দিব্যি। আমি হাত জোড় করে মিনতি ক'রে বলছি। দোহাই তোমার।

—আচ্ছা।

—সকাল হলেই এই গাঁয়ে যেয়ো। বাগ্দীদের গাঁ। ঘরে ঘরে গরু ছাগল—দুধ কিনতে পাবে—এই—এই—

—না। তোমার টাকা তুমি রাখ। তবে অপেক্ষা আমি করব। এই বাগানেই থাকব।

ব্রজদাসী বলিল—হায়—সেদিন যদি এ বাঁধন আমি যেচে না পরতাম!

বাবাজী বলিলেন—কেন এত ভেঙে পড়ছ ব্রজ? লোকে শুনলে হাসবে!

—হাসবে? তা হয়তো হাসবে। হাসুক তারা। কিন্তু আপনিও কি হাসছেন প্রভু?

—না ব্রজ, আমার অন্তর তোমার মতই হায়-হায় করছে! কিন্তু দুলাল আজ মদ খেয়েছে। তাকে সাবধান কর—বুঝিয়ে বল—

—প্রভু, তাকে আপনারা জানেন না। তাকে চেনেন না। আমি—। ব্রজদাসী হাসিল—আক্ষেপ যখন রাখিবার ঠাঁই থাকে না—তখনই মানুষ আক্ষেপে ক্ষোভপ্রকাশের বদলে হাসে; হাসিয়া ব্রজদাসী বলিল—আমি ওকে জানি। চেনার যেটুকু বাকী ছিল—সেটুকু আজ পূর্ণ হ'ল। আজই আমি ওকে খাইয়ে দাইয়ে—গিয়েছিলাম ওর জন্যে কনে খুঁজতে। আমার কপাল! ও গাঁয়ের ভোলাদাসী, কলকাতায় পাপবৃত্তি করে পয়সা করে ঘরে এসেছে—পাপের ফল একটা মেয়ে নিয়ে। দুলালের জন্ম-কলঙ্ক মাথায় তুলে নিয়েছি, পাঁচজনে পাঁচকথা বলে আড়ালে, সে আমার অঙ্গের চন্দন করেছি। কিন্তু আজ ভোলাদাসী—তার পাপের সঙ্গে সমান ওজনের পাপের কালী অঙ্গে মাখিয়ে দিয়ে—গা ঘেঁষে ব'সে বললে—বেশ হবে ভাই, তোমার সঙ্গে বসে গোপন কথা বলব আর হাসব! তবুও আমি দমি নি প্রভু। ওই ওর জন্যে। কথা কয়ে বাড়ী ফেরার পথে বাগ্দীবুড়ী বললে—দুলাল পালিয়ে এসেছে। ছুটতে ছুটতে এখানে এলাম—চৌমাথায়—।

আবার সে আক্ষেপে হাসিল।—অথচ প্রভু—সেই রাত্রি পোয়াল—ওকে কোলে নিয়ে সেই বাগানে ব'সে ব'সে শুধু ভাবলাম—। কি ভাবলাম জানেন? বৃন্দাবনে যেদিন বের হই, আমার ঘর যেদিন ছাড়ি—পথে পা দিই—সেদিন মনে মনে বলেছিলাম—বৃন্দাবনে যাব—তবে তোমার ওই বংশীধারী ছলনাময় প্রেমিকের রূপ তো দেখব না! ও সাধ আমার মিটেছে। তাই—, তাই কি গোবিন্দ—

—সত্য—।

বৃন্দাবনের পথে চলিতে চলিতে আপন মনেই কত দিন বলিয়াছে—বৃন্দাবনে যাইব কিন্তু তোমার বংশীধারী প্রেমিক রূপ আমি দেখিব না। ও রূপ দেখার সাধ আমার মিটিয়াছে।

ঝর-ঝর করিয়া চোখে তাহার জল নামিয়া আসিত, পশ্চিমে বাতাসের স্পর্শে বিগলিত বর্ষার মেঘের মত। তাহার অতীত দিনগুলির স্মৃতিই ছিল যেন পশ্চিমের বাতাস। মনে পড়িত, কত ভাল সে বাসিয়াছিল সেই মানুষটিকে। নিজেই সে আশ্চর্য হইয়া যাইত, ভাবিত, এত ভালবাসা কি করিয়া বাসিল সে! তাহার অঙ্গস্পর্শে সে থরথর কাঁপিত, দেহের অভ্যন্তরে—প্রতিটি লোমকূপের মুখ দিয়া বাহির হইত কম্পিত অগ্নিশিখার মত শিহরণ, মরণের স্বাদের মত অপরূপ বিবশতায় সে ঢলিয়া পড়িত; মনে হইত, ইহার পর আর বুঝি পৃথিবী নাই, দিন-রাত্রি নাই, এই মানুষটি ছাড়া আর দ্বিতীয় জন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে কেহ কোথাও নাই! সেই মানুষ এক দিন তাহাকে একখানা ছেঁড়া কাপড়ের টুকরার মত পরিত্যাগ করিল। অভিমানে, দুঃখে, আক্ষেপে অধীর হইয়া হইয়া সে পথে পথে বাহির হইল। সেদিন সে মুক্তির মূল্য বুঝিতে পারে নাই।

বুঝিতে পারে নাই তাহার শ্যাম তাহার মানুষের স্বরূপ দেখাইয়া—মুক্তি দিয়াছিলেন। সে অভিমান করিয়াছিল, দুঃখ পাইয়াছিল—তাই তিনি ছলনা করিয়া ওই শিশুকে কোলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। অলক্ষ্যে হাসিয়াছিলেন। ব্রজর চোখ তো প্রভুর দিকে ছিল না, তাই সে দেখিতে পাইল না। সকালের আলোয় ছেলেটির মুখের দিকে চাহিয়া সে ভাবিল—তোমাকে প্রণাম—তোমাকে প্রণাম। সমবয়সীদের কোলে সন্তান দেখিয়া কতদিন এ সাধ তাহার হইত; সে সাধ তুমি মিটাইয়া দিলে!

তারপর সে সেই গাছতলাতেই সূতিকাগৃহ রচনা করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। নিজের কাপড় ছিল মাত্র তিনখানা। একখানা পরনে, একখানা গাছের ডালে শুকাইতে দিয়াছিল, একখানা ছিল পোঁটলায়—সেইখানা ছিঁড়িয়া টুকরা করিয়া ছেলেটির বিছানা তৈয়ারী করিল। আটাশ-তিরিশ বৎসরের জীবনে সন্তানের জননী হইবার ভাগ্য তাহার হয় নাই। শিশুকে কোলে লইয়া বিব্রত হইল, কাঁদিলে তাহার দুগ্ধহীন স্তনবৃন্ত তাহার মুখে দিতে গিয়া অস্বস্তিতে যন্ত্রণায় অধীর অস্থির হইয়া উঠিল, তবু সে সেদিন বুঝিতে পারে নাই। মনে পড়িতেছে—ছেলেটি বেশী কাঁদিলে সে সন্তানবতী সখী কাদু গোল্যানীর দৃষ্টান্ত মনে করিয়া তাহাকে বুকে লইয়া উঠিয়া বাগানময় নাচিয়া নাচিয়া বেড়াইয়াছিল। তাহার গান-সাধা অপরূপ কণ্ঠস্বর গানের বদলে ছড়ায় গুঞ্জন উঠিয়াছিল!

"ও রে আমার ধন ছেলে—পথে পড়ে পড়ে কাঁদছিলে—মা বলে বলে ডাকছিলে—গায়ে ধুলো মাখছিলে।"

ছড়াটা যেন এই শিশুটিকে গাহিয়া শুনাইতে তাহারই জন্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল—ইহার পদকর্তা!

"সে যদি তোমার মা হ'ত,
ধুলো ঝেড়ে তোমায় কোলে নিত!"

তাহার পরিবর্তে ধূলায় ফেলিয়া দিয়া সে পলাইয়াছে; সে তো তোমার মা নয়! আজ যে তোমাকে ধুলা ঝাড়িয়া কোলে লইয়াছে সে তোমার মা! আমি তোমার মা! আমার সোনা! আমার মানিক! আমার গোপাল!

বাগানের প্রান্তেই বাগ্দীদের গ্রাম। লোকটি তাহাকে বলিয়া গিয়াছিল—বাগ্দীদের গাঁয়ে—ঘরে-ঘরে গরু ছাগল। সে শিশুকে কোলে লইয়াই গাঁয়ের দিকে চলিল।

একটি মেয়ে আসিতেছিল। সে থমকিয়া দাঁড়াইল, বিস্ময় ফুটিয়া উঠিল দৃষ্টিতে।

—কে গো বাছা ? এমন চেহারা—এই বেশ ?

—আমি বাছা বষ্টুমী !

—বষ্টুমী ? তা—তোমার কাপড়ে-চোপড়ে রক্তের ছোপ !—এ ছাওয়াল—তোমার কোলে ?

ব্রজ থতমত খাইয়া বলিয়াছিল—পথেই এল মা ও কোলে।

সে গালে হাত দিয়া বলিল—ও মা-গো ! পথেই পেসব হয়েছ ?

—হ্যাঁ।

পিছনে তখন আরও কয়জন আসিয়া জমিয়াছিল।

একজন হঠাৎ বলিয়া উঠিল—অ !

তাহার দৃষ্টি, কণ্ঠস্বর বিচিত্র, তাহাতে যত কৌতুক—তত শ্লেষ ! ব্রজর গায়ে লাগিয়াছিল—ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিয়াছিল—কেন ? এমন বললে কেন ?

এক বুড়ী দন্তহীন মুখে হাসিয়া বলিয়াছিল—তা' বলে মা, তা' বলে। ওতে 'আগ' করতে নাই ! ভদ্দনোকের মেয়ে, এমন রূপ তোমার, ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়েছ, পাপের কাঁটা পেটে নিয়ে—পথেই সে কাঁটা ফুল হয়ে কোলে খসেছে ; তাই বলছে আর কি ! তা বলবে মা, দশ জনে দশ রকম বলবে।

ব্রজ একেবারে থ' হইয়া গিয়াছিল। কথাটা সে ভাবে নাই। অথচ এত সহজ, এত স্বাভাবিক যে ইহার প্রতিবাদ করিবার কিছু নাই। অন্য কেহ যদি আজ এমনি ভাবে এই শিশুটিকে বুকে লইয়া তাহাকে এই কথাগুলি বলিত—তবে সে হয়তো এমন কৌতুক ও শ্লেষ মিশাইয়া 'অ বলিয়া উঠিত না, হয়তো অন্য রকম কিছু বলিত—সান্ত্বনা দিয়া সহানুভূতির কথাই বলিত—কিন্তু অনুমানে কোন পার্থক্য হইত না, ঠিক এই অনুমানই করিত।

শিশুকে কোলে তুলিবার প্রথম ক্ষণ হইতে এ পর্যন্ত তাহার এ কথাটা বারেকের জন্যও মনে হয় নাই। নিষ্পাপ অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত করুণায় তুলিয়া লইয়াছিল—এতক্ষণ পর্যন্ত নিজের মনে মনে শুধু পাপের সাজা দিয়াছে ওই লোকটিকে। একবারও ভাবে নাই শিশুর অঙ্গেও পাপের ছাপ লাগিয়া আছে, উহাকে কোলে তুলিলে—সে ছাপ তাহার অঙ্গেও লাগিবে। থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছিল সে।

একজন হাঁ-হাঁ করিয়া বলিয়া উঠিল—আহা-মা। পড়ে যাবে—পড়ে যাবে।

আর একজন বলিল—লজ্জা কি মা ? ভগবান দিয়েছেন—পেটে এসেছে—কোলে ধরেছ। কি করবে বল ? তোমার চেয়ে—যে তোমার সর্বনাশ করে পথে এমন ক'রে দাঁড় করিয়ে দিলে—লজ্জা তারই বেশী, পাপ তারই।

একজন বলিল—এই হয় মা ! এ পথের এইই হল নিয়ম। ভুলিয়ে নিয়ে ঘর থেকে পথে বার করবে—তার পর যখন দেখবে ফুল এইবার ফল হল—তখন পেজাপতির মত একদিন ড্যানা মেলে উড়বে। আহা-মা ! তা' যে তুমি অকালে ওকে নষ্ট করনি—এই তোমার পাপের মধ্যে পুণ্যি। বেশ করেছ ! ভাল করেছ। ওই তোমার এখন সম্বল হল !

একজন বলিল—আহা-হা মা, কাঁপছ তুমি বস, বস।

যে কথা বলিতেছিল—সে তখনও বলিতেছিল—ওকে যত্ন করে মানুষ কর, ওই দেখবে তোমার অন্ধের নড়ি হবে একদিন।

বুড়ী হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল অকস্মাৎ—বলিল—দেখ না মা, আমার বরাত ! একটা পা আমার ভেঙে গেল এই বয়সে, আজ হাঁটবার ক্ষমতা নাই। পোড়া অদৃষ্টে এ জন্মে

কাউকে কোলে পাই নাই, আমার আজ দুঃখ দেখ, হাত ধরে আমাকে নিয়ে যায়—এমন কেউ নাই। 'ওজগার' করে খাওয়ায় এমন কেউ নাই। মরব—ভাবছি—সেখান গিয়েও 'পরিত্তান' পাব না, কে দেবে মুখে আগুনের ছেঁকটি—কে দেবে এক গণ্ডুষ জল ?

বোষ্টুমীর চোখ দু'টি যেন আপনা হইতে বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল। চোখের কোণ হইতে জলের দু'টি ধারা নামিয়া গড়াইতেছিল গাল বাহিয়া। ধীরে ধীরে গড়াইতেছিল, ব্রজ নিজে স্পষ্ট অনুভব করিয়াছিল উষ্ণ জলবিন্দুর গতি। কিন্তু সে তা মুছিল না।

একজন বলিল—কেঁদো না মা! নাও, দুধ নাও। পয়সা তোমার লাগবে না। নোব না আমরা।

ব্রজ অসঙ্কোচে তাহার ঘটিটি পাতিয়া তাহাদের দান দুধটুকু গ্রহণ করিয়াছিল। একটি মেয়ে বলিয়াছিল—দেখে লাগছে বাছা এই তোমার প্রথম, তা বলে দি, একেবারে খাঁটি দুধ—জল মিশিয়ে দিও। নইলে প্যাট খারাপ হবে।

ব্রজ বাগ্দীপাড়া হইতে ফিরিল অপরূপ আনন্দে পরিপূর্ণ মন লইয়া। মেয়েগুলি যে কলঙ্কের নিকষ কালো কালি সহস্র ধারায় তাহার মাথায় ঢালিয়া দিল—সে কালি যেন জন্মাষ্টমীর উৎসবের উজ্জ্বল প্রসন্ন হলুদ রঙের মাধুরী লইয়া তাহার সর্বাঙ্গে ঝলমল করিতেছে। যে কলঙ্কের কথা শুনিয়া সে প্রথমটা শিহরিয়া উঠিয়াছিল, সে কলঙ্ককে তার কলঙ্ক বলিয়া আর মনে হইল না। মনে হইল, এইবার সে সত্য সত্যই এই শিশুর মাতৃত্বের অধিকার লাভ করিল, এটুকু মাথায় না লইলে তাহার কোলে এ ছেলে আপন মায়ের কোলের তৃপ্তি কখনই অনুভব করিত না। ক্রমে ভারী মিষ্টি লাগিয়াছিল এ কলঙ্ক; যত ভাবিল—তত বেশী মিষ্ট মনে হইল।

নির্জন আমবাগানের মধ্যে ছেলেটিকে দুধ খাওয়াইয়া দুই হাতের উপর শোওয়াইয়া নাচাইতে আরম্ভ করিল মনের পুলকের আবেগে। কণ্ঠে গুন-গুন করিয়া উঠিল মহাজন কণ্ঠ মহাশয়ের পদ—

"নেচে নেচে আয় রে নীলমণি
একবার তেমনি-তেমনি-তেমনি ক'রে
চরণে-চরণ দিয়ে—
নেচে-নেচে আয় রে নীলমণি—
যতনে খাওয়াই তোরে ক্ষীর-সর-নবনী।"

পিছন হইতে কে বলিল—আহা, মা, কি সুন্দর গলা তোমার!

চমকিয়া পিছন ফিরিয়া ব্রজ দেখিল—বাগ্দীপাড়ারই সেই মেয়েটি, যাহার সহিত প্রথম দেখা হইয়াছিল; সে যে কখন আসিয়াছে ব্রজ তাহা জানিতে পারে নাই। ফাল্গুনের শেষে বাগানটা ঝরাপাতায় ভরিয়া আছে। গতকাল রাত্রে ঘুমের মধ্যেও সে ঝরাপাতার উপর মহেশ মণ্ডলের পায়ের শব্দ শুনিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল—আজ জাগিয়া বসিয়া থাকিতেও মেয়েটির আসার কথা ঘুণাক্ষরে বুঝিতে পারিল না।

মেয়েটি কাছে বসিয়া বলিল—একটুকুন জোরে গাও মা। আহা-হা!

ব্রজ বলিল—খুব ভাল ক'রে গান শোনাব আজ বিকেলে। খঞ্জনী বাজিয়ে।

—খঞ্জনী বাজিয়ে? অ, হ্যাঁ—তুমি যে বষ্টুমী!

—হ্যাঁ আমি যে—আমি বষ্টুমী! ব্রজ হাসিয়াছিল।

মেয়েটি আরও কাছে আসিয়া বসিয়া বলিয়াছিল—আমি মা প্রথম ভেবেছিনু তুমি কোন বামুন-কায়েতের ঘরের মেয়ে হবে! তা তুমি আমাদের পাড়ায় চল না কেন। আমাদের পাড়াতেই একপাশে খানিক ঠাঁই-ঠিকানা ক'রে দোব, মরদরা আসুক—দণ্ড দু'য়ের মধ্যে বাঁশে-খড়ে চালা তুলে দেবে, খল্‌পা দিয়ে ঘিরে দেবে, আগড় বেঁধে দেবে। তুমি থাকবা আপনার, রাঁধবা বাড়বা—খাবা। খঞ্জনী বাজিয়ে গান ক'রে ভিগ মেগে আনবা, ছেলে থাকবে শুয়ে—আমাদের উঠানে; আমরা দেখব-শুনব—সে বেশ হবে। আমি সেই বলতেই এলাম।

ব্রজ বলিল—যাব। কিন্তু তার আগে—একে একটু দুধ খাইয়ে দেবে ভাই? আমি পারছি না ঠিক। আর একবার যদি ও'কে নিয়ে বস—তবে আমি চান করে আসি।

—চান? সে কি গো? কাঁচা সন্তানের মা তুমি—

—ও! ব্রজ হাসিল। তাহার ভুল হইয়া গেছে। কাঁচা সন্তানের মা ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে মাথায় জল চাপিয়া বিকার হইবে। হাসিয়া ব্রজ বলিল—আমি কাপড় কেচে আসি। চান করব না।

স্নান সে করিল। নদীর জল টলমল করিতেছিল। চৈত্র মাস, নদীর জলে স্রোত তেমন নাই, তার উপর সেটা একটা দহ।

গতকাল সন্ধ্যায় সেই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যে মাঠে-প্রান্তরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া সর্বাঙ্গে ধূলা লাগিয়াছিল, কাপড়খানা হইয়া গিয়াছিল কাদা-মাখা কাপড়ের মত, মাথার চুল এলাইয়া পড়িয়াছিল—তাহাতেও ধূলা লাগিয়া পিঙ্গল ধূসর চেহারা হইয়াছিল। তাহার উপর অবশিষ্ট রাত্রিটা শ্মশানে কাটাইয়াছে, শেষরাত্রে এই শিশুটিকে লইয়া এক উদ্বেগ—তাহার ধূলি-ধূসরিত ওই চেহারার উপরেও একটা কালো ছায়ার মত ছাপ রাখিয়া গিয়াছিল। নদীর জলে সে যেন ঝাঁপাইয়া পড়িল। স্নান করিয়া ধূলি-মালিন্য-মুক্ত হইয়া উঠিয়া ফিরিতে গিয়া মনে পড়িল শিশুর ক্লেদাক্ত কাপড়ের ফালিগুলির কথা। আপন মনেই হাসিল সে, তার পর সেগুলি কাচিয়া আবার স্নান করিয়া ফিরিল যখন—তখন বাগ্দী মেয়েটির ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়াছে। সে বলিল—ছি মা, এত দেরি করে? আরও হয়তো কিছু সে বলিত কিন্তু ব্রজর সদ্যস্নাত মালিন্য-মুক্ত মূর্তির দিকে চাহিয়া সে অবাক হইয়া গেল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহাকে দেখিয়া বলিল—কি রূপ তোমার মা! কিন্তু ছেলে এমন কেন হল? এ যে কালো—।

ব্রজ হাসিয়া বলিল—ও আমার কালো মাণিক!

ধীরে ধীরে তাহার মনে কি যেন ফুটিয়া উঠিতেছে। রাত্রির শেষপ্রহরে যন্ত্রণা শুরু হইয়াছিল, অসহনীয় উদ্বেগ; আখড়ায় ব্রজ ফুলগাছের যত্ন করিত, বড় শখ ছিল তার, কুঁড়ি ধরিলে দিনে দশবার দেখিত কতটুকু বাড়িল, কতদিনে কখন ফুটিবে; সে দেখিয়াছে—ফুটিবার সকালটির আগের প্রহরে—ভোরবেলা কুঁড়ির আবরণ ফাটানোর ছবি, সে স্পষ্ট অনুভব করিয়াছে—গাছের সে এক মর্মান্তিক যন্ত্রণা—। তারপর, ফুলটি ফুটিলেই গাছটিকে ওই ফুলটির রূপরসের আনন্দে বিভোর হইয়া হেলিতে দুলিতে দেখিয়াছে। সখীদের সূতিকা-গৃহ সে কখনও দেখে নাই। মনে পড়িল ফুল ফোটার কথা। তাহার মনে যেন ফুল ফুটিয়াছে।

ব্রজ বলিল—চল—তোমাদের ওখানেই যাচ্ছি। কালো মাণিক কোলে নিয়ে—তোমাদের উঠানে গিয়ে বসব।

*   *   *   *

ভাল করিয়া সে আজ সাজিল। তিলক কাটিতে বসিয়া সাজিতে সাধ হইল।

পথে বাহির হইয়া অবধি সাজে নাই সে। যত্ন করিয়া তিলক কাটিল, রসকলি আঁকিল। স্নান করিয়া চুলের ধুলা ধুইয়া গেছে, ঘন কালো রঙ ফিরিয়াছে, তাহার উপর রুখু স্নান করায় কোঁকড়ানো চুল ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়াছে; সামনে কপালের দিকে বাঁকাইয়া চূড়া করিয়া যত্ন করিয়া চুল বাঁধিল। পরিষ্কার শুদ্ধবস্ত্র—কাঁটের কাপড়খানি বাহির করিয়া পড়িল। তারপর শিশুটিকে কোলে করিয়া বাগ্দীদের উঠানে আসিয়া খঞ্জনীতে ঠুং করিয়া একটি মৃদু ধ্বনি তুলিয়া বলিল—হ-রি বোল! গোপালের জয় হোক মা!

মেয়েরা ছুটিয়া বাহিরে আসিল। তাহারা অবাক হইয়া গেল।

ব্রজ বলিল—তোমাদের গোপাল দুধে-ভাতে থাক, জন্ম সুখে যাবে গোবিন্দ-গোপালের প্রসাদে। আমার গোপালকে নিয়ে তোমাদের আশ্রয়ে এলাম।

ব্রজ দাসী জাঁকাইয়া বসিল। মেয়েরাও তাহাকে ঘিরিয়া বসিল। চমৎকার দেখাইতেছিল ব্রজদাসীকে। তাহার প্রসন্ন রূপশ্রীর দীপ্তির উপর ক্লান্তির একটি করুণ ছায়া পড়িয়াছে; দিগন্তের আসন্ন অন্ধকারে সে তাহাদের আঙিনায় যেন সন্ধ্যাপ্রদীপের শিখার অনুজ্জ্বল আলোক-মণ্ডলের সৃষ্টি করিয়া বসিল।

ফাল্গুন মাস। গম যব ছোলা মসুর আলু পেঁয়াজ তুলিবার সময়; পুরুষেরা তখনও মাঠ হইতে ঘরে ফেরে নাই, ব্রজদাসী বলিল—আসুন তোমাদের কর্তারা সব—ফিরুন, তাঁরা কি বলেন দেখি—তারপর গান আরম্ভ করব। কেমন?

মনে মনে সে এরই মধ্যে একটা ঠিক দিয়া ফেলিয়াছে।

সকালবেলার সেই বুড়ী ব্রজর কাছে আসিয়া বসিল। বলিল—কত্তাদের তোয়াক্কা আমি রাখি না। বুয়েচ না মা! কত্তার মাথা আমি 'যোবতী' বয়সে চিবিয়ে খেয়েছি। এক ডর—খানিক—আদেক করি আমাদের বতন মাতব্বরকে; ক্ষেপা-খেপা মানুষ—মায়ের সাধন ভজন করে, লোকটি ভাল মানতে হয়; বুয়েচ না! তা আবার সময় বুঝে বলেও দিই দুম-দাম ক'রে দশ বিশ কথা। হ্যাঁ! আমি তোমাকে ঠাঁই দোব। তাতে ঝগড়া-ল্যাই করতে হয় তা আমি করব। তুমি মা—গায়েন ধর।—

ব্রজ হাসিয়া গান ধরিল।—

"পথের মাঝে পথ হারালাম ব্রজে চলিতে—
কোন মহাজন পথের দিশা পারো বলিতে?"

মেয়েরা স্তব্ধ হইয়া গেল—এমনটি শুনিবে সে তাহারা প্রত্যাশা করে নাই। গান থামাইয়া ব্রজ দেখিল পুরুষেরা কখন আসিয়া—মেয়েদের চারিদিকে দাঁড়াইয়া আছে। দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া ব্রজ তাহাদের বাড়ীতেই তাহাদিগে আহ্বান জানাইয়া বলিল—আসুন গো, বাবারা আসুন!

কাল হইলেও সে বলিত—আসুন গো প্রভুরা! শ্রীদাম সুদাম বসুদামেরা! প্রভুর সখারা সব! বলিয়াই খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিত। আজ তাহার দেহ-মন সব যেন ভাঙিয়া গিয়াছে। সে হাসিল—কিন্তু সে হাসি রেখায় ফুটিল ঠোঁটের উপর—কণ্ঠস্বরে শব্দ-তরঙ্গে জল-ধারার মত ঝরিল না।

পুরুষেরা গানের মধ্যেই আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। পাড়া ঢুকিতেই এমন সন্তান কোলে-করা শ্রীসম্পন্ন একটি মা-জননীর মধুর কণ্ঠের গান শুনিয়া তাহারা বিস্মিত হইয়াছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু

এ দেশে কপালে তিলক গলায় কণ্ঠী পরা বা জটা মাথায় গেরুয়া পরা আগন্তুক এত বেশী বিস্ময় উদ্রেক করে না—যা নাকি সহজাত রসবোধকে ডিঙাইয়া মানুষকে প্রশ্নমুখর করিয়া তোলে। বিস্ময় জন্মিয়াছিল তাদের ব্রজদাসীর শ্রী দেখিয়া, তবুও তাহারা চুপ করিয়াই দাঁড়াইয়াছিল; প্রভুর নাম আর এমন কণ্ঠের গান; তাহার মধ্যে কথা বলিবার মত অরসিক যে, তাহাকে বলে অসুর।

তাহার উপর পাকা ফসলের তৃপ্তিতে তাহারা এমন পরিতৃপ্ত, প্রফুল্ল; হুঁকা টানিতে টানিতে হাসি-রসিকতায় নির্জন পল্লীপথ ভরিয়া তুলিয়া ঘরে আসিয়া এমন মিষ্ট চেহারার মা জননীকে দেখিয়া তাহার এমন গান শুনিয়া তাহাদের প্রফুল্ল মন প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

বাগ্দীদের পুরুষেরা তাহাকে বষ্টুমী-মা বলিয়া গ্রহণ করিল এক কথায়।

ব্রজ বলিল—বাবা, খেতে লাগবে না, পরতে লাগবে না, গৃহস্থের দোরে-দোরে আমার জায়গীর জমিদারি প্রভু আমায় দিয়ে রেখেছেন, লাগলে এক মুঠোর বেশী দু'মুঠো লাগবে না। লাগবে বাবা—একটু আগল বাঁধ, আপনাদের পাড়ার এক পাশে একটি চালা বাঁধব, একটু দেখবেন বাবারা। যেন দুষ্টু লোকে অপমান না করে, চোরে-ডাকাতে মেরে-ধ'রে কেড়ে-কুড়ে না নেয়,—আর বাবা সাপ-খোপ—জন্তু-জানোয়ার। বেশী দিন নয় বাবা, অল্প কিছু দিন। আমার এই অঙ্কুরটি একটু বড় হবার অপেক্ষা—একটু ডাঁটো হোক—দুটো ডালপালা মেলুক—চলে যাব ওর হাত ধরে।

বাগ্দীরা বলিয়াছিল, দেখুন, দেখুন দেখি মা-লক্ষ্মী? থাকবেন আমাদের পাড়ায়—সে তো আমাদের ভাগ্যি গো! যাবেনই বা কেনে? এইখানেই বেঁধে দেব আপনার আখড়া, বোশেখেই আরম্ভ করে দোব ঘর, চারিদিকে লাগিয়ে দেব গাছপালার বেড়া—আপনি থাকবেন, সন্ধ্যেয় আপনার মুখে প্রভুর নাম শুনব। আপনার গোপাল বড় হবেন, বাবাজী হবেন—উনিও থাকবেন এইখানে, আমাদের ছেলেরা থাকবে, আখড়ার সেবা তারাও করবে।

বষ্টুমী বলিয়াছিল—না বাবা। আমাকে যেতেই হবে, প্রভুর ধামে যাব বলে বেরিয়েছিলাম, পথে গোপাল এল কোলে। গোপালকে নিয়েই যাব শ্রীধামে। সেখান ছাড়া আর কোথাও ওকে রেখে আমি শান্তি পাব না। আমি ছাড়া ওর তো কেউ নাই, এক আছেন তিনি, তাঁর কাছেই রেখে যাব।

হঠাৎ কে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। এমনই উচ্চকণ্ঠের বাধা-বন্ধহীন পাগ্‌লা ঝোরার মত সে হাসি যে ব্রজ চমকিয়া উঠিল। কাছেই বসিয়াছিল বাগ্দীবুড়ী, সে ফিস ফিস করিয়া বলিল—রতন ক্ষ্যাপা—পাড়ার মাতব্বর!

একজন প্রৌঢ় আসিয়া ব্রজর সামনে বসিল। ঝাঁকড়া পাকা চুল, পাকা-দাড়ি পাকা-গোঁফ শক্ত-সমর্থ মানুষ—যেন অনেক পুরানো কালের শ্যাওলা পড়া খস্‌খসে একখানা অক্ষয় পাথর; সে যেন এখানকার এই নরম মাটি সবুজ ঘাসের দেশের নয়—কোন পাথুরে অঞ্চলে পাহাড় খসিয়া গড়াইয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছে। সামনে বসিয়া সে নিজেই বলিল—আমি ক্ষ্যাপা, মা। 'এদের পাড়ার মাতব্বর!

ব্রজ বলিল—গোবিন্দ তোমার ভাল করবেন বাবা। কিন্তু আপনি এমন করে হাসলেন কেন?

—তোমার কথা শুনে হাসলাম মা। তবে এমন করে হাসলাম—ক্ষ্যাপা বলে, আমার

অমনিই হাসি। আমি ক্ষ্যাপা—দু'তিনবার ক্ষেপেছি মা।

—আমাকে ঠাঁই দেবেন না আপনি ?

—তারা তারা বল মন। সেজন্যে নয় মা। ঠাঁই তো পাড়ার লোকে দিয়েছে গো।

—তবে ?

—তোমার কথা শুনলাম—সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলাম—একটা বাছুর চেঁচাচ্ছে—হাম্বা-হাম্বা-হাম্বা। এই দুটো এক হয়ে গেল। আর হাসি এল। তুমি বললে তুমি ছাড়া ওর কেউ নাই; তার মানে ও নিজেও নাই, শুধু তুমিই আছ। গরুর বাছুরটা বললে—হাম্‌-বা। মানে হাম-হ্যায়। তোমার বাচ্চাও হাম্‌-বা বলে ডাকবে গো। এই বোল ফুটতে দাও। দুনিয়ার বোলই হ'ল হাম্‌-বা।

ব্রজ স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—আপনি কি বলছেন বাবা ?

পাশ হইতে বুড়ী বলিল—গাও গাও তুমি। ওর মাথার ঠিক নাই। তার ওপর গাঁজা খায়।

বুড়া হা-হা করিয়া হাসিয়া পাগলের মতই বলিয়া উঠিল—হাম্‌-বা, হাম্‌-বা গরু মা—আমি গরু তুমি গরু ওই বুড়ী গরু—তোমার ওই কোলের বাচ্চা—ওটা কৈনে বাছুর।

ব্রজ মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না বাবা। আমরা প্রভুর চরণের রজ। এ দেহ তাঁর, এ রূপ তাঁর—এ কণ্ঠ তাঁর—আমাদের প্রাণ যে তিনি। আমাদের তো আমি নাই—আমির সাধ আমার মিটেছে—সে মরেছে বাবা, আমাদের সব—তুমি। সেই শেখাবার জন্যেই তো, একটু বড় হলেই ওর হাত ধরে বেরিয়ে পড়ব পথে; ওকে বুঝিয়ে দোব দেখিয়ে দোব, চিনিয়ে দোব আমির মেকি—তুমির আসল দাম! ওর যে বড় দুর্ভাগ্য বাবা, নইলে ওর মুক্তি কিসে হবে বল!

বুড়া তাহার রাঙা চোখ দুটা বড় বড় করিয়া বলিল—ওরে বেটী—ওরে বেটী। ওরে আমার হারামজাদী; এঁ্যা—এত কথা—এসব বুলি ফুটল কি ক'রে তোর মুখে? ওমা—তোর সঙ্গে আমার মিলবে ভাল! কিন্তু গাঁজা খাস মা? না খেলে তো জমবে না?

ধমক দিয়া উঠিল বুড়ী—এই দেখ—এই দেখ—ক্ষ্যাপামি আরম্ভ করলে দেখ! গাঁজা খাবে কি? কি আবোল-তাবোল বকছ? যাও সব চান করে এস, খেয়ে নাও। বষ্টুমী গান শোনাবে।

—কালী কালী—তারা তারা—হরি হরি বল মন। তাই বটে। ক্ষ্যাপার মন বৃন্দাবন, এমন মধুর নাম ছেড়ে বকে যাচ্ছে আবোল তাবোল। হাম্‌-বা মা এ হ'ল ওই হাম্‌-বা। তোমার কাছে শিখব মা, এই হাম্‌বা বুলি ছাড়ব। তোমাকে ছাড়ব না। ঠিক বলেছ—হাম্‌-বা ঘুচলেই তুঁহু-তুঁহু রব ওঠে। গরু মরে—তার হাম্‌-বা বুলি ঠাণ্ডা হয়—তখন তার আঁত থেকে—ধুনুরীরা ধুহুচি করে তুলো ধোনে—তখন তাতে বুলি ওঠে তুঁহু-তুঁহু তুঁহু-তুঁহু। তুই আমার ধুহুচি মা! কালই তোর আখড়া আমি বানিয়ে দোব। ক্ষ্যাপা রতন সব পারে মা!

পুরুষেরা গেল স্নানাহার সারিতে, মেয়েরা উঠিল সন্ধ্যা জ্বালিতে—পুরুষদের ভাত দিতে। ব্রজ একা বসিয়া রহিল, পর্ব-পার্বণের গোবর নিকানো আঙিনার মাঝখানে আঁকা শুভ্র আল্পনাখানির মত! মন তাহার অজস্র ফোটাফুলে ভরা সন্ধ্যামণি গাছটির মত প্রসন্ন—কত কল্পনা মৌমাছির মত উড়িয়া উড়িয়া গুঞ্জনে গুঞ্জনে মুখর করিয়া তুলিল তাহার চিত্তকে।

একটি আখড়া গড়িবে; প্রশস্ত আঙিনা রাখিবে, পরিপাটি করিয়া নিকাইয়া রাখিবে, যেন

এতটুকু ধূলা না থাকে, একটি ইট-পাথরের কুচি উঠিয়া না থাকে। দামাল ছেলে উঠানময় হামা দিয়া ঘুরিবে, গায়ে যেন ধূলা না থাকে, হাঁটুতে যেন ইট-পাথরের কুচিতে ক্ষত না হয়। ঘরের দাওয়াগুলি হইবে নিচু নিচু, পড়িয়া গেলে যেন কাটিয়া-কুটিয়া না যায়। বেড়ার গাছের মধ্যে বিশল্যকরণী ও ঈশের মূলের গাছ পুঁতিয়া ফুল জল দিবে,—যেন সাপ না আসে। এখন হইবে একখানি ঘর, তারপর একখানি ছোট উঁচু দেবতার ঘর, প্রভুর সেবা প্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে, সে না হইলে তো বৈষ্ণবের আখড়া হয় না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল সে। যুগল বিগ্রহ মনে পড়িল তার। মনে পড়িল তার বিগত জীবনের স্মৃতি। প্রেমের দেবতাকে যুগলরূপে সম্মুখে রাখিয়া কত খেলাই খেলিয়াছে। দোলে আবীরে-কুমকুমে গাঢ় লাল রঙে—ফুলের মালায় রাধাশ্যামের পূজা করিয়া সেই প্রসাদ লইয়া প্রেমাস্পদের সঙ্গে কত মাতামাতি! সে বাজাইত খোল—নিজে করতাল বাজাইয়া গাহিত গান। ঝুলনে যুগল দেবতাকে ঝুলনায় চাপাইয়া দু'জনে দাঁড়াইত দুই দিকে, ওদিক হইতে সে ঝুলনা ঠেলিত—এদিক হইতে ঠেলা দিত নিজে বষ্টুমী। গুন-গুন করিয়া সে গান গাহিত। "অপরূপ ঝুলন—নানা ফুল শোভন—তা' পর, কিশোরী-কিশোর।"

রাস-পূর্ণিমার রাত্রি মনে পড়িল। সে কি জ্যোৎস্না আকাশে! দুটি-চারিটি নক্ষত্র মাত্র ফুটিয়া থাকিত, এ ছাড়া আকাশে শুধু চাঁদ। আকাশটাকে দেখিয়া মনে হইত, নীল আকাশটা যেন ঘামিতেছে—গলিতেছে। আখড়ার আঙিনায় গাছের ফাঁকে ফাঁকে আসিয়া মাটির উপর রূপার টুকরার মত পড়িয়া থাকিত।

ভাবিতে ভাবিতে চোখে জল আসিল। টপ্-টপ করিয়া ঝরিয়া পড়িল ছেলেটির উপর। ছেলেটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। বৈষ্ণবীর চমক ভাঙিল তাহার সে চঞ্চলতায়। দোলা দিয়া একটি হাত তাহার বুকে রাখিয়া অন্য হাতে আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া সে ঘাড় নাড়িল—না।

না। দেবতা নহিলে ঘর নয় এ কথা সত্য, তবু যুগল বিগ্রহ আর সে স্থাপন করিবে না। এ সব পর্ব-পার্বণ পালন করিতে গিয়া সে আর কাঁদিতে পারিবে না। সে এবার মহাপ্রভুর সেবা প্রতিষ্ঠা করিবে।

—"আমার গৌরাঙ্গ জানে প্রেমের মরম!
ভাবিতে ভাবিতে ভেল রাধার বরণ!"

সেদিন গানও সে ধরিল—ওই গান।

গানে গানে সন্ধ্যাটিকে সে মহোৎসব-সন্ধ্যা করিয়া তুলিল।

উৎসবের আনন্দে শুধু হাসি, এদেশের মানুষেরা বলে—মহোৎসবের আনন্দে হাসি নয়—কান্না; যে কান্নার বিলাপ নাই—শুধু চোখের জল ঝরে, সেই কান্না। এ দেশের মানুষ এ কান্না কাঁদিতে জানে—কাঁদিতে ভালবাসে। তাহারা ঘন ঘন চোখের জল মুছিতেছিল।

হঠাৎ গানের একটি অল্প বিরতির মধ্যে কে যেন বলিল—কি রে রতন দাদা, এ যে তোরা গানে গানে নদে ভাসিয়ে দিলি! আহা-হা এমন গান তো বড় একটা শুনতে পাই না ভাই!

ব্রজ চোখ তুলিল।

কলরব করিয়া গানের ব্যাঘাত করিবার প্রবৃত্তি কাহারও ছিল না, কিন্তু মজলিসের সকলেই স্বল্প চঞ্চল হইয়া উঠিল। চাপা-গলায় মাতব্বর বুড়া নিঃশব্দে এক-গাল হাসিয়া বলিল—মণ্ডল ভাইটি।

মণ্ডল বষ্টুমীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া মাতব্বর বুড়াকে হাত-ইশারায় চুপ করিতে ইঙ্গিত করিল। বষ্টুমী তাহাকে দেখিয়াই চিনিল। সে শিহরিয়া উঠিল।

পরমুহূর্তটি ছিল পুনরায় গান ধরিবার মুহূর্ত। সে গান ধরিয়া গানখানি কোন্ রকমে শেষ করিয়া খঞ্জনী রাখিয়া বলিল—আর পারছি না বাবা। আজ থাক।

লোকটি হাত জোড় করিয়া বলিল—আমিই কি এসে অপরাধ করলাম—মা-জী ?

ক্ষ্যাপা রতন বলিল—হে-ই মা! ওরে আমার মা-মণি, আর একখানি। ভাইটি আমার এল,—আর এমন মধুর নাম থামিয়ে দেবে তুমি—তা হ'লে আমার খেদ থাকবে মা। ভাইটি আমার ভক্ত রসিক। ও-ও পাগল মা। আর একখানি। নইলে আমি পায়ে ধরব।

অপ্রসন্ন চিত্তেই এবার ব্রজদাসী গান ধরিল।

* * * *

লোকটি এ-অঞ্চলে সম্মানিত ব্যক্তি তাহাতে বৈষ্ণবীর সন্দেহ রহিল না। শুধু সম্মানিতই নয়, মানুষটির সঙ্গে এই সব পাড়ার লোকের একটি হৃদ্য অন্তরঙ্গতাও আছে। সম্ভ্রমভরে তাহাকে তাহারা মোড়া দিল বসিবার জন্য। লোকটি বলিল—না। মোড়া সরাইয়া দিয়া বলিল—একখানা নতুন চ্যাটাই থাকে তো দে। প্রভুর নাম হচ্ছে—যিনি গাইছেন, তিনি মাটিতে বসে—আমি ওপরে বসব কি রে ? আক্কেল আর তোদের হবে কবে!

ব্রজদাসী লোকটির কথা গানের মধ্যে ভুলিয়া গিয়াছিল। কাল সে বলিয়া গিয়াছিল আজ আসিবে। ব্রজ কথা দিয়াছিল—তাহার জন্য সে অপেক্ষা করিবে। সে ছিল একটা সঙ্গীন আবেগময় মুহূর্ত। আজ ব্রজর চিত্ত তাহাকে দেখিবামাত্র কিরূপ তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে যাহা বলিতে আসিয়াছে—সে তো ভাল করিয়াই জানে, অক্ষরে অক্ষরে জানে।

কাল গাছের ফাঁস লাগানো দড়ি সত্য সত্যই বাঁধা দেখিয়া মানুষটির প্রতি করুণা তাহার হইয়াছিল। আজ আর কোন মমতা নাই।

লোকটার অবস্থা ভাল, নিজের মুখেই সে বলিয়াছে কাল। আজ কিছু টাকা আনিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিবে—এই ক'টি তোমায় নিতে হবে। না বললে আমি শুনব না। তোমাকে দিচ্ছি না, এ ওই ছেলেটার জন্যে। এ তোমাকে নিতেই হবে। তুমি ওর ভার নিলে, মরণের মুখ থেকে রক্ষা করলে, আমাকে অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচালে—এর দাম টাকায় হয় না, মানুষ দিতে পারে না, সে যা দেবার—যে দেবার—সেই দেবে—তোমার জীবন ভ'রে দেবে, গাছকে যেমন ফুলে ভ'রে দেয়, নদীকে যেমন জলে ভ'রে দেয়, দিনকে যেমন আলোয় ভ'রে দেয়, তেমনি ক'রে দেবে। এ টাকা ক'টা—ওর জন্যে খরচ করো, যদি কখনও অসুখ-বিসুখ করে—কখনও কোন বিপদ-আপদ হয়—কখনও যদি অনবুঝের মত কোন দামী কিছুর জন্য ঝোঁক ধরে—তবে এই থেকে খরচ করো।

* * *

ব্রজদাসী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—প্রভু, সমস্ত দিন ধ'রে মনের মধ্যে একটি বীজকে জল দিয়ে দিয়ে তা থেকে একটি অঙ্কুর বের করেছিলাম। তাতে পাতা মেলবে—ডাল মেলবে—ফুল ধরবে, ফল ধরবে—এই সাধের নেশা পেয়ে বসেছিল আমাকে। ওই লোকটিকে দেখে আমার সে নেশা ছুটে গেল; ও যেন এসে পড়ল এক ঝলক আগুনের মতন—ওর আঁচে বীজটির তাজা অঙ্কুর 'সামনে' নেতিয়ে পড়ল।

আক্ষেপ করিয়া উঠিল ব্রজদাসী—আঃ! ওই সুমতি যদি তখন হ'ত আমার! ওই মজলিসে সকলের সামনে ছেলেটাকে ওর কোলের ওপর ফেলে দিয়ে বলতাম—নাও, তোমার পাপের ফল তুমি নাও, তুমি বয়ে মর, আমি কেন বইব—কেন মিথ্যে-কলঙ্কের পসরা মাথায়

নিয়ে, সাধের বাঁধনে বাঁধা পড়ব ? কিন্তু—!

হতাশায় বষ্টুমী বার বার মাথা নাড়িয়া বলিল—আমি যে তখন বাঁধা পড়েছি ; আমার সর্বনাশ তখন হয়ে গিয়েছে। নইলে—লোকটিকে দেখে ওই টাকা দিতে এসেছে অনুমান ক'রে আমার সমস্ত বুকটা ধড়ফড় ক'রে উঠল, মনে হ'ল—টাকা দেওয়ার মানে হ'ল—ওই ছেলে মানুষ ক'রে দেওয়ার দাম-মেটানো। যে দিন খুশী ছেলেকে বলবে—আমার ছেলে তুই বাবা, তোর মা মরে গিয়েছিল—বষ্টুমী তোকে মানুষ করেছে টাকা নিয়ে।

ওকে কথা বলতে দোব না ঠিক ক'রে, আর গাইতে পারব না বলে—আমি আর থামলামই না। দেড় প্রহর রাত্রি পর্যন্ত গানই গেয়ে গেলাম। ভাবলাম—ভিন গাঁয়ের মানুষ রাত্রি দেখে কথা না বলেই উঠে যাবে। কিন্তু—।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল ব্রজ। ব্রজর চোখের উপর ভাসিতেছে—চ্যাটাইয়ের উপর লোকটি অচঞ্চল হইয়া বসিয়া আছে।

* * *

অচঞ্চল মহেশ মণ্ডল।

মাথার উপর কৃষ্ণাদ্বাদশীর নীলাভ অন্ধকার আকাশ, কোটি কোটি নক্ষত্র। মধ্যে মধ্যে নিশাচর পাখী পাখা ঝাড়িয়া—ডাক দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল। মজলিসে ছেলেরা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, অনেকে ঘুমে ঢুলিতেছে ; বাগ্দী মাতব্বর ভাম হইয়া বসিয়া আছে, বুড়ী বলিল—এইবার থাম মা। নাম রাখ এইখানে। সব ঢুলছে। তার ওপর মা—তোমার শরীল আছে মা। কাঁচা সন্তানের মা,—ঠাণ্ডা লাগবে—হয়তো লেগেছে।

মাতব্বর পাগল রতন—অকস্মাৎ সজাগ হইয়া উঠিল কথাটা শুনিয়া—আ—হা—হা! সাধে কি বলে গাঁজা বড় পাজী নেশা! কথাটা খেয়ালই হয় নাই আমার। কিন্তু তোমার নিজের তো স্মরণ করা উচিত ছিল মা! আর বুড়ী—আর রমনের মা—তোরা? তোরা তো নেশা করিস নাই! ছি—ছি—ছি! ওঠ মা—ওঠ! ওরে মা জমুনীকে একটা বড় বাটীতে করে দুধ দে! ভরতি করে দিবি। বুকে দুধ আসা চাই।

লোকটি তবু উঠিল না।

ব্রজদাসীর চোখ দুটি ঝকঝক করিয়া উঠিল। সে আক্রোশভরে মাতব্বরের কথার উত্তর দিবার ছল করিয়া বলিল—আমি তোমাদের ঘরের লোক হয়ে গিয়েছি বাবা, আমার জন্যে ভেবো না, ব্যস্ত কেন হচ্ছ—আমি চেয়ে খাব। আগে অতিথি বিদায় কর বাবা। এই এঁকে! মনে হচ্ছে—ইনি যেন তোমাদের এখানকার মহৎ লোক, বড় লোক, অনেক খাতির—অনেক টাকা!

মণ্ডল খোঁচাটা হজম করিল। নীরব হইয়া রহিল।

বাগ্দী মাতব্বর বলিয়া উঠিল—তা মা, আপনি ঠিক ধরেছেন। মণ্ডল ভাইটি আমার এ অঞ্চলের পবিত্র মানুষ, মহৎ মানুষ! ভর্তি জোয়ান বয়সে ভাইটির আমার ঘর ভেঙে গেল—মোল্যান বউমা সিঁথির সিঁদুর নিয়ে চলে গেলেন—ভাইটি আমার আর সংসার করলেন না। মাছ ছাড়লেন—থান পরলেন—বামুন ঘরের বিধবার মত আচরণ ওঁর। দেশের গরীবদের ধান দেন বর্ষায়, শকতি ছাড়া বাড়ি নেন না।

—তা ছাড়া—আরও—

সে আর কিছু হয়তো বলিত, কিন্তু বৈষ্ণবী আর থাকিতে পারিল না, বলিল—একটা কথা বলব আমি? কিছু মনে করবে না তো বাবা? মণ্ডল মশায় যেন রাগ করবেন না।

আমি যা বুঝি—তা বলছি। বাইরে দেখে মানুষের ভিতরটা বুঝা যায় না। আমি তো বাবা—সারা জীবন ঠকেই এলাম। এই দেখ না বাবা, আমাকেই দেখ। বষ্টোমের মেয়ে—গৃহী-গেরস্থ নই—। মা-বাপ ছিলেন—গেরস্থ গৃহী। আমি প্রভুর সেবায় প্রেমের গুরু হিসাবে আখড়ার মহান্তের সঙ্গে মালাচন্দন করেছিলাম। প্রভু আমাকে রূপ দিয়েছিলেন—আমাকে দেখেই তোমরা বাবা আহা-আহা-বলে কত মায়া করলে—গান শুনে গলে গেলে—কিন্তু একবার ভাবলে না বাবা প্রভুর সেবায় দেহ মন যে সঁপে' দিলে—তার কোলে এই শিশু কেন? এল কি ক'রে?

সমস্ত মজলিসটা এক মুহূর্তে ওই শেষের দুটি প্রশ্নে স্তম্ভিত হইয়া গেল। কথাটা সত্যই কাহারও মনে হয় নাই। নহিলে প্রশ্ন করিবার কথাই তো। বৈষ্ণবীর ওই কোমল মধুর রূপ তাহাদের চোখে পড়িবামাত্র তাহারা অন্তরের মমতা বিনা প্রশ্নে ঢালিয়া দিয়াছে অন্তর উজাড় করিয়া। সদ্য উদ্গত বিবর্ণ অঙ্কুরের দল দু'টির উপর সূর্যের দৃষ্টি পড়িবামাত্র, বিষবৃক্ষের অঙ্কুর—না অমৃত পুষ্পের অঙ্কুর বিচার না করিয়াই তাহার উপর ঢালিয়া দেয় সবুজ লাবণ্যের রসধারা—তেমনি করিয়াই ঢালিয়া দিয়াছিল। কিন্তু এ মেয়েটিই বা কেমন মেয়ে যে, সকলের চোখে চোখ রাখিয়া এমন উঁচু গলায় সেই কথা বলে? সকলে হতবাক্ হইয়া বষ্টুমীর দিকে চাহিয়া রহিল। মণ্ডল বসিয়া রহিল মাথা হেঁট করিয়া। কিন্তু আশ্চর্য মানুষ বাগ্দী মাতব্বর ওই রতন। সে নিজের কথা শেষ করিয়া সদ্য ছোট তামাকের কল্কে হাতে করিয়াছিল, বষ্টুমী কথা বলিতে বলিতে একটা টানও দিয়াছিল, নিশ্বাস বন্ধ করিয়া ধোঁয়া চাপিয়া সে বাকী কথাগুলি শুনিল; লোকে যখন হতবাক্ হইয়া মেয়েটির দিকে চাহিয়া ছিল তখন সে ধোঁয়াটা ছাড়িল, তারপর বলিল—ওরে বেটী কথাটার জবাব আমি দিই। তোমার কোলে ছেলে দেখে আমরা ও-সব ভাবতে যাব কেন মা? যে গাছে ফুল হয় মা—সেই গাছেই ফল হয়। আবার এমন ফুলও আছে মা—যার ফুলের মধ্যেই থাকে তার বীজ। দেবতার পূজার জন্মেই যে ফুল গাছ লাগালাম মা—তাতে কোন ফুল যদি তুলতে ছুট হয়ে ফলই হয় মা—তবে কি তা গাছের পাপ? না সেই জন্মে কি সে গাছের গোড়ায় জল দেবে না মানুষ? বেশ ত মা, ফুলে পুজো না হয়ে থাকে—ফলে পুজো হবে ঠাকুরের।—শেষে শুধু মণ্ডলের দিকে চাহিয়া সে বলিল—কি বল গো মণ্ডল ভাইটি?

মণ্ডল একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—তোর কথা আলাদা রতন দাদা, তুই হলি রতন পাগল। কিন্তু সংসার তো তোর চোখ পায় নাই,—তোর মনও পায় নাই। উনি সেই দিক দিয়ে ঠিক বলেছেন। সংসারের মানুষের ভেকই সর্বস্ব। বাইরে দেখে চেনা তাকে যায় না। এই পাঁচজনে আমাকে ভালো লোক বলে। কিন্তু আমি তো জানি, লোককে আমি কত ঠকিয়েছি।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মণ্ডল বৈষ্ণবীকেই বলিল—মানুষের ভাগ্য বড় খারাপ। ভাগ্যই বই কি, তা ছাড়া আর কে? ভগবানকে পাওয়ার জন্মে হাত বাড়িয়ে পথ চলতে চলতে হঠাৎ হুঁচোট খেয়ে কি পা পিছলে যখন আছড়ে পড়ে, তখনকার কথা একবার ভেবে দেখুন দেখি! স্নান করে শুদ্ধ হয়ে কপালে তিলক এঁকে পুজোর থালা নিয়ে যেতে গিয়ে পড়ল পা পিছলে পথের পাঁকে—সর্বাঙ্গে লাগল কাদা,—লোকে হো-হো ক'রে হাসলে—

বাধা দিয়া রতন মাতব্বর বলিল, ওরে ভাই, এইখানেই তোর হার হ'ল। কাদা মেখে যেদিন পুজো করতে যেতে পারবি—সেদিন আর পথে পড়ে গিয়েও ঘরে ফিরতে হবে না কাপড় ছাড়তে চান করতে। পড়বি—উঠবি—আবার পড়বি—আবার উঠবি—পথ চলবি। ওই

মায়ের দিকে চেয়ে দেখ—যা বললেন নিজের মুখে—তাই যদি মানি—ও যদি হয় কাদার তাল—পাপের ছাপ—তাই কেমন কোলে নিয়ে বসেছেন দেখ। কেমন হাসিমুখে উঁচু গলায় বললেন মনে কর। ওঁর পথ আটকায় কে ? মা তুবি পাবে—পাবে।

অবাক্ বিস্ময়ে বষ্টুমী বাগ্দী মাতব্বরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, বলিল—কে বাবা, তুমি তো সহজ মানুষ নও।

হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল মাতব্বর। বলিল—পাগ্‌লা মা। রতন পাগ্‌লা আমি। বার দুয়েক ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম তা—। বুড়া আঙুল দু'টি নাড়িয়া বলিল—খটো খটো লবডঙ্কা! একবার ঐ বাগ্দিনীর মুখ মনে পড়ে ফিরে এলাম—আর একবার ফিরলাম—রমনের মায়ায়। এখন আবার রম্‌নার দুটো বেটা হয়েছে। ক'ষে কোদাল চালাচ্ছি মা। ঠিক করেছি—ওই ছোঁড়া দুটোকেই ভজে শেষ পর্যন্ত দেখব।

আবার প্রাণখোলা হা-হা হাসিয়া বুড়া গড়াইয়া পড়িল।

মণ্ডল বলিল—এতক্ষণে যেন খানিকটা চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিল সে, বলিল—রতন দাদা, হাসিস পরে। এখন একটা কাজের কথা বলি শোন। শরীরটা যেন খারাপ হয়ে পড়ল মনে হচ্ছে।

বুড়া হাত বাড়াইয়া দিল, বলিল—দেখি, নাড়ীটা দেখি।

মণ্ডল বলিল—থাক, নিদেনের দিন আসে নাই—হাত তোকে দেখতে হবে না। এক কাজ কর, বাড়ীতে আমার কাউকে পাঠিয়ে দে। খবর দিয়ে আসুক, আজ আর আমি ফিরব না।

—তার লেগে আর ভাবনা কি ? ভাবনা—। বুড়া ভাবনায় যেন নিমগ্ন হইয়া গেল এক মুহূর্তে। বিষণ্ণ হাসি ফুটিয়া উঠিল বষ্টুমীর ঠোঁটে।

সে বেশ বুঝিয়াছে—মণ্ডল তাহার সঙ্গে নিরিবিলি কথা বলিবার সুযোগ খুঁজিতেছে। আরও বুঝিয়াছে যে, সে তাহার পাপের দাম দিতে আসিয়াছে। সে বলিল—তাই তো শরীর খারাপ হ'ল আপনার—আর আপনার মত মানুষ সুখের শরীর নিয়ে—এখানে এই—

—সে ওর অভ্যেস আছে মা। কত দিন ভাইটি আমার নদীর চরে সারারাত ঘুরে বেড়ান। বাগ্দী বুড়া বলিল—শরীর ওর খারাপ নয় মা—মন ওর খিঁচড়ে গিয়েছে। আজ ও সারারাত নদীর গর্ভে বসে থাকবে। হাসিয়া বলিল—ও জানে, কেউ জানে না,—কেউ দেখে না—কিন্তু ক্ষ্যাপার মন বৃন্দাবন, কখন যে বাঁশী বাজবে সেখানে, তার তো ঠিক নাই। রতন পাগল রাত-দুপুরে কত দিন দেখেছে, ভাইটি আমার আকাশপানে চেয়ে আছে। কাছে যাই না, ভাইটি চমকাবে বলে, তবে বুঝতে পারি চোখে জল গড়াচ্ছে। নদীর গর্ভে যে কাটাতে পারে সারাটা রাত, সে আর একটা রাত আমাদের পাড়ায় কাটাতে পারবে না ? এই ঘরে বিছানা করব তোমার, পিঁড়েতে থাকবে ভাইটি, উঠোনে থাকব আমরা সবাই। বাস, এক রাত্তির তো! তার ওপর মানুষের দেহ। শুলো—না ঘুমলো ; ঘুমলো—না মরলো।

আবার সেই হা-হা করিয়া হাসি।

* * *

রতন বুড়া সহজ মানুষ নয়।

লোকে পাগল বলে, কিন্তু ব্রজদাসী আন্দাজ করিয়াছিল ঠিক। পাগলের মধ্যে বস্তু আছে। সে ঠিক আন্দাজ করিয়াছিল। আন্দাজ করিয়াছিল—মণ্ডল ভাইটির কথা আছে বষ্টুমী মায়ের সঙ্গে।

সেদিন গভীর রাত্রে উঠিয়া বসিয়া সে-ই বলিয়াছিল, ভাইটি! মা জননী গো!

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই বলিয়াছিল—শুনছ আমার কথা? তোমাদের কথা যা আছে, সেরে লাও। ঘুমিয়েছে—সবাই ঘুমিয়েছে। আমি জানি, আমি বুঝেছি, তোমাদের কথা আছে। বল তো না হয়, আমি খানিক ঘুরে আসি চাঁদের আলোয়! সত্যই বুড়া চলিয়া গেল।

বৈষ্ণবীর ক্রোধের আর সীমা ছিল না। ক্রোধ হইয়াছিল লোকটির উপর। সে নিজেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিল—কি তোমার কথা শুনি?

মণ্ডল বলিল,—এইটি নিতে হবে তোমাকে।

কাগজের একটি বাণ্ডিল সে বাহির করিল। বলিল—আমার বোঝা তুমি নিজের ঘাড়ে নিলে, আমার অঙ্গের কালি নিজের অঙ্গে মেখে কলঙ্কিনী সাজলে তুমি। তার জন্তে আমি দিচ্ছি না। ওর জন্তে তোমার মত মানুষকে যে দাম দিতে যায়, তার মত মূর্খ নাই। আমি দিচ্ছি ওর জন্তে; ওই হতভাগা—ওর জন্তে তো দরকার হবে—

—না, তুমি নিয়ে যাও। নিয়ে যাও তোমার পাপের বোঝা!

বলিয়াই বষ্টুমী ঘরে ঢুকিয়া মুহূর্তে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। বিছানায় শুইয়া এতক্ষণে সে অস্থির হইয়া উঠিল। রাত্রে শিশুটা পাশে শুইয়া কিলবিল করিতেছে, তাহার সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিতেছে; মধ্যে মধ্যে কাঁদিতেছে, এ কিন্তু ক্ষুধার সুধা তাহার নাই, তাহাকে দুধে-ভিজানো ন্যাকড়ার শলিতা মুখে দিয়া শান্ত করিতে হইতেছে। হঠাৎ এই মুহূর্তে মনে হইল—এ যে চরম দুর্ভোগ বলিয়া মনে হইতেছে! এক দিন নয়, দুই দিন নয়, এই দুর্ভোগ ভোগ করিতে হইবে, হিসাব করিতে গিয়া সে কূল-কিনারা পাইল না। আতঙ্কে অভিভূত হইয়া গেল। চোখে জল আসিল। মনে মনে বার বার বলিল, এ আমি কি করলাম! গোবিন্দ এ আমাকে কোন্ জালে জড়ালে!

বাহির হইতে বাগ্দী বুড়া ডাকিল, মা জননী!

সে সাড়া দিল না।

বুড়া আবার বলিল—মোড়ল কি চলে গেল মা?

শুইয়াই ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সে আবার বলিল—কে চলে গেল?

—মোড়ল ভাইটি!

—তা তো জানি না।

—চলে গিয়েছে। চাদর লাঠি কিছুই নাই। ও-ও এক ক্ষ্যাপা মা।

বৈষ্ণবী বাহিরে আসিয়া বলিল—সাধের ক্ষ্যাপা বাবা!

বুড়া হাসিল। ও কথাটা বাদ দিয়া বলিল—কথা হয়ে গেল!

বৈষ্ণবী এক মুহূর্ত ভাবিয়া লইল—তার পর বলিল—ওর সঙ্গে কথা আমার ছিল না বাবা। কিন্তু তোমাকে আমি গোটাকতক কথা বলব—না বলে আমি আর পারছি না।

—বল মা। না—এখানে নয়। এরা সব উশখুশ করছে। ঘুম পাতলা হয়েছে। মনে হচ্ছে, উঠবে এবার। চল, আমার মায়ের থানে চল।

—মায়ের থান?

—আমার এক মা আছেন মা। পাথুরে মা। বলেছিলাম না—বার-দুয়েক ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম,—ক্ষ্যাপামি চেপেছিল ঘাড়ে। সেই ক্ষ্যাপামির ও একটা বোঝা। শেষবার ছিলাম বামা ক্ষ্যাপা বাবার তারাপীঠে। মায়ের থানে পেসাদ পেতাম আর বামা বাবার কাছে

বসে থাকতাম। বাবা গাল দিতেন, আর বলতেন—ভাগ বেটা! আমি বলতাম—আমাকে মা দাও তবে যাব। শেষে একদিন নিজের মনই ঘর-সংসারের জন্ম কাঁদল। বললাম বামা বাবাকে—তাই ভাগলাম আমি। নিজে আগুলে রাখলে মা-কে, আমাকে দিলে না—সে তোমার ধর্ম তোমার ঠাঁই। আমার ভাগের জন্মে আমিও নালিশ করব তোমার নামে। বাবা বললে,—ওরে হারামজাদা বেটা, নালিশ ক'রে তুই আমার নিবি কি? আমি বললাম—দেখবে কি নোব! কিছু না থাকে তোমার—তোমাকেই ক্রোক করব আমি! এমন খাটুনী তোমাকে খাটাব—বুঝবে মজা! বাবার হাতের কাছে ছিল একটা পাথর—বাবা পাথরটা ছুঁড়ে আমাকে মারলে—মাথাটা সরিয়ে না নিলে ফেটে যেত মাথাটা। তার পরে ত্রিশূল নিয়ে মারতে ছুটল। আমি না ওই পাথরটা কুড়িয়ে নিয়ে ছুট দিলাম। বাবা দিয়েছে। ও-ই আমার মায়ের ভাগ। আমবাগানের কোণে বুড়ো শিমূল গাছতলায় মাটির বেদী করে সেইখানে রেখেছি—ফুল-বেল-পাতা-সিঁদুর দিই। দুঃখ হলে বলি। কাঁদি। সুখ হ'লেও গিয়ে বলে আসি। ওতেই আমার মন সন্তুষ্ট। চল, সেইখানে চল।

গ্রামপ্রান্তের সেই আমবাগানের এক কোণে বাগ্দী বুড়ার মায়ের স্থান। চারিপাশে নিবিড় জঙ্গল; জ্যোৎস্না তখন উঠিয়াছে, সেই আলোয় বৈষ্ণবী দেখিয়া বুঝিল—জঙ্গলটা তৈরী করা জঙ্গল; আর একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতেই দেখিল—গাছগুলির অধিকাংশই বেল, কল্কে, করবী, জবা আর ধুতরার। ভিতরে ঢুকিয়া দশ-বারো হাত পরিমিত একটি পরিচ্ছন্ন স্থান, সম্মুখেই একটা বড় গাছের তলায় একটি মাটির বেদীর চারিপাশে ফুল-বেলপাতার রাশি জমিয়া আছে। বুড়া বলিল—বস মা। বল কি বলবে বল!

ছেলেটিকে প্রাঙ্গণে নামাইয়া দিয়া ব্রজ বুড়ার মাকে প্রণাম করিল। তার পর বলিল—আমি কি করি বল তো বাবা? এ যে আমি বন্ধনে পড়লাম!

—কিসের বন্ধন? ওর?—ছেলেটাকে দেখাইয়া দিল।

—হ্যাঁ বাবা। ও তো আমার নয়।

—তোমার নয়? আমার খানিকটা যেন 'সন্দ' হয়েছিল মা। তা বয়স হয়েছে, দৃষ্টির জোর তো কমে এসেছে, সন্ধ্যের মুখে ঠিক ঠাওর করতে পারি নাই।

চমকিয়া উঠিল বৈষ্ণবী।—কিসে তোমার মনে হ'ল বাবা?

—তোমার চেহারা দেখে। চাষ করি মা—গাছ দেখে ফলন্ত, না অফলন্ত বুঝতে পারি। গরু আছে ঘরে, শিঙের গাঁট গুনে দেহ কতটা ভারী হয়েছে দেখে বুঝতে পারি—ক'সন্তানের মা হয়েছে গাই। তা মা, মানুষের পেটে জন্মেছি, মানুষ নিয়ে ঘর করি, তোমার চেহারা দেখে বুঝতে পারব না? মেয়েগুলোর বুঝতে পারা উচিত ছিল—ওদের সন্দও হয়েছিল—আমাকে বললে—রমনের মা। বললে—বষ্টুমীর দেহ কি না, দেখে কে বুঝবে যে সন্তানের মা হয়েছে! তা ওকে কোথায় পেলে মা?

ব্রজ তাহাকে সব বলিয়া গেল। তার পর বলিল—বল তো বাবা, এবার আমি কি করি?

—কি করবে?

—হ্যাঁ।

—যা তোমার মন চায় মা, তাই কর। যদি বন্ধন সহ্য না হয়, তবে ওকে গাছতলায় শুইয়ে রেখে রাত্রে উঠে চলে যাও তোমার পথে। বল তো বুড়ো ছেলে তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসবে, যতটা বলবে।

—কিন্তু এর কি হবে?

—সে ভাবনা তুমি ভাববে কেন মা ?

—তুমি ওর ভার নেবে বাবা ?

—না। সে আমি পারব না। সে কথা আমি বলছিও না।

—তবে ?

—ওর ভাগ্যে যা আছে তাই ঘটবে। কারুর দয়া হয় নেবে। না-হয় তো—। বুড়ো বিচিত্র হাসি হাসিল।

ব্রজ বিস্মিত হইয়া বুড়ার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তার পর বলিল—তুমি এত নিষ্ঠুর বাবা ?

বুড়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসিতে জ্যোৎস্না-পাণ্ডুর স্তব্ধ রাত্রি যেন চমকিয়া উঠিল। নদীর ওপারে সে হাসির প্রতিধ্বনি উঠিল। বুড়ার মায়ের স্থানে শিমুলগাছের মাথায় কোন বৃহদাকার পাখী পাখার সাপট দিয়া নড়িয়া-চড়িয়া বসিল। হঠাৎ হাসি থামাইয়া বুড়া বলিল—আমি যে ব্যাটাছেলে মা। আমরা নিষ্ঠুরই বটে। তার পর আবার বলিল—মা গো, বয়স হল অনেক। ঠেকে-দেখে বুঝলাম অনেক। তুমি নিষ্ঠুর বললে মা, কিন্তু বল তো, ওকে ঘাড়ে চাপালে ওই বাঁচবে, না আমিই বাঁচব ? পুরুষমানুষ খেটে খেতে হয়, সকালে যাই সন্ধ্যের আসি। কে ওকে দেখবে বল ? রমনের মা ভাববে, রমনের ভাগীদার এল, রমনের বউ ভাববে—তার ছেলের অংশীদার এল। পাড়ায় কারুর যদি সদ্য সদ্য থাকত কোলের ছেলে—তবে তাকে দিলে হয়তো নিতে পারতো। কিন্তু তেমন তো নাই কেউ পাড়ায় !

তার পর বলিল—ওঠ মা, রাত্রি প্রায় শেষ হয়ে এল। চল, বাড়ী চল। বরং সারাটা দিন কাল ভেবে নাও। যা তোমার প্রাণ চাইবে, তাই কর। ফেলে যেতে চাও, রাত্রে উঠে চলে যেও, পিছন ফিরে চেয়ে দেখো না। ওর কি হবে তা ভেবো না। চলে যেও সামনে চক্ষু রেখে। আর প্রাণ যদি চায়—তবে ওকেই বুকে জুড়িয়ে ধর, নিজেকে ভেঙে-চুরে গড়, ঘর বেঁধে দি—থেকে যাও এখানে, আমি যত দিন আছি তোমার কোনও কষ্ট হবে না। আমি মরলে—।

হাসিয়া বুড়া বলিল—তা আমি এখন দশ বছর বাঁচব মা। বেশ ডাঁটো আছি এখনও। চল—এখন ফিরে চল।

বৈষ্ণবীর মনে হইতেছে সে যেন জলে ডুবিয়া যাইতেছে। জলমগ্ন মানুষ ভাসিয়া উঠিয়া যেমন করিয়া মাথা নাড়ে অস্থির ভাবে তেমনি ভাবেই সে মাথা নাড়িল—সেটা হাঁ, অথবা না কে জানে! বুড়া তাহা বুঝিল—সে বলিল—ভাল কথা মা। আজ তুমি ভাব। কাল যা হয় করবে। ভাল ক'রে ভাব মা! হাম-বা—না তুঁহু! তুঁহু!

বুড়ার কথা-মত পরের দিনটা সে সমস্ত দিন থাকিল, অনেক ভাবিল কিন্তু কূল-কিনারা পাইল না—ঘর বাঁধিতেও মন উঠিল না—ছেলেটাকে ফেলিয়া যাইতেও পারিল না। সমস্ত দিনটা চোখ মেলিয়া বসিয়া র'হিল, চোখে কিছু পড়িল না; শুধুই ভাবিল। রাত্রে সকলে ঘুমাইয়াছে, তাহার চোখে ঘুম নাই—সে ভাবিতেছে। বুড়াই তাহাকে বেশী করিয়া ভাবাইয়া দিয়াছে। সে লোকটা চলিয়া গিয়াছে। বুড়ার কথাই ভাবিতেছে সে। আর একবার প্রত্যক্ষ ভাবে বোঝার গুরুত্বটা অনুভব করিতেছে।

হঠাৎ বাহিরে কাহার পায়ের শব্দ উঠিল। ব্রজ বুঝিল সে কে। কিন্তু শুনিয়াও চঞ্চল

হইল না।' সে শক্তিই তাহার যেন নাই। এইবার কে ডাকিল—মা!

বুড়া ডাকিতেছে। ব্রজ সাড়া দিতে পারিল না। সে যেন আধ-নিদ্রার মত দুঃস্বপ্ন দেখিতেছে, প্রাণপণে জাগিবার চেষ্টা করিতেছে, তবু জাগিতে পারিতেছে না।

—মা!

—এঁ্যা? বহু কষ্টে এবার সে সাড়া দিল।

—যাবে যদি মা—তবে এই সময়! ভূরা ঘুমে সব ঘুমোচ্ছে।

এ কথার উত্তর সে খুঁজিয়া পাইল না। আবার আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে সে। সে উঠিতেই ছেলেটা চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার গায়ে হাত দিল।

—মা!

ব্রজর বুকখানা আবার ধড়ফড় করিয়া উঠিল। ওদিকে বুড়ার ডাকের বিরাম নাই—মা শুনছ? যাও যদি দেরি করো না আর, তোমাকে এগিয়ে আমাকে আবার রাত্রি থাকতে ফিরতে হবে।

—না। এবার ব্রজ পাশ ফিরিয়া শুইল। শুইয়া অনেক কাঁদিল, মণ্ডলকে অভিসম্পাত দিল, তার পর কখন হঠাৎ ঘুমাইয়া পড়িল, পুরা দুইটা রাত্রি, তিনটা দিনের একটা ঝড় যেন শান্ত স্তব্ধ হইয়া গেল। পরের দিন সকালে বুড়া তাহাকে ডাকিয়া বলিল—তাহ'লে মায়ের নাম নিয়ে হরি বলে আজ আরম্ভ করে দিই ঘর?

—ঘর? ব্রজ আজও সংশয়াকুল মন লইয়া প্রশ্নের সুরেই ঘর কথাটা উচ্চারণ করিল। এ কি নিষ্ঠুর যন্ত্রণার মধ্যে সে পড়িল!

—আর ঘর ব'লে হ্যাঁক্ রেখো না মা। ওরে নিয়ে আয় কোদালখানা!

'জয় তারা' বলিয়া সে পাড়ার প্রান্তেই একটি বকফুলের গাছকে সম্মুখে রাখিয়া ঘরের বনিয়াদ পত্তন করিয়া দিল। বকফুলের গাছটা থাকিবে মাঝ-উঠানে।

দশ

ঘরে ঢুকিতে গিয়া বষ্টুমীর চোখে জল আসিয়াছিল। ঘর! আবার ঘর!

সেদিনের সে ঘরখানা কিন্তু পাকা-পোক্ত ঘর ছিল না। বাঁশ দিয়া চালা তুলিয়া চারিপাশে খল্পা বাঁধিয়া ঘরখানা বাগ্দী বুড়া একদিনেই তুলিয়া ফেলিল। নদীর ধারের বাঁশ, পাড়ায় চাঁদা করিয়া খড় ও সাবুইয়ের দড়ি সংগ্রহ করিয়া ওই বকফুলের গাছটার তলায় ঘর গড়িয়া দিল। বকফুলের গাছটার তলায় একটা পাকা-পোক্ত মেঝের মত মাটির বেদী বাঁধা ছিল। বেদীটা বাঁধা হইয়াছিল প্রায় এক বৎসর আগে। বাগ্দী-পাড়ার অবীরা অর্থাৎ সন্তান-সন্ততিহীনা ওই মানদা বুড়ী জীবন-মহোৎসব করিয়াছিল। মৃত্যুর পর কে তাহার শ্রাদ্ধ করিবে—কে তাহার পরলোকে সদগতির জন্ম ভগবানের চরণে ফুল-জল দিবে, জ্ঞাতিগোষ্ঠী ফকীর গোঁসাইকে ভোজন করাইয়া আশীর্বাদ লইবে—এই লইয়া ভাবনার তাহার অন্ত নাই। অনেকে তাহাকে পোষ্য লইতে বলিয়াছিল, কিন্তু সে তা লয় নাই। বুড়ীর কিন্তু পয়সা আছে। ঘরে কাজ নাই, সারাটা দিন বুড়ী মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায়। তিন-চারিটা গাই আছে, তাদের চরায়, গোবর কুড়ায়, ঘুঁটে দেয়; ফসলের সময় মাঠের ঝরা ফসল সংগ্রহ করে; বর্ষার সময় জালি পাতিয়া

পুকুরে নালায় খালে মাছ ধরিয়া বিক্রী করে। খায় এক সন্ধ্যা, কাজেই পয়সা তাহার জমে। কতক পুঁতিয়া রাখে, কতক ধার দেয় পাড়ার লোককে। মানদা বুড়ীর সেই জীবন-মহোৎসব উপলক্ষে এখানে বেদী বাঁধা হইয়াছিল। রান্না-বান্না খাওয়া-দাওয়া হইয়াছিল তাহার উঠানে, এখানে হইয়াছিল অষ্টপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন। সে বেদীটা আর ভাঙা হয় নাই। বরং যত্ন করিয়াই ওটা রাখা হইয়াছে। ওটাই পাড়ার মজলিসের স্থান হইয়া উঠিবার উপক্রম হইতেছিল।

ওই বুড়ী বলিল—ওই ঠেনে বাঁশে খড়ে চালা তুলে দাও মাতব্বর। কাল থেকে আমি পাঁচবার বলেছি—আমি তোমাকে ঠাঁই দোব মা।

রতন বুড়া হঠাৎ একটা হুঙ্কার দিয়া উঠিল—টাকা লাগবে!

—টাকা? তু ক্ষেপলি নাকি আবার? টাকা! মরণ!

—হ্যাঁ টাকা। জীবন মচ্ছব করিয়েছিস, টাকা লাগে নাই? দেবতা বষ্টুম বসাবি, টাকা লাগবে না? টাকা লাগবে। পাঁচ টাকা। খরচ নাই?

ব্রজ লজ্জা পাইল, সে তাড়াতাড়ি বলিল—সে কি বাবা! পাঁচ টাকা আমি দিচ্ছি, আমার আছে। বৃন্দাবনে যাবার জন্যে পথে বেরিয়েছিলাম—

রতন বুড়া বলিল—কুকুর হ'তে সাধ গিয়েছে তোর, তীর্থের টাকায় পথে ঘর বাঁধবি;—উহু— সে হবে না। ওই বুড়ীই দেবে টাকা।

অদ্ভুত মানুষ সব, বিচিত্র বিশ্বাস, ঝিনুকের খোলার ভিতর মুক্তার মত হৃদয়, যেমন রতন বুড়া—তেমনি মানদা বুড়ী—তেমনি আর সব মানুষেরা;—ব্রজর রূপ দেখিয়া—তাহার গান শুনিয়া তাহাকে তাহারা ভালবাসিয়াছিল. কপালে তিলক, গলায় কণ্ঠী, নাকে রসকলি দেখিয়া পবিত্রাত্মা ভক্ত বৈষ্ণব ভাবিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছিল, ভালবাসায় শ্রদ্ধায় তাহাকে অভিসিঞ্চিত করিয়া দেবতা বানাইয়া তাহাকে তাহারা ঘর বাঁধিয়া দিল। ব্রজর টাকা কিছুতেই লইল না, বুড়ীই দিল টাকা; গোটা পাড়ার লোক সেদিন কাজ কামাই করিল, দেখিতে দেখিতে বৈকালবেলা পর্যন্ত ঘর উঠিয়া গেল। বুড়া হাসিয়া বলিল—বেঁধে দিলাম তোমার তালপাতার কুঁড়ে! বুঝেছ মা! তুমি এখানে আজকেই হরি বলে আস্তানা বাঁধ। দেখ থেকে! তুমিও বুঝে দেখ— —আমরাও বুঝে দেখি! বনাবস্তি হয়, শক্ত-পোক্ত ঘরে জেঁকে বসবে। না হয় তো—তোমার বাড়ীর সামনেই পাড়া থেকে বেরুবার পথ মা, খোলা পড়েই রয়েছে!

বুড়াই হাঁড়ি-কুড়ি, টুকি-টাকি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিল। সে-ই পাতিয়া দিল ইটের উনান। বলিল—তোমার কাছে আজ চারটি খাব মা!

ব্রজ বলিল—সে যে আমার মহাভাগ্যি বাবা। আপনি খাবেন! আমার ঘর পবিত্র হবে। ওই হতভাগা—ওর পরম কল্যাণ হবে। আপনি তো সামান্য ব্যক্তি নন!

রতন হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।—এই দেখ—বেটী কি বলে দেখ।

—ঠিক বলছি বাবা। আপনি মহাজন—

—মহাজন? আবার উচ্চ হাসিয়া সমস্ত পল্লীটা সচকিত করিয়া তুলিল বুড়া। তারপর বলিল—মহাজনী কারবারে সাধ হয় না কার বল মা, সাধ একদিন আমারও হয়েছিল। কিন্তু বড় কঠিন কারবার মা! আসল ডুবিয়ে দেনা ঘাড়ে ক'রে ঘরে ফিরলাম। বিদ্যে না থাকার ফল। জ্ঞান নাই—শুধু ভক্তিতে হবে কি? গুরু বললে, ফিরে যা, বাড়ী যা, কচু কুড়োতে এসেছিস, মন পড়ে আছে কচুর ক্ষেতে, কচু-বেচা পাঁচ সিকে তোর সম্বল, তোর আবার মহাজনীর সাধ কেন? ভাগিয়ে দিলেন মা।—বলিয়া সেই হা-হা করিয়া হাসি।

হাসি থামাইয়া বলিল—নাও এখন ঘরে চল।

বষ্টুমী এক দিকে হাসিল, অন্য দিকে কাঁদিল। ঘর! আবার ঘর!

দীর্ঘদিন পরে সেই অতীত কথা বলিতে বলিতে ব্রজ নিজের কপালে মৃদু আঘাত হানিয়া বলিল—আমার পা সেদিন যেন কে চেপে ধরেছিল। মনের ভিতরটাও যেন কেমন কেঁদে উঠেছিল। কিন্তু আমি মানি নাই। পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম—খালি বুক; বুক জুড়ে পেলাম—ওই আমার কালকে—।

বাবাজী বলিলেন—না। ও কথা তোমার মুখে সাজে না।

হাসিয়া ব্রজ বলিল—প্রভু—আমার গুরু গল্প বলতেন—সে গল্প সেদিন মনে পড়ে নাই, আজ মনে পড়েছে। বলতেন—কালের ছলনা বড় বিচিত্র। জীব বুঝতে পারে না। অমৃত আনে—কাল বিষ হয়ে তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে। একটা গাছে এক পক্ষিণী বেঁধেছিল বাসা। দুটি ডিম পেড়েছিল। একদিন ঝড় এল—বাসাখানি তছনছ হয়ে গেল—ডিম দুটি মাটিতে পড়ে ভেঙে নষ্ট হয়ে গেল। বিহঙ্গিনীর সে মহাদুঃখ। কেঁদে কেঁদে সে গলা ভেঙে ফেললে। তারপর লাগল বাসাখানি মেরামত করতে। বাসা মেরামত হল, কিন্তু ডিমের দুঃখ তার গেল না। হঠাৎ একদিন তার নজরে পড়ল—নদীর ধারে—একটি গাছের গোড়ায় কতকগুলি ডিম। তার বুকের লালসা একেবারে লক লক করে উঠল, বললে—কেউ যখন নাই—তখন নে—একটি ডিম নিয়ে পালিয়ে চল! ওর তো অনেক আছে; একটি গেলে বুঝতেও পারবে না। যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। ডিম দুটি ঠোঁটে নিয়ে বাসায় এনে—বুক দিয়ে ঢেকে তা দিতে আরম্ভ করলে। কি আনন্দ কি গান তার। হঠাৎ একদিন মাঝরাত্রে বুকের মাঝখানে কে যেন বিঁধিয়ে দিলে—একটা আগুনে পোড়ানো তপ্ত রাঙা একটা শলা। চীৎকার ক'রে পক্ষিণী পাখা নেড়ে উঠবার চেষ্টা করলে—কিন্তু তাও পারলে না, কে যেন পাক দিয়ে তাকে বন্ধন করলে। পক্ষিণী জিজ্ঞাসা করলে—কে রে নিষ্ঠুর? কে বললে—আমি তোর কাল। বিহঙ্গিনী সভয়ে দেখলে—তার চোখের সামনে—ছোট একটি ফণা মেলে একটি সাপের ছানা দুলছে। পক্ষিণী বললে—এ গাছের সর্বাঙ্গে কাঁটা—এ গাছ আকাশ ছুঁয়ে আছে। সাপ হয়ে তুই এলি কি ক'রে? কাল হেসে বললে—তুই নিজে আমাকে এনেছিলি হতভাগিনী, ঠোঁটে তুলে এনে—বুকের গরম দিয়ে আমাকে ডিম ফুটিয়ে বের করলি তুই। তাই তোর বুকেই বিষ ঢালতে হ'ল আমাকে।

ব্রজদাসী হাসিল—ঘরে ঢুকে ছেলেটিকে বুকের কাছে নিয়ে শুয়েছিলাম। মনে হয়েছিল কত আনন্দ—কত সুখ—কত আরাম।

* * *

ঘরের আরাম আছে—আনন্দ আছে—সুখ আছে। খাইয়া-দাইয়া-শুইয়া গভীর তৃপ্তিতে নিশ্চিন্ত হইয়া গাঢ় ঘুমে ঢলিয়া পড়িতে পড়িতে তাহার মনে হইল, এমন করিয়া নিজের ঘর সে কখনও পায় নাই। বৈকালে উঠিয়া তাহার মনে পড়িয়া গেল কয়েকটা জরুরী প্রয়োজনের কথা।

কেরোসিনের ডিবে একটা বুড়া আনিয়া দিয়াছে, কিন্তু মাটির প্রদীপ না হইলে সন্ধ্যা দিবে কিসে? ধুনুচী একটা চাই। ঘরে ঢুকিয়া সে ছোট একখানি যুগল মূর্তির ছবি—খান-চারেক ইঁট মাটি দিয়া গাঁথিয়া তাহার উপর কম্বলের ছোট আসন বিছাইয়া বসাইয়াছে। ছোট একটি কাঠের সিংহাসন তাহার চাই।

আজ সে গ্রামখানার ভিতরে প্রবেশ করিল।

ছোট গ্রাম। একখানা মাত্র মুদীর দোকান আছে। কিছুই পাওয়া গেল না। ফিরিয়া সে খানিকটা মাটি মাখিয়া প্রদীপ গড়িতে বসিল, উনানের আগুনে কোন রকমে শুকাইয়া লইয়া আজকার কাজটা সারিতে হইবে।

ওদিকে ছেলেটা কাঁদিতে শুরু করিল। বিব্রত হইয়া উঠিল সে।

দুধ গরম করিতে হইবে।

ওঃ—তিন-চারি দিনেই ছেলেটার গলায় জোর হইয়াছে। পলিতায় দুধ খাইয়া তৃপ্ত হইতে চাহিতেছে না। বাগ্দী মেয়েগুলির ইহার মধ্যেই এদিকে নজর পড়িয়াছে। স্তন দিবার ভান করিতে হইতেছে। সাবধানতা অবলম্বনের সে এতটুকু ত্রুটি করে না। ছেলেটাকে কোলে লইয়া সে ঘরের মধ্যে গিয়া বসে। বুকের অপুষ্ট স্তন-বৃন্ত ছেলেটার মুখে দিয়া সে নিজেও শিহরিয়া সারা হইয়া যায়, ছেলেটাও ওই অপুষ্ট বৃন্ত মুখে ধরে ব্যাকুল আগ্রহে, পরমুহূর্তেই আপনিই সে বৃন্ত মুখ হইতে খসিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত ক্ষোভে চীৎকার করিয়া ওঠে। সে চীৎকার তাহার আর থামিতে চায় না। পাড়ার মেয়েরা বলিতেছে—ছেলে তোমার আচ্ছা কাঁদুনে বষ্টুমী!

ছেলেটাকে সে কোলে তুলিয়া লইল। উনানে বসাইয়া দিল দুধের বাটি। পলিতা গড়িল, ছোট একটা বাটি বাহির করিল। সঙ্গে সঙ্গে মনটা তাহার কেমন তিক্ত হইয়া উঠিল। বাটিটা চন্দনের বাটি। অভাবে সেটাকেই ছেলেটার দুধের বাটি করিতে হইয়াছে।

ছেলেটার পেটে রাক্ষসের ক্ষুধা, চীৎকার করিয়াই চলিতেছে; বুকে ক্রমাগত মুখ ঘষিতেছে। কিন্তু আজ তাহার স্তন-বৃন্তে সে যন্ত্রণা অনুভব করিতেছে। তবু সে স্তন-বৃন্তটা তাহার মুখে গুঁজিয়া দিল।

—মা!

চমকিয়া উঠিল ব্রজদাসী। বাগ্দী বুড়া আসিতেছে।

বাগ্দী বুড়া একটা ভার কাঁধে বহিয়া প্রবেশ করিল। ভারটা একেবারে দাওয়ার উপর নামাইয়া দিল।

বিস্মিত হইয়া বষ্টুমী বলিল—এ সব কি! এত সব জিনিস!

বুড়া হাসিয়া বলিল—নন্দোচ্ছব মা। নানান জায়গা থেকে ভার-ভারোটা আসে। নিয়ে এলাম, তুলে রাখ।

—কত দাম লাগল বাবা? প্রশ্নটা করিয়া সে জিনিসগুলি দেখিয়া লইল; দেখিয়া সে হাসিল। বুড়ার হিসাব খুব! মাদুর, কম্বল, দুইটা ছোট-বড় বালিশ, মশারি পর্যন্ত একটা। সে নামাইতে বসিল। নিচে টুকরা জিনিস অনেক। বাটি, ঝিনুক, কাজল-লতা; একপ্রস্থ বাসন, খানিকটা মিছরী পর্যন্ত। একটা ডালা খালি করিয়া অন্য ডালাটা খালি করিতে গিয়া সে চমকিয়া উঠিল। দু'খানা নূতন তাঁতের মোটা কাপড়ের নিচে খানকয়েক পুরানো কাপড়। পুরানো কাপড় দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। বলিল—এসব তুমি কিনে আনলে বাবা? পুরানো কাপড় সুদ্ধ?

—তোমার কাপড় দু'খানি কিনেছি মা। বাকী—মিছে কথা তোমার কাছে তো বলব না মা, নেহাত দায়ে না পড়লে মিছে কথা আমি বলি না। বাকী জিনিস মোড়ল ভাইটি দিয়েছে। তোমাকে সে একটি ছুঁচ দেয় নাই মা। যা দিয়েছে—সে ওই ওকেই। বাসন ক'খানা পর্যন্ত ওর জন্যেই দিয়েছে।

বষ্টুমী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল।

—তোল তোল। তার ছেলেকে সে দিয়েছে—সে অধিকার—

—না-না-না। কোন অধিকার তার নাই এ ছেলের ওপর। নিয়ে যাও এসব—তাকে ফিরে দিয়ো।—ব্রজদাসীর চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল।

বুড়া বলিল—আমি যে বিপদে পড়লাম।

—কেন? ফিরে তুমি দিচ্ছ না বাবা, সে পাঠিয়েছে আমাকে, আমি ফিরে দিচ্ছি। ছেলে তার, এই বলে যদি সে দিতে চায়—তবে সে নিয়ে যাক্ তার ছেলে!

—আমি যে জোর করে আদায় ক'রে নিয়ে এলাম।

—কেন আনলে তুমি বাবা? ও আমি নোব না। আমার নাম ক'রে বলো তুমি, আমি ফিরিয়ে দিলাম। যা সত্যি তাই বলবে। বলবে—আমার মত না নিয়েই তুমি তার কাছে জিনিস চেয়েছিলে।

রতন হাত দুইটা উল্টাইয়া দিয়া বলিল—বেশ—তাই বলব। কিন্তু—

—কি? কিন্তু কিসের এর মধ্যে?

রতন দাঁত খিঁচাইয়া উঠিল—এর মধ্যে নয়, তোর মধ্যে।—চটিয়া গিয়াছে বুড়া। তুই-তুকারি শুরু করিয়া দিয়াছে। বুড়া বলিল—তুই এত ক্ষেপে উঠলি কেনে? আমাদের পাড়ায় একটা মা-কুকুর ছিল। সেটার বাচ্ছা হলে—আর তার কাছ দিয়ে যাবার জো থাকত না। শীতের দিন—চারটি খড় পেতে দোব—গরমে শোবে—ছানাগুলোকে নিয়ে—ভাল করতে গেলাম—তো সে হারামজাদী ভাবলে ছানা কেড়ে নিতে এসেছে—দিলে ঘ্যাঁক করে কামড়ে। তুই যে তাই করছিস!

বুড়া উঠিয়া চলিয়া গেল। ব্রজদাসী লজ্জিত হইল। কিন্তু যত লজ্জাই সে পাইয়া থাক নিজের আচরণে—ওই জিনিসগুলা সে কিছুতেই লইবে না, লইতে পারিবে না।

কিছুক্ষণ পর বুড়া আবার ফিরিয়া আসিল। মেজাজ অনেক ঠাণ্ডা এখন। বুড়া বলিল, যা বলবার তুমি বাপু মহেশ ভাইকেই বলো। সে আসছে একটা দুধালো ছাগল নিয়ে। তুমি কাপড় দুখানা তুলে নাও। ও দুখানা সে দেয় নাই, ও আমি কিনে এনেছি। আমি দিয়েছি।

ব্রজ কাপড় দুখানি তুলিয়া লইল।

বুড়া চলিয়া যাইতেছিল। তাহাকে সে ডাকিল, যেয়ো না বাবা। দাঁড়াও।

—কেন? আবার কি?

—সে লোকটিকে যা বলবার তোমাকেই বলতে হবে বাবা। তার সঙ্গে কথা বলব না। আমার আর কে আছে বল—তুমি ছাড়া?

—আমি ছাড়া আর কেউ নাই তোমার? বুড়া হাসিল এতক্ষণে।—তা হলে শোন মা। আমার পরামর্শ শোন। জিনিস তুমি ঘরে তোল। আমি তাকে বলব, জিনিসগুলির দাম তাকে নিতে হবে। দেবে তুমি ক্রমে ক্রমে। দু টাকা, চার টাকা—ভিখ-সিখ করে যখন যেমন পারবে ফেলে দেবে। কেমন?

ব্রজ বলিল—বেশ। তাই। এ তুমি খুব ভাল বলেছ বাবা।

—আমি ভাল কথাই বলি। লোকটি যে আমি সোজা নই। হা-হা করিয়া হাসিতে হাসিতে রতন চলিয়া গেল।

ব্রজদাসী ছেলেটাকে কোলে লইয়া জিনিসগুলার সামনে বসিয়া রহিল। তবু কেমন যেন

ভয় করিতেছে। সে চঞ্চল হইয়া উঠিল, আবার ঘর! পরের ছেলে লইয়া—! দশদিন পর বড় হইলে—ঐ লোকটা যদি—। সে আবেগে ছেলেটাকে বুকে চাপিয়া ধরিল।

ছেলেটা দুগ্ধহীন স্তন-বৃন্ত মুখে করিয়া আবার কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। নাড়া-চাড়া করিতেই আবার সে চুক্ চুক্ করিয়া স্তন-বৃন্ত আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ব্রজ যন্ত্রণার শিহরণে কুঁজা হইয়া গেল, প্রতিটি স্নায়ু-শিরাতে কিছু একটা যেন দ্রুতবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে; নাচিয়া বেড়াইতেছে যেন! সমস্ত শরীরে ঘাম দেখা দিয়াছে।

ঠিক এই মুহূর্তেই বুড়া আবার ফিরিল ছাগল লইয়া। বলিতে-বলিতেই ঢুকিল—তাই হ'ল মা। যা বলবে—তুমি—তাই হবে। সে ফিরে গেল।

উঠানে দাঁড়াইয়া সে ব্রজকে দেখিয়া বলিল—আহা মা! এবারে যেন ঠিক নন্দরাণীর মত লাগছে।

ব্রজ যেন অসাড় হইয়া গিয়াছিল—সে তবু নড়িয়া ছেলেটাকে বুক হইতে পৃথক করিয়া সোজা হইয়া বসিতে পারিল না।

রাত্রে ব্রজর জ্বর আসিল। বুক জুড়িয়া অসহ্য বেদনা।

রমনের মা হাসিয়া বসিল—ঠোনকার জ্বর মা। ও হয়।

*   *   *

দিন দুই পর—জ্বর ছাড়িলে সে স্নান করিল।

স্নান করিল সে একা; মেয়েদের সঙ্গে মিশিয়া ঘাটে গেল না। পাড়ার মেয়েরা গেল পুকুরে। সে গেল নদীতে।

ছোট নদী। ময়ূরাক্ষীতে গিয়া পড়িয়াছে কয়েক ক্রোশ দূরে;—নাম ডাহুকী। দুই পাশে নিবিড় বন—শিরীষ ও বাঁশ বন। তারই মধ্য দিয়া ছোট নদীটি বহিয়া গিয়াছে। ময়ূরাক্ষীর বুক বালিতে ভরিয়া উঁচু হইয়া ওঠায় বারো মাস জল থাকে। জল অবশ্য হাঁটু-খানেক, তবে মধ্যে মধ্যে দহ আছে। সেখানে জল থাকে সাঁতার। কিন্তু ভয় আছে। ছোট মেছো-কুমীর থাকে দহে—আর আছে নাকি ভয়ানক একটা কিছু, রক্ত-মাংসের জন্তু নয়, একেবারে খাঁটি পাথর—কিন্তু জীবন্ত। সেগুলি নাকি চলিয়া বেড়ায়—মানুষ পাইলে টানিয়া লয় এক মুহূর্তে এবং বুকে চাপিয়া বসিয়া রক্ত চুষিয়া খাইয়া ফেলে।

সেকালের বিশ্বাস একালে আর ঠিক চলে না। নানা জনে এখন নানা রকম কথা বলে; কেউ বলে—পাথরের খণ্ডের আকারের কোন জন্তু—যেমন শুশুক, এমন কিছু হইবে। কেহ বলে—গড়ানে পাথর জলের স্রোতে গড়াইয়া চলে—তাহার মুখে পড়িলেই মানুষ পড়িয়া যায়, চাপা পড়ে। যাই হোক, ডাহুকীতে মধ্যে মধ্যে মানুষ মরে কিছুর আক্রমণে—যাহাকে এখনও লোকে পাথর বলে। আগে মরিত বেশী। মেছো-কুমীরগুলা নিতান্তই ছোট আকারের—ওগুলা মানুষ কখনও মারে না, তবে আক্রমণ করে—কামড়ায়—লেজের আছাড় মারে। এই কারণেই এখানে নদীতে স্নান বড় একটা কেহ করে না।

ব্রজ আজ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমি সেদিন না জেনেই গিয়েছিলাম নদীতে স্নান করতে। রতন বুড়ো আমায় একটা কথা বলেছিল প্রভু, স্নান করতে গিয়ে সেই কথাটা মনে পড়ল। বুড়ো বলেছিল—মা বাজা গরু দেখে চিনতে পারি—গাছ দেখে চিনতে পারি—মানুষ দেখলে পারব না—এ কি হয়! মেয়েগুলো তোমার রূপ দেখে ভুলেছে, মিষ্টি গান শুনে

ভুলেছে। মনে যে কথা উঠেছে—সে কথা মনেই থেকে গিয়েছে মা। তাই ভয় হয়—মেয়েদের সঙ্গে ঘাটে গিয়ে স্নান করতে। ওরা যদি বুঝতে পারে—ও আমার নিজের নয়—ও আমার কুড়ানো, তাই নদীতে গেলাম। আপনার কাছে লজ্জা করব না প্রভু, সব কথা বলতে বসেছি—বলব—সব খুলেই বলব। স্নান করতে গিয়ে জলে নেমে—।

আজ স্নান করিতে গিয়া সে নিজের দেহের দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া গেল। নিজের দেহ সে তো না-দেখা নয়। এ যেন আর কারও দেহ! যত সে মুগ্ধ হইল—ভয়ও পাইল তত। সে জলে গলা ডুবাইয়া বসিয়া রহিল। চোখ হইতে অকারণে জলের ধারা গড়াইয়া আসিল। অনেকক্ষণ পর উঠিয়া শিশুটির ক্লেদ পরিষ্কার করা ন্যাকড়াগুলি তুলিয়া লইয়া বাড়ী ফিরিল।

ছেলেটা ঘুমাইতেছে। সে নিশ্চিন্ত হইয়া চুল ঝাড়িয়া চূড়া করিয়া বাঁধিল, আয়না সামনে রাখিয়া তিলক কাটিতে বসিল।

আয়নার মধ্যে নিজের মুখ দেখিয়া সে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল। এ কে? ইচ্ছা হইল ওই প্রতিবিম্বকে সে জিজ্ঞাসা করে—তুমি কে গা? কবে বাহির হইলে তুমি সূতিকাগার হইতে? ঠিক যেন শুক্লা দ্বিতীয়ার চাঁদের ফালির ক্ষীণ আলোয় পাণ্ডুর পশ্চিম আকাশের কোণের মত তাহার চেহারা হইয়াছে। মুখখানা পর্যন্ত যেন ভাঙিয়া গড়িতেছে কেহ। শীর্ণ হইয়া গিয়াছে তাহার সে নিটোল মুখ। রূপের এ পরিবর্তন তাহার ভাল লাগিল। ভারি ভাল লাগিল। চোখের দৃষ্টিতে আগে তাহার হাসির ছটা ছিল; আজ মনে হইল, সেখানে যেন কান্না টলমল করিতেছে।

দেবতার আসনের সম্মুখের স্থানটুকু নিকাইয়া বাসি ফুল ফেলিয়া দিয়া সে প্রদীপ জ্বালিল। বুড়া তাহাকে একটি পিতলের প্রদীপ দিয়াছে। প্রদীপ জ্বালিল—ধুনা জ্বালাইল, প্রদীপ ঘুরাইয়া প্রভুর আরতি সাড়িয়া উঠিতেছে—এই সময়টিতেই ছেলেটি সাড়া দিয়া উঠিল। সে ঘুরিয়া দেখিল—ছেলেটা জাগিয়াছে, পা গুটাইয়া এক হাতের মুঠা মুখে পুরিয়া চুষিতেছে অন্য হাতখানি কাঁপিতেছে। মিটমিট করিয়া সব যেন দেখিতেছে। বড় ভাল লাগিল আজ। হাসিয়া সে তাহাকে বলিল—এই তো লক্ষ্মী-সোনা জেগে উঠে খেলা করছে! কাঁদলে কি চলে, কাজ কি ক'রে হয় সংসারের?

হাতের আরতির প্রদীপটার শিখায় হাতের তালু গরম করিয়া তাহার কপালে দিয়া বলিল—নীরোগ হয়ে বেঁচে থাক!

উঠিতে গিয়া কি মনে হইল—প্রদীপটা তাহার মুখের সামনে ঘুরাইয়া দিল।

"সাঁঝের পিদীম নড়ে চড়ে—
যে আমার খোকনকে থোঁড়ে—
সে যেন এই আগুনে—পোড়ে।"

সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবীর আরও মনে পড়িয়া গেল—

"আরতি করে নন্দরাণী গোপাল মুখ হেরি—
গাওত নব নাগরীগণ বাথান সব ঘেরি।"

প্রদীপ রাখিয়া ওই কলি দুইটি গাহিতে গাহিতে নতুন কাজললতায় কাজল পাড়িতে বসিল।

এ যেন এক অপরূপ নেশা। এ নেশার ঘোর শুধু বাড়িয়াই চলে—কমে না, কাটে না।

বৈষ্ণবী মাতিয়া উঠিল। আবার যেন সব হাসিয়া উঠিল। ছেলেটা হাসিতে শিখিয়াছে, সে হাসে, চোখের সামনে প্রদীপ ঘুরায়—আলোর ছটার সঙ্গে সঙ্গে চোখের তারাটি ঘোরে—সে হাসে, কোলে তুলিয়া নাচায়—সে হাসে, মুখে মুখ ঘষে—সে হাসে, বৈষ্ণবীও হাসে—বৈষ্ণবী হাসে সরবে, খিল খিল শব্দে। নেশার ঘোরে দিন চলিয়া যায় জলের মত।

নতুন ঘর হইয়াছে, সে ঘরখানাকে বৈষ্ণবী এমন করিয়া সাজাইতে লাগিল যেন ঘরখানিকে সে হাসাইয়া তুলিবে। খড়ি-মাটি দিয়া লেপিয়াছে। খড়ি-মাটির লেপনের উপর মধ্যে মধ্যে গেরি-মাটির গোল মাড়ুলি দিয়া তাহার উপর তুলি দিয়া আল্পনা আঁকিয়াছে।

হঠাৎ একদিন নজর পড়িল—উঠানে সে নয়নতারা ফুলের চারা আনিয়া পুঁতিয়াছিল—তাহার তিন-চারিটি আধ হাত আন্দাজ বড় হইয়া উঠিয়াছে—দুইটির মাথায় দুইটি ফুল ফুটিয়াছে। একটির কুঁড়ি বোধ হয় কাল ফুটিবে।

সন্ধ্যামণির গাছগুলিতেও তেজ ধরিয়াছে। পাতাগুলি চওড়া হইতে শুরু করিয়াছে। একটিতে যেন কুঁড়ি উঁকি দিতেছে।

শুধু তাই নয়। তাহার অঙ্গন হাসিতে আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিল। তাহার কণ্ঠস্বরের খ্যাতি অঞ্চলটায় রটিয়া গেল। ময়ূরাক্ষীর এ অঞ্চলও অজয়ের তীরের মত বৈষ্ণব-তীর্থের মাহাত্ম্য-ধন্য। কয়েক ক্রোশ উত্তরেই মহাপ্রভু নিত্যানন্দের জন্মস্থান—একচক্রা মহাতীর্থ তাহারই কাছাকাছি—বীরচন্দ্রপুরে আছেন বাঁকা রায়। এ অঞ্চলেও আখড়া আছে অনেক। সদগোপ-প্রধান অঞ্চল; মধ্যে মধ্যে সমৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কায়স্থের গ্রামও আছে—কিন্তু অধিকাংশ গ্রামেই বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব বেশী। ব্রাহ্মণেরা তান্ত্রিক অনেকে আছেন—কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের উপর কোন ঘৃণা বা বিদ্বেষ নাই। বিশেষ করিয়া পদাবলী শুনিয়া কাঁদিয়া অন্তরখানাকে একবার ধুইয়া লইতে সকলেরই একটা তৃষ্ণা আছে। তাহারই জন্য ব্রজ বৈষ্ণবীর নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ব্রজ বলিল—আমার গুরু কথায় কথায় এই গানটি গাইতেন প্রভু—

"প্রেমের কাজল পরলি পাগল মনের নয়নে,
ওই কাজলের কালো ছটা লাগল জীবনে।
কালোই যে তোর হ'ল আলো—
আলোয় কালো রঙ বুলালো—
অন্ধ হলি দৃষ্টি গেলো—হায় এ ভুবনে।"

আমারও তাই হ'ল প্রভু। আমি সাধ করে পরের ছেলে কোলে ক'রে মা সেজে বসলাম। মনে হ'ল—আমি আমার সব পাওনাগণ্ডা পেয়ে গিয়েছি; তাকেই মূলধন ক'রে কারবার আরম্ভ করলাম। আঁটসাঁট করে ঘর বাঁধলাম—সংসার পাতলাম। খেয়েদেয়ে দুলালকে ওই বাগ্দীবুড়ীর কাছে রেখে বেরিয়ে যেতাম—ভিক্ষে করতে।

ব্রজ ভিক্ষায় যাইত, গৃহস্থেরা কাজ-কর্ম ফেলিয়া গান শুনিত। একটা গৃহস্থ-বাড়ীর দরজায় খঞ্জনী বাজাইয়া বসিয়া গেলেই—সাড়া পড়িয়া যাইত—সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার বাড়ীতে বাড়ীতে খবর পৌঁছিত—মেয়েরা সব ছুটিয়া আসিয়া বসিয়া যাইত,—গান গাহিয়াই চলিত—দু'খানা—চারখানা। ফিরবার পথে চণ্ডীমণ্ডপে অথবা বাবুদের বৈঠকখানার সামনে বসিয়া গান শুনাইতে

হইত। বাড়ীতে ফিরিয়া দেখিতে পাইত একজন দু'জন বৈষ্ণব বাবাজী বসিয়া আছেন। বলতেন—মা-জী এখানে এসে আখড়া তুলেছেন শুনেছি, শুনেছি মা-জীর কণ্ঠের নাম-গানে পাষাণ কাঁদে। শুনতে বড়ই ইচ্ছা, তা প্রভুর ইচ্ছে না হলে তো তা হয় না। প্রভুর ইচ্ছেয় আজ এসে পড়েছি। রতন বাবা আমাদের জানেন। বাবা আমাদের মায়ের ভক্ত পাগল মানুষ ; তা বেশ করেছেন—মহতাশ্রয়ে আছেন।

বাগ্দী বুড়া হাসিত। অকপট, অসঙ্কোচ হা-হা করিয়া হাসি। মহৎ বলিলেও লজ্জিত হইত না—অহঙ্কৃত হইত না, নিন্দা করিলেও ক্ষুব্ধ হইত না, রাগিত না। সে-ই বৈষ্ণবীর অতিথি সৎকারের একটা ভার গ্রহণ করিয়াছিল। ছোট তামাক—বড় তামাক—যে তামাকের রসিক যত জন আসুক সে-ই যোগাইত সব। পয়সা দিয়া তামাক কিনিত না বুড়া। ক্ষেতে লাগাইত রঙপুরী তামাক। আর ডাহুকীর তীরে জঙ্গলের মধ্যে লাগাইত গাঁজার গাছ। বুড়ার ওই পাগল খ্যাতির জন্যই চৌকিদারে জানিয়াও কিছু বলিত না। পুলিস আসিবার খবর থাকিলে সে-ই আসিয়া খবর দিয়া যাইত।

—হঠাৎ সেদিন এলেন আপনি।

বাবাজী বিষণ্ণ মৃদু হাসিয়া বলিলেন—মনে আছে। মহেশকেই সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম।

—হ্যাঁ। আপনার নাম শুনেছিলাম। আপনার ওই আখড়ার কত গল্প শুনেছিলাম। দেখতে সাধ হ'ত কিন্তু সাহস হ'ত না। লোকে বলত—ইংরিজী লেখাপড়া জানা লোক—আগে ছিলেন হাকিম, হঠাৎ সব ছেড়ে দিয়ে মানগোবিন্দপুরে আখড়া তুলে—গোবিন্দের শরণ নিয়েছেন। ভয় হ'ত—ইংরিজী জানা হাকিম বোষ্টম বাবাজী হয়েছে কিন্তু সে মন কি ছাড়তে পেরেছে? আবার সাধও হ'ত। হঠাৎ সেদিন আপনি এলেন। সঙ্গে মহেশ মণ্ডল। রতন বুড়ো এসে ডাকলে। বুকটা গুর গুর করে উঠল। তবু গুরুর নাম নিয়ে—আর দুলালকে কোলে নিয়ে বেরিয়ে এসে প্রণাম করলাম। আপনি বললেন—তোমার দোরে হরি বলে এসে দাঁড়িয়েছি। নামের ভিখিরী হয়ে।

বাবাজী বলিয়াছিলেন—শুনেছি তোমার কণ্ঠে নাকি সুধা আছে—বৈষ্ণবী, নামের সুধা—কণ্ঠের সুধা দুইয়ে মিলে শুকনো গাছে ফুল ফোটায়। বাঁশীতে নূপুরের ধ্বনির রেশ শোনা যায়। চোখে দেখছি রূপ—তুমি ভাগ্যবতী।

ব্রজদাসী লজ্জিত হইয়াছিল। সবিনয়ে হাত জোড় করিয়া বলিয়াছিল—আমি সামান্য বৈরাগী বোষ্টমের মেয়ে প্রভু। ওসব কথা আমাকে বললে—আমার অপরাধ হয়। ভগবান রূপ দিয়েছেন—তাতে কালো দাগ ধরেছে বয়েসের সঙ্গে, কোলে এই দেখুন—আমার ফুল ফল হয়ে গিয়েছে।

—বেশ তো। ওই ফলে সাজিয়ো প্রভুর নৈবেদ্য। প্রভুর লীলায় কি শুধু রাধাই আছেন? মা যশোমতী নাই?

ব্রজদাসী বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ইংরাজী জানা বাবাজী বলিয়াই হয় তো এমন নূতন মধুর কথা শুনাইতে পারিলেন তাহাকে।

মহেশ মণ্ডল নীরবে বসিয়া সব শুনিতেছিল, আঙুল দিয়া মাটি খুঁড়িতেছিল।

বাবাজী তাহাকে বলিলেন—তুমি এত নীরব কেন মহেশ?

বাগ্দী বুড়া হা-হা করিয়া হাসিয়া বলিল—রব সময়-বিশেষে হ'রে যায় বাবাজী। ঠাই-বিশেষেও হরে। আবার মানুষ-বিশেষে তার সামনেও হরে। কিম্বা হয়তো মনের মধ্যে

কোন ভাব উঠেছে আর কি! সুখ হোক, দুঃখ হোক—উঠেছে কিছু!

বাবাজী হাসিয়া বলিলেন—কি ব্যাপার মহেশ?

বুড়া বলিল—ওই দেখ! যে দরজায় ধাক্কা দেবে দাও গোঁসাই—মানুষের ভাবের ঘরটি হল আসল ঘর—ওখানে ধাক্কা মেরো না। লাও গো মা—গান শোনাও বাবাজীকে!

গান শুনাইবার আগেই সে একটা কাণ্ড করিয়া বসিল। কি জানি কেন, লোকটির প্রতি আজ আর সে কিছুতেই রাগ করিতে পারিল না। বরং খানিকটা যেন দুঃখ হইল। সে ছেলেটিকে ভালো করিয়া তাহাকে দেখাইবার সংকল্প করিল। দেখিয়া যাক। কেমন হইয়াছে —কত সুন্দর হইয়াছে একবার দেখুক। বাবাজীকে সে বলিল—একটু বসুন প্রভু।

গান শেষ করিয়া খঞ্জনী রাখিয়া সে চোখ মুছিয়া বলিল—আজ আর আমি পারব না প্রভু!

বাবাজী বলিলেন—আমিও আর শুনতে চাইব না। এর বেশী আর কি শুনব?

ব্রজ বলিল—ও কথা আপনিই বলতে পারেন বাবা। কত বড় মহাজন আপনি। শুনেছি তো সব।

—কি শুনেছ? বড় চাকরি করতাম?

ব্রজ একটু লজ্জিত হইল। বাবাজী হাসিয়া আবার বলিলেন—বেশ তো, তোমার ছেলেকে ইংরিজী লেখাপড়া শেখাও, ও-ও বড় চাকরি করবে। আমি যদি বেঁচে থাকি তবে যাতে চাকরি পায় তোমার ছেলে—সে চেষ্টা আমি করব। আর আজ নিয়ে এস ওকে—মাথায় হাত দিয়ে সেই আশীর্বাদ করে যাই। আন ওকে।

ব্রজ স্থির দৃষ্টিতে বাবাজীর দিকে চাহিয়া রহিল।

বাবাজী বলিলেন—ভাবনায় পড়ে গেলে?

ব্রজ আরও কিছুক্ষণ ভাবিল। তারপর বলিল—ওকে কি আশীর্বাদ করবেন সে আপনি জানেন বাবা। আপনি আমাকে আশীর্বাদ করে যান—আমি যেন ওকে রেখে ব্রজগোপালকে পাই।

বাবাজী বলিলেন—ও পাওয়া-না-পাওয়া তোমার হাতে। মানুষের আশীর্বাদে মানুষ ধন পায় সম্পদ পায়—জ্ঞান পায় বুদ্ধিও পায়, কিন্তু যা চাইলে তুমি তা পাওয়া যায় না। ব্রজগোপাল পাওয়া যায়—দেওয়া যায় না। তবে চাইলে তুমি পাবে।

—এই আমার ঢের বাবা—এই আমার ঢের।

বাবাজী আবার বলিলেন—দুঃখ তুমি পেয়েছ—মুখে তার ছাপ রয়েছে। তার বদলে দুঃখ দিয়েছ কিনা জানি না। মুখ দেখে মনে হচ্ছে দাও নি। ওই তো চেয়ে পাওয়ার সব চেয়ে বড় দাবী গো! দয়া করে কাকে? দয়ার হকদার একমাত্র দুঃখীতেই যে! অন্নবস্ত্রের দুঃখের কথা তো নয়। ওটা আলাদা। আপন জনের অভাবে যে দুঃখ পায়—আপন জনে যাকে দুঃখ দেয়—সেই তো আসল দুঃখ। ও দুঃখ মানুষে ঘোচাতে পারে না বলেই তাকে বোঝাতে হয়। হক হয়েছে তোমার। তবে চেও। ভাল করে চেও। না চাইলে পায় না।

বাগ্দী বুড়া এতক্ষণ ঝিমাইতেছিল, গাঁজার দমটা তাহার আজ বোধ হয় বেশী হইয়াছে। এই কথাটা তাহার কানে যাইতেই কিন্তু সে হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—ঠিক বলেছ গোঁসাই। কানা কুকুর মাড়ে সন্তুষ্ট, পোষা কুকুর এঁটোয় তুষ্ট, কেড়েখাকী হাঁউ ক'রে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে—হাঁড়ি-কুড়ি বেবাক মেরে দিয়ে চলে যায়। দেখ না কেন আমার অদেষ্ট! পাথর পেয়ে ভাবলাম—রতন পেলাম। ফাঁকি—একদম ফাঁকি, গোঁসাই একদম ফাঁকি। কাঠের গুঁড়িতে ঢেঁকি করলে কাজ হয়—ধান ভানে। পোড়ালে পোড়ে। লাঙ্গল করলে মাটি

চষে। ঠাকুর করলে কি হয়? কচু! কচু! আবার হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বুড়ার হাসিতে পাড়াটা গম্-গম্ করিয়া উঠিল। বষ্টুমী শিহরিয়া উঠিল, বলিল—ছি বাবা! ও-সব কথা বলতে নাই।

বুড়া রক্ত-রাঙা চোখ দুইটা মেলিয়া বলিল—কচু জানিস তুই। তুই তাহ'লে মরবি।

মুহূর্তে বিবর্ণ হইয়া গেল বষ্টুমীর মুখ।

বাবাজী উঠিবার সময় বলিলেন—একটা কথা তোমাকে বলবার ছিল। একদিন এস আমার প্রভুর আখড়ায়। কেমন? গান শুনিয়ে আসবে।

এগার

উদ্বেগ হইয়াছিল। বাবাজী বলিলেন—একটা কথা তোমাকে বলবার ছিল!

কি কথা? ওই মহেশ মণ্ডল বাবাজীর শিষ্য। সে কি গুরুকে বলিয়াছে? বলিয়াছে—দুলাল তাহার দুলাল নয়! বলিলে ক্ষতি হয়তো নাই—কিন্তু না—; মন তাহার—না বলিয়া উঠিল। রতন বুড়া জানিয়াছে—পৃথিবীর আর কেউ জানিলে—সে সাক্ষী হইয়া দাঁড়াইবে। দুলাল তাহার নয়—এই কথা বলিয়া সাক্ষী দিবে!

যাই-যাই করিয়াও তাই যাওয়া হইয়া উঠিল না। সংসারে ছোট ছোট কাজগুলি বড় হইয়া উঠিল। কতদিন ভিক্ষায় মানগোবিন্দপুরের দিকের গ্রামের পথে বাহির হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া ফিরিয়া আসিল। পথ বদল করিয়া অন্যদিকের গ্রামের মুখে পথ ধরিল।

একদিন মহেশ আসিয়া দাঁড়াইল।

চোরের মত—মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ভাল আছেন?

হাসিয়া ব্রজ বলিল—ভালই আছি। আমার দুলালও ভাল আছে। দেখবেন আমার দুলালকে?

মহেশ বলিল—ভগবানে মতি আছে আপনার, পুণ্য ছাড়া আপনার জীবনে পাপ নাই—আপনার দুলাল ভাল থাকবে না?

ব্রজ দুলালকে কোলে লইয়া—দোলাইয়া চুমা খাইয়া—বুকে চাপিয়া বলিয়াছিল—কথা বলছে এইবার। আও আও ক'রে—কত কথা!

মহেশ একবার কোলে লইবার বাসনাও প্রকাশ করে নাই, ব্রজও দেয় নাই। কিছুতেই তাহার বলিতে মন উঠিল না—একবার নেবেন আমার দুলালকে?

মহেশ বলিল—বাবাজী আপনাকে যেতে বলেছিলেন—কই গেলেন না?

—রাস্তা যে অনেকটা দু ক্রোশ—আড়াই ক্রোশ পথ।

কথাটা নিতান্তই একটা তুচ্ছ অজুহাত। বলিয়া নিজেই অপ্রস্তুত হইল।

ভিখারিণী বৈষ্ণবী—পথ হাঁটিতে কষ্ট! ছেলেবেলায় মায়ের সঙ্গে কত হাঁটিয়াছে! হাঁটিয়া নবদ্বীপ গিয়াছিল। তারপর প্রথম যৌবনে হাঁটিয়াছে কত তাহার ঠিকানা নাই। সঙ্গে ছিল গুরু। বাউল বুড়ার সঙ্গ ধরিয়া ঘুরিতেছিল সে—হরিণী যেমন তৃষ্ণায় জলের সন্ধানে ঘোরে তেমনি করিয়া।

ঘুরিতে ঘুরিতে—গুরু সঙ্গ ছাড়িলেন। চলিয়া গেলেন নিজের তৃষ্ণার জলের সন্ধানে।

সে সন্ধান তিনি তখন পাইয়াছেন। তার পর একা সে ঘুরিয়াছে। ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন হঠাৎ একজনের সঙ্গে দেখা হইল। তাহার হাতে ছিল জলের ভৃঙ্গার। সেই জল সে পান করিল, যে জল দিল—তাহার ওই মায়া-মন্ত্রপড়া জল খাইয়া পোষ-মানা জীবের মত তাহার অনুসরণ করিল। কত পথ তাহার পিছনে-পিছনে হাঁটিয়াছে তাহার হিসাব নাই। হিসাব করিলে বোধ হয় শতেক যোজনের তো কম হইবে না। তাহার মায়া-মন্ত্রপড়া জলের জাদু যেদিন কাটিল, সেদিন অনুভব করিল—জল সে একবিন্দু পায় নাই, পাইয়াছে জাদুর ঘোরে জলের বদলে নেশার পানীয়—সেদিন আবার পথের বাহির হইয়া যে পথটা হাঁটিয়াছে সেটা যে গোটা জেলাটা। সে কথার খানিকটা তো সে মহেশকে সেদিন রাত্রে বলিয়াছিল। আজকাল যে সে ভিক্ষা সাধিয়া বেড়ায়—সেও যে অনেক! লজ্জিত হইয়া সে তাড়াতাড়ি বলিল—যাব—যাব একদিন।

তারপর বলিল—তিনি জানেন—?

—কি ?

—দুলাল যে আমার নয়—?

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মহেশ বলিল—না।

—গুরুর কাছে বলেন নি ?

মহেশ একটু হাসিল। বলিল—না। পারি নি।

ব্রজ বলিল—নিতান্ত খাপছাড়া উত্তর দিয়া বলিল—যাব, বলবেন প্রভুকে, শিগ্‌গীর যাব একদিন।

খোকনকে লইয়াই যাইবে স্থির করিল। এই তো ক্রোশ-দুয়েক পথ, কেউ কেউ বলে আড়াই ক্রোশ কিন্তু তা নয়, তাহারা বাড়াইয়া বলে ; দুই ক্রোশ পথ—প্রহরখানেক বেলা হইতে-না-হইতে পার হইয়া যাইবে। একটু রৌদ্র হইবে—তা হোক—একখানা গামছা খোকনের মাথায় চাপাইয়া দিবে।

কিন্তু ঠিক আগের দিনই আউলি-বাউলি বাতাস আরম্ভ হইল, আকাশে মেঘ ঘটা-পটা করিয়া চলা-ফেরা শুরু করিল। বাগ্দী-পাড়ায় চাষী কৃষাণেরা মাথালি পাতিয়া মেরামত শুরু করিল, কড়া তামাকের পাতাগুলি শুকাইয়া রাখিয়াছিল, সেগুলি পাড়িয়া কাটিয়া ফেলিল—গুড় দিয়া মাখাইল। যাহাদের চাল মেরামত হয় নাই, তাহারা খড় দিল চালে। আউলি-বাউলি বাতাস বহিতেছে—কাটা কাটা মেঘ রাত্রের আকাশে চলিতেছে ; দু'-চার দিনের মধ্যেই 'দেবতা নামিবেন'। বৈষ্ণবী নিজেও জানে এ সব কথা। যাওয়া বন্ধ করিতে হইল এই কারণেই। ছোট একটা গোয়াল-ঘর করিয়াছে—সেটা এখনও ছাওয়া হয় নাই। নতুন দেওয়ালে জল পড়িলে গলিয়া যাইবে গুড়ের পাটালির মত!

ঘর ছাওয়া হইল। বর্ষা নামিল। আবার মাসখানেক পর যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইল। আকাশে মেঘ তখন ধরিয়াছে ; শরতের রৌদ্র দেখা দিয়াছে। মনে মনে—"যাও যাও গিরি—আনিতে গৌরী" গানের সুর গুন গুন করিয়া গুঞ্জন করিতে শুরু করিয়াছে ; বসন্ত ঋতুতে কোকিলের গলায় পঞ্চমসুর যেমন জাগিয়া ওঠে, গান গাহিয়া ভিক্ষা মাগিয়া জীবনধারণ করে যাহারা তাহাদের গলাতেও ঋতুতে ঋতুতে বিশেষ ভাবের গানগুলি তেমনি ভাবে সাড়া দিয়া উঠে। ওই গান গাহিতে গাহিতেই সে বাবাজীর আখড়ায় গিয়া উঠিল।

মনোরম আখড়া। হইবে না কেন ? বাবাজী তো ভিক্ষুক নন। তিনি বৈষ্ণব কিন্তু ভিক্ষা করেন না। শিষ্য-সেবক আছে, তাহারা দেয় কিছু কিছু ; আর নিজে তিনি জমি-জমা

কিনিয়াছেন ঠাকুরের নামে। পাকা বাঁধানো আঙিনা, সুন্দর ছোট মন্দির ; চারিদিকে ফুলের গাছ। মালতী-লতায় তখন ফুল ধরিয়াছে। সাদা ফুলে ঝলমল করিতেছে, গন্ধে চারিদিক ভুরভুর করিতেছে। মৌমাছি ভ্রমরের গুনগুনানিতে যেন একসঙ্গে পাঁচ-সাতটা একতারার তারে ঝঙ্কার উঠিতেছে। নিবিড়-পল্লব একটা বকুল গাছের মধ্যে কোথায় বসিয়া একটা হলুদমণি পাখী ক্রমান্বয়ে ডাকিয়া চলিয়াছে—গেরস্তের খোকা হোক! গেরস্তের খোকা হোক! গেরস্তের খোকা হোক! এ ছাড়া চারিদিকে ঝিল্লীর একটানা ডাক প্রবাহের মত বহিয়া চলিয়াছে ; কোন উদাসিনী যেন গুনগুনানি গুঞ্জরণে মনের গান গাহিতেছে। বষ্টমী পাখীটাকে উদ্দেশ করিয়া হাসিয়া বলিল—মরণ, ও ডাক ডাকতে এখানে কেন ? যা না গেরস্ত-বাড়ীতে।

বাবাজী থাকেন একখানি ছোট্ট মাটির ঘরে। একখানি কুঠরী, কোনমতে মানুষ দাঁড়াইতে পারে তেমনি আয়তনে ছোট। মেঝেটি বাঁধানো। কম্বলের বিছানার তলায় দু'খানা ইট দিয়া বালিশ। সামনের দাওয়াটি প্রশস্ত। লোকজন আছে—বসে, আলাপ-আলোচনা হয়।

বাবাজী নীরবে বসিয়া ব্রজদাসীর পুরানো কথাগুলি শুনিতেছিলেন—মুখে বিষণ্ণতার ছায়া পড়িয়াছে, চোখ দুটি বেদনায় ম্লান হইয়া উঠিয়াছে। এতক্ষণে মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন—সে দিনের কথা—আমারও মনে আছে। তুমি পাখীটাকে স্নেহের সঙ্গেই তিরস্কার করলে—কথাটা আমার কানে গেল। কণ্ঠস্বরের মিষ্টতায় মনে হ'ল—এ নিশ্চয় সেই বৈষ্ণবী; বেরিয়ে এলাম—দেখলাম অনুমান আমার মিথ্যে নয়। মা যশোদার মত বসে আছ—দুলালকে কোলে নিয়ে। দুরন্ত দামাল কালো ছেলে। আমি তোমাকে যা বলেছিলাম—তাও আমার মনে আছে। বলেছিলাম—ওকে তুমি মিথ্যে তিরস্কার করছ গো বৈষ্ণবী, ও তো এখানে ওই কথা ব'লে ডাকে না, ও কথা ও গেরস্ত-বাড়ীতেই বলে, সেখানকার বউদের মেয়েদের মনের কথা ও বুঝতে পারে। এখানে ও অন্য কথা ব'লে ডাকে।

ব্রজ বলিল—হ্যাঁ। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—এখানে তাহলে ও কি কথা বলে প্রভু ? আপনি বলেছিলেন—এখানে যারা থাকে তাদের মনের কথা ও সব বুঝতে পারে গো। বুঝে দেখ তোমার মনের কথা, মিলিয়ে দেখ, মিলে যাবে। ও এখানে বলে—কৃষ্ণ কোথা হে! আমি চমকে উঠেছিলাম। সে দিন মিছে কথা বলেছিলাম আপনাকে। লজ্জায় সত্যি কথা বলতে পারি নি। আমার মনে হয়েছিল সেদিন—পাখী বলছে—'খো-কা বেঁ-চে থাক্'! আপনি দেখতে পাননি আমার সে চমক।

বাবাজীর চোখ এড়াইয়া গিয়াছিল।

তিনি সে-সময় একদৃষ্টে দেখিতেছিলেন—দামাল দুলালকে। সুস্থ সবল কালো রঙের দামাল শিশু—মায়ের কোল হইতে নামিয়া—নাটমন্দিরের আঙিনায় হামা দিয়া ছুটিয়া বেড়াইবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল।

ওই চমকিয়া-ওঠাটুকুর সত্য গোপন করিবার জন্যই বৈষ্ণবী কৃত্রিম রাগ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিল—আঃ! ছেলে যেন দস্যি। নামবে, ধুলো ঘাঁটবে, মাটি খাবে। বাপরে, বাপরে!

হাসিয়া বাবাজী বলিয়াছিলেন—এই তো শুরু বৈষ্ণবী।

—কি বললেন প্রভু ? কথাটা যে বুঝলাম না।

—আগে ওকে ছেড়ে দাও ; ও থাকবে না কোলে। মা—যশোদা অনেক বাঁধন দিয়ে

গোপালকে বাঁধতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেন নি। দাও, ওকে খেলা করতে দাও।

দুলালকে নাটমন্দিরে নামাইয়া দিয়া ব্রজ বলিয়াছিল—নে তবে গোবিন্দের আঙিনায় গড়াগড়ি দে, গোবিন্দ তোর সকল মন্দ দূর ক'রে দিন।

বাবাজী সস্নেহে বলিয়াছিলেন—নামটি বড় ভাল দিয়েছ—দুলাল। আমি কিন্তু একটু বদল ক'রে দোব। শুধু দুলাল নয়—ব্রজদুলাল।

ব্রজ লজ্জাও পাইয়াছিল, পুলকিতও হইয়াছিল।

বাবাজী বলিয়াছিলেন—কতদিন প্রত্যাশা করেছি যে তুমি আসবে। কিন্তু এস নি। আজ আমি খুশী হয়েছি—তুমি এসেছ।

অপ্রস্তুত হইয়া ব্রজদাসী বলিয়াছিল—আসা কি সহজ কথা প্রভু! পা বাড়াই আর বাধা পড়ে।

—তা হ'লে তুমি বত্রিশ বন্ধনে বাঁধা পড়েছ!

বত্রিশ বন্ধন অর্থে সংসারের মায়ার বন্ধন; বত্রিশ নাড়ির বন্ধন।

হাসিয়াছিলেন বাবাজী—বলিয়াছিলেন—ভাল ভাল। বন্ধন সত্য না হ'লে মুক্তিও সত্য হয় না। রসে যখন মজতে হয় তখন রসগোল্লার মত ডুব দিয়ে মজাই ভাল।

তিনি উঠিয়া পড়িয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন—এখানেই থাক, এ-বেলা প্রসাদ পাও, ও-বেলা গান শোনাবে, সন্ধ্যার পর তোমাকে লোক সঙ্গে দিয়ে পাঠিয়ে দেব।

—কি বলবেন্ বলেছিলেন যে!

—সেও বলব তখন।

প্রসাদ পাওয়ার পর বাবাজী তাহাকে বলিলেন—রতন বুড়ো সম্পর্কে একটু সাবধানে থেকো।

—কেন? চমকিয়া উঠিল বৈষ্ণবী।—ও তো মানুষ খুব ভাল! লোকে বলে—আপনিও বললেন সেদিন—

বাধা দিয়া বাবাজী বলিলেন—সে কথাও মিথ্যা নয়, এ কথাও মিথ্যে নয়। মধ্যে মধ্যে ও পাগল হয়। সত্যি সত্যিই পাগল হয়। তাই সাবধান হতে বলছি।

—পাগল হয়?

—হ্যাঁ। তখন ও ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। আগে পাগলামি উঠলে ঘর ছেড়ে চলে যেত। ঘুরত নিরুদ্দেশ হয়ে। ওটা ওর সাধন-যোগ। কিন্তু যোগে শেষ পর্যন্ত থাকতে পারত না—খুব অসুখে পড়ত—তার পর ভাল হলেই পালিয়ে আসত। আবার পালাত বছর কয়েক পরে। এখন একেবারেই পাগল হয়ে যায়, ঘর থেকে পালায় না, বাড়ীর সকলকে ঘর থেকে দূর করে দেয়। বলে—সকলকে ছেড়ে বনে পালানোর চেয়ে সবাইকে দূর ক'রে দিয়ে ঘরকেই বন বানিয়ে নাও।

স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূ-পৌত্র—সব তখন পালায়। নইলে দা' নিয়ে কাটতে যায়।

—দা' নিয়ে কাটতে যায়?

—হ্যাঁ, বলে ঘর ছেড়ে পথে বেরুতে হবে কেন, তোরা দূর হলে ঘরই আমার পথ হবে। কখনও কখনও বলে—হ্যাঁ, থাকতে দিতে পারি—কিন্তু একজনকে কাটতে দিতে হবে। মায়ের কাছে বলিদান দোব। একবার একটা নাতিকে কাটতে নিয়ে গিয়েছিল। শেষে লোকজনে বেঁধে ধ'রে রাখে—তবে রক্ষা।

—কিন্তু আমাকে—

—হ্যাঁ। তোমাকে নিয়েও পড়ে যদি সেই ভেবে বলছি। তোমাকে ভালবাসে—ওই তোমাকে বসবাস করিয়েছে। তোমাকে নিয়ে পড়াও বিচিত্র নয়। তন্ত্র নিয়ে সাধনার ওই বিপদ!

—তবে? তা'হলে আমি কি করব?

—অন্যত্র আশ্রম বাঁধ। বল তো আমি চেষ্টা করি। একটু ভাবিয়া বলিলেন—মহেশকে তো দেখেছ। লোকটি সম্পন্ন অবস্থার গৃহস্থ। ও একটি আখড়া করতে চায় গ্রামে—

কথার মধ্যস্থলেই ব্রজদাসী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—না।

তাহার কণ্ঠস্বরে একটু চকিত হইয়া বাবাজী বলিলেন—তুমি রাগ করলে? রাগ করবার কথা তো বলি নি।

ব্রজদাসী অপ্রতিভ হইয়া বলিল—না-না। রাগ নয়। মোড়ল কি আপনাকে ওই কথা বলেছে নাকি?

—আখড়া করে প্রভুর সেবা প্রতিষ্ঠার সাধ ওর অনেক দিনের। মধ্যে মধ্যে বলে।

—সে কথা নয়। আমি বলছি আমার কথা।

—তোমার কথা ও কেন বলবে। আমি বলছি সব দিক ভেবে।

ব্রজদাসী হাত জোড় করিয়া বলিল—তার চেয়ে আপনার এই আশ্রমে আমাদের মা-বেটাকে একটু ঠাঁই দিন না।

বাবাজী চুপ করিয়া রহিলেন। উত্তর দিলেন না।

—প্রভু! ব্রজদাসী আবার তাঁহাকে ডাকিল।

—না।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বৈষ্ণবী বলিল,—আমার কি কোন অপরাধ আছে প্রভু?

—তা খানিকটা আছে বই কি? তোমার রূপ আছে ব্রজ!

বৈষ্ণবীর মুখ লাল হইয়া উঠিল। ছেলেটিকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিল—ও কথা আমাকে শুনতে নাই প্রভু, আমার পাপ হয়। গোপাল আমার কোলে।

—শুনতে চাইলে ব'লে বললাম। মিথ্যে বলারও তো পাপ আছে!

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বৈষ্ণবী বলিল—আমি উঠব প্রভু!

—উঠবে? ভয় পেলে? হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—না, সে ভয় ক'রো না। সব কথা তো বলতে পারলাম না। বললে বুঝতে।

বৈষ্ণবী উঠিয়া দাঁড়াইল।

বাবাজী বলিলেন—বস। আর একটা কথা বলব। প্রভুর নাম নিয়ে বলছি—ভয় নাই তোমার।

বৈষ্ণবী বসিল না, দাঁড়াইয়াই বলিল—বলুন, কি বলবেন!

বাবাজী বলিলেন—মন্ত্র বদল—ইষ্ট বদল বড় কঠিন বৈষ্ণবী। তুমি এখনও পার নাই।

চমকিয়া উঠিল বৈষ্ণবী। স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। বাবাজী বলিয়াই গেলেন—রামপ্রসাদের গানটি বড় ভাল—মা হওয়া কি মুখের কথা?

ব্রজ এবার বসিয়া পড়িল।—কেন? এ কথা বলছেন কেন?

বাবাজী বলিলেন—বুঝে দেখ।

ব্রজ একদৃষ্টে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

বাবাজী বলিলেন—তুমি যে ভাবের ব্রজে যাবার মন করেছ—সে ভাবের ঘোরে যদি ভোর

হ'তে পারতে—তবে যে পৃথিবীর সব তোমার কাছে ওই তোমার দুলালটি হয়ে যেত গো। তা হ'লে কি রূপের কথায় তুমি লজ্জা পেতে? আমি যুগল ভাবের ভাবী, আমি যদি ওই ভাবে ভোর হতে পারতাম—তবে কি তোমার রূপকে ভয় করতাম। ওরই মধ্যে যে আমি তাঁকেই পেতাম গো। শ্রীমতী আমার শ্যামকে ভালবেসে জগৎ দেখেছিলেন শ্যামরূপে ময়-ময়। তমালকে দেখে শ্যাম ব'লে জড়িয়ে ধরতেন। সেই তো প্রেম—সেই তো পাওয়া।

ব্রজ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। এই পাওয়ার কথায় তাহার মন উদাস হইয়া উঠিল। মনে মনে অনেকদিন পর প্রশ্ন জাগিল—এ কি করিল সে? এ কোন মায়ায় আবদ্ধ হইয়া কোথায় চলিয়াছে? মনে পড়িল বৃন্দাবন যাত্রার সঙ্কল্পের কথা। তাহার ইচ্ছা হইল এই মুহূর্তে বাবাজীকে সব কথা খুলিয়া বলিয়া প্রশ্ন করে—এ আমি কি করলাম? কিন্তু তাহার পূর্বেই—বাবাজী বলিলেন—রতন বুড়ো যত দিন সুস্থ আছে তত দিন থাক ওখানে। ভালো লোক, পুণ্যও আছে। তবে যদি বোঝ—কেমন ভাবগতিক—তুমি চলে যেয়ো।

—কোথা যাব?

—সে তো বলা মুশকিল। আচ্ছা, তখন এখানে এস—আমি ভেবে রাখব কিছু।

* * *

ব্রজ আজ বার বার আক্ষেপ করিয়া বলিল—আঃ! আমি যদি সেদিন সব কথা আপনাকে বলতাম প্রভু।

বাবাজী বলিলেন—আমি সব জানতাম ব্রজ।

—জানতেন? ব্রজ চমকিয়া উঠিল।

—জানতাম। দুলালের জন্ম-কথাও জানতাম, আবার দুলালের কর্মও যে এমন হবে—তাও যেন বুঝতে পেরেছিলাম। হ্যাঁ ব্রজ, বুঝতে পেরেছিলাম।

—তবে? তবে কেন সেদিন আমাকে সাবধান করেন নি প্রভু!

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বাবাজী বলিলেন—বলি নি। বলতে পারি নি।

ব্রজ বলিল, বাগ্দীদের আশ্রয় যেদিন ছেড়ে এলাম—সেদিন রতন আমায় বলেছিল।

বারো

বৎসর পাঁচেক পর ব্রজদাসী বাগ্দীপাড়া পরিত্যাগ করিয়াছিল।

দুলাল তখন শৈশব পার হইয়াছে। বৎসর ছয়েক বয়স। রতন বাগ্দী পাগল হয় নাই, তাহার জন্য নয়, ওই দুলালের জন্যই বাগ্দীপাড়ায় থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। দুলালের বাল্য-লীলার রূপ দেখিয়া সে শঙ্কিত হইয়া ছুটিয়া আসিল—বাবাজীর কাছে। ছয় বৎসরের দুলালকে দেখিয়া মনে হয়—আট-দশ বৎসরের ছেলে। দুরন্তপনায় চীৎকার করিয়া ধুলা উড়াইয়া গোটা পাড়াটা মাতাইয়া বেড়ায়।

রাজ্যের ইট-পাথর কুড়াইয়া ঘরে আনে, ঠাকুর পাতে, পূজা করে; ফড়িং ধরিয়া বেড়ায়। কখনও কখনও চলিয়া যায় ও-পাড়ার লোহার বাগ্দীপাড়ার লোহাশালায়। হাপরের ফুঁয়ে আগুন জ্বল-জ্বল করে, লোহা গলে, লোহার উপর হাতুড়ী পড়ে, আগুনের ফুলকি ছোটে,

দুলাল আহার-নিদ্রা ভুলিয়া দেখে। ছেলেকে কোথাও না পাইলে ব্রজ ওখানে যায়। বকিতে বকিতে আসে—বোষ্টমের ছেলে—কামারশালে—কি সুখ পাস ? শেষে প্রভুকে ভুলে লোহা পিটবি ? পৌষ মাঘ মাসে দুলাল সারাটা দিন পড়িয়া থাকে মাঠে। ওই বাগ্দীবুড়ীর সঙ্গে যায়, ধানের শীষ কুড়াইয়া আনিয়া জড়ো করে।

ব্রজ তাহাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া ধরিয়া আনে—গায়ের ধুলা মুছাইয়া দিয়া তিরস্কার করিয়া বলে—ধানে দরকার কি তোর ? ধানে কি হবে ? সুদে কারবার করবি। মহাজন হবি ? হতভাগা কোথাকার !

দুলাল বলে—পালো খাব না ? পিঠে খাব না ?

ধান কুড়ানো বন্ধ হয়, ধানের সময় যায়, বর্ষায় আবার দুলাল ছুটিয়া মাঠে যায়—বাগ্দীদের ছেলেদের সঙ্গে বুড়ীর সঙ্গে মাঠের মাছ ধরিয়া বেড়ায়।

ব্রজ তাহাকে প্রহার করিতে শুরু করিল। দুলালের কর্কশ গলার কান্নার চীৎকারে পাড়াটা যেন অশান্ত অধীর হইয়া উঠিল।

ব্রজ তাহাকে অনেক বুঝাইল। হৃদয়ের ক্ষোভ বেদনা মিশাইয়া তিরস্কার করিয়া বুঝাইল—তোর কি মনে থাকে না তুই বৈষ্ণবের ছেলে, তুই কি তোর ভবিষ্যৎ ভাবিস না রে ? তোর গতি কি হবে ভেবে তোর এতটুকু ভাবনা হয় না রে !

ছেলেটি ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে।

প্রথম প্রথম তিরস্কারের সুরে আহত হইয়া কাঁদিয়া ফেলিত। ক্রমে সেটা সহ্য হইয়া গেল। সে মুখ গোঁজ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। তার পর সে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে শুরু করিল।

হঠাৎ একদিন ব্রজর মনে হইল—ভূমিকম্প হইয়া সব ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল।

সেদিন দুলাল অশ্লীল ভাষায় গাল দিয়া উঠিল।

চমকিয়া উঠিল ব্রজ। পরক্ষণেই সে একটা বাখারি টানিয়া লইয়া বলিল—কি বললি ?

দুলাল কয়েক পা পিছাইয়া গিয়া বন্য জন্তুর মত স্থির দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ব্রজদাসীর ক্ষোভের আর সীমা রহিল না, সে বলিল—বলবি আর ?

দুলাল আরও কয়েক পা পিছাইয়া গেল—দাঁত বাহির করিয়া হিংস্র ভঙ্গিতে বলিল—বলব। বলবই তো।

—বলবি ? বোষ্টমের ছেলে হয়ে এই সব শিখছ তুমি ?

—হ্যাঁ শিখছি। শিখবই তো।

ব্রজর আর সহ্য হইল না। সে ছুটিল। দুলালও ছুটিয়াছিল—গাল দিতে দিতেই ছুটিয়াছিল—বলব—বলব—বলছি— — —। কিন্তু বাড়ীর আগড়টা ছিল বন্ধ। আর ছোট পায়ে ছুটিয়া মায়ের সঙ্গে তাহার পারিয়া ওঠার কথাও নয়। তাহাকে ধরিয়া ব্রজ নিষ্ঠুর ক্রোধে ঘাকতক বসাইয়া দিল। ছেলেটার জেদ চাপিয়াছিল—প্রহারের সঙ্গে সমানে গাল দিয়া চলিল, অশ্লীলতম গালাগাল—কুৎসিততম ভঙ্গী—পশুর মত কণ্ঠস্বর। ব্রজ সভয়ে হাতের লাঠি ফেলিয়া দিয়া পিছাইয়া আসিল। ছেলেটা মুহূর্তে দুরন্ত ক্রোধে একটা ঢেলা কুড়াইয়া লইয়া সজোরে ছুঁড়িয়া মারিল। শিশুর লক্ষ্য—তাই রক্ষা, বুকে মুখে বা পেটে লাগিলে কঠিন আঘাত পাইত ব্রজদাসী, কিন্তু ঢেলাটা আসিয়া লাগিল কাঁধের নীচে হাতে। মনে হইল হাতখানা যেন অসাড় হইয়া গেল।

দুলাল এবার বেড়ার একটা ফাঁক দিয়া, বোধ হয় সর্বাঙ্গ ছিঁড়িয়াই বাহির হইয়া পলাইয়া গেল। ব্রজদাসী সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। সে যেন কাহারও অভিশাপে—এক মুহূর্তে পাথর হইয়া গেল।

*　　*　　*　　*

সে রাঁধিল না, বাড়িল না। ভাবিল, কাহার অপরাধ? কোন্ অপরাধে এমন ঘটিল?

অপরাধ কি উহার জন্মের? অপরাধ ব্রজর অদৃষ্টের? আর কি? আছে, আরও একটা অপরাধ। এই পল্লীটির মধ্যে সে ঘর বাঁধিল কেন? ও-পাড়ার লোহার বাগ্দীপাড়া এমন নয়। আরও বাগ্দীপাড়া সে দেখিয়াছে—সেগুলিও এমন নয়। এখানকার অবস্থা ওই রতন পাগল এমনটা করিয়া তুলিয়াছে। তান্ত্রিক সাধুদের মুখের আগল নাই; তাহাদের কাছে শ্লীল-অশ্লীল নাই, তাহারা এই ভাবে কদর্য কুৎসিত গালাগাল করিয়া থাকে। ব্রজ শুনিয়াছে—পঙ্ক-চন্দনে তাহাদের কাছে কোন প্রভেদ নাই। আলো-অন্ধকার,—পঙ্ক-চন্দন—হীরক-অঙ্গার—কাঞ্চন-বিষ্ঠা সব তাহাদের কাছে এক—এমন কি জীবন এবং মৃত্যু দুইকে তাহারা এক করিয়া ফেলিয়াছে। কেহ করে ঘৃণা, কেহ করে পূজা, তাহারা ভ্রূক্ষেপ করে না। হয়তো তাহারা পাগল—সত্য সত্যই পাগল—অথবা তাহারা পাগল নয়, আর কিছু। তবে তাহাদের আচরণ সংসারীর পক্ষে বিষম। ওই অর্ধ তান্ত্রিক—সাধনা ছাড়িয়া ঘরে আসিয়া সেই বিষ ছড়াইয়া দিয়েছে গোটা পাড়ায়। সে ভ্রূক্ষেপহীন হইয়া এই সব অশ্লীল গালিগালাজ ব্যবহার করে। তাহার ফলে গোটা পাড়াটার মনে ঘাঁটা পড়িয়া গিয়াছে। পাখীর জাত ছেলের দল—বুলির মত শুনিয়া শুনিয়া এইসব শিখিয়াছে। দুলালও শিখিয়াছে তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া।

অনেক ভাবিয়া সে বাহির হইয়া পড়িল—মানগোবিন্দপুরের পথে। মনে পড়িল—বাবাজী তাহাকে বলিয়াছিলেন—তখন এখানে এস।

বাবাজীর সম্মুখে বসিয়া ছিল অল্পবয়সী একটি ছেলে। মোটা চটের মত কাপড় পরনে, গায়েও তেমনি জামা। চোখ দুটি ছোট, কিন্তু প্রখর দৃষ্টি তাহাতে। ঘন ভ্রূ এবং কপালের কুঞ্চন-রেখার সারিতে মিলিয়া কেমন যেন বৈশাখ-অপরাহ্ণের পশ্চিম দিগন্তের মেঘের ছায়ার মত ছায়া ফেলিয়াছে তাহার তরুণ মুখশ্রীর উপর। বৈষ্ণবী একটু থমকিয়া গেল।

বাবাজী প্রসন্ন মুখে বৈষ্ণবীকে বলিলেন—এস—এস।

বৈষ্ণবী প্রণাম করিল।

বাবাজী বলিলেন—বস তুমি। বিশ্রাম কর। এখন আমি একটু ব্যস্ত রয়েছি।

ব্রজ আসিয়া নাটমন্দিরে বসিল। বিগ্রহের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—সুমতি দাও, তুমি আমার দুলালকে সুমতি দাও। তাকে দয়া কর। তার জন্মের পাপ কৃমিকীটের মত তাকে ডুবিয়ে রেখেছে—তুমি তাকে উদ্ধার কর!

চোখ দিয়া তাহার জল পড়িতে শুরু করিল। অনেকক্ষণ কাঁদিয়া সে আবার উঠিয়া সসঙ্কোচে বাবাজীর ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল। দেখিল একাই বাবাজী বসিয়া আছেন। ছেলেটি কখন চলিয়া গিয়াছে।

বাবাজী তাঁহার সযত্ন-বিন্যস্ত চুলে আঙুল চালাইতেছিলেন এবং গুনগুন করিয়া গান গাহিতেছিলেন। মৃদু হইলেও ব্রজদাসীর বুঝিতে কষ্ট হইল না।

পদাবলী তো তাহার অজানা নয়; সুর শুনিয়া ঠোঁট নড়া দেখিয়া বুঝিল বাবাজী

গাহিতেছে—

"আজু কে গো মুরলী বাজায় ?
এতো কভু নহে শ্যাম রায় !"

গানের তালের মাথায় ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন—ব'স।

গান শেষ করিয়া বলিলেন—গান গাইছিলাম। হাসিলেন।

বৈষ্ণবী হাসিল না। হাসি আসিল না।

বাবাজী বলিলেন—তুমি খুব উৎকণ্ঠিত। জোরে পথ হেঁটে এসেছ—হাঁপাচ্ছিলে—এখনও দেখছি মুখ অপ্রসন্ন। কি হয়েছে বল তো ? দুলাল ভাল আছে ? তাকে অনেক দিন দেখি নি।

বৈষ্ণবীর চোখ দুইটার ভিতরে কাজল দীঘির মোহনা ভাঙিয়া গেল।

কাঁদিতে কাঁদিতে বহু কষ্টে সে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া বলিল—বলুন আমি কি করব ?

বাবাজী দীর্ঘক্ষণ আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

বৈষ্ণবী অধীর হইয়া তাঁহাকে ডাকিল—প্রভু।

—হ্যাঁ। কি বলছিলে যেন ? অপরাধীর মত হাসিয়া বলিলেন—আজ আমার মনটা একটু চঞ্চল আছে। ওই যে ছেলেটিকে দেখলে না ? ওটি আমারই ছেলে। স্বদেশী করছে আজকাল ভদ্রঘরের ছেলেরা—শুনেছ তো ? ও তাই করে। আগে দু'বার জেলে গিয়েছে। একবার গেল—একবার এমনি আটক ক'রে রেখেছিল।—এবার আবার নাকি খুব বড় একটা স্বদেশী মাতন আসছে। আমার কাছে এসেছিল দেখা করতে। বলে গেল—। একটু চুপ করে থেকে চুলে আঙুল চালিয়ে বললেন—এবার নাকি গুলি-গোলা চলবে। তাতে যদি মারা যায় তবে দেখা হবে না।

বৈষ্ণবী শিহরিয়া উঠিল, তাহার চোখের জল যেন লজ্জা পাইল। সে তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া বলিল—তবে আজ আমি যাই।

—না। ব'স, ওর পথে ও চলে—আমার পথে আমি চলি। যে সময়টুকু মুখোমুখি দেখা হ'ল—থেমেছিলাম। ও চলে গেল। আমারই বা বসে থাক্‌লে চলবে কেন ?

ব্রজ মাটির দিকে চাহিয়া মেঝের উপর নখের দাগ কাটিতে কাটিতে বলিল—আপনি বলেছিলেন—যদি কখনও ওখানে থাকতে না পার, তবে আমার এখানে এস। এখানে ইস্কুল আছে—আমি ওকে ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দোব।

বাবাজী বলিলেন—আরও অনেক কথা বলেছিলাম ব্রজ ! বলেছিলাম—তোমার রূপ আছে। আমার ভাবে এখনও নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারি নি বৈষ্ণবী।

ব্রজ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া বলিল—মোড়ল তার গাঁয়ে আশ্রম করতে চেয়েছিল বলেছিলেন।

—ভাল। দিন কয়েক পরে খবর দোব। তুমি এস না। আমি পাঠাব খবর।

খবর আসিল। দিন-কয়েক নয়, প্রায় মাস-খানেক হইয়া গেল। ব্রজ অধীর হইয়া উঠিয়াছিল।

দুলাল ইতিমধ্যে একদিন একটা শালিকের বাচ্চা ধরিয়া বলিদান করিয়া রক্তের ফোঁটা কপালে পরিয়া নাচিতে নাচিতে ঘরে ফিরিল। ব্রজ শিহরিয়া উঠিয়া নিজের কপালে ঘা মারিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

রতন আসিয়া বলিল—কাঁদিস কেন অনবুঝ মেয়ে! ওকে আমি আমার চেলা করব। আমিই তো বললাম ওকে—দে মায়ের নাম ক'রে কেটে। পিদীম জ্বললেই জ্বালা—নিভলেই ঠাণ্ডা। শালিক ছানাটার ডানা ভেঙেছে—দে ওটাকে কেটে।···পাখাই যখন ভেঙেছে—তখন পাখী-জন্মে কাজ কি ওর। তা জয় তারা বলে দিব্যি কেটে দিলে! ওকে আমি চেলা করব।

ব্রজ বলিল—না! তার চেয়ে ও মরে যাক, মরে যাক।

—মরে যাক! চীৎকার করিয়া উঠিল রতন।

—হ্যাঁ! হ্যাঁ! হ্যাঁ!

পাগল রতন যে পাগল রতন—সেও ব্রজদাসীর সে মূর্তি দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। ব্রজ বলিল—খুব—খুব শাস্তি হল আমার তোমার আশ্রয়ে থেকে। আমি চলে যাব বাবা—আমি চলে যাব।

পাগল অনেকক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর আপন মনে বকিতে বকিতে চলিয়া গেল।

ব্রজ গুম হইয়া বসিয়া রহিল। দুলালের শাস্তিটা আজ কঠোর হইয়াছিল, ব্রজদাসী জীব-হত্যার অপরাধ সহ্য করিতে পারে নাই। রক্তাক্ত হত্যার নৃশংসতা তাহার দৃষ্টিকে আতঙ্কিত করিয়া তাহাকে যেন দিশাহারা করিয়া তুলিয়াছিল, তাহারই ক্ষোভে সে দুলালকে প্রহার করিয়াছিল, তাহাতেও তাহার ক্ষোভ প্রশমিত হয় নাই, তখন সে নিজের কপালে ঘা মারিয়াছিল। দুলাল দুর্দান্ত, সে ব্রজদাসীকে অমান্য করিতে শিখিয়াছে, সে হতভম্ব হইয়া কাঁদিতেছিল।

কিছুক্ষণ পর সে হঠাৎ উঠিয়া পড়িল—কর্কশ কণ্ঠে কদর্য চীৎকার করিয়া বলিল—বেশ করব। খুব করব। করবই তো। কাটব, আমি কাটব, আরও কাটব। ছুটিয়া সে পলাইয়া গেল। কিছুক্ষণ পর কাহার বাড়ী হইতে একটা জ্বলন্ত কাঠি লইয়া আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া হিংস্র পশুর মত গর্জিয়া উঠিল—আগুন লাগিয়ে দোব।

ব্রজ একটি কথাও আর বলিল না। দেয় দিক। আগুন লাগিয়া পুড়িয়া যাক ঘর-সংসার, সব—সব! মুক্তি হোক তার।

দীর্ঘকাল পরে তার মনে পড়িল—বৃন্দাবনের পথ।

কথা বলিতে গিয়া ব্রজদাসী আজ আবার কাঁদিয়া আকুল হইল। বাবাজী চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। সান্ত্বনা দিলেন না, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন না, উদাস দৃষ্টিতে শান্ত প্রৌঢ়ত্ব রূপময়ী হেমন্তের প্রান্তরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

অনেকক্ষণ পর বলিলেন—আমারই ভুল। তুমি আমায় বলে গেলে, আমি তোমাকে বলতে পারলাম না—ব্রজ আমি জানি দুলালের জন্মকথা, কর্ম যা হবে তাও বুঝতে পারছি, তুমি আর মায়ায় জড়িয়ো না। তুমি পথ ধর! তার পরিবর্তে—আমার ভুলের বোঝা তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলাম—মহেশকে ব'লে—গোপালের আখড়া প্রতিষ্ঠা করে তোমাকে—এক বন্ধন থেকে বের ক'রে এনে নতুন বন্ধনে বেঁধে দিলাম।

সত্য কথা। সেই দিনই সন্ধ্যায় বাবাজী নিজেই আসিয়া হাজির হইয়াছিল।

* * * *

বাবাজী একা নয়, সঙ্গে মহেশ মণ্ডল এবং আরও দুইজন স্থানীয় আখড়ার মহান্ত।

রাত্রির অন্ধকারে বন্যায়-ভাসিয়া-যাওয়া মানুষের চোখের সামনে শুধু সূর্যোদয়ই হইল না—সঙ্গে সঙ্গে যেন পায়ের তলায় মাটির স্পর্শ পাইল; সে মাটিতে দাঁড়াইয়া হাত জোড় করিয়া প্রণাম জানাইয়া গদগদ চিত্তে প্রভুকে জানাইল—তোমার অসীম দয়া, অকূলে তুমি কূল দিলে, অরণ্যে তুমি পথ দিলে। জয় গোবিন্দ, জয় গোবিন্দ, জয় গোবিন্দ!

তাহারই মনের কথার প্রতিধ্বনি তুলিয়াই যেন বাবাজী বলিলেন, জয় গোপাল! জয় গোবিন্দ! তোমার দরবারে যে এলাম বৈষ্ণবী। প্রভুর আদেশ নিয়ে এসেছি।

—আসুন প্রভু! আসুন! ব্যস্ত হইয়া উঠিল ব্রজদাসী।

বাবাজী হাসিয়া বলিল—তুমি ব্যস্ত হয়ো না। অভ্যর্থনা তোমাকে করতে হবে না। আমরাই তোমাকে বরণ করতে এসেছি।

অবাক হইয়া গেল ব্রজ।

বাবাজী বলিলেন—আমি স্বপ্ন দেখেছি—কয়েক দিনই দেখেছি যে আমি নাড়ুগোপাল বিগ্রহ সেবা প্রতিষ্ঠা করছি। আয়োজনও করছিলাম। হঠাৎ মনে হ'ল, নাড়ুগোপালের সেবা—এ কি আমার দ্বারা চলবে? এ সেবা চালাতে হলে গোপাল-ভাবের ভাবিকা চাই—সেবিকা চাই। বুঝেছ; আর আমার আখড়ার মধ্যেও ভাবগ্রাহী আর ভাবিকায় আলাপ ঠিক নির্বিঘ্ন হবে না। তা—মহেশ বলল—ওর সাধ এ ভার ও নেয়, আখড়াটি নিজের গ্রামে প্রতিষ্ঠা করে। আমি বললাম—ভাল কথা, আমার স্বপ্নের সাধ পূর্ণ হলেই হ'ল। সবই ঠিক। এখন তোমার কাছে এসেছি আমি—এ গোপাল সেবার ভার তোমাকে নিতে হবে। আমি তোমাকে বরণ করতে এসেছি।

ব্রজ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অজস্র ধারায় কাঁদিল। এ কি অভাবনীয় সৌভাগ্য তাহার! আর ভাবনা নাই। বাবাজী তাহার জীবনে মঙ্গলময়ের মত আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তাহার সকল দুশ্চিন্তা ঘুচাইয়া দিয়াছেন। আখড়ার পূজা-অর্চনা উৎসব-আচার-আচরণের মধ্যে দুলাল রেশম কীটের মত পাকে পাকে জড়াইয়া পড়িবে, তারপর একদিন সে বাহির হইবে ব্রজদাসীর কল্পনার রঙে রঙীন বিচিত্রিত পাখা লইয়া। হঠাৎ তাহার বুকখানা ধড়াস করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। এত সমাদর! ইহার অর্থ লইয়া মানুষে কুৎসিত কথা বলিবে না তো? সে তো জানে! সে তো জানে—তাহার আড়ালে মানুষ গোপালের জন্ম তাহাকে কলঙ্ক দেয়!

গোটা বাগ্দীপাড়াটা কাঁদিয়া আকুল হইল।

শুধু রতন বুড়া হা-হা করিয়া হাসিল। বুড়া সেই দিন হইতে ব্রজদাসীর বাড়ীতে আসে নাই। শুধু তাই নয়, বুড়ার ভাবভঙ্গিও কেমন যেন হইয়া আসিতেছে। মধ্যে মধ্যে দুই হাতের বুড়া আঙ্গুল দেখাইয়া চীৎকার করে—কচু-কচু—আমার কচুটা!

বাড়ীর লোক—পাড়ার লোক সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। ব্রজকে সাবধান করিয়া গিয়াছে বাগ্দীবুড়ী—বলিয়া গিয়াছে—ক্ষেপবে মনে লাগছে মা। সাবধান হবা যেন!

বিদায় লইতে গিয়া ব্রজদাসী তাকে হাত জোড় করিয়া প্রণাম জানাইয়া বলিল—কন্যের আদরে রেখেছিলেন বাবা, আপনার ঋণ আমার শোধ হবার নয়। কিন্তু দেবতার ডাক এসেছে—আমাকে যেতে হবে। আপনি যে-সে লোক নন—মহাজন, অনুমতি করুন।

রতন বুড়া গাঁজা খাইয়া ভাম হইয়া বসিয়াছিল। সে লাল চোখ দুইটা বিস্ফারিত করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল কিছুক্ষণ, তারপর হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল—বলিল—কচু-কচু-আমার কচুটা!

তারপর বলিল—পালাচ্ছিস! তা ভাল ক'রে পালিয়ে যা না কেন? তেঁতুল গাছ ফেলে পালা। তেঁতুল বীচিতে গাছ, টকো ফলে অম্বল, বাতাসে চর্ম্মরোগ। পালাবি তো ফেলে পালা! যাবি তো ব্রজে যা। বুঝলি! নইলে মরবি। ছেলেটাকে দিয়ে যা—ওকে আমি ভাতে সেদ্ধ ক'রে খেয়ে দেব।

তারপর চীৎকার করিয়া উঠিল—আবোল-তাবোল চীৎকার—

—জয় তারা—জয় তারা, ঘুরিয়ে দে মা খাঁড়া। দে—সব রক্তে ভাসিয়ে দে। কেটে-কুটে দে। ভাত মাস দে মা। গাঁজা দে মা।

ব্রজর দিকে চাহিয়া আবার বলিল—পালা—পালা—ছুটে পালা।

ম্লান হাসিয়া ব্রজ সরিয়া আসিল।

পাগলের জন্য বেদনার অবধি ছিল না তাহার। শুধু পাগলের জন্যই নয়। বাগ্দীপাড়ার মমতাও কম নয়। বাগ্দীবুড়ী কাঁদিয়া সারা হইল।

বাগ্দীপাড়ার এ মমতা—এ যে বত্রিশ নাড়ীতে জড়াইয়া গিয়াছে। ছিঁড়িতে সে সমস্ত টনটন করিতেছে। এত ভালবাসা—এত যত্ন—এ ফেলিয়া যাইবে কেমন করিয়া! অকৃতজ্ঞ—সে অকৃতজ্ঞ!

তেরো

অকৃতজ্ঞতার অপরাধও সে মাথা পাতিয়া লইল; মনে মনে বলিল—তুমি তো অন্তর্যামী, কিছুই তো তোমার অগোচর নাই। আমাকে তুমি ক্ষমা করো। না-হয় সাজা দিয়ো। শুধু এইটুকু করো—সে সাজার এতটুকু আঁচ যেন দুলালকে স্পর্শ না করে। তোমার চরণে তার মতি হোক—তার জন্মের অপরাধের খণ্ডন হোক—সেই মতির পুণ্যে। দুলাল আমার সব কিছুর উপরে।

দুলাল তাহার সব কিছুর উপরে। কৃতজ্ঞতা-অকৃতজ্ঞতা, পাপ-পুণ্য কলঙ্ক-প্রশংসা সব কিছুর উপরে। অকৃতজ্ঞতার অপরাধের বেদনা অন্তরে বহিয়া—চোখের জল মুছিতে মুছিতে নতুন আখড়ায় আসিয়া উঠিতে লোকে তাহার মাথায় কলঙ্কের কালো জলে স্নান করাইয়া দিল। যে কলঙ্কের কথা লোকে তাহার আড়ালে বলিত—সে কলঙ্ক সে নিজেই একদা সকলের সমক্ষে বলিয়াছিল। সেদিন ভাবে নাই ওই মিথ্যা কলঙ্ক যেদিন ফিরাইয়া দিবে—সেদিন আর তাহার সহ্য করিবার শক্তি থাকিবে না।

ব্রজদাসী আক্ষেপের হাসির সঙ্গে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—তাও সহ্য করলাম—ওই দুলালের মুখ চেয়ে। আখড়ায় এসে উঠলাম, আখড়াটি দেখে মন একেবারে ভরে উঠল। চোখ জুড়িয়ে গেল। আজ ষোল বছর হয়ে গেল—কিন্তু সেদিনের আখড়ার সেই ছবি আমার চোখে ভাসছে আজও। মণ্ডলকে সেদিন মনে মনে বলেছিলাম—তোমার সব পাপ খণ্ডন করলে তুমি—প্রভু যেন তোমাকে মার্জনা করেন।

সুন্দর আখড়াটি পরিপাটি করিয়া গড়া হইয়াছে। বাঁধানো মেঝে মাটির ঘর, আটপলা

কাঠের খুঁটি দেওয়া বাঁধানো পিড়ে। বাঁধানো উঠান। আখড়ার ধারেই একটি নালা—শাখা-নদী জাহ্নবীর প্রশাখা। আখড়া হইতে খালে নামিবার ঘাটটি পর্য্যন্ত কয়েকটি পাকা সিঁড়ি এবং অল্প একটু চাতাল করিয়া বাঁধানো। নাড়ুগোপালের ঘরখানি আড়ে-দীর্ঘে চার হাত চার হাত, সামনে তিন দিকে তিনটুকরা বারান্দা। সামনের বারান্দাটুকুতে তিনটি থামে দুইটি খিলান। চারিপাশের এক দিকে নালা—বাকী তিন দিকে পুরানো বাগান। কাঁঠাল, শিরীষ এবং আমের গাছ। আর জন্মিয়াছে বন্য বাবলা গাছ।

আখড়ার চারিদিকে ঘন করিয়া কাঞ্চন গাছের চারা লাগানো হইয়াছে, গাছের ডাল।

গ্রামখানিও নেহাৎ ছোট নয়। দোকান-দানিও কয়েকখানা আছে। পাঠশালা আছে। গ্রামের যে সব ছেলেগুলি আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল—তাহাদের দেখিয়া ব্রজ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। পরিচ্ছন্ন বেশভূষা, মিষ্ট চেহারা ভারী ভাল লাগিল ব্রজর। গোপালের বাল্যভোগ দিয়া প্রসাদ লইয়া সে বারান্দায় দাঁড়াইয়া বলিল—এস আমার গোপালের সখারা সব। শ্রীদাম-সুদাম-দাম-বসুদাম! আমার সুবল কোন্‌টি হবে গো? সব চেয়ে সুন্দর কে গো?

প্রতিটি ছেলের মুখে যে হাসি ফুটিয়া উঠিল—তাহার শ্রীতে তাহার দৃষ্টি জুড়াইয়া গেল—মন অনাবিল প্রসন্নতায় ভরিয়া উঠিল; মনে মনে সে বাবাজীকে সহস্র প্রণাম জানাইল—গোবিন্দকে নিবেদন করিল—যিনি দুঃখিনীর দুলালের জন্য এত করিলেন—তোমার কৃপা যেন তাঁহার উপর অজস্র ধারায় ঢালিয়া দিও। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল বাগ্দী-পাড়ার ছেলেদের। মনে পড়িতেই লজ্জা অনুভব করিল সে। মনে হইল—এ মুক্তি সে লাভ করিল একটা অপরাধের মূল্যে! তাহাদের সাহচর্য হইতে দুলালকে সরাইয়া আনিয়া দুলালের জীবনের পথ সে পরিসর করিল; কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথ হইতে রাজপথে আনিয়া দাঁড় করাইয়া দিল, কিন্তু যাহারা এতদিন ওই বন্ধুর পথে দুলালের হাত ধরিয়া চলিয়াছিল—তাহাদের সম্মুখের অন্ধকারের কথা তো ভাবিল না। চোখে তাই জল আসিল। বলিল—ওদের পথ ধরাইয়া দিবার দায়িত্ব বহন করিবার শক্তি যেন তুমি দুলালকে দিয়ো। ওই ভারটাই যেন জীবনে সে বহন করিতে পারে।

বাবাজী বসিয়াছিলেন কর্মকর্তার আসনে। আখড়ার ব্যয়ভার বহন করিয়াছে মহেশ মণ্ডল, আখড়ার সেবার ভার গ্রহণ করিবে ব্রজদাসী কিন্তু আখড়াটি বাবাজীর মানগোবিন্দপুরের আখড়ারই অঙ্গ স্বরূপ। এমন আখড়া আরও কয়েকটি আছে। বৈষ্ণব মহান্ত কয়েকজন বাবাজীকে ঘিরিয়া বসিয়াছিলেন। হঠাৎ ব্রজদাসীর কানে গেল—রাধিকাপুরের মহান্ত—ছি-ছি করিয়া সারা হইয়া গেলেন।

সে চকিত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সমবেত বৈষ্ণবেরা সকলেই রাধাগোবিন্দ স্মরণ করিয়া বলিল—রাধা গোবিন্দ, রাধা গোবিন্দ! হায় রে মানুষের রসনা! হায় রে অন্তরের কলুষ!

ব্রজদাসী সঙ্কোচভরে আসিয়া দাঁড়াইল।

বাবাজী সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া বলিলেন—এই যে ব্রজদাসী এসেছে! অবসর হ'ল তোমার? নাও—তা হ'লে বস—নামকীর্তন কর।

—হ্যাঁ। মিথ্যা কথা—খারাপ কথা শোনাও পাপ। ভগবানের নামে খণ্ডন হোক। বসুন মা-জী।

ব্রজ কিন্তু জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিল না—কি হ'ল বাবা?

—কিছু না। সে তুমি—নাম ধর।

রাধিকাপুরের বাবাজী প্রবীণ কিন্তু খানিকটা পাগল মানুষ, তিনি বলিলেন—সংসারে তো জটিলে-কুটিলেই বেশী মা-জী, তাদের কথাই হচ্ছে গো! ফোঁটা কাটলেই বৈষ্ণব হয় না, তা হ'লে তো—নালা মাত্রেই নদী হ'ত। ইতরজনে নানা কথা বলছে।

—কি বলছে?

—সে আর শুনতে হবে না আপনাকে। দেখছেন না—মহান্তরা সবাই আসেন নি!

ব্রজদাসীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

—থাক বাবাজী ওসব কথা—

—থাকবে কেন? মা-জী সন্তান কোলে নিয়ে বসে প্রথম দিনই তো—

বাধা দিয়া নরোত্তম দাস বাবাজী বলিলেন—থাক ওসব কথা। শ্রীমতী কলঙ্ককে অঙ্গের ভূষণ করেছিলেন। কলঙ্কের লজ্জা তো তোমাকে ভয় দেখাতে পারে নি ব্রজ। আমি তো শুনেছি প্রথম দিনই তুমি বাগ্দীপাড়ায় নিজের মুখে কি বলেছিলে! নাও তুমি নাম আরম্ভ কর। আন, খোল আন। আমি খোল বাজাব।

গৌরচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বন্দনা করিয়া ব্রজ গান ধরিল—

"জয় ব্রজরাজ-কোঙর
গোকুল উদয় গিরি চান্দ উজোর!"

প্রাণ ঢালিয়া সে গান করিয়া গেল। বার বার ফিরাইয়া ফিরাইয়া গাহিল—কিন্তু তাহাতে স্বাদ ম্লান হইল না। গান শেষ করিয়া ব্রজ দেখিল—দুলাল মন্দিরের দুয়ারের পাশে দাওয়ার উপরটিতে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নরোত্তম দাস বাবাজীকে একটা প্রণাম করিয়া বলিল—আপনার দয়ার ফল—আপনার দয়ার ফল এরই মধ্যে ফলে গেল প্রভু, দুলাল আমার গোপালের দরজায় গড়িয়ে পড়েছে।

নরোত্তম দাস হাসিলেন। বলিলেন—তাই সত্যি হোক। প্রভু দয়া করুন। দুলালকে তুমি মনের মত ক'রে মানুষ ক'রে তোল। তোমার জীবনের দুঃখ—

ব্রজ অভিভূত হইয়া গিয়াছিল—কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইয়া বলিল—গোবিন্দের দয়া, আপনার আশীর্বাদ, ওর অদৃষ্ট আর আমার—। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমার যে কোন সম্বলই নাই।

—তোমার অনেক পুণ্য ব্রজ। যতখানি তোমার ওর ওপর ভালবাসা ততখানি পুণ্য। অফুরন্ত! অফুরন্ত!

—না। ছেলেকে কোন্ মা ভাল না বাসে বলুন!

—যে কলঙ্ক তুমি স্বীকার ক'রে ওকে কোলে নিয়ে জগতের হাটে দাঁড়িয়েছ ব্রজ—সে তো মা হ'লেই মানুষে পারে না। তুমি যদি কলঙ্কের ভয়ে ওকে পথে ফেলে দিতে—

ব্রজ শিহরিয়া উঠিল। তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল কৃষ্ণা একাদশীর রাত্রির শেষ প্রহরের শ্মশান। সে বলিল—না-না—সে কথা—মনে পড়াবেন না।

বাবাজী হাসিয়া বলিলেন—তাই তো কলঙ্ক তোমার ফুল হয়ে ফুটল। আজও মানুষের কলঙ্ক দেবার চেষ্টার বিরাম নাই। কিন্তু সে তো তোমাকে স্পর্শ করলে না।

—আজও কলঙ্ক দিচ্ছে!

—দিচ্ছে বৈকি। বাবাজী হাসিলেন—এবার আমাকেও রেহাই দেয় নি। বলেছে—এমন আয়োজন ক'রে সমারোহ ক'রে ওই কলঙ্কিনীকে এনে যখন গোপালের আখড়া করেছে তখন ওই-ওই। অর্থাৎ আমি।

হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন নরোত্তম দাস। বলিলেন—আমি ধন্য হলাম। তোমার কলঙ্কের ভাগ পেয়েছি।

ব্রজ কাঁদিয়া ফেলিল।

বাবাজী বিস্মিত হইয়া বলিলেন—তুমি কাঁদছ?

ব্রজ বলিল—আমার এ আখড়ায় কাজ নাই প্রভু। আমি বরং আপনার আখড়ায় দাসীর মত থাকব। আমার কলঙ্ক আমি সইতে পারি—কিন্তু ওই দুগ্ধপোষ্য শিশু, ও যদি দুঃখ পায় লজ্জা পায়—

বাবাজী অনেক বুঝাইয়া শান্ত করিলেন।

ব্রজ চোখ মুছিয়া অবশেষে বলিল—গোবিন্দ দিলেন যে রসনা, যাতে নামের মধু ঝরে পড়ে—সেই রসনায় ওদের এত বিষ প্রভু!

এতক্ষণে বাবাজী হাসিলেন সহজ হাসি।—সে বিষেও তুমি জর-জর হয়ে ঢলে পড় নি, তাই তো তোমাকে এত স্নেহ করি! মনের মধ্যে যার বাঁশী বাজে, তার কালিদহের নাগকে ভয় কিসের? আচ্ছা চলি।

বৈষ্ণবী সমস্ত রাত্রিটা আজ আবার কাঁদিল। দুলালের মাথায় হাত বুলাইল। ছয় বছরের দুলালের আজও স্তন্যপানের তৃষ্ণা মেটে নাই। মধ্যে মধ্যে বৈষ্ণবীর চোখে কথাটা ভাবিয়া জল আসে। ওই অমৃত সে দুলালকে দিতে পারিল না। সুস্থ সবল ছেলে দুলাল—কিন্তু ওই অমৃত যদি বুক পুরিয়া সে তাহাকে পান করাইতে পারিত তবে রূপে—আকারে—শক্তিতে আরও কত সুন্দর হইয়া উঠিত, সে কথা সে জানে। সে ছবি সে আঁকে, আঁকিতে পারে।

* * * *

ব্রজদাসী অকস্মাৎ অতীত কথায় ছেদ টানিয়া বলিল—কালিদহের নাগের বিষে অঙ্গ আমার একদিন জর-জর হয়ে গেল—তাও আমি সহ্য করলাম। ওর মুখ চেয়ে। ভস্মে আমার ঘি ঢালা হ'ল। ওর মতি পালটাল না। মোড়লদের ছেলেরা পড়ত গাঁয়ের পাঠশালায়—দুলালকে ভর্তি করে দিয়েছিলাম, বছর খানেক পরে পণ্ডিত এসে বললে—মা-জী, তোমার ছেলেকে পড়ানো আমার সাধ্য নয়। ওর যত বুদ্ধি তত দুষ্টুমি। দুপুরবেলা পাঠশালা থেকে পালাবে—গিয়ে উঠবে বাগ্দীপাড়ায়। সেখানকার বুড়ীর সঙ্গে মাঠে মাঠে বেড়াবে।

বুড়ীর সহিত দুলালের একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক আছে। ধানের শিষ কুড়াইবার সঙ্গী ছিল দু'জনে। দুলালের আঁচলে যখন আর শিষ ধরিবার জায়গা থাকিত না তখন শিষ কুড়াইয়া বুড়ীর ঝুড়িতে দিত দুলাল। মাছ ধরিয়া সবই দিত বুড়ীকে। বুড়ীর ঘরে তখন হইতেই লুকাইয়া মাছ খাইয়া আসিত। বুড়ী অনর্গল বকিত, পাড়ার লোককে গালি-গালাজ করিত, ভগবানকে গাল দিত; দুলাল কখনও কোন প্রতিবাদ করে নাই। বরং প্রতি কথায় সায় দিয়াই চলিত। বুড়ী বলিত—ওই রতন—ও সর্বনেশে পাগল, ভয়ঙ্কর লোক!

দুলাল বলিত—ভারী দুষ্টু। যে চোখ।

বুড়ী মনের আক্ষেপে গাল দিত—ভগবান চোকখেকোর বিচার নাই।

দুলাল বলিত—লাঠির বাড়ি মারতে হয়।

দুলাল এখনও মাছ-ভাতের লোভে বুড়ীর বাড়ী যায়। বুড়ী লুকাইয়া মাছ-ভাত খাওয়াইয়া তাহাকে পাঠশালায় ছুটির আগে বাড়ী পাঠাইয়া দেয়।

রতন বুড়া পাড়ায় থাকিলে বুড়ীর কাছেই সারাক্ষণটি বসিয়া থাকে। রতন বুড়া তাহাকে দেখিলে যেন ক্ষেপিয়া উঠে। চীৎকার করিয়া গালি-গালাজ করিয়া বলে—বেরো—বেরো—বেরো বলছি পাড়া থেকে। খবরদার এ পাড়া মাড়াবি না।

মধ্যে মধ্যে পাগলের মত বলে—তোকে কেটে ভাতে সেদ্ধ ক'রে খাব। বোষ্টমের মাংস কিনা। সেদ্ধ করে আলুর মত খাব। মা তারার ভোগ লাগাব।

বুড়া পাড়ায় না থাকিলে ছেলেদের সঙ্গে গুলি-দাঁড় খেলিয়া পাড়া মাতাইয়া তুলিয়া তবে ফেরে। ফিরিবার সময় চীৎকার করিয়া একে চন্দ দুইয়ে পক্ষ, তিনে নেত্য—ঘোষিয়া নিজের বিদ্যা জাহির করিয়া ফেরে। ব্রজদাসী কোন কথা জানিতে পারে না।

বাড়ীতে সে শান্ত-শিষ্ট।

মহেশ মণ্ডলের সঙ্গে বড় ভাব।

আখড়ায় এখন নিত্য সন্ধ্যায় নাম-গান হয়—গ্রামের মাতব্বরেরা আসেন। তামাক খান। গানের পর কথাবার্তা হয়, তাহাদের বিদ্যা-বোধ-মত শোনা ধর্মের কাহিনী বলে। মহেশ মণ্ডল, মণ্ডল না থাকিলে পাঠশালার পণ্ডিত চরিতামৃত পাঠ করে।

মহেশ মণ্ডল পণ্ডিত নয়, কিন্তু এ গ্রামে সে সকলের চেয়ে ভাল লেখাপড়া জানে। এমন শুভঙ্করীর হিসাব মুখে-মুখে কেউ করিতে পারে না। শুধু এ গ্রামে কেন—পাঁচখানা গ্রামে কেউ পারে না। দলিল, চেক রসিদ এসব সে নির্ভুল দেখিয়া লইতে পারে। সব চেয়ে বড় কথা—লোকটি মিথ্যা বলে না। সকলেই এ কথা বলে। মহেশ হাসে। কিন্তু বৈষ্ণবীর আখড়ায় এ কথা বলিলে সে মাথা হেঁট করিয়া গভীর স্বরে যেন আর্তনাদ করিয়া ওঠে—গোবিন্দ! গোবিন্দ! দয়া কর প্রভু!

বৈষ্ণবী আর তাহাকে ব্যঙ্গ করে না, আর তাহাকে তীক্ষ্ণ কথা বলে না। মিষ্ট হাসিয়া বলে—গোবিন্দ তো তোমার উপর নিদয় নন মণ্ডল! মিছে দুঃখ কর কেন?

মহেশ আকাশের দিকে চাহিয়া বলে—জানি না মা-জী। তবে দুঃখ তো অনেক!

আজকাল সে বৈষ্ণবীকে মা-জী বলিতে শুরু করিয়াছে। ব্রজ তাহাতে খুশী হইয়াছে।

বৈষ্ণবী বলে—দুঃখ করো না। আজকের দুঃখ কালকে সুখ হয়ে ওঠে। কাঁটায় ভরা ডালের আগায় ফুল ফোটে। নাও, ও-সব কথা রেখে একবার ভাল ক'রে তামাক খাও। আর দুলালকে একটু পড়া দেখিয়ে দাও। দুঃখিনীর ছেলের যদি দু' কলম হয়—যদি শাস্ত্র পড়ে প্রভুর সন্ধান পায়—তবে তোমার তাঁর আশীর্বাদে সব দুঃখ ঘুচে যাবে। দুঃখীর আশীর্বাদেই তো তাঁর ভাঁড়ারে টিপ্‌ কাটা যায় গো!

দুলাল পড়িতে গিয়া মণ্ডলের কোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়ে।

মণ্ডল ডাকে—মা-জী। দুলালকে তোল। ঘুমিয়ে গেল।

—এই দেখ। ঘুম পাড়াতে তোমাকে বললাম বুঝি? বললাম—পড়াও খানিকটা—

—পড়বে। বয়স হলেই পড়বে।

—বয়স হলে পড়বে কি? এখনই তো পড়ছে। যা চেঁচিয়ে পড়তে পড়তে বাড়ী আসে! তুমি পড়া শুধাও না ওকে!

মনে মনে ব্রজদাসী সোনার মন্দির গড়িয়া তোলে—সেই গড়ার আনন্দের খানিকটা ঝলক তাহার মনের পাত্র উপ্‌চাইয়া গড়াইয়া পড়ে।

হঠাৎ পণ্ডিতের কথা শুনিয়া ব্রজদাসী চমকিয়া উঠে। মনে হয় একটা বজ্রাঘাত হইয়া গেল ওই মন্দিরের উপর।

দুলাল দুষ্ট, দুলাল পাঠশালা হইতে পলাইয়া গিয়া বাগ্দীপাড়ায় মাছ-ভাত খাইতে যায়। এখনও পর্যন্ত প্রথম ভাগ তাহার শেষ হইল না! হে গোবিন্দ!

পাঠশালার পণ্ডিত বলিল—আপনি ওকে মানগোবিন্দপুরের মাইনর স্কুলে ভর্তি করে দেন।

* * * *

অন্ধকারের মধ্যে আবার আলো দেখিতে পাইল ব্রজ। তাহার মন বলিল—ভাল হইবে। ইহাতেই ভাল হইবে।

বাবাজীর আশ্রমের গ্রামেই মাইনর ইস্কুল। ওখানে ভর্তি হইলে অন্ততঃ একবেলা দুলাল বাবাজীর পায়ের ধূলা লইয়া আসিতে পারিবে। এ ছাড়া তাহার মায়ের মন প্রত্যাশাতেও উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। পাঠশালা হইতে মাইনর ইস্কুলে যাইবে দুলাল। আল-পথ হইতে মেটে গাড়ীর পথ পাইবে, সে পথ গিয়া আরও বড় পথে পড়িয়াছে।

তাহার কল্পনা যেন আশ্বাসের জলসিঞ্চনে বীজ ফাটিয়া অঙ্কুর—অঙ্কুর হইতে সবুজ একটি ছোট চারা গাছ হইয়া উঠিল।

মহেশ বলিল—না। দুলাল তোমার ঘরেই পড়ুক।

—কেন?

—না—বৈষ্ণবের ছেলে ও-সব লেখাপড়া শিখে করবে কি?

বৈষ্ণবী আর একটি কথা বলিল না। মহেশের উপর সমস্ত ভাল ধারণা এক মুহূর্তে চুরমার হইয়া গেল।

সে নিজেই দুলালকে সঙ্গে করিয়া একদিন রওনা হইল। প্রথমেই বাবাজীর আখড়ায় গিয়া উঠিল। মন্দিরের সম্মুখে গিয়া দুলালকে লইয়া প্রণাম করিল। দুলালও খুব খুশী। জামা গায়ে দিয়াছে, একটি ছিটের কোট, পরনে একখানি নতুন কাপড়, তাহার উপর শখ করিয়া ব্রজ একখানি পাড়ওয়ালা ছোট চাদর গলায় জড়াইয়া দিয়াছে। মুখখানি ফুটফুট করিতেছে, মাথার চুল তেলে চকচক করিতেছে, কপালের উপর আঙুল দিয়া চুলের ডগাগুলি এক-মুখ করিয়া টানিয়া দিয়াছে, কপালের মাঝখানে পরাইয়া দিয়াছে গোপালের আঙিনার মাটি ও দইয়ের একটি ফোঁটা।

দেবতাকে প্রণাম করিয়া সে বাবাজীর কাছে গেল।

কিন্তু থমকিয়া দাঁড়াইতে হইল।

বাবাজীর সামনে বসিয়া আছে বাবাজীর সেই ছেলে। ছেলেটি শীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সেই মোটা কাপড়-জামা-চাদর পরনে, মাথার চুলগুলি রুক্ষ তামাটে, চোখে প্রখর দৃষ্টি, মোটা ভ্রূ ও কপালের কুঞ্চনে সেই কালবৈশাখীর মেঘের ছায়া—সে ছায়া যেন আরও ঘন হইয়া উঠিয়াছে। মৃদু অথচ কঠিন কথাবার্তা চলিতেছে। তাহার দিকে চাহিয়া ছেলেটির দৃষ্টি যেন আরও কঠোর হইয়া উঠিল। সঙ্কোচভরে ব্রজ দুলালকে লইয়া মন্দিরের সামনে আসিয়া বসিল। ছেলেটি রাগ করিয়াছে তাহাকে আসিতে দেখিয়া। তা করিবে বই কি! নিজের বাপের সঙ্গে দু'দণ্ড কথা বলিবার সময়ে ব্যাঘাত করিলে রাগ কার না হয়! তাও আজ বোধ হয় বৎসর দেড়েক পর বাপের কাছে আসিয়াছে ছেলে। গোবিন্দকে সে মনে মনে বার বার প্রণাম করিল। ছেলেটি গুলি খাইয়া মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া দেশের কাজ করিতে গিয়াছিল। এ লইয়া রাজার জাত সাহেবদের সঙ্গে হাঙ্গামা। শান্ত পল্লীগ্রামে পর্যন্ত কত

খবর—কত জটলা—কত মজলিস। নুন তৈরী, মদ খাওয়া বারণ, চরকা—এই সব লইয়া শহরে বাজারে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে। যাক, সেই 'মন্বন্তরা'র মধ্য হইতে সে যে বাঁচিয়া অক্ষত শরীর লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, বাবাজীর বুকে যে অগ্নিবাণ হানেন নাই বিধাতা, সে কেবল গোবিন্দের দয়া। বিধাতার বিধাতা যে তাহাদের গোবিন্দ!

বসিয়া থাকিতে থাকিতে দুলাল ঢুলিতেছিল। ওদিকে কথাবার্তা যেন চড়া সুরে উঠিতেছে, দেরিও অনেক হইয়া গেল। অবশেষে ব্রজ দুলালকে বলিল—দুলাল এইখান থেকে প্রণাম কর বাবাজীকে। চল, ওদের দেরি আছে। আমরা বরং ইস্কুলে গিয়ে ততক্ষণ ভর্তির কাজ সেরে আসি।

গোবিন্দকে স্মরণ করিয়া সে মাস্টারের সামনে জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরেই বেত্রাহতের মত একরকম ছুটিয়াই বাহির হইয়া আসিল।

ভর্তি করিতে গিয়া মাস্টার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—বাপের নাম?

স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল ব্রজ।

—ওর বাপের নাম কি! এই খোকা—তোমার বাবার নাম কি?

দুলাল বোকার মত একবার বলিয়াছিল—এঁ্যা?

—তোমার বাবার নাম কি?

—জানি না।

—জানি না? বাবার নাম নইলে ভর্তি হবে কি করে? বাবার নাম বলতে পার না? তা হলে তোমাকেই যে বলতে হবে!

ব্রজ মুহূর্তে একটা কাণ্ড করিয়া বসিল। দুলালের হাত ধরিয়া টানিয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল। রাস্তায় পড়িয়া এতবড় ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া গোটা বাজার পার হইয়া একটা গাছতলায় আসিয়া বসিয়া পড়িল।

দুলাল জিজ্ঞাসা করিল—কি হ'ল মা?

ব্রজ অঝোরঝরে কাঁদিয়া আকুল হইল।

তাহার মনে হইল—কালীয় নাগের বিষে জীবন-সমুদ্রে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। এত বিষ, এত বিষ! সে দুলালকে বুকে চাপিয়া ধরিল। মনে হইল বুকটা জুড়াইয়া গেল।

অনেকক্ষণ পর আসিয়া আবার উপস্থিত হইল বাবাজীর আখড়ায়। বাবাজী প্রবেশপথেই দাঁড়াইয়াছিলেন। বলিলেন—কোথায় গিয়েছিলে? আমি তো ভেবেই পাই না।

ব্রজ আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

—কি হল?

বহু কষ্টে ব্রজ ব্যাপারটা জানাইল। বাবাজী শান্ত বিষণ্ন হাসি হাসিলেন, বলিলেন—আর একটু অপেক্ষা করতে পারলে না? আমি তাহ'লে যেতে দিতাম না।

তার পর বলিলেন—কেঁদো না তুমি! করবে কি বল? পৃথিবীর দেনা-পাওনা—ও তো না মিটিয়ে উপায় নাই।

ব্রজ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—কোন উত্তর দিতে পারিল না।

বাবাজী বলিলেন—বস।

তিনি চলিয়া গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া কয়েকখানি বাতাসা, কয়েক টুকরা শসা, নারিকেল, দুলালের হাতে দিয়া বলিলেন—খাও। তোমার মুখ শুকিয়েছে—বুঝতে পারছি ক্ষিদে পেয়েছে তোমার। ব্রজ—তুমি—

ব্রজ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—তবে কি আমার দুলাল পড়তে পাবে না? ওর পড়া হবে না?

—আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো। আমি পড়াব ওকে।

দুলালের মহা ভাগ্য—পরম ভাগ্য। ভাঙা-গড়ার মধ্যে কি অপরূপ তাঁর লীলা—বৈষ্ণবী ভাবিয়া অভিভূত হইয়া গেল; ভাঙা ঘরের ভিতের উপরেই পত্তন করিয়া দিলেন সোনার কলস দেওয়া শ্রীমন্দিরের।

চৌদ্দ

ব্রজ থামিল। কাহিনী তাহার ফুরাইয়া আসিয়াছে। নীরবে সে অনেকক্ষণ ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিল। তার পর দিন বলিল—আমার কোন্ পাপে কোন্ অপরাধে এমন হ'ল? আমি যতবার গড়তে গেলাম—ততবার—প্রভু আমার—। কথা সে শেষ করিতে পারিল না। হু-হু করিয়া চোখের জল ঝরিয়া তাহার মুখ ভাসাইয়া দিল। নিঃশব্দ কান্না। খুনী ফাঁসীর আসামীর মত লজ্জায় তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ কিন্তু চোখের জল অজস্র ধারায় বহিয়া যাইতেছে।

বাবাজী বলিলেন—ব্রজর গড়ার কথা ধরিয়াই বলিলেন—ভাঙা আর গড়া, গড়া আর ভাঙা—এই তো তাঁর লীলা ব্রজ! সোনার কলস দেওয়া শ্রীমন্দির—

—না। সবেগে ব্রজ মাথা নাড়িল।—না—সে আশা আমি অনেকদিন ছেড়েছি। আপনার কাছে পড়তে দিলাম, ও আপনার চরণ ছেড়ে দিয়ে—মানগো।বিন্দপুরের বাজারের পথে কুড়িয়ে বেড়ালে—সুধার বদলে গরল, বৈষ্ণবের মতি ওর হল না, ও শেষ পর্যন্ত মটরের চাকরি নিলে। আমি তাতেও কিছু বলি নি। আমার ভাঙা মন্দির আর গড়তে চাই নি প্রভু। চেয়েছিলাম—ওই ভাঙা দেওয়ালের উপরেই পাতার ছাউনি করে বসতের একটু আশ্রয়। তাতেও গোবিন্দ আগুন ধরিয়ে দিলেন। দুলাল শেষে মদ খেতে ধরলে প্রভু!

নরোত্তম দাস বাবাজী বিষণ্ণ দৃষ্টিতে দিগন্তের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কি বলিবেন? দুলালকেই বা কি দোষ দিবেন? তাঁহার বিচারে দুলালের দোষ নাই।

প্রথম প্রথম সে বাবাজীর আশ্রমে আসিয়া পরমানন্দে এই গণ্ডীটুকুর মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া ফিরিত। নির্জন মন্দিরের আবেষ্টনীর মধ্যে কোথায় কোন্ পাখী ডাকিল তাহার সন্ধান করিয়া ফিরিত। হাতে থাকিত ঢেলা—গাছে গাছে ঢেলা মারিয়া পাখীটাকে উড়াইয়া দেখিবার চেষ্টা করিত, প্রজাপতি ফড়িংয়ের পিছনে পিছনে সন্তর্পণে অনুসরণ করিত। ফুল তুলিত—ছিঁড়িত। মন্দিরের দেবতার বেশ-পরিবর্তন দেখিত। বাবাজীর কাছে পড়িতে বসিত, গল্প শুনিত। মায়ের আখড়া গ্রাম, বাগ্‌দীদের গ্রাম পার হইয়া এখানে আসিয়া অনেক কিছু পাইয়াছে, মনে হইয়াছিল। এখান হইতে মধ্যে মধ্যে এই বর্ধিষ্ণু গ্রামখানির ভিতর ঢুকিত কিন্তু ভয় লাগিত। প্রথম যেদিন সে একা আখড়া হইতে বাহির হইয়া এখানকার বাজারের দিকে গিয়াছিল, সে দিন হাঁ করিয়া চারিপাশ দেখিয়া চলিতে গিয়া একটা গরুরগাড়ীর সামনে পড়িয়া প্রচণ্ড ধমকে চমকিয়া উঠিয়াছিল; ছুটিয়া সে আখড়ায় ফিরিয়া আসিয়াছিল। ক্রমে ক্রমে তাহার সাহস বাড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সে যেন ডাক শুনিল। বিচিত্র বিস্তৃত পৃথিবীর ডাক। মস্ত বাজার, সপ্তাহে দু'দিন হাট, ইস্কুল, ডাকঘর—এসবের চারিপাশে মানুষ ভিড় করিয়া, দলে দলে আসিতেছে—যাইতেছে।

বাজারে কত জিনিস—বর্ণে গঠনে চোখকে ডাক দেয়, কত খাবার গন্ধে আকৃষ্ট করিয়া তাহাকে টানে। বৈকালে ইস্কুলের ছেলেরা মাঠে ফুটবল খেলিতে যায়। সেখানে গিয়া খেলা দেখিয়া সে একেবারে লোলুপ হইয়া উঠিল। নিত্য গিয়া সে বসিয়া থাকিত মাঠের ধারে। খেলার বলটা বাহিরে গেলেই ছুটিয়া সেটাকে দুই হাতে তুলিয়া বুকে ধরিয়া আনিয়া ছুঁড়িয়া দিত। ক্রমে পায়ে করিয়া মারিয়া দিতে শুরু করিল। এখন সে দলের একজন খেলোয়াড় হইয়া উঠিয়াছে। অনেক ছেলের চেয়েই তাহার পায়ের শট জোরালো। ওখান হইতেই একদিন চলিয়া গিয়াছিল জংশন স্টেশন—রেলগাড়ী দেখিয়া আসিয়াছে; লোহার গাড়ী লাইনের উপর দিয়া ছুটিয়াছে। ওখানেই দেখিয়া আসিল মোটর। ওখানেই দেখিল টেলিগ্রাফের খুঁটি—কান পাতিয়া শব্দ শুনিল—গোঁ-গো করিতেছে।

আশ্চর্য পৃথিবী! ছুটিয়া চলিয়াছে, লোহার গাড়ী ছুটিয়াছে, মোটর গাড়ী ছুটিয়াছে, তারে তারে খবর ছুটিয়াছে, মানুষও ছুটিয়াছে, দেহের শক্তিতে কুলাইতেছে না, তবু সে ছুটিতেছে—চোখে তাহার প্রখর দৃষ্টিতে দুর্জয় আকাঙ্ক্ষা। প্রচণ্ড তাহাদের গতিবেগের আকর্ষণ। শান্ত মন্থরগতি একটি স্নিগ্ধ নীলাভ গ্রহের একটি মণ্ডল হইতে একটি গ্রহপিণ্ড আর একটি প্রচণ্ড গতি-বেগে ঘূর্ণ্যমান উজ্জ্বল লাল এক প্রদীপ্ত গ্রহমণ্ডলীর কাছে আসিয়া—তাহারই আকর্ষণে বিচ্ছিন্ন হইয়া উল্কাখণ্ডের মত ছুটিয়া চলিল তাহারই দিকে। এ আকর্ষণ বেগ সম্বরণ করার শক্তি তাহার কোথায়? সে কি করিবে?

শেষ আকর্ষণ ও শ্রেষ্ঠ বৈচিত্র্য লইয়া একদা এই গ্রামে আসিল মোটর বাস। এখান হইতে নিয়মিত যাতায়াত করিবে জংশন স্টেশন।

ব্রজদাসী বলিল—ও যদি ম'রে যেত, তবে বুকের শেলের আঘাত নিয়ে চলে যেতাম আপনার পথে। আমি কি করব?

—আমি একটা কথা বলব ব্রজ? পারবে?

—পারব। বলুন। এ আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

—যে পথে যাত্রা করেছিলে, যে পথে মাঝখানে ওই ওকে জীবন দেবার জন্যে থেমে রয়েছ, সেই পথে বেরিয়ে পড় তুমি। তোমার কাজ তো হয়ে গেছে। দুলাল তো এখন জোয়ান হয়ে উঠেছে।

ব্রজদাসী কথা বলিতে পারিল না, শুধু বাবাজীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বাবাজী বলিলেন—অনেক দিন আগে ব্রজ, তুমি যেদিন প্রথম আমার আখড়ায় এসেছিলে—সেদিন একটা কথা তোমাকে বলেছিলাম, তুমি কথাটা শুনে তার আঁচ পেয়েছিলে কিন্তু অর্থ বুঝতে পার নি। একটু চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করেছিলে—কি বললেন প্রভু! আমি কথাটার উত্তর দিই নি। অন্য কথা পেড়েছিলাম। তুমিও ভুলে গিয়েছিলে। তোমার মনে নাই, আমার মনে আছে। দুরন্ত দামাল ছেলেটি তোমার কোলে থাকতে চাইছিল না, তুমিও ছেড়ে দিচ্ছিলে না, অবশেষে আমিও বললাম—তুমিও ছেড়ে দিলে—ও মনের আনন্দে আখড়ার নাট-মন্দিরময় ছুটোছুটি শুরু করে দিলে। আমি বলেছিলাম—এই তো শুরু। ফল কি গাছের বোঁটার বাঁধনে চিরদিন বাঁধা থাকে! গাছের মত বেদনাই হোক, সে খসবে—সে মাটির বুকে গাছ হয়ে মাথা তুলবে—ফুল ফলাবে—ফল ধরাবে! এই নিয়ম।

তত্ত্বকথায় ব্রজদাসীর মন প্রবোধ মানিল না। সে বিষণ্ণ অপ্রসন্ন মন লইয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

—ব্রজ!

ব্রজ এবার বলিল—ও যে মদ ধরলে!

—ধরুক। ওর পথ এখন ওর চোখে, তোমার দেখানো পথে তো চলবে না। এই তো তোমার কথাই ধর না, তুমি যেদিন প্রভুর আশ্রয়ে যাবার জন্তে পথে বেরিয়ে ওকে পেলে—সেদিন ওকে কোলে নিয়ে আবার উল্টো মুখে পথ হাঁটতে শুরু করলে—সেদিন তো রতন পাগল তোমাকে বলেছিল—ও যাক—ওর ভাগ্যে যা আছে হবে—তুমি চলে যাও নিজের পথে। তুমি তা যাও নি। গেলে ভাল করতে। দুলালও আজ তাই করেছে ব্রজ।—তোমাকে আমি ভালই বলছি। তুমি চলে যাও। তোমার ডাক এসেছে।

ব্রজ হঠাৎ উঠিয়া বলিল—আমি আজ যাই! গোপালের আমার আরতি আছে!

সে চোখ মুছিল, মুখে হাসি ফুটাইবার চেষ্টা করিল, বলিল—পাপীর মন প্রভু, হতভাগার কথাই শুধু চিন্তাই করছি, আমার গোপাল যে ঘরে বদ্ধ রয়েছেন—সে কথা মনেই নাই। যাক —হতভাগা আপন পথে, আমার গোপাল আছেন।

পিছন হইতে বাবাজী ডাকিলেন—শোন ব্রজ।

ব্রজ ফিরিল।

বাবাজী বলিলেন—বস। বাবাজীর মুখ দেখিয়া ব্রজ বিস্ময়ে শঙ্কায় অভিভূত হইয়া গেল। বাবাজীর চোখ জলে ভরিয়া উঠিয়াছে, ঠোঁট দুইটি কাঁপিতেছে, আত্মসম্বরণের চেষ্টায় তিনি আকাশের দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন।

ব্রজ পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল, কথা বলিতে পারিল না, বসিবার সামর্থ্যও হইল না।

হাতের আঙুল নাড়িয়া ইসারায় বাবাজী বলিলেন—বস।

ব্রজ বসিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পর বাবাজী বলিলেন—আমার অপরাধের কথা তোমায় বলব বলে ডাকলাম। বস।

ব্রজ আক্ষেপ করিয়া হাসিয়া মনে মনেই বলিল—আপনার অপরাধ! সে আর কতবার শুনব! প্রায়ই বাবাজী বলেন—শিক্ষার দোষ আমার, আমি ঠিক দিতে পারলাম না বলে নিলে না।

বাবাজী বলিলেন—তোমার কাছে আমার অনেক ঋণ, অনেক অপরাধ। দুলাল মহেশের সন্তান নয়, ও আমার পাপ!

ব্রজদাসী চমকিয়া উঠিল—শব্দহীন কণ্ঠে প্রশ্বাস দিয়া সে বলিয়া উঠিল—প্রভু!

—হ্যাঁ ব্রজ। ও আমার পাপ। মহেশ ওর মাকে দেখে পাগল হয়ে উঠেছিল, তাকে ঘরে এনেছিল। কিন্তু ধর্মকে লঙ্ঘন করতে পারে নি। মনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আমার কাছে এসে পড়ল—বললে—আপনি আমার গুরু—আমাকে রক্ষা করুন, ত্রাণ করুন। আমি তাকে পরিত্রাণ করতে মেয়েটিকে আশ্রয় দিলাম—এই আখড়ায়। মানুষকে পরিত্রাণ করা সহজ নয় ব্রজ;, পরকে মুক্ত করতে গিয়ে নিজেকে বন্দী হতে হয়, পরকে ঠেলে তুলতে নিজেকে নীচে নামতে হয়। আমি পড়লাম, আমি—।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—ও যখন তার দেহের মধ্যে এল—তখন তার আনন্দ দেখে আমি ওকে নষ্ট করতে পারি নি। নইলে—। অনেক যত্নে তাকে লুকিয়ে রাখলাম, ভাবলাম—সন্তান কোলে এলে—ওকে দূরে-দূরান্তরে সরিয়ে দেব। কিন্তু প্রসব করেই সে মারা গেল। অনেক ভাবলাম, অবশেষে মহেশকে ডেকে বললাম—তুমি আমার ত্রাণ কর। ওকে শ্মশানে ত্যাগ ক'রে এস। মহেশ বলেছিল—শ্মশানে? বলুন কাউকে দিয়ে আমি পালন

করাই। আমি বলেছিলাম—না। পাপের দহন অন্তরে-অন্তরে সহ্য করা যায় ব্রজ কিন্তু মূর্তি ধরে পাপ এসে সামনে দাঁড়ালে তাকে সহ্য করা যায় না। মহেশ মাথা হেঁট ক'রে ওকে নিয়ে গেল। পরদিন ওর মায়ের সমাধি দিলাম এই আখড়ায়। ওকেও এইখানে সমাধি দিলেই ভাল হ'ত। কিন্তু জীবন্ত শিশু—বৈষ্ণবের আখড়া—তা পারি না। ওর মায়ের সমাধি শেষ হয়েছে—এমন সময় মহেশ এল—বললে—শ্মশানে কোল পেতে বসেছিলেন মা-যশোদা। আমার কলঙ্ক মাথায় নিয়ে মহেশ ওকে তোমার কোলে তুলে দিলে, আমি তোমার ওখানে গিয়েছিলাম—তোমার গান শুনতে নয়, তোমাকে দেখতে। দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। ভেবে-ছিলাম—তোমার পুণ্যে আমার পাপ মুক্তি পাবে। তাই মনের বাসনা সম্বরণ করেছিলাম প্রাণপণে, নইলে সেদিন সাধ হয়েছিল—তোমার হাত ধ'রে বলি—বৈষ্ণবী ওকে যখন কোলেই নিয়েছ—তখন আমারও হাত ধর, এস আমরা ঘর বাঁধি। আবার কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন—এই জন্যই যখন তুমি বলেছ—আপনার এখানে আমায় আশ্রয় দিন—আমি বলেছি—না।

কতক্ষণ কাটিয়া গেল—দু'জনের কাহারও খেয়াল ছিল না। হঠাৎ কল কল করিয়া পাখী ডাকিয়া উঠিতেই দু'জনের চমক ভাঙিল। সূর্য অস্ত গিয়াছে, চারিদিক হইতে গোল হইয়া অন্ধকার তাহাদের দুজনের দিকে আগাইয়া আসিতেছে। বাবাজী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—আমার কারণে তুমি কষ্ট পেলে—সেইটেই আমার আক্ষেপ—সেই আমার বেদনা। নইলে—।

হাসিয়া বাবাজী বলিলেন—নইলে এ কষ্ট পেতেই হয়। আমার নিজের ছেলেকে দেখেছ তো। স্বদেশী ক'রে জেল খাটে;—তোমার দুলালও সেখানে যায়—শোভা দিদির কাছে। সে আমার কাছে সেদিন এসেছিল—এবার আবার নাকি খুব বড় একটা স্বদেশী মাতন আসছে। আমার কাছে এসেছিল দেখা করতে। বলে গেল—। এবার নাকি গুলি-গোলা চলবে। তাতে যদি মারা যায় তবে দেখা হবে না। আমার যন্ত্রণা তোমার চেয়েও বেশী। অনেক ভেবে পরিত্রাণের পথ পেয়েছি। আমি চলে যাব, প্রভুর আশ্রমেই যাব। পরিত্রাণ যদি চাও তবে তুমি—। আমার সঙ্গে যেতে বলব না। আমার যেতে দেরি হবে। তুমি দেরি ক'র না। মন যদি স্থির করতে পার, সঙ্গে সঙ্গে চলে এস, আমি তোমাকে টিকিট করে ট্রেনে তুলে দেব।

পনের

দুলাল প্রতিজ্ঞা করিল—সে আর ওই রাক্ষসীর কাছে ফিরিবে না। কিছুতেই না। তাহার গায়ে মদের গন্ধ পাইয়া সে তাহাকে কুষ্ঠ রোগীর মতো দূরে ঠেলিয়া দিয়া ছুটিয়া গেল। রাস্তার উপর দুলাল লোকের হাতে লাঞ্ছিত হইল ঐ রাক্ষসীর জন্য। কখনও আর সে ওই বৈরাগিনীর মুখ দেখিবে না। মা হইয়াছে তো কি হইয়াছে? ঐ মায়ের জন্য তাহাকে কত ইঙ্গিত সহ্য করিতে হয়। লোকে তাহার মুখের সম্মুখে বলিতে সাহস করে না, আড়ালে বলে, অস্পষ্ট হইলেও তাহার কানে আসে। হঠাৎ সে থমকিয়া দাঁড়াইল; ইচ্ছা হইল ছুটিয়া গিয়া ওই রাক্ষসীকে গিয়া ধরে, বলে—বল—বল আমাকে আমার বাবার নাম? বল কেন বাবাজীকে

জড়াইয়া—ওই ঘোড়লকে জড়াইয়া লোকে তোর নামে বাঁকা হাসি হাসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা বলে ? কেন বল্ তুই আমাকে জন্ম-মাত্র মারিয়া ফেলিস নাই ?

কয়েক পা গিয়া—আবার থমকিয়া দাঁড়াইল।—থাক। তোর জন্য সহ্য করিয়াছি। সে লইয়া তোর উপর কোন রাগ নাই আমার, কিন্তু তুই আমাকে মাথা মুড়াইয়া কণ্ঠী পরাইয়া বৈরাগী বানাইবি—কোথা হইতে একটা ভূতের মতো মেয়ে আনিয়া আমার গলায় গাঁথিয়া দিবি—তাহা আমি কোন মতেই সহ্য করিব না। তাহার উপর তুই আজ বিনা অপরাধে আমাকে অস্পৃশ্যের মতো ঘৃণা করিয়া পথের মাঝখানে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া চলিয়া গেলি, যা—তুই তোর পথে চলিয়া যা, আমি আমার পথে যাইব।

পথ খুঁজিতে গিয়া দুলালকে আবারও দাঁড়াইতে হইল।

বাসের আড্ডার পথটা সোজা চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু ওই শিউচা আর ওই দেওকীর কদর্য হাসিভরা কুৎসিত মুখ মনে পড়িয়া গেল। রঙ্গিকে মনে পড়িয়া গেল। রঙ্গি আসিবে তাহার সঙ্গে আলাপ করিতে। না—সেও তাহার সহ্য হইবে না।

হঠাৎ সে বাঁ দিকের একটা পথ ধরিয়া হন হন করিয়া হাঁটিতে শুরু করিল। আসিয়া উঠিল রাধাচরণের চরখার আখড়ায়। চীৎকার করিয়া ডাকিল—শোভা দিদি !

শোভা দিদি বাহির হইয়া আসিলেন।—কে ? এ কি—দুলাল ? এ কি চেহারা তোমার ?

দুলাল হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—আমাকে ধ'রে জোর করে মদ খাইয়ে দিলে।—ওই শিউচা, ওই দেওকী !

অবাক হইয়া গেলেন শোভা দিদি।

দুলাল আপন মনে অনর্গল বলিয়া গেল তাহার দুঃখের কথা। এক নিশ্বাসে সমস্ত কথা বলিয়া সে যেন বাঁচিয়া গেল, বলিল—আমাকে একটু ঠাঁই দাও শোভাদি। আমাকে যা বলবে তাই করব।

শোভা দিদি হাসিলেন—বলিলেন—না, তুমি বাড়ী যাও ! তোমার মা কত দুঃখ পেয়েছেন বল তো।

দুলাল সঙ্গে সঙ্গে ফিরিল।

—দুলাল !

—না। সে হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাত মুঠা করিয়া আস্ফালন করিয়া বলিল—হাম ব্রিজনন্দন, কোইকে পরোয়া নেহি করতা হ্যায়। চলো মুসাফের—

বাহির হইয়া সে চলিতে শুরু করিল। কোথায় যাইবে ঠিক নাই। কিন্তু ব্রিজনন্দন কাহারও তোয়াক্কা রাখে না। দুনিয়াতে কাহাকেও ভয় করে না, কিছুকেও ভয় করে না। আপন মনেই সে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল—বন্দেমাতরম, ইনক্লাব জিন্দাবাদ, গান্ধীজী কি জয়, সুভাষবাবু কি জয়, সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক ; আপ্-আপ্ ন্যাশানাল ফ্ল্যাগ, মারো ডাণ্ডা তোড়ো দুনিয়া ! শালা মার ডালো—। বনমে যায়ে গা—বাগ মারে গা—হাতীকে দাঁত তোড়ে গা।

বনে যাইবে—বাঘ মারিবে—হাতীর দাঁত ভাঙিবে—নগরে যাইবে—রাজাকে মারিবে—উজীরকে মারিবে। নদীতে ডুবিয়া কুমীর সে মারিয়াছে। এমনি সব অর্থহীন চীৎকার করিতে করিতে পাগলের মতই সে চলিল।

মানগোবিন্দপুর পার হইয়া চলিল সে। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। হোক। সারা রাত্রি

পথ চলিবে। সদর রাস্তার পথ নয়। পদচিহ্নহীন মাঠের প্রান্তরের পথে। যে পথে লোকের সঙ্গে দেখা হইবে না। কাহারো কোন প্রশ্নের জবাব দিতে হইবে না। রক্তে যেন তাহার বান ডাকিয়াছে—মদের প্রভাব আর তাহার নাই, কিন্তু অদ্ভুত উত্তেজনা তাহার শিরায় শিরায়।

হঠাৎ সে একটা শব্দ করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

কে যেন কিসে প্রচণ্ড আঘাত করিতেছে!

ঠুই-ঠুই-ঠক্-ঠক্। ঠুই-ঠুই-ঠক্-ঠক্।

সামনে ঘন জঙ্গল।

দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া দুলাল ভ্রূ কুঞ্চিত করিল।—কোথায় আসিয়াছে সে?—এ তো—! এ তো বাগ্দীপাড়ায় নদীর ধারের জঙ্গল—! এটা তো শ্মশানটা! ওই তো সামনেই রতন পাগলার পাথর বুড়ীর আস্তানা।

অবিরাম শব্দ উঠিতেছে—ঠক্—ঠক্—ঠুই—ঠুই!

সে চীৎকার করিয়া উঠিল—কে রে?

ওদিক হইতে রতন বুড়ার হুঙ্কার উঠিল—নিকাল! নিকাল!

দুলাল আবার চীৎকার করিয়া বলিল—এও—পাগ্‌লা!

প্রচণ্ড জোরে আঘাতের শব্দ উঠিল—ঠক্—ঠক্—ঠুই—ঠুই। সঙ্গে সঙ্গে রতন হাঁক দিল—নিকাল! আভি·নিকাল!

দুলাল রতনের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। বুড়া শয়তান—! সকল আক্রোশ যেন তাহার উপর গিয়া পড়িল। অসুস্থ মস্তিষ্কে মুহূর্তে তাহার অভিপ্রায় জাগিয়া উঠিল—রতন বুড়াকে, মহেশ মণ্ডলকে, আর ওই বাবাজীটকে আজই রাত্রে মারিয়া সে ফেরার হইবে। তারপর দেশান্তরে—বনে হোক—নগরে হোক চলিয়া গিয়া সে বাস করিবে। বায়ুমণ্ডলে একটা ঘুষি চালাইয়া সে বলিল—যেখানে গিয়ে ডাণ্ডা গেড়ে বসব—সেইখানেই হম্ র‍্যাজ বনায়েগা। চলো মুসাফের! সে শ্মশান পার হইয়া আসিয়া উঠিল—রতন ক্ষ্যাপার পাথর বুড়ীর আশ্রমে।

সে অবাক হইয়া গেল।

অন্ধকারের মধ্যে একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়াছে পাগল। সেই আগুনের লালচে আলোয় পাগলকে দেখাইতেছে প্রেতের মতো; চোখ দুইটা কুঁচ ফলের মতো লাল—তাহাতে এক বিচিত্র ভয়াল উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি, সর্বদেহের পেশীগুলি দড়ির মত শক্ত এবং প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। একটা হাতুড়ি লইয়া ওই পাথরটার উপর আঘাত করিয়া প্রকাণ্ড বড় পাথরটাকে ভাঙিয়া ফেলিয়াছে। এখন সে কুড়ুল লইয়া আঘাত করিতেছে শিমুলগাছটার গোড়ায়—আর চীৎকার করিতেছে—নিকাল—নিকাল!

বাগ্দীপাড়ার লোকগুলি সভয় দৃষ্টিতে চাহিয়া সারিবদ্ধ মাটির পুতুলের মতো দূরে দাঁড়াইয়া আছে। নিস্পন্দ নির্বাক।

দুলাল ডাকিল—এই বুড়ো—! ও কি হচ্ছে?

রতন গর্জন করিয়া উঠিল—ক্যা-ও! হাতের কুড়ালখানা ফেলিয়া দিয়া আগাইয়া আসিল—

—তুই এখানে কেন রে—বৈরেগীর বাচ্চা?

—হচ্ছে কি?

বাগ্দী বুড়ী ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—সরে আয় দুলাল, সরে

আয়। আজ ওর মা জাগবে। পাথর ভেঙেছে, মা বেরিয়ে গাছে লুকিয়েছে—গাছ কেটে মাকে বের করবে রে!

দুলাল হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বুড়াও সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া উঠিল—এই ঠিক হয়েছে! তোকে বলিদান দিলেই মা জাগবে! শ্মশানে বষ্টুমী মায়ের কুড়নো ছেলে—বুড়ীও হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

* * *

রাত্রির অন্ধকারে দুলাল আসিয়া আখড়ার উঠানে দাঁড়াইল। প্রেতের মত মূর্তি হইয়াছে তাহার। চোখ দুইটা জ্বলিতেছে। দাঁতে দাঁত ঘষিতেছে নিষ্ঠুর আক্রোশে।

ডাকিল—মা!

কেহ উত্তর দিল না।

আবার সে ডাকিল—মা!

কোন সাড়া পাইল না। সে এবার দরজায় ধাক্কা দিল। বন্ধ দরজার তালা শব্দ করিয়া উঠিল। কোথায় গেল?

যেখানে যাক্, ফিরিবে তো! দুলাল মায়ের প্রতীক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ব্রজদাসীর কাছে সে কৈফিয়ৎ চাহিতে আসিয়াছে। রতন পাগল তাহাকে বষ্টুমী মায়ের কুড়ানো ছেলে বলিয়াছে। শুনিয়া সে উন্মত্তের মতো অতর্কিতে বুড়াকে চাপিয়া ধরিয়া মাটিতে ফেলিয়া বুকে বসিয়া বলিয়াছিল—বল, কি বললি?

বুড়া ভয় পায় নাই। বুড়া তাহাকে বলিয়াছে—মহেশের বেজাত পুত্র সে। শ্মশানে তাহাকে ফেলিয়া দিয়াছিল—বৈষ্ণবী তাহাকে কুড়াইয়া লইয়া মানুষ করিয়াছে।

দুলাল স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছে।

বুড়াকে ছাড়িয়া দিয়া সে পলাইয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছিল, পথ হইতে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে ব্রজদাসীর কাছে। জিজ্ঞাসা করিবে—কথাটা সত্য কিনা! সত্য যদি হয়—তবে কেন সে তাহাকে কুড়াইয়া লইয়াছিল! কেন—কেন?

—কে?

ব্রজদাসীর শঙ্কিত কণ্ঠস্বর। কতক্ষণ দুলালের খেয়াল ছিল না, স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

ব্রজদাসী আবার প্রশ্ন করিল—দুলাল!

দুলাল যে তাহার প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিবে—এমনই একটা প্রত্যাশা লইয়া সে আখড়ায় প্রবেশ করিয়াছিল। সেও যে ফিরিতেছে ওই বাগ্দীপাড়া হইতে।

বাবাজীর ওখান হইতে ফিরিয়া সে বৃন্দাবনে যাইবার উদ্যোগই করিতেছিল।

মহেশকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইয়া বলিয়াছিল—তুমি দেবতা! তোমাকে আমি অনেক কটু বলেছি, আমাকে তুমি মাপ কর। বাবাজী আমাকে সব বলেছেন।

মহেশ বিষণ্ণ হাসিয়া বলিয়াছিল—আপনি আমার মহাপাতক ঘটালেন মা-জী! আপনার প্রণাম নেবার মত লোক্ আমার চোখে দেখি নাই। গুরুর কলঙ্ক মাথায় নিয়েছিলাম—তাতে আমি সুখ পেয়েছিলাম মা-জী। তাকে আমি বড় ভালবাসতাম। তার সন্তান!

বেচারী কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল।

ব্রজ বলিয়াছিল, দুলালের ভার তা হ'লে তোমার ওপর রইল।

—সে কি? আপনি—

—আমি বৃন্দাবনে যাব। কাল সকালেই। বাবাজী আদেশ করেছেন, আমারও মন উঠেছে।

হাত জোড় করিয়া মহেশ কি বলিতে গিয়াছিল, সঙ্গে সঙ্গে ব্রজ হাত দুটি জোড় করিয়া বলিয়াছিল।—কিছু বলবেন না, আমার আর সহ্যশক্তি নাই!

মাথা হেঁট করিয়া মহেশ চলিয়া গিয়াছিল। ব্রজ বলিয়াছিল—বৃন্দাবনে যাইবার আয়োজন করিবে। কি-ই বা আয়োজন! খুঁজিয়া পাতিয়া বাহির করিল—পুরাতন ঝোলাটি। সে ঝোলাটির ভিতরের জিনিসগুলি তেমনি আছে। ওটি সে নাড়ে নাই। একবার ঝোলার মুখ খুলিয়া ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। দুই একটা পুরানো জিনিস পাল্‌টাইয়া লওয়া, পুরানো আয়নাখানা আজ ষোল বৎসরে অব্যবহার্য হইয়া গিয়াছিল, সেখানা বাহির করিয়া দিয়া—নূতন আয়না লওয়া, পুরানো তেলের শিশি পাল্‌টানো, তিলক মাটি পুরানো চন্দনকাঠ টুকরাটাও বদলাইতে হইল। দুইখানা নূতন কম্বল, একটা বালিশ—।

হঠাৎ কাহার পায়ের শব্দে সে চমকিয়া উঠিয়াছিল—কে?

মহেশ মণ্ডল হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিয়াছিল—মা-জী, রতন পাগলের নাকি শেষ অবস্থা!

—সে কি?

—হ্যাঁ—আমি যাচ্ছি। যাবেন দেখতে?

—যাব। কিন্তু হঠাৎ কি হল?

—লোকে বলছে গাছ চাপা পড়েছে।

—গাছ চাপা!

—হ্যাঁ। বলছে—গাছ কেটে মাকে বের করতে গিয়েছিল—যাবে তো এস।

—চল।

ছুটিয়া বাহির হইয়াছিল ব্রজদাসী। যাইবার আগে রতনবাবার পায়ের ধূলা লইবার ইচ্ছাও তাহার ছিল।

রতন পাগল গাছ. চাপা পড়িয়াছে। গাছ কাটিবার সময় দুলাল আসিয়া বাধা দিয়াছিল। দুলাল চলিয়া যাইবার পর—উঠিয়া কুড়ালখানা কুড়াইয়া লইয়া একবার তাহার পিছনে ছুটিবার উদ্যোগ করিয়াছিল—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে গাছে কোপ মারিয়া বলিয়াছিল—ছলনা—আমার সঙ্গে ছলনা! ওই বৈরেগীর বাচ্চাকে পাঠিয়ে আমাকে ভুলাবি? ওর পিছনে ছুটব আর তুই এদিকে পিটটান দিবি?

কয় দিন হইতে রতন উন্মাদ পাগল হইয়া উঠিয়াছিল। এবার তাহার উন্মত্ততার ধারা অন্য রকম। অন্য অন্য বারে সংসারের সকলকে কাটিবার ঝোঁক লইয়া হইত। এবার সে দিন-কয়েক ওই মায়ের স্থানে আহার নিদ্রা ছাড়িয়াছিল। খাওয়া-দাওয়া ছিল না, শুধু গাঁজা খাইয়াছে আর চীৎকার করিয়াছে। দু'দিন হইতে চীৎকার করিয়া গোটা আমবাগানময় ছুটিয়া বেড়াইয়াছে। সন্ধ্যায় হঠাৎ বাড়ী আসিয়া বলিয়াছিল—হাতুড়ি দেখি—হাতুড়ি!

হাতুড়ি হাতে করিয়া গোটা পাড়ায় ঘোষণা করিয়া বলিয়াছিল—আজ রাতে মাকে বার করব। খবরদার কেউ বাইরে বেরুবি না। খবরদার! খবরদার!

গাঢ় অন্ধকার-ভরা কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত্রি। লোকগুলি জানালা খুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল। ছেলেরা কাঁদিলে সভয়ে মুখচাপা দিয়া বলিয়াছে—চুপ! ওদিকে গাঢ় অন্ধকারের

মধ্যে জমাট অন্ধকারের একটা স্তূপের মত ওই আমবাগানটার মধ্যে অনবরত সমানতালে দুইটা কঠিন বস্তু সংঘর্ষের শব্দ উঠিতেছে, ঠুই—ঠুই ঠুই—ঠুই!

মধ্যে মধ্যে রতন পাগলের হিংস্র চীৎকার উঠিতেছে—নিকাল! নিকাল!

কখনও কখনও চীৎকার করিতেছে—অ্যা-ই।

হাতুড়ি মারিয়া সে যেন আঁধার ঘরের লোহার কপাটে হানা দিয়াছে।

কিছুক্ষণ পর শব্দ থামিল। পাগল ফিরিয়া আসিয়া কুড়াল লইয়া বাহির হইয়া গেল। চীৎকার করিয়া বলিয়া গেল—আয় সব দেখবি আয়।

ফিরিয়া গিয়া আগুন জ্বালিল। আগুনে জঙ্গলটা আলো হইয়া উঠিল। পাড়ার লোক সভয়ে আসিয়া দূরে দাঁড়াইল—সারিবদ্ধ মাটির পুতুলের মত।

পাগল গাছ কাটিতেছিল, হঠাৎ কুড়াল চালানো বন্ধ করিয়া বলিল—বেরিয়েছিল।

অর্থাৎ পাথরের মধ্যবর্তিনী তাহার ইষ্ট দেবী।

—বেরিয়েছিল। পাথরটা ভাঙলাম, বেরিয়ে ঢুকে গেল শিমূল গাছটার গোড়ায়। এইবার গাছটা কাটব। নইলে গেল কোথা? যাবে কোথা?

সাধারণ মানুষ এ প্রশ্নের উত্তর কি দিবে। পাগল গাছ কাটিতে শুরু করিয়াছিল।

দুলাল চলিয়া যাইবার পর সে দ্বিগুণ উৎসাহে গাছের উপর কুড়াল চালাইল। বার বার বলিল—বৈরেগীর বাচ্চাটাকে পাঠিয়ে আমাকে ছলনা!

দেখিতে দেখিতে মড়মড় শব্দ উঠিল।

পাগল গাছটা পড়িবার দিক ঠাওর করিতে ভুল করিল না, বিপরীত দিকেই সরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—নিকাল! অব্ নিকাল!

মুহূর্তে একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল—বড় গাছটা পড়িবার সময় আর একটা গাছের উপর পড়িল—সেই গাছটার একটা ডাল আছাড় মারিয়া পড়িল পাগলের উপর।

মুমূর্ষু অবস্থা—এখনও কিন্তু চীৎকার করিতেছে মধ্যে মধ্যে—নিকাল!

নিষ্ঠুরতম যন্ত্রণার মধ্যেও রক্তাক্ত পিষ্ট বিকৃত-মূর্তি পাগল কঠোর মুষ্টি প্রসারণ করিয়া কিছু যেন আঁকড়াইয়া ধরিতে চেষ্টা করিল। শেষ হাতটা পড়িয়া গেল—বাঁকানো আঙুলের খোলা মুঠি মেলিয়া।

কে যেন বলিল—দে হাতে পাথর দিয়ে দে। বল—এই তোমার আপনার। এই নিয়ে যাও তুমি। ছেলে-পিলে যারা রইল—তাদের দিকে হাত বাড়িয়ো না। কিন্তু কেহই সে সাহস করিল না। ও মুঠির মধ্যে যাহাকে পাইবে—তাহাকে ছাড়াইয়া লইবার শক্তি বোধ করি যমেরও হইবে না। মরিলেও মুঠি খুলিবে না।

বৈষ্ণবী পাড়ার প্রান্ত হইতেই ফিরিল। দেখিবার শক্তি হইল না তাহার। সে তাহার বাপের চেয়ে বেশী স্নেহশীল ছিল। একদিন গরুড়ের মত পক্ষ মেলিয়া তাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। বনবাসের মধ্যে আশ্রয় দিয়াছিল সেকালের মুনিঋষির মত। তাহার এ শেষ দশা দেখিবার মত শক্তি সে সংগ্রহ করিতে পারিল না।

বাগ্দীবুড়ী বলিল—ভাগ্যে দুলাল পালিয়েছিল মা! নইলে—তাকে নিয়েই ও যেত। তাকে আর কুবাক্যি বলতে বাকী রাখে নাই। বললে মহেশের—ওই মোড়লের, ছি—ছি —ছি—।

সব শুনিয়া ব্রজর মনে হইয়াছিল—সে আসিবে। সে হয়তো রতনের মতই আজ তাহাকে কাটিয়া—খুঁজিয়া দেখিবে তাহার মা-কে সে পায় কি না।

অন্ধকারে আখড়ায় ঢুকিয়াই দেখিল উঠানে প্রেতের মত দাঁড়াইয়া আছে। তবু সে প্রশ্ন করিল—কে?

দুলাল এবার ফিরিয়া দাঁড়াইল—

—দুলাল?

চীৎকার করিয়া উঠিল দুলাল—কোথা গিয়েছিলি?

—রতনবাবাকে দেখতে।

আবার দুলাল চীৎকার করিয়া উঠিল—রতন পাগল আমাকে ও কথা বললে কেন? তুই আমার মা নোস?

ব্রজ ভাবিয়া পাইল না কি উত্তর দিবে! অন্ধকারের মধ্যেও দুলালের মুখ সে দেখিতে পাইতেছে। অন্ধকার যেটুকু অস্পষ্ট করিয়া রাখিয়াছে তাহার অন্তরের মমতায় প্রদীপের আলোয় সেটুকু স্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে; তাই বা কেন—ওই আলোতে শুধু দুলালের বাহিরটাই না—ভিতরটাও দেখিতে পাইতেছে। দুলালের চোখে আগুন জ্বলিতেছে—কিন্তু ব্রজ দেখিল—ওই আগুনের মধ্যে চোখের জলের ঢেউ উঠিয়াছে। দুলালের ওই কর্কশ রূঢ় চীৎকারের অন্তরালে বুক-ফাটানো আর্তনাদ প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছে। সে কি করিয়া বলিবে? আজ তাহার সত্য বলাই উচিত। কাল সে যাত্রা শুরু করিবে; দীর্ঘকাল পূর্বে পিছনে ফেলিয়া আসা পথের উদ্দেশে সে চলিতে আরম্ভ করিবে—আজ সকল মিথ্যার ঘর পৃথিবীর সম্মুখে খুলিয়া দিয়া সব দায় চুকাইয়া দেওয়াই উচিত। দুলাল আসুক—তাহার পরিচয়, সে যদি আজ বলে কেন তুই আমাকে কুড়াইয়া বাঁচাইয়াছিস্? তবে সে বলিবে—ওরে আমি যে বৈষ্ণবী, জাত আমার কাছে বড় নয়—জীব আমার কাছে সব চেয়ে বড়, তাই জাতিবিচার করি নাই, তাই আমার স্বর্গের পথে চলায় ছেদ টানিয়া তোকে শ্মশান হইতে কুড়াইয়া এত বড় করিয়াছি—তুই এখন যা—আপন পথে চলিয়া যা, আজ আমার মুক্তি। আমি আজ প্রভুর নাম লইয়া আমার পথে চলিলাম। আমি তোকে গর্ভে ধরি নাই, তবে প্রতারণা তোকে করি নাই, তোর মা বোধ হয় আমার বুকেই বাসা বাঁধিয়া আছে, বিশ্বাস না হয়—তুই আমাকে হত্যা কর।—ওই রতন-বুড়া পাথর ভাঙিয়া যেমন তাহার মাকে খুঁজিয়াছে—তেমনি করিয়া আমাকে খুন করিয়া দেখ—রতনের পাথরের মায়ের মত তোকে আমি ঠকাইব না, তুই তোর মাকে খুঁজিয়া পাইবি।

দুলাল আবার চীৎকার করিয়া উঠিল—মা! বল!

ব্রজ এবারও উত্তর দিতে পারিল না। সে চোখে দেখিতে পাইতেছে দুলাল ছুটিয়া পলাইতেছে—অন্ধকারে প্রান্তরের মধ্য দিয়া—

—মা! তোর পায়ে পড়ি—বল্ বল্।

এবার মৃদুস্বরে ব্রজদাসী বলল—কি বলব?

—তুই আমার মা নোস্?

ব্রজ বলিতে গেল—না। কিন্তু অকস্মাৎ কি যেন একটা জমাট-বাঁধা বস্তু বুক হইতে উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠিয়া তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ করিল—প্রাণান্তকর যন্ত্রণায় তাহাকে অধীর করিয়া তুলিল, সে একটা অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

দুলাল তাহার হাত চাপিয়া ধরিল—তুই কাঁদছিস? তবে তুই—তুই—

ব্রজদাসী দুই হাতে তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—তুই আমার ছেলে দুলাল,—আমি তোকে গর্ভে ধরেছি বাবা। দশ মাস দশ দিন—

দুলালের চোখের আগুনের অন্তরালে সত্যই জলের পাথার ছিল—আগুন নিভাইয়া সে

পাথার এব্যর উথলিয়া উঠিল—বলিল, তবে—তবে কেন বুড়ো—

—পাগল,—পাগলের কথা বাবা। নইলে পাথর ভেঙে দেবতা বের করতে যায়!

—না-না, তুই মিছে কথা বলছিস। আমার জাত নাই। আমার মা, সে—

—আমি তোর মা।

ব্রজদাসীর চোখে এবার আলো জ্বলিয়া উঠিল যেন।

দুলাল বলিল—তুই অমন ক'রে তাকাচ্ছিস কেন?

—আয়, আমার সঙ্গে আয়।

—কোথায়?

—আয়। সে মন্দিরের দুয়ার খুলিল। প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া দিয়া বলিল—শোন, এই আমার প্রভু সামনে, বল্ ওঁর সামনে তোকে যদি বলি—বিশ্বাস হবে তোর?

বিবর্ণ পাংশু হইয়া গেল দুলালের মুখ।

—শোন্—আমি তোর মা। আমার গর্ভে তোর জন্ম। পথে গাছতলায় তোকে আমি প্রসব করেছিলাম।

—আমার বাবা? লোকে পাঁচজনে গুজ-গুজ করে—

—আমার স্বামী তোর বাপ।

—সে তোর স্বামী?

—হ্যাঁ। স্বামী—

—কে? আমার বাবা? ওই—ওই মোড়ল?

—গোবিন্দ! গোবিন্দ! না—না—

—তবে? ওই বাবাজী?

ব্রজ দুলালের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।

—বল্?

ব্রজ বলিল, বলিল ঠিক নয়, বলিয়া ফেলিল, কি বলিবে ভাবিয়া না পাইয়াই বলিয়া ফেলিল—হ্যাঁ।

—তবে—। দুলাল কাঁদিয়া সারা হইয়া গেল।

ব্রজ বুঝিল। সে বলিল—আমরা দুজনে বৈষ্ণবের সাধন পথে মিলেছিলাম বাবা। তারপর সে পথে—ওই রতনের মত—আমাদেরও হ'ল পতন। তুই এলি আমার বুকে। লজ্জায় আমি ওকে ছেড়ে পথে বেরিয়েছিলাম। তারপর—

মিথ্যার পর মিথ্যা জুড়িয়া সে বলিয়া গেল। সে মিথ্যাকে সত্য করিয়া তুলিবার ভার মন্দিরের দেবতার পায়ে সমর্পণ করিয়া মনে মনে বলিল—সকল সাজা তুমি আমাকে দিয়ো। দুলালকে এ নিষ্ঠুর সত্যের আঘাত দিতে আমি পারব না, পারব না, পারব না!

দুলাল হঠাৎ উঠিয়া বলিল—আয় আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

—বাবার কাছে।

ব্রজদাসী মন্দিরের দাওয়ার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল। বলিল—আর আমি পারছি না দুলাল। আমাকে আজ তুই ক্ষমা কর, বাবা!

—তবে আমি চললাম।

—কোথায়?

—তার কাছে।

সে সেই অন্ধকার কৃষ্ণা চতুর্দশীর রাত্রেই বাহির হইয়া গেল। ভয় তাহার নাই। সে দুর্দান্ত —প্রচণ্ড তাহার দেহ—তাহার উপর প্রবল হৃদয়োচ্ছ্বাস তাহাকে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল।

সমস্ত রাত্রি ব্রজদাসী তেমনি ভাবে পড়িয়া রহিল। কোন প্রার্থনা জানাইল না। মন মস্তিষ্ক সব যেন পঙ্গু হইয়া গিয়াছে তাহার।

অমাবস্যার অন্ধকারের চেয়েও গাঢ় অন্ধকার চোখ বন্ধ করিয়া আপনার চারিপাশে সৃষ্টি করিতে পারে। সেই অন্ধকারের মধ্যে সে পড়িয়া রহিল।

পৃথিবী নিস্তব্ধ।

কতক্ষণ পর কে জানে—নিস্তব্ধ অন্ধকার পৃথিবীতে যেন প্রথম আলোকরেখার স্পর্শ লাগিল। ব্রজ অনুভব করিল, কে যেন তাহার কপালে স্নেহস্পর্শ বুলাইয়া দিতেছে—মৃদু সে স্নেহ, সে স্পর্শ। হাতখানা কঠোর কর্কশ, কিন্তু সেই হাতেরও স্পর্শটুকু মধুর, পাছে কর্কশ হাতের রূঢ়তা আঘাত করে—তাই মৃদু স্পর্শে হাত বুলাইতেছে।

—মা!—দুলাল ফিরিয়াছে।

—বাবা!

—আমি মদ খাই নি মা। ওরা আমাকে জোর ক'রে—। ছোট ছেলের মত দুলাল কাঁদিতে শুরু করিল।

—কখনও খেয়ো না বাবা। বৈষ্ণবের ছেলে তুমি—। আমি কাল চ'লে যাব, তোমার নিজের ভাল মন্দ—

—চলে যাবি? কোথায়? চীৎকার করিয়া উঠিল দুলাল।

—আমি বৃন্দাবনে যাব বাবা।

—না। না। না। দুলাল এবার উপুড় হইয়া মায়ের বুকের উপর ভাঙিয়া পড়িল। আমি আর—আর—। সে কথা বলিতে পারিল না—শুধু দীর্ঘ হাতখানা প্রসারিত করিয়া ব্রজদাসীর পায়ে ধরিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া রহিল।

—পা ছাড়, দুলাল।

—না। এবার সে বলিল—তোর পায়ে হাত দিয়ে বলছি। তুই যা বলবি—আমি শুনব।

ব্রজ এবার উঠিয়া বসিল। দুলালের কপালে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিল—গিয়েছিলি? দেখা হ'ল?

প্রশ্নের মর্ম বুঝিতে দুলালের বিলম্ব হইল না। সে বলিল—না।

—কেন?

—না। পথ হ'তে ফিরে এলাম। একটু নীরব থাকিয়া দুলাল বলিল—না। তাকে আমার দরকার নাই। আমরা বেশ আছি। তুই যা বলবি আমি শুনব। শুধু—

—কি? বল্?

—বিয়ে আমি করব না। না।

—বেশ। ব্রজ হাসিল। ষোল বছরের দুলাল—তাহার মনে বিবাহের সাড়া আজও জাগে নাই।

ষোল

ব্রজদাসী থাকিয়া গেল।

তাহার গোপালের আশ্রম—সত্য এবং প্রাণবন্ত হইয়া উঠিল। দুলাল মস্তক মুণ্ডন করিয়া গলায় কণ্ঠী ধারণ করিয়া কপালে তিলক আঁকিল। ব্রজদাসীই তাহাকে বহির্বাস পরিতে দিল না, নহিলে সে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিল। ব্রজদাসী গোপালের গৃহদ্বারে লুটাইয়া পড়িয়া আনন্দে চোখের জলে গৃহদ্বারের সম্মুখটুকু মার্জনা করিয়া দিল।

নরোত্তম দাস বাবাজী কিন্তু চলিয়া গেলেন।

বলিলেন—আমার ডাক এসেছে। আর থাকব না আমি।

ব্রজদাসীকে ডাকিয়া বলিলেন—মানগোবিন্দপুরের আখড়ার ভার তুমি নাও। তোমার দুলালকে তুমি দিয়ে যাবে।

ব্রজদাসী হাত জোড় করিয়া বলিল—না। আমি গোপালকে ছেড়ে যাব না। মানগোবিন্দপুরকে আমি ভয় করি।

বাবাজী বলিলেন—তবে মহেশকে ভার দিয়ে যাচ্ছি। দুলাল যদি—

—যদি? যদি কেন বলছেন?

—বলব না। দুলালকে সে-ই বুঝিয়ে দেবে। তুমি কিন্তু দুলালের শিগ্‌গীর বিয়ে দিয়ো।

হাসিয়া ব্রজ বলিল—বিয়ে ও করবে না এখন। সেইটুকু আমি শপথ করেছি ওর কাছে।

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বাবাজী বলিলেন—তুমি নিজের পথ ধরলেই ভাল করতে ব্রজ।

দুলালকে ডাকিয়া আশীর্বাদ করিলেন—নীরবে, কোন কথা বলিলেন না, শুধু চোখ হইতে দু'ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল।

দুলালও কোন কথা বলিল না।

ব্রজ শেষ ক্ষণটি মুখর করিয়া তুলিল, বলিল—চলুন আপনি এগিয়ে, আমরা মা-বেটায় যাব একবার শ্রীধামে, আপনার সঙ্গে যে বোঝাপড়া বাকী রইল, সে সেইখানে হবে। দেখবেন, দুলাল কেমন নিষ্ঠাবান হয়েছে।

বাবাজী হাসিলেন। বলিলেন—তোমার অসম্পূর্ণ সোনার কলস দেওয়া মন্দির এবার সম্পূর্ণ হোক।

•

সে মন্দির ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিল। আর বোধ হয় সামান্য বাকী।

দুলাল, দুর্দান্ত দুলাল পাল্টাইয়া যাইতেছে। ভোরে উঠিয়া স্নান করে, ফোঁটা তিলক কাটে, সে-ই ফুল তোলে; তাহার মা তাহাকে গৃহমার্জনা করিতে দেয় না। তাহার পর সে ফুলগাছগুলির পরিচর্যা করে। বৈষ্ণবী ভিক্ষায় বাহির হয়, দুলাল ঐটুকু পারে না।

বলে—না মা। ও পারব না। না। আমি—

সে যে কি বলিতে চায় বলে না, ব্রজদাসী তাহা বুঝিতেও চায় না। সে যতদিন আছে ততদিন কোন চিন্তা নাই। তাহার গান শুনিয়া লোকে দু হাত ভরিয়া দেয়, সে সেই দু হাতের ভিক্ষার এক হাতেরটুকু সঞ্চয় করিয়া যায়—দুলালের জন্য।

দুপুরে দুলাল একা বসিয়া থাকে। আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। পায়ে শিকল বাঁধা বাজপাখীর মত আকাশের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে।

মধ্যে মধ্যে মেল ট্রেনের শব্দ আসে। কখনও কখনও মানগোবিন্দপুরের প্রান্তভাগের মজা দীঘির ঘাটে মোটর বাসগুলাকে ধুইতে আনিয়া ইলেকট্রিক হর্ন বাজায়—তাহার শব্দও সে শুনিতে পায়। সাধারণ গ্রামবাসীদের কাছে এ শব্দগুলো—শব্দবৈচিত্র্যের মধ্যে হারাইয়া যায়, তাহার কাছে এ শব্দ হারায় না।

সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, একটু নড়িয়া চড়িয়া বসে।

তাহার পরই বলে—ধু—র্। ভা—গ্!

মধ্যে মধ্যে শোভা দিদিকে মনে পড়ে। মনে মনে প্রণাম জানাইয়া বলে—তোমাকে প্রণাম—শত কোটি প্রণাম! তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছ। তোমার ছায়া আর আমি মাড়াব না। সে অস্থির হইয়া উঠে। শোভা দিদি! অকৃতজ্ঞ শোভা দিদি! বুকটা কখনও কখনও ফুলিয়া উঠে তাহার। আজও ফুলিয়া উঠিল।

—দুলাল!

ভিক্ষা হইতে মা ফিরিল। সে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—গোবিন্দ! গোবিন্দ! তারপর উঠিয়া বাহিরের আগড় খুলিয়া দিয়া বলিল—আজ এত সকালে ফিরলে মা?

সে অবাক হইয়া গেল, ব্রজদাসীর সঙ্গে একটি বিধবা ও একটি কিশোরী। ভোলাদাসী ও তাহার কন্যা। মা বলিল—ওরা আখড়া দেখতে এসেছিল। ব'স ভাই—ব'স। এইটি আমার ছেলে।

—বাঃ, এ যে চমৎকার ছেলে গো! লোকে যে বলে কালো!

সত্য কথা—বৈষ্ণব হইয়া ব্রজদাসীর প্রত্যাশা মত একটি মিষ্ট শান্ত শ্রী দেখা দিয়াছে দুলালের সর্বাঙ্গে। সে কালো—কিন্তু সে শান্ত স্নিগ্ধ।

দুলাল লজ্জিত হইয়া একটু হাসিল।

মেয়েটিও মুখ ফিরাইয়া হাসিল। বেশ মেয়েটি। পাড়াগাঁয়ের মেয়ের মত ধূলিমলিন নয়, দীপ্তি আছে। তবে দুলালের চোখ এড়াইল না, এ দীপ্তি সূর্যের দেশের মানুষের নয়। এ মেয়েকে—চাঁদের দেশের্ বলা চলে। দুলাল বইতে পড়িয়াছিল—চাঁদের নিজস্ব কোন দীপ্তি নাই, সূর্যের আলো চাঁদের উপর পড়ে, তাহাতেই প্রতিফলিত হইয়া উঠে চাঁদের দীপ্তি। মেয়েটি নকল করিয়াছে। তবুও ভাল লাগিল।

দেখিয়া শুনিয়া অনেক পান চিবাইয়া ভোলাদাসী মেয়েকে লইয়া চলিয়া গেল। ব্রজদাসী বলিল—তোকে মেয়ে দেখাতে এনেছিল। আমি নিজে কিছু বলি নি বাবা। ওরা নিজেই এসেছিল।

দুলাল হাসিয়া বলিল—মেয়ে ভাল।

—বিয়ে করবি?

—দেখি ভেবে।

আকাশে মেঘ জমিয়াছে। বর্ষা নামিবার লক্ষণ চারিদিকে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একটা বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। বৈশাখের প্রখর প্রদীপ্ত নয়, বর্ষার অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল ক্ষীণ। কিছুক্ষণ পর ঘন গম্ভীর গুরু-গুরু ধ্বনি আকাশ ছাইয়া বাজিয়া উঠিল। খালে ব্যাঙ ডাকিতেছে। অনেক ব্যাঙ একসঙ্গে ডাকিতেছে। কোন ঝোপে বসিয়া বনকাক ডাকিতেছে—কুক্—কুক্—কুক্—কুক্। ছোট চাতক পাখীগুলা শূন্যমণ্ডলে নাচিয়া নাচিয়া উড়িয়া যাইতেছে।

গুর্‌-গুর্‌-গুর্‌-গুর্‌-গুর্‌-গুর্‌ ধ্বনির আর বিরাম নাই।

মেঘের ডাক নয়। এরোপ্লেন। একখানা এরোপ্লেন উড়িয়া বেড়াইতেছে। দুলালের মনে পড়িল যুদ্ধ চলিতেছে।

আখড়ায় বসিয়া সব হারাইয়া গিয়াছে। সন তারিখও হারাইয়া গিয়াছে। ইংরাজী বিয়াল্লিশ সাল এটা। মাস শ্রাবণ। ইংরাজী কোন্ মাস সে জানে না।

প্লেনখানা চলিয়া গেল।

এরোপ্লেন লুঠ করিয়া বোমা ফেলিয়া ইংরাজের সঙ্গে লড়াইয়ের সাধ ছিল একসময়।

—গোবিন্দ! গোবিন্দ!

তারপর ডাকিল—মা!

—কি?

—কি করছ?

আজকাল দুলাল আর তুই-তুকারি করে না। ভাষাকে সে সংযত সংস্কৃত করিয়াছে।

—যাই।

—আসতে হবে না। তুমি কর বিয়ের সম্বন্ধ—

—করব?

—হ্যাঁ, কর। বলিয়া দুলাল বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

আকাশের প্লেনটা যেন অনেকটা নীচে নামিয়া পড়িয়াছে—ওই—ওই—ওইখানে। ওই মাঠের ওপারে—ময়ূরাক্ষীর তীরের জঙ্গলের মাথায় ওই—ওই লাট খাইতেছে। হ্যাঁ, লাট খাইতেছে।

থাক। সে আর যাইবে না।

তাহার অন্তরের সমস্ত তৃষ্ণাকে সে অবরুদ্ধ করিয়াছে। ও বড় পাজী নেশা। দুনিয়াকে আর এক রকম করিয়া দেয়। ছুটিয়া চলে, স্থির মাটি। যে মাটি, ক্ষেত-খামার গাছ-পালা বুকে লইয়া শান্ত স্থির ধরিত্রী—সে লাগাম-কষা, চাবুক-খাওয়া ঘোড়ার মত ছুটিয়া চলে, থামে না। বাসের পাশের ডাণ্ডা ধরিয়া এক হাত বাড়াইয়া পৃথিবীর মুখের লাগাম ধরিয়া সে অনেক ছুটাইয়াছে, নিজেও ছুটিয়াছে। আর না। মা যাহা চায় সে তাই করিবে। নহিলে সে—সেই বিরিজনন্দন ডাণ্ডা লইয়া বনে গিয়া বাঘ মারিয়া—হাতীর দাঁত উপড়াইয়া—বনকে ভয়শূন্য করিয়া বন কাটিয়া নগর গড়িতে পারিত। কিম্বা রাজাকে মারিয়া কোতোয়ালকে বাঁধিয়া রাজকন্যাকে লুটিয়া লইয়া পলাইতে পারিত।

চল, বাড়ী ফিরিয়া চল।

জোর বাতাস উঠিয়াছে। বাতাস নয়, ঝড়। আকাশে কালো মেঘের পুঞ্জগুলা ফুলিয়া বড় হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে দুরন্ত বেগে নৈর্ঋৎ কোণ হইতে অগ্নিকোণের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে। বর্ষার ঝড়ো বাতাসে মাথার লম্বা বাবরি চুলগুলো চোখে কপালে আছাড় খাইতেছে। রাত্রে নিশ্চয় মুষলধারে বর্ষা নামিবে। পাতা খড় উড়িয়া মুখে চোখে সর্বাঙ্গে লাগিতেছে। খানকয়েক কাগজ আসিয়া তাঁহার বুকে আটকাইয়া গেল। বাতাসের যেন বেগে আঁটিয়া লাগিয়া গিয়াছে। হাত ছাড়াইয়া ফেলিয়া দিতে গিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল।

লাল হরফে মোটা অক্ষরে ছাপা কাগজ।

মাথায় লেখা—বিপ্লব—বিপ্লব—বিপ্লব।

আরও অনেক কথা। নীচে নাম রহিয়াছে শোভা সেন।

দুলাল থমকিয়া দাঁড়াইল। বুকখানার ভিতর মেঘের ডাকের প্রতিধ্বনি উঠিল।* একটা বিপুল শক্তি প্রচণ্ড আলোড়নে যেন আবর্তিত হইয়া উঠিল।

* * *

ব্রজদাসী চারিদিকে খুঁজিয়া অধীর হইয়া উঠিল। রাত্রি প্রায় এক প্রহর হইয়াছে, দুলাল ফেরে নাই। সেই 'আসি' বলিয়া বাহির হইয়াছে। আকাশ ভাঙিয়া বর্ষণ শুরু হইয়াছে। কোথায় দুলাল ?

কেহই কোন সন্ধান বলিতে পারে না।

এক প্রহর রাত্রে সংবাদ আনিল মহেশ মণ্ডল। মানগোবিন্দপুর হইতে সে ছুটিয়া আসিতেছে। বৃষ্টিতে ভিজিয়া সে ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে।

দুলালকে সে মানগোবিন্দপুরে দেখিয়াছে। মাথার চুল উড়িতেছে, চোখে আবার সেই আগের দৃষ্টি ফুটিয়াছে। শোভাকে পুলিস ধরিয়া লইয়া গিয়াছে—তাহারই প্রতিবাদে সভা হইতেছিল, সেই সভায় সে দুলালকে দেখিয়াছে। পুলিস আসিয়া লাঠি মারিয়া সভা ভাঙিয়া দিয়াছে, কতক লোককে গ্রেপ্তার করিয়াছে, অনেক জনের মাথা ফাটিয়াছে। মহেশ দুলালকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল, তাহার হাত ধরিয়া বলিয়াছিল—দুলাল !

মুহূর্তে হাতখানা হেঁচকা টানে ছাড়াইয়া লইয়া সে চীৎকার করিয়াছিল—এ্যা—র্ত্।

তারপর তাহার দিকে চাহিয়া দেখিয়া তাহাকে চিনিয়া ছুটিয়া পলাইয়াছে, বলিয়াছে—নেহি যায়েঙ্গা—যাও।

ব্রজদাসী পাংশু বিবর্ণ মুখে মোড়লের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল যেন, আকাশে বাজ ডাকিয়া গেল যেন। প্রায়-সম্পূর্ণ মন্দিরের উপরেই বোধ হয় বাজ পড়িল।

সারারাত্রি সে জাগিয়া বসিয়া রহিল। জানে, সে ফিরিবে না। তবু বসিয়া রহিল।

দিন কয়েক পর—মহেশ আবার ছুটিয়া আসিল।

—এক দল এখান থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। শুনছি, রেলের লাইন তুলে ফেলে দিচ্ছে। থানা পোড়াচ্ছে। পুলিস এসেছে কলকাতা থেকে ট্রেন বোঝাই। কাল নাকি বোলপুরে গুলি চলেছে।

—গুলি ?

—হ্যাঁ।

দুরন্ত দুর্দান্ত দুলাল—মানুষের জীবনের সকল বন্যায় সে প্রথম ঢেউ—সেই তো সকলের আগে ছিল ! ব্রজ মহেশের মুখের দিকে চাহিয়া শুষ্ক কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—মরেছে ? কিন্তু উত্তরের প্রতীক্ষা করিল না, প্রয়োজন ছিল না, সে চোখে যেন দেখিতে পাইতেছে—রক্তাক্ত ধূলি-ধূসরিত দুলাল অসুরের মত দেহ প্রসারিত করিয়া দিয়া পড়িয়া আছে। ব্রজ পাগলের মত ছুটিল। বোলপুর সে চেনে। অজয়ের তীরবর্তী অঞ্চল সে দীর্ঘকাল পায়ে হাঁটিয়া ঘুরিয়াছে। কিছুক্ষণ পর সে শুনিল—দাঁড়াও ব্রজ।

ব্রজ পিছন ফিরিয়া চাহিল না, সে বুঝিল—মহেশ মণ্ডলই আসিতেছে। ভালই হইয়াছে, সে দুলালের দেহ মণ্ডলকে ফিরাইয়া দিবে, বলিবে—নাও, আমি একদিন তোমার হাত থেকে নিয়েছিলাম। আমি ফিরিয়ে দিলাম। যা তুমি করতে চেয়েছিলে—তাই হয়েছিল—তাই হয়েছে। সকল কলঙ্কের চিহ্ন তোমার মুছে গেল।

ট্রেন বন্ধ। পায়ে হাঁটিয়া ধূলি-ধূসরিত দেহ—লাল ধূলায় লালচে কাপড়, রুক্ষ চুল, চোখে

প্রখর চঞ্চল দৃষ্টি লইয়া সে আসিয়া বোলপুর পৌঁছিল। সামনে যাহাকে পাইল তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল—বলতে পারেন প্রভু, কোথায়—কোন্ জায়গায়? হাঁপাইতে লাগিল সে।

—কি?

—গুলি করেছে?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে ব্রজর দিকে চাহিয়া বলিল—কেন? তোমার—

—আমার ছেলে। দুলাল। ব্রজদুলাল দাস।

—তোমার ছেলে? কিন্তু—

—কোথায় বাবা? কোন্ জায়গায় গেলে তার দেহখানা পাব?

—কি জানি? কিন্তু—কই—

—বলুন বাবা—বলুন!

লোকটি আর কথা বাড়াইল না—আঙুল দেখাইয়া বলিল—স্টেশনের ওখানে গুলি চলেছিল, কিন্তু কই—ব্রজদুলাল দাস কই—? না তো!

ব্রজ আর শুনিল না—ছুটিল।

লোকটি মিথ্যা বলে নাই—যাহারা মরিয়াছে তাহাদের মধ্যে ব্রজদুলাল দাস বলিয়া কেহ ছিল না। লোকে বলিল—থানায় বলিল—ডাক্তার বলিল। ব্রজ বিশ্বাস করিল না-কি কে জানে—কোন একজনের বুকের ঝরিয়া-পড়া রক্তে ভিজা মাটির পাশে বসিয়া রহিল।

* * *

মল্লারপুরের ওদিকে রেল-লাইন তুলিয়া দিয়াছে।

ব্রজ অন্ধকার রাত্রে কাহাকেও না বলিয়া একদিন মল্লারপুরের দিকে রওনা হইল। রামপুর-হাটে অনেক লোককে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে। ব্রজ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

লোহার শিক দেওয়া খাঁচার মত ঘরের মধ্যে হাতে-পায়ে বেড়ীতে আবদ্ধ দুলাল পড়িয়া আছে—শিঙে-নাকে-গলায় বাঁধা মহিষের মত। লালচে চোখ মেলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে। ব্রজকে দেখিয়া সে কথা বলিবে না, একটু নিঃশব্দ হাসি ফুটিয়া উঠিবে মুখে—দু'ফোঁটা জলও গড়াইয়া পড়িবে চোখের কোণ হইতে।

এবার ব্রজর মায়ের মনের অনুমান মিথ্যা হইল না।

মল্লারপুর পৌঁছিয়া শুনিল—ব্রজদুলাল নয়, বিরিজনন্দন একজন আছে। ধরা পড়িয়াছে। অল্প বয়স—দুর্দান্ত ছেলে—বুনো মহিষের মত গোঁ—তেমনি আকৃতি! ব্রজর সন্দেহ রহিল না।

—কি হবে?

—কে জানে? ফাঁসি—দ্বীপান্তর—যা খুশী ওদের। আবার বলছে—জেলের মধ্যে দাঁড় করিয়ে গুলি ক'রে মেরে দেবে।

ব্রজ আবার ছুটিল। সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল, লোকে বারণ করিল—পৃথিবী আর সে পৃথিবী নাই, এ রাত্রে তুমি যেয়ো না। প্রচণ্ড বর্ষা—বন্যায় দিগ্‌দিগন্তর ভাসিয়াছে। পথে নদী—দারকা—এখানে দারকাকে নদ বলে, বর্ষায় প্রচণ্ড স্রোত, সেই দারকার দুকূল-পাথার।

ব্রজ মানিল না।

বর্ষণ শুরু হইল পথে। আকাশ-পৃথিবী একাকার হইয়া গেল—বৃষ্টির ধারায় ধারায় মেঘ ও মাটির মধ্যে শূন্যলোক পরিপূর্ণ করিয়া একসঙ্গে জুড়িয়া দিল। অন্ধকার—এমন অন্ধকার ব্রজদাসী কখনও দেখে নাই। ব্রজ তাহারই মধ্য দিয়া চলিল। বর্ষণ একসময় থামিল। ব্রজ

একটু জোরেই চলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু দারকা নদীর ঘাটে আসিয়া আটকাইয়া গেল। নদীর জল স্পষ্ট দেখা যায় না—শুধু একটা বিস্তীর্ণ শুভ্র আস্তরণ বিছানো রহিয়াছে বলিয়া মনে হইল—কিন্তু অন্ধকার রাত্রিতে হাসির মত খল-খল কল-কল শব্দে বন্যা বহিয়া চলিয়াছে—সেখানে অস্পষ্ট কিছু নাই। খেয়া নাই। এপারে-ওপারে কোথাও একটি ক্ষীণ আলোকরশ্মিও দেখা যায় না, গ্রাম চেনা যায় না; ব্রজ তবু চীৎকার করিল—মাঝি—মাঝি!

তাহার কণ্ঠস্বর নদীর বুকে ছড়াইয়া পড়িল—ভাসিয়া চলিয়া গেল—কিন্তু সাড়া কেহ দিল না।

একা সে একটা গাছতলায় বসিয়া রহিল।

ভোর হইলে দেখিল—ঘাট কোথায়? সে একটা আঘাটায় বসিয়া আছে।

আরও খানিকটা ঘুরিয়া ঘাটে গিয়া দেখিল—খেয়া বন্ধ। সরকারী হুকুমে খেয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এইমাত্র পুলিস আসিয়া ওপারে বসিয়াছে।

রেলের পুল আছে। লোহার কাড়ির উপর কাঠের স্লিপার পাতা পুল। সাহস থাকিলে সন্তর্পণে পার হওয়া যায়। ব্রজ ফিরিল—সেই পুলের উপর দিয়াই পার হইবে সে!

রেলের পুলের উপরেও পাহারা। ইহারা পুলিস নয়, গোরা পল্টন বন্দুক লইয়া পাহারা দিতেছে।

দূরে দূরে লোক জমিয়া আছে। বিচিত্র দৃষ্টিতে চাহিয়া এই পাহারা দেওয়াই দেখিতেছে। তাহারাই ব্রজকে আটকাইল।—যেয়ো না, গুলি ক'রে দেবে। ক্ষেপে গিয়েছে বেটারা। কাল রাত্রে জল-ঝড়ের মধ্যে জেল থেকে ছ'জন কয়েদী পালিয়েছে।

—জেল থেকে পালিয়েছে?

—হ্যাঁ। বাহাদুর ছোকরা সব!

—বিরিজনন্দন—

—সেও পালিয়েছে। হাতকড়ি খুলে—জানলার শিক বেঁকিয়ে—কাপড় বেঁধে—পাঁচিল টপকে—বাইরে লাফিয়ে পড়েছে। জন-দু-তিন ডাকাত আর এরা তিন-চারজন।

* * *

ব্রজ দিনে ঘুমায়—রাত্রে ঘরে আলো জালিয়া জানালা খুলিয়া দিয়া তাহারই পাশে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

নিজে কাটারী লইয়া জানালার সামনের কতকগুলি গাছের ডাল কাটিয়া দিয়াছে।

কাহাকেও সে এ কথা বলে নাই। বাবাজীকে না, মহেশকেও না। বলিতে তাহার সাহস নাই। শুধু বলিয়াছে—দেবতা গোপালকে। বলিয়াছে—একটি রাত্রে একটি বারের জন্য তাহাকে এখানে আসিবার মতি দাও।

রাত্রে বসিয়া থাকে। খুট করিয়া শব্দ হইলে বাহির হইয়া চাপা গলায় ডাকে, দুলাল?

সাড়া পায় না। তবু দাঁড়াইয়া থাকে। চারিপাশ ঘুরিয়া-ফিরিয়া দেখে। তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঘরে ফিরিয়া আপন মনে আপনাকে শুনাইয়াই বোধ হয় গায়—"মনে ছিল আশা—হ'লে বৃদ্ধ দশা—গোপাল পুষিবে শেষে।"

মাত্র ওই একটা কলিই গুন-গুন করে। গান তো সে গায় না, ওইটুকুই মনে পড়িয়া যায়—আপনিই বিলাপ-গুঞ্জনের মত বাহির হইয়া আসে।

মধ্যে মধ্যে মহেশের কাছে যায়। খবরের কাগজে দুলালের ফাঁসি বা দ্বীপান্তরের খবর উঠিয়াছে কি না জানিতে যায়। থাকিলে মহেশ গোপন করিবে না—সে কথা সে জানে।

করিতে পারিবে না। চোখ দিয়া তাহার বন্যা বহিয়া যাইবে।

মহেশ বলে—আর নিজেকে মিথ্যে মায়ায় জড়িয়ে রাখবেন না মা-জী। চ'লে যান। পথে বেরিয়ে—ছলনায় বাঁধা প'ড়ে আটকে রয়েছেন। আমি তার জন্যে দায়ী। আর না। অনেক দুঃখ ভোগ করলেন। এইবার সময় এসেছে, বেরিয়ে পড়ুন, চ'লে যান। গুরুদেবকে লিখেছিলাম, তিনি লিখেছেন—

ব্রজ বলে—যাব। তাই যাব। চিঠি শুনব না।

ব্রজ উদ্যোগ-আয়োজন করে। কিন্তু সে আয়োজন তার শেষ কোন দিন হয় না। বাঁধে আর খোলে। এটা লইতে ভুল হইয়াছে। আবার খোলে—ছি, এ-সবে তার প্রয়োজন কি? এত পোঁটলা বহিয়া কি পথ চলা যায়!

নিজের ছলনা এক-এক সময়ে নিজেই ধরিয়া ফেলে, কিন্তু তাহাতে সে লজ্জিত হয় না। বলে—আমার যদি নিজের সন্তান হ'ত তবে কোন্ দিন—কোন্ দিন আমি চ'লে যেতাম। এ যে পরের। সেখানে গিয়ে যদি শুনি—পরের ব'লেই এটা তুমি পেরেছিলে, নিজের হ'লে কি পারতে? শাস্তিকে তো ভয় করি না, অনেক শেল বুকে ব'য়ে বেড়াচ্ছি, এর চেয়ে আর কোন বড় শক্তিশেল ভগবানের আছে? শাস্তি নয়, লজ্জা; নিজের কাছেই যে লজ্জায় ম'রে যাব। শুধু একটা সংবাদের প্রতীক্ষা!

সাত-আট মাস হইল দুলাল চলিয়া গিয়াছে। জেল হইতে পলাইয়া—আবার হয়তো কোথায় ধরা পড়িয়াছে। কিম্বা ঝড় আছে, ঝঞ্ঝা আছে, বন্যা আছে, বজ্রপাত আছে, রোগ আছে, জন্তু-জানোয়ার আছে, সাপ আছে—মৃত্যু আছে—মৃত্যু তো বহুরূপে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, মানুষের চারিপাশ ঘিরিয়া পাকে-পাকে ফিরিতেছে, সে শুধু খোঁজে সুযোগ। দুলালের দুর্দান্তপনা—দুরন্তপনার মধ্যে সুযোগ যে প্রতি মুহূর্তে প্রতি পদক্ষেপে মৃত্যুকে ডাকে!

শুধু সেই সংবাদটার প্রতীক্ষা সে করিয়া আছে। সংবাদ আসিলেই সে চলিয়া যাইবে। তাহার সকল আয়োজন এইখানে বসিয়াই করিতে আরম্ভ করিল। সে এক তপস্যা।

আর তাহার প্রতীক্ষায় লাভ নাই। সে চলিয়াই যাইবে। প্রাণ-মন সমস্ত কিছুকে সে একত্রিত করিয়া দেবতার সেবায় ঢালিয়া দিল। আখড়াকে সে উৎসব-মুখর করিয়া তুলিবার চেষ্টায় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সব মিথ্যা—তুমি সত্য। তুমি যখন রহিয়াছ—মূর্তি ধরিয়া ব্রজর আখড়ার সিংহাসনে বসিয়াছ—তখন ব্রজর তো সব আছে। কিসের দুঃখ। সে স্নান করিয়া পবিত্র বস্ত্র পরিয়া বাল্যভোগ সাজায়, মালা গাঁথিয়া পরায় গোপালকে, চন্দনের অলকাবিন্দু তিলক-রেখা আঁকিয়া দেয়—হাতে একটি নাড়ু তুলিয়া দেয়, মৃদুস্বরে গান গায়—

"একবার তেমনি-তেমনি-তেমনি ক'রে নাচ রে
চাঁদের কোণা!
চরণে চরণ দিয়ে—তেমনি ক'রে!
তোর মুরলী বান্ধায়ে দিব যত লাগে সোনা,
নাচ রে চাঁদের কোণা!"

ঠিক এমনি একটি মুহূর্তে সেদিন ভারী জুতার শব্দ করিয়া কে আসিয়া উঠানে দাঁড়াইল। একজন বিচিত্র পোশাকপরা লোক। সিপাহীর মত পোশাক। পিছনে এক পাল ছেলে—এক দল লোক।

দুলালের বন্ধু শিউচা। সে বলিল—ধেৎ—আমার নাম শিবদাস। আমি বাঙালী রে বাবা! শিউচা তো পুলিসের গুলি খেয়ে মরেছে। হা-হা করিয়া হাসে। সে বিচিত্র সংবাদ আনিয়াছে।

দুলালের বন্ধু। একসঙ্গে বাসে চাকরি করিত। একসঙ্গেই পলাইয়াছিল। বিচিত্র সংবাদ আনিয়াছে।

দুলাল যুদ্ধে চাকরি করিতেছে।

সে কি? তোমরা যে সব—লাইন তুলে—

হা-হা করিয়া হাসিয়া সে বলিল—পাগল সব। আস্ত পাগল। লাইন তুলতে কে গিয়েছিল—সে মা-গঙ্গা জানে - আমরা তিনজন যুদ্ধের চাকরিতে মোটা মাইনে ব'লে চ'লে গেলাম কলকাতা। সেখানে হ'ল না, চলে গেলাম পানাগড়। সেখানে চাকরি মিলে গেল। ড্রোইবিংয়ের পরীক্ষা নিলে—আরও শেখালে, লাইসেন্ ক'রে দিলে—বাস্—বড় বড় গাড়ী নিয়ে চ'লে গেলাম। আমি বাড়ী এলাম ছুটি নিয়ে—কাঁধে বোমার টুকরো লেগেছিল। আবার যাব। দুলাল খুব গাড়ী চালাচ্ছে—সে-ই চাটগাঁয়ের ওধার—জঙ্গল-পাহাড়—সেদিকে আছে এখন।

কে একজন বলিল—আঃ, বাছা রে! কোন্ দিন কি হবে—কেউ খবর পাবে না।

সে বলিল—সেটির জো নাই। দুলাল মায়ের নাম-ঠিকানা দিয়েছে; আমি আমার দিয়েছি; যে যার আপন লোকের ঠিকানা দিয়ে রেখেছে। কিছু হ'লে রেজেস্টারী চিঠি আসবে—কিছু দিয়ে গেলে তা আসবে। সরকার ডেকে ক্ষতিপূরণ দেবে—টাকা দেবে। সে সব পাবে। সে সব বন্দোবস্ত পাকা।

তার পর বলিল—দুলাল একটি কথা ব'লে দিয়েছে। তোমরা সব যাও বাপু। যাও—যাও। কারও সামনে আমি বলব না—ব্যাগো! শেষে সে 'ব্যাগো' বলিয়া একটা হাঁক মারিয়া উঠিল। সকলে চমকিয়া উঠিয়া পলাইয়া গেল।

শিউচা হাসিয়া বলিল—ওদের ছামনে ঝুট বলতে হ'ল। আমার নাম শিউচা। নাম আমরা ভাঁড়িয়েছি তো! লাইন তুলতে আমরা গিয়েছিলাম। বিরিজনন্দন ভিজে গায়ে বাসের গ্যারেজে হাঁক মারলে মায়ী—সে কি বলব তোমাকে! ইনকিলাব জিন্দাবাদ্! মারো ডাণ্ডা! আরে বাপ রে! তারপর বললে—শিউচা, দে আমাকে একটা হাপপ্যাণ্ট আর একটা শার্ট, আর একটা চাদর। পাগড়ী বেঁধে ডাণ্ডা ঘাড়ে নিয়ে বললে—চল্। পহেলে লাইন উখাড় দেব, তারপর চল্—জেল তোড়কে ছিনিয়ে আনব শোভা দিদিকে। বেরিয়ে সে হয়ে গেল অন্য রকম কাণ্ড! ধরা পড়লাম, জেলে ভরলে, বিরিজনন্দন শলা ক'রে সাহস ক'রে জেল থেকে পালাবার ব্যবস্থা করলে। আরে বাপ রে! সে এক কাণ্ড! আজও দেখ না—গায়ের রোঁয়া সব খাড়া হয়ে উঠেছে!

তারপর হাসিয়া বলিল—নাম আমাদের কেউ জানত না। সব নাম ভাঁড়িয়েছিলাম। পুলিস এখানে কোন খোঁজখবর করে নি?

ব্রজদাসীর কণ্ঠস্বর শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, দেহমন পঙ্গু হইয়া গিয়াছে, সমস্ত আকাশ পৃথিবী যেন দোল খাইতেছে, সে চোখ বন্ধ করিয়া যেন তলাইয়া যাইতেছে গাঢ়তম অন্ধকারের মধ্যে। ওরে দুরন্ত—ওরে দুর্দান্ত! তবু তাহার আক্ষেপ—এ বুক হইতে তাহার রক্তকে ক্ষীর করিয়া তাহার বুক ভরিয়া দিতে পারি নাই। ওরে দুলাল, মাতৃস্তন্যবঞ্চিত দেহে তুই—। চোখ দিয়া তাহার জল গড়াইয়া পড়িল।

শিউচা আবার প্রশ্ন করিল—পুলিস এসেছিল নাকি?

ব্রজদাসী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

সে বলিল—ঠিক হায়। তারপর জেল থেকে পালিয়ে অনেক ঘুরে শেষে পানাগড়ে গিয়ে

আসল নাম লিখিয়ে যুদ্ধের কাজ নিলাম।

ব্রজ এবার বলিল—সে কি বলেছে?

—বলে নাই কিছু। তবে আমি গোপনে খোঁজটা নিলাম। এ যদি প্রকাশ হয় তবে একেবারে গুলি ক'রে মেরে দেবে তো, তাই জন্তে। আচ্ছা চললাম। যুদ্ধ শেষ হ'লেই আসবে সে। যদি—। হাসিয়া বলিল—তা হ'লে খবর পাবে। রেজেস্টারী চিঠি আসবে, কিছু যদি দেয় সে—তাও পাবে। তুমি একটা মাদুলি দিয়েছিলে—সেটা সে ঠিক রেখেছে—বলেছে—তা যদি হয়, তবে মাদুলিটা পাঠিয়ে দিতে বলব! আর সরকার যা দেয়—তা পাবে।

স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিল ব্রজদাসী।

কিছু বলিয়া দেয় নাই দুলাল?

মাদুলিটা সে সযত্নে রাখিয়াছে?

সে যদি—। তাহা হইলে সেইটা ফেরত আসিবে?

দোল-পর্ব চলিয়া গেল।

মহেশ আসিয়া বলিল—মা-জী—

—মোড়ল!

—কি ঠিক করলেন?

—ঠিক আর কি করব? আর ক'টা দিন দেখি? রেজেস্টারী তো আসবে—

—না। না। তা কেন? সে হয়তো ফিরেই আসবে।

—দেখি।

বৈষ্ণবী উঠিয়া চলিয়া যায় পোস্ট-আপিসে।—আমার কি কোন রেজেস্টারী আছে বাবা?

নাই।

দিন যায়—মাস যায়—বছর যায়—। যুদ্ধ হঠাৎ শেষ হইয়া গেল। রেজেস্টারী আসিল না। দুলালের সঙ্গী শিউচা ফিরিল। বলিল—কলকাতায় এল। এসে বললে, যা তুই বাড়ী। আমি এখন যাব না। সে শোভা দিদির খোঁজ করছে। দুদিন তাকে রাস্তায় দেখেও ধরতে পারে নি। তা ছাড়া—আবার কোন নতুন হাঙ্গামাতে মাতবার ফিকিরে আছে সে। হাসিয়া বলিল—সে একটা হালফেশানের মেয়ে বিয়ে করবে। তারপর তার একটা না একটা হাঙ্গামা চাই-ই।

হা-হা করিয়া সে হাসিতে লাগিল।—সে হ্যায় বিল্লিজনন্দন। মারে ডাণ্ডা দনাদন্। যাঁহা ডাণ্ডা গাড়তা হুই রাজ বানাতা! সে আসবে না।

এবার ব্রজ একদিন সব বন্ধন একটানে ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া পড়িল। নাকে রসকলি কাটিল—গলায় নূতন কণ্ঠী পরিল, গৈরিক কাপড় ছোপাইয়া লইল, ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে লইল, চূড়া করিয়া চুল বাঁধিল, হাতে খঞ্জনী লইয়া বাবাজীকে গোপালের ভার বুঝাইয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

দীর্ঘকাল পরে সে গান ধরিল—

"কবে আমি ব্রজে যাব,
মাধুকরী মেগে খাব—
পথের ধূলায় ধূসর হয়ে—"

এবার সে পথ হাঁটিবে না। ট্রেনে চাপিয়া—চোখ মুদিয়া বসিবে। একেবারে বাংলা দেশ

পার হইয়া সেই এক বড় জংশনে নামিবে—তাহার পর বৃন্দাবন।

শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দ গোবিন্দ নন্দ-নন্দন !

স্টেশনে আসিয়া সে গান আরম্ভ করিল। ভিক্ষা শুরু করিল।

আর সে সে-কালের সে নয়। বিরহিণী রূপসী বৈষ্ণবী নয়। আজ সে দুঃখিনী, দুলালের মা, প্রৌঢ়া ব্রজদাসী বৈষ্ণবী। কেহ আর আজ ইঙ্গিত করিল না, হাসিল না, রসিকতা করিবার চেষ্টা করিল না। আজ তাহাকে কেহ করিল শ্রদ্ধা—কেহ করিল স্নেহ—কেহ বলিল মা। কেহ বলিল মেয়ে।

কিন্তু সকলেই তাহার গান শুনিয়া কাঁদিল।

গান শেষ করিয়া সে একজনকে বলিল—আমাকে একখানা টিকিট কেটে দেবেন বাবা ?

—কোথাকার টিকিট ? দাও।

খুঁট খুলিয়া সে একমুঠা টাকা তাহার হাতে দিয়া বলিল—কলকাতার।

—কলকাতার তো এত টাকা কেন ?

—ও! আমি বৃন্দাবনের ভাড়া খুঁটে বেঁধে রেখেছিলাম কি না? তাই দিয়েছি। কলকাতা হয়ে আমি বৃন্দাবন যাব বাবা, সেই টিকিট একখানি কেটে দাও।

লোকটি হাসিয়া বলিল—তা তো হয় না। কলকাতা পূবে, বৃন্দাবন পশ্চিমে। কলকাতা গেলে—সেখান থেকে আবার নতুন টিকিট কিনতে হবে। এখান থেকে কলকাতার যা ভাড়া —সেই ভাড়াটা আবার বেশী লাগবে।

ব্রজদাসী একটু ভাবিয়া বলিল—তবে কলকাতার টিকিটই কিনে দাও। কি করব।

কি করিবে সে ? কলিকাতা যে তাহাকে যাইতেই হইবে।

এই কিছুক্ষণ আগে একজন খবরের কাগজ পড়িয়া গল্প করিতেছিল—একজন এ-দেশী পল্টনের সিপাহী এবং একজন নিগ্রো সিপাহী—পরস্পরের মধ্যে গালি-গালাজ করিয়া ছুরি লইয়া মারামারি করিয়াছে। এই দেশী লোকটি নিগ্রো সিপাহীটিকে খুন করিয়া ফেলিয়াছে। আহত অবস্থায় দেশী সিপাহীটিকে পুলিস গ্রেপ্তার করিয়াছে।

ব্রজ জানে—এ তাহার দুরন্ত দুর্দান্ত দুলাল ছাড়া আর কেহ নয়।

সে জানে—। টপ-টপ করিয়া চোখ দিয়া তাহার জল পড়িতে শুরু হইল। সে জানে—এবার তাহার নিষ্কৃতি নাই। ফাঁসিকাঠে—

সে তাহার পূর্বে একবার তাহাকে দেখিবে। দুলালকে লইয়া কত ভাবনা সে ভাবিয়াছে, কত প্রশ্ন জাগিয়াছে—কতজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাহার উত্তর সে সংগ্রহ করিয়াছে। ফাঁসির পূর্বে দরখাস্ত করিলে মা-বাপ স্ত্রী-পুত্র—ইহাদের দেখিতে অবশ্যই অনুমতি মিলিবে।

তাহাকে দেখিয়া—সকল খেদের সকল ভাবনার শেষ করিয়া সে আবার বৃন্দাবনের পথে রওনা হইবে। গিয়া তাঁহার চরণাশ্রয়ে গড়াইয়া পড়িয়া বলিবে—সব শেষ করিয়া আসিয়াছি। এইবার তুমি দয়া কর।

তাহার পূর্বে দুলালকে একবার—

ট্রেনখানা দুরন্ত বেগে ছুটিয়া চলিয়াছিল। ব্রজ জানালার বাহিরে মুখ বাহির করিয়া সকলের অগোচরে কাঁদিতে লাগিল।

ঝর-ঝর করিয়া সে জল পৃথিবীর বুকে পড়িতেছিল। পৃথিবী তৃপ্ত হইল—ধন্য হইল। পৃথিবী বলিল—আরও কাঁদ তুমি। তোমার সন্তানেরা তোমার কোল ছাড়িয়া ছুটিয়া চলে

ভবিষ্যৎ-বধূর হাতছানিতে। প্রৌঢ়া তুমি অনুসরণ করিতে পার না, এমনি করিয়া চিরকাল কাঁদিয়া আসিয়াছ, আজও কাঁদিতেছ; সেই অশ্রুর একটি বিন্দু সিন্ধু হইয়া আমাদের স্নান করায়; সেই স্নানে ওই দুরন্ত অস্ত্রাঘাতে ক্ষরিত আমার বুকের সকল রক্ত কলঙ্ক—সকল উত্তাপ মুছিয়া যায়, শীতল হয়। আমি তৃপ্ত হই।

প্রতিটি অশ্রুবিন্দু মাটিতে পড়িবা মাত্র শুকাইয়া যাইতেছিল। দুরন্ত তৃষ্ণায় পৃথিবী পান করিতেছিল।

যোগভ্রষ্ট

উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়

শ্রদ্ধাভাজনেষু

কয়েকটি কথা

১৩৬৬ সালে এই রচনাটি পুজা-সংখ্যা 'উল্টোরথে' বের হয়েছিল। তখন নাম ছিল 'যবনিকা'। গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার সময় নাম পরিবর্তন করে নাম দিয়েছি 'যোগভ্রষ্ট'। হয়তো গোড়ারটিই ঠিক ছিল—অন্তত ভূমিকা লেখবার সময় তাই মনে হচ্ছে। এই আখ্যানটি সচরাচর এই যুগে যে অর্থে উপন্যাসকে উপন্যাস বলে থাকি—তা ঠিক নয়। অর্থাৎ ঠিক অতি সাধারণ সমাজ-জীবনের দৈনন্দিন সমস্যায় পীড়িত; সুখে-দুঃখে, বর্তমানযুগবোধে জর্জরিত সমাজচিত্র নয়। এর পাত্রপাত্রী সবই কাল্পনিক—কোনখানে কোন সত্য জীবন ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে নি বা আশ্রয় করে নি একটি ঘটনা ছাড়া। সেটি সুদর্শন, ডেটিন্যু এবং ওই বিচিত্র সন্ন্যাসী প্রসঙ্গ। বাকীটার মূল হল এই যে, আমার জীবনের অণুপরমাণুতে, বুদ্ধিতে ও হৃদয়ে, অতীত সংস্কার-বিশ্বাসে ও নূতন শিক্ষার বুদ্ধিতে যে আমি মর্মান্তিক প্রচণ্ড সংঘর্ষ অনুভব করছি—যার ফলে আজ সব ভেঙে ধূলিসাৎ হয়ে গেল, সেই ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে আজ যে মনে হচ্ছে জীবনের পৃথিবীর দিক নেই, দিগন্ত নেই, সূর্য ক্ষণজীবী, চন্দ্র একটা বুদ্বুদ, সব মরুভূমি, সব মরুভূমি, শুধু বালু; কোন বিশ্বাস নেই, আশ্বাস নেই। এখানে সত্যটা কী? এখানে আজ উলঙ্গ প্রশ্ন—আমি কে? আমি কেন? আমি কী?

একদা বিশ্বাস করেছিলাম সৃষ্টির মূলে এক স্রষ্টাকে। ঈশ্বরকে। সঙ্গে সঙ্গে গড়েছিল মনোরাজ্যে সপ্তস্বর্গ, বৈকুণ্ঠ, নন্দনকানন, পারিজাত, মন্দাকিনী। গড়েছিল আদর্শ কর্তব্য। তাই ছিল স্রষ্টার শ্রেষ্ঠ নির্দেশ। শুধু মনেই গড়ে ক্ষান্ত হয় নি মানুষ। বাইরের পৃথিবীতে হিমাচলের উপরে বদ্রীনাথ-কেদারনাথ-অমরনাথের মন্দির থেকে দক্ষিণে জলমগ্ন কুমারিকা প্রান্তে কন্যাকুমারীর বেদীপীঠ নির্মাণ করেছে। দেশ-দেশান্তরে মসজিদ উঠেছে, গির্জা উঠেছে।

আজ জগতে এসেছে নাস্তিবাদ। ঈশ্বরবাদ আজ জীর্ণ বৃদ্ধ পিতার শবদেহের মত পড়ে রয়েছে। কোথাও আমরা সর্বময় উত্তরাধিকারী কর্তা বলে চিৎকার করছি। কোথাও মর্মান্তিক যন্ত্রণায় চিৎকার করছি। শুধু তাই নয়—আজ ওই ঈশ্বরের উপাধানের তলদেশে একটা চিরকুট পেয়েছি। যাতে লেখা আছে—ঈশ্বর চিরকালই এই শবের মত মিশরের মমির মত সাজানো ছিল। জীবন্ত মনে হয়েছিল কিন্তু জীবন্ত কোনকালে ছিল না। তবে? তবে আমরা কে? আমরা কী? আমরা কেন? জন্তুর পুত্র? সার্কাসের শিক্ষিত জন্তু? আমরা কি শুধু মরবার জন্য এবং যতদিন বাঁচি ততদিন শুধু ভোগের জন্য? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রতম কণা পরমাণু—তাকে ভেঙেও মহানাস্তিতে পৌঁছুতে পারি না। পৌঁছুই এক মহাশক্তির প্রলয়ঙ্কর প্রকাশে। সে কি অস্তি? না, সে নাস্তি? সেই তো যবনিকা।

এ প্রশ্ন অজ্ঞানে হোক, সজ্ঞানে হোক, প্রতিটি মানুষকে আজ একটি মর্মযন্ত্রণায় অধীর করে রেখেছে। অস্তিবাদে হোক, নাস্তিবাদে হোক, সে খুঁজছে সেই পরম উত্তর অর্থাৎ একটি পরম বিশ্বাস। সেইটিই প্রকাশ করেছি একটি কাল্পনিক কাহিনীর সাহায্যে। কাহিনী কাল্পনিক হোক, পটভূমির স্থান. কাল এবং ঐতিহাসিক স্থিতি ও গতি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তার বদল কোথাও করি নি। সেইখানেই আমার দাবি এ কাহিনীও সত্য। এ আমার কৌশলসর্বস্ব রচনা নয়, এ আমার অন্তরের যন্ত্রণায় সঙ্গীত।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শিবনাথের কথা

ফাঁসি। মৃত্যুদণ্ডাদেশ।

মৃত্যু পৃথিবীর প্রবলতম, প্রচণ্ডতম শক্তি। ভয়ঙ্করতম। সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্নতা। মৃত্যু কী, কেমন—আজও কেউ জানে না, জানতে পারে নি। এই শক্তি যার যতখানি করায়ত্ত, সে তত বড় শক্তিমান এই পৃথিবীতে। বাঘকে দেখে মানুষ প্রচণ্ড ভয়াতুর হয়; কিন্তু সে বাঘ যখন খাঁচায় বন্দী তখন মানুষ পরম কৌতুকে তাকে খোঁচা মেরে ডাক ছাড়ায়। ফণাধর সাপ ফণা তুলে সামনে দাঁড়ালে মানুষের হৃদ্‌পিণ্ড বুকের পাঁজরায় শেষ মাথা ঠুকে লুটিয়ে পড়তে চায়, কিন্তু সেই সাপকে বন্দী করে বিষদাঁত ভেঙে বেদে যখন খেলা দেখায় তখন চারপাশে মানুষের ভিড় জমে যায়। তার কারণ ভয় তো বাঘকেও নয়, সাপকেও নয়—ভয় সাপ-বাঘের আয়ত্ত ওই মৃত্যু-শক্তিকে। মৃত্যুই শক্তির উলঙ্গ রূপ—অথবা শক্তির শেষ অস্ত্র মৃত্যু। তার সম্মুখীন হলে কারও নিষ্কৃতি নেই; সে ক্ষমাহীন, সে চরমতম নিষ্ঠুর, সে ভীষণতম ভীষণ, তার উপর তার আঘাতের বিরুদ্ধে তাকে আঘাত করা যায় না—তাকে দেখাই যায় না। সে অন্ধতার চেয়েও অন্ধকার। সে নিরবয়ব, তাকে ছোঁয়া যায় না—অথচ সে এমনই নীরন্ধ্র যে তার গ্রাসে পড়লে মুহূর্তে ভয়ঙ্করতম পেষণযন্ত্রে কীটের মত পিষ্ট হয়ে চিহ্নহীন হয়ে যেতে হয়। সর্বশেষ ভয়ঙ্কর সে। শক্তিমানের সে শেষ অস্ত্র। কিন্তু আশ্চর্য তার সংস্কারহীন উদারতা। সে যেমন ঈশ্বরের আয়ত্তাধীন, তেমনি সে শয়তানেরও। বিষ্ণুর হাতে সে চক্র, রুদ্রের হাতে সে ত্রিশূল, ইন্দ্রের সে বজ্র, দৈত্যের সে ভীমকায় খড়্গ, বাঘের সে নখ-দাঁত, সাপের দাঁতে সে বিষ, মানুষের হাতে সে তলোয়ার-ছোরা, বন্দুক-পিস্তল, কামান-বারুদ, বোমা-অ্যাটমবোমা, হাইড্রোজেন বোমা। অকৃপণ উদারতায় সে, যে তার সাধনা করেছে—তাকেই নিজেকে বিতরণ করেছে। দুটো জাত মহামারণাস্ত্র নিয়ে আস্ফালন করে; দুই দিকে বসেই সে বিচিত্র হাসি হাসে। না, সে তো হাসে না; আকার-অবয়বহীন তার অদৃশ্য মুখে তো কোন অভিব্যক্তি নেই। রাজা, রাষ্ট্রনায়ক। এই শক্তিতেই রাজা, রাষ্ট্রনায়ক। তাদের হুকুমে সৈন্যবাহিনীর বন্দুক উদ্যত হয়—গুলিবর্ষণের মধ্য দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মৃত্যু বর্ষণ করে, তাই তারা রাজা অথবা রাষ্ট্রনায়ক। তার প্রতিনিধি বিচারক, রাজ্যের বিধানানুযায়ী চরম দণ্ডও দিতে পারে, তাই তারা রাজা বা রাষ্ট্রনায়ক—"I, therefore, sentence the accused Sudarsan to death and direct that he be hanged by neck till he is dead."

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের ফটকের পশ্চিম দিকের ঘরটায় সুদর্শন এসে বসল। সরকারের অনুমতি নিয়েছিলাম তার সঙ্গে দেখা করবার। দীর্ঘদেহ সবল সুস্থ সুদর্শন এসে ঘরে ঢুকে আমাকে দেখে হেসে বললে, তুমি? আমি তাই ভেবেছিলাম।

সে চেয়ারে এসে বসল।

আমি তাকে বিপুল বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছিলাম।

সে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হেসেই বললে—আমার দৃষ্টির অর্থ সে বুঝেছিল—বললে, কী দেখছ? ভয় পেয়েছি কি না?

সত্য বলতে—তাই দেখছিলাম। খুঁজছিলাম,—কোথায় রয়েছে তার মুখ-চোখে, হাস্ত-

পায়ের চঞ্চলতায়, কণ্ঠস্বরের কম্পনে ভয়ের সূক্ষ্মতম চিহ্ন। পরন্তু তার দণ্ডাদেশ হাইকোর্ট থেকে বহাল হয়ে ফিরে এসেছে, কাল সারারাত্রি সেলে একা সে মৃত্যুকল্পনার বা বিভীষিকার সঙ্গে বাস করেছে। তার এতটুকু চিহ্নও কি অভিসারিকার সিন্দূরবিন্দু বা কজ্জলরেখার মত কোথাও রেখে যায় নি সে ?

না, পেলাম না।

সুদর্শন বললে, ভয়! তারপর সে খানিকটা চুপ করে জালঘেরা জানলা দিয়ে বাইরের, অর্থাৎ জেলখানার ভিতরের দিকে তাকালে। এ ঘর থেকে যে পৃথিবী, মুক্ত পৃথিবী, যেখানে মানুষ অবাধে চলাফেলা করে, সেদিকটা দেখা যায় না। অবশ্য আকাশ আবরণ দিয়ে ঢাকা যায় না, আকাশ দেখা যায়। আকাশের দিকে তাকিয়েই সে নিজেকে বোধ হয় যাচাই করে নিলে। তারপর বললে, বলা কঠিন। তবে ভয়কে খুঁজে পাচ্ছি নে। থাকলে, মনের অনেক তলায় আছে।···তোমার সঙ্গে দেখা করবার আমার ইচ্ছে ছিল। দেখা করতাম। এরা যখন জিজ্ঞাসা করত—কাকে দেখতে চাও ? আমি তোমারই নাম করতাম। ছেলেবেলা থেকে তোমার সঙ্গে আমার চলার পথটা সোজা উল্টোমুখে। আমরা আজ এখানে বসে কথা বলছি, তবু মনের দিক থেকে দুজনে দুদিক থেকে অনেক দূরে। শেষ খুনটা তোমাকে করলে সত্যকারের নাটক হত। কিন্তু—

সে আবার হাসলে।

তারপর অন্যমনস্কভাবেই ওই আকাশের দিকে তাকিয়ে বললে, সব মনে পড়ছে। ওঃ, কত কথা! কেউ লিখলে, লিখে লিখে ফুরিয়ে উঠতে পারত না। মহাভারতের মত বিরাট-কলেবর হত। হঠাৎ হেসে উঠল অত্যন্ত সহজভাবে, বললে, মনে আছে—আমি তোমার বাবাকে গাল দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, কোলাব্যাঙ! তুমি তখন কিছু বলতে পার নি। আমার সঙ্গে গায়ের জোরে পারতে না, আর আমিও কথাটা বলেছিলাম নিরাপদ ঠাঁই থেকে; কিন্তু তুমি দুদিন পরেই ইস্কুল থেকে ফেরার পথে পাড়ার ছেলেদের জুটিয়ে দল বেঁধে পথ আগলে আমাকে মেরেছিলে। গালের উপর নখের দাগ এঁকে দিয়েছিলে। গালের উপর হাত বুলিয়ে বললে, খুব ভাল করে দেখলে বোধ হয় এখনও তার ক্ষীণ চিহ্ন দেখা যায়। ওঃ, সে-সব কত কথা!

মনে পড়ে বইকি। আমার মনে থাকবারই কথা। ওই বিরোধে যে শেষ পর্যন্ত হার হয়েছিল আমার। হেডমাস্টার ওর মুখে নখের ক্ষত দেখে শাস্তি দিয়েছিলেন আমাকেই। আমি আপত্তি করে বলেছিলাম, ও আমার বাবাকে কোলাব্যাঙ বলবে আর আমি মারব না ?

হেডমাস্টার ব্যঙ্গভরে হেসে বলেছিলেন, তোর বাবা তো কোলাব্যাঙের মতই মোটা রে!

যে-কোন শিশু জীবনের ইতিহাসে এ-কথা ভুলবে না। কিন্তু সুদর্শনের তো মনে থাকার কথা নয়! তবুও মনে আছে।

দীর্ঘকাল পরে আজও সে-কথা আমার মনের মধ্যে প্রথম থেকেই ঘুরছিল। তাই আমি বললাম, সেই বোধ হয় তোমার বিপরীত মুখে যাত্রার শুরু!

সুদর্শন ঘাড় নেড়ে বললে, না। আবার একটু পরে বললে, মানুষ কতটুকু বোঝে, কতটুকুই বা জানে জীবনের ? মানুষের মধ্যে যে মহাশক্তি—যার নাম 'আমি'—সেই 'আমিই' তো সে শক্তিকে বোঝবার পরিমাপযন্ত্র। মানুষ পরকে দেখে জীবনকে চিনেছে মনে করে; কিন্তু 'আমি'কে না চিনলে তো জীবন চেনা হয় না। বার বার সে ঘাড় নাড়লে—তার অন্তরের দৃঢ় প্রত্যয় তার সর্বাঙ্গের ভঙ্গিতে মুখর হয়ে উঠল। তারপর একটু মৃদু হেসে বললে, তোমার 'আমি

আর আমার 'আমি' জন্ম থেকেই বিপরীতমুখী।

হয়তো কতকটা তাই। বাল্যকাল থেকেই আমার সঙ্গে সুদর্শনের কোথায় যেন একটা বিরোধ। জৈব বিদ্বেষের মত পরস্পরের প্রতি একটা অপ্রীতি। পারিবারিক কলহ ছিল না। পাঠ্যজীবনেও প্রতিযোগিতার কোন কারণ ছিল না। আমরা এক ক্লাসে পড়ি নি। শুধু পাঠ্য-জীবনে কেন, জীবনের ক্ষেত্রও আমাদের পৃথক ছিল; সে যা করত, আমি তা করি নি। দুজনের খেলার ক্ষেত্রও পৃথক ছিল। আমি খেলতাম ফুটবল, ক্রিকেট; সে ওদিক পানে হাঁটত না। ওদিক পানেই বা কেন—দশজন যেদিকে হাঁটত, যেখানে খেলত, সেদিকে সে কখনও যেত না। সে যেন একক ছিল প্রথম জীবন থেকেই। সেটা আশ্চর্যভাবে সকলের চোখে পড়ত, কারণ তার জীবনের প্রকাশ সবল ছিল বললেই সবটা বলা হবে না—তার মধ্যে একটা প্রচণ্ড কিছু ছিল। সবিস্ময় প্রশ্নে মানুষের ভুরু কুঁচকে উঠত।

আমাদের গ্রামে অ্যামেচার থিয়েটার ছিল—আজও আছে; তার সমারোহ ছিল অনেক; সে অভিনয় দেখে আমরা গায়ের র‍্যাপারের সিন টাঙিয়ে গ্রীষ্মদুপুরে কোন খামার-বাড়িতে অথবা কারও পাকা বাড়ির ছাদে চিলেকোঠার পাশে স্টেজ খাটিয়ে অভিনয় করতাম। সুদর্শন অভিনয় করত না, করতেও পারত না এবং সে দলেও কখনও আসত না; সে ভাগবতপাঠের আসর পাতত। কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হবে, কারণ ভাগবত পাঠ করবে কি একটা দশ-বারো বছরের ছেলে! কিন্তু করত। ভাগবত নয়, চাণক্য শ্লোক পাঠ করত; ছেলেবেলা থেকে চাণক্য শ্লোক মুখস্থ করিয়েছিলেন ওর বাবা। বাড়ির দাওয়ায় আসর পেতে সে ভাগবত-পাঠের গৌরব অনুভব করত। সামনে রাখত একখানা জলচৌকি, তার উপর বিছিয়ে দিত একখানা পাট করা ধোওয়া কাপড়, নিজে বসত আসনে, এবং চৌকির উপর একখানা শিশু-বোধক রেখে পাঠ করত চাণক্য শ্লোক। আরম্ভ করত—'বন্দ মাতা সুরধুনি, পুরাণে মহিমা শুনি'—গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করে। ফলে পাড়ার প্রবীণারাও এসে জুটতেন। শুনতেন।

এর আধুনিক ব্যাখ্যা হয়তো ইনফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স—কিন্তু সে ব্যাখ্যা সুদর্শন সম্পর্কে আমি মানতে পারি নে। সুদর্শন নিজে তো মানেই না। সে ফ্রয়েডের তত্ত্বকেই বলে অর্ধসত্য! ঈডিপাস কম্‌প্লেক্স সম্পর্কে সে বলে, পুরুষ আর প্রকৃতি-তত্ত্ব যে জানে তার কাছে কি ওটা একটা তত্ত্ব? আলো তো আগুন নয়—ধোঁয়াটা তো নয়ই। ওটা ধোঁয়া। তন্ত্রমতে অনাবৃত নারীদেহ পূজা করে, সেই দেহ ভোগ করে যাঁরা এ তত্ত্ব বোঝবার সাধনা করেন তাঁদের সঙ্গে আমি ঘর করেছি। এ দেশে এ সাধনা অন্তত কয়েক হাজার বছরের। এঁটোখেগো একদল মানুষ চিরকাল আছে—ঘরের অনুচ্ছিষ্ট অন্ন তাদের কাছে বিস্বাদ, স্বভাবে গোলাম, যাদের চাকর রাখার ক্ষমতা আছে তাদের বাড়ির এঁটো খাদ্যই ওদের কাছে অমৃত। ওর মধ্যে কোন জীবাণু নেই। তবে ও নিয়ে লাফালাফি চেঁচামেচি করে কী হবে?

আমার নিজেরও অন্তরে অন্তরে অনুভব করেছি—বাল্যকাল থেকেই সুদর্শন যা করেছে তার পিছনে কোন কম্‌প্লেক্স ছিল না। তার প্রকৃতির মধ্যে প্রাণশক্তির একটা প্রচণ্ড গতিবেগ ছিল। জীবনের ঐকতানের মধ্যে সে যেন এক স্বতন্ত্র সুর; অনেকের মধ্যে যে ঐক্যের বৈচিত্র্য—তার মধ্যেও সে অনৈক্য সৃষ্টি করে।

ওই ভাগবতপাঠের আসরেই তার সঙ্গে আমার প্রথম বিবাদের আরম্ভ। সুদর্শন ভাগবত পাঠ করে শুনে সেদিন আমরাও কজন শুনতে গিয়েছিলাম। বিস্ময়ের অবধি ছিল না। ওরা তখন সবে মাস-কয়েক আমাদের গ্রামে এসেছে। ওর বাপ ছিলেন আবগারী দারোগা—আমাদের গ্রামের জামাই। মাতামহ ছিলেন ইস্কুলের শিক্ষক। সুদর্শনের বাবা বিশ্বেশ্বরবাবুর

ঘুষ খেয়ে চাকরি গেল; তিনি এসে উঠলেন তাঁর শ্বশুরের গ্রামে, অর্থাৎ আমাদের গ্রামে। হুগলী অঞ্চলের কুলীনের ঘরের ভাগ্নে বিশ্বেশ্বরবাবুর পৈতৃক ভিটে ছিল না। বিয়ের পর শ্বশুরের গ্রামে বাস করবার কল্পনা করে শ্বশুরকে নিয়মিত টাকা পাঠাতেন জমি কেনবার জন্য; বেশ কয়েক বিঘা জমি কেনাও হয়েছে তখন, ঘুষের মোটা টাকা হাতে নিয়ে শ্বশুর-বাড়িতে উঠে মাসখানেকের মধ্যেই একজনের বসতবাড়ি কিনে গৃহপ্রবেশ করে আমাদের প্রতিবেশী হলেন। এবং অর্থ ও বরখাস্ত-হওয়া সরকারী চাকরির গৌরবে গণ্যমান্যও হয়ে উঠলেন। ইংরেজী বলতে পারতেন, সকলের সঙ্গে—এমন কী শ্বশুরের সঙ্গেও ঝগড়া করতেন, চুরুট খেতেন। ছেলে সুদর্শন সে আমলে সুন্দর সুন্দর হাফপ্যাণ্ট কোট পরত। সদর্প পদক্ষেপে ঘুরত। বাপ বলতেন, ও একটা গ্রেট-ম্যান হবে। শুনতাম তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে ছেলেকে কখনও নিজেদের উচ্ছিষ্ট পর্যন্ত খেতে দেন না। কারণ সে গ্রেট-ম্যান হবে। সুতরাং প্রতিষ্ঠা হতে দেরি হয় নি। কিন্তু মাস ছয়েক না যেতেই বিশ্বেশ্বরবাবু মারা গেলেন। সুদর্শন কারও সঙ্গেই মিশত না; প্রথম প্রথম বিশ্বেশ্বরবাবুও ওটা পছন্দ করতেন না; তাঁর ভয়ে আমরা ওর কাছ থেকে দূরেই থাকতাম। বাপের মৃত্যুর পর তাদেরই দাওয়ায় নিঃশঙ্ক সুদর্শন ভাগবতের আসর করছে শুনে আমরাই গেলাম এগিয়ে। আমার সঙ্গে ছিল আমারই পাড়ার বন্ধুরা, তার মধ্যে ছিল বিপ্রপদ। একান্তভাবে মাটির জীব। সামান্য ক্ষুধায় চেঁচায়, অল্প কৌতুকে অট্ট হেসে গড়িয়ে পড়ে, ক্রোধে জ্ঞান হারায়, ভালবাসে প্রাণ ঢেলে, কাঁদে চিৎকার করে—বিপ্রপদ অদ্ভুত। কেঁচো চেঁচায় না—নইলে বিপ্রপদকে কেঁচো বলতাম। ক্লেদাক্ত জীব।

সুদর্শন শ্লোক পড়ে ব্যাখ্যা করছিল—বিস্ময় বোধ করছিল সকলেই। চাণক্য শ্লোক আমার মুখস্থ ছিল না, কিন্তু পরিচয় ছিল শ্লোকগুলির সঙ্গে। সেকালে অনেক ছেলেরই ছিল। হঠাৎ বিপ্রপদর বিচিত্র কৌতুকবোধ সমস্ত-কিছুর সুর-তাল ভঙ্গ করে দিল। সে যেন এই বহু সহস্র বৎসরের বিবর্তনে বিপ্লবে এগিয়ে-আসা মনুষ্য-সমাজের মানুষই নয়। স্থূল কুৎসিত, বুদ্ধিহীন বর্বর।

সুদর্শন শ্লোকটি পড়ে ব্যাখ্যা করলে, বিষ্ঠার মধ্যেও যদি সোনা পড়ে থাকে তৎক্ষণাৎ তাকে তুলে নেবে।

একটি প্রবীণা বলে উঠলেন, রাধামাধব! কী বলছ গো ছেলে?

সুদর্শন বললে, বলছি, বিষ্ঠার মধ্যেও যদি সোনার টুকরো পড়ে থাকে তবে তখুনি তাকে উঠিয়ে নেবে।

প্রবীণা বললেন, এ ভাগবত তোমার কোন্ বেদব্যাসের লেখা গো ছেলে? সোনার জন্যে বিষ্ঠায় হাত দিতে বলে?

সুদর্শন বললে, ছেলে মায়ের কোলে বিষ্ঠা ত্যাগ করলে লাগে না মায়ের হাতের গয়নায়? মা ফেলে দেয় সোনার গয়না? আর খুব তো বিষ্ঠা-বিষ্ঠা করছেন—বিষ্ঠা তো আপনার পেটে রয়েছে, ছেলেবেলায় তা সব ছেলেই খেয়েছে—আপনি খান নি?

প্রবীণা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন—উঠবারই কথা; কিন্তু তিনি কী বললেন তা আর শোনা গেল না, বিপ্রপদর অট্টহাস্যে সব ঢাকা পড়ে গেল। সে কৌতুকে হেসে সারা। হি-হি-হি-হি! হি-হি-হি-হি! হি-হি-হি-হি!

সুদর্শন এবার ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিল, এই বিপ্রপদ! এই!

বিপ্রপদ সেই হেসেই চলেছে।—হি-হি-হি-হি!

প্রবীণ্যাও এবার সবিস্ময়ে বললে, আ মরণ, এত হাসিস কেন রে ছোঁড়া ?

আমিও তাকে ধাক্কা দিলাম : এই বিপ্র ! হাসছিস কেন ?

সে এবার বহু কষ্টেই হাসি একটু থামিয়ে বললে, ভাগবতে বিষ্ঠা ! হি-হি-হি-হি-হি-হি-হি-হি !

এতক্ষণে সে বিষ্ঠা শব্দের অর্থটা বুঝেছে এবং ভাগবতের কথার মত পবিত্র কথার মধ্যে ওই অপবিত্র বিষ্ঠা শব্দের উল্লেখ শুনে তার বিচিত্র কৌতুকবোধ উথলে উঠেছে। ভাগবতের কথার মধ্যে বিষ্ঠার উল্লেখ ? ভাগবতে বিষ্ঠা ! কথাটা সে এমনই ভঙ্গিতে বলেছিল যে সারা শ্রোতা ও শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যেও সে হাসির ছোঁয়াচ ছড়িয়ে পড়িল। সবাই সশব্দে প্রবল কৌতুকে হাসতে শুরু করে দিলে।

সুদর্শন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে এসে ধরলে বিপ্রপদকে।

আমি মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাধা দিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে সঙ্গে মহিলাদের দলও যোগ দিয়ে বলেছিলেন, এ কী, এ কী ? ছাড়। ছাড়। ও বাবা সুদর্শন, ছাড়। সুদর্শন ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু তার রাগটা পড়েছিল আমার উপর, কারণ আমিই তাকে বাধা দিয়েছিলাম প্রথম। মেয়েরা না থাকলে সে হয়তো আমার উপরেই তার প্রতিহত আক্রমণটা প্রয়োগ করত। মারামারিটা আমার সঙ্গেই করত, এবং তার শক্তির কাছে আমি পরাজিত হতাম এটা সন্দেহাতীতরূপে সত্য। কিন্তু তা হতে পায় নি ওই প্রবীণা মহিলাদের জন্যে। সুদর্শন তার বদলে আমাকে গাল দিয়েছিল। আজ সেটা নিতান্তই পরম্পরাহীন, অসংলগ্ন, অবান্তর মনে হয় ; কিন্তু সেদিন মনে হয় নি। তারও হয় নি, আমারও হয় নি। সে ফিরে গিয়ে 'শিশুবোধক'খানা হাতে করে ঘরের দরজা বন্ধ করতে করতে আমাকে বললে, তোর বাবা তো কোলাব্যাঙ রে, তোকে আমি ব্যাঙাচির মত মেরে দিতে পারি।

মারামারিটা সেইদিনেই হত। কিন্তু ওই মহিলারাই আমাকে নিবারণ করেছিলেন। ঘটেছিল তার পরের দিন ইস্কুল থেকে ফেরবার পথে।

হেডমাস্টার আমাকেই শাসন করেছিলেন। সুদর্শনের নাকের কোল থেকে চিবুক পর্যন্ত আমার নখের আঁচড়টা স্থায়ী দাগ রেখে যাবার মত গভীর হয়েছিল। সুদর্শনের মুখ এখন দাড়িতে ঢেকে রয়েছে—দাগটা আজও আছে, না, মিলিয়ে গেছে জানি না। কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত ছিল।

এর কিছুদিন পর আমার জীবনে ঘটল বিপর্যয়। আমার বাবা মারা গেলেন। মা মামাদের সঙ্গে পরামর্শ করে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন মামাদের ওখানে। ওখানে মামাদের অভিভাবকত্বের অধীনে থাকব এবং পড়ব। পশ্চিম প্রদেশ—শরীরও ভাল হবে। বছরে দুবার ছুটিতে আসব। মধ্যে মধ্যে মা যাবেন। ওই সুদর্শনের সঙ্গে ঝগড়ার কিছুদিনের মধ্যেই তা ঘটে গেল। বাবার মৃত্যুর দিন সে এসে আমার পাশে বসে ছিল। কোন কথা সে বলে নি, চুপচাপ বসে ছিল। তারপর মামার বাড়ি যাওয়ার সময় পর্যন্ত আর দেখা হয় নি। বাবা মারা গেলেন ডিসেম্বরের শেষে ; শ্রাদ্ধ শেষ হল দশ দিনে, জানুয়ারির শেষ সপ্তাহের আগেই চলে গেলাম পাটনায়। গ্রামে ফিরলাম গ্রীষ্মের ছুটিতে। বিপ্রপদ রেলস্টেশন পর্যন্ত এসেছিল আমাকে প্রত্যুদ্গমন করে নিয়ে যাবার জন্যে। গ্রামে পৌঁছে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই অন্য বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হল, সুদর্শনের সঙ্গে হল না ; তার কথা ঠিক মনেও হয় নি। কারণ ওরা তো আমাদের গ্রামের বাসিন্দা ছিল না ; আগন্তুক। তাও তাদের আসা—আমি গ্রাম থেকে মামার বাড়ি যাওয়ার কাল পর্যন্ত মাস কয়েকের বেশী হয় নি, তাই ঠিক ওকে মনেও ছিল না।

ওকে দেখলাম বিকেলবেলা। সে দেখাও মনের মধ্যে অক্ষয় হয়ে আছে। গ্রামের বাইরে খানিকটা দূর চাষের ক্ষেত পার হয়ে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বি চলে গেছে ডিস্ট্রিক-বোর্ডের পাকা সড়ক, সড়কটার ঠিক ওপাশে একটা বিরাট মজা-দীঘি। লোকে বলে—মুসলমান রাজত্বেরও আগের কালে এখানকার রাজার কাটানো সরোবর। গোটা গর্ভটাই এখন চাষের জমিতে পরিণত হয়েছে—সরোবরের চিহ্ন হিসাবে জেগে আছে চারপাশে চারটে পাড়; সে পাড়ের উপর কাঁটাগাছ, শেয়াকুল, কেয়া ও ফণিমনসার জঙ্গল। দু-চারটে বড় শিরীষ গাছও আছে। দীঘিটা আকারে বিশাল—এত বড় যে ডিস্ট্রিক-বোর্ডের রাস্তাটা এক পাশ ঘেঁষে এটাকে কেটে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে এবং গ্রামের একটি স্বাভাবিক নালা সেটাও এটার বুক চিরে নদীর দিকে চলে গেছে। ওই সড়কের নালার উপর একটা সাঁকো আছে, সেই সাঁকোটা আমাদের অতি প্রিয় জায়গা ছিল। বিকেলবেলা সেখানে গিয়েছিলাম বেড়াতে। খিলেনের সাঁকো, দুপাশে দুটো আলসে—তার উপর বসে চিরকাল গ্রামের কিশোরেরা আড্ডা দেয়। আমরা সেখানে পৌঁছেই দূরে নালার একটা বাঁকে কাঁটাঝোপের আড়াল থেকে শুনতে পেলাম দুপ্‌দাপ্‌ শব্দ। কেউ যেন মাটি পিটছে বা কাউকে মারপিট করছে। সাঁকোটার আলসের উপরে উঠেই দেখলাম, আমাদেরই সমবয়সী একটি ছেলে একটা বাঁশের লাঠি দিয়ে কিছুকে আঘাত করছে। দেখলাম কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপরই শব্দ স্তব্ধ হল, ছেলেটিকেও আর দেখতে পেলাম না।

এবার এগিয়ে গেলাম।

দেখলাম, নালাটার বাঁকের মাথায় ছেলেটি ঘাড় হেঁট করে বসে একাগ্রচিত্তে কী যেন করছে।

কাছে গিয়েই শিউরে উঠলাম। প্রকাণ্ড বড় হাত-তিনেক লম্বা একটা কেউটে সাপকে মেরেছে একটি ছেলে। সে সুদর্শন। মেরে দুটো কাঠি দিয়ে তার মাথা এবং চোয়াল চিরে মুখের ভিতরটা দেখছে নিবিষ্ট চিত্তে। সাপটার লেজটা তখনও অল্প নড়ছে।

পিছনে পায়ের শব্দ শুনে সে ধীর শান্তভাবে মুখ ফেরাল, তার হাত নড়ল না, যেমন কাঠি দিয়ে সাপটার মুখটা চিরে ধরেছিল তেমনই স্থির রইল।

সবিস্ময়েই বললাম, সুদর্শন!

সে বললে, হ্যাঁ। দীর্ঘদিন পর আমাকে দেখে তার মুখে কোন একটি ভাবরেখাও ফুটে উঠল না।

আমি বললাম, এত বড় সাপটাকে তুমি একা মারলে?

আবার সেই সংক্ষিপ্ত উত্তর, হ্যাঁ।

বিপ্রপদর চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল, সে বললে, প্রকাণ্ড সাপ!

এবার সুদর্শন হাসলে, হেসেই বললে, হ্যাঁ।

আমি বললাম, কিন্তু তুমি এখনও কী করছ?

—ওর বিষদাঁত আর বিষের থলিটা দেখছি। উঃ, কী সাংঘাতিক! এইটুকু এত সরু নালি এর মধ্যে আছে, তার ভিতর দিয়ে বিষ এসে পড়ে। গোড়ায় ওইটে বিষের থলি। আট-দশটা গরুকে মেরেছে, ক'দিন আগে একটা বাউরী মেয়ে মরেছে ওর কামড়ে। আজ তিন-চারদিন ওকে আমি খুঁজছি।

এবারে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দুই আঙুলে সাপটার মাথা ধরে তুলে ডান হাতে একটা কাঠি দিয়ে বিষের থলিটায় চাপ দিয়ে ধরলে—খানিকটা তরল পদার্থ ফোঁটা হয়ে

ঝরে পড়ল। সুদর্শন বললে, বিষ।

আমার শরীরে কেমন একটা যেন শিউরে ওঠার মত অনুভূতি খেলে যাচ্ছিল। আমি বললাম, ওঠা ফেলে দাও ভাই সুদর্শন। কেন আর ওটাকে নিয়ে ঘাঁটছ ?

প্রতিবাদ করলে না সুদর্শন, ফেলেই দিলে। ফেলে দিয়ে বললে, এবার এই নিয়ে বারোটা সাপ মারা হল আমার। সাপ হল সাক্ষাৎ পাপ। পাপীকে—পাপকে দমন করব আমি।

বলেই সে হনহন করে চলে গেল। আমাকে জিজ্ঞাসাও করলে না—কখন এলে ? বরং হঠাৎ থেমে, ঘুরে দাঁড়িয়ে যা বললে তাতে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বললে, ভগবান আমাকে এই জন্যে পাঠিয়েছেন।

এমনি ধারার বিচিত্র অদ্ভুত সে, সেই ছেলেবেলা থেকে। প্রায় প্রতিবার ছুটিতে দেশে এসেছি—প্রতিবারই তার সম্পর্কে কয়েকটি বিচিত্র কাহিনী শুনেছি। দু-একটি চোখে দেখেছি।

তারপর একবার এসে দেখলাম বিপ্রপদর সামনের একটা দাঁত নেই। বিপ্রপদ ছিল দস্তুর, মূর্খ। সামনের দাঁত দুটো ছিল অশোভনরূপে বড়; লোকে বলত—কপাট নয়, ফটক। শুনলাম, দাঁতটা সুদর্শন ঘুষি মেরে ভেঙে দিয়েছে। বিপ্রপদ তখন লেখাপড়া ছেড়ে বাবু সেজে বেড়ায়। থিয়েটারের দলে ঢুকেছে, সৈনিকের, পথিকের পার্ট করে; সিগারেট অনেকদিন থেকেই খেত, এখন সেদিক দিয়ে উঁচু পর্যায়ে উঠেছে। থিয়েটারের দলে সখীর ব্যাচ তৈরির জন্ম গাইয়ে, দেখতে-শ্রীমান ছেলেদের পিছনে ঘোরে; তাদের লুব্ধ করে। হঠাৎ একদিন তার সঙ্গে দেখা হল সুদর্শনের এমনই একটি আলাপের ক্ষেত্রে। ছেলেটি দরিদ্র বিধবার ছেলে—ইস্কুলে পড়ে; বিপ্রপদ তাকে একটা সিগারেট ধরিয়ে দিচ্ছিল। সুদর্শন সেই মুহূর্তেই এসে পড়েছিল এবং থমকে দাঁড়িয়ে ছেলেটির কান ধরে বলেছিল, তুই সিগারেট খাচ্ছিস ?

বিপ্রপদ গর্জন করে উঠেছিল, তাতে তোমার কী ?

সুদর্শন তার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে বলেছিল, তা হলে তুমি দিয়েছ ?

—দিয়েছি, বেশ করেছি।

সুদর্শন সঙ্গে সঙ্গে তার গালে মেরেছিল একটি চড়। মুহূর্তের মধ্যে বিপ্রপদও তার উপর লাফিয়ে পড়েছিল। তারপর দুজনে যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে ঘুষি মেরে বিপ্রপদর সামনের দাঁত দুটি নড়িয়ে দিয়েছিল। একটি এমনি নড়েছিল যে, কিছুদিন না-যেতেই সেটি পড়ে গিয়েছিল। যুদ্ধের শেষে সুদর্শন বলেছিল, তুমি নিজে পাপ করছ, তার উপর সেই পাপ চারদিকে ছড়াচ্ছ। আমি তা হতে দেব না। আজ তোমাকে প্রথম সাবধান করে দিলাম, কিন্তু পরে তোমাকে কঠিন শাস্তি দেব।

সুদর্শন তখন ক্লাস টেন-এ পড়ে। এই ক'বছরে তার স্বাস্থ্যকে সে পরম যত্নে গড়ে তুলেছে। বাইশ জনের সঙ্গে মিশে সে ফুটবল খেলে না, ক্রিকেট খেলে না, কিন্তু বাড়িতে সে ডন-বৈঠক দিয়ে, ডাম্বেল ভেঁজে শরীর গড়ে তুলেছে পাথরে-খোদাই-করা মূর্তির মত। বিপ্রপদ নড়া-দাঁত নিয়ে ইস্কুলে নালিশ করেছিল। হেডমাস্টার সুদর্শনকে ভালবাসতেন—কিন্তু এই ধরনের ঔদ্ধত্য তাঁর ভাল লাগে নি, তিনি তাকে ডেকে প্রশ্ন করেছিলেন, কেন মেরেছ তুমি বিপ্রপদকে ?

সুদর্শন বলেছিল, ও একটা ছোট ছেলেকে সিগারেট দিচ্ছিল।

—তাতে তোমার কী ? বিশ্বসংসারকে শাসন করবার অধিকার তোমাকে দিলে কে ?

—অন্যায়কে শাসন করবার অধিকার সবারই আছে।

—না, নেই। তার জন্ম সমাজ আছে, গর্ভর্ণমেন্ট আছে, কোর্ট আছে। তুমি সমাজপতি? তুমি কোর্ট? তুমি পুলিস?

—আমি ওসব কিছুই মানি না।

—মান না? স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন হেডমাস্টার।

—না, আমার বুদ্ধি আছে, গায়ে বল আছে, আমি বিচার করে দেখব; যেখানে অন্যায় সেখানেই আমি প্রতিকার করতে চেষ্টা করব। যেমন বিপ্রপদ করলে করেছি, তেমনি আর একজন করলেও করব। ঈশ্বর এই জন্তে আমাকে পাঠিয়েছেন।

এর পর—বোধ হয় উত্তেজনায় তার জ্ঞানগম্য লোপ পেয়েছিল—সে বলেছিল, আপনি অন্যায় করলেও করব।

—হোয়াট্! চিৎকার করে উঠেছিলেন হেডমাস্টার এবং বেতখানা টেনে নিয়েছিলেন—সেটা তাঁর চেয়ারের পিছনে যে আলমারিটা ছিল তার মাথার উপর তোলা থাকত; এবং বেতখানা তুলেছিলেন সুদর্শনকে মারবার জন্তে। সুদর্শন মিথ্যা দম্ভ করে নি—সেও মুহূর্তে হাত বাড়িয়ে উদ্যত বেতখানা চেপে ধরে টান মেরে ছাড়িয়ে নিয়ে ভেঙে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল এবং হেডমাস্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বলেছিল, আজ থেকে ইস্কুল ছেড়ে দিলাম আমি।

হেডমাস্টার এর পরও তাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন—কিন্তু সে যায় নি। তার জীবন তখন সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন, মুক্ত; বছরখানেক আগে তার মা-ও মারা গেছেন। মাতামহ মামা ওঁরা কেউ তাকে কোন কথা বলতে সাহস করেন নি। ওর বাপের আমল থেকেই ওঁদের সঙ্গে মনোমালিন্য চলে আসছে। ওর মাতামহ জামাইকে বলতেন—ঘুষখোর বদমাইশ, ওর বাবা শ্বশুরকে বলতেন—চোর, জোচ্চোর। কারণ তিনি বলতেন—তিনি এখানে জমি কেনবার জন্য যে টাকা পাঠাতেন সেই টাকায় শ্বশুর নিজের নামে কিনতেন ভাল জমি, আর জামাইয়ের নামে সস্তায় ডাঙা জমি কিনে দিতেন। কথাটার সমর্থন গ্রামেও ছিল। সুদর্শনের বাপের মৃত্যুর পরও এ বিবাদ মেটে নি; তার কারণটা সত্যই মর্মান্তিক। বিশ্বেশ্বরবাবুর মৃত্যুর আগে পর্যন্ত অসুখের সংবাদ পেয়েও শ্বশুর জামাইয়ের ঘরে পদার্পণ করেন নি। সুদর্শনের মা আদৌ তেজস্বিনী ছিলেন না, বরং নিজস্ব-মতামতহীন, একান্তভাবে নিরীহ মানুষ ছিলেন—তিনিও বাপ-ভাইদের এ অপরাধ ক্ষমা করতে পারেন নি। মায়ের যখন মৃত্যু হল তখন সুদর্শন বেড়ে উঠেছে বয়সে যতখানি, তার চেয়ে অনেক বেশী তার স্বয়ম্ভুত্বে। সুতরাং তাঁরা আর মিলনের চেষ্টাই করেন নি। হেডমাস্টার সুদর্শনের মাতামহকে ডেকে বলেছিলেন, আপনি ওকে ইস্কুলে আসতে বলুন, এই তো ক'মাস পরেই পরীক্ষা।

মাতামহ হাতজোড় করে বলেছিলেন, আমাকে মাপ করুন মাস্টারমশাই। ওর বাবা ছিল হারামজাদা বজ্জাত, তার ঔরসে ও জন্মেছে রামজাদা সত্যপীর; জন্ম থেকেই জ্যাঠামশায়—ও ছেলের বাপ-মা মামা-মাতামহ কেউ নেই, থাকে না। ভগবান সদয় এবং সহায়—বাপ মা দুটোকেই সরিয়েছেন। এখন আমি সামনে দাঁড়ালে ভগবানকে দরকার হবে না, নিজেই কাত করে দিয়ে চলে যাবে। ওর কাছে আমার ভরসা তো তেরাত্রিতে একটা পিণ্ডি, তাতে আমার লোভ নেই। ও যা খুশি করুক। আমাকে মাপ করবেন।

হেডমাস্টার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, এত উদ্ধত হবে, এ আমার ধারণা ছিল না মশাই। পড়াশুনায় ভাল, চরিত্র ভাল। কিন্তু—। একটু পরে বলেছিলেন, তা না হয় অন্য ইস্কুলে যাক। কিংবা প্রাইভেটে দিক।

—সে তো ঠিক করে ফেলেছে, বাড়িতে সংস্কৃত পড়বে।
—হ্যাঁ, খবর পেয়েছি আমি।

সংস্কৃতই পড়ছিল। হঠাৎ আবার এক কাণ্ড করে বসল। ওই পাষণ্ডদলন—পাপদমন। দেহের শক্তিতে সে তখন সত্যই প্রচণ্ড। সে দেহ তার দেখবার মত। আমাদের গ্রামে ধান চুরি একটা উপদ্রব হয়ে দাঁড়ায়। ধান চুরি চিরকালই আছে, চোরেরা গ্রামেরই, পুরুষানুক্রমে এ কাজ তারা করে আসছে। অল্পস্বল্পে লোকে গ্রাহ্য করে না। ক্ষেতের ধান খামারে উঠবার সময় সকলেই একটা হিসেব করে রাখে—কতটা নেবে চোরে, কতটা খাবে ইঁদুরে, কতটা খাবে কীট-পতঙ্গে। এ ছাড়া রাজা আছেন, ভিক্ষার্থী আছেন। হঠাৎ চোরের অংশ রাজভাগকেও ছাপিয়ে যাবার উপক্রম করল। ধান চুরিতে চোরের মজা এই যে ধানের সনাক্ত নেই, একবার ঘর থেকে নিয়ে পথে বের হতে পারলে সে ধান কার প্রমাণ করা যায় না। এবং চোরদের মধ্যে এমন এক নূতন চোরের আবির্ভাব হল যাকে চোখের সামনে দেখে হাত বাড়িয়ে প্রায় ধরে ফেলেও ধরা যায় না, কারণ এই নূতন চোর নিশি মুহূর্তের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে যায়, আধ মিনিটে পাঁচ মিনিটের ব্যবধান সৃষ্টি করে। ক্ষিপ্রতায় তার জুড়ি কেউ দেখে নি। সুদর্শনের বাড়িতে ধান ছিল, দু-তিনটে ধানের মরাই বাঁধা থাকত। সুদর্শন উঠোনের সামনে খোলা বারান্দায় মশারি খাটিয়ে শিয়রে একখানা হাঁসুয়া নিয়ে পাহারা দিত।

নিশিকে পাকড়াও করবার জন্য পুলিস এবং গ্রামের লোকের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না, কিন্তু নিশির কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করতে পারে নি। সুদর্শন কিন্তু তাদের সঙ্গে যোগ দেয় নি। সে একদা নিশিকে ডেকে বলে দিলে, নিশি, পাপের ভরা তুই পূর্ণ করে তুলেছিস। বড় বেশী বাড়াবাড়ি করছিস। গরীব, বিধবা—এদেরও ধান চুরি করছিস তুই। এতদিন আমি কিছু বলি নি, এবার আর ক্ষমা করব না। আমি যেদিন বের হব—

নিশি হেসেই ভুরু কুঁচকে বলেছিল, এই দেখেন, আপনি বার হবেন তা বারণ করেছি কোনদিন? আমি চুরির কী জানি? আমি যদি চুরি করি তবে আপনি ধরবেন। আমার দাদা রবিলাষ চুরি করত—তাকে ধরে ফেললে সেদিনে সবাই মিলে ঘিরে, আমার ভাগনে মতিলাল সে ধানের বস্তা ফেলে পালালে—তাকে তেড়ে ধরলে। ওই গোগার আমাদের জ্ঞাতি—ফুচে, সে ধরা পড়ল হাতে-নাতে গোলার ভেতর; যার যেমন সাজা হল। কই, আমার গায়ে কে কবে হাত দিয়েছে বলুক! 'এই দেখলাম পালিয়ে গেল নিশে'—এ বললে তো হবে না মশায়। আমি মশায় দুখ করে খাই। আমার ভাই ভাগ্নে চোর বলে আমিও চোর হব, ই কেমন কথা?

শুধু এই কথাতেই প্রসঙ্গটা শেষ হল না—দিন দুয়েকের মধ্যেই সুদর্শনের বাড়ি থেকেই ধান চুরি হয়ে গেল। সেদিন সকালে ওদের হরিজন ঝি মরাইয়ের সামনে মাড়ুলি দিতে গিয়ে ধানের ছড়া দেখে সুদর্শনকে ডাকলে, মুনিব, রাত্তিরে ধান চুরি হয়েছে বাবা। দেখবে এস। সুদর্শন দেখলে। মরাইটার খড়ের বেড় পরীক্ষা করলে। হ্যাঁ, চুরি হয়েছে। এদিকটার ধান বের করে নেওয়ার জায়গাটা বসে গেছে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে চলে এল। তারপর সটান গেল নিশির বাড়ি। বলে এল, পালক উঠেছে তোর। আমি আগুন। একদিন ফিরে এসেছিস। আর ফিরবি নে।

নিশি আর প্রতিবাদের বাকি রাখে নি। নিজের পাড়ায় দাঁড়িয়ে আস্ফালন এবং কটু কথা বলেছিল ইচ্ছামত, কিন্তু সুদর্শন আর কোন কথা না বলে চলে এসেছিল। এর ঠিক দু

দিন পরে সুদর্শন নিশিকে শুধু ধরেই ফেললে না, তার ডান হাতের চেটোতে হাঁসুয়ার কোপ মেরে জখম করে দিল।

নিশি আবার এসেছিল বাবুকে তার শাসানির জন্য ব্যঙ্গ করতে। বিলিতি প্রথায় বাবুর চ্যালেঞ্জের উত্তর দিতে। সে জানত, তার থেকে ক্ষিপ্রতর মানুষ এবং প্রয়োজনের সময় সবলতর মানুষ কেউ নেই এখানে। ভুল করেছিল সে। সুদর্শনকে ঠিক আন্দাজ করতে পারে নি। নিশি বাড়ি ঢুকে ধানের গোলায় সবে হাতটি দিয়েছে, হঠাৎ উঠোনের আমগাছটা থেকে লাফ দিয়ে পড়ে সুদর্শন বলেছিল, আমি আজ জেগে আছি নিশে। আগুন আজ ছাই-ঢাকা পড়ে নি।

মুহূর্তে নিশি বসে বসেই লাফ দিয়ে খানিকটা স্থান অতিক্রম করে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটেছিল—এবং এক লাফে পাঁচিল পার হয়ে ওপারে রাস্তায় পড়ে আবার দিয়েছিল তার সেই এ অঞ্চলের বিস্ময়কর দৌড়। কিন্তু আশ্চর্য, নিশির কল্পনাতীত এক আতঙ্ক অনুসরণরত পদশব্দের রূপ ধরে ঠিক তার পিছনে পিছনে, বোধ করি তার থেকেও ক্ষিপ্রতর গতিতে ক্রমশ নিকটতর হয়ে, তার ঠিক পর-মুহূর্তেই পাঁচিল টপকে পড়ে কিছুদূর এসেই তাকে ধরে ফেলেছিল। তাকে একটা যুদ্ধ দেবার জন্যেই অগত্যা নিশিকে ঘুরে দাঁড়াতে হয়েছিল। ঘুরে দাঁড়িয়েই তার আর আতঙ্কের পরিসীমা ছিল না। তার সেই আতঙ্ক হাঁসুয়া নিয়ে হাত উদ্যত করেছে। উদ্যত হাতের ওই অস্ত্রটা যদি তার মাথায় পড়ে তবে মৃত্যু অবধারিত। সে ডান হাত তুলে বাধা দিয়ে চিৎকার করে উঠেছিল, হাতে মারো বাবু, হাঁসুয়া দিয়ে পরানে মেরো না। কিন্তু তখন তার হাতের চেটোখানায় অস্ত্রটা বসে গেছে। তর্জনী আর মধ্যমা আঙুল দুটো মাত্র চামড়ার সঙ্গে লেগে আছে। নিশি আর্তনাদ করে বসে পড়েছে। সুদর্শন হাঁসুয়াখানা হাতে নিয়ে বলেছিল, থানায় যেতে আমি চাই নে। তবে তুই গেলে আমাকে যেতে হবে। কী করবি?

—না না বাবু, আমি থানায় যাব না; কিন্তুক তুমি আর এর উপর আমাকে থানায় দিয়ো না।

—না, আমি যাব না।

এবার নিশি কেঁদে উঠেছিল: কী করলে বাবু গো, জন্মের মত ডান হাতটা নিলে গো?

—পরের বার বাঁ হাতটা নেব। এখন ডাক্তারের কাছে যা। না, বাড়ি যা, ডাক্তারকে নিয়ে তোর বাড়ি আমিই যাব।

চিকিৎসার খরচটা সুদর্শনই দিয়েছিল। নিশির হাতখানা জোড়া লেগেছে বটে, কিন্তু অকেজো হয়ে গেছে। দুটো আঙুল লোহার শিকের মত সোজা হয়ে থাকে, মুড়তে পারে না।

কথাটা গোপন থাকার কথা নয়, প্রকাশ হয়ে পড়েছিল; নিশির স্ত্রী অনেক অভিসম্পাত দিয়েছিল ঘরে বসে, লোকের কানে সেটা পৌঁছেছিল। লোকে সুদর্শনকে প্রশ্ন করেছিল, ধরলে তো পুলিসে দিলে না কেন?

সুদর্শন বলেছিল, আমি ধরেছি, যা সাজা দেবার দিয়েছি। পুলিস ধরে জেল দিতে চায় তো পুলিসই তাকে ধরুক।

এর পর বছরখানেকের মধ্যেই সুদর্শন এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে ঘর ছেড়ে চলে গেল। সেবার আই. এ. পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি এসে খবরটা শুনলাম। জমি-জেরাত-বাড়ি সব জলের দরে বেচে দিয়ে গেছে।

এবার এসে আলাপ হয়েছিল, ধীরেনবাবু ডেটিস্ট্যুর সঙ্গে। এই দেশসেবকের সঙ্গেও নাকি

সুদর্শনের ঝগড়া হয়েছিল। ধীরেনবাবুকে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলেছিলেন—থাক্ তার কথা। সে গ্রাম থেকে গেছে তোমরা বেঁচেছ। থাকলে আমার কাজ বাড়ত; ওকে শেষ করতে হত আমাকে।

এই সুদর্শন।

দীর্ঘকাল—হ্যাঁ, কুড়ি বৎসর পরে হঠাৎ কাগজে দেখলাম, হাইকোর্টে সেসন্‌সে সুদর্শনের বিচার হচ্ছে। অভিযোগ অনেক—খুন থেকে নয় কী! প্রথম সন্দেহ হয়েছিল—কোন্ সুদর্শন, কে সুদর্শন? সংসারে তো সুদর্শন নাম তারই একার নয়। তবু দেখতে গেলাম সেসন্‌স্। দেখলাম, হ্যাঁ, সেই সুদর্শন। স্থির হয়ে বসে ছিল—কিন্তু গভীর কোন চিন্তায় মগ্ন। হঠাৎ একবার আমার দিকে চোখ পড়ল। একটু যেন প্রশ্ন জাগল দৃষ্টিতে। তারপর সে একটু হাসল। বুঝলাম, চিনেছে।

ফাঁসির হুকুম হল। রায়ে বিচারক যে ভীষণ কথা লিখেছেন—তা বোধ হয় বিচারের নথিতে, ল রিপোর্টে অতুলনীয়। মানুষের সমাজে আসামী অতি ভয়ঙ্কর। এমন ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুর, দুঃসাহসী ব্যক্তিত্ব কিরূপে সম্ভবপর হয় তা মানুষের কল্পনায় ধারণা করা যায় না। আসামীর প্রকৃতিতে চরিত্রে মানুষের সমাজ ও সভ্যতার কোন প্রভাবই যেন ক্ষীণতম রেখাপাত করতেও সক্ষম হয় নি। এ যেন প্রকৃতির উন্মত্ত সত্তার এক আকস্মিক আত্মপ্রকাশ। সমাজ ও দেশের দুর্ভাগ্য যে, যুদ্ধ এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মত একটি ভয়ঙ্কর বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত, সকল সমাজ-রাষ্ট্রের আয়ত্তের বহির্ভূত গত পাঁচটা বৎসরের মত একটি উন্মত্ত কাল এই আসামীকে আদিম পৃথিবীর তমসাময়ী পটভূমিতে ভয়ঙ্কর মূর্তিতে আত্মপ্রকাশের অবকাশ দিয়েছে। অর্থাৎ প্রাগৈতিহাসিক ভয়ঙ্কর জন্তুগুলির অবশিষ্ট বংশধর—যারা প্রকৃতির পরিবর্তনে আকারে অবয়বে প্রকৃতিতে ক্ষীণকায় মৃদু প্রকৃতি নিয়ে বেঁচে ছিল বা আছে পৃথিবীর বুকে, সেই প্রাগৈতিহাসিক দুর্যোগপূর্ণ অন্ধকারের আকস্মিক পুনরাবির্ভাবের সুযোগে, তাদের সেই অতিকায় ভয়ঙ্কর প্রকৃতিতে বেড়ে ওঠার মত এই ব্যক্তিও আদিম প্রকৃতিতে ভীষণ উল্লাসে আত্মপ্রকাশ করেছে।

বিচারক আরও অনেক কথা লিখেছেন। এবং পরিশেষে রায় দিয়েছেন—I, therefore, sentence the accused Sudarsan to death and direct that he be hanged by neck till he is dead.

সুদর্শন হাসল—সে হাসি অবশ্যই বিচিত্র—কারণ মৃত্যুকে সম্মুখে রেখে হাসি। সজ্ঞানে রোগে অনেক মানুষ মরে। মৃত্যুর পূর্বে তারা যখন হাসে তখন সম্মুখে থাকে নিশ্চয় কোন প্রসন্ন কল্পনার আশ্বাস। কত সুস্থ প্রাণময় মানুষ বিচিত্র প্রেরণায় পরকে বাঁচাতে, জাতকে বাঁচাতে হঠাৎ ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করেছে। তার মূলেও আছে এই কল্পনার আশ্বাস। মানুষের সভ্যতার প্রারম্ভ থেকে এই আশ্বাস সৃষ্টি করে রচিত হয়েছে কত কল্পকথা, কত পুরাণগাথা—তার মধ্যে বৈকুণ্ঠলোক শিবলোক ব্রহ্মলোক ইন্দ্রলোক নন্দনকানন পারিজাত মন্দাকিনী—কত কল্পনা থরে থরে সাজানো। ওই বিশ্বাসের কল্পনাকে সামনে রেখে ইতিহাসের শুরু থেকে কত লোক এই অজানা, এই মহা অনিশ্চিত, এই মহাশূন্য—না, শূন্যতাশূন্য মহানাস্তির মধ্যে ঝাঁপ খেয়েছে—অলীক সিংহদ্বারে করাঘাতের জন্য মুষ্টি উদ্যত করে অগ্রসর হয়ে নিজের সকল অস্তিত্ব ও অস্তিকে নাস্তির মধ্যে বিলীন করে দিয়েছে।

কাব্য পুরাণ মুখর হয়ে উঠেছে—পুষ্পকরথ নেমে আসা দেখেছেন তাঁরা, অমৃতলোকের শঙ্খঘণ্টা বাজতে শুনেছেন তাঁরা, আকাশলোক থেকে বর্ষিত পুষ্পলাজ দু হাতে কুড়িয়েছেন তাঁরা। চিত্রকর তার ছবি এঁকেছে। তা ছাড়াও রোগে যখন মানুষ মরে তখন তার প্রাণশক্তি জীর্ণ হয়, অনুভব অনুভূতিও ক্ষীণ হয়ে আসে, ভয়ও তখন বিহ্বল হয়ে পড়ে; মানুষ যখন যুদ্ধ করে মরে—তখনকার কথা স্বতন্ত্র—তখন সেও মৃত্যু-শক্তির অধিকারী—সেই শক্তিই দেয় তাকে দুর্দান্ত আবেগে মৃত্যুর সম্মুখীন হবার উল্লসিত সাহস। আর যারা প্রাণদান করে, নিজের প্রাণ দিয়ে যারা পরের প্রাণ বাঁচায়, তাদের মধ্যেও থাকে প্রাণের অন্য প্রাণের মমতার অমিত আবেগ। কিন্তু যেখানে মানুষকে বেঁধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, সেখানে সে অসহায়, সে রিক্ত। সেখানে যে হাসি, সে হাসি বিচিত্র থেকেও বিচিত্র—অতি বিচিত্র।

সুদর্শন সেই অতি বিচিত্র হাসি হেসে বললে, সংসারে বৈষ্ণবশাস্ত্রে একটা কথা আছে—'বদ্ধ জীব'। একটা দড়ির একটা প্রান্ত জৈব-নিয়ম, অন্য প্রান্ত হৃদয়-নিয়ম—এই দুই প্রান্ত মিলিয়ে গিঁঠ দিয়ে মানুষের জীবন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা বলে তারা বলে বদ্ধ-জীব। সংসারে বিচারকেরা আইনবদ্ধ জীব। প্রচলিত আইনমত নিজেদের সংস্কামত বিচার তাঁরা ঠিকই করেছেন। কিন্তু আমি ঠিক সব মানুষের মত মানুষ তো নই। আমার বিচারক হওয়া উচিত ছিল আলেকজাণ্ডার দি গ্রেটের মত। ছেলেবেলায় পড়েছিলাম—আলেকজাণ্ডার অ্যাণ্ড দি রবারের গল্প। সংস্কারমুক্ত বীর্যবান মানুষ দেশ-কাল-শাস্ত্র কোন সংস্কারে বদ্ধ নয়—নিজের অধিকারে প্রতিষ্ঠিত; অথচ উদার।

• কি বলব ভেবে পেলাম না। শুধু মনে মনে প্রশ্নই করলাম, এ বলে কী?

সুদর্শন বললে, দণ্ড সম্বন্ধে বলার আমার কিছুই নেই। আমি ঠিক ধরা পড়ি নি। ধরা দিয়েছি বা পালাতে চাই নি বলে ওরা ধরতে পেরেছে। আমি নিজেই নিজের বিচার করেছি। এবং নিজেই নিজেকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছি। কিন্তু আরও মর্যাদার সঙ্গে দিতাম। যে কথাগুলো তিনি রায়ে বলেছেন, সে কথাই আমি আরও গভীর চিন্তার সঙ্গে মর্যাদা দিয়ে বলতাম।

সুদর্শন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না হলে হয়তো একটু হাসি আপনিই আমার ঠোঁটের রেখায় ফুটে উঠত। ব্যঙ্গের জন্য নয়। অন্য কারণে। এই কথার মধ্যে সেই বাল্যকালের সুদর্শন উঁকি মারছে বলে। কিন্তু হাসতে পারলাম না। বরং আজ যেন ভয় লাগল।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সুদর্শন বললে, থাক্ ওসব কথা। এখন তুমি কী বলবে বল। সেদিন তোমাকে কোর্টে দেখে অবধি তোমার সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে আমার ছিল, আমিই বলতাম।

আমি বললাম, কী বলব? তোমাকে আসামীর কাঠগড়ায় দেখে,—কেসটার বিবরণ শুনে প্রাণটা ব্যাকুল হয়ে উঠল। মনে হয়েছিল প্রশ্ন করব—তুমি এ কী করলে? কেন করলে? কিন্তু তোমার সামনে বসে তো প্রশ্ন করতে ভরসা পাচ্ছি নে। তোমারই বা উত্তর দেবার সময় কই?

সুদর্শন অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তার মুখ দেখে মনে হল একখানি বিষণ্ণতার হালকা মেঘ তার চোখের প্রখর দীপ্তিকে আবৃত করে যেন ভেসে যাচ্ছে। অনেকক্ষণ পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, সারাজীবন প্রচণ্ড যুদ্ধ করেছি নিজের সঙ্গে, ক্ষতবিক্ষত করেছি নিজেকে। জান, মানুষের আসল সত্তার উপর একটা আবরণ আছে, সেটাকে কিছুতেই খোলা যায় না। সেই আবরণ ছিঁড়ে সেই সত্তাকে আমি দেখতে চেয়েছি।

আবার চুপ করল সে। কিছুক্ষণ পর বললে, জেলের সেলে বসে বসে সব লিখে ফেলেছি আমি। তোমাকে দেবার জন্যেই এনেছি। নিয়ে যাও এটা, পড়ে দেখো। ফাঁসির দিনের কথাটা তুমি লিখে এটা সম্পূর্ণ করে নিয়ো। ততক্ষণ তো লিখতে পাব না আমি।

সুদর্শনের কথা

(ক)

জেলের সেলে বসে ভাবছি। আমি জানি আমার ফাঁসি হবে। মৃত্যু আমার সেলের চার কোণের অন্ধকারে অস্পষ্ট আভাসে যেন দাঁড়িয়ে আছে। আমার উচিত ছিল মরা—না, নিজেকে মারা। তা আমি পারি নি। ওখানেই আমার হার হয়েছে। নিজেকে মারতে পারি নি বলেই ধরা পড়েছি—ধরা দিয়েছি বললেও মিথ্যে বলা হবে না শিবনাথ।

থাক্, সে-সব তো জীবনের পরিণামের কথা। ধরা না দিলেও ধরা পড়তে হত। শেষ যে দুটো হত্যা করেছি—একজন আমার জীবনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ছিল। তার সে জড়ানোর দাগ যে আমার সর্বাঙ্গে। আর হত্যা করেছি যাকে সে কে জান ? তোমার আমার বাল্য-সাথী, যাকে তোমরা জান কোথায় হারিয়ে গেছে—সে সেই বিপ্রপদ। যার বড় দুটো দাঁতের একটা আমি ভেঙে দিয়েছিলাম, অন্যটা নড়ে গিয়েছিল। বিচিত্র নয় ? আমি কতদিন ভেবেছি কী করে আমি ওর সঙ্গে থাকি—কেমন করে এটা সম্ভবপর হল ! পুরাণে আছে গঙ্গার প্রবল-তম ধারা কোন্ এক বণিকের শঙ্খধ্বনিতে আকৃষ্ট হয়ে পদ্মা নাম ধরে চলে গেলেন—সগরসন্তান উদ্ধারের লক্ষ্য পিছনে পড়ে রইল। শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে ভাগীরথীর ক্ষীণ জলস্রোত পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে কোনমতে সাগর-সঙ্গম তীর্থের সৃষ্টি করলে, সগরসন্তানেরা স্বর্গে গেলেন। আমার জীবনে ওই বিপ্রপদ সেই প্রতারক বণিক। তবে তফাত এই যে, আমার জীবনের সব জলটাই ওই বিপ্রপদর শঙ্খধ্বনিতে বিভ্রান্ত হয়ে কীর্তিনাশার স্রোত হয়ে ছুটে গেল। একটা নালাও আর অন্য মুখে বের হল না। আমার জীবনের সগরসন্তানেরা ভস্মস্তূপে আজও চাপা পড়ে আছে।

বিপ্রপদকেই বা দায়ী করছি কেন ?

শিবনাথ, গঙ্গা যেখান থেকে দ্বিধারায় একমুখে কীর্তিনাশা অন্যমুখে ভাগীরথী হয়েছেন সেখানে হিসেব করলে দেখা যাবে—যেদিকে কীর্তিনাশা ধেয়েছেন উত্তাল তরঙ্গে, সেই দিকটাই নিচু বেশী। গঙ্গা বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা হলে কী হবে, আসলে যে জল—নিচু মুখে চলা হল ওর প্রকৃতিগত অভিপ্রায়—স্বভাব। ভগীরথ শঙ্খ না বাজিয়ে কোদাল-গাঁইতি নিয়ে খাল কাটলে বেশী কাজ হত।

ওই স্ব-ভাবটাই হল মূল সত্য শিবনাথ।

জেলে বসে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা কথা মনে হয়েছে। একটা কল্পনা। ঠিক কল্পনা নয়, এইটিই আমি গোটা জীবন ধরে ধীরে ধীরে অনুভব করে এসেছি। 'আমিত্ব' যেমন করে তিলে তিলে বাড়ে, যেমন করে অস্পষ্ট থেকে স্পষ্ট হয়—ঠিক তেমনি করে। দৃষ্টি যেমন অন্ধকার

ভেদ করে অল্পে অল্পে—তেমনি ভাবে যেন চোখে দেখেছি।

আমি যেন একটা যবনিকার সামনে দাঁড়িয়ে আছি আর রঙ্গমঞ্চের কোন্ অন্তরাল থেকে আমার স্ব-ভাব আমাকে আমার পার্ট বলে দিয়েছে। কী করতে হবে বলে দিয়েছে, কী বলতে হবে বলে দিয়েছে—ত্বনিয়ার কোনো শাস্ত্র কোনো বিধানের কোনো বিধি আমার উপর সে খাটাতে দেয় নি। আমার প্রাণশক্তি দুর্দান্ত। সে তুমি জান—সে আজ সারা দেশ জেনেছে। দুর্বার আমার শক্তি, প্রচণ্ড আমার আবেগ, কঠোর আমার সংকল্প, কঠিন আমার মন। এটা কার দান? সমাজের নয়, পরিবারের নয়, বাপ আমার যে প্রাণবীজ ধারণ করেছিলেন তার মধ্যে এটা অবশ্যই ছিল। কিন্তু আমার বাবার এ শক্তি ছিল না—পিতামহেরও ছিল না। মায়ের রক্তেও হয়তো এ গুণ ছিল, কিন্তু মা ছিলেন নিরীহ দুর্বল। মাতামহকে দেখেছ, মামাদের দেখেছ—তারা ছিল কুটিল স্বার্থপর ভীরু জীব, তাদেরও ছিল না। আমার দেহের শক্তি, আমার মনের দৃঢ়তা, সাহস, এটা তো আমি নিয়ে জন্মেছি। জন্মের পর অবশ্য আমার বাবা মা, আর কোষ্ঠী করেছিলেন যে গ্রহাচার্য, এই তিনজনে বার বার আমাকে শুনিয়েছেন আমার বিপুল বীর্য, আমি এমনই অসাধারণ—আমি বহুর মধ্যে এক।

আমার জন্ম ভাদ্র মাসে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে অর্থাৎ জন্মাষ্টমীর রাত্রে। তেমনি বর্ষণমুখর ছিল সে রাত্রি।

তাই আমার নাম—এই যুগেও নরেন্দ্র নয়, দেবেন্দ্র নয়, রবীন্দ্র নয়, আমার নাম সুদর্শনধারী। সুদর্শনধারী মুরারি।

গ্রহাচার্য বলে গিয়েছিলেন—ছেলেটিকে যেন উচ্ছিষ্ট খাওয়াবেন না, আপনারা বাপ-মা—আপনারাও দেবেন না। এ ছেলে দেখবেন, মহাপ্রতাপশালী, রাজতুল্য ব্যক্তি হবে। দুষ্টের দমন করবে, শিষ্টের পালন করবে। মহাবীর হবে। তেমনি মেধা হবে।

শেষ কথা দুটো গোড়া থেকেই সত্য হয়েছিল; দেখেছিলে আমার দৈহিক শক্তি। ইস্কুলেও আমার মেধা দেখেছ। থাক্, সে তো পরের কথা।

বাবা আমার দুর্দান্তপনা এবং সবল দেহ দেখে বলতেন—কী হবি? নেপোলিয়ান বোনাপার্ট? না, জর্জ ওয়াশিংটন?

মদ খেতেন, মদ খেয়ে বলতেন—ভগবানের অংশে তোর জন্ম। বুঝলি, যত বেটা পাপী বদমাশ আছে, সব বেটাকে কচ্ কচ্ করে কেটে ফেলবি। ডাকবি—চক্র-চক্র-চক্র! আর বন্ বন্ ঘুরতে ঘুরতে চক্র চলে আসবে। বলবি, কেটে ফেল্—খচাখচ্। বাস্। আগে মাতুলগুষ্টিকে কংসবধ করে দিবি।

মা আমাকে ক্ষীর মোয়া খোয়াক্ষীর করে খাওয়াতেন। তিনি ভাবতেন, দুঃখীর দুঃখ দূর করবে আমার মানিক, সাধুদের সেবা করবে।

পাঁচ-ছ বছর পর্যন্ত যাত্রাদলের কৃষ্ণের মত সলমা-চুমকি-সাটিনের পোশাক পরিয়ে সাজাতেন। তোমাদের গ্রামে যখন এলাম, তখন মনে মনে ধারণা হয়েছে আমার—আমি পাতকী-শাসন ভূভার-হরণের দায়িত্ব নিয়ে জন্মেছি। আমার পরাজয় নেই—আমি অপরাজেয়। ন্যায়-বিচারের ভার আমার, অন্যায়ে কোন অধিকার নেই আমার। পুরাণ মহাভারত রামায়ণ মুখস্থ করে ফেললাম। সে বয়সে ভাগবত পাঠ করার কথা তোমার মনে আছে? তোমার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল বিপ্রপদকে নিয়ে? সেদিন মনে মনে বার বার চক্র চক্র চক্র বলে সুদর্শনচক্রকে স্মরণ করেছিলাম—কিন্তু চক্র আসে নি। বড় দুঃখ হয়েছিল। সেদিন চক্র এলে বিপ্র-

পদকে সেই দিনই নাশ করতাম ; জীবনটা অন্তরকম হত।

একা একা বেড়াতাম, সঙ্গীসাথী ছিল না, কাউকে পছন্দ হত না। যারা কাছে আসতে চেয়েছে, তারা রূঢ় স্পর্শে কাছ থেকে সরে গেছে। ওই একলা বেড়ানোর মধ্যেই শুরু হয়েছিল আমার দুষ্টদলনের কাজ। বাঁখারির তলোয়ার হাতে নিয়ে শেয়ালকাঁটার গাছগুলো কাটতাম। বোধ করি গাছগুলোর কাঁটার জন্তে ওদের পাপী মনে হত।

তারপর ক্রমে গাছ ছেড়ে দৃষ্টি পড়ল প্রাণীজগতে। প্রচলিত বিশ্বাস মনে বাসা গাড়ছিল, মনে হল, গাছের আবার পাপ কী? ওরা তো গাছ। একদিন চোখে পড়ল, একটা বহুরূপী—দেশে যাকে 'ফউয়া' বলে—সেই একটা। লাফ দিয়ে ধরে ফেললে একটি সুন্দর প্রজাপতিকে। মনে হল এই পাপী। তীর-ধনুক তৈরি করলাম, আমাদের জমির সাঁওতাল ভাগজোতদার তৈরি করে দিয়েছিল। ফউয়া মারতে শুরু করলাম। হঠাৎ একদিন চোখে পড়ল, অনেকগুলো শালিক পাখি ত্রস্তভাবে উড়ছে এবং কলকল করে চিৎকার করছে। ওদের ভাষা আছে কিনা জানি না—কিন্তু ডাকের কলরবের মধ্যে ভাবের আবেদন আছে। শুনেই মনে হল ওরা আর্তভাবে চিৎকার করছে এবং তার সঙ্গে খানিকটা ক্রোধও আছে। এবং মধ্যে মধ্যে তারা ছোঁ মেরে কিছুকে আক্রমণ করবার চেষ্টা করছে। একটা গোঙানির মতও শব্দ উঠছে কোথায়। কৌতূহল এক্ষেত্রে সকলেরই হয় ; তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সন্ধান করে দেখতে গিয়ে দেখলাম, একটা ছোট আগাছার জঙ্গলের মধ্যে একটা গোখুরা সাপ একটা শালিকের বাচ্চাকে ধরেছে। গিলছে। নিতান্তই শাবক, গায়ে ভাল করে পালক গজায় নি। ধরেছে মুখের দিকে। একটা শালিক সাপটার মুখের কাছে কী কাতর আর্তনাদই না করছে! আমার মন বলে উঠল—এই তো পাপী, অত্যাচারী। কি অপরাধ করেছিল ওই পক্ষীশাবক? হিংসক! কুটিল! পাপী! আমার হাতে সেদিন কিছু ছিল না। তখন তীর-ধনুক নিয়ে বেড়ানোর বয়স পেরিয়েছে। লজ্জা পাই। ঢেলা কুড়িয়ে সাপটাকে মারবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সাপটা ঢেলা খেয়ে বাচ্চাটাকে মুখে নিয়েই গভীর জঙ্গলে ঢুকে গেল। পরের দিন থেকে হাতে নিলাম একটা লাঠি। এবং পৃথিবীতে সাপকে পাপের প্রতীক ধরে নিলাম। কৃষ্ণ অকারণে কালীয় নাগকে দমন করেন নি। সাপ পাপ। পাপকে দমন করা আমার কর্ম, ওই আমার ধর্ম—ওই জন্তই আমার যে জন্ম! কত সাপ যে আমি মেরেছি শিবনাথ! একদিন তুমি বোধ হয় আমাকে দেখেছিলে মাঠে একটা সাপ মারতে। দু-চারটে মারতেই আমার সাপের সম্মুখীন হবার ভয় ভেঙে গেল। ভয় আমার কম। ভয় আমার ছিল না বললেও ভুল হবে না। আমি মরব না, আমাকে মারতে কেউ পারবে না—এমনি একটা বিশ্বাসই আমার ছিল। সে বিশ্বাস আমার ভ্রম নয় শিবনাথ। এই যে ফাঁসি এরা আমাকে দেবে, এও আমার প্রায় স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ। যাক সে কথা।

গীতা পড়লাম, পুরাণ পড়লাম। নিজের দেহকে গড়ে তুললাম। দেহ গড়ার গোড়ার দিকটা একটু বিরক্তিকর, কিন্তু একবার শক্তির স্বাদ পেলে, দেহ গড়তে শুরু করলে—তখন সে এক নেশা। তান্ত্রিককে যেমন পঞ্চমুণ্ডীর আসনে টানে, শ্মশানে টানে—যারা দেহচর্চা করে তাদের ঠিক তেমনি টানে আখড়ায়।

আমার আখড়া ছিল আমার বাড়িতে। গুরু আমার প্রয়োজন হয় নি। গুরু আমার অসহ্য বোধ হতে শুরু হয়েছে তখন থেকেই।

তুমি জান, বিপ্রপদকে মেরেছিলাম এবং বিপ্রপদ রক্তাক্ত মুখ এবং নড়া দাঁতটা নিয়ে হেডমাস্টারের কাছে নালিশ করেছিল। হেডমাস্টার যখন মাস্টারি ফলিয়ে আমাকে প্রশ্ন

করেছিলেন—তোমাকে বিশ্বসংসার শাসনের অধিকার দিলে কে ? তখন মনে প্রথমটা বিস্ময় জেগেছিল—এ কী মূর্খের মত প্রশ্ন ? এই আমার গুরু ? শিক্ষক ? মনে মনে যে জবাবটা জেগেছিল নিতান্ত দীর্ঘ দিনের আনুগত্যের জন্ম সেটা সেদিন মুখ থেকে বের হয় নি। আমার স্ব-ভাব যবনিকার অন্তরাল থেকে বলাতে চেয়েছিল—আপনি যে আমাকে শাসন করছেন, তার অধিকার তো ওই একশো পঁচিশ টাকা মাইনের জোরে ? মাইনে না পেলে শাসন করার অধিকার জন্মায় না ধারণা যাদের, তারা জাতিতে দাস। আমি দাস নই—আমি স্বাধীন।

সেদিন স্ব-ভাবকে বলেছিলাম—না, অন্য কথা বলাও। ওর কাছে অনেক শিখেছি।

স্ব-ভাব আমায় বলে দিয়েছিল—তবে আজ থেকেই ওর কাছ থেকে শিক্ষা নেওয়া বন্ধ কর। বল—ইস্কুল ছেড়ে দিলাম আমি। আর বল—অন্যায়ের প্রতিবাদের অধিকার মানুষের জন্মগত।

তাই বলেছিলাম।

হেডমাস্টার ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু স্ব-ভাব বলেছিল—যেয়ো না।

হয়তো তোমার এতখানি পড়ে মনে হবে আমি পাগল—অন্তত, আমার মাথার ঠিক নেই। তা খানিকটা পাগল আমাদের মত মানুষেরা হয়। এবং জীবন দিয়ে এ পাগলামির দাম দিই আমরা। সে কথা থাক্। এখন তোমার মনে প্রশ্ন জাগবে, বলবে—কিন্তু তোমার এ পাগলামি আমি বুঝি কী করে ? তোমার তুমি—এবং তোমার স্ব-ভাব—ভিন্ন হল কী করে ?

একটু খতিয়ে দেখো, তোমার স্ব-ভাবকে দেখতে না পাও, তার প্রম্‌টিং শুনতে পাবে। তোমরা গোপন মন মানো ; কিন্তু স্ব-ভাবকে মানো না ; দুটো কাছাকাছি বটে—তবে তফাতও অনেক।

তোমাদের গোপন মন শুধুই কালো। শুধু বিষ। আমাদের স্ব-ভাবের মধ্যে আলো-কালোয় প্রবল দ্বন্দ্ব। বিষামৃতের মহামন্থন। জীবন-মূল্যে এটাই বুঝে গেলাম। আমার স্ব-ভাব প্রচণ্ড, প্রবল, দুর্দান্ত। কিন্তু যুগের চেতনা চৈতন্যকে অমান্য করে আমার মধ্যে সে প্রকাশ হতে দেব, সেদিন পর্যন্ত তেমন আধার যে হতে পারি নি আমি। তাই সে আমায় বললে—আমাকে ধরবে তুমি, আমি দাউ দাউ করে জলব। তার উপযুক্ত করে নিজেকে গড়ে তোল তুমি। আমি ইস্কুলে আর গেলাম না। বাড়িতে সংস্কৃত পড়তে লাগলাম। ইংরেজিও পড়তাম। তবে পরে অনেক পড়েছি।

মনে মনে তখন প্রবল ক্ষোভ। ছেলেবেলা থেকে যা শুনে এসেছি সব মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে। কোথায় আমার ভগবানত্বের অংশ! কই, কোন দিব্যালোক চকিতের জন্যও তো আভাসে অনুভব করি না! কোন দিব্যশক্তিই তো আমার নেই! মনে হয়েছিল—শাস্ত্র পড়লে শাস্ত্রের মহিমায় সে শক্তির স্ফুরণ হবে। কখনও কোন স্বপ্নালু অবসরে মনে হত—হঠাৎ একদা গভীর রাত্রে ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে ঘুম ভেঙে যাবে, শুনতে পাব দিব্যসঙ্গীত শঙ্খধ্বনি, শুনব আকাশ-লোক থেকে আহ্বান—জাগো, আর কত ঘুমোবে ? তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে এসে দেখব, একটি আশ্চর্য সাদা ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে, জিনের সঙ্গে লাগানো আছে তেমনি আশ্চর্য এক তরবারি। ঘোড়া আনন্দধ্বনি করে উঠবে আমাকে দেখে। আমি মুহূর্তে অনুভব করব দিব্যশক্তি। লাফ দিয়ে চড়ব ঘোড়ায়, টেনে বের করে নেব সেই তলোয়ার। বলব—জ্বালো। গভীর অন্ধকারে জলে উঠবে লক্ষ লক্ষ মশাল। পাপীদের আর্ত কোলাহলে আকাশ-বাতাস পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।—উত্তেজিত হয়ে উঠতাম। আবার অবসাদে ভেঙে পড়তাম। কোথায়

কী? ঈশ্বরই কোথায়? বিজ্ঞানের বই অল্প কিছু পড়েছি। রুশ দেশে বিপ্লব হয়ে গেছে। সোনালী গম্বুজওয়ালা গির্জে-ঘর রক্তে ভেসে গেছে। ঈশ্বর নেই—সব মিথ্যা বলে ধ্বনি তুলেছে; আকাশলোক থেকে একটি বজ্রনাদ হয় নি, মাটির তলা থেকে বাসুকী মাথা নাড়ে নি, ঈশান কোণ থেকে কোন ঝড় ওঠে নি; ও দেশের এ দেশের কোন দেশের একটি মানুষও সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলে নি—আমি দেখেছি ঈশ্বরকে। আমি তোমাদের দেখাব। ক্রীশ্চান দেশ, সেখানে ক্রাইস্ট কোন পলায়নপর ভক্তকে দেখা দিয়ে বলেন নি—আমি চলেছি রাশিয়ায় —'টু বি ক্রুসিফায়েড এগেন'—নূতন করে ক্রসবিদ্ধ হতে চলেছি। এবং কবর থেকে আবার অভ্যুদয় হব।

আমার মনের মধ্যে সে কী নিষ্ঠুর যন্ত্রণা!

বাবা মারা গেলে জীবন এমন অসহায় হতাশায় ভেঙে পড়ে নি। মা মারা গেলে পৃথিবীতে একা দাঁড়িয়ে এত ভয় হয় নি। মনে হত, অতি-সবল এক দেওদার-শিশুর মত সূর্যলক্ষ্যে বেড়ে চলেছিলাম—হঠাৎ সূর্য একটি খদ্যোতের মত মানুষের হাতে পিষ্ট নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। মাটির তলার অন্ধকার আর বিষবাষ্প সমস্ত বাতাবরণ আচ্ছন্ন করে সমস্ত ঊর্ধ্বলোক-অধোলোক এক করে দিলে।

বাল্যকাল থেকে সন্ধ্যা-আহ্নিক করতাম। প্রথমেই মন্ত্রে আছে—ঊর্ধ্বে ব্রহ্মণে নমঃ, অধঃ অনন্তায় নমঃ। ঊর্ধ্বের ব্রহ্ম নিশ্চিহ্ন হল। রইল শুধু অনন্ত—হারিয়ে গেলাম অন্তহীন অন্ধকারে—দিক্‌হীনতায়। কিসের পাপ। কিসের পুণ্য। কী অন্যায়, কী ন্যায়? তা শুধু অন্ধকারের মত উলঙ্গ শক্তি। যে মৃত্যু হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, লঙ্ঘন করলেই মৃত্যু দিয়ে দণ্ড দেবে। গাছের উপমা দিয়ে আরম্ভ করেছিলাম শিবনাথ, তাই দিয়েই বলি—সূর্যহীন বিশ্বে কোন্‌টা অধোলোক, কোন্‌টা ঊর্ধ্বলোক কে বলবে? সেখানে বিষ-বাষ্পাচ্ছন্নতার মধ্যে পাতা, ফুল ধরবার ফোটবার স্থান কোথায়—উপাদান কোথায়? শাখাগুলোর পরিণতি তো সেখানে—বটগাছের ঝুরির মত আর একরকম ঝুরিতে—মূলে। সেখানে শুধু পঙ্করস পান আছে—বিবর্ণতা আছে; সবুজ পত্রপল্লব, ফুল কী করে ফুটবে? কেন ফুটবে? আমার সেই দেওদার শিশুর মত জীবনের মাথাটা যেন উলটে দিত কেউ। মাটির তলায় গুঁজে দিত। দম বন্ধ হয়ে যেত আমার। সূর্য গেল, আলো গেল, স্বর্গ গেল, বৈকুণ্ঠ গেল, ব্রহ্মলোক গেল, ইন্দ্রলোক গেল, রইল শুধু পৃথিবী—মাটির পৃথিবী—এর বুক থেকে চুষে খাও মাটির রস, ভোগ কর দেহে বেঁচে থাকার অনেক সুখ, আকাশচারী চৈতন্য হোক এরই মধ্যে বন্দী। সে মরুক। খাঁচার মধ্যে মরা-পাখির মত সে পচে নিশ্চিহ্ন হোক। মনে হত, মন নেই তার আশা। ভাবনা নেই তার ভাষা।

এই কালের বিশেষ টানে জীবনের গতিটা যে পথে চলতে পারত, যে পথে চলা স্বাভাবিক ছিল, সে পথে চলল না, এই ধাক্কাতেই। এইখান থেকেই তুমি আমার জীবনকে আদৌ জান না।

কোন্ পথ বুঝতে পার? পারা উচিত তোমার। তোমার জীবনও সেই পথের আকর্ষণে চলেছিল। তোমার থেকে আমি অনেক শক্তিমান, অনেক ধীমান, তোমার আগেই এ পথ আমাকে আকর্ষণ করেছিল। আমি ভারতবর্ষের পরাধীনতার পাপশৃঙ্খল মোচনের পথের কথা বলছি শিবনাথ। এ পথ আমাকেও টেনেছিল। ক্ষুদিরামের ফাঁসিতে জীবনদান, প্রফুল্ল চাকীর মৃত্যুবরণ, কানাইলালের ফাঁসির হুকুমের পর পরমানন্দে তার স্বাস্থ্যোন্নতি, বাঘা যতীনের টেগার্টের সঙ্গে লড়াই—এসব আমাকেও টেনেছিল বইকি। নিশ্চয় টেনেছিল। আমি

ভাবতাম গীতা হাতে আর পিস্তল হাতে কোন একদিন বের হব এবং যুবক-বাংলার সামনে দাঁড়িয়ে বলব—'মাম্ অনুসর'। কিন্তু হঠাৎ ধাক্কা খেলাম। আমাদের গ্রামে ডেটিন্যু রাখবার আড্ডা পেতেছিল গভর্ণমেণ্ট। ডেটিন্যু এলেন ধীরেনবাবু। ধাক্কা সেখানেই খেলাম। বলছি সে কথা।

(খ)

স্বাভাবিক আকর্ষণ ডেটিন্যুর উপর।' খাঁচায় বন্দী বাঘের যে আকর্ষণ, অনেকটা সেই আকর্ষণ। মহাশক্তিধর, তাই সে বন্দী। আমি গেলাম সর্বাগ্রে। নিজেই গিয়েছিলাম।

আলাপ করলেন, পিঠ চাপড়ে সস্নেহে হাসলেন। আমার চিত্ত মুহূর্তে বিরূপ হয়ে গেল। কেন জান? পিঠে কাঁধে কেউ হাত রাখলে আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করি। সকলেই বোধ হয় অস্বস্তি বোধ করে, কম আর বেশী। তবে যারা বাহন হতে জন্মেছে তাদের কথা আলাদা। গলা জড়িয়ে কাঁধে হাত সহ্য হয় পিতার-মাতার-প্রিয়ার আর সন্তানের।

আমি অস্বস্তি প্রকাশ করে তার হাতখানা সরিয়ে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, ও আমার ভাল লাগে না

ভুরু তুলে কৌতুকভরে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, কী?

—পিঠে হাত। চাপড়। কেমন যেন অসোয়াস্তি লাগে।

সকৌতুকে অট্টহাস্য করেছিলেন তিনি। বলেছিলেন, ওরে বাপ রে! তাই নাকি? বলেই খপ করে হাতখানা চেপে ধরে টিপতে শুরু করেছিলেন। আমি সবিস্ময়ে বলেছিলাম, টিপছেন কেন?

—কেমন শক্ত দেখছি। গায়ের জোর দেখছি। গায়ের জোর কম থাকলে তোমার পিঠে চাপড়ানো কেন, নিশ্চয় পিঠে চড়ে বসব।

আমি মুহূর্তে নিজেকে দৃঢ় করে শক্তি প্রয়োগ করেছিলাম। একটু পরেই তিনি বলেছিলেন, ছাড়, তোমার গায়ে জোর আছে।

আমার সর্বাঙ্গের দিকে তাকিয়ে দেখে বলেছিলেন, কাল রাত্রি বারোটার পর এসো। অনেক কথা বলব।

বারোটা রাত্রি, বর্ষাকাল—বৃষ্টি হচ্ছিল ; হাতে লাঠিটা নিয়ে বেরিয়েছিলাম। মাথায় মাথালি—টোকা নিয়েছিলাম, ছাতা নিই নি। কারণ বাঁ হাতে নিয়েছিলাম লণ্ঠন। আমাদের গলিটা মনে আছে তো? সাপ অনেক মেরেও গলিটার সাপ শেষ করতে পারি নি। গলির এক পাশে চাটুজ্জেদের খামার, খামারে অনেক ধান, যত ধান তত ইঁদুর এবং ইঁদুরের জন্য সাপও শেষ হয় নি। খাদ্য থাকলেই খাদক থাকে। তা ছাড়া কয়েকদিন থেকেই গলিটাতে সন্ধ্যার পর মানুষের চিৎকার শুনেছি, সাপ সাপ! লাঠি হাতে ছুটে গিয়ে তাকে পাই নি, তার আগেই সে অন্তর্হিত হয়েছে।

এত বলছি তার কারণ আছে। সেদিন ওটার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আমি সেটাকে মেরেছিলাম। সেও লড়াই দিয়েছিল—সে লড়াই স্মরণীয়। সাপটা অত্যন্ত চতুর, মানুষের চোখের সামনে সে পলকে লুকিয়ে পড়ে। কিন্তু সেদিন সে ছিল ক্ষুধার্ত, তাড়া করেছিল একটা ইঁদুরকে। একেবারে বাঘ আর হরিণের ঘটনা। মুহূর্তের হিসেবের ভুলে বাঘটা লাফিয়ে পড়ে

দু ফুট পিছনে, পর-মুহূর্তে হরিণ দেয় লাফ। বাঘ আবার লাফ দেয় বটে, কিন্তু হরিণ তার আগেই নাগালের বাইরে যায়। আমার চোখের সামনে বিদ্যুৎগতিতে আমার উপর দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল ইঁদুরটা—সাপটার ছোবলটা মাটিতে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে উঠল—কিন্তু আমার আলোটা তার সামনে। সে নামালে না ফণা, চতুরতার সঙ্গে অন্ধকারের দিকে ছুটে মিশিয়ে গেল না, গর্জাতে লাগল ফণা তুলে দাঁড়িয়ে। সাপ মেরেছি অনেক। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মাথা নুইয়ে পালাতে চায়। তখন প্রয়োজন সাহসের আর লক্ষ্যের স্থিরতার। মেরুদণ্ডহীন সরীসৃপ, খুব জোর মারতে হয় না, মাথায় একটি সামান্য আঘাতে সাক্ষাৎ যমের মত জীবটা লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু সেদিন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আমাকে সে রুখেছিল। শূন্যে মাথা নিয়ে অল্প অল্প দুলছিল—ও অবস্থায় লাঠিটার আঘাত ঠিক জোরে পড়বে না। আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে ঠিক সেই মুহূর্তে আমাকে ছোবল মারবে। পিছিয়ে এলাম এক পা। কাজ হল। আমি হেরে পালাচ্ছি ভেবে ও এগিয়ে এসে ছোবল মারলে, যে মুহূর্তে মাটিতে পড়ল তার মাথা, সেই মুহূর্তে আমার লাঠি পড়ল তার মাথায়। আমার লাঠিটার ডগায় ছিল এক টুকরো লোহা। ছেঁচে গেল মাথাটা।

ধীরেনবাবু আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন ওই বর্ষণমুখর রাত্রে আমাকে দেখে। তিনি ভাবেন নি, ওই অত বর্ষণের মধ্যেও আমি আসব। আপাদমস্তক আমার দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ চকিত হয়ে বলেছিলেন, এ কী ? কাপড়ে তোমার রক্ত কেন ?

সাপটা ছিল ভরা জোয়ান; সাপেরও স্বাস্থ্য আছে, আমি দেখেছি। বেদেদের ঝাঁপিতে, চিড়িয়াখানায় শীর্ণ সাপ দেখলে স্বাস্থ্যহীনতা নিশ্চয় বোঝা যায়। খোলা, মুক্ত, স্বাধীন সাপের মধ্যে ওর বিপরীতটা আছে। জোয়ান সাপটার মাথায় যে আঘাত করেছিলাম তাতে মাথাটা ছেঁচে খানিকটা রক্ত ছিটকে আমার হাঁটুর নীচের কাপড়ে লেগেছিল। তিনি আমার সাপ মারার কথা শুনে বলেছিলেন, চল, আমি দেখব সাপটাকে।

সাপটাকে ভাল করে মাথা ছেঁচে মেরে পথের পাশে একটা ঘুপচি জায়গায় রেখে গিয়েছিলাম—সেটাকে টেনে এনে সামনে ফেলে দিলাম। ধীরেনবাবু অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ফিরে যাবার সময় সমস্ত পথটা কথা বলেন নি। কিছু ভাবতে ভাবতে গিয়েছিলেন। তাঁর বাসায় ফিরে ঘরে খিল দিয়ে বলেছিলেন, বোস। আমি বসেছিলাম। তিনি একটা সিগারেট মুখে পুরে দেশলাই বের করে ধরাতে গেলেন। কিন্তু জলে ভিজে দেশলাইয়ের বারুদ নোনা-ধরা মসলার মত ঝুরঝুরে হয়ে গিয়েছিল। তিনি একখানা ছেঁড়া বইয়ের একখানা পাতা ছিঁড়ে পাকিয়ে চিমনির শিখায় ধরিয়ে সিগারেট ধরালেন। আমি শিউরে উঠলাম। বইখানা একখানা ছেঁড়া গীতা। ধাক্কা খেলাম। নিষ্ঠুর ধাক্কা।

তার পরই প্রথম প্রশ্ন করেছিলেন, তুমি এত ঈশ্বর-ঈশ্বর কর কেন ?

আমার স্নায়ু-শিরায় তখনও ওই সাপটা মারার উত্তেজনা ছিল, তার উপর ওই গীতার পাতা ছিঁড়ে সিগারেট ধরানোর প্রতিক্রিয়া—আমি মুহূর্তে উত্তর দিলাম, তবে কী করব ? আপনি—আপনি—?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, ঈশ্বর মিথ্যা। যা সত্য তাই করবে—মানুষ।

আমি বলেছিলাম, আমিও মানুষ, আপনিও মানুষ। অজানা-অচেনা অনেক-অসংখ্য মানুষের চেয়ে আপনি বেশী সত্যি—আমি সবচেয়ে বেশী সত্যি। সেখানে আপনি 'আমি' 'আমি' না করে মানুষ মানুষ করেন কেন ? এত কষ্টেরই বা দরকার কী ?

—তুমি অত্যন্ত উদ্ধত। এত অল্প বয়সে এমন ঔদ্ধত্য ভাল নয়। ওই সাপটা আজ উদ্ধত

না হলে মরত না। তুমিই বললে। তা ছাড়া সাপটাও ঈশ্বরের সৃষ্টি। ওটাকে তুমি তা হলে মারলে কেন?

—সাপটার বিষ আছে, অতর্কিতে মানুষকে আক্রমণ করতে পারে, ওটা পাপ বলেই ওটাকে আমি মেরেছি। নিরীহ কিছু হলে আমি মারতাম না। আমি সাপ নই। ঔদ্ধত্যের কথা বললেন, সাপটার কথা তুললেন—তার উত্তরে বলি—তা হলে নেপোলিয়নও ঔদ্ধত্যের জন্য গেছে। তার সঙ্গে সাপটার কোন তফাত নেই। ইংরেজ আপনাকে বন্দী করেও অন্যায় করে নি—কারণ তাদের কাছে আপনি উদ্ধত। আমি সত্য বলছি—সেটা আমার মনোমত হচ্ছে না। এই মাত্র।

—ভাল। কিন্তু ঈশ্বর তো মিথ্যা। মিথ্যা নিয়ে তোমার যত তর্ক, যত রূঢ় প্রতিবাদ সেও তো সেইজন্য মিথ্যা।

—কে বললে? আপনি পড়ে বলছেন? ঈশ্বর আছেন কি নেই—সে জানবার কোনদিন কোন চেষ্টা আপনি করেন নি। আর ঈশ্বরকে মানবার জন্যে তাঁকে পুজো করবার জন্যে আমি কোন অন্যায় করি নে। তাঁকে বলি—অন্যায় যেন আমি না করি।

—ঈশ্বর মানতে হলে তোমাকে পুরোহিতকে মানতে হয়। তারা স্বার্থের জন্যে মিথ্যে বলে।

—আমি পুরোহিত মানি না। নিজেও পুরোহিত হব না।

—শুধু পুরোহিত নয়, আরও অনেক আছে। তা ছাড়া ঈশ্বর অনুমান। অনুমান সত্য নয়।

ধীরেনবাবু আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে বোঝাতে লাগলেন। অকাট্য যুক্তি। আমার প্রাণ হাঁপিয়ে উঠল। শ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল যেন। আমি তাঁর সে যুক্তি খণ্ডন করতে পারি নি, কিন্তু মানতেও পারি নি। ওদিকে ভোর হয়ে আসছিল। তিনি হেসে আমাকে বললেন, ভোর হয়ে গেল, আজ বাড়ি যাও। আবার এসো, আরও বুঝিয়ে দেব। সব বুঝতে পারবে। বই দেব পড়বে। ওই সংস্কৃত বইগুলো আর পড়ো না।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, আচ্ছা ঈশ্বরকে নয় না মানলাম, কিন্তু আপনার দলে যদি যোগ দিই তবে আপনাকে মানতে হবে তো?

—দলের নিয়মকে মানতে হবে। দলের যিনি যেমন শ্রেষ্ঠ তাঁকে তেমনি মানতে হবে। যিনি শেষ নেতা—তাঁর কথাই শেষ কথা। সেখানে তর্ক নেই।

আমি বলেছিলাম, তা হলে আপনাদের দলেও যেতে চাই নে, আর আপনার কাছে আসতেও চাই নে এসব শুনতে। ঈশ্বরকে মানলাম না, নেতাকেই বা মানতে যাব কেন? দেবতা মানলাম না, দলের যিনি শ্রেষ্ঠ তাঁকেই বা তাহলে মানতে যাব কেন? ঈশ্বরকে ভোগ দিলে তিনি কিছুই খান না, তাঁর দৃষ্টি আছে পেট নেই; দলের নেতাদের পেট আছে, জিভ আছে, সব আছে—তাঁদের তুষ্ট করা সোজা কথা নয়। এক পুজো ছেড়ে অন্য পুজো আমি করতে চাই নে। নমস্কার।—বলেই আমি চলে এসেছিলাম।

শিবনাথ, তখন যেন আমি মুমূর্ষু বৃদ্ধ ঈশ্বরের-শয্যার-সঙ্গে-মিলিয়ে-যাওয়া দেহখানিকে, এক আত্মীয়হীন বন্ধুহীন বালকের মুমূর্ষু পিতার দেহ আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকার মত আঁকড়ে পড়ে আছি। সেই মুহূর্তে ওই ধীরেনবাবু যেন আমার হাত ধরে টানলে, তুমি মূর্খ, ও মুমূর্ষু, মরেছে, মরবে; তুমি জীবন্ত, ওই মুমূর্ষু দেহটা ছেড়ে দাও; বাইরে এস—মুক্ত বাতাসে সুস্থ হও। কে পিতা? কিসের প্রয়োজন পিতার?

আমার অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠল—অন্তর থেকে ধ্বনি উঠল, না—না—না। তোমার ওই কুটিল কদর্য মুখ তুমি আমার দৃষ্টির সম্মুখ থেকে ফিরিয়ে নাও। তুমি বেরিয়ে যাও। বলতে ইচ্ছা হল—তোমার সঙ্গেই বা যাব কোথায়? তুমিও তো মরবে। তোমার মুখের যৌবনশ্রী ভেদ করেও তো তার ছায়া দেখা যাচ্ছে। চলে যাও, তুমি চলে যাও—আমি যাব না। যাব না। যাব না।

শিবনাথের কথা

(ক)

সংসারে এক জাতের মানুষ আছে, যাদের হৃদয়াবেগটাই সবচেয়ে বড়। আবেগ নেই কার, সকলেরই আছে; হৃদয়াবেগ অবুঝ অনবুঝ। তার করুণা মমতা আত্মপরতা সবই প্রচণ্ড। করুণার বশে পরের জীবন রাখতে সে নিজের জীবন দিতে পারে, স্নেহে-মমতায়, প্রিয়-বিরহে আত্মহত্যা করতে পারে, নিজের স্বার্থের জন্য পরকে হত্যাও করতে পারে। সাধারণ মানুষের আবেগ পরের সঙ্গে সংঘর্ষে, শিক্ষায় দীক্ষায় বুদ্ধির বিকাশের ফলে সংযত হয়—আপস করে। মধ্যে মধ্যে নিয়ন্ত্রণ-করা বাঁধ ভাঙে না তা নয়—ভাঙে। আবার বাঁধে। কত ভাঙন জীবনের শ্যামল ক্ষেত্রে বালি চাপিয়ে মরুভূমি করে দিয়ে যায়। বালি-চাপা-পড়া জীবনক্ষেত্র থেকে বালি সরিয়ে আবার শ্যামলও করতে চায় মানুষ। কিছু কিছু বুদ্ধিবাদী মানুষ বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণে আবেগকে বেঁধে শুধু একটা বদ্ধ জলাশয়েই পরিণত করে না—তার উৎসমুখেও পাথর চাপা দেয়। আবার কিছু লোকের আবেগ, সে নামে পাহাড়ের চূড়া থেকে বরফ-গলা জলের মত। তার উৎসকে কখনও চাপা দেওয়া যায় না। তুষার-ঝড়ের রাজ্য—বায়ুস্তরের জলকণা সেখানে বরফ হয়ে জমে। তারপর গলে নেমে আসে প্রচণ্ড গতিতে। সে সৃষ্টি করে সিন্ধু-ব্রহ্মপুত্রের মত ধারার; হিমালয়ের প্রস্তরবেষ্টনী কেটে নেমে আসে সে ধারা। নদ-নদীতে সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, শতদ্রু যেমন কয়েকটি, মানুষের মধ্যে তেমনি হৃদয়াবেগের ক্ষেত্রে এমন মানুষ মুষ্টিমেয়। সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র, শতদ্রু এরা তটের বন্ধন মানে—পার্বত্য-প্রদেশে এদের ধারার দু পাশে সুউচ্চ পাথরের পাড় কঠোর শাসনে এদের নিয়ন্ত্রণ করে। সমতলে এসে অরণ্য-বেষ্টনীর শাসন মানে, মানুষের গ্রাম-নগরের শাসন মানে; কিন্তু যে জলধারা পাহাড়ের মাথা থেকে জলপ্রপাতের ধারায় ঝরে পরে মাটির বুকের ভিতর গহ্বরের সৃষ্টি করে তার আবেগ—ভয়াবহ ভীষণ। তার গর্জনের মধ্যে যে সঙ্গীত আছে, তা শোনবার মত কান, সহ্য করবার মত মন, তাকে ধরার মত সঙ্গীতযন্ত্র বিরল।

সুদর্শনের লেখা পড়ছি আর আমারও শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে আসছে।

অনেককাল আগে এক পাগলকে দেখেছিলাম। তখন আমি ছেলেমানুষ, পাটনায় পড়ি। পাটনায় পাগলা-গারদ ছিল। একটা জন্মপাগল কাঁচা নর্দমার পাঁকে পড়ে থাকত। সেই তার সুখশয্যা—সকল আরামের শান্তিনীড়। সেখান থেকে তুলে তাকে স্নান করালেই সে চিৎকার করত, কখনও কখনও ইঁট নিয়ে মাথায় ঠুকত। আমার ভয় হয়েছিল তাকে দেখে। পাগলা-গারদ থেকে পালিয়ে এসেছিলাম। রাত্রে ঘুম হয় নি কয়েকদিন। তাকে স্বপ্নে দেখতাম।

সুদর্শনের লেখা পড়ে তেমনি ভয় হচ্ছে। সে যেন ওই ছেলেটার মত মাথায় ইঁট ঠুকছে।

পড়ছি আর রাখছি—, কিন্তু রেখে দিয়ে থাকতে পারছি না। আবার পড়ছি।

সুদর্শন লিখেছে—ও-পথে গেলে আজ দেশের স্বাধীনতার পর আমি একজন কৃতী নায়ক হতে পারতাম। মন্ত্রী না হই, কোন বিরোধী দলের নেতা তো নিশ্চয়ই হতাম।

হ্যাঁ, তা সে হত। নিশ্চয় হত।

ধীরেনবাবু সুদর্শনের কাছে আদর্শবাদের মহিমান্বিত রূপের চেয়ে দলবাদের কুটিল রূপটাই বেশী প্রকট করে ধরেছিলেন।

সুদর্শন লিখেছে—আজকের ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলা দেশে—রাজনৈতিক দলবাদের দস্তুর স্বরূপ—তার শ্বাদন্তের যে ধার, তা আমি সেই দিনই দেখেছিলাম ধীরেনবাবুর মধ্যে।

ধীরেনবাবু আমাদের গ্রামে একটি দল গড়তে চেয়েছিলেন—সে আমি জানি এবং আমাদের জেলার পরবর্তী কয়েক বৎসরের রাজনৈতিক রিপোর্টেও তা আছে। তার মধ্যে একটি সত্য কদর্যরূপে স্পষ্ট হয়ে আছে। সে কদর্য সত্যটি হল—অন্য গুণী ছেলেদের থেকে ধনীর বাড়ীর গুণী ছেলেটির প্রতি তাঁর অধিক আগ্রহ। সে চেষ্টা তাঁর সফল হয় নি—সে ছেলেকে তার বাপ সরিয়ে নিয়েছিল, ইংরেজ সরকার তাকে অনুগ্রহ করে সাহায্য করেছিলেন। অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটি দিয়ে কোর্টে বসিয়ে দিয়েছিলেন। তবে ধীরেনবাবু কিছু উপকৃত হয়েছিলেন বইকি। সে কথা আর-এক দিনের কথা।

সুদর্শন সে দিকটা দেখেছিল, কিন্তু প্রকাশ করে নি। সুদর্শন লিখেছে—ধীরেনবাবুর শ্বাদন্ত দুটো নিশি-চোরের চেয়েও হিংস্র। নিশির কথা তুমি শুনেছ নিশ্চয়। নিশির অক্ষম হাতখানাও দেখেছ। হাতখানার কাটা জোড়া লাগল বটে, কিন্তু আঙুল আর সে মুড়তে পারত না।

আবার পড়তে শুরু করলাম—

নিশিকে যেদিন মেরেছিলাম—সেদিনের কথা আমার মনে আছে। স্মৃতি অক্ষয় হয়ে আছে। মানুষের রক্তপাত বলে নয়। মানুষের রক্ত বিপ্রপদের মুখেও দেখেছি। কিন্তু নিশিকে যেদিন মারি, গাছের উপর লুকিয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। সে মন, সে রাত্রি আমার মনে জলজল করছে। কিছু ছিল না মনে, গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে সজাগ ছিল আমার দুটি চোখের দৃষ্টি, সজাগ ছিল কানের শোনার শক্তি, আর বুকের মধ্যে ধক ধক স্পন্দিত হচ্ছিল হৃৎপিণ্ড, তার পিছনে ছিল একটা বিচিত্র কুটিল উদ্বেগ। কালো আয়নার মত রাত্রির বুকে যেন একটা গাঢ়তর কালো কিছুর প্রতিবিম্ব পড়েছিল। আজও যেন চোখে দেখতে পাই সেদিনের সেই ছবির টুকরো। সেই প্রতিবিম্বের ছবি। সে আমারই স্ব-ভাবের প্রতিবিম্ব! নিশি এল, পাঁচিল পার হয়ে এপারে পড়ল; একটি লঘু শব্দ হল। তারপর চারিদিক দেখে সে এসে দাঁড়াল ধানের মরাইয়ের ধারে। আমি লাফ দিয়ে পড়লাম এবার। আমার পড়ার শব্দ হয়েছিল। নিশি চমকে উঠে দাঁড়াল, সে হাঁটু গেড়ে বসে মরাই ফুটো করে ধান বের করছিল; উঠে দাঁড়াল এবং ছুটল। লাফ দিয়ে পাঁচিল পার হয়ে ওপারে পড়ল। আমিও লাফ দিয়ে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই গাঢ়তর কালো প্রতিবিম্বটাও। এবং আশ্চর্য একটা গর্জন—পশুর মত হিংস্র গর্জন করে উঠল। আজও আমার মনে হয় সে গর্জন আমি করি নি, করেছিল আমার সেই স্ব-ভাব। শ্বাপদের মত তার দুটো দাঁত আছে—বড় তীক্ষ্ণ, বড় নিষ্ঠুর। আমি ভয় পেয়েছিলাম শিবনাথ। ভয় না পেলে নিশিকে সেদিন

খুনই করে ফেলতাম। হাত দিয়ে সে আমার হাঁসুয়াখানার আঘাত রুখতে চেষ্টা করলে—হাতের তালুতে বসে গেল অস্ত্রখানা। সে চিৎকার করেছিল—ওগো বাবু, খুন করো না গো! সঙ্গে সঙ্গে গরম রক্ত—রাত্রির অন্ধকারে কালো গাঢ় কিছু তরল পদার্থের মত বেরিয়ে এল, আমার হাতে লাগল। সেই স্পর্শে আমার 'আমি' চমকে উঠে সজাগ হল। আমার স্বভাবের নির্দেশ অমান্য করে আমি থমকে গেলাম। আমার এই স্ব-ভাব মানুষেরই স্বভাব। এ স্ব-ভাব এসেছে অরণ্যের অন্ধকার হতে। আমি সবল আমি প্রবল—তাই আমার মধ্যে সেও প্রবল—অতিপ্রবল ছিল। আমার মধ্যে যে 'আমি' ভাবত—আমি ঈশ্বরের অংশ, সে তখন দুর্বল হয়ে পড়েছে; ঈশ্বর-বিশ্বাসের আশ্রয়দণ্ডটা মচকে ভেঙে গেছে শিবনাথ। ওই দণ্ডটা ধরেই খাড়া সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উর্ধ্বলোকের দিকে হাত তুলে ঈশ্বরকে প্রণাম করেছিল। সামনের পা দুটো হাত হয়েছিল। ওই দণ্ডটা মচকে যাবার সঙ্গে সঙ্গে জীবনভাব আবার মাটিতে হাত দুটো পেড়ে চতুষ্পদ হচ্ছে। সবল থেকে সবলতর হচ্ছিল তখন। নিশি হাতখানা অন্য হাত দিয়ে চেপে ধরে কাঁদছিল—চিরকালের তরে ডান হাতখানা খোঁড়া করে দিলে বাবু!

আমি স্তব্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়েছিলাম।

আমার স্ব-ভাব গজরাচ্ছে তখনও।

আমার 'আমি' বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবছে, কী করলাম আমি।

স্ব-ভাব বলছে—ধরে ওকে পুলিসে দাও।

'আমি' বলছে—না। এর পরে জেলে দিয়েই বা হবে কী?

স্ব-ভাব আমাকে ব্যঙ্গ করেই নিরস্ত হয়েছিল—হেরে গিয়েছিল সে।

আমি নিশির হাত ধরে তুলেছিলাম, বলেছিলাম, ওঠ।

আমি তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম, ডাক্তারকে সমস্ত খরচ আমিই দিয়েছিলাম। সে তুমি জান। যাক সে কথা। রাত্রিতে ডাক্তারের ওখান থেকে ফিরে আর ঘুমোই নি। ঘুমোতে পারি নি। আমার স্ব-ভাবকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম—কালো একটা শ্বাপদের মত সে তখনও ক্রুদ্ধ নিঃশ্বাস ফেলছিল।

পরদিন নিশি এল বিকেলবেলা। বললে, একটা কথা বলতে এলাম বাবু।

প্রশ্ন করলাম, কী?

সে বলল, ওই যে 'লজর-বন্দী' বাবু—উনি আমাকে ডেকেছিলেন গো। বলছিলেন—

—কী বলছিলেন?

—বলছিলেন—আপনার নামে একটা দরখাস্ত দিতে।

—দরখাস্ত দিতে? কার কাছে?

—ম্যাজিস্টর সাহেব আর পুলিস সাহেবের কাছে। লিক্‌তে বলছিলেন—আমি রাতে শৌচে উঠেছিলাম, আপুনি আমার বাড়ির পাশে পাহারায় ছিলেন—আমাকে মাঠের দিকে যেতে দেখে তাড়া করে এসে হাঁসুয়ার কোপ মেরেছেন।

বিস্ময়ের আর অবধি ছিল না। গ্রামের যারা বিষয়ী লোক তাদের জানি, বুঝি; বিষয়ী লোক—সে যত বড় ধনীই হোক, প্রতিষ্ঠা তার যতই থাক, অন্য কারও সামান্য অভ্যুদয়ও সে সহ্য করতে পারে না। কিন্তু মানুষ যেখানে বিষয়ী নয়—যেখানে তপস্যা সাধুত্বের, ন্যায়ের, সেখানে এ কেমন করে হয়? নিশিকে দমন করতে গিয়েছিলাম, অন্যায়কে, চৌর্যকে দমন করতে; সেখানে নিশির চুরির মাল সামলে নিয়ে যারা স্বার্থ করে, তারা আমার শত্রুতা করতে

পারে ; কিন্তু যিনি দেশসেবক, দেশের স্বাধীনতার জন্য দুঃখকেই মাথায় তুলে নিয়েছেন, তিনি আমার বিপক্ষতাচরণ করবেন—এ যে ধারণার অতীত, সকল কল্পনার বহির্ভূত। তবে সে বিস্ময় আমার বেশীক্ষণ থাকে নি ; ধীরেনবাবুর ব্যক্তিত্বের পশ্চাতের দলকে আবিষ্কার করতে আমার বিলম্ব হয় নি। এবং তারই সঙ্গে আবিষ্কার করেছিলাম, দলশক্তির বিচিত্র কুটিল এক স্বার্থের স্বরূপ। তুমি যদি তার অধীনতা স্বীকার না কর, তবে তুমি তার শত্রু। শত্রুদমনে তার ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম কোন বিচার নেই। রাজনীতি বড় জটিল, যার হাত থেকে ধর্মপরায়ণ যুধিষ্ঠিরও পরিত্রাণ পান নি ; দল ছাড়া রাজনীতি হয় না, রাজাকে নায়ককেও দলের নির্দেশে মিথ্যা বলতে হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে গুরু দ্রোণকে বধের জন্য যুধিষ্ঠির দলের চাপে মিথ্যা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন। সশরীরে স্বর্গে উপনীত হয়েও নরকদর্শন করেছিলেন।

বাইবেলে আছে—নো ম্যান ক্যান সার্ভ টু মাস্টারস, ঈশ্বর এবং দল—এই দুইকে একসঙ্গে ভজনা করা যায় না শিবনাথ। ঈশ্বরের কাছে ন্যায় বড়, নীতি বড়, ধর্ম বড়। দলের কাছে তার প্রাধান্য, তার প্রতিষ্ঠা বড়। তাই দলের কাছে বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল—দেশের স্বাধীনতা যদি তার দলের কর্মে আসে তবে আসুক, নইলে প্রয়োজন নেই।

সেই দিনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম—না, দেখতে পেয়েছিলাম, দলবাদের স্বরূপ।

ধীরেনবাবুর এই প্রস্তাবে নিশির মত চোর কী উত্তর দিয়েছিল জান ? নিশি তাকে বলেছিল—আজ্ঞে না। তা পারব না মশায়।

ধীরেনবাবু বলেছিলেন—কেন ?

নিশি বিস্মিত হয়ে বলেছিল—বুঝতে যদি লেরে থাক মশায়, তবে আর বুঝতে লারবে। বুঝাতে ক্ষমতা আমার নাই।

নিশিকে তবু আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তুই কি দরখাস্ত করবি ?

সে জিভ কেটে বলেছিল—তাই পারি বাবু ? আপনকার ঘরে চুরি করতে গিয়েছিলাম, আপনি তাড়া করে ধরতে এসে হাঁসুয়ার কোপ মেরেছেন। আমার হাতে অস্তর থাকলে আমিও মারতাম আপনাকে। আপুনি আমাকে জেলে দিতে পারতেন, দেন নি। ডাক্তারের খরচ দিয়েছেন। কোন্ ধরমে আমি দরখাস্ত করব ? চোর হলেও আমার একটা ধম্ম তো আছে বাবু। তবে হ্যাঁ, ওই 'নজর-বন্দী' বাবু আমাকে ডেকে তাই বলেছিলেন মশায়, তা আমি বলে দিয়েছি—তা পারব না।' সে আপুনি দেবতা হোন ক্যানে।

একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলেছিল, আমি শুনলাম বাবু, আমি রাজী না হলেও উনি বেনামা দরখাস্ত দেবেন।

দরখাস্ত ধীরেনবাবু করেছিলেন। তদন্তও একটা হয়েছিল। কিন্তু নিশি কোন কথা স্বীকার করে নি। ডাক্তারও কথাটা গোপন করেছিলেন।

ধীরেনবাবুকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমাকে জব্দ করবার জন্যে নিশির হয়ে বেনামী দরখাস্ত করতে আপনার বাধল না ?

ধীরেনবাবু হেসে বলেছিলেন, আমার কাছে নিশির দাম তো তোমার চেয়ে কম নয়।

আমি বলেছিলাম, আমার কাছে কিন্তু আজ থেকে আপনার চেয়ে নিশির দাম বেশী। তার ন্যায়বোধ আছে, আপনার নেই।

ধীরেনবাবু হেসেই কথা বলছিলেন—বলেছিলেন, না, ওর সত্যকার ন্যায়বোধ জন্মায় নি। না হলে ও প্রশ্ন করত—চুরি করা যদি অন্যায় তবে কোন্ ন্যায় অনুসারে আপনার ঘরে ধান আছে, আমার ঘরে নেই বলতে পারেন ? কেন আপনি উঁচু জাত, আমি ছোট জাত বলতে পারেন ?

আমি বলেছিলাম, একটা অন্যায়ের প্রতিকার আর একটা অন্যায় দিয়ে হয় না। নিশির অবস্থার লোক সংসারে অনেক আছে। তারা চুরি করে না থাকার শোধটা ওইভাবে নেয় না। আমার ধান কিছু আছে—টাকা নেই, দালানবাড়ি নেই। যাদের আছে তাদের বাড়িতে চুরি করে আমি সে অভাব মেটাতে যাই না। আর উঁচু জাত? ও চিরকাল আছে—বোধ হয় চিরকালই থাকবে। সেকালে বামুনেরা উঁচু জাত ছিল। রাজারা উঁচু জাত। মন্ত্রী সেনাপতি শেঠ উঁচু জাত ছিল। ছিল কেন—রয়েছে। নতুন কালে সবাইকে মেরে আপনারা সকলের উঁচু জাতের অধিকার একচেটে করবেন। তার জন্যে এখন থেকে কাদা ছুঁড়তে শুরু করেছেন। এর পর ওই অধিকার কায়েম হলে জেলে দেবেন, আন্দামান পাঠাবেন, গলা কাটবেন। ইংরেজরা যা করছে তাই আপনারা করবেন আর চেঁচাবেন তোমরা সবাই সমান, তোমরা সবাই সমান। এমন সুখ আর কোন কালে ছিল না। আমাদের হুকুম মান, সব মিলবে। আজই আপনি নিজেকে উঁচু জাতের সামিল করে আমাকে নিশির চেয়ে নীচু জাত ঠাওরাচ্ছেন।

এবার ধীরেনবাবু চটেছিলেন। বলেছিলেন, ভবিষ্যতে তুমি কষ্ট পাবে।

বলেছিলাম, কে দেবে? আপনি? কিন্তু দাঁড়ান; আগে আপনি কষ্ট দেবার মালিক হোন।

—সেও হবে। ভেবো না। দিন আগত ওই। ধীরেনবাবু ক্রুদ্ধস্বরে বলেছিলেন, আসবে, বিপ্লব আসবে। এবং সেই দিন দেখবে ওই নিশি—সেদিন যদি বেঁচে থাকে—তবে ও-ই তোমাকে স্বহস্তে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে শোধ নেবে। তোমার ঈশ্বর সেদিন তোমাকে রক্ষা করতে আসবেন না। মৃত্যুকালে তোমাকে বলে যেতে হবে—ঈশ্বর নেই, ঈশ্বর নেই, ঈশ্বর নেই।

এইবার ধৈর্য হারিয়েছিলাম আমি। কারণটা বোধ হয়, আমি এবার হেরে গিয়েছিলাম। ঈশ্বর-বিশ্বাসের দেউলে আমার ফাটল ধরেছিল। আমার মনের ঘরেই বিজ্ঞান-পড়া নানান্ প্রশ্ন ফাটলের সঙ্গে বাইরের ঝড়ের সগর্জন প্রবেশের মত প্রবেশ করেছিল—জীবনের সব পূজা-আয়োজন তছনছ করে দিয়ে আমাকে ব্যঙ্গ করেছিল। আমি প্রমাণ করতে পারি নি ঈশ্বর আছেন। সেই কারণে আমার পথ ছিল দুটি—এক বিনীতভাবে ওঁর কথা মেনে নিয়ে ওঁর পায়ে গড়িয়ে পড়া, নয় ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে ওই হত্যার ভয় দেখিয়ে পাল্টা জবাব দেওয়া। তাই আমি দিয়েছিলাম: আর আমিও বলছি—ভারতবর্ষ যদি কখনও সত্যি স্বাধীন হয়, তবে সে বিপ্লবে আপনাদের মত, ইওরোপের নাস্তিক বুদ্ধিমানদের অনুকরণকারী নাস্তিক যারা তাদের—এদেশের মানুষ আমি, ওই নিশিদেরই সঙ্গে নিয়ে হত্যা করব, তার আগে বলতে বাধ্য করব এবং আপনারা বলবেন, ঈশ্বর আছেন—ঈশ্বর আছেন—ঈশ্বর আছেন।

ঈশ্বর আছেন এও যেমন আমি প্রমাণ করতে পারি নে, ঠিক তেমনি ভাবেই ঈশ্বর নেই এ প্রমাণও আপনি করতে পারেন নি। আপনাদের রাজত্ব হলে আপনারা জোর করে বলাবেন ঈশ্বর নেই; আমাদের রাজত্ব হলে আমরা আপনাদের জোর করে বলাব ঈশ্বর আছেন।

•

এর পর সুদর্শন অনেক যুক্তিতর্ক তুলেছে। সে পড়েছে অনেক—ভেবেছে অনেক। সে সব কথা থাক। তাঁর সকল তত্ত্ব আমি নিজেও বুঝতে পারি নি। তবে তার সকল বক্তব্যের মর্মচ্ছেদী আকৃতি আমাকে স্পর্শ করেছে এবং সকলকেই করবে তা আমি জানি। এ আকৃতি বিশ্বব্যাপী হয়ে ভৈরব রাগে ছড়িয়ে যেত যদি কোন নাস্তিকবাদী শাসনতন্ত্র রবীন্দ্রনাথের মত মহাকবিকে উদ্যত অস্ত্রের সম্মুখীন করে বলত, বল—আমার বিশ্বাস ভ্রান্ত। ঈশ্বর নেই। অথবা শেষ গান গেয়ে নাও। সুদর্শন গান গাইতে পারে না—রচনা করতে পারে না।

কিন্তু আকৃতি তার প্রচণ্ড।

থাক।

এর পর সে একটা কথা লিখেছে। সেটা আমার ভাল লাগল। লিখেছে—রাজনীতির ক্ষেত্রে দুটি লোকের সান্নিধ্যে এলে বোধ হয় আমি ধন্য হতে পারতাম, মানতে পারতাম, গ্রহণ করতে পারতাম। একজন মহাত্মা গান্ধী। কিন্তু সুযোগ হয় নি। এবং তার অহিংসাকেও আমি মানতে পারি নি। আমার স্ব-ভাবে অহিংসা নেই। সেই জন্যেই এগিয়ে সুযোগ করে নিয়ে তাঁর কাছে যাই নি বা যেতে পারি নি। আর একজনকে মানতে পারতাম, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে। কিন্তু তা-ও পারি নি। কারণ ধীরেনবাবু। ১৯২৭-২৮ সনে ধীরেনবাবু সুভাষচন্দ্রের সমর্থক ছিলেন। সেই জন্যে তাঁর কাছেও যাই নি। গান্ধীজী নেতাজী দুজনেই ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতেন, তাঁকে অনুভব করতেন, ডাকতেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তাঁর অনুসরণকারীদের কেন যাচাই করে নেন নি জানি নে। তাঁর অনুসরণকারীদের মধ্যে আজ বহুজন নাস্তিক। ভারতবর্ষ স্বাধীন হল—তিনি জীবন দিয়ে সেটা দিয়ে গেলেন, কিন্তু এই যাচাই না করে অনুচর করে নেওয়ার জন্য তাঁর সেই আদর্শের প্রদীপটি নিবে গেল।

থাক ওসব কথা শিবনাথ, এখন আমার কথা শোন। ওই ধীরেনবাবুর খোঁচা খেয়েই আমার অগাধ বিশ্বাসে আঘাত লাগল। আস্তিক্যবাদের একটা বড় দায়িত্ব, শিবনাথ, তাকে অস্তির প্রমাণ দিতে হয়। নাস্তিকের সুবিধে, সে নাস্তিবাদী—নাস্তির আবার প্রমাণ কি দিতে হবে? মানুষ যখন নিজেকে জন্তুর দল থেকে আলাদা বলে ঘোষণা করে তখন হৃদয়ের প্রমাণ দিতে হয়। জন্তুদের প্রমাণ তার নখ এবং দাঁতেই আছে। আমি অস্তিবাদের প্রমাণ খুঁজতে বদ্ধপরিকর হলাম। আমার ভয়ঙ্কর স্ব-ভাব, সে অনুগত বাহনের মত আমাকে বহন করতে চাইলে। তারও মুক্তিকামনা আছে। পশুত্বের মধ্যে তারও তৃপ্তি নেই। আজ এই ফাঁসির হুকুমের পরও বলছি, নেই—নেই—নেই।

তুমি জান শিবনাথ, আমি সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলাম।

(খ)

সুদর্শন সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করেছিল। তাঁর জন্য কাঁদবার কেউ ছিল না। মামারা পরের চেয়েও পর হয়ে গিয়েছিল। কেউ কিছু বললে তারা বলত—ওর কথা আমাদের বোল না। যাই হোক, কেউ কাঁদেও নি, কেউ বিস্মিতও হয় নি। বিন্দুমাত্র দুঃখও কেউ প্রকাশ করে নি। একা ঘুরত, একা থাকত, যা-কিছু ঘটত গ্রামে তার মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়ে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করেই ক্ষান্ত হত না—যে পক্ষ তার বিচারে ন্যায়-পক্ষ সেই পক্ষ অবলম্বন করে সরল কলহকে জটিল করে তুলত।

বিপ্রপদ তখন শখের থিয়েটারের শৌখিন বাবু। কালীকৃষ্ণদার ওষুধের দোকানে বসে আড্ডা দেয়, তামাকের সঙ্গে গাঁজা মিশিয়ে খায়, মিকশ্চারে মিশিয়ে টানে, মধ্যে মধ্যে ভাইনাম গ্যালেসিয়া তাও ঢেলে খায়। কালীকৃষ্ণদা বিচিত্র মানুষ, আচারে ব্যবহারে সদানন্দ,—রাগ নেই, রোখ নেই; স্ত্রী নেই, পুত্র নেই; অনুরাগ শুধু নেশায় আর হরিনাম ও ধর্মে-কর্মে। থিয়েটার দেখতে ভালবাসেন—কিন্তু অভিনয় করেন না; বসে বসে গোটা নাটকটাই আউড়ে

যান। তাঁর ওখানে আড্ডা বসে, বিপ্রপদরা কোলাহল করে; কালীকৃষ্ণদা হাসেন। তাঁর আর-একটি আনন্দ—লোককে ডেকে গাঁজা-মেশানো তামাক খাইয়ে। এই কালীকৃষ্ণদাও সুদর্শনকে দেখলে শঙ্কিত হতেন, বলতেন—নেশার জিনিসগুলো আড়াল দে। বিবেকানন্দ আসছে। লেকচার দিতে আরম্ভ করবে। কালীকৃষ্ণদার দেওয়া এই নামটা বিপ্রপদরা সাগ্রহে গ্রহণ করে ওকে ব্যঙ্গ করে বলত—বিবেকানন্দ।

এই বিপ্রপদ হঠাৎ এক সন্ন্যাসী আবিষ্কার করেছিল। আমাদের গ্রামে এসেছিলেন তিনি। সন্ন্যাসী সত্যই উচ্চমার্গের মানুষ। এই সন্ন্যাসীর সঙ্গেই সুদর্শন গৃহত্যাগ করেছিল। সুদর্শনের সন্ন্যাসী হওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়, কিন্তু এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে যাওয়া একটু বিস্ময়ের! কারণ এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে তার প্রথমটা ঝগড়া হয়েছিল। সুদর্শন তাঁকে নাকি অপমান করেছিল বহু-লোকের সামনে।

সুদর্শন লিখেছে—সব কথা সকলে জানে না। জানার কথাও নয়। সত্য হলেই কথা বলে বেড়ানো যাদের স্বভাব শিবনাথ, তারা—কী বলব—যদি গাছের সঙ্গে তুলনা করি, তবে বলব—শোলার জাতের গাছ। শোলা দিয়ে ভেলা হয়, কিন্তু মহাজনী নৌকা হয় না বা জাহাজ হয় না। আমি শোলার জাতের নই। যা ঘটেছে জীবনে তা বলে বেড়াই নি। সত্য বলে বেড়াবার নয়—সত্য আপন অন্তরে অনুভব করবার জন্যে। যা ঘটেছিল তা আমি বলি নি।

ওই সন্ন্যাসীকে নিয়ে বিপ্রপদ মাতামাতি করেছিল, ভক্ত সেজে লোক জুটিয়েছিল; কিন্তু ওঁর সঙ্গে আমাদের গ্রামের প্রবেশ-মুখে আমারই দেখা হয়েছিল সর্বপ্রথম। এবং উনিই আমাকে প্রথম অপমান করেছিলেন। ভগবান আমি মানতাম—শিক্ষার মধ্যে সেই ভগবানকে মিথ্যে হয়ে যেতে দেখে আমি পিতৃহীনের মত কেঁদেছি, কিন্তু অদৃষ্ট আমি ঠিক মানতাম না। তাই বলছি, না—এটা হয়তো অদৃষ্টের নির্দিষ্ট পথেই তাঁর সঙ্গে আমার সেদিন দেখা হয়েছিল। ওই ডেটিন্যু ধীরেনবাবুর সঙ্গে সেই ঘটনার পর আমি তখন অধীর অস্থির হয়েছি—কোথায় কার কাছে এই প্রশ্নের উত্তর পাব? বই আমি বিশ্বাস করি না। যারা নাস্তিক, তারা চিন্তা করে যুক্তির পথে ঈশ্বর নেই ঘোষণা করেছে। কেউ ঈশ্বর পাবার সাধনা করে নি। যারা সাধনা করেছে তাদের কথা তাদের শিষ্যরা পল্লবিত করে লিখে গেছে। বিজ্ঞান আমি ভাল জানি না, কিছু পড়েছি, পড়েও তার মধ্যে অনেক কিছু বুঝি নি। তাঁরা সৃষ্টি-কথার নতুন রূপ যা সামনে ধরেছেন, তা আমি না-বুঝেও বহু কষ্টেই অসহায়ের মত বিশ্বাস করে নিয়েছি। তোমরা দুর্বল, তোমরা অনায়াসে মেনে নিয়েছ। কিন্তু বিশ্বাস করেও যে প্রশ্ন মেটে না। প্রশ্ন তো—কী ভাবে নয়; প্রশ্ন আমার—কেন? তোমরা ইংরেজিনবীশ; নমস্তে তোমাদের তত ভাল লাগে না যত ভাল লাগে গুডমর্নিং। ইংরেজীতেই প্রশ্নটা পরিষ্কার করি—"How things happened is of no importance compared with the question of why they happened.'

ঈশ্বরের ইচ্ছা। কিন্তু কোথায় ঈশ্বর? কে দেখেছে ঈশ্বরকে?

গীতাতেও পড়েছি, কৃষ্ণই বলেছেন অর্জুনকে—আমার যে সত্য ঈশ্বরের রূপ, সে রূপ তোমার ওই দেহজ দৃষ্টিতে দেখা যায় না।

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥

তারপর আবার বলেছেন, দিব্যদৃষ্টিতে আমার যে রূপ দেখলে, বেদজ্ঞানে, তপস্যায়, দানে, যজ্ঞানুষ্ঠানে কিছুতেই সে রূপ দেখা যায় না।—

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন চ চেজ্যয়া।

শক্যং এবং বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥

তা হলে ? কে সেই দিব্যদৃষ্টি পেয়েছে ?

সেই দিব্যদৃষ্টি যার আছে তার সন্ধান আমি করেছি বৎসরের পর বৎসর। তাকে যাচাই করব। তারপর তাকে বলব—দাও, আমাকে ওই দৃষ্টি দাও। তখন আমার সেই সন্ধানের সবে আরম্ভ। আমি নিত্য আমাদের গ্রামপ্রান্তের শক্তিপীঠে যাই ; ধ্যান করি ; দাঁড়িয়ে থাকি। মানুষের পর মানুষ আসে। দলে দলে আসে ; মা-মা বলে চেঁচায়, মানত করে, হাড়িকাঠের গোড়ার মাটি নেয় ; পুষ্প, পা-ধোওয়া জল চরণামৃত বলে খায় ; ধন চায়, দৌলত চায়, আরোগ্য চায়, পরের সর্বনাশ চায়—চায় না কী ? বিপ্রপদের দল এসে জোড়হাত করে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি বুঝতে পারি, চাচ্ছে কোন কুমারী বা সধবা বা বিধবার মন ; বশীকরণের জন্য জবাপুষ্প নিয়ে যায়। চিত্ত আমার চিৎকার করে।

কালাপাহাড়ের মত ভেঙে দেখতে ইচ্ছে করে—কী আছে ওর মধ্যে বা কী হয় ওই মৃত্তিকা-স্তূপ ভাঙলে ! সন্ধ্যায় আরতি শেষ হয়, ঢাকী ঢাক বাজানো শেষ করে চলে যায়, ভক্তরা গাঁজার প্রসাদ পেয়ে বাড়ি ফেরে, পুরোহিত আমদানির চাল-কলা-মণ্ডা-গামছা-কাপড় নিয়ে পোঁটলা বাঁধে ; আমি চলে যাই দেবস্থানের চারিপাশের জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দক্ষিণ দিকের দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরে ; সম্মুখে অন্ধকারাচ্ছন্ন দিগন্তে কোপাই নদীর তটপ্রান্তের বনরেখা, দুই পাশের অন্ধকারের মধ্যে গ্রামপ্রান্তের বিচ্ছিন্ন বসতির দু-চারটি টিমটিমে আলো—মাথার উপর নক্ষত্রখচিত আকাশ ; তারই মধ্যে বসে থাকতাম, কখনও অধীরভাবে পায়চারি করতাম। কোথায় উত্তর ?

উত্তর নেই। উত্তর নেই। নেই উত্তর। নিরুত্তর অন্ধকারের মধ্যে শুধু প্রশ্নই শুনতাম। ঝিঁঝির ডাকের মধ্যে মনে হত, ওর মধ্যেও আমারই প্রশ্নের প্রতিধ্বনি বাজছে। জঙ্গলের মধ্যে শেয়ালে খরগোশ ধরত, তারা মরণ-যন্ত্রণায় চিৎকার করত, তার মধ্যেও শুনতাম প্রতিধ্বনি —হে ঈশ্বর ! কোথায় ঈশ্বর ?

কত চিন্তাই মনের মধ্যে ঘুরত, সারা জীবনই ঘুরল—আজও তার শেষ নেই। এই যেটুকু লিখেছি, এতেই বোধ হয়, হাঁপিয়ে উঠেছ। ভাবছ, তুমি তো বাপু ফাঁসির আসামী ; করেছ খুন ; খুন করেছ একটি নারীকে যে তোমার অঙ্গে গাছের অঙ্গের লতার মত জড়িয়ে ধরে দাগ রেখে গেছে। আর খুন করেছ বলছ বিপ্রপদকে। তা কই, তাদের কথা কই ? তোমার তত্ত্বকথা শুনব কত ? বিচারক বলেছে—তুমি ভয়ঙ্কর পাপী। কই, সেই নারীর কথা বল—মন একটু সরস হোক, ভয়ঙ্করত্বের কথা বল—একটু রোমাঞ্চ হোক।

বলব তাদের কথা। কিন্তু তার আগের কথা শোন। আমি তো সাধারণ নই শিবনাথ। আমি একটা যুগের প্রতিনিধি। তোমরা স্বীকার কর বা না কর—আমি জানি আমি একটা যুগের প্রতিনিধি। সমুদ্রের উপরের ঢেউ তোমরা—ঝড়ে উথলপাতল কর, আমি তলদেশের জলস্রোত। তোমাদের বেদনা আমার মত কজন বুকে ধরে ঘূর্ণাবর্তে পাক খায় ! তোমাদের সুখ আছে, দুঃখ আছে। আমাদের কজনের সুখ-দুঃখের অতীতের মর্মবেদনা আছে।

অপেক্ষা কর, নারীর কথা বলব, রোমাঞ্চের কথা বলব। দু-একটা হাসির কথাও হয়তো আছে, বলব। যাক, এখন কথা থাক, কাহিনী শোন।

এমনি সময় একদিন সন্ধ্যায়, কার্তিক মাস তখন, সম্মুখে কালীপূজা—কৃষ্ণপক্ষের সন্ধ্যায় হঠাৎ এক সময়ে চোখে পড়ল, প্রান্তরের উপর শূন্যলোকে একটা অগ্নিপিণ্ড যেন ভেসে চলে

আসছে। সে দৃশ্য আজও আমার চোখের উপর ভাসছে। হ্যাঁ, ভাসছে। প্রথমে মনে হয়েছিল, আলেয়া। আমাদের গ্রামের দক্ষিণ দিকের মাঠে নদীর ধারে আলেয়া আছে অনেককাল থেকে, কিন্তু সে আর-একরকম। সে জ্বলে আর নেবে। নেবে আর জ্বলে। তার পিছনেও আমি ধাওয়া করে দেখেছি। সে উল্কামুখী শেয়াল। নিজের চোখে দেখেছি। হাঁ করলেই মুখের ভিতর আগুনের দীপ্তি ফুটে ওঠে। এ আলো স্থির। নেবে না—শুধু গতিবেগে মধ্যে মধ্যে দুলছে। ভয় আমার নেই। আমি এগিয়ে গেলাম। দশ-বারো হাত দূরে যখন, তখন দেখলাম এক দীর্ঘকায় মানুষ একটা জ্বলন্ত কাঠের চ্যালা নিয়ে চলে আসছে। জ্বলন্ত অর্থে শিখায় দীপ্যমান নয়—জ্বলন্ত অঙ্গার ধক ধক করছে। আর চার পা এগোতেই দেখলাম, দীর্ঘকায় মানুষটির পরনে বহির্বাস, ঊর্ধ্বাঙ্গ নগ্ন; গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পিঠে বোঁচকা, কাঁধে ঝোলা। সন্ন্যাসী। বয়সে প্রাচীন। মাথার চুল খুব ছোট করে ছাঁটা, বোধ করি কামানো ছিল—এখন কদমফুলের কেশরের মত বেরিয়েছে। হাতের জ্বলন্ত কাঠের অর্থ আমি জানতাম। সন্ন্যাসগ্রহণের দিন যে হোমকুণ্ড জ্বেলেছিলেন, যে অগ্নিকে সম্মুখে রেখে সব ছেড়েছিলেন, সেই অগ্নিকেই বাকী জীবনটা বহন করে নিয়ে চলেছেন। যেখানে যাবেন, সেইখানে এই আগুনে আবার কাঠ দিয়ে ধুনি জ্বালবেন, আবার যেদিন উঠবেন সেদিন ওই ধুনির একখানি জ্বলন্ত কাঠ বয়ে নিয়ে চলবেন। ওই ধুনির কাঠ স্পর্শ করেই বসে থাকবেন। মুহূর্তে আমার বড় ভাল লাগল। সেই অসাধারণ দীর্ঘকায় মানুষটির দিকে তাকিয়ে ছিলাম বিমুগ্ধ বিস্ময়ে। তিনি আমাকে দেখেই হিন্দীভাষী জিহ্বার বিশেষ টানযুক্ত বাংলায় প্রশ্ন করলেন—বাবা, এহি শক্তিপীঠ অট্টহাস ?

সসম্ভ্রমে বললাম, হ্যাঁ বাবা। এই পথ।

—জঙ্গলের ভিতর যেতে হোবে ?

—হ্যাঁ। আসুন আমিও যাব, পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই।

—তুম নিজে যাবে, না হামায় লিয়ে যাবে ?

—না, আমিও যাব।

—তবে চল।

আমার পেছন ধরে সন্ন্যাসী এলেন মায়ের মন্দিরে। তখন সমস্ত দেবস্থলটাই জনশূন্য। খাঁ-খাঁ করছে। থাকবার মধ্যে ভাগ্যক্রমে পুরোহিত তখনও আছেন। পুরোহিতকে বললাম, ইনি এসেছেন, এখানে থাকবেন। কোথায় থাকবেন ?

থাকবার জায়গা অনেক। কিন্তু যুগের প্রভাব এখানেও পড়েছে। দেবস্থল অভিভাবক-হীন। পুরনো সব ব্যবস্থাই বিপর্যস্ত। জমিদারেরা সেবায়েত, দেবতার অভিভাবক, আধুনিক কালের মানুষ সমুদ্রের উপরের ঢেউ, পশ্চিমী ঝড়ো বাতাসে আছড়ে পড়েছে—সমাজের উপর আর ধর্মবিশ্বাসের উপর। আর ইংরেজের পাথর-বাঁধানো বন্দরের ডক-ইয়ার্ডে, শৌখিন সমুদ্রস্নানের বীচের উপর গড়িয়ে প্রণতি জানাচ্ছে। মন্দিরের চারিপাশের ঘরগুলি কোনটা গরুর গোয়ালে পরিণত হয়েছে—কোনটায় বলির পাঁঠা থাকে, কোনটায় থাকে ভাঙা দরজা-জানালা—কাঠ-ঘুঁটে-কয়লা। বারান্দাটায় দিনে পাঁঠা বাঁধা থাকে, সে জায়গাটাও ময়লায় আবর্জনায় পরিপূর্ণ, গন্ধে বমি আসে। পুরোহিত বিব্রত হয়ে বললেন—এখানে কোথায় থাকবেন বাবা ? এই দেখুন অবস্থা। লণ্ঠনটা তুলে ধরলেন তিনি। তারপর আবার বললেন—তার চেয়ে গ্রামে বাবুদের ঠাকুরবাড়ি যান, সেখানে আরামে থাকবেন।

—আরামকে লিয়ে তো আসে নাই বাবা। ঠাঁই না হোবে তো কোই গাছ তলেমে চল

যায়েগা রাত।

পুরোহিত ব্রাহ্মণ লোভী, হয়তো মিথ্যাবাদীও বটে ; তবু অভ্যাসগুণে খানিকটা সন্ন্যাসী-অতিথির উপর শ্রদ্ধাও আছে ; দায়িত্ববোধ কিছুটা সব মানুষেরই থাকে। বিব্রত হয়ে সে বললে—তা হলে এই বারান্দার খানিকটা পরিষ্কার করে দি—

সন্ন্যাসী বললেন—হামি আপনে করিয়ে লিওম বাবা, লেকিন শরীর হামার আচ্ছা নেহি। ক্লান্ত হো গিয়া। সাড়ে তিন হাত সাফা হোনেসে হোয় যাবে।

আমি বললাম—আমি দিচ্ছি। আপনি আলো দেখান।

নিজেই আমি ঠাঁইটা জল এনে ধুয়ে পরিষ্কার করে দিলাম, কাঠ এনে দিলাম ; সন্ন্যাসী সেই জ্বলন্ত কাঠখানা পেতে তার উপর কাঠ চাপিয়ে দিলেন। পুরোহিত কয়েকখানা বাতাসা, একটা মণ্ডা রেখে চলে গেলেন। সন্ন্যাসী নিজে ঘাটে জল আনতে গেলেন। আমি আগুনের দিকে চোখ রেখে ভাবছিলাম। ভাবছিলাম দীক্ষার কথা, গুরুর কথা। এই মানুষ কি জানে না সেই সন্ধানের কথা? অন্ধকারের মধ্যে মানুষটিকে বিচিত্র বোধ হচ্ছিল। বহুদিনের মানুষ। অন্ধকারের মধ্যে বুঝতে পারি নি কিন্তু পুরোহিতের হাতের লণ্ঠনের আলোয় মানুষটিকে দেখলাম, ছ ফুটেরও বেশী খাড়া সোজা মানুষ, কিন্তু চোখে মুখে সর্বাঙ্গে বহু প্রাচীন শালগাছের মত বয়সের এক বিচিত্র চিহ্ন স্পষ্ট রয়েছে। অনেক খণ্ড কালকে যে অতিক্রম করেছে, সে কি মহাকালকে চকিতের মতও দেখে নি? দেখেছে। মন বলল—দেখেছে। মন বলল—ওকে প্রশ্ন কর। কিন্তু কী বলে প্রশ্ন করব? কী করে সরাসরি জিজ্ঞাসা করব, ভগবানকে দেখেছেন? দেখতে পারেন?

ঠিক সেই সময় সন্ন্যাসী জল নিয়ে ফিরে এলেন। ধুনির পাশে কম্বলের উপরে বসে বললেন—ভগবান তুমারা মঙ্গল করে বাবা। অব তুমরা ছুটি। ঘর যাও। আমার ভি ছুট্টি মিলে।

বললাম, যাব। একটা কথা বলতে চাই।

—বোলো।

—আমার মনে অনেক প্রশ্ন বাবা। তার জন্য অনেক অশান্তি। গুরু ভিন্ন তার উত্তর মিলবে না। আপনি আমাকে দীক্ষা দেবেন?

—দীক্সা? ধুনির আগুনের আলো-পড়া আমার মুখের দিকে চাইলেন।

আমি বললাম, হ্যাঁ। দীক্ষা। আমি হাত জোড় করলাম।

সন্ন্যাসী বললেন, সুধা রাখতে হলে স্বর্ণপাত্রের প্রয়োজন বাবা, মৃৎপাত্রে হয় না।

মুহূর্তে আমি উঠে দাঁড়ালাম। যেন চাবুক পড়ল পিঠে। তবুও আত্মসংবরণ করে বললাম, নমো নারায়ণায় বাবা। আমি তা হলে চললাম।

চলে এলাম। সমস্ত অন্তরে যেন একটা জ্বালা অনুভব করেছিলাম সমস্ত রাত্রি। আমি মৃৎপাত্র? আমি মৃৎপাত্র? ভাল।

পরের দু-তিন দিন ওই শক্তিপীঠের দিকে গেলাম না। সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হবে বলেই গেলাম না। চার দিনের দিন গ্রামে প্রায় কলরব শুনলাম—আশ্চর্য এক সাধু এসেছেন শক্তিপীঠে। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান তিনই তাঁর নখদর্পণে। ঈশ্বর-জানিত মহাপুরুষ। মহাযোগী।

সেদিন বিকেলবেলা গেলাম। দেখতে গেলাম। গিয়ে কিন্তু সাধুর সম্মুখে গেলাম না, যাবার সময় পাশে তাকিয়ে দেখে গেলাম প্রায় একশো লোক বসে আছে, আর সন্ন্যাসী শাস্ত্র-কথা বলছেন। আমি সরাসরি গিয়ে মন্দিরের সামনে দাঁড়ালাম। প্রণাম করতে গিয়ে বলে-

ছিলাম, তুমি সত্য না মিথ্যা জবাব দাও। সত্য বলে স্তুতি করলে প্রসন্ন হতে দেরি হয়—তবে মিথ্যেই বলছি, আমাকে নাশ কর, ধ্বংস কর; বুঝতে পারব তুমি আছ।

হঠাৎ ছুটে এল বিপ্রপদ। সে প্রায় হাঁপাচ্ছিল।—এই যে, এই যে সুদর্শন, তোমাকে যে বাবা খুঁজছেন? ডাকছেন।

—কে? কে ডাকছেন? বুঝতে পেরেও আমি না-বোঝার ভান করেছিলাম।

—সাধুবাবা গো! ওই যে। রোজই তিন দিন ধরেই খুঁজছেন তোমাকে।

—আমাকে? কেন?

—এস না বাপু! সে কি আর আমাকে বলেছেন?

অন্য সময় হলে আমি যেতামই না। বিপ্রপদ যে-সাধুর ভক্ত—সে সাধুর কাছে যাবার স্থান আর যারই হোক, আমার নয়। তবুও গেলাম। চিত্তের ক্ষোভ আমার যায় নি। গিয়ে বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে বললাম, নমো নারায়ণায় বাবা।

—নমো নারায়ণায়। তুমিই সুদর্শন? হাঁ—হাঁ—সেই বটে তুমি। সে রাত্রে অনেক করেছ হামার।

হেসে বললাম, আপনি অতিথি, বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, তাই করেছি। যে-কেউ থাকলে করত বাবা।

—তা তুমি তো কই আউর এলে না। তুমি তো আমার কাছে দীক্‌সা নিতে চাইছিলে?

—কী করব এসে বাবা? আমি দীক্ষার কথা বলতে আপনি বললেন সুধা রাখতে স্বর্ণপাত্র চাই বাবা, মৃৎপাত্রে হয় না।

—হাঁ—হাঁ। উ তো ঠিক কথা আছে বাবা। কিন্তু এহি তো হিঁয়া শাস্ত্রকথা হোতা, প্রশ্ন হোতা, জবাব হোতা, এহি তো দীক্‌সাকে কাম হোতা বাবা।

বললাম, সে ওদের হোক। ওরা ধন্য। ওতে আমার ঠিক দরকার নেই। আর আপনার কাছে আমার আসতে ভয় আছে বাবা।

—ভয়? ডর? কাহে বাবা? কী ডর আছে বাবা হামার কাছে?

জবাবটা মুহূর্তে মনের মধ্যে যুগিয়ে দিল কেউ। কে আর? আমার স্ব-ভাব। আমি বললাম, তা হলে আমি একটা গল্প বলি বাবা। ছেলেবেলা পড়েছিলাম—একদিন এক নদীতে দুটি কলসী ভেসে যাচ্ছিল। কোন স্নানের ঘাট থেকে নদীর জলে ভেসে গিয়েছিল বোধ হয়। তার একটি মাটির, অপরটি ধাতুর, ধরে নিন সেটি সোনার। এখন দুটি কলসীর মধ্যে দূরত্ব অনেক। হয়তো একটি এ পারের, অন্যটি আর এক পারের। একসময় ওই সোনার কলসীটি ওই মাটির কলসীটিকে ডেকে বললে—ওহে মৃৎকলসী, আমরা তো দুজনেই ভেসে চলেছি একই মুখে, তা এস না, কাছে এস—দুজনে একসঙ্গেই চলি। তখন মৃৎকলসী বললে—অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। কিন্তু আমাকে তুমি মাফ্ কর, কেন না তোমার দেহ ধাতুময়, আর আমি নিতান্তই ভঙ্গুর, মাটির। কোনক্রমে যদি অনিচ্ছাক্রমেও সংঘর্ষ হয়, তবে তোমার কোন ক্ষতি হবে না, হয়তো অপরাধও থাকবে না, কিন্তু আমি আমার নিজের ভঙ্গুরতার জন্যে ভেঙে চুরমার হয়ে যাব। আপনি স্বর্ণপাত্র, আমি মৃৎপাত্র বাবা, আপনার কাছে আমার আসা তো নিরাপদ নয়।

গোটা আসরটা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল আমার স্পর্ধিত উত্তর শুনে। অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। একটি বিশ-বাইশ বছরের ছেলে এই শতবর্ষবয়সী সাধকের মুখের উপর এমন জবাব দিলে! বোধ করি শঙ্কিত বিস্ময়ে প্রতীক্ষা করছিল—এখুনি হয়তো সাধুর রোষকটাক্ষে ভস্ম হয়ে যাব। বিংশ শতাব্দীর তিরিশ সালের কাছাকাছি কালে এত বড়

অসম্ভব পরিকল্পনা যদি বা মনে না-ই এসেছিল, তবু এটুকু তারা স্থির বলে জেনেছিল সে সন্ন্যাসী ক্রুদ্ধ গর্জনে নিদারুণ অভিসম্পাতে আমাকে অভিশপ্ত করবেন।

সন্ন্যাসীও স্তব্ধ বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়েছিলেন। আজ ভাবি—এবং মনে মনে লজ্জিত হই—কারণ তিনি অভিসম্পাত আমাকে দেন নি। নিজেকে সংযত করেছিলেন। বোধ করি ভাবছিবেন—কী উত্তর দেবেন আমাকে? আমি কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করেছিলাম, তারপরই হাত তুলে নমস্কার করে বলেছিলাম, নমো নারায়ণায় বাবা। আমি আসছি।

সন্ন্যাসীও হাত তুলে বলেছিলেন—নমো নারায়ণায় বাবা।

শিবনাথের কথা

শ্রোতাদের কেউ ওই রাত্রির কথাটা জানত না। স্বর্ণপাত্র মৃৎপাত্রের কথাটা শুনেও সকলের বোধগম্য হয় নি। কারণ সুদর্শনের পক্ষে অহেতুকভাবে এমন কথাটা বলাও তো অসম্ভব ছিল না। সতেরো-আঠারো বছর বয়সে হেডমাস্টারের মুখের উপর সে বলেছিল—অন্যায়ের প্রতিবাদের অধিকার মানুষের জন্মগত। ওটা নেওয়ারই অপেক্ষা রাখে, দেওয়ার অপেক্ষা করে না। এবং বলেই ক্ষান্ত হয় নি, ইস্কুলও ছেড়ে দিয়েছিল। সুতরাং তেমন উদ্ধত তরুণের ওই কথাগুলির অর্থ কেউ খোঁজে নি, শুধু তার ঔদ্ধত্যের আর একটি বিচিত্র প্রকাশ বলে ধরে নিয়েই খুশী ছিল। অবশ্য অর্থ জানলেও ইতর-বিশেষ কিছু হত না—বরং সন্ন্যাসী তাকে মৃৎপাত্র বলেছেন বলে নিন্দামুখর হয়ে উঠত প্রখরভাবে।

যাই হোক, এই সন্ন্যাসীর সঙ্গেই বছর খানেক পর সে গৃহত্যাগ করেছিল। এর মধ্যে জটিল কাণ্ড একটা কী ঘটেছিল। সব জানি না, বিদেশেই থাকতাম। তবে শুনেছিলাম, গ্রামের লোক সন্ন্যাসীর ভ্রষ্টরূপ আবিষ্কার করে ক্রমে তাঁর উপর বিরূপ হয়ে তাঁকে লাঞ্ছনা করতে গেল যেদিন, সেদিন বিচিত্রবুদ্ধি সুদর্শন এসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল। আমার কাছে তার অর্থ দুর্বোধ্য ঠেকে নি, শুধু আমি কেন, অনেকেই তার সেই ব্যাখ্যাই করেছিলেন। সেদিন সন্ন্যাসীর পাশে দাঁড়িয়ে তাঁকে রক্ষা করে অপমানের শোধটা সে চরম করে তুলে নিয়েছিল।

সেদিন যখন ধাতুপাত্রটির উপরের গিলটি চটে গিয়ে জলে তার লোহার অঙ্গে জং ধরে ফুটো হয়ে ডুবছিল, তখন মৃৎপাত্রটি কাছে গিয়ে বলেছিল—আমাকে আশ্রয় কর, আমি তোমাকে আর কিছু না পারি, কিনারায় নিয়ে ফেলে দিতে পারব। কিন্তু সুদর্শন লিখেছে—না। এ ধারণা কোর না শিবনাথ। সংসারে কুটবুদ্ধি, অসৎ অভিপ্রায়ই সব নয়। সৃষ্টিতে সংসারে কলুষই সর্বস্ব নয়। আরও আছে। আরও আছে। সেদিন, অর্থাৎ ওই সন্ন্যাসীটির পাশে যেদিন গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, তাঁর পক্ষ নিয়েছিলাম—সেদিনও এই বিশ্বাস জীবনের প্রবল প্রচণ্ড বিপর্যয়ের মধ্যেও পাহাড়ের চূড়ার মত অটল ছিল। বুঝতে পারছিলাম দূরে মাটির গভীরতম গভীরে কম্পন জেগেছে। ভূমিকম্পের পূর্বে একটা গর্জন হয় শুনেছ? ভীষণ গর্জন—দশ-বিশখানা ট্রেনের শব্দের মত। বিহার ভূমিকম্পে ওই শব্দটা আমি শুনেছিলাম। হয়তো বহুজন শুনেছিল। তেমনি গর্জনই শুনেছিলাম তখন। ইউরোপে শুরু হয়েছে ভূমিকম্প; রাশিয়াতে তো বিশ্বাসের পাহাড়—তার উচ্চতম চূড়া—যেখানে উঠে মানুষ হাত বাড়াত ঊর্ধ্বলোকের দিকে অসীম শূন্যতার মধ্যে এবং ভাবত যে-কোন মুহূর্তে পাবে তাঁর চরণস্পর্শ; যিনি

ঈশ্বর ; যিনি সকল করুণার ও ক্ষমার কেন্দ্র, সকল সততার ও ন্যায়ের কেন্দ্র ; মায়া মমতা প্রীতি প্রেমের কেন্দ্র উৎস ; সকল মাধুরীর কেন্দ্র, সকল সৌরভ সকল মধুর উৎস ; সকল শান্তির আধার ; সকল সুখের আশ্রয় তাঁকে বা তাঁর স্পর্শে সে সব গ্লানি সব অভাব থেকে মুক্ত হবে—সে জানতে পারবে তাঁকে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ; সেই ঈশ্বর-বিশ্বাসের পাহাড়, সভ্যতার আদিকাল থেকে আজও পর্যন্ত—কালের প্রবলতম ভয়ঙ্করতম ভূমিকম্পে চুরমার হয়ে অতলের কোন্ নিরুদ্দেশে তলিয়ে গেছে এবং সেখানে সৃষ্টি হয়েছে গভীর সমুদ্রের, যেখানে আর ওসব বিশ্বাস নেই, অর্থাৎ জীবনাতীত কিছু নেই, যা আছে তা জীবনেই আছে—সুতরাং থাকবার মধ্যে আছে বেঁচে থাকার নিরন্তর চেষ্টা। মন মরবে। থাকবে দেহ আর বুদ্ধি। ঘটনার অতিরিক্ত সত্য কিছু নেই। এবার আর ক্রাইস্টের রেসারেকশন হবে না। এই তাঁর শেষ সমাধি। সেই প্রলয়ঙ্কর পরিবর্তনের জন্য যে ঝড় বল ঝড়, কম্পন বল কম্পন আসছে—তার সূচনার মধ্যেও তখন আমি দাঁড়িয়ে আছি পাহাড়ের মত অটল বিশ্বাসের কঠিন ভূমিতে। ওই ধীরেনবাবুর মত নাস্তিক স্বার্থসংযুক্ত বাস্তববাদী কর্মীদের আবির্ভাবে সে কম্পন এসেছে। তাদের সঙ্গে লড়াই করেও তখনও বিশ্বাস করি—আরও আছে, অনেক আছে। আজ এই মৃত্যু-যবনিকার সামনে দাঁড়িয়ে আবারও মনে হচ্ছে, আছে। আরও আছে। অনেক আছে। জন্ম-জীবন মৃত্যু এরই মধ্যে সব শেষ নয়। আগেও আছে পরেও আছে। সংসারে দেহের তাগিদে যা ঘটে তাই অবশ্যম্ভাবী বাস্তব নয়। তা ছাড়া আরও আছে, অনেক আছে—অথবা অনেক কিছুরও ওজন-পরিমাণের অতিরিক্ত কল্পনাতীত বিরাট কিছু'আছে। সেদিন তো সে বিশ্বাস অটলই ছিল। আরও আছে।

সুদর্শনের কথা

(ক)

আরও আছে। অনেক আছে ; গাছভরা ফুল ফোটে, সে আকাশকুসুম নয়, কারণ মাটির নীচে অজস্র-অসংখ্য মূল-জাল সহস্র মুখে অন্ধকারে পচনরস পান করে। আবার তত্ত্বকথা হয়ে যাচ্ছে। কী করব ? না বললে যে বোঝাতে পারছি না। তোমরাও বুঝতে পারবে না। তোমরা মৌমাছি, ভ্রমরের মত শূন্যলোকে ফুলের সম্ভারের চারিদিকে উড়ে বেড়াও, পাখা কাঁপিয়ে সেই মধু পান কর। আমি দুই-ই দেখি, তাতেও সন্তুষ্ট নই ; আমি মাটি খুঁড়ে সেই অন্ধকারে ফুলের উৎস খুঁজি। ফুলকে নিষ্পেষণ করে দেখি। আমি মানুষ। তোমরা মৌমাছি, ভ্রমরের মতই পুষ্প-রসের অভাবে বা ঝড়ঝাপটায় মর, মরার আগে কাঁদ। আমরা মরি না, দেহত্যাগ করি। আমি হেরেছি আমার স্ব-ভাবের ভয়ঙ্করীর কাছে। কিন্তু জেনেছি সেই ভয়ঙ্করীর ওই একটি মূর্তিই নয়—তার আর একটি মনোহারিণী, পরম মাধুর্যময়ী সুন্দরী রূপও আছে। সে শুধু বিনোদিনীই নয়—সে কল্যাণী, সে শুভা, সে সতী। সে যাকে খোঁজে তাকে যখন পায় তখন সে হয় গৃহলক্ষ্মী। যখন পায় না তখন সে রাক্ষসী ভয়ঙ্করী। থাক তত্ত্বকথা। সাধুর সঙ্গে পরে যে ঘটনাটি ঘটেছিল, তাতে আমি যা করেছিলাম, তার মধ্যে একবিন্দু কলুষ ছিল না। বিশ্বাস করতে অনুরোধও করছি না—বলছি, অবিশ্বাস করলে সত্যকে পাবে না। আমার মতি, আমার কর্ম সব-কিছুর মধ্যে যিনি রূপ নিয়েছিলেন—তিনি

কল্যাণী, তিনি সতী। সব করেছি আমি সৎ-সত্তার নির্দেশে। কারণ ওখানে সত্যকে আমি প্রসন্নচিত্তে সসম্ভ্রমে উপলব্ধি করেছিলাম।

সন্ন্যাসীর নামে অপবাদ রটল। ওই বৃদ্ধের নামে নারী নিয়ে ব্যভিচারের অপবাদ রটল। রটনার মূলে ছিল ওঁর একদা-মহাভক্ত বিপ্রপদ। এবং সেই রটনা নিয়ে সন্ন্যাসীর বিচারকর্তা সেজেছিলেন গ্রামের তিন বাবু, তান্ত্রিক ব্যভিচারী। বলি শোন।

আমাদের গ্রাম অথবা শক্তিপীঠ সন্ন্যাসীর ভাল লেগেছিল। হয় তিনি এখানকার পীঠে ভক্তি নিবেদন করে তৃপ্তি পেয়েছিলেন, অথবা এখানকার ভক্তদের ভক্তি পেয়ে তিনি প্রলুব্ধ হয়েছিলেন। হয়তো বা দুটোই সত্য। তবে আংশিক। আসল সত্যটা আমি জেনেছিলাম, সন্ন্যাসীর দম্ভে আমি আহত হয়েছিলাম, কিন্তু এই সত্যটি আমার বড় ভাল লেগেছিল। কারণ তখন আমি ক্ষুরের ধারের উপর চলি। আমি অবতার হই বা না হই আমার মধ্যে বিরাটের প্রেরণা অনুভব করি। বিরাটের উপাদান দুটি। এক শক্তি, অপরটি দীপ্তি। মানুষের জীবনে দীপ্তির প্রকাশ সত্যে ন্যায়ে। আমি ন্যায়বিচার করে এই সত্যকে উপলব্ধি করেছিলাম।

প্রথমবার সন্ন্যাসী এসে দিন-সাতেক ছিলেন। মাস দুয়েক পর তিনি আবার আসেন শক্তিপীঠে। প্রথমবার মেয়েরা, যারা শক্তিপীঠে প্রণাম করতে যেত, তাদের সঙ্গে কথা বলতেন না, আশীর্বাদ করতেন হাত তুলে। কেউ কিছু দিয়ে গেলে সেটা সেখানেই পড়ে থাকত, ছুঁতেন না। দ্বিতীয়বার তিনি এসেছিলেন, তার কারণ তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমার জন্য। আমার ওই কথাগুলি তাঁর মর্মে কাঁটার মতই বিঁধেছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার এসেই তিনি খানিকটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। উপবাস করে শুয়েছিলেন, ভক্তেরা এসে ফিরে গিয়েছিল। দু-একজন সেবার জন্য রাত্রে থাকতেও চেয়েছিল, কিন্তু তিনি না-ই করেছিলেন সকলকে।

আমাকে পরে বলেছিলেন—সেবা কইকো ন লেনা। লেনা তো দেনা হায় বাবা। দেনদার হোনা ন চাহিয়ে। ঋণ তো বন্ধন।

কারও কাছে বাঁধা পড়তে তিনি চান নি; কিন্তু দুনিয়ার প্রাণের খেলায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাট খেলায় বন্ধনই তো সব। সবই তো বাঁধা। বাঁধা আছে—তাই আছে। বাঁধন কাটলে এখানে ঠাঁই নেই—স্থান কাল সবের অতীত হয়ে যেতে হয়। তাই যে-জন বাঁধন ছিঁড়তে যায় তাকে অন্য জনে বাঁধে। দুনিয়ার বিচিত্র বিধিবিধান—বাঁধন কেটেও আবার পরতে হয়। এ তো শুধু মানুষের কথা নয়—সমস্ত কিছুরই এক কথা। সূর্য চন্দ্র পৃথিবী—বস্তু-জগৎই শুধু নয়, প্রাণ-জগৎও তাই। প্রাণ, প্রাণের বন্ধনে বাঁধা। সে যত কাটে বাঁধন, তত বাঁধা পড়ে। বাঁধন কাটে আর কাঁদে। সেদিন সীতারাম সাধু নিজের অসুস্থতার পরিমাণ ঠিক বুঝতে পারেন নি। হয়েছিল ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি। রাত্রের দিকে সেটা দেখা দিয়েছিল প্রবল প্রকোপে। মধ্যরাত্রির পর পর্যন্তও তিনি উঠে বাইরে গেছেন। তারপর আর পারেন নি। ওই বারান্দাতেই মলত্যাগ করেছেন। তারপর বিছানায় অর্থাৎ কম্বলটাতেই। ভোরবেলা ক্লেদাক্ত দেহে নির্জীবের মতই পড়েছিলেন বারান্দার প্রান্তে, খুঁটির গায়ে গড়িয়ে এসে পড়েছিলেন। আকণ্ঠ তৃষ্ণায় বুকটা মরুভূমি হয়ে গেছে। যোগাভ্যাসী আত্মাকেও শুষ্ক আর্ত দেহ ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করিয়ে টেনে এনে ফেলেছে নিজের সীমানায়।

ভোরবেলা গ্রামের মেয়েরা যান শক্তিপীঠের দ্বারপ্রান্ত মার্জনা করে প্রণাম করতে। দেবী-

প্রণাম সেরে তাঁরা আগন্তুক সাধুদেরও প্রণাম করেন। তাঁরাই ওঁকে প্রথম দেখেন। কিন্তু স্পর্শ কেউ করেন নি। ভিড় করে সামনে দাঁড়িয়েছিলেন। কী করবেন? সীতারাম পড়েই ছিলেন। তখনও তাঁর মনে দ্বন্দ্ব—এদের কাছে সাহায্য চাইবেন অথবা চাইবেন না! হয়তো অহঙ্কার। ভাবছিলেন, এদের কাছে প্রাণরক্ষার জন্য সাহায্য চেয়ে সাধারণ আর্ত মানুষের মত ছোট হয়ে যাবেন! অথবা হয়তো বা সত্যিই বৈরাগ্য। সে তিনিও বলতে পারেন নি। পরে যখন আমাকে সব কথা বলেন, তখন ঠিক এই কথাই বলেছিলেন আমাকে—না, মালুম নেই! তবে এটা তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, বুকের মধ্যে অভিমান তাঁর উথলে উঠছিল। এতটুকু মমতা নেই, স্নেহ নেই তাঁর জন্যে? শুধু শ্রদ্ধা, ভয়, আর সেই শ্রদ্ধা, ভয় ঘুচে গেলে ঘৃণা, অবজ্ঞা, উপহাস?

ঠিক সেই সময় একটি বাঁশীর মত মধুর কণ্ঠ করুণ সুরে বেজে উঠেছিল। একটি তরুণী ভিড় ঠেলে এসে সামনে দাঁড়িয়ে দেখবামাত্র বেদনার্ত কণ্ঠে বলে উঠল—আহা-হা! এবং কাছে এসে তাঁকে ডেকেছিল—বাবা! গোসাঁইবাবা!

সীতারাম সাধু তার দিকে তাকিয়ে নীরব দৃষ্টিপাতে সাড়া দিয়েছিলেন, তাঁর চোখ তখন জলে ভরে উঠেছে। জীবনের আদিম ভাষা—তার অভিব্যক্তি অভ্রান্ত এবং অমোঘ। মেয়েটিরও চোখ মুহূর্তে সজল হয়ে উঠেছিল। সে আর দ্বিধা করে নি, সাধুত্বের মহিমার কথা বাধা হয় নি, তাঁর সর্বাঙ্গের ক্লেদাক্ততায় ঘৃণা বোধ করে নি, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথার গোড়ায় বসে মাথাটি কোলে নিয়ে কমণ্ডলু উদ্যত করে বলেছিল—একটু জল খান বাবা।

সাধু সাগ্রহে হাঁ করেছিলেন এবং সে মুখে জল ঢেলে দিয়েছিল। ওদিকে সমবেত মেয়েদের মধ্যে আচরণ ও আচারতত্ত্বদর্শিনীরা বলে উঠেছিল—তুমি ওঁকে ছুঁলে?

—ছুঁলে, ছুঁলে, ওঁকে এই ময়লামাটি-মাখা অবস্থায় জল খাওয়ালে? এত বড় সাধু! ওঁর না হয় এখন জ্ঞান নেই! তা বলে—?

—পাপ আমার হবে। উনি এখন বাঁচুন।

সাধু তখন আবার হাঁ করছেন—জল দাও। জল। শুধু গলা নয়, শুধু বুক নয়—দেহের রোমকূপে-কূপে তখন তৃষ্ণা জেগে উঠেছে।

মেয়েটি তাঁকে জল খাইয়েই পরিচর্যার শেষ করে নি, কাঠ ঘুঁটে জ্বেলে জল গরম করে তাঁর সর্বাঙ্গের ক্লেদ মুছিয়ে পরিষ্কার করে, বারান্দার মল-ময়লা মুক্ত করে, তাঁকে ধুনির কাছে বসিয়ে, পুরোহিতকে একটু দেখতে বলে বাড়ি চলে এসেছিল—এবং বার্লি তৈরি করে নুন লেবু একটু আদাকুচি নিয়ে ফিরে এসে তাঁকে বলেছিল—একটু খান বাবা। খেলে গায়ে বল পাবেন।

সন্ন্যাসী বলেছিলেন—দাও। বার্লিটুকু খেয়ে বলেছিলেন—তুমি সাক্ষাৎ নন্দরানী।

নন্দরানী নামটি মধুর এবং বৃন্দাবনের স্মৃতি-জড়ানো। কিন্তু নন্দরানী কে—এ কথা সকলের ঠিক মনে পড়ে না শিবনাথ; তোমারও মনে আছে কিনা এমন সন্দেহ হয় আমার মনে। নন্দরানী মাতৃনাম। নন্দের গৃহিণী মা-যশোদা। রাধা নন। কেন বলছি জান, এরপর ওই নন্দরানী নাম নিয়েও লোক তার মধ্যে কলুষ সম্পর্কের সন্ধান করেছে। সে কথা পরে বলছি।

মেয়েটি কিন্তু সেদিন ওই নামকরণে ঝরঝর করে কেঁদেছিল। সে বালবিধবা, সে বন্ধ্যা।

সন্ন্যাসী তা জানতেন না। তিনি তার পরে বললেন—তোমার গোপাল শতায়ু হোবে মা।

মেয়েটি কিছু বলে নি। বলেছিল পুরোহিত, সে পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। বলেছিল—ওর সন্তান নেই বাবা। নিঃসন্তান, বিধবা।

এবার সকাতরে সন্ন্যাসী ডেকেছিলেন ভগবানকে—হে পরমেশ্বর!

মেয়েটি তখন চলে গেছে।

দুদিন পরই সন্ন্যাসী সুস্থ হয়ে চলে গেলেন।

মেয়েটি কে জান?

রমণবাবুকে মনে আছে? পোস্টমাস্টারি করতেন? গ্রামের মানুষ চাকরি করতে গিয়ে বিদেশী হয়ে গিয়েছিলেন; খুব কমই গ্রামে আসতেন, তাই বলছি। চাটুজ্জেপাড়ার রাধারমণ চাটুজ্জে। সেকালের কুলীনের ছেলে এণ্ট্রান্স পাস করে পোস্টমাস্টার হয়েছিলেন। সম্পত্তি ছিল না, তাই এ গ্রামের সম্পত্তিশালী—সে দশ হাজার আয়ের জমিদারিই হোক আর দশ-বিশ বিঘে জমিই হোক—তাদের সঙ্গে অন্তরে অন্তরে একটা কলহ ছিল। চাকরি পেয়ে এঁদের উপরে সে বিদ্বেষ-কলহটা প্রকাশ করে ফেলেছিলেন। আমার বাবার মত শ্বশুরবাড়িতেই বসবাস করবার সঙ্কল্প করে, সেখানেই ছুটিছাটায় যাতায়াত করতেন। ভাগ্যবান মানুষ, সন্তান-গুলি সবই কন্যা—এবং সংখ্যায় পাঁচ। এই কন্যাই সর্বকনিষ্ঠা, নাম শান্তি। জীবনে যা সঞ্চয় করেছিলেন রমণবাবু, তা তিন কন্যার বিবাহে শেষ করে, দুই কন্যাকে কুমারী রেখে পেনশনের আগেই মারা যান। রমণবাবুর স্ত্রী বাকি দুই মেয়ের বিবাহে সম্পত্তি বন্ধক রেখে ঋণ নিয়ে-ছিলেন। সেই ঋণের দায়েই সম্পত্তি বিক্রি হল। সামান্য সম্পত্তি। মেয়ে-জামাইরা ঋণ শোধ করে সম্পত্তি নিতে চায় নি, বিক্রি হয়ে গেল। মা তখন মারা গেছেন। এর পরই শান্তি হল বিধবা। বিয়ে হয়েছিল বারো বছরে, ষোল বছর বয়সে বিধবা হল। নিঃসন্তান। দেবর-ভাসুরের তাকে বিদায় করে দিলে। অজুহাতস্বরূপ কপালে একটি কালো দাগ দিয়ে দিলে। কোথায় যাবে শান্তি? মামারা স্থান দিলেন না, স্থান দিতে হলে ভরণপোষণের ভারও নিতে হয়। যেতে পারত কাশী, নবদ্বীপ। অধিকতর সাহসিনী হলে বর্ধমান কলকাতা যেতে পারত। কিন্তু শান্তির ততখানি সাহস ছিল না। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের দিকে তাকিয়ে সন্ধান করে পিতামহের গ্রাম ছাড়া আর কোনস্থানে আশ্রয় খুঁজে পায় নি। এবং বিধাতা এইখানেই আশার আলো দেখিয়েছিলেন। শান্তির জ্যাঠাইমা স্বামী-পুত্র সব হারিয়ে তাদেরই মৃত্যুব্যাধি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে দিন গুনছিলেন। নিজের সেবার জন্য তিনি নিরাশ্রয়া শান্তিকে ব্যাধি-কাতর মুখ যথাসাধ্য প্রসন্ন করেই ডেকে নিলেন। শান্তি পত্র লিখেছিল রিপ্লাই পোস্টকার্ডে। জানতে চেয়েছিল, তার বাবার অংশের বাড়িটুকু আজও মাথা গোঁজবার মত আছে কিনা, এবং সেখানে গ্রামের অনাথা কন্যা হিসেবে খেটেখুটে খাবার সুযোগ পেতে পারে কিনা? জ্যাঠাইমা যদি কারুর বাড়ি একটা কাজ জুটিয়ে দেন—তবে সে বেঁচে যায়, নইলে ভেসে যাওয়া ছাড়া তো আর পথ দেখতে পাচ্ছে না সে। উত্তরে জ্যাঠাইমা লিখলেন—তার বাবার অংশের ভিটে কেন, তাদের গোটা ভিটেটাই আজ মাটির ঢিপি হয়ে পড়ে আছে। সেখানে এখন বাস করে সাপ, ইঁদুর, বেজি। তিনি তাঁর বাপের সম্পত্তি পেয়ে তাঁদের শরিকানী বাড়ির ভাগের ঘরে বাস করছেন। সম্পত্তির সঙ্গে শরিকানী দেব-সেবা আছে, মাসে একদিন। আর আছে ব্যাধির বীজ। যে ব্যাধিতে তাঁর পুত্র গেছে, স্বামী গেছে, যা বর্তমানে তিনি বুকে ধরে পড়ে আছেন।

লিখলেন—সব জানিয়া-শুনিয়া তুমি যদি আস, জ্যাঠাইমার শেষ কদিন মুখে জল দাও—

তবে এটুকু আমি তোমাকেই দিয়া যাইব। আমার বাবার বংশের পুরানো দালানে দুইখানা ঘর আমার ভাগে। ফাটা-ফুটা হইলেও—তোমার জীবন কাটিয়া যাইবে। বিঘা দশেক জমি আছে, একটা বিধবার ভাত-কাপড়েরও অভাব হইবে না। তবে হয়তো এই ব্যাধির পাপের ভাগও লইতে হইতে পারে। বুঝিয়া উত্তর দিয়ো।

স্বর্গরাজ্যের চেয়েও মূল্যবান অধিকার পেল বলে মনে হল শান্তির। স্বর্গরাজ্যে মৃত্যু নেই, এ অধিকারে অল্প কিছুদিনের মধ্যে মৃত্যুও অবধারিত। সে কৃতার্থ হয়েই ছুটে এল। কিন্তু তার ভাগ্য বিচিত্র। সে আসবার মাস-দুয়েকের মধ্যেই জ্যাঠাইমা মারা গেলেন। এই মাস দুয়েকই যে সেবা শান্তি করেছিল, তাতেই তিনি খুশী হয়ে তাকে তাঁর সম্পত্তিটুকু লিখে দিয়ে গেলেন।

এই শান্তির পরিচয়। ষোড়শী স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। ফরসা রঙ। একপিঠ চুল। বড় বড় চোখ। জানে শুধু হাসতে আর নীরবে তিরস্কার সহ্য করতে, কাঁদতে জানে না। কদাচিৎ কাঁদে। যেমন সে কেঁদেছিল—সন্ন্যাসীর আশীর্বাদে।

একটা কথা বলতে ভুলেছি শিবনাথ, জ্যাঠাইমার মৃত্যুর পর শান্তিকে জ্যাঠাইমার পৈতৃক ঘর দুখানা ছাড়তে হয়েছিল। কারণ আইন অনুসারে জ্যাঠাইমার পৈতৃক সম্পত্তি তাঁর বাপের জ্ঞাতিদের কাছে ফিরে গেল। কিন্তু জমি দশ বিঘে গেল না। ওটা শান্তির জ্যাঠামশাই আইনের ফাঁক দিয়ে নিলামে বেচে এবং কিনে কায়েমী স্বত্বে দখলিদার হয়েছিলেন। শান্তি বিঘে দুই জমি বেচে পৈতৃক ভিটেতেই মাটির কোঠা তৈরি করিয়ে উঠে গেল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেই উঠে গেল। কারণ জ্যাঠাইমার পিতৃবংশের জ্ঞাতিদের জন-দুই ঘর দুখানাকেই শুধু দাবি ও দখল করতে চান নি, শান্তিকেও দখল করতে চেয়েছিলেন। তার মধ্যে বিপ্রপদ একজন।

এতগুলো ঘটনা মাস-ছয়েকের মধ্যেই ঘটে গেল। এর মধ্যে ওর সঙ্গে পরিচয়ের কোন সম্পর্কই আমার ঘটে নি, কথাবার্তাও বলি নি কোনদিন, কিন্তু আমি নিজে ওর পরিচয় নিয়েছিলাম। একতরফা পরিচয়। তার একটা বিশদ বিবরণ দেব এবার। কারণ শান্তি আমার জীবনে বিচিত্রভাবে গাঁথা। ও যেন আমার জীবনের সঙ্গে জড়াবার জন্যই এসেছিল। যেদিন শেষ খুন করে ধরা পড়ি বা ধরা দিই—সেদিনও সে আমার সঙ্গে জড়িয়ে ছিল।

মেয়েটি যেদিন এল গ্রামে, তার পরদিনই গিয়েছিলাম দেখতে। সম্পত্তির লোভে যক্ষ্মারোগীর সেবা করতে এসেছে যে মেয়ে, সে মেয়ে কেমন মেয়ে?

শান্তির জ্যাঠাইমার সঙ্গে সম্পর্ক আমার দুটো। উনি গ্রামের মেয়ে গ্রামের বউ, আমি এ গাঁয়ের ভাগ্নে—সুতরাং মামী এবং মাসী দুটোই বলতাম, যখন যেটা ইচ্ছে হত। ওঁর বাড়ি আমি মধ্যে মধ্যে যেতাম ছাগলের দুধের জন্য। বল্লভমামা অর্থাৎ শান্তির জ্যাঠামশাই বাড়িতে ছাগল পুষেছিলেন, যক্ষ্মারোগ প্রতিরোধের জন্য। জান বোধ হয়, দেশে পুরনো বিশ্বাস আছে যে, ছাগলের গায়ের গন্ধ রোগটার সহ্য হয় না। অনেক নাম-না-জানা রোগী নাকি ভাল হয়েছে এতে। তাই জয়ামাসীর স্বামীর আমল থেকেই এ বাড়িতে ছাগল ছিল। কয়েকটা ছাগল বেড়ে এক পাল হয়েছিল। রোগ পালায় নি, কিন্তু কিছু পয়সা এবং পথ্যের সুবিধে তারা করেছিল। পুজোর সময় পাঁঠা বিক্রি করে বেশ কিছু টাকা পেতেন। এ ছাড়াও ফিস্ট হলে খাসীর জন্য কেউ ভাবত না, রাত্রি দশটা পর্যন্ত জয়ামাসী চেষ্টা করে জেগে থাকতেন, বিশেষ করে শীতকালে আর বর্ষাকালে। কারণ কে কখন এসে হাঁকবে—জেগে আছেন ঠাকরুন? আমরা এসেছি, একটা খাসী চাই।

জয়ামাসী উঠতেন না ; বলতেন—বড়, না মাঝারি ? ছোট আমি বেচব না। বড় হলে আঠারো টাকা, মাঝারি বারো টাকা। টাকা এই দরজার ফাঁকে গুঁজে দাও। আগড় খুলে পছন্দ করে নিয়ে যাও।

জয়ামাসীকে কেউ কখনও-ঠকাত না। কখনও-সখনও ছুটো একটা চুরি যেত, সেটা করাত বিপ্রপদ। জয়ামাসী তা জানতেন। খাসী কি পাঁঠী কি পাঁঠা চুরি গেলেই জয়ামাসী চোখ বুজে বিপ্রপদকে গালাগালি করতেন, অভিসম্পাত দিতেন। বিপ্রপদ নির্বিকারচিত্তে দাঁত মেলে হাসত। ছাগল গেছে—পাগল গাল দিচ্ছে। দিক।

খাসী-পাঁঠার দাম ছাড়া ছাগলগুলো থেকে দৈনিক ছুধও পেতেন কিছু জয়ামাসী ; তা প্রায় সের দেড়েক। ওটাই তিনি খেতেন। গ্রামের কারুর ছেলের অসুখে ছাগলের ছুধের প্রয়োজন হলে সেটা তিনি বিতরণ করতেন। মাঝে মাঝে অসময়ে ভাল চা খেতে ইচ্ছে হলে কেউ কেউ যেত—পিসী বা মাসী বা খুড়ি, একটু ছুধ চাই, চা খাব।

জয়ামাসী বলতেন—দেখ বাবা বাঁটটা টেনে, পাবে।

কচি বাচ্চার মা-ছাগল ছুটো-তিনটে বাঁধা থাকত বাড়িতে। এবং ছাগলের ছুধ ঘণ্টায় ঘণ্টায় বাঁট টানলে অল্প একটু-আধটু মেলে। আমি মধ্যে মধ্যে ছাগলের ছুধের জন্য যেতাম। সেদিনও ওই অজুহাতে একটা কাপ হাতে গিয়েছিলাম।

গিয়ে দেখলাম, উঠোনটায় প্রায় থিয়েটারের স্টেজ গড়ে উঠেছে। পর পর দড়ি টাঙিয়ে সাবান-কাচা বা ক্ষারে-কাচা বিছানার ওয়াড় ঝুলিয়ে শুকোতে দেওয়া হয়েছে। আর উঠোনের মেঝেতে, দাওয়ার কিনারায় দীর্ঘকালের পুরনো খোয়া-ওঠা পিটোনো মেঝের মত শক্ত ছেঁড়া বিছানাগুলো রোদ্দুরে দেওয়া হয়েছে। জয়ামাসী পাকা বারান্দাটার কিনারায় একটা থামে ঠেস দিয়ে বসে আছেন, পরনে ধোওয়া কাপড়, বোধ করি মাথাতেও সাবান দিয়েছেন, অল্প চুল কটি শুকিয়ে ফুলে ফেঁপে অনেকখানি দেখাচ্ছে। বুঝতে আমার কষ্ট হয় নি ; তবু বলতে হয় বলেই বললাম—ব্যাপার কি মাসী ? আজ যে এত কাচাকাচির ধুম ?

মাসী বললেন—আয় বাবা সুদর্শন। দেখ, আমার সুখ দেখ! মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা রে। যে মানুষ আজ হোক আর ছু মাস পর হোক, কি ছু বছর পর হোক মরবে, তার আবার বিছানা পরিষ্কারে কী দরকার! ঘর ঝাড়াঝুড়োতেই বা কী দরকার! তা কপালে যে ছুর্ভোগ আছে, পরার্ন (প্রহার) আছে, তা ঘোচাবে কে বল ? মরবই যখন, তখন পরিষ্কার-ঝরিষ্কার হয়ে মরে কী লাভ, এ যে না বুঝবে তাকে বলে কী করে বোঝাই! তাই দিয়েছি বাবা নিজেকে সঁপে, তোর যা খুশি তাই কর।

ঘরের মধ্যে থেকে খিলখিল করে হাসি বেজে উঠল। যেন কৌতুকে কেউ ভেঙে পড়ছে। সে হাসিতে বিস্ময় বোধ করেছিলাম। এতে এত হাসির কী আছে ? জয়ামাসী ভ্রূ কুঁচকে বললেন—অই—অই, এতে এত হাসির কী আছে ? ওরে বাবা, তোর মাথা-টাথা খারাপ নাকি ?

এবার হাসি বেড়ে গেল। মনে হল মেঝের পড়ে হয়তো গড়াগড়ি খাচ্ছে মেয়েটা। জয়ামাসী ক্রুদ্ধ হলেন, অকস্মাৎ চিৎকার করে বললেন—অই! অই! শান্তি! শান্তি! শা-ন্তি! আমার মাথা খেয়ে এ কী হাসি তোমার!

হাসি থামল না। হাসতে হাসতেই সে বললে—তা এত রাগছ কেন ?

—রাগব না ? কী এমন বললাম যে তুমি হাসছ ?

—তুমি বললে না, আজ হোক কাল হোক ছু বছর পরেই হোক যে মরবেই তার আবার

বিছানা পরিষ্কার কি ঘর ঝাড়াঝুড়োতে কী দরকার, তাই হাসছি।

—এতে হাসির কথা কী আছে শুনি ?

—নেই ? তা হ্যাঁ জ্যাঠাইমা, দু বছর কি দশ বছর কি বিশ-পঞ্চাশ বছর পর তো সবাই মরবে গো। তাই বলে বিছানা পরিষ্কারের দরকার নেই, ঘর ঝাড়াঝুড়োর দরকার নেই ? এ হাসির কথা নয় ?

কথাগুলির মধ্যে সূক্ষ্ম বা স্থূল কোন রকম রসিকতার বিশেষ উপাদান নেই, কিন্তু মেয়েটির বলার ভঙ্গির মধ্যে এই রসিকতা উপলব্ধির এমন একটা কিছু ছিল, আর ছিল এমন একটা সহজ সারল্য যে, তা শুনে জয়ামাসীও হাসলেন, আমিও হাসলাম। হেসে জয়ামাসী বললেন—তা হলে তুমি যত খুশি হাস মা, আর কিছু বলব না। তবে দেখো মা, হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরিয়ে মূর্ছা যেয়ো না ; আমি উঠে তোমার মুখে জলের ছিটে দিতে পারব না।

আবার সে হেসে ভেঙে পড়ল বোধ হয়—পেটে খিল কী গো ? পেটে খিল আছে নাকি ? চলল খিলখিল করে হাসি সমানে। জয়ামাসীও এবার হাসতে লাগলেন। আমি বুঝলাম, এ মেয়ে বিষয়ের লোভে আসে নি এবং এই সব কাচাকাচি করা—এর মধ্যে জয়ামাসীর হুকুম নেই। এর মধ্যে আছে আপন জনের কাঙাল এই মেয়েটির সহজ একটি সেবাধর্ম, যা ভিন্ন ও থাকতে পারে না, বাঁচতে পারে না। একটু হেসেই প্রসন্ন মনে বাড়ি ফিরে এসেছিলাম দুধ নিয়ে। সেদিন ওকে চোখে দেখি নি, দেখতেও চিত্ত কোন আগ্রহ প্রকাশ করে নি।

এক বিন্দু সত্য গোপন করছি না। হলফ করে লাভ নেই, নইলে হলফ করেই বলতাম। হলফ করে ঈশ্বরের নাম নিয়ে। ঈশ্বরের চক্ষু সদা-জাগ্রত, তাঁকে ফাঁকি দেওয়া যায় না, সুতরাং মিথ্যা বললে তিনি মিথ্যা বলার পাপের সঙ্গে তাঁর নাম নেওয়ার অপরাধটা জুড়ে কঠিন শাস্তি-বিধান করবেন, এই বিশ্বাসবলেই ঈশ্বরের নাম নিয়ে হলফ করে মানুষ। আদালতে হলফের তবু মূল্য আছে, কারণ মিথ্যা বলা প্রমাণিত হলে সাজা দিতে পারবে আদালত। এমনি এমনি তোমার কাছে বা অবিশ্বাসী দশের কাছে হলফ করে লাভ কী ? নইলে হলফ করেই বলতাম, দেখতে ইচ্ছে হয় নি। নারী সম্পর্কে আমার জীবনে তখনও আকর্ষণ লোহা আর চুম্বকের সম্পর্ক হয়ে ওঠে নি।

থাক, তত্ত্বকথা বলব না। এর পর মেয়েটির কথা বিশেষ মনেই হয় নি। মধ্যে মধ্যে দু-চারটে কথা কানে আসত, সেটা মেয়েটিকে নিয়ে বিপ্রপদের আলোচনা ও জল্পনা-কল্পনার প্রতিধ্বনি। শুনতাম বিপ্রপদ দিন-রাত্রি উপরতলায় বারান্দায় বীররসের বক্তৃতা করে। মধ্যে মধ্যে বিপ্রপদকে রাস্তার উপরেও গলা কাঁপিয়ে বক্তৃতা করতে শুনতাম, তার দুটো লাইন আজও আমার মনে আছে—

পাষাণী—আমি তব ধাইব পশ্চাতে
সাথে লয়ে তপ্ত আঁখিজল।
তুমি কিন্তু চলে যাবে ফিরায়ে বদন।

কোটেশন ঠিক হল কিনা জানি না। তবে মোটামুটি ঠিক আছে বলেই বিশ্বাস। শুনে, মনে মনে করুণাও হত, আবার অবজ্ঞাও হত। ইচ্ছে হত, মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করে দেখব। যদি দেখি মেয়েটি বিপন্ন বোধ করছে, তবে বিপ্রপদর আর একটা দাঁত ভেঙে দেব। পরক্ষণেই মনে হত, ও মেয়ের সেবাধর্ম যতই মনোমুগ্ধকর লেগে থাক জয়ামাসীর ক্ষেত্রে, আসলে ও হল সাধারণ মানুষের মত দাসের বা দাসীর জাত। ওকে উপযাচক হয়ে রক্ষা করতে গিয়েই বা লাভ কী ? ও-ই আগে বলুক, ও বিপন্ন। কিন্তু তেমন কথাও কানে আসে নি কোনদিন

বরং উল্টো কথাই কানে এসেছিল। শুনেছিলাম, জয়ামাসী রাগ করে চিৎকার করতেন—ওরে ও নটো, থেটার করবি তো সেই তোদের মাচায় যা না। ঘরে কেন রে? না হয় মাঠে যা। ওরে, এটা যে ভদ্দরলোকের বাড়ি।

মেয়েটা নাকি খিলখিল করে হাসত। বলত—বেশ তো জ্যাঠাইমা, বেশ তো সুর করে খাসা বক্তৃতা করছে। রাগছ কেন গো? বরং এক গেলাস জল খেয়ে গলা ভিজিয়ে নিতে বল। কাশছে, চেঁচিয়ে গলা শুকিয়ে গিয়েছে।

জয়ামাসী বলতেন—যা, তবে শরবত তৈরি করে নিয়ে যা, দিয়ে আয়। হারামজাদার তপ্ত আঁখিজল ঠাণ্ডা হোক।

শুনেছিলাম জয়ামাসী বিরক্ত হয়েছিলেন ওর স্বভাবের জন্য। কিন্তু যে সেবার স্বাদ মেয়েটি তাঁকে দিয়েছিল, যা তিনি অকস্মাৎ পেয়ে গেছেন, তাকে পরিত্যাগ করার মত মনের বল তাঁর ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় দিন যখন মেয়েটিকে দেখলাম তখন বুঝলাম, ওর জাত আলাদা। সেদিন জয়ামাসী মারা গেছেন। কথাটা ছড়িয়েছিল দু'দিন আগে থেকে; মাসী সজ্ঞানে গেছেন; দু'দিন আগে থেকে আয়োজন করেছেন—অঙ্গ-প্রায়শ্চিত্ত করেছেন, সম্পত্তি দানপত্র করেছেন, কয়েকটা ছাগল পর্যন্ত বিলি করেছেন, সুতরাং গাঁয়ের লোক সকলেই শুনেছে। শুনলাম দু'দিন ধরে বিপ্রপদই তদ্বির-তদারক করেছে। উদ্যোগী হয়ে দানপত্র লেখানো, রেজিস্ট্রি করানো সব করেছে সে-ই। সম্পত্তি দিয়েছেন শান্তিকে। সুতরাং যে গুজবটা কানাকানি চলছিল, সেটা এখন সকল জনের মধ্যে জানাজানি হয়ে গেল। শুনলাম, আগুনের উত্তাপে ঘি গলেছে—ফুটছে। গন্ধটা এতদিন ওঠে নি—ঢাকনি ঢাকা ছিল, আজ ঢাকনি খুলেছে। মেয়েটি প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন করেছে, মধ্যে মধ্যে দু-একবার হাসে নি এমনও নয়। আমি গেলাম শব নিয়ে যাবার সময়। জয়ামাসীর কাছে কথা দেওয়া ছিল আমার। তিনি কয়েকবারই আমাকে বলেছিলেন—তুমি তো বাবা গরীব-দুঃখীর অনেক উপকার কর, অনাথ-আতুরের বন্ধু, রোগে সেবা কর, মরলে ফেল, জাত বাছ না, তা মাসী মরলে মাসীকে দেখো বাবা। যক্ষ্মার রোগী—সহজে তো কেউ কাঁধ দিতে আসবে না। আমি প্রতিবার বলেছি—নিশ্চিন্ত থাক মাসী, কেউ না আসে, আমি একা তোমাকে কাঁধে ফেলে তোমার বিধিমত সৎকার করে আসব।

এমন সৎকার আমি কয়েকটা করেছি। জাত মানি নি, গাড়ি করে তাতে চারিয়ে, শ্মশানে নিয়ে পুড়িয়েছি—তার আগে তার মুখে আগুনও দিয়েছি। মনে মনে বলেছি, তোমার সম্পদ-সম্পত্তিহীন উত্তরাধিকার আমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে তোমার মুখে আগুন দিচ্ছি।

যাক, নিজেই গেলাম। দেখলাম জয়ামাসী মিছে আশঙ্কা করেন নি। শব সৎকারে কেউ আসে নি—এক বিপ্রপদ ছাড়া। আর এসেছে কালো কর্মকার, সে মাসীর কাছে নিয়মিত খাসী পাঁঠা কিনত এবং কেটে ভাগা দিত। বিপ্রপদ চিৎকার করছে, গ্রামের লোককে শাসাচ্ছে এবং শান্তিকে অভয় দিচ্ছে—কোন ভয় নেই তোমার। আমি আছি।

কালো কর্মকার একখানা গরুর গাড়ি এনেছে; মাসী গাড়িখানা কিনে রেখে গিয়েছিলেন—গরু দুটো কালোর নিজের। গাড়িখানা কালোই পাবে। কালো কাঠ চাপাচ্ছে আর-একখানা ভাড়ার গাড়িতে, আর মধ্যে মধ্যে বলছে—একটুকুন থামুন বাবু। কাজ কটা সেরে নিই।

মেয়েটি স্তব্ধ হয়ে বারান্দার থামে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আমি যেতেই কালো বললে—এই দেখুন, যিনি আসবার তিনি এসে গিয়েছেন।

বিপ্রপদ ভুরু কুঁচকে বিস্ময় প্রকাশ করে বললে—সুদর্শন? তুমি যাবে নাকি?

মেয়েটি একটু হেসে বললে—উনি যাবেন, জ্যাঠাইমা আমাকে বলে গেছেন। দেখিস, সুদর্শন ঠিক আসবে।

আমি বললাম—হ্যাঁ, আমি একবার নয়, বার বার তাঁকে কথা দিয়েছি। কেউ না গেলে আমি একলাই নিয়ে যাব।

এর পর শ্মশানে মুখাগ্নির সময় মেয়েটি কাঁদল। সে কান্না আশ্চর্য বিষণ্ণ, করুণ, নিরুচ্ছ্বসিত। শুধু জলের দুটি ধারা নেমে এল। মুখাগ্নি করে বললে—এইবার তুমি জুড়োও; বড় দাহে জ্বলেছ। তারপর আমাদের তিনজনের মুখের দিকে তাকিয়ে চোখ মুছতে মুছতে অপ্রতিভের মত স্বল্প একটু হাসি টেনে বললে—বড় দুঃখী। মরবেন এ জানতাম, কিন্তু এত শিগগির তা জানতাম না। ইচ্ছে ছিল, কিছুদিন সেবা-যত্নের আরামটা দিই। তা—

হাত উল্টে দিল। অর্থাৎ আর হল না।

আবার বললে—এ জানলে হয়তো আমি আসতাম না।

তারপর বিষণ্ণ হয়ে বসে রইল সারাক্ষণ। বিপ্রপদ কয়েকবার বললে—না, না, এমন মন খারাপ করে বসে থেকো না তুমি।

একটু হেসে সে বললে—কী করব?

—হাস। কী করবে? মৃত্যু তো সবারই আছে। বলেই সে আরম্ভ করলে—

এই নরদেহ
জলে ভেসে যায়, ছিঁড়ে খায় কুকুর-শৃগাল
কিংবা চিতাভস্ম পবন উড়ায়।

আবার সেদিন আমি এক চড় মারতাম, কিন্তু তার আগেই মেয়েটি চকিতে তার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে—আপনি অতি ইতর।

মুহূর্তে থেমে গেল বিপ্রপদ। চিৎকার করতে পারলে না প্রতিবাদে, চলে যেতে পারলে না, পঙ্গুর মত দাঁড়িয়ে রইল। বলতেও পারলে না—আমি তোমার উপকার করলাম, আর আমাকে তুমি বলছ ইতর!

মেয়েটির সঙ্গে গোপন প্রীতির সম্পর্ক থাকলে বিপ্রপদ দাঁত বের করে কাষ্ঠহাসি হাসত। তাও পারলে না।

পরের দিনই শুনলাম, বাড়ির মধ্যে ঘরের উত্তরাধিকার নিয়ে জয়মাসীর পিতৃবংশ আপত্তি করেছে। শান্তি ঘর থেকে উঠে যাবে, ও ঘর সে চায় না।

আমার সন্দেহ মিটে গেল। এ মেয়ে দাসীর জাত নয়—বহুর জাতেরও নয়, এর জাত আলাদা।

কিন্তু আমি বুঝলে কী হবে, লোকে তা বুঝতে চায় না; লোকে বিশ্বাস করলে অন্য এক রটনা। রটালে বিপ্রপদ। রটালে, জয়মাসীর পিতৃবংশ এতদিন অনেক অনাচার সহ্য করেছে আর সহ্য করবে না। পাপকে প্রশ্রয় তারা দেবে না।

পাপের প্রমাণ? অকাট্য প্রমাণ হাজির করলে বিপ্রপদ, বললে—দেখ তোমরা, চোখে দেখ—হিসেব কর। শান্তি ঘর থেকে উঠে যাচ্ছে এবং কালো কর্মকার তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। শান্তি বাপের ভিটেতে বাড়ি করবে—তাতেও উদ্যোক্তা কালো কর্মকার। কালো কত রাত্রে এসেছে জয়মাসীর বাড়ি খাসী কেনার অজুহাত নিয়ে। সে সময় কী ঘটেছে কে দেখেছে?

কিন্তু ঘি আর আগুন, নারী আর পুরুষ নির্জনে মিললে যা ঘটে তা মিথ্যা বলবে কে? সাক্ষী তার শাস্ত্র।

শান্তি এ অপবাদও গ্রাহ্য করে নি। নিজের বাপের ভিটেয় ঘর তুলে উঠে গিয়েছিল। কিন্তু মুখের হাসি ফুরোয় নি।

এই শান্তির পরিচয় শিবনাথ।

(খ)

এই শান্তিকে নিয়েই সাধু সীতারামের অপবাদ রটল। ওই সাধুর মুখে জল দেওয়া এবং বার্লি খাওয়ানোটুকু নিয়েই নয়, আরও ঘটনা ঘটেছিল। সীতারাম সাধু সেবায় সুস্থ হয়ে দুদিন পরে চলে গেলেন, আমার সঙ্গে দেখা করার গোপন সংকল্প অপূর্ণই রইল। কিন্তু আবার ফিরে এলেন এক মাস পর। আমার সঙ্গে দেখা করবার সংকল্প এবার ছিল না এমন নয়, তবে সেটা এবার আর মুখ্য ছিল না। এবার এসেছিলেন তাঁর নন্দরানীর আকর্ষণে।

সীতারাম সাধু পরে বলেছিলেন আমাকে—প্রকৃতির নিয়ম বাবা। বাল্যকালে যখন সংসার ত্যাগ করেছিলাম, মা তখন খুব কেঁদেছিলেন; কিন্তু তখন সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়েছিলাম, ফিরে তাকাই নি। উসকে বাদ, যখন নওজোয়ান, গুরু যখন আগুনসুদ্ধ কাঠ হাতে দিয়ে বললেন—এখন তোমার সাধনা তুমি করো, সিদ্ধি গুরু দেয় না, সাধনায় আসে। তখন কত ভাই মিলেছে, বন্ধু মিলেছে, তারা মায়াতে বাঁধতে চেয়েছে, আশ্রম করে দিতে চেয়েছে, বলেছে—এখানেই থাকুক সাধু ভাইয়া। শুনে আমি হেসেছি, চলে এসেছি, আর সেখানে ফিরি নি। কত ভক্তিমতী যুবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে ভাই, কত সেবা দিতে চেয়েছে, আমার তন্‌মন ভগবানকে দিতে চাই শুনে মুগ্ধ হয়েছে। আকারে ইঙ্গিতে বলেছে—তবে আমার তন্‌মন তুমি নাও, তোমাকে আমি সঁপে দি; তোমার তন্‌মনের সঙ্গে আমার তন্‌মন তাঁর কাছে পৌঁছে যাবে। কতজন সিধা বাত্‌সে প্রকাশ করেছে। আমি হেসেছি ভাই। মনে মনে প্রণাম করেছি প্রকৃতির রাধা-রূপকে। নিজেকে নিজে হুঁশিয়ার করেছি, বলেছি, কিষণজীকেও রাধা ছেড়ে তবে নিজেকে প্রকাশ করতে হয়েছিল। বন্ধন। ওতে বাঁধা পড়ো না। মুসাফির গাঁঠরি বাঁধো। চলে এসেছি। আজ বুড়া বয়সে মহাপ্রকৃতি মহা সংকটের দিনে নন্দরানী এগিয়ে এল জননীরূপে। বাঁধা পড়ে গেলাম ভাই।

প্রথম এসেছিলেন—ওই মেয়েটিকে, তাঁর নন্দরানীকে কৃতজ্ঞতা জানাতে, আশীর্বাদ করতে। রাত্রে এসেছিলেন, ভোরবেলা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন নন্দরানীর প্রতীক্ষায়। সে তো জল দিতে আসবে দেব-মন্দিরের অঙ্গনে। এবং দেখেই চিনেছিলেন। বলেছিলেন—তোমার লিয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি মা। তুমি আমার সেই নন্দরানী?

—বাবা! আনন্দে চোখ দুটি ভোর-রাত্রের যুগল শুকতারার মত ঝলমল করে উঠেছিল। —আপনি ভাল আছেন?

—হাঁ মা, এখন সব ঠিক হয়ে গিয়েছে।

নন্দরানী বললে—না বাবা, শরীর এখনও আপনার দুর্বল হয়ে আছে।

—ওঁ কুছ না মা। তোমার স্নেহে সব ঠিক হয়ে যাবে।

—না, না, না। এখন আপনার এমন করে ঘোরাফেরা করা ঠিক নয়।

—তোমার কাছে না-এসে পারলাম না, মা। তোমাকে আশীর্বাদ করতে এসেছি।

—কী আশীর্বাদ করবেন বাবা? বলুন। হাসলে নন্দরানী, অর্থাৎ শান্তি।—আমার স্বামী নেই, সন্তান নেই, সে তো কেউ দিতে পারবে না বাবা। আর ও-সব নেই যার, তার ধন-সম্পদ-সুখ-আয়ুতেই বা কাজ কী?

সন্ন্যাসী হেসে বললেন—যা পেলে সব পাওয়া হয় মা, তাই পাবে তুমি।

—সে কী বাবা?

—ঈশ্বর। ভগবান। গোবিন্দ। কিষণজী।

অবাক হয়ে শান্তি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকল। তারপর বললে—আপনি তাঁকে পেয়েছেন বাবা? আমাকে দেখাবেন তাঁকে?

—আমার দর্শন আজও মেলে নি মায়ী। তবে পথ আমি জানি। সে পথ আমি বলে দেব।

শান্তি আর কিছু বলে নি, প্রণাম করে চলে এসেছিল তখন। তারপর স্তব্ধ দুপুরে একা কিছু ফল নিয়ে তাঁর ওখানে গিয়ে প্রণাম করে বলেছিল—রাত্রে এইগুলি খাবেন। আজ ব্যবস্থা করতে পারি নি, কাল থেকে দিনের বেলার জন্যে দুধ আর মিহি চাল দিয়ে যাব; পুরুতমশাইকে বলে দেব, আপনাকে যেন আলাদা করে চারটি ফুটিয়ে দেয়। শরীর আপনার ভাল নয়।

সন্ন্যাসী 'না' বলতে পারেন নি; গ্রহণ করে একটি ফল তার হাতে দিয়ে বলেছিলেন—এটি তুমি খাও মা।

—আমি? এবার সে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল।—আমি খাব কি বাবা?

—হাঁ মা, তুমি খাবে। তুমি খাও, আমি দেখি।

—আমি খাব, আপনি দেখবেন?

কী অপার কৌতুক! এতে কি শান্তি না হেসে পারে!

—হাসছ কেন মা? এতে হাসির কী আছে?

—হাসির কী আছে? আমি খাব? আবার সেই হাসি।

এবার সন্ন্যাসীও হাসতে শুরু করলেন।

জঙ্গলে-ঘেরা শক্তিপীঠের নির্জন স্তব্ধ দ্বিপ্রহর এক বৃদ্ধ এবং এক তরুণীর কলহাস্যে মুখরিত হয়ে উঠল। এবং শেষ পর্যন্ত খেতে হল শান্তিকে। শান্তি পরে আমাকে বলেছিল—আমি খেয়েছিলাম, আমার হঠাৎ একটা কথা মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, সাধুবাবা আমাকে যে ফলটি দিলেন, এইটিই বোধ হয় আশীর্বাদ। মন্তর-টন্তর পড়ে দিয়েছেন, খেলেই আমার চোখ খুলবে, হয়তো সাক্ষাৎ ঈশ্বর সামনে এসে দাঁড়াবেন। যদিই বা তা না হয়, তবে পথটা দেখতে পাব। তাই বললাম—বেশ খাচ্ছি। কিন্তু আপনার সামনে খেতে পারব না। ওই ঘাটে গিয়ে খেয়ে হাত-মুখ ধুয়ে আসছি।

শান্তি ঘাটে গিয়ে ফলটি খেয়ে কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু চোখের সম্মুখে যেমন পৃথিবী তেমনিই ছিল, আকাশের কোন কোণে একবিন্দু দীপ্তি দেখা দেয় নি, মাটির কোন স্থান ফেটে কোন জ্যোতির আবির্ভাব হয় নি। পাখিরা গান গেয়ে ওঠে নি, গাছে গাছে অজস্র ফুল ফুটে ওঠে নি, নিজের অন্তরলোকেও কোন আলোর দেখা পায় নি। চোখ বুজে দেখেছিল—যে অন্ধকার সেই অন্ধকার, সূর্যের দিকে বন্ধ চোখ তুললে সেই যথানিয়মে অন্ধকার খানিকটা রক্তাভ হয়ে ওঠে, আবার ছায়াচ্ছন্ন বনের দিকে তাকালে গাঢ় কালো হয়ে ওঠে

অন্ধকার। মনের মধ্যেও কোন আনন্দ অনুভব করে নি, যাতে মনে হয় তার জীবনের সব দুঃখের শেষ হয়ে গেছে।

তবে? তবে এ কী হল? তার মনই উত্তর দিয়েছিল—হয় নি, হবে। সাধুবাবা তো বলেন নি যে ফল খেলেই তুমি দিব্যচক্ষু পাবে। ঈশ্বর এসে দাঁড়াবেন। বলেছেন, পথ বলে দেবেন। সেই পথে তোমাকে চলতে হবে, তবে তো পাবে।

ঠিক কথা। পথের কথা বলব বলেছেন সাধুবাবা, কিন্তু এসে অবধি এই ফলটা খাওয়া নিয়েই খাও-খাও আর না-না করেই কেটে গেল। পোড়া হাসিই তার কাল, কী যে অকারণ বা সামান্য কারণে সে হাসলে! ছি! যাক, যা হয়েছে হয়েছে, আর না। এবার গিয়েই বলবে—পথ বলে দিন বাবা। সংকল্প করেই সে ফিরল। কিন্তু প্রায় সেই মুহূর্তে দ্বিপ্রহরের যে একটি গম্ভীর স্তব্ধতা আছে, যখন রুদ্রশঙ্কর ইষ্টের ধ্যানে বসেন আর প্রহরারত নন্দিকেশ্বর তর্জনী হেলন করে পৃথিবীকে স্তব্ধ করে রাখেন, সেই কালটি বোধ হয় পার হল। স্তব্ধতা ভঙ্গ করে পাখিরা কলরব করে ডেকে উঠল। কয়েকটি কাক উড়ে এসে ঘাটের রানায় বসল, শক্তিপীঠের বড় পুকুরটার চারিপাশের শালুকপানাড়ির ঘন বন থেকে কয়েকটা পানকৌড়ি ঘুম ভেঙে পাখা ঝেড়ে উঠে জলে ডুবতে এবং উঠতে লাগল। শক্তিপীঠের ওদিকের গোয়াল থেকে একটা বাছুর হাম্বারবে মাকে ডাক দিলে।

শান্তি চমকে উঠল, ওমা, এ যে বিকেল হয়ে গেছে। সারা দুপুরটা হেসেই কেটে গেল! মরণ! সঙ্গে সঙ্গে তার হাসির ঘরের আগল খুলে গেল। জানতে এলাম ভগবানের ঘরের পথ। কিন্তু একটি পাকা কলা খেতে সময় ফুরোল। চল, এইবার বাড়ি চল, উনোনে আঁচ দেবে, ঘর ঝাঁট দেবে; ছাগলগুলোকে পথে দাঁড়িয়ে ডাকবে—আয় আয়। আর-র-র-র, আয়—আ-র-র-র। ছাগলের পাল আসবে, সর্বাগ্রে সেই বুড়ো ধেড়ে দাড়িওয়ালা ছাগলটা এসে বলবে—ব্যা ব্যা ব্যা। হাসি লাগে আর না লাগে।

হি হি করে হাসতে হাসতেই সে আসছিল সাধুবাবার কাছে। বলবে তাঁকে কথাটা। কিন্তু দেবমন্দিরের আড়াল পার হয়েই তার হাসি বন্ধ হয়ে গেল, লজ্জায় সে জিভ কাটল। এরই মধ্যে কখন গ্রামের দুজন দেবী-ভক্ত এসে সাধুর কাছে বসে কথা বলছেন। সে নিজেকে সংযত করে এগিয়ে এসে প্রণাম করে বলে—আজ যাই বাবা!

—আচ্ছা মা।

—কিন্তু পথের কথাটা বললেন না?

—হাঁ হাঁ। বলব মা নন্দরানী। কাল বলব।

চলে এল নন্দরানী। পরের দিন ভোরে আবার দেখা হল। দুপুরে সে আবার গেল। পথ কী?

সাধু আরম্ভ করলেন পথের কথা। ভাল লাগছিল শান্তির। হঠাৎ একটা বিছে কোন্ কোণ থেকে বেরিয়ে চলে আসছিল সাধুর আসনের দিকে, সেটা নজরে পড়তেই সে ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল—বিছে বাবা, বিছে।

—বিছা! যেতে দাও মা। চলে যাবে।

—না না, ঢুকছে আপনার বিছানার তলায়।

—আরে, যা যা। এ বিছা, যা। হাতে তালি দিলেন তিনি। বিছেটা কোথায় ঢুকে গেল।

শান্তি কিন্তু রাগ করে বললে—উঠুন। উঠুন।

—চলল যাবে মা, বোস। ওরা অন্ধকারে থাকে। তলায় তলায় হাঁটে। যেতে দাও।

—না। উঠুন।

—না মা নন্দরানী। পথের কথা শোন মা। এই যে পথে তুমি চলবে মা, এই পথে চলতে কত এমনি বাধা আসবে বেটী। জান, ধ্রুব তপস্যা করতে গেলেন, ভগবানকে পাবেন। মন্ত্র জানেন না, ক্রিয়া জানেন না, জানেন শুধু ডাকতে। গভীর বনে ডাকেন—কই ভগবান! হে ভগবান—হে ভগবান! কাঁদেন। কখনও বাঘ আসে, ধ্রুব ভাবেন এই আমার ভগবান বাঘের মূর্তি ধরে এলেন। ভয় করেন না, এগিয়ে যান—হে ভগবান! বাঘ অবাক হয়; ভাবে—এ কেমন জীব? আমাকে ভয় করে না! সে পালায়। মা, সর্বজীবে ভগবান আছেন মা। বিছা-ভগবানকে ভয় করব না, তাড়না করব না, সে কেন আমাকে দংশন করবে? তোমাদের রামকৃষ্ণদেব বলতেন—সাধু ভগবান, চোর ভগবান। সব ভগবান। ভগবান বলে ডাক মা—ভালবাস, ভগবান জাগবেন।

অবাক হয়ে গেল শান্তি। এ কী কথা! তার চোখে জল আসে। এ পথ তো সোজা পথ। বেলা গড়িয়ে অপরাহ্ন নামে। পাখিদের ডাকে চমক ভাঙে। মনে মনে বলে, পাখি-ভগবান বলছে—ঘর চল।

সে উঠে প্রণাম করে বাড়ি ফেরবার জন্য পা বাড়িয়েও থমকে দাঁড়িয়ে বলে—বাবা, আপনি একটু উঠুন বাবা, আমি দাওয়াটা পরিষ্কার করে দি। কী জানি বাবা, রাত্রে ঘুমের ঘোরেই বিছে-ভগবানের উপর হাত কি পা পড়ে তো কামড়ে দেবে। বিছে-ভগবান তো মানুষ ভগবান বলে মানে না। বলেই সে খিলখিল হাসি হেসে উঠল।

সাধু বললেন—হ্যাঁ মা, সেই জন্যই তো মানুষের ভগবান মেলে। বিছার মেলে না। ভগবান ওসব দেহে অনন্তশয্যায় ঘুমিয়ে আছেন। মানুষের দেহের শয্যায় তাঁর ঘুম ভাঙে।

শান্তির হাসি মধ্যপথেই বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু সে সারা বারান্দাটা পরিষ্কার করে দিয়ে বাড়ি ফিরল।

এমনি করে চলে দিনের পর দিন। এবং শান্তির সঙ্গে আরও দু-চারটি মহিলা যেতে শুরু করলেন।

সাধু শক্তিপীঠ থেকে সেবারের মত চলে গেলেন। আবারও এলেন। আবারও সেই দুপুরে শান্তি যায়—পথের কথা শুনতে বসে, শুনে কাঁদে। কখনও কখনও হঠাৎ পথ কখন এসে ঘরের দোরে হাজির হয়, শান্তি বলে—একদিনও আপনি আপনার ঘরের জীবনের কথা বললেন না! আপনি মায়ের এক ছেলে, না আরও ভাই ছিল?

—অনেক ভাই মা। তা না-হলে মা কি পথে বেরুতে দিত, না আমি পথে বেরুতাম?

—ক ভাই?

—হিসাব ঠিক নাই মা। দুনিয়ায় যত মানুষ, তত ভাই। সবই মায়ের ছেলে।

শান্তি হাসতে শুরু করে।—আমি কী বোকা!

এর পর একদিন দেখা গেল, শান্তির গলায় তুলসীকাঠের মালা। নাকে তিলক। অনেক রাত্রি তখন, সে ফিরে এসেছে ওই শক্তিপীঠ থেকে। হাতে একটি লণ্ঠন। গ্রামে ঢোকবার মুখে একটা বাড়ির দাওয়ার উপর থেকে কে তাকে প্রশ্ন করলে—কে?

সে উত্তর দিল—আমি শান্তি।

সঙ্গে সঙ্গেই একটা টর্চের আলো এসে তার মুখের উপর পড়ল।

বাড়িটায় ধীরেনবাবু ডেটিন্যুর বাসা। বারান্দায় অন্ধকারে বসে ছিলেন ধীরেনবাবু এবং

গ্রামের দু-তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তার মধ্যে একজন কলকাতা-প্রবাসী পুলিস কর্মচারী। আই. বি. ইন্‌স্পেক্টর। হয় কদিনের ছুটিতে এসেছেন, অথবা ছুটির অজুহাতে কোন তদন্তে এসেছেন। ধীরেনবাবু তখন গ্রামের দুটি ধনীর ছেলেকে বিপ্লবী করবার চেষ্টা করছেন, কথাটা গোপন নেই। সকালবেলা পৌঁছে ইন্‌স্পেক্টর ভদ্রলোক সন্ধ্যায় গল্প করতে এসেছেন ধীরেনবাবুর সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে এসেছেন তাঁর এক বন্ধু, তিনিও কলকাতা-প্রবাসী ব্যবসায়ী, এই গ্রামেরই লোক। তাঁদের দুজনের সঙ্গে আছে বিপ্রপদ। বিপ্রপদ আত্মীয় এবং ওঁদের সেবক। ওঁরা তান্ত্রিক বংশের সন্তান। ইংরিজী লেখাপড়া শিখেছেন, বাড়িতে ইংরিজী মতে ঘর সাজিয়েছেন, খাওয়া-দাওয়াতেও সে মত ঢুকেছে; ইংরেজের চাকর; ইংরিজীতে কথা বলতে পারেন, ইংরিজী লিখতে পারাটাই শিক্ষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলে মনে করেন, ইংরেজের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জাত নেই, পৃথিবীতে কখনও হয় নি—এই ঘোষণাই উচ্চকণ্ঠে করেন। কিন্তু তান্ত্রিক সাধনা তাঁরা ছাড়েন নি। মদ খাব বলে খান না, কালী-তারা নাম জপ করে কারণ করেন। বিপ্রপদ এক্ষেত্রে উত্তরসাধক, সে গভীর রাত্রেও ঘরের চোলাই মদ সংগ্রহ করে এনে যোগায়।

টর্চের আলোটা মুখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিপ্রপদ সামনে এসে শাসনের সুরে বললে—এত রাত্রে তুমি কোথায় গিয়েছিলে? একা?

শান্তির দৃষ্টি বিহ্বল। সে বললে—অ্যাঁ?

—কোথায় গিয়েছিলে এত রাত্রে?

আশ্চর্য হাসি মুখে ফুটে উঠেছিল শান্তির। সে বলেছিল—দীক্ষা নিয়ে এলাম। সাধুবাবা আজ আমাকে দীক্ষা দিলেন।

—দীক্ষা? রাত্রে? প্রশ্ন করলেন এবার আই. বি. ইন্‌স্পেক্টর।

—হ্যাঁ। উনি তাই বলেছিলেন।

—অ!

বিপ্রপদ চীৎকার করে উঠেছিল—রাত্রে দীক্ষা? 'রেতে গোষ্ঠ—দিনে রাস!' চালাকি পেয়েছ?

এতক্ষণ পর্যন্ত শান্তি একটা বিহ্বলতার মধ্যে ছিল। এবার বিপ্রপদের ধমকে সে চমকে উঠল। বিহ্বলতা কেটে গেল। এবং বিস্ফারিত চোখে তীব্রদৃষ্টিতে সে তার দিকে তাকিয়ে যে নীরব উত্তর দিল—তারপর আর কোন প্রশ্ন বিপ্রপদর মুখে এল না। শান্তি তার পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

আই. বি. ইন্‌স্পেক্টর বললেন—সেই এ, মানে জয়াপিসীর দেওর সেই পোস্টমাস্টারের মেয়েটা নয়?

ধীরেনবাবু বললেন—হ্যাঁ। রোজ দুপুরবেলা শক্তিপীঠে যান দেখি। আজ দেখছি রাত্রে।

—আপনাদের সমাজ খুব ভাল মশাই। ফোঁটা-মালার কল্যাণে সব চলে।

—সাধুটা কে? বেটাচ্ছেলে খুব মজা পেয়েছে তো তা হলে?

বিপ্রপদ বললে—সে এক বেটা ভণ্ড। আমরাও প্রথমে ঠকেছি। তবে ঠিক ধরেছিল সুদর্শন। সে প্রথম দিনই বলেছিল—তোমার সঙ্গে দরকার নেই, নেহি মাংতা। খুব কড়া কড়া বাত শুনিয়ে দিয়েছিল।

ইন্‌স্পেক্টরবাবু এবং ব্যবসায়ী ধনী বললেন—বেটাকে এখান থেকে ভাগিয়ে দাও। কালই।

ধীরেন্দ্রবাবু বললেন—দেশ থেকে এই সাধু-পুরোহিত, এদের ব্যবসা বন্ধ করুন। এরা ইংরেজদের চেয়েও কুটিল এবং জটিল। এদেশের জীবনকে ওরা পোকার মত কুরে কুরে খাচ্ছে। ইংরেজ পঙ্গপাল, ওরা ভিতরের পোকা। পঙ্গপাল শস্য দেখে নেমেছে, খাওয়া শেষ করে চলে যাবে। আবারও শস্য হবে। কিন্তু এই পোকা মাটির ভিতরে বাসা গেড়েছে, চিরকাল থাবে।

হেসে ইন্‌স্‌পেক্টর বললেন—ও বেটাকে কাল তাড়াব। দাঁড়ান না। তারপর ওই মেয়েটাকেও।

(গ)

এত সবের আমি কিছুই জানতাম না, শিবনাথ। আমার অবসরও ছিল না। দিন-রাত্রি ওই এক চিন্তায় মগ্ন থাকি। পড়ি। পড়ার একটা বিচিত্র নিয়ম করেছিলাম। শাস্ত্রের বই পড়ি। ভাবি। তারপর পড়ি বিজ্ঞানের বই। অসুবিধে অনেক হয়, তবু পড়ে যাই। যতটা বুঝি, তাই সম্বল করে ভাবি। এ যুগে যারা ইংরিজী ভাষা শিখে চিৎকার করে খবরের কাগজে লেখে তারা নিশ্চয় বলবে ইংরিজী-অশিক্ষিত মূর্খের কথা এগুলো। তাই বলছি—ইংরিজীতে বিজ্ঞান পড়েছি। ওদের দর্শন পড়েছি। কিন্তু তবুও জন্মগত সংস্কার ধ্যান-ধারণা—এর আকর্ষণ কাটাতে পারি নি। খানিকটা সময় একান্ত নির্জনে বসে থাকি চোখ বুজে। ডাকি। রাত্রে আসন করি। বই দেখে যোগাভ্যাস করি। কুম্ভকে শ্বাসরোধ করে বসি, প্রত্যাশা করি মন দেহ নিষ্ক্রিয় হবে—আত্মা নিজেকে প্রকাশ করবেন। এ আকুতি আকুলতা সর্বনেশে। এর উত্তর না পেলে আমি মিথ্যা, আমি ব্যর্থ। বুদ্ধ মিথ্যা, চৈতন্য মিথ্যা, ক্রাইস্ট মিথ্যা : সত্য চেঙ্গিজ খাঁ, নাদির শাহ, আমেদ শা আবদালী! কী সত্য? কী মিথ্যা? অধিকাংশ মানুষ যা চায় না, তাই মিথ্যা? ভাল, আমি যদি শক্তিবলে মানুষ যা চায় না, অথচ আমি চাই—তাই ঘটাতে পারি এবং প্রচণ্ড দমনে তাদের ওই 'চাই না' চিৎকার বন্ধ করে দিতে পারি, তবে তা কেন মিথ্যা হবে? কিসের সঙ্কোচ আমার? কাকে ভয়?

সাধুর সম্পর্কে আগ্রহ আমার ছিল না। আমি সেই প্রথম দিনই বুঝেছিলাম অমৃত রাখতে যিনি স্বর্ণপাত্রের সন্ধান করেন, তিনি অমৃতের সন্ধান পান নি। অমৃত পরম বস্তু, সে মর-জীবকে অমর করে। মাটির ভিতরে সোনা জন্মায় তারই স্পর্শে। আর এই গোটা পৃথিবীই তো মাটির। মাটির পাত্রে যদি অমৃত রাখা না-ই যায়, তবে পৃথিবীতে অমৃত কোথাও থাকতে পারে না, এ তো প্রমাণিত সত্য। সুতরাং সন্ন্যাসীর জন্য কোন আকর্ষণ আমার ছিল না। এদিকেও যেমন আগ্রহ ছিল না, বিপরীত দিকে প্রতিশোধ নেবারও কোন আগ্রহ আমার ছিল না। রাগও আমার ছিল না। এটুকু আমি নিঃসন্দেহে বুঝেছিলাম সাধু সত্যকে না পেয়ে থাকুন, তাঁকে পাবার জন্য নিষ্ঠা তাঁর আছে। তাঁর বুদ্ধিবিচারমত সৎ ছাড়া তিনি অসৎ নন, ভণ্ড নন। এবং তান্ত্রিক, বীরাচারী বা বামাচারীও নন। বৈষ্ণবমতের সহজিয়াপন্থিও তিনি নন।

তাই পরের দিন দুপুরবেলা সদর রাস্তার উপর যখন ওই সন্ন্যাসীকে শাস্তি দেবার হুকুম আমার উপর জারি করলেন ওই দুই স্বেচ্ছা-মনোনীত সমাজপতি, তখন বিস্ময় বোধ না করে

পারলাম না। সকালবেলা বেরিয়ে গেছি নির্জন প্রান্তরে, গাছের তলায় বসে শুধু চিন্তা করেছি আর দেখেছি প্রাণজগতের নিয়ম এবং খেলা ; দেখেছি, আছে শুধু প্রাণধারণের যুদ্ধ, দেহভোগের বিপুল আকুতি এবং উন্মত্ততা, আর মৃত্যুর প্রতি ভয়, পরিশেষে অসহায় আত্মসমর্পণ ; আর কিছু নেই। ঈশ্বর ? এর মধ্যে কোথায় সেই ঈশ্বর—ন্যায়-নীতি-প্রেম-আত্মদানের উৎস বলে আমি খুঁজি ? অবসন্ন তিক্ত মন নিয়েই ফিরছিলাম। গ্রামে ঢোকবার মুখে তোমাদের অন্যতম জমিদার-বাড়ির সামনে পথের উপর এই কলকাতা-প্রবাসী সমাজপতি দুটি দাঁড়িয়ে ছিলেন, সঙ্গে ছিল বিপ্রপদ। আরও একজন ছিলেন—ত্রিপুরারি ঘোষাল। মহাতান্ত্রিক। আই. বি. ইন্‌স্পেক্টর মুরারিবাবুর দাদা। লোকটির অনেক দোষ। মূর্খের আশি দোষ বলে—ত্রিপুরারির দোষ অন্তত পঁচানব্বুই। আমি শুধু দুটো গুণের কথা জানি। প্রথম গুণ, অসাধারণ সাহসে সাহসী। প্রায় ভয়হীন। ভয় তার ঈশ্বরকে আর রাজাকে। আর কাউকে নয়। বাঘ-ভালুককেও নয়। বাঘ ও মেরেছে। আমি সাপ মারি, ত্রিপুরারি সাপ ধরে কৌতুক করে। দাঁত ভেঙে ছেড়ে দেয়। দ্বিতীয় গুণ, লোকটি সরল—বোকা বললেই ঠিক হয়—কিন্তু বিশ্বাসের দৃঢ়তায় সে পাথর। কাঁধে বন্দুক নিয়ে সেও দাঁড়িয়ে ছিল। বন্দুকটা সে বাঘ মেরে পেয়েছিল।

আলোচনাটা হচ্ছিল ওই সাধুকে নিয়েই। আমাকে দেখেই তাঁরা উৎসাহিত পৃষ্ঠপোষকের মত বলে উঠলেন—এই যে! এই একটি মরদ ছেলে গ্রামে রয়েছে, তবু গ্রামে এই অনাচার হয়। আশ্চর্য!

আমি অবশ্যই একটু খুশী হয়েছিলাম বইকি, নইলে দাঁড়ালাম কেন ? অন্য সময় হলে দাঁড়াতাম না। বললাম—কী ? আমাকে বলছেন ?

ত্রিপুরারি বললে—ওকে আজই আমি মেরে ভাগিয়ে দেব, ভাবছিস কেন তোরা ? মজা পেয়েছে বেটা!

অশ্লীল বাক্য বলে কথাটা শেষ করলে ত্রিপুরারি।

বিপ্রপদ বললে—ওই সাধুর কথা বলছি হে। শান্তিকে নিয়ে যা আরম্ভ করেছে, ছি-ছি-ছি!

এদের কাছ থেকে সব কিছুই শুনতে হতে পারে—এটা জেনেও ঠিক সেই কথাটা সেই মুহূর্তে যেন শুনতে প্রস্তুত ছিলাম না। হয়তো বা ওই সাধুর সম্পর্কেই এমন কথা শুনতে প্রস্তুত ছিলাম না। না, ছিলাম না শিবনাথ। সকলের মধ্যেই একটি ন্যায়বাদী সত্তা আছে ; আমার মধ্যে যে ন্যায়বাদী সত্তা, সে এই সত্তার উৎসসন্ধানী ছিল—তাই তার রূপ ছিল কঠোর, ধারালো। সে সর্বাগ্রে বিচার করত নিজের। সেই কারণেই ওই সাধুর বিচারের সময় নিজের ব্যক্তিগত সকল বিরূপতা নির্মূল করে সরিয়ে ফেলে বিচার করেছিলাম। এবং বুঝেছিলাম, আমার সম্পর্কে তিনি যা-ই বলে থাকুন সে কথা আমাকে গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে, কিন্তু এই সন্ন্যাসী ভণ্ডামির আশ্রয় নিয়ে কোন অন্যায় করবেন না। ভ্রান্তি তাঁর হতে পারে, কিন্তু পাপ তিনি করতে পারেন না। মা সম্বোধন করে শান্তির দেহ তিনি ভোগ করতে পারেন না। এবং এতদিন পর্যন্ত যে-সব কুৎসিত রটনা গ্রামে হয়েছে সাধু ও শান্তিকে নিয়ে, তার কিছু কানে এসেছে কিন্তু শুনতে চাই নি—আসেও নি। তাই কথাটা শুনে একটা যেন খোঁচা খেয়েছিলাম। কেমন জান ? একটা ঘৃণিত ধনী ব্যক্তি যদি অতর্কিত লোহার ছাতার খোঁচা দিয়ে অন্তরঙ্গতা জানায় তা হলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি। ওটা আরও অসহ্য হয়েছিল এই প্রসঙ্গে ধীরেনবাবুর নাম শুনে। কঠিন হয়ে উঠলাম আমি এক মুহূর্তে, প্রশ্ন করলাম—পাপ বা মন্দ কিছু করেছেন তার নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছেন ?

সে আমলের পুলিস তান্ত্রিক বাবুটি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—কাল রাত্রি এগারোটার সময় আমরা নিজের চোখে শান্তিকে সাধুসঙ্গ সেরে ফিরতে দেখেছি। প্রশ্ন করলে বলে—ওঁর কাছে আমি দীক্ষা নিয়েছি। উনি আমার গুরু।

এ কথায় অবিশ্বাস হল না আমার। তাই বা কেন—সত্যকে এক মুহূর্তে আবিষ্কার করলাম আমি। দীক্ষার আকৃতি আমি জানি। আমার মন শক্ত হয়ে উঠল। বললাম—গুরু যখন, তখন এতে দোষ কী বলুন? আজও আমাদের দেশে গুরুকরণ রয়েছে। বলুন কার গুরু বাড়িতে না আসেন, এবং কার স্ত্রী-কন্যা-ভগ্নী গুরুর সেবা না করেন? এবং যখন তাঁরা গুরুর পরিচর্যা করেন, কে পাহারা দিয়ে বসে থাকেন? অন্যের গুরুদের কথা আমি জানি না, দেখি নি তাঁদের—কিন্তু এই সাধুটি এই কাজ করতে পারেন বলে আমি বিশ্বাস করি না।

তাঁরা এ উত্তর প্রত্যাশা করেন নি। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। কিন্তু বিপ্রপদ সরোষে প্রতিবাদ করে উঠল—তোমাকে তিনি বলেন নি মাটির ভাঁড়?

—বলেছিলেন।

—তুমি মাটির ভাঁড় আর শান্তি সোনার পাথরবাটি?

—সে তাঁর ধারণা। ভুল হতে পারে আবার সত্যও হতে পারে। আমার ভবিষ্যতে আমি কী করব তা কি আমিই জানি? কিন্তু তবুও এমন অনাচারের লোক তিনি নন। যেমন বহু লোকে নিজেদের তান্ত্রিক বলে, তন্ত্র তন্ত্র বলে চেঁচায়, কিন্তু টাকা আর মাটি সমান বলে দুইই গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়া এঁদের সাধ্য নয়। তন্ত্রের নামে মদ খান, কিন্তু শবসাধনের জন্য পচা শব ছুঁতে পারেন না। ঠিক তেমনি। এ কাজও সাধুর পক্ষে অসম্ভব। তাঁর বয়স হিসেবেও বটে। মানুষ হিসেবেও বটে।

আমি আজও এই জেলখানার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর সেলে বসে অনুভব করছি শিবনাথ, আমি সে-মুহূর্তে এক আশ্চর্য উচ্চ ন্যায়বোধের বেদীর উপর দাঁড়িয়ে কথা বলেছিলাম। সে কথায় দেবতার উক্তির মত আকাশের একটা স্পর্শ ছিল। ওরা সকলে চুপ করে গেল, কিন্তু চিৎকার করে উঠল এবার ত্রিপুরারি। ত্রিপুরারি কানে কালা, বুদ্ধিতে ভোঁতা সুতরাং আমার কণ্ঠস্বরের স্পর্শ অথবা বক্তব্যের যুক্তি কোনটাই তার কাছে কার্যকরী হয় নি। সে চিৎকার করে উঠেছিল—আজ রাতমে—হাঁ আজ রাতমে সাধুকো ভূতকে মাফিক হম ভাগায় গা। দেখেগা কোন্ উসকো বাঁচায়!

আমি ধীর কণ্ঠে বলেছিলাম—আমার সঙ্গে তা হলে দেখা হবে আপনার, এ অন্যায় আমি হতে দেব না। বলেই আমি চলে এলাম। সঙ্গে সঙ্গেই সংকল্প স্থির করে ফেললাম, আজ রাত্রে শক্তিপীঠে গিয়ে অলক্ষ্যে সাধুকে পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকব।

রান্নাবান্না নিজেকেই করতে হত। বাজার-হাটের কাজটা করে দিত নিশি চোর। নিশি সাধু হয় নি, তবে তখন কিছুদিন চুরি ছেড়েছিল। এক বেলা আমার কাছে খেত। স্নান সেরে বালতি করে জল নিয়ে বাড়ি এসে দেখি, খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে শান্তি।

বাইরে থেকেই শুনলাম নিশি বলছে—বাবুদাদা যদি বলে থাকে ঠাকরুন, তবে তুমি নিশ্চিন্তে থাক। ঘুম যদি আসে, তবু সে পথ ছাড়বে না।

কোন উত্তর শুনতে পাই নি। বোধ করি সহজভাবে উত্তর দেবার মত শক্তি শান্তির ছিল না। আমি ঘরে ঢুকতেই আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে গিয়েও বলতে পারল না। ঠোঁট দুটি শুধু থরথর করে কেঁপে উঠল। আমারও বিস্ময়ের অবধি রইল না। মনে হল, এ সে শান্তি তো নয়! এত রূপ তো তার ছিল না! এ যেন এক অপরূপা এসে আমার সামনে

দাঁড়িয়েছে। বিষাদ এবং বৈরাগ্যের একটি নিজস্ব মাধুর্য আছে শিবনাথ; যেন গোধূলির আলোর মত; সে আলো যখন রূপের উপর পড়ে, তখন রূপ হয়ে ওঠে অপরূপ। আমিও কথা বলতে পারি নি। কথা ধরিয়ে দিয়েছিল নিশি। সে বললে, ঠাকরুন এসেছে, শুনেছে তিপু ঘোষালবাবুরা নাকি সাধুবাবাকে মারবে, খুন করবে বলেছে। আপনাকেই বলেছে। তাই—

ততক্ষণে দুটি জলের ধারা তার চোখ বেয়ে নেমে এসেছে। নিশির কথা শেষ হতেই সে বলে উঠল—কী হবে সুদর্শনদা?

আমি বললাম—কী হবে তা জানি না, তবে আমি থাকতে ওঁর গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে না। আমি রাত্রে শক্তিপীঠে যাব, জেগে থাকব।

নিশি বলে উঠল—বাস্ ঠাকরুন, আর যমের অধিকার নেই। তুমি নিশ্চিন্তি হয়ে বাড়ি যাও।

শান্তি বললে—আমিও যদি থাকি?

—সে তোমার ইচ্ছে শান্তি। আমি কিছুই বলব না। কারণ আমি তোমার জন্যে তো যাব না পাহারা দিতে, সন্ন্যাসীর জন্যেও ঠিক নয়, আমি যাব এ অন্যায় হতে দেব না বলে।

—কিন্তু কদিন পাহারা দেবে তুমি?

—আজ দেব। কাল ওঁকে বলব—হয় চলে যাবেন, নয় নিজের দায়িত্বে থাকবেন। আমি উপলক্ষ শান্তি। রক্ষা কেউ কাউকে করে না। উনি দীর্ঘদিন একা পথ চলেছেন, বনে পর্বতে দুর্গমে হেঁটেছেন, থেকেছেন—কে রক্ষা করেছে?

—কিন্তু আমি কী করব? উনি তো কারুর ভয়ে যাবেন না।

আপনিই আমার মুখে এসে গেল কথাটা। বললাম—শান্তি, তুমি ওঁর কাছে দীক্ষা নিয়েছ, উনি তোমার গুরু। গুরু যখন, তখন ওঁকে তুমি তোমার বাড়িতে আনো না। কেন তুমি লোকের কথা গ্রাহ্য করবে? তখন তুমি নিজে পাহারা দিতে পারবে। অন্তত প্রাণটা দিতে পারবে। অবশ্য আমি তার আগে দেব।

—তুমি বলছ? চোখের দৃষ্টিতে তার দীপ্তি ফুটে উঠল।

—হ্যাঁ, বলছি।

—জানি না উনি আসবেন কিনা, উনি সন্ন্যাসী।

—তুমি শিষ্যা। তিনি যখন গৃহীকে শিষ্যা বলে স্বীকার করেছেন, তখন তোমার গৃহে আসবেন না কেন?

যুক্তি সে খুঁজে পেল—মুখ তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলে উঠল—আমি বলি গে?

—যাও।

যেতে গিয়ে সে ফিরল। বাইরের দরজার মুখ পর্যন্ত গিয়ে ফিরল—ফিরে এসে দাওয়ার নীচে খুঁটিতে হাত ধরে দাঁড়াল। বললাম—কী?

চুপ করে রইল। একটু হাসি খেলা করছিল মুখে। আবার প্রশ্ন করলাম—বল, কী? আবার ফিরলে কেন?

হঠাৎ ছোট মেয়ের মত হেঁট হয়ে আমার পা ছুঁয়ে কপালে বুলিয়ে সে প্রায় পালিয়ে গেল।

আবার এল ঘণ্টা-দুয়েক পরে।—বাবা এসেছেন সুদর্শনদা! বললেন, সে ঠিক বলেছে মা, আজ তোমার ঘরে গিয়ে তোমার সেবা নেবার দিন এসেছে। চল, যাই। বলে চলে এলেন। কম্বল দুটো গুটিয়ে আমার মাথায় চাপিয়ে দিলেন। বললেন, এটা তুমি মাথায় করে নিয়ে চল।*

হেসে বললাম—খুব ভাল। গুরু গুরুর মতই কাজ করেছেন। তুমি যাও, নির্ভয়ে পরমানন্দে সেবা কর; কোন বিপদ ঘটলে সর্বাগ্রে আমি গিয়ে দাঁড়াব।

তবু সে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললাম—কোন ভয় নেই তোমার। তুমি নির্ভয়ে চলে যাও। তোমার বাড়ি তো কাছেই।

এতক্ষণে সে বললে—তুমি একবার এস।

—কোথায়?

—বাবা তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাইছেন। বললেন, মা তুমি ওকে একবার ডাক।

আমি বললাম—না। তা আমি যাব না, শান্তি। আমি যা করছি মানুষের কর্তব্য, ধর্ম বলেই করছি। এর জন্যে তোমার সাধুবাবার বা অন্য কারুর কোন কৃতজ্ঞতা আমার পাওনা নয়, তা আমি চাইও না।

সে অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বোধ করি ভয়ও পেয়েছিল, কথাগুলি তার কাছে পূর্ণ-বোধগম্য হয় নি বলে। একটু দাঁড়িয়ে থেকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিষণ্ণ পদক্ষেপে সে চলে গেল।

বিকেলবেলা সে আবার এল। এবার সংবাদ বিচিত্র। গ্রামের বড়বাবুরা সংবাদ পেয়ে দুজন দারোয়ান পাঠিয়েছেন সাধুকে পাহারা দেবার জন্য। কারণ, আই. বি. ইন্‌সপেক্টরবাবুর সঙ্গে তাঁদের প্রতিষ্ঠার বিবাদ। যেখানে তাঁরা শাস্তি দিতে উদ্যত, সেখানে এঁরা অবশ্যই রক্ষার জন্য হস্ত প্রসারণ করবেন। এটা নূতন নয়, এ বিবাদের কথা তুমি জান। সংসারে সকলেই বোধ হয় এর স্বরূপ জানে। কারণ, সর্বত্রই ঘটে এটা। কিন্তু সাধু শান্তিকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন, বলেছেন—মা, ভরসা তো ভগবানের। তবু মানুষের ভরসা যদি করতে হয়, তবে ওই নওজোয়ানের ভরসায় আমি এসেছি। সে যদি বলে—ওরা থাক মা, তবে থাক; আর যদি বলে—না, তবে না। বলে দাও দরকার নেহি।

আমি বললাম—বলবে তুমি শান্তি। আমি বলব না। তুমি যদি চাও তো ওরা থাক।

—তুমি?

—আমার মুক্তি।

—তা হলে তুমি যাবে না?

—না। দরকার তো নেই।

—না। ওদেরই তা হলে চাই নে আমি। তুমি না গেলে হবে না। আমি ভয়ে মরে যাব। কিন্তু উনি যে তোমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছেন।

—না শান্তি। সে আমি যাব না।

শান্তি চলে গেল এবং কয়েক মিনিটের মধ্যে আবার ফিরে এল। বাইরের দরজা থেকে ডাকল—সুদর্শনদা!

আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম শিবনাথ। এই মেয়েটা আমাকে এমন করে জড়িয়ে বাঁধতে চাচ্ছে যে আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে।

গম্ভীরভাবে উত্তর দিলাম, কী? ভেবে রাখলাম, এবার ও যা বলবে তাতে বলব—এমন করে তুমি আমাকে বিরক্ত কোর না। আমি যা করছি, তা আমার অন্তরের নির্দেশে কর্তব্য বলে করছি। কারও প্রতি স্নেহমমতা আমার নেই।

উত্তর শান্তি দিলে না, গম্ভীর মধুর কণ্ঠে উত্তর এল—আমি এসেছি ভাই, তোমার সঙ্গে দেখা করতে।

সন্ন্যাসী! তিনি নিজে এসেছেন? এ আমি কল্পনা করতে পারি নি। সমস্ত শরীর মন মুহূর্তে যেন অবসন্ন পঙ্গু হয়ে গেল।

—তোমার কাছে আমি কসুর মানতে এসেছি—মার্জনা কর হামাকে। সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি মাত্র হ্যারিকেনের আলো-আঁধারির মধ্যে দীর্ঘকায় সন্ন্যাসী হাতজোড় করে আমার সামনে দাঁড়ালে।

কত স্তম্ভিত হলাম জান? একটা বিরাট পাহাড় সচল হয়ে এসে সামনে করজোড়ে দাঁড়ালে যত স্তম্ভিত হতাম, ঠিক ততখানি। না, তার থেকেও বেশী। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই আত্ম-সম্বরণ করে বললাম, না না, আমাকে এভাবে আপনি অপরাধী করবেন না।

প্রণাম করতে গিয়েও প্রণাম করতে পারলাম না। সন্ন্যাসী হাত চেপে ধরলেন, বললেন —বল ভাই, নমো নারায়ণায়। তুমি প্রণাম কোর না সবার মত। ভাই, সেদিন অন্ধকারে ভালো দেখতে পাই নি তোমাকে। আমার নিজের চিত্তও স্থির ছিল না। যত ক্লান্তি ছিল, তত দেহ অসুস্থ ছিল। আর তিক্তও ছিল মন। ভাবতে ভাবতে আসছিলাম কী জান? ভাবছিলাম—সারাজীবন তো চলে গেল ভাই, কিন্তু যা ঢুঁড়লাম, তা তো মিলল না। ভ্রম হয়ে গেল, তোমাকে বললাম—মৃৎপাত্র।

শান্তি অবাক হয়ে দেখছিল। সন্ন্যাসী আমার কাছে এমন নত হবেন সে কথা আমিহ ভাবি নি শিবনাথ তো সে কী করে ভাবতে পারবে? তবু সে এবার বললে—বাবা, এইবার ওকে আপনি দীক্ষা দিন।

—না মা। ওর গুরু আমি নই। হয়তো আপনিই তিনি আসবেন; নয়তো অন্তর থেকেই একদিন জাগবেন।

চলে গেলেন সাধু।

আমি রাত্রে গিয়ে শান্তির বাড়ির দোরে দাঁড়ালাম। দরজায় আঘাত দিয়ে শব্দ করতে হল না, 'শান্তি' বলে কণ্ঠস্বর তুলে ডাকতে হল না, আমার পায়ের শব্দ শুনেই দরজার ওপাশ থেকে মৃদুস্বরে প্রশ্ন হল—কে?

হেসে আমি বললাম, ভয় নেই শান্তি, আমি সুদর্শন।

দরজা খুলে দিলে। প্রসন্ন হেসে বললে—ভেতরে এস। বাড়ির বাইরে দারোয়ানের মত পাহারা দেবে তুমি? মা গোঃ! কাণ্ড দেখ দেখি, দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবে! বাবা বললেন—

—কী বললেন?

—বললেন, ও সামান্য নয় মা। ও আকাশে ছুটলে আকাশ আলো করে দেবে; আর মাটিতে মাথা ঠুকলে দুনিয়া ফাটিয়ে ভিতরে ঢুকে যাবে, মা।

আমি হাসলাম। এক মুহূর্তের জন্য। মুহূর্তের মধ্যে মনে হল, আমার অসমসাহসী মন বললে, আমি তো বিবেকানন্দ হতে পারি। হ্যাঁ, তা পারি। যদি রামকৃষ্ণের মত গুরু পাই তবে তাঁকে স্মরণ করে ওই নাস্তিক্যবাদের দেশে গিয়ে তো বলতে পারি—শোন তোমরা, ঈশ্বরের বার্তা আমি বহন করে এনেছি, শোন; তাঁর কথা আমি শোনাব।

বোধ করি স্বপ্নাতুর হয়ে উঠেছিলাম। মিনিট খানেকের জন্যে আমার দেহে রোমাঞ্চ হয়েছিল, চোখে পলক ছিল না—হয়তো বা শ্বাস-প্রশ্বাসও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শিবনাথ, কখনও কি তুমি মনে মনে স্বপ্ন দেখ নি, তুমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হবে,—গান্ধী হবে, রবীন্দ্রনাথ হবে; দেখ নি? নিশ্চয় দেখেছ। অগ্নির একটা স্ফুলিঙ্গ, সেও তো গোটা একটা অরণ্য

ব্যাপ্ত করে দাউ দাউ করে জলবার স্বপ্ন দেখে। যে দেখে না, সে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নয়—ছাই, অথবা জোনাকি পোকা, একটু ফসফরাস। গত পঞ্চাশ বছরের গোটা জাতকে স্মরণ কর; তা হলেই সেই মুহূর্তের আমাকে বুঝতে পারবে। আমি গীতা মাথায় নিয়ে শুয়ে থাকতাম।

প্রদীপ হাতে শান্তি আমার সেই মুখের দিকে বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে ছিল। কথা বলতেও সাহস হয় নি। আমি চোখ নামাতেই সে বলেছিল—তুমি—তুমি—

আমি বলেছিলাম, চল। 'তুমি' 'তুমি' বলে সে কি বলতে চাচ্ছিল জিজ্ঞাসাও করি নি।

উপরতলায় পিছন দিকে একখানি ঘরে সন্ন্যাসী তাঁর আসন করে ছিলেন; কারণ, ঘরখানি শান্তির পূজার ঘর। ঘরখানি সংকীর্ণ, একটি মাত্র জানালা, কিন্তু সীতারাম সাধু বলেছিলেন —ও ঘর ছাড়া অন্য ঘরে আমি থাকব না মা। এ ঘরে দেবতা আছেন তোমার—তাঁদের আশ্রয়ে দেবস্থলেই থাকা হবে। অন্য ঘরগুলি গৃহীর গৃহ। তিনি জপ করছিলেন। শান্তি আমার বিছানা করেছিল নীচে ঠিক সামনের ঘরে। পরম যত্নে পরিপাটি করে পাতা বিছানা। ধবধবে ধোওয়া চাদর, ঝালর-দেওয়া বালিশ, একখানি নরম তোশক।

আমি বললাম, এ সব কী? এই বিছানায় শুয়ে কি পাহারা দেওয়া যায়? এ যে দেখেই ঘুম পাচ্ছে।

সে বললে—তারা কেউ আসবে না। তুমি এসেছ। কণ্ঠস্বরে তার পরম নির্ভরতার আশ্বাস ফুটে উঠল। আমিও অবশ্য তা জানতাম। ত্রিপুরারি ঘোষাল—বাইরে পথে হয়তো লড়াই করে পরখ করতে পারে, কিন্তু রাত্রে চড়াও হয়ে মারতে আসবার মত সাহস তার নেই। আইনকে, রাজশক্তিকে তার বড় ভয়। তবুও আমার কাজ আমি করব। জেগেই বসে রইলাম। পাশের ঘরে সেও বসে রইল। সাধুর জপ শেষ হলে তিনি ডাকলেন। তাঁর নিজের কথা বললেন। তাঁর সন্ন্যাসের কথা, বাল্যের কথা, এখানে এসে এই শান্তির সঙ্গে বন্ধনের কথা, আরও অনেক কথা। সে কথা আগে বলেছি শিবনাথ।

কথা শেষ করে তিনি শুলেন। আমি ফিরে এলাম।

রাস্তা-ঘর অর্থাৎ দরজা খুলে বা ভেঙে ঢুকবার মুখের ঘরে একখানা মাদুর পেতে নিয়ে শান্তিকে বললাম—তুমি ঘুমোও।

—তুমি জেগে বসে থাকবে, আমি ঘুমোব?

—সাধু ঘুমিয়েছেন। আমি নিজেই তোমাদের আগলাবার ভার নিয়েছি। তুমি ভিতরে গিয়ে শোও। ভিতর থেকে দরজাটা বন্ধ করে দাও।

—আর একটু জেগে থাকি। তারপর শোব।

আমি গীতা পড়তে আরম্ভ করলাম। পড়তে পড়তে আমিই ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ কিছুতে আমার পা ঠেকে আমার ঘুম ভেঙে গেল। উষ্ণ, কোমল কিছু। একটু মাথা তুলে তাকিয়ে দেখলাম। যা দেখলাম, তা জীবনে এমন করে দেখি নি।

অনাবৃত-উর্ধ্বাঙ্গ নারীদেহের তরুণ যৌবন আমার পদপ্রান্তে রাত্রের কুমুদ-কহ্লারের নৈবেদ্যের মতই যেন কেউ নিবেদন করে দিয়েছে। লণ্ঠনটা জলছিল তার মাথার কাছেই। তার আলো পড়েছে মুখে, বুকে। আলোটা গরম হয়েছে; মধ্যে মধ্যে দপদপ করে উঠে সে রূপকে যেন ইঙ্গিতময় করে তুলছে। শান্তি ভিতরে যায় নি। সে আমার পায়ের তলায় এমন জায়গায় শুয়েছে—যেখানে প্রথম পা পড়বে বাইরের আগন্তুকের।

শিবনাথ, মুহূর্তে যেন তাণ্ডব নৃত্য শুরু হল আমার দেহের কোষে কোষে। আমার মন, আমার চিত্ত বুকের ঘরে ভয়ার্ত হয়ে খিল দিয়ে দ্বার রুদ্ধ করতে চাইলে; বাইরে—অর্থাৎ

দেহের রোমকূপে-কূপে শ্রাবণ-রাত্রের বর্ষণ এবং বাতাসের সব-ভাসানো, সব-ওড়ানো প্রচণ্ড মাতন আরম্ভ হয়ে গেছে। চোখ বন্ধ করতে চাই, কিন্তু পারি না—চোখের পলক ঝড়ে খিল-ভাঙা জানালার মত কামনার তাড়নায় খুলে যায়; আমার হাত এগিয়ে গিয়ে তাকে স্পর্শ করতে চায়, কিন্তু তাও পারি না। আমার ঘরের লোহার দরজা খোলে না, নিজে অবশ, উঠতে পারি না। দেহ এবং মনের এমন সুস্পষ্ট দ্বন্দ্ব আমি আর কখনও অনুভব করি নি।

দেহ বললে: তোমার পায়ের তলায় নৈবেদ্যর মত নিজেকে সঁপে দিয়েছে, তুমি তুলে নাও।

মন বললে, ও অমৃত নয়, ও নিয়ে কী করবে?

দেহ বললে, ওই অমৃত। আস্বাদন করে দেখ। তুমি মূর্খ। অলীক অমৃতের জন্য উন্মাদের মত ঘুরছ! এই পৃথিবীতে সে অমৃত নেই। এই সত্যকারের অমৃত। এরই মধ্য দিয়ে তো পুরুষানুক্রমিকতার অমর ধারায় তুমি বেঁচে থাক।

মন বললে, পুরুষানুক্রমিকতার ধারার মধ্যে বাঁচে জীব। যে জীবের চেতনা আছে, চৈতন্য নেই। মানুষের মধ্যে জীবন চেতনা পার হয়ে চৈতন্যে এসেছে। সেই চিনিয়েছে নারীকে পুরুষকে শত পরিচয়ে। এ পরিচয় সত্যের চেয়ে বড়। সৎ।

দেহ বললে, ওরে জ্ঞানী মূর্খ, তুই পুরুষ ও প্রকৃতি। প্রকৃতি আর পুরুষের মধ্যে বিশ্ববিধানগত সম্পর্ক একটি মিলনের। জাতি নেই, ধর্ম নেই, কিছু নেই।

মন বললে, না। ওই সরলা মেয়ে পরম বিশ্বাসে—

বাধা দিয়ে দেহ বললে, মূর্খ, সে বিশ্বাসের গভীরে আছে তোমাকে কামনা। নইলে এইভাবে তোমার পায়ের তলায় অনাবৃত দেহে নিজেকে নিবেদন করে?

মন এবার হেরে গেল। এবার সে ভয় দেখালে। বললে, না। চিৎকার করবে। আপত্তি করবে—

দেহ বললে, আয়ত্ত কর তুমি, মুখ চেপে ধর।

মন বললে, না। না। এবার সে চীৎকার করে উঠল। হেরে-যাওয়া মানুষের অসহায় অবোধ অসম্মতির মত। সে বললে, পালাও। পালাও।

কিন্তু পালিয়ে যাবার পথ ছিল না। শান্তি শুয়ে আছে দরজার মুখে। কপাট জোড়াটায় তার পিঠ লেগে রয়েছে।

আমি শুয়ে ছিলাম দরজার দিকে পা রেখে, মাথা ছিল ঘরের ভিতরের দেওয়ালের দিকে। একটু হিসেব করে এইভাবে বিছানাটা আমি ঘুরিয়ে নিয়েছিলাম। যদি রাত্রে কেউ আসে এবং দরজায় হানা দেয়, তবে উঠে বসেই আমি নিরাপদ দূরত্ব থেকে দরজাটার সামনাসামনি দাঁড়াতে পারব। যদি দরজার ফাঁক দিয়ে কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্র দিয়ে খোঁচা মারে, তবে সেটা মাথায় লাগবে না, পায়েই লাগবে। আমার পা এবং দরজার মধ্যে একফালি জায়গা পড়ে ছিল। রাত্রে আমাকে নিরাপদ করবার জন্য শান্তি দরজায় পিঠ লাগিয়ে আমার পায়ের সামনে বুক পেতে কখন এসে নিশ্চিন্ত হয়েছে। তার মধ্যে ওর গভীরতম মনে যদি এমন পুরুষের কাছে প্রকৃতির আত্মনিবেদনের গোপন বাসনা থাকে তো জানি নে। অবিশ্বাস আমি করব না। যে সত্য আমি সেই মুহূর্তে সর্বাঙ্গ দিয়ে অনুভব করেছিলাম, যে সত্যের প্রবলতম তাড়না আমার শিরায় শোণিতে স্নায়ুতে, নখ হতে চুল পর্যন্ত সর্বাঙ্গে আমি অনুভব করেছিলাম, তাকে আমি অস্বীকার করব কী করে?

তবুও এ কথা বলব যে ঠিক সমান সত্য—মন, আমার অলীক অমৃত-সন্ধানী মন, তবুও হার

মানে নি। সেই মন তবু বলেছিল, না, আমি মানুষ। মানুষের জীবনে পুরুষ আর প্রকৃতির মিলনে দেহধর্ম বড় নয়, মনোধর্ম বড়। উমার সঙ্গে শঙ্করের মিলন কামদেব ঘটাতে পারেন নি। ঘটেছিল তপস্যায়। মনের আকর্ষণে এ মিলনের প্রারম্ভ, দেহমিলন তার মধ্য, সন্তানের গ্রন্থিতে গৃহমিলনে তার পূর্ণতা। আমি সভ্য মানুষ, আমি সাধক মানুষ। আমি পশু নই।

জোর পেয়েছিলাম মনে। সন্তর্পণে তার কপালে একটি আঙুল রেখে ঠেলা দিয়ে ডেকেছিলাম, শান্তি! শান্তি!

সে চোখ মেলে আমাকে দেখে নিদ্রালুতার মধ্যেই একটু হেসেছিল। প্রসন্ন সে হাসি। কিন্তু সে প্রসন্নতা, শুধুই প্রসন্নতা, তার কোন ভাগবত ব্যঞ্জনা নেই, ঘুমভাঙা শিশুর মুখের প্রসন্নতার মত। তখনও তার খেয়াল নেই যে তার অনাবৃত দেহ আমার চোখের সম্মুখে, আমি দেখছি।

আমি বললাম, ওঠ। ওঠ।

ধড়মড় করে উঠে বসল সে।—কেন?

—ভয় নেই। রাত্রি শেষ হয়েছে। আমি চলে যাব। দরজাটা খোল। আমি চলে গেলে দরজাটায় খিল দিয়ে দেবে।

তখনও তার স্খলিত অঞ্চল মেঝের উপর তেমনি লুটিয়ে পড়ে আছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা আকস্মিক ঘটনা ঘটে গেল। লণ্ঠনের আলোটা দপ করে উঠে এবার নিবে গেল। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে সব যেন হারিয়ে গেল। চকিত চমকে অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে সে আমাকে সবলে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বলে উঠল, না। না। তুমি যেয়ো না।

প্রথম 'না'-টিতে ছিল ভীতার্তের সভয় আবেদন; দ্বিতীয় 'না'-টিতে তা ছিল না। তারপর সে বললে, তুমি যেয়ো না। তার মধ্যে যে আবেদন, সে নারীর আবেদন, শিবনাথ। আদিম অন্ধকারে পুরুষের কাছে প্রকৃতির সলজ্জ আত্মনিবেদনের আকুতি আমাকে থরথর করে কাঁপিয়ে দিলে। ওঃ, সে কী মুহূর্ত! আমি তাকে মুহূর্তের জন্য সবলে আমার বুকে জড়িয়ে ধরে পিষ্ট করে দিতে চেয়েছিলাম। তার উত্তপ্ত ঠোঁট দুটির উপর আমার উত্তপ্ত ঠোঁট দুটি দিয়ে তার জীবন-রস পান করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে একটি, বা কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র।

তারপর সেও সভয়ে বলে উঠল—না, না। ছাড়।

আমি তাকে ছেড়ে দিয়ে দরজাটা খুলে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লাম। ছুটে পালালাম। কিন্তু এই কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে কত যে কথা জানাজানি, কত দেওয়া-নেওয়া হয়ে গেল, তার যেন পরিমাপ নেই।

শিবনাথ, সেই রাত্রেই অর্থাৎ সেই ভোরেই আমি গৃহত্যাগ করলাম। গ্লানির সীমা ছিল না। এ কী করলাম আমি! বলে গেলাম নিশিকে, ওরে, আমি চললাম। সে বললে, কোথায় দাদাবাবু? আমি বললাম, জানি না রে। আজ থেকে আমি সন্ন্যাসী হলাম। ধান কটা তুই নিস। আমি একটা লিখে দিয়ে যাই, তুই থানায় দেখিয়ে নিয়ে নিস। নিশিই আন্দাজ করেছিল গত রাতটা যখন সন্ন্যাসীর সঙ্গে কাটিয়েছি তখন তিনিই এ দীক্ষা দিয়েছেন।

লোকে তা-ই বিশ্বাস করে বলেছিল, সন্ন্যাসীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছিলাম। সন্ন্যাসী থাকলেন, আমি চলে গেলাম, এর অর্থও তারা আবিষ্কার করেছিল। সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই গৃহত্যাগ করতে হয় যে। সুতরাং আমি সেই ভোরেই চলে গেছি; সন্ন্যাসী পরে

আসবেন। সন্ন্যাসী কী ভেবেছিলেন, সে শুনেছিলাম শান্তির কাছে অনেক পরে, সে সেই সময়ের কথার সঙ্গেই বলব। মোট কথা আমার সন্ন্যাসের সঙ্গে ওই সীতারাম সাধুর কোন সম্পর্ক ছিল না। যে আমাকে দীক্ষা দিতে ভরসা করে না, তার সঙ্গে কোথায় যাব আমি? আমি খুঁজছিলাম অমৃতের পথ। ঈশ্বরের সন্ধান। একাই চলেছিলাম আমি। ফিরেছিলাম মাস ছয়েক পর। এবার এখানকার সব বিক্রি করে চলে গিয়েছিলাম। আমার ভাগ্য, শান্তি তখন এখানে ছিল না। সে চলে গিয়েছিল তার গুরুর সঙ্গে তাঁর আশ্রমে। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে সব বিক্রি করে চলে গিয়েছিলাম। এসব খবর সঠিক জানে নিশি চোর। সম্পর্ক বলতে তার সঙ্গেই ছিল। ধীরেনবাবুও জানতেন বোধ হয়। তিনি খবর রাখতেন।

(ঘ)

এর পর পাঁচ বৎসর জুড়ে এক অধ্যায়।

শুধু ঘুরলাম, ঘুরলাম, ঘুরলাম। কেদারনাথ, বদরীনারায়ণ, মানসসরোবর, কৈলাস; কাশ্মীরে অমরনাথ, থেকে কন্যাকুমারী, দ্বারকা থেকে নীল-পর্বতে; কামরূপ ঘুরে এলাম, খুঁজে এলাম। পাহাড়-পর্বত, অন্তহীন অরণ্য। কত দগ্ধ প্রান্তর, কত মরুভূমি ঘুরে দেখলাম। মন্দিরে মন্দিরে দেবতা দেখলাম, কোথাও অবয়বহীন শুধু শিলা, কোথাও নিপুণ ভাস্করের হাতে তৈরি অপরূপ মূর্তি; কিন্তু শিলাখণ্ডই হোক আর দেবমূর্তিই হোক—তার মধ্যে দেবত্ব কিছু নেই। হিসেব শুনেছি, কোন স্মরণাতীত কাল থেকে কতজনের কত অভীষ্ট পূরণ হয়েছে; কতজন সাক্ষাৎ দর্শন পেয়েছেন; কত পুরাণকথার মত কথা। আমি, শিবনাথ কোনখানে কোন আভাস পাই নি। আবার যুগে যুগে কত দেবতাকে কত বীর্যবান হিংস্র আক্রোশে ভেঙে দেখতে চেয়েছে কোথায় দেবতা? পায় নি।

কিন্তু তবু মানুষের কী বিপুল আকুতি শিবনাথ তাঁকে খোঁজার! বদরীনাথের পথে খঞ্জকে যেতে দেখেছি বুকে হেঁটে, অন্ধকেও একখানি লাঠি সম্বল করে ফিরতে দেখেছি, তারা সেখানে পৌঁছেছে আবার ফিরেছে। যাত্রীরাই তাদের নিয়ে গেছে হাত ধরে, তারাই তাদের খাইয়েছে। মনে মনে স্বীকার করেছি, হ্যাঁ, এখানে একটা ঈশ্বরের নিয়মের মত নিয়ম আছে। তা আছে। ফেরার পথে অন্ধকে জিজ্ঞাসা করেছি, দর্শন্ হল? সে বলেছে—হাঁ মহারাজ, বদরী-বিশালা, তার অঙ্গনে গেলাম, দর্শন হবে না?

—চোখ নেই, দেখলে কী করে? কী দেখলে?

—মনে দেখলাম মহারাজ। সে তো মুখে বলা যায় না। তবে আসছে জন্মে আমার চোখ হবে, তখন আবার এসে দেখে যাব। নারায়ণ বলেছেন, হ্যাঁ।

মনে মনে হেসেছি, মর্মান্তিক তিক্ত হাসি। হ্যাঁ, এই উত্তরটা এবার পেয়েছি বলে। এজন্মে হল না, আগামী জন্মে দেখা হবে। পৃথিবীর মানুষের পুরুষের পর পুরুষের ধারা ওই একই ভাবে আগামী জন্মে ঈশ্বরদর্শনের, ঈশ্বরকে খুঁজে বের করার প্রত্যাশায় চলেছে।

আবার এই পথে ভ্রমণবিলাসীদের বহু আয়োজন সঙ্গে ঘুরতে দেখেছি, মানুষের কাঁধে চেপে ধনীকে পুণ্য অর্জন করতে দেখেছি, নারী-বিলাসীকে এই পথেই নারীর পশ্চাতে ছুটতে দেখেছি।

তবুও বলব, শিবনাথ, এসব সত্ত্বেও জীবনের সেই অজানাকে জানার সন্ধানেই এ পথে মানুষ পুরুষানুক্রমে হেঁটে চলেছে। পেয়েছে কেউ ? আমার উত্তর, না। কারণ আমি তো পেলাম না।

এক সন্ন্যাসী বলেছিলেন, তিনি হিমালয়ের অরণ্যের মধ্যে আজ দীর্ঘদিন কাটিয়ে দিয়েছেন, বসে বসে হিমালয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে। ওই যে বিরাট, ও বিরাটকে দেখে আমিও স্তম্ভিত হয়েছি, কয়েক দিনই আহার-নিদ্রা ভুলে বুঝি ঈশ্বরকে আবিষ্কার করলাম বলে স্পন্দিত বুকে নির্নিমেষ চোখে চেয়ে থেকেছি। কিন্তু কয়েকদিন পরেই সে স্তম্ভিত ভাব কেটে গেছে। সন্ন্যাসী বলেছিলেন, বাবা, সমুন্দরের অন্দরে ঘূর্ণি আছে জান ? সে ঘূর্ণি কী করে হয়, সে থাক। এখন আমি যদি বলি বাবা, ওই সমুন্দরের থোড়া পানি সমুন্দরকে দর্শনের জন্য পাক দিয়ে নীচের দিকে নামছে, আর বুক চাপড়াচ্ছে কাঁহা সমুন্দর, কাঁহা সমুন্দর বলে, তা হলে যা হয় তুমি তো তাই জিজ্ঞাসা করছ বাবা।

আমি ঘাড় নেড়েছিলাম, ও হল না। উপমায় প্রশ্নের উত্তর হয় না মহারাজ। রাম কেমন, এর উত্তর শ্যামের মত নয়, বাবা। আমি রামকেও জানি না, শ্যামকেও জানি না। হয় রামকে দেখাও, নয় শ্যামকে দেখাও। শুনুন বাবা, আমি বিরাট, বিপুল, অপরূপ—এসবের মধ্যে বিস্ময়কর ঈশ্বরকে খুঁজছি না। আমি খুঁজছি আমার মূলকে, যিনি আমার মত কথা বলবেন অথবা নিজের সকল আবরণ উন্মোচন করে দেখাবেন নিজেকে এবং তারই মধ্যে জানব সমস্ত কিছুকে। আমি বিংশ শতাব্দীর মানুষ, ওতে আমার পরিতৃপ্তি নেই। . হবে না।

চলে এসেছিলাম তাঁর কাছ থেকে।

বিংশ শতাব্দী না হলে, অন্য রকম হত আমার জীবনে ; আমিই অন্য রকম বলতাম। আমার মন ওই বিরাট, ওই অপরূপের মধ্যে মগ্ন হয়ে থেকে যে আনন্দ পেত, তাকেই ঈশ্বর-দর্শনের স্বাদ বলে মেনে নিত। কিন্তু আমি তা কী করে পারব ? আমি যে বিংশ শতাব্দীর মানুষ। তিনি আমার উপর ক্রুদ্ধ ঠিক হন নি, তবে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, বলেছিলেন, দোষ তোমার নয়, দোষ এই কালের। বাবা, আমি কী জানি, কী বুঝি জগৎজীবন-স্রষ্টার প্রত্যক্ষ প্রমাণের কথা, যা তোমার কাল চায় ; তবে অনুভবে বুঝি তিনি আছেন, সেই অনুভবে আমার আনন্দ আছে। নিরানন্দ, অশান্তি নেই। এইটুকুই আমার সম্বল, এইটুকুই বলতে পারি। কিন্তু এতকালের সব অবতারকল্প পুরুষ, সিদ্ধপুরুষ মহাত্মা, তাঁদের কথায় বিশ্বাস রেখো বাবা। তাঁরা ঈশ্বরকে জেনেছিলেন।

আমি মুখে তর্ক করি নি, কিন্তু মাথা আপনিই অস্বীকারের ভঙ্গিতে নড়ে উঠেছিল। এবার তাঁর কণ্ঠস্বরে বিস্ময় ফুটে উঠেছিল।—তুমি বিশ্বাস কর না ?

বাধ্য হয়ে বলেছিলাম, অবিশ্বাসও করি না, বিশ্বাসও করি না মহারাজ। তাঁরা পেয়েছিলেন একটা কালের ঈশ্বরকে, সে কাল গত হওয়ার সঙ্গে সে ঈশ্বর-দর্শনের প্রসাদও বাসি হয়েছে। না হলে মানুষের এত সংশয় কেন, যন্ত্রণা কেন ?

সাধু বললেন, ঈশ্বর-সাধনায় যন্ত্রণা ? সাধকের ভগবানকে ডাকা আর পাগলের ভগবান ভগবান বলে চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে যন্ত্রণাভোগ এক নয় বাবা। দুয়ের মধ্যে বহৎ ফরাক্।

আমি বলেছিলাম, মানুষ বিজ্ঞানবলে প্রত্যক্ষভাবে জেনেছে, পুরাণ যেভাবে সৃষ্টি হয়েছে বলেছে, তা হয় নি। কুমোরশালের কুমোরের মত ভগবান বসে বসে চন্দ্র সূর্য মানুষ জানোয়ার তৈরি করেন নি। যে অঙ্ক কষে পৃথিবী মেপেছে, সূর্য মেপেছে, চন্দ্র মেপেছে, সে ভগবানের

আস্তানা পায় নি। মানুষ ব্রহ্মার সৃষ্টি ভগবানের সন্তান নয়। তার সৃষ্টি হয়েছে পশু থেকে। শুধু অনুভবের কথা সে শুনবে না বাবা। তার প্রমাণ চাই।

তিনি বললেন, হাঁ বাবা, তা যদি হয় তবে বিলকুল মানুষ জানোয়ার হয়ে যাবে। কেউ রুখতে পারবে না বাবা। না বিদ্যা. না বিজ্ঞান, কিছু না। তা বন্ যাও জানোয়ার। মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। আমি উঠে চলে এলাম।

বিজ্ঞানবিদ বিজ্ঞানচর্চা ছেড়ে সাধু হয়েছেন, এমন জনের সঙ্গেও দেখা হয়েছে। তর্কের ঝড় উঠেছে। তুলেছি অবশ্য আমি। তিনি মৃদু মৃদু হেসে উত্তর দিয়েছেন।

তিনি আমাকে একটা কথা বলেছিলেন তার উত্তর দিতে পারি নি, কিন্তু মনে আছে। বলেছিলেন, যেসব অঙ্কের কথা বলছেন আপনি, সেসব অঙ্ক আপনি নিজে কষে প্রশ্নের উত্তর বা সিদ্ধান্তে কি উপনীত হয়েছেন, না অন্যে কষেছে তার উত্তর বিশ্বাস করে নিয়েছেন? আমার বিশ্বাস নিজে কষেন নি, বিশ্বাসই করেছেন।

আমি বলেছিলাম, প্রথম অখণ্ড বিশ্বাস করেছি অস্তিবাদী সাধকদের কথায়। কিন্তু সে বিশ্বাস টিকল কই? তাঁর দেখা পেলাম কই? সেইটে টলে গেল, টলে গেল কেন, ভেঙে চুরমার হয়ে গেল যে! কী করব? আজও তো আমি উন্মাদের মত ফিরছি সেই সন্ধানে। কিন্তু কই?

—সন্ধান করুন। ও কি কাউকে দেখাতে পারে? ওটা যে দেখে আর যে দেখা দেয় তার দুজনের মধ্যে আবদ্ধ। নেই মনে করেন—তাই ভেবে চলেন, চলুন। নেই, নেই, ঘোষণা করে যান—শেষ পর্যন্ত গিয়ে শেষ ঘোষণা করুন 'নেই'। সেই তখনই হয়ত মিলবে দেখা।

বাক্‌বিস্তার ভাল লাগে নি। উঠে চলে এসেছিলাম। এরা অন্তর্যাতনা বোঝে না। ওরাও না। যারা বলে নেই, কিছু নেই; সৃষ্টি আছে ঈশ্বর নেই। সন্তান আমি আছি, আমার পিতা নেই, তারাও বোঝে না। তারা বলে—নেই থাকল, ক্ষতি কী? আমি বলছি বিশ্বাস কর। না কর, আমরা নিষ্ঠুর শাসনে শাসিত করে তোমাকে বিশ্বাস করতে বাধ্য করব। মানুষের পিতৃপরিচয় নেই—তবে সারা মানুষ-জাতিটা কী? সে জারজ? সে বানর থেকে উৎপন্ন? এর জন্যে যে অন্তর্যাতনা তা তারা বোঝে না। বুঝতে চায় না।

একজন চোর-সাধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। চোর-সাধু একজন নয়, অনেক—অনেক—অনেক। তার মধ্যে একজনের কথা বলছি, শিবনাথ। সে আমার কোলে মাথা রেখে মারা গিয়েছিল। মৃত্যুকালে তার সে কী হায় হায়! জীবনে সে এক সময় এক মন্দির থেকে সোনার রাধামূর্তি চুরি করে সন্ন্যাসী সেজে এসেছিল হিমালয়ে পালিয়ে। মৃত্যুকালে হায় হায় করে বলেছিল—'না পেলাম রাধা না পেলাম সোনা'। সে কী কান্না তার! ওঃ! সে যেন আমারই মর্মযাতনা, শিবনাথ। শুধু তাই নয় শিবনাথ, তার মৃত্যুতে আমিই হলাম তার চৌর্যের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী।

শিবনাথের কথা

এইখানে সুদর্শন এক বিচিত্র চোরের কথা লিখেছে। বড় ভাল ছোট গল্প হয়। একেই বলে truth is stranger than fiction—; কিন্তু সে থাক। সেবার তৃতীয়বার সে বদরী-নারায়ণ চলেছিল। বদরীনারায়ণের পথে এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তার সঙ্গী হয়েছিলেন। সন্ন্যাসী অসুস্থ ছিলেন। তীর্থের পথে দেবদর্শনের আকর্ষণে মানুষ ছোটে, যে অসুস্থ হয়, অক্ষম হয়, সে পড়ে থাকে চটিতে, একান্ত দুর্ভাগা হলে পথের ধারে। কিন্তু সুদর্শন তাঁকে পথের ধার থেকেই প্রায় কাঁধে করে চটিতে এনে তাঁর সেবা করেছিল। সেবার আর তার বদরীনাথ যাওয়া হয় নি। তার আগে অবশ্য সে বদরীবিশালকে দর্শন করেছে, একবার নয়, দুবার। সেবার ছিল তৃতীয়বার।

সুদর্শন লিখেছে: সাধু পড়েছিল ক্লেদাক্ত দেহে। বাঙালী বৈরাগী সাধু। প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় চটিতে এনে তুললাম; চটির ভিতর ওই ক্লেদাক্ত রোগীর স্থান হল না, বাইরে এক কোণে তাকে শুইয়ে শুশ্রূষা করলাম। জ্ঞান হল, একটু সুস্থ হলেন, তখন বললেন, এখন তুমি যাও। গোবিন্দ তোমার ভাল করবেন। তুমি যাও। যাও, বদরীনারায়ণকে দর্শন করে এস।

সুদর্শন বৃদ্ধের অবস্থায় মমতা করেই বলেছিল, আমি আরও দুবার দর্শন করেছি। না-ই হল এবার দর্শন, আপনি ভাববেন না, আগে আপনি সুস্থ হোন।

সাধু ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন. না, না, না। কারুর সেবা আমি চাই না। না। যাও, তুমি যাও। কেন তোমার সেবা নেব আমি! নেব না। তুমি যাও।

বিস্মিত খুব হয় নি সুদর্শন। সাধু বৈরাগী অনেক দেখেছে সে। বহু বিচিত্র ভাবনা এঁদের। সেবাগ্রহণকেও জীবনে এঁরা ঋণ বলে মনে করেন। দেবতার মঠ, দানছত্র ছাড়া ভিক্ষা বা সাহায্য গ্রহণ করেন না। কেউ মৌনী। আবার কত মঠধারী সন্ন্যাসী পথে কত খয়রাত করে যান। চোর ভণ্ড যারা, তারা অনেক। তারাই বেশী। তাদের বাদ দিয়েই এদের কথা লিখেছে সুদর্শন। এ লোকটিকে চোর বা ভণ্ড তার মনে হয় নি।

সুদর্শন চলে যাওয়াই স্থির করেছিল। কী প্রয়োজন ওই বৃদ্ধের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে তাকে সেবায় ঋণী করার! চলেও গিয়েছিল কিছুটা দূর। কিছুটা দূর অর্থে চটি ছেড়ে এসে বসেছিল নদীর ঘাটে। পায়ে হোঁচট খেয়েছিল বলেই সে বসে ছিল। অন্যথায় সে আরও খানিকটা এগিয়ে যেত। হঠাৎ চটি থেকে একটি ছেলে এসে তাকে ডেকেছিল—সাধুজী, জলদি আও, তুম্হারা গুরু বুঢ্‌ঢা সাধু মহারাজ উঠনেকে বখৎ গির কর একদম বেহোঁশ হো গয়া। শিরসে খুন নিকলতা হ্যায়।

ফিরে এসেছিল সুদর্শন।

সুদর্শন লিখেছে, সেদিনও মনে হয়েছিল বিচিত্র ঘটনা তো। এখানে তার পায়ে হোঁচট লাগল বলে বসতে বাধ্য হল, আর কিছুক্ষণ পরেই খবর এল বৃদ্ধ সাধু পড়ে মাথা ফাটিয়েছেন। তবে কি তাঁর কাছেই পাবে পরম সন্ধান!

সাধুর মাথা ফেটেছিল, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। জ্ঞান হয়েছিল দুদিন পর। তখন রাত্রিকাল, একটি আলো জেলে সুদর্শন বসে ছিল একটু দূরে, উপাসনা করছিল। হঠাৎ

চোখে পড়েছিল, সাধু চোখ মেলে চেয়ে রয়েছেন। উপাসনা শেষ করে সে প্রশ্ন করেছিল, কেমন বোধ করছেন ?

—আমি আর বাঁচব না।

—না না। বাঁচবেন না কেন ?

—না। একটু চুপ করে থেকে বললেন, তুমি ফিরে এলে কেন ? তুমি তো চলে গিয়েছিলে।

—কী জানি, বোধ হয় বদরীনাথের নির্দেশ। এখান থেকে বেরিয়ে নদীর পুলের কাছে পায়ে হোঁচট লাগল। বসতে হল। কিছুক্ষণ পর চটির একটা ছেলে খবর দিলে আপনি পড়ে গেছেন, মাথা ফেটে অজ্ঞান হয়ে গেছেন। ওরা ভেবেছে, আপনি আমার গুরু, আমি শিষ্য।

—হুঁ। আমার বালিশটা কি আমার মাথায় ?

—হ্যাঁ। ওই তো।

হাত তুলে বালিশটা টেনে মাথায় দিয়ে বলেছিলেন—হুঁ। বদরীনাথের নির্দেশই বটে, হুকুম তাঁরই। দেখ—

—কী বলুন ?

অনেকক্ষণ পর বলেছিলেন, সে যেন বহুকষ্টে বলা, দেহের কষ্টের জন্য নয়, যেন অনিচ্ছার একটা নিরন্ধ্র বেষ্টনী ভেঙে কথাটা বলতে হল তাঁকে। বলেছিলেন, আমি সাধু নই, আমি চোর। চুরি করে সন্ন্যাসী হয়েছিলাম। দেবতার পূজক ছিলাম, ব্রাহ্মণের ছেলে, চুরি করেছিলাম. সোনার রাঁধামূর্তি। বিরাট ধনীর বাড়ি, নইলে সোনার রাধা হয় কি করে ? যিনি করিয়েছিলেন তাঁর নির্দেশ ছিল, পূজো সেবা বাড়ির লোকেরা নিজের হাতে করবে। কিন্তু কালের হাওয়া, বংশের দু পুরুষ পরে তিন পুরুষের সময় তাঁরা পুজোর ভার দিলেন গুরুবংশের হাতে। আর বন্দুকধারী পাহারা তো ছিলই। আমার বাবা পূজো করতেন, আমি সঙ্গে যেতাম। দেখতাম। সোনার রাধা। সোনার রাধা। কত সোনা ! ওঃ, কত সোনা ! বাবা মারা গেলেন, আমি পূজোর ভার পেলাম। সোনার রাধাকে স্নান করাতাম, বেশ করাতাম, নাড়তাম, আর ওজন অনুমান করতাম। কালো কষ্টিপাথরের গোবিন্দের দুই চোখে নীল পাথর, শুনতাম নীলা। আর ওই নীলা নাকি যার কাছে, যে ঘরে থাকে—তারা রাজ্যেশ্বর হয়। তিন পুরুষে বাবুরা, বাবুদের মেয়েরা সব পাল্টে গেল। বাবুরা হল সাহেব, মেয়েরা হল বিবি। পুরনো বাড়ি ছেড়ে নতুন বাড়ি করলেন। সাহেবী কেতা। জেলার সাহেব-সুবো আসত, খানাপিনা হত ; নানান্ ধরনের কমিটি হত ; মেয়েরাও তাতে যেতেন। মন্দিরে আসবার সময় হত না। আমি পূজো করতাম আর ভাবতাম। হঠাৎ মারা গেল স্ত্রী। হাত-পা আমার খোলা হয়ে গেল। ছুটি নিয়ে গিয়েছিলাম তীর্থে। পয়সা আমি ভালই পেতাম। নিয়ম ছিল বছরে কটা পর্বে ঠাকুরের চরণে সোনার তুলসী নিবেদনের। সে তুলসী পেতাম আমি। তীর্থ করতে গিয়ে জয়পুরে দেখলাম দেবমূর্তির কারবার। হঠাৎ মাথায় এল, বারো আঙুল মাপের অষ্টধাতুর এমনি একটি রাধামূর্তি পাওয়া যায় না ? উদভ্রান্তের মত খুঁজতে লাগলাম। হঠাৎ এক জায়গায় পেলাম। অবিকল সোনার রাধা। কিনে নিয়ে সরাসরি বাড়ি ফিরলাম। তারপর কিছু কিছু করে জমি বেচলাম। স্ত্রীর গহনা বেচলাম। নোট করে গাঁথলাম। তারপর একদিন, সেদিন জেলার সাহেব এসেছে ইস্কুলে প্রাইজ হবে, আরও কী কী মিটিং হবে, রাত্রে বাবুদের ছেলেদের থিয়েটার হবে। বাবুদের বাড়ি দূরের কথা, গ্রামসুদ্ধ ব্যস্ত। সেইদিন বিগ্রহকে স্নান

করাবার সময় বদল করে নিলাম সোনার রাধা। সেদিন সন্ধ্যেতেও গেলাম, আরতি করে এলাম, শয়ন দিয়ে এলাম। আমি তো জানতাম যে, চোখ বাইরে পড়েছে। বাইরে যখন জলুসের আসর ঝলমল করছে, রাজার প্রতিনিধি যেদিন এসেছেন পুজো নিতে, সেই আয়োজনে যখন সবাই মেতেছে, সেদিন ঠাকুরের মন্দিরে ভুলেও কেউ আসবে না। গুজব শুনছি, বড়বাবু এবার খেতাব পাবেন। আমি নির্ভাবনায় আরতি করলাম; আরতি সেরে বাড়ি এসে মাথার বালিশের ভিতর রাধাকে ভরে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ইচ্ছে ছিল, হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে সোনার রাধাকে সোনার পিণ্ড করে নেব। কিন্তু পারি নি। ভাঙতে গিয়েও পারি নি।

আসলে হয়েছিল মমতা। কিন্তু ধরা পড়বার ভয় যখন মমতাকে চোখ রাঙালে, তখন মমতাই বোধ হয় ওই ভয়কে সায় দিয়ে ভোল পাল্‌টে বললে, শব্দ করলেও লোকে শুনতে পাবে। পাশেই জ্ঞাতিদের বাড়ি। তারা তখন থিয়েটার দেখতে যাবে—খাওয়া-দাওয়া সারছে, কলরব উঠছে। বালিশের মধ্যে পুরে সেলাই করে কম্বল জড়িয়ে পিঠে বাঁধলাম। তারপর গ্রাম একটু নিষুতি হতেই গেরুয়া পরে বেরিয়ে পড়লাম। সব ঠিক করাই ছিল, মুখে দাড়ি-গোঁফ ছিল, দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে বাবরি চুল যেমন পারি কাঁচি দিয়ে কেটে নামাবলী জড়িয়ে পাড়ি দিলাম।

মানুষ সব পারে বাবা, মানুষের অসাধ্য কাজ নেই। রাত্রে শ্মশানে এসে একটা পড়ো কলসী নিয়ে সাঁতার দিয়ে গঙ্গা পার হয়েছিলাম। এপারে এসে কয়েক ক্রোশ হেঁটে শেষরাত্রে একটা রেল ইস্টিশানে এসে টিকিট কেটে এসেছিলাম প্রয়াগ। সেখানে মাথা মুড়িয়ে এসেছিলাম হরিদ্বার। ইচ্ছে ছিল, বছরখানেক পরে ফিরব সংসারে, ভাষা পালটাব, জাত পালটাব। জান বাবা, ভেবেছিলাম ক্রীশ্চান হয়ে যাব, এই পশ্চিম অঞ্চলে কোন পাদরীদের গির্জের এলাকায় কোট পেণ্টেলুন হ্যাট চড়িয়ে সুখে কাটিয়ে দেব জীবন। না হয়, মুসলমান হয়ে যাব। তার আগে হিমালয়ের কোন গুহা-টুহাতে বসে ওই রাধাকে পাথর দিয়ে ভেঙে নেব। যা টাকা আমার ছিল, তাও কম ছিল না। দু হাজার টাকা বাবা। একশো টাকার নোটে দেড় হাজার, দশ টাকা পাঁচ টাকার পাঁচশো টাকা। পথে বেরিয়ে এ টাকার এক পয়সা ভাঙি নি—ভিক্ষে করেছি, মঠে খেয়েছি, দান নিয়েছি, ও টাকা ভাঙিনি। টাকা দিয়ে বাবা, আমি ঘর বাঁধতে পারতাম। কিন্তু ওই রাধা। ওই রাধাকে না ভেঙে ঘর বাঁধতে পারলাম না। অথচ বাবা, ওই রাধাকে ভাঙতেও পারলাম না। কিছুতেই না বাবা। নির্জন বনে গুহাতে ওকে বের করলাম, রাধা হাসতে লাগল। হ্যাঁ বাবা, ও হাসে। যেন জীবন্ত হয়ে উঠে হাসে। কতদিন ভুল করে পাগলের মত জীবন্ত ভেবে বুকে চেপে ধরেছি, তখন ওই সোনার রাধা কঠিন সোনার দেহ নিয়ে বুকে আমার আঘাত দিয়েছে। আছাড় মেরে ফেলতে গিয়েছি, কিন্তু তখনই আবার সেই হাসি দেখেছি। আর পারি নি। কতবার ভেবেছি কোন গোবিন্দ-মন্দিরে ওকে রাত্রে ফেলে দিয়ে আসব। তাও পারি নি। সোনার লোভ ছাড়তে পারি নি। সোনা তো কম নয় বাবা, পোওয়া পাঁচেক হবেই। আর পারি নি। সারা জীবনটা কাটল আমার ওই সোনার রাধাকে নিয়ে। রাধাও পেলাম না, সোনাও পেলাম না।

দীর্ঘকাল চুপ করে থেকে সে তাকে বলেছিল, সেদিন মরবার মত অবস্থায় পথে পড়েছিলাম, আঁকড়ে ধরেছিলাম ওই বালিশটা। মানে, ওই সোনার রাধা। এর কী হবে ভেবে আমার মরণ-ভাবনা ভাবতে পারি নি। তুমি এখানে নিয়ে এলে কাঁধে করে, সেবা করে সুস্থ করলে;

তখন ভয় হল, সন্ধান পেলে তুমি কেড়ে নেবে। তাই তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম। তুমি চলে গেলে আমি উঠে ওই নিরাপদ কোণটায় যাব বলে উঠতে গিয়ে পড়ে গেলাম, মাথা ফাটল। তুমিও পথে হোঁচট খেলে। এ তখন বদরীনারায়ণের নির্দেশ বইকি। তুমি এসব নিয়ো। আমি বাঁচব না। তবে বেঁচে থাকতে কেড়ে নিয়ে যেয়ো না।

সুদর্শনও মূর্তিটি নিয়ে সে সময় মোহে পড়েছিল। ঠিক ওই চোর-সাধুর মোহ তাকে পেয়ে বসেছিল। যতবার কোন দেবমন্দিরে দেবার জন্য বের করে দেখেছে, ততবার আশ্চর্য মোহ তাকে ঘিরে ধরেছে। অপরূপ মূর্তি। দিতে পারে নি।

টাকাটার কথায় সাধু বলেছিল—ওটা আমার পাপের টাকা নয়। ওটা তুমি নিয়ো। তোমার জীবনে লাগবে বাবা। সন্ন্যাসী হলেও লাগবে। ওটা সঙ্গে রেখো। খরচ কোর। তোমাকে আমি দিয়ে গেলাম।

কঠিন সংশয়ের মধ্যে তখন তার জীবন চলছে। ভাবাবেগে সে তখন অধীর নয়। টাকা মাটি, মাটি টাকা বলে টাকা জলে ফেলে দেওয়ার মধ্যে একটা তত্ত্বজ্ঞান নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু ওই তত্ত্বই জড় এবং জীবনের মিলিত এই বিচিত্র তত্ত্বের চাবি-কাঠি নয়। টাকাটা সে ফেলেও দেয় নি, দানপত্র করে ছড়িয়েও দেয় নি, রেখে দিয়েছিল। ভিক্ষা করে খাওয়ার মধ্যেও কোন পথ সে পায় নি। সে চোখের উপর হিমালয়ের বুকে দেখেছে রাশি রাশি অর্থ আসছে, সেই অর্থ মঠ উঠছে, মন্দির উঠছে; পাহাড় কেটে পথ হচ্ছে। নদীর বুকে ঝোলা ঘুচে ব্রীজ তৈরী হচ্ছে। দেবতার অঙ্গে দেখেছে রাশি রাশি অলঙ্কার, হীরা-মণি-মুক্তা; তীর্থদর্শনের সুফলে অর্থ লাগে, দেবদর্শনের দক্ষিণায় অর্থ লাগে, অর্থ না হলে দেবতার সেবা অচল, দেবতার ভোগ হবে না, উপবাসী থাকতে হবে দেবতাকে, মানুষও প্রসাদ পাবে না।

একটা জীবন-দর্শন, একটা পথ অবশ্য আছে, যেখানে গাছের ফলে, নদীর জলে, পাহাড়ের গুহায় জীবন-ধারণ করে মানুষ নির্বিরোধ নিস্তব্ধতার মধ্যে পরমানন্দের স্বাদ পায়, মূল জীবন-রহস্যের আভাস পায়। সে পথের পথিকদেরও দেখেছে। তারা বিচ্ছিন্ন, তারা একক, তাদের সিদ্ধিতে তাদের নিষ্ফলতার সঙ্গে সংসারের বিশাল জীবনস্রোতের কোন সম্পর্ক নেই। এমন কত সাধক এসেছেন গিয়েছেন, জগতের জীবনের হিসাব-নিকাশের বাইরে তাঁরা। কৃষ্ণ ও পথের পথিক নন, রাম নন, বুদ্ধ নন। সন্ন্যাসী বুদ্ধ সুখদুঃখের পাপপুণ্যের সংসারে এই অর্থের রাজ্যে ফিরে এসেছিলেন। বিগলিত বিষ্ণুর স্বেদ-গণ্ডুষ ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ কী মূল্য তার? স্বর্গে-মর্ত্যে-পাতালে প্রবাহিণী হয়েই সে মহিমময়ী, সে পতিতোদ্ধারিণী।

সেই টাকা আর সোনার রাধা বয়ে নিয়ে ফিরল সে। তার সঙ্গে সেই মর্মযাতনা।

সুদর্শনের কথা

(ক)

শুধু আমার কেন? গোটা যুগটাই আর্তনাদ করছে এই নিষ্ঠুর যন্ত্রণায়। এই যুগের এক সরল প্রবল প্রচণ্ড জীবনাংশ আমার মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে, আমার আর্তনাদ তো উচ্চ চিৎকারে ধ্বনিত হবেই। গোয়ালে গাই, পুকুরে মাছ, মরাইয়ে ধান, মন্দিরে পাথরের কি ধাতুর ঠাকুর ভজে

তার মধ্যে পরমানন্দকে আবিষ্কার করার দিন এ যুগে চলে গেছে। বনে পাহাড়ে বিচিত্র এবং বিরাটকে দর্শন করে সারাটা জীবন যাঁদের পরমানন্দে কাটে জীবনান্তে যাঁরা অমৃতলোকে প্রয়াণ করেন, তাঁরা ভাগ্যবান। আমার ভাগ্য দুর্যোগে ভরা। আমি বিরাট বিচিত্র অপরূপকে শুধু নয়, এই চৈতন্য-জাগ্রত জীবনের মূলকেন্দ্রকেও জানতে চাই, সে না জানলে আমার স্বস্তি নেই। আমি অনুভব করি আমার প্রাণসত্তা অহরহ সেই অস্বস্তিতে অধীর চঞ্চল। এ অধীরতা এ চঞ্চলতা সকল কালেই আছে, কিন্তু এ যুগে সে অধীরতা, চঞ্চলতা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গারের মত বুক ফাটিয়ে বেরিয়ে এসেছে। মূল কেন্দ্রবিন্দুকে দুই হাতে আঁকড়ে ধরতে চাই আমি। মধ্যে মধ্যে ভয় হত যদি কিছু না থাকে, সে যদি এক বিরাট নাস্তি হয়, তবে? তবে? তবে আমাকেই আঁকড়ে ধরব। আমি, আমিই সব। আমার সুখই সুখ, আমার দুঃখই দুঃখ। বাকি সব নাস্তি।

আমি নিজেকে প্রতারিত করতে পারি নি। তা পারলে নিজেকে সিদ্ধপুরুষ বলে ঘোষণা করে পৃথিবীর সকল সমস্যার সমাধান-বাণী প্রচার করতাম। কিন্তু এ যুগের মনকে সেকালের মত সহজে প্রতারণা করা যায় না। হিমালয় অঞ্চলে আমার কেন্দ্রস্থল ছিল হরিদ্বার। কখনও কখনও ঋষিকেশ।

হরিদ্বারে কনখলে বেদান্ত-আশ্রমে, ঋষিকেশে পড়াশুনা অনেক করলাম। ইংরিজী বাংলা হিন্দী—অনেক। মাস-আষ্টেক এসে ছিলাম দিল্লীতে। ওই পড়াশুনার জন্যেই। ঘুরলাম তীর্থে-তীর্থে। শেষ যেবার ফিরে গেলাম হিমালয়ে, ভেবে গেলাম এবার পাব তো পাব, না পাব তো উল্টোমুখে ফিরব। এর মধ্যে বহু ক্ষুদ্র বিচিত্র ঘটনা ঘটেছে যাকে বুদ্ধির অগোচর বলতে পারি, কিন্তু তা আমার প্রশ্নের উত্তর নয়; ওই ক্ষুদ্র বিচিত্রের পুঁথির মালা গেঁথে যারা ঈশ্বরতত্ত্বের জপমালা রচনা করে, আমি তাদের কেউ নই। আমার ঈশ্বরস্তোত্রে শুধু সঙ্গীত নেই, শুধু আনন্দ নেই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিপুল ক্রন্দনও আছে। মনের তৃষ্ণাই শুধু নেই, দেহের ক্ষুধাও আছে। আমি শুধু মনের আনন্দেই তৃপ্ত হতে পারি না, দেহের সুখও আমি চাই। সব কালেই মানুষ যা চেয়েছে, বুদ্ধও যাকে অস্বীকার করতে পারেন নি। অনেক কৃচ্ছ্র-সাধন আমি করলাম, কী পেলাম? ভাবছিলাম ফিরব, জীবনের কলকল্লোলভরা হাটের মধ্যে ফিরে যাব। সকল মিথ্যা-বিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দিয়ে দেহে-মনে উপলব্ধি করা সত্যের নির্দেশে জীবনকে ভরে তুলব। পূর্ণ করব। জন্ম এবং মৃত্যুর দুই মহানাস্তির প্রান্তের মধ্যে যেটুকু অস্তিবাদ সেইটুকুকেই বলি জীবন, সেই জীবনের মধ্যে যদি ঈশ্বরকে পাই তো তিনি আছেন, নেই তো নেই। এই তো এত ঘুরলাম, জগৎ এবং জীবন-বৈচিত্র্যের কত কিছু দেখলাম—উদ্ভিদ কীটপতঙ্গ সরীসৃপ চতুষ্পদ এদের এই বেঁচে থাকা কি প্রতি মুহূর্তকে পরিপূর্ণ ভোগ করে বেঁচে থাকা নয়? নিয়ম শুধু একটি, বেঁচে থাক। সেইটুকুই তো অজ্ঞাতের নির্দেশ। সেই নির্দেশ প্রত্যক্ষ, স্পষ্ট, অসংখ্য স্তরের জীবজীবনে প্রমাণিত। তাকে ফেলে মানুষের এই কল্পনার ঈশ্বর, তার নির্দেশ কেন মানতে যাব? সুতরাং তাকেই গ্রহণ করে গৈরিক ভাসিয়ে দিয়ে ফেরবার কথাই মনে মনে ভাবছিলাম। কিন্তু সেও তো সহজ নয়। আমি প্রতারক হলে ওই গৈরিকের আড়ম্বরকে সমৃদ্ধ করে তুলে একটা ধ্বজা হাতে নিয়ে কোন স্থানে এসে গেড়ে বসে বলতে পারতাম, এইখানেই আমার জন্মজন্মান্তরের সিদ্ধপীঠ। এইখানেই গড়ব আশ্রম। মাটির তলা থেকে সনাতন ভারতবর্ষকে টেনে বের করব। কিন্তু তাও আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। প্রতারণা না করেও একটি মানবসেবা-সঙ্ঘ গড়তে পারতাম। তার কথাও মনে মনে ভেবেছি। কিন্তু পুণ্যেই যে আমার বিশ্বাস নড়ে গেছে।

আমি তখন হিমালয় থেকে নেমেছি। আসছি উল্টোমুখে। দেশে ফিরবার অভিপ্রায় ঠিক নয়, লোকালয়ে ফিরবার ইচ্ছা। ভাবতে ভাবতে কাশী থেকে এসেছি সেদিন গয়া।

সেদিন অপরাহ্নবেলায় কোথা থেকে কী হয়ে গেল! দাঁড়িয়ে ছিলাম একখানা পাথরের উপর; অকস্মাৎ মনে হল সমস্ত পৃথিবীর বুকের ভিতর থেকে জেগে উঠল প্রলয় গর্জন। সঙ্গে সঙ্গে দুলে উঠল আকাশ-মৃত্তিকা-গাছপালা-বাড়িঘর-বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। দিগন্তও যেন বেঁকে গিয়ে হেলে পড়ল; বনভূমি কাত হয়ে পড়ল, আবার সোজা হল—আবার কাত হল, মাটি ফাটল, পাথর গড়াল, নদীর জল এপার থেকে গড়িয়ে গিয়ে ওপারের উচ্চ তটভূমিকে ভাসিয়ে দিলে। গাছ ভেঙে পড়ল, নীচে সমতলে দেখলাম বসতিগুলি তাসের ঘরের মত শুয়ে পড়ল এবং তাকে মুহূর্তে ঢেকে দিয়ে উঠল রাশি রাশি ধুলার পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ। বারেকের জন্য মনে হয়েছিল, বিশ্বব্যাপী মানুষের অবিশ্বাসের প্রতিবাদে ভগবান যেন নর-সিংহ-অবতার মূর্তিতে প্রকট হচ্ছেন। বলবেন, মূঢ় মানুষ, দেখ আমি আছি। আছি। আছি। আছি। কিন্তু সে বারেকের জন্য। তার পরই আমার মন বলে উঠেছে, না—না। এ ভূমিকম্প। ভূমিকম্প। এর কারণ আমি জানি। তারপরই আমি উপুড় হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আর মনে নেই।

১৯৩৪ সন; বিহারে এক বিধ্বস্ত-করা ভূমিকম্প হয়ে গেল সেদিন। পয়লা মাঘ। আমি নেমেই এসেছিলাম হরিদ্বার থেকে মনে একটা সংকল্প নিয়ে। সংকল্প করেছিলাম বুদ্ধগয়ায় যাব। সেখানে এই গৈরিক বেশভূষা সব খুলে ফেলে সংসারী সেজে সংসারে ফিরব। অপরাহ্ন-বেলায় শহর থেকে একটু দূরে ফল্গুর তটভূমে দাঁড়িয়ে ছিলাম; অদূরে প্রেতশিলা; হঠাৎ পৃথিবী নড়ে উঠল। মাটিতে পড়ে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান হারিয়েছিলাম। জ্ঞান হয়েও কিছুক্ষণ বিহ্বল হয়ে ছিলাম। বিহ্বলতা কাটিয়ে যখন উঠলাম তখন বিপর্যয় ঘটে গেছে প্রায় সৃষ্টি জুড়ে। মানুষের ভয়ার্ত শোকার্ত চিৎকার আকাশ স্পর্শ করেছে। আকাশ ধুলোয় ভরা। মানুষেরা ছুটে বেরিয়ে আসছে বসতি ছেড়ে প্রান্তরে। সম্মুখে সন্ধ্যা; রাত্রি নেমে আসছে। মনে হল বারেকেরে জন্য ঈশ্বরের ক্ষুব্ধ রূপ বুঝি স্বল্প কয়েক মুহূর্তের জন্য দেখলাম, তাঁর বাঁ পায়ের কনিষ্ঠা অঙ্গুলির একটি চাপ যেন ক্ষণিকের জন্য প্রত্যক্ষ করলাম। মনে মনে বলেছিলাম, আজও স্পষ্ট স্মরণ করতে পারি বলেই বলছি, বলেছিলাম, তুমি কি আমাকে মুখের বামপার্শ্ব দেখালে? পরক্ষণেই আমার বলা উচিত ছিল, তা যদি হয়, তবে তোমার বাম রূপ ইচ্ছে করলেই তুমিও দেখতে পার না। ভূমিকম্পর কারণ যে উত্তাপ, সে উত্তাপের জন্য জ্বালানি জ্বেলে বসে থাকতে হয় মাটির তলার অন্ধকারে। কিন্তু তাও পারি নি। সেদিন সত্যই মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলাম। শুধু কি আমি? গান্ধীজীও বলেছিলেন, বিহারে এ ভগবানের দেওয়া শাস্তি। অবশ্য গান্ধীজীর আগেই আমার মুহ্যমানতা কেটেছিল। সেদিন মুহ্যমান হয়ে সেইখানেই পড়ে ছিলাম সমস্ত রাত্রি। লোকালয়ে ফিরে যাবার শক্তিও ছিল না, সাহসও ছিল না। মনে আছে বোধ হয়, কম্পন একেবারেই শেষ হয় নি, দু-তিনবার কেঁপেছিল মাটি। শহরের মানুষ ঘর ছেড়ে যেখানে সে খোলা আকাশের তলা পেয়েছিল, সেইখানেই এসে আশ্রয় নিয়েছিল। মনের মধ্যে প্রতিটি জনের গভীর আতঙ্ক। আজই বোধ হয় পৃথিবীর শেষ রাত্রি। শহর গ্রাম অন্ধকার, শহরের বিজলী বাতি নষ্ট হয়েছে। আলো ভেঙেছে। শুধু এখানে ওখানে অগ্নিকুণ্ড দেখা যাচ্ছে। সেও উত্তাপের জন্য। সে রাত্রে সে কী শীত! যেন অন্ধকারের মধ্যে মৃত্যু নিজেকে বিস্তার করছে উলঙ্গ রূপে। ক্রমশ রাত্রির অগ্রগতির সঙ্গে যেন দেহ জমে পাথর হয়ে আসতে লাগল। চেতনা কিছুটা আছে, বাকিটা হিমশিলার মত স্পন্দনহীন।

হিমালয়ের বুকে শীতল হ্রদের মত অবস্থা, উপরটা জমে গেছে, নীচে অনেক গভীরে জল রয়েছে, কিন্তু তাও বাতাসের, আলোর স্পর্শ পায় না; স্পন্দনহীন স্থির। একটা গাছের তলায় দুটো কম্বল জোড়া দিয়ে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে মুড়ি দিয়ে পড়েছিলাম। চেতনা নেই, তার সঙ্গে চিন্তা নেই। থাকবার মধ্যে সর্বাঙ্গে নিষ্ঠুর শীতার্ততার একটা মর্মান্তিক যন্ত্রণা। আর ছিল বোধ হয় একটা কম্পন। কাঁপছিলাম। জন্তু-জানোয়ার-সরীসৃপ কারও কোন সঞ্চরণশব্দ নেই; থাকবার মধ্যে দূরে শহরগ্রামের ভয়ার্ত মানুষের কলরব। তাও আকস্মিক। কখনও কখনও কোন কিছু নড়ে উঠলেই মানুষ চিৎকার করে উঠছে—আ—! ভাবছে আবার বুঝি কাঁপছে মাটি, ফাটছে মাটি। এইবার বুঝি টুকরো টুকরো হয়ে অনন্ত শূন্যলোক ফেটে ছড়িয়ে পড়বে।

সে যেন এক মহানাটকের একটি অঙ্কশেষের মুহূর্ত। মহাপ্রলয় হচ্ছে। শিবনাথ, সত্যিই সেই মুহূর্তটিতে আবার মাটি একবার কাঁপল। এরই মধ্যে অকস্মাৎ কিসের যেন একটা ঠোক্কর অনুভব করলাম, পরমুহূর্তেই একটা কী আমার উপর আছাড় খেয়ে পড়ল। ভয় আমার নেই। মৃত্যুকেও না; তবুও আঘাতে একটু যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে উঠলাম। কী পড়ল! হয়তো পাথর বা গাছ হবে। পিঠের দিকে একটা পাথর উঠে ছিল। উপরের ধাক্কায় যন্ত্রণা অনুভব করলাম তার থেকেই। কিন্তু এ কী? আমার কাতর শব্দের সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম আর একটা মানুষের আতঙ্কিত আর্তনাদ! না, গাছ বা পাথর গড়ায় নি, মানুষ। কোন মানুষ হোঁচট খেয়ে আমার উপরে এসে পড়েছে। পরক্ষণেই সে উঠে, আমার উপর থেকে নেমে, বোধ করি হামাগুড়ি দিয়ে সরে গেল। প্রশ্ন করলে না—কে? আমাকে নেড়ে দেখলে না। দূরে সরে গিয়ে হাঁপাতে লাগল। আমার কৌতূহল ছিল না, ঔৎসুক্য ছিল না, আমি শুধু পড়েই রইলাম। কয়েক মুহূর্ত পর আবার একটা শব্দ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে কাতর আর্তনাদ। এবার কম্বল থেকে মুখ খুলে দেখলাম, মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে একটা কালো মূর্তি আর্তনাদ করেছে। কিন্তু সেই প্রলয়রাত্রির দ্বিপ্রহরে নিষ্ঠুরতম শীতের মধ্যে আমার কোন বিস্ময় বা কৌতূহল জাগে নি। আমার থেকে কয়েক হাত দূরে সে পড়ে রইল। আমি আবার মুখে ঢাকা দিলাম।

সে রাত্রে কি ঝিঁঝির ডাক ছিল? পেঁচা ডেকেছিল? মনে নেই শিবনাথ। এমনই আমার অবস্থা সেদিন রাত্রে। এরই মধ্যে মনে পড়েছে, আমার কম্বলটা কেউ টানছে।

টানছিল সে-ই। আমি চেপে ধরেছিলাম কম্বলটা। সে টেনে কাতর কণ্ঠে বলেছিল—মর যাউঙ্গী। থোড়াসে জাগা দেও কম্‌লিকে অন্দর। জেরাসে। মেহেরবানি করো।

এতক্ষণ পরে কণ্ঠস্বর শুনে বুঝলাম, যার কণ্ঠস্বর, সে নারী।

এবার বিস্ময়ে আমার হাতের মুঠো শিথিল হয়ে গেল। সে কম্বলটা ফাঁক করে তার মধ্যে ঢুকে পড়ে হিন্দী-উর্দু-মেশানো ভাষায় বললে, আমাকে জড়িয়ে ধর। আমি মরে যাব শীতে। আমি মরে যাব।

সঙ্গে সঙ্গে সে আমাকে জড়িয়ে ধরলে সবলে। ঠক ঠক করে কাঁপছে। সমস্ত কাপড়ের আবরণটা শিশিরে-ভিজে কনকন করছে। দাঁতে দাঁতে শব্দ হচ্ছে।

আমি বললাম, তুম আওরৎ, হম মর্দানা। সে বললে, নহি। আদমী। আউর তব ভি আওরৎ কহো তো শুনো, ময় আওরৎ হুঁ মগর মেরি জাত নেহি হ্যায়, ধরম নেহি হ্যায়, ইজ্জত নেহি হ্যায়, সব ছুট গেয়া, টুট গেয়া—শয়তান সব ছিন লিয়া। জান হ্যায়—সিরিফ জান হ্যায়। উহো মুঝে বাঁচানে দো। মেহেরবানি করো, মেরি জান বাঁচাও।

আমিও এবার তাকে জড়িয়ে ধরলাম। সে বললে, জোরসে। বহুত জোরসে। ময় মর যাউঙ্গী!

শিবনাথ, নারী নয়, পুরুষ নয়। দুটি মানুষ। এই প্রলয়রাত্রির মৃত্যুহিমানীর মধ্যে দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। কম্বলের মধ্যেই ঢাকা ছিল দুজনের মুখ, দুজনের নিশ্বাস-প্রশ্বাসে, দুজনের অঙ্গের স্পর্শে দুজনেই সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছিলাম। তার কম্পন অনেকটা কমে এসেছিল। হঠাৎ সে হাতের আঙুল দিয়ে আমার বুকের রুদ্রাক্ষের মালাটা নেড়ে দেখে বলেছিল—এ কেয়া? মালা?

—হাঁ।

—আপ ফকির? ফকির-মালা ইয়ে?

—হম্ সন্ন্যাসী। রুদ্রাক্‌সকে মালা হ্যায় ইয়ে।

—সন্ন্যাসী! রুদ্রাক্‌সকে মালা! আপ হিন্দু?

কণ্ঠস্বরে বিচিত্র ব্যঞ্জনা ফুটে উঠল। ভয়ার্ত হিমপীড়িত রাত্রে স্নায়ুশিরা এবং দেহের প্রতি রোমকূপের সঙ্গে মন যখন ডুবে যাচ্ছে জলমগ্নের মত, তখন কণ্ঠস্বরে এমন আশা-উৎসাহের উত্তাপের স্পর্শ কেমন করে তার স্বরে ভাষায় সঞ্চারিত হল জানি না।

বিস্মিত হয়েই বললাম, হাঁ। ম্যয় হিন্দু সন্ন্যাসী হুঁ।

সে মুহূর্তে বলে উঠল, তা হলে তুমি আমাকে বাঁচাতে পার। সন্ন্যাসীজী তুম মুঝে বাঁচাও। সবলে সে আমাকে জড়িয়ে ধরলে, ওর ভাষাতেই বললে—আমি আজ মুসলমান। আগে কিন্তু আমি হিন্দু ছিলাম। আমাকে আমার বাপের বাড়ি থেকে ডাকাতি করে ছিনিয়ে নিয়ে এসেছে। এক বৎসর আজ—

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল সে।

আমি বললাম, রোতি কিঁউ? বাতাও কেয়া হুয়া?

তবু সে থামল না। সেই মর্মান্তিক শীতের রাত্রেও তার বুকের মধ্যে বোধ করি জলন্ত লাভা-স্রোত প্রবলতর উত্তাপে টগবগ করে ফুটে উঠেছিল; সে কাঁপছিল ভূমিকম্পে কেঁপে-ওঠা মাটির মত। সে কেঁদেই চলেছিল।

আমি আমার অজ্ঞাতসারেই কখন বোধ করি বাংলাতে বলে উঠেছিলাম, কী বিপদ!

সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল সে, বললে—তুমি বাঙালী? তুমি হিন্দু?

এবার আমি চমকে উঠেছিলাম। এতক্ষণ প্রশ্নোত্তর চলছিল দেহাতী হিন্দীতে; এবার ভাষা বাংলা। বাঙালীর মেয়ে। আমি এর পর চমকে না উঠে পারি নি। বলেছিলাম, তুমি বাঙালীর মেয়ে!

সে আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল—বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও। আজ এক বছর হল আমাকে ডাকাতি করে নিয়ে এসেছে। এক বছরের মধ্যে বিশ-তিরিশ জায়গায় নিয়ে নিয়ে আটকে রেখেছে। কোনখানে দশ দিন, কোনখানে বিশ দিন, আর সে কী নিষ্ঠুর অত্যাচার! ধুলিয়ান অঞ্চল থেকে গোটা পূর্ণিয়া, কিষণগঞ্জ কাটিহার অঞ্চলটা ঘুরে আজ চার মাস হল এনেছে এই অঞ্চলে। কুলুপ দিয়ে আটকে রাখে।

আজ ভূমিকম্পে গোটা বাড়িটা ভেঙে পড়ল হুড়মুড় করে। সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল; জ্ঞান ফিরলে তার মনে হল সে তো মরে নি—সে তো বিচিত্রভাবে বেঁচে গেছে। সন্ধ্যার আকাশে ম্লান আলোতে পেয়েছিল সে মুক্তির ইশারা। চারিদিকে আর্তনাদ, চিৎকার, কান্না। এই তো পালাবার অবসর। রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে

হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। লুকিয়েছিল অন্য ধ্বংসস্তূপের আড়ালে। তারপর এক-সময় উঠে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্যের মত ছুটেছিল। কোন্ পথে কোন্ মুখে ছুটেছিল তার হিসাব করে নি, করে তো ফল ছিল না। ভেবেছিল, সারারাত্রি ছুটবে, যেখানে সকাল হবে, মানুষ দেখবে, চিৎকার করে বলবে, বাঁচাও। কিন্তু তার আগেই রাত্রির অন্ধকারে মাটি কেঁপে ওঠার সঙ্গে সে হোঁচট খেয়ে পড়েছিল আমার উপর। পড়ে আবার উঠে সে পালাতেই চেয়েছিল। হামাগুড়ি দিয়ে উঠবার চেষ্টা করে পারে নি। থরথর করে তার হাত-পা কাঁপছিল ভয়ে। আবার ভূমিকম্পের সঙ্গে ভয় তাকে এক মুহূর্তে অভিভূত আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। কোথায় যাবে ? কেমন করে যাবে ? তখনও পাথরের টুকরো গড়াচ্ছে চারিদিকে। যদি পায়ের তলায় মাটি ফেটে যায় ! বিশাল অন্তহীন গহ্বরের মধ্যে সে কোথায় হারিয়ে যাবে। আর সে উঠতে পারে নি, উপুড় হয়ে পড়েই ছিল। যে লোকটি শুয়ে আছে—সে যত ভয়ঙ্কর হোক, সে মানুষ। আর পুরুষের কাছে নারীর যে ভয়, সে ভয় আজ মুখ বাড়াতে সাহস করবে না। তারও চেয়ে বড় ভয় নখ দাঁত বিস্তার করে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বাঘের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দ বনভূমির মত মানুষের অন্তরের অবস্থা। তৃষ্ণা স্তব্ধ, ক্ষুধা স্তব্ধ, কাম স্তব্ধ, সব স্তব্ধ। অকস্মাৎ একসময় শীতের তীব্রতা বাঘের তীক্ষ্ণ নখের মত তাকে স্পর্শ করেছিল। তখন সে আর পারে নি, হামাগুড়ি দিয়ে এসেই আমার কম্বলের মধ্যে ঢুকেছিল অসঙ্কোচে। আমাকে জড়িয়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিল।

আমি সব শুনে বলেছিলাম, আমি তোমাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেব।

সে শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। তারপর বলেছিল, তুমি সন্ন্যাসী, তুমি পুণ্যবান, আমার দেহ পাপে ভরা। ওরা ভরে দিয়েছে পাপে। কিন্তু আমার রূপ ছিল, আজও রূপ আছে। আমার অন্তরে অগাধ ভালবাসা আছে। সে সব তোমাকে দিয়ে আমি ধন্য হতাম। কিন্তু তুমি সন্ন্যাসী।

আমি সস্নেহে তার মুখে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলাম।

মুহূর্তের প্রশ্রয়ে সে তার মুখখানা আমার মুখের উপর চেপে ধরেছিল।

জীবন যখন জীবনকে সত্যকার আবেগে সমাদর করে, তখনকার আনন্দ পরমানন্দ, শিবনাথ। একের সমাদরের আবেগ অপরের আবেগকে জ্বালিয়ে তোলে প্রদীপের মুখের শিখার মত। সে প্রদীপ, আমি শিখা। প্রদীপ্ত হয়ে উঠলাম সেই হিমরাত্রির শেষ প্রহরে। জন্ম ও মৃত্যুর দুটি প্রান্তের মাঝখানে জীবন সকল প্রশ্ন, সকল দুঃখ, সকল ভয় ভুলে এই প্রজ্বলনেই বোধ বোধ করি সার্থক হয়ে ওঠে।

সেই অবস্থাতেই, মুখের কাছে ছিল মুখ, বোধ করি মহাপ্রকৃতির অমোঘ আকর্ষণে, চুম্বকের আকর্ষণে লোহার মত, আমার অধর তার অধরের উপর আবদ্ধ হয়েছিল। আমি তাকে চুম্বন করেছিলাম। অনেকদিন আগে শান্তির মুখে চুমু খেয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিয়েছিলাম ভয়ে লজ্জায়। আজ প্রলয়-রাত্রির শেষ প্রহরে এ মেয়েটিকে প্রকৃতির আকর্ষণে চুম্বন করে-ছিলাম, কিন্তু তার মধ্যে ছিল অগাধ করুণা। ভোর তখন হয়ে আসছিল। আব্‌ছা আব্‌ছা আলো ফুটছিল। দেখা যাচ্ছিল দিগন্ত। আমরা উঠে বসলাম। পরস্পরের দিকে তাকালাম। সে হাসল, আমি হাসলাম। তারপর বললাম, ওঠ, চল, হাত ধর।

সে চারিদিকে চেয়ে একবার দেখলে। তারপর দূরে ধ্বংসস্তূপে পরিণত একটা ছোট গ্রামকে দেখিয়ে বললে, ওই গ্রামটা বোধ হয়। হ্যাঁ, ওইটে।

তার চোখে ভয় ফুটে উঠল।

আমি বললাম, কোন ভয় নেই। চল।

(খ)

আমার পরমায়ুর সীমা খণ্ডন করে আর কয়েকটা দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হিতোপদেশে পড়েছিলাম, অনন্তপারং কিল শব্দ-শাস্ত্রং, স্বল্পং তথায়ু বহবশ্চ বিঘ্নাঃ। শব্দ-শাস্ত্রের সীমা দীর্ঘ, না জীবনের চলার পথ দীর্ঘতর—সেই কথাটাই মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে। কেন জান? ভাবছি, জীবনের সব কি প্রকাশ করা যায়? যায় না। তার উপর আমার আয়ু স্বল্প থেকেও স্বল্পতর হয়েছে।

ওই রাত্রির অবসানকালে সেদিনের নূতন প্রভাতে তাকে যখন দেখেছিলাম, সেই মুহূর্তের মনের কথা নিয়ে একখানা মহাকাব্য হয়। যতটুকু আলো ফুটলে মানুষের মুখ স্পষ্ট দেখা যায় শিবনাথ, সেই আলোটুকু ফুটবামাত্র তার মুখের দিকে চেয়ে আমি চমকে উঠেছিলাম। এ মেয়ে কী মেয়ে? কেমন মেয়ে? শীর্ণ দেহ, শুধু যেন চামড়া-ঢাকা কঙ্কাল, মুখের চামড়ার অন্তরাল থেকে চোয়াল চিবুকের হাড়গুলো রূঢ়ভাবে প্রকট হয়ে মুখখানাকে দেখাচ্ছে লম্বাটে; কিন্তু তার মধ্যে কী দুটি চোখ! সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল মরুভূমির মধ্যে দুটো জলাশয় শুধু টলমলই করছে না, মরুভূমির আকাশের প্রখর সূর্যের প্রতিচ্ছটায় গলা রুপোর দুটো সরোবরের মত ঝলমল করছে। মুখের বিশীর্ণতায়, দেহের জীর্ণতায়, কপালের উপর কয়েকটা শুকনো ক্ষতচিহ্নে, অনাবৃত বাহু দুখানার কালসিটের দাগের মধ্যে বহু নির্যাতনের কথা লেখা আছে, কিন্তু চোখের মধ্যে এতটুকু একবিন্দু ক্লান্তি বা মলিনতার চিহ্ন নেই। হয়তো বা সেই দিন সেই উদয়মুহূর্তে সে যে আশায় সঞ্জীবিত হয়েছিল, সেই সঞ্জীবনীবর্ণচ্ছটা চোখেই প্রকাশ পেয়েছিল, সব ক্লান্তি, সব ভীতি, সব নৈরাশ্যকে মুছে দিয়ে। সে বিচার থাক্। যা দেখেছিলাম তাই বলছি। দু-চারজন বা দু-একজন যক্ষ্মারোগীর চোখে এমনই দীপ্তি দেখা যায়।

তার পরনে ছিল কালো রঙের একটা জামা আর তেমনি কালো রঙের শাড়ি, আর ছিল একটা বোরখা। সিঁথি ছিল বাঁকা, একপাশে। নাকে নাকছাবি আর হাতে একহাত কাচের চুড়ি।

ওখান থেকে যাত্রার জন্য তার হাত ধরতেই সে পা বাড়িয়েও থমকে দাঁড়াল। বললে, একটু দাঁড়ান।

—কেন?

—আপনার আর গেরুয়া কাপড় নেই?

—আছে। কেন?

—আমাকে দিন। পোশাকটা পালটে নেব।

সবিস্ময় প্রশ্নের সঙ্গেই তার মুখের দিকে তাকালাম। মেয়েটির চতুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, আমার বিস্ময় সে বুঝে নিয়ে বললে, ওই যে গ্রামখানা আর তার পাশের গ্রামখানা, সবই এমনি বদমাইশ লোকের আড্ডা। ওরা ভয়ানক। চুরি ডাকাতি খুন, এসব এদের বংশগত পেশা। এই পোশাকে আপনার সঙ্গে যাব, পথে অন্য লোক সন্দেহের চোখে দেখবে। ওরা কেউ দেখলে তো রক্ষে থাকবে না। এত বড় সর্বনাশের কথা সব ভুলে গিয়ে আপনার উপর ঝাঁপিয়ে

পড়বে? তা ছাড়া, ওই কাপড়জামায় সমস্ত শরীর আমার ঘিনঘিন করছে।

আমার সঙ্গে ছিল গেরুয়া কাপড়, চাদর, আলখাল্লা। তাই দিলাম তাকে।

একটা পাথরের আড়ালে গিয়ে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে সে পোশাক পাল্টে বেরিয়ে এল। হাতের চুড়িগুলো ভেঙে ফেলেছে, কপালের কাঁচপোকা টিপ নেই, নাকছাবি নেই, বাঁকা সিঁথি নেই, আঙুল চালিয়েই সিঁথি ঘুচিয়ে চুল এলিয়ে পিঠে ফেলে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। সে চুলের রাশি আশ্চর্য অদ্ভুত লাগল। গোটা মানুষটা যেন পাল্টে গেছে। মনে হল, এ যেন আজন্ম তপশ্চরণে কৃশতনু কোন সন্ন্যাসিনী। সব থেকে বিচিত্র সেই বিচিত্র চোখের দৃষ্টি। বিস্ফারিত এবং কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন। আমার দিকে তাকিয়ে বললে, আপনার গলায় দুগাছা রুদ্রাক্ষের মালা। আমাকে দিন একগাছা। বুঝলাম, মনের মধ্যে একটা প্রচণ্ড ভয় তাকে পরিত্রাণের পথসন্ধানে মগ্ন করে রেখেছে, শিকারীর ব্যূহের মধ্যে বন্দী জন্তুর মত। আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, ভয় কোর না। আমার দেহে জীবন থাকতে তোমার অঙ্গ কেউ স্পর্শ করতে পারবে না।

তার চোখের দৃষ্টি পালটাল। সে একটু হেসে বললে, তা হলে চলুন। তারপর নিজের বেশের দিকে তাকিয়ে বললে, নাঃ, সহজে কেউ ধরতে পারবে না।

কয়েক পা এগিয়ে আবার বললে, এমন নিরাপদ ছদ্মবেশ আর হয় না। সন্ন্যাসীর আবার নাম কী? তার আবার বাড়ি কোথায়? বাপ-মা পরিচয় এ সবই বা কী? গেরুয়ার আবরণে সব ঢাকা পড়েছে। সে আবরণ কারুর উন্মোচনের অধিকার নেই।

আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ, সন্ন্যাসীর বেশের আড়াল দিয়ে কত ভণ্ড, কত চোর, কত খুনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার তো সংখ্যা নেই।

অপ্রস্তুত হয়ে সে বলেছিল, না, না, সে কথা আপনাকে বলি নি। আমি বলছিলাম নিজেকেই। কেন জানেন? যে বাড়িতে আমার জন্ম, যা আমার জীবনের শিক্ষা, তাতে ঈশ্বর, ধর্ম, সন্ন্যাসী এসব কোনদিন মানি নি, বিশ্বাস করি নি। অথচ আজ দেখুন, সেই সন্ন্যাসীই আমার রক্ষাকর্তা। আমি সন্ন্যাসিনী সেজে নিজেকে যে কত নিরাপদ ভাবছি, সে আর আপনাকে কী বলব! মনে হচ্ছে, ভগবান আমাকে ঘিরে রয়েছেন।

খানিকটা নীরবে পথ চলে আবার বললে, আমার বাবা একেবারে নাস্তিক ছিলেন। তিনি আমাদের শেখাতেন, ভগবান মানে ভেল্কি, ভেল্কির আসল মানে ভুয়ো, ভুয়োর আসল মানে চিচিংফাঁক। ঈশ্বর নামের প্রস্তর, প্রস্তরে মাথা ঠুকে প্রণাম করলে ফেটে রক্ত পড়ে; যার চাল-কলা-নৈবেদ্য পুরুতবামুনে খায়; বিশ্বাস না হয়, সারা দেশ ভ্রমণ করে দেখ।

আর একটু থেমে বললে, আজ এই মুহূর্তে সব মনে পড়ছে। ছেলেবেলা মিশনারি ইস্কুলে পড়বার সুযোগ পেয়েছিলাম। চৌদ্দ বছর পর্যন্ত মিশনেই কেটেছে। জাত মানতাম না, বাবা-মাই মানতেন না, আমি তাঁদের কাছে শিখেছিলাম; কিন্তু তবুও হিন্দু বলে ইস্কুলের প্রেয়ারের সময় মুখ টিপে হাসতাম। আবার ক্রীশ্চান ছেলেমেয়েরা হিন্দুর পুতুলপুজো নিয়ে যখন ঠাট্টা করত, তখনও খুব খুশী হতাম। বাবা ছিলেন সমাজ-না-মানা লোক। সমাজ জাত ধর্ম ঈশ্বর কিছুই মানতেন না। পড়েছিলেন আই. এস-সি. পর্যন্ত, পাস করে বিয়ে করলেন ব্রাহ্ম মেয়ে, এবং বাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়ে ঢুকলেন রেলের চাকরিতে। অ্যাসিস্ট্যাণ্ট স্টেশন মাস্টার। উন্নতি হয় নি। যেখানে গেছেন, লোকের সঙ্গে ঝগড়া করেছেন ওই জাত ধর্ম আর ঈশ্বর নিয়ে। আমার যখন চোদ্দ বছর বয়েস, তখন মা মারা গেলেন। বাবা তখন স্টেশন মাস্টার হয়েছেন। ছোট্ট স্টেশন। বাবা বাধ্য হয়ে বাড়ি নিয়ে এলেন আমাকে।

ছোট তিনটি ভাই আছে, দেখতে শুনতে হবে, দুবেলা দুমুঠো ফুটোতেও হবে। পড়া অবশ্য ছাড়ালেন না, তিনি নিজেই পড়াতেন। তার মধ্যে ও-ই ছিল শিক্ষার মূল কথা। কানা-খোঁড়া ছাড়া ভিক্ষে কাউকে দিতে বারণ ছিল। এ ছাড়া কেউ ভিক্ষে করতে এলে বলতাম, খেটে খাও গিয়ে। ছোট্ট একটা উপদেশমূলক বক্তৃতাও মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। সন্ন্যাসী এলে, বাবা বাড়ি থাকলে বলতেন, নিকালো, আভি নিকালো। আমার উপর উপদেশ ছিল, দরজা খোলা থাকলে বন্ধ করে দেবে, বন্ধ থাকলে খুলবে না। কখনও কোন পুজোয় চাঁদা দেন নি।

কথা বলতে বলতেই সে চলেছিল। বোধ করি অনেক কাল এমন নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে মনের দুয়ার অবাধ উন্মুক্ত করে তার অন্তরের মানুষ খোলা দিগন্তের দিকে দৃষ্টি রেখে দাঁড়িয়ে থাকবার সুযোগ পায় নি। আমি শুনেই চলেছিলাম। আমার কোন উত্তরের জন্য সে মুহূর্তের জন্যও থামে নি, আমিই বা কী বলব! প্রশ্ন যেখানে নেই, সেখানে কথার মাঝখানে কথা বলবার অবকাশই বা কোথায়? আমার বুকের মধ্যে শুধু চলছিল আশ্চর্য আলোড়ন, নলিনীর প্রতিটি কথায় আমার যেন চমক লাগছিল। এ মেয়ে আশ্চর্য মেয়ে! বলতে ভুলেছি, ওর নাম নলিনী।

বাবার কাছে পড়েই নলিনী ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিল—পাসও করেছিল ফার্স্ট ডিভিসনে। সুন্দরী মেয়ে। শুধু সুন্দরী নয়, ওর ওই বড় বড় দুই আশ্চর্য চোখ আর বিপুল চুলের রাশ তাকে মোহময়ী করে তুলেছিল। বাবার সহকর্মীরা বলেছিলেন, এবার বিয়ে দিন মেয়ের, মাস্টারবাবু। লেখাপড়া-জানা এমন সুন্দরী মেয়ে, আর টাকা-পয়সারও তো অভাব নেই। নলিনীর বাবা টাকা সত্যিই জমিয়েছিলেন।

নলিনীর বাবা বলেছিলেন, বিয়ে দেব, কে বিয়ে করবে হে? পাত্র কই? আর আমিই বা বিয়ে দিতে যাব কেন? মেয়ে পছন্দ করে বললেই আমি আয়োজন করব। তবে আমার ইচ্ছে, ও বি. এ. পাস করুক আগে। তারপর যা হয় হবে। তবে হ্যাঁ, যদি কোন রাজপুত্তুর কি নবাবপুত্তুর এসে বলে, বিয়ে করতে চাই তোমার মেয়েকে, তবে না হয় বিবেচনা করে দেখি।

স্বাভাবিক ভাবেই কেউ কেউ প্রশ্ন করেছেন, বলেন কী? নবাবপুত্তুর?

হা-হা করে হেসে বলতেন মাস্টারবাবু, নিশ্চয়। দোষ কী? আমি তো জাত মানি নে। নলিনী খুব ভাল মুর্গী রাঁধে। খেতেও ভালবাসে। বিফ্‌টা হেঁশেলে ঢোকে না, খাইও না। তবে সেটা, পাই নে তাই খাই নে। দু-চারদিন অসুবিধে হয়তো হবে, তারপর সব সয়ে যাবে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা, আর্য ঋষিগণ, পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে নধর গোবৎস খেতেন হে!

অট্টহাসিতে ভেঙে পড়তেন তিনি।

কথা বলতে বলতেই এসে উপস্থিত হয়েছিলাম এক মঠের সামনে।

গঙ্গার ধারে একটি দেবমন্দির। দেবমন্দিরটি আশ্চর্যভাবে অক্ষত রয়েছে। ভাঙে নি, ফাটে নি, অটুট আছে। তার সামনে হাজার জনের জনতা। কোলাহল কলরব করছে।

সাক্ষাৎ ভগবানের অধিষ্ঠান এখানে। জয় জয় ভগবান পরমেশ্বর। জয় দীননাথ।

কারণটা শুধু মন্দিরটি অটুট থাকাই নয়, মন্দির থেকে ভাণ্ডার খুলে লোককে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে।

আশপাশের ভেঙে-পড়া গ্রাম থেকে হাজার লোক এসে মন্দিরের সামনে একটা আমবাগানে আশ্রয় নিয়েছে।

—হে ভগবান, রক্ষা কর। হে দেওতা, থানে দেও।

আশ্রয় আমরা সেদিন সেইখানেই নিয়েছিলাম। গাছতলায় থাকতে হয় নি, সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনী দেখে তারা আশ্রমের মধ্যে একটু আশ্রয় দিয়েছিল।

নলিনী ব্যঙ্গভরেই বলেছিল, ভগবান সত্যিই ভাল লোক। এই শীতে দুর্যোগে আশ্রয় দিলেন, তখন ভাল তো বলতেই হবে।

পরমুহূর্তেই আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, আমাকে মাফ করবেন। কথাগুলো নিজের অজান্তে বলে ফেলেছি অভ্যাসবশে, মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। আমি নিজে সন্ন্যাসিনী সেজেছি প্রাণের দায়ে। কিন্তু আপনি সন্ন্যাসী, ঈশ্বরবিশ্বাসী সাধু, সে কথা ভুল হয়ে যাচ্ছে আমার।

আমি বলেছিলাম, না। মিথ্যে তোমাকে বলব না, ঈশ্বরবিশ্বাস আমার ভেঙে গেছে, শূন্যে মিলিয়ে গেছে। পাঁচ বছর মনের আবেগে গোটা ভারতবর্ষ ঘুরে সেই বিশ্বাস ভেঙে গয়ায় এসেছিলাম, ইচ্ছা ছিল যাব বুদ্ধগয়া। বুদ্ধগয়ায় বোধিদ্রুমের তলায় আমার সন্ন্যাসীর বেশ, আমার সন্ন্যাস রেখে বলে আসব ভেবেছিলাম, বুদ্ধ এখানে নির্বাণ পেয়েছিলেন, আর আমি কিছু না পেয়ে সন্ন্যাসকে পরিত্যাগ করে ঘরে ফিরছি।

সে অবাক বিস্ময়ে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে ছিল। তারপর বলেছিল—বলবার সময় তার সেই আশ্চর্য দুটি চোখ নিস্তরঙ্গ সরোবরের মত বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, ছেড়ে দিলেন সন্ন্যাস?

বলেছিলাম, হ্যাঁ। অকপটে তোমাকে বলছি, আমি পাই নি কিছু।

—এত অল্পদিনে কি সেই বস্তু পাওয়া যায়?

—অল্পদিন তো নয়। আমার বয়স আজ তিরিশ বৎসর, এ সন্ধান তো বিশ বছর করছি। যা শিখেছি ইস্কুলে, তারপর যা পড়েছি, তাকে অবিশ্বাস করে এই বিশ্বাসে জীবনের সব দাবিকে উপেক্ষা করে ঘুরেছি। উন্মাদের মত ঘুরেছি, কিন্তু কই? কোথায় কী?

সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল, আমার যে মনে উল্টো সাধ জেগেছিল। কাল রাত্রে যখন মৃত্যু-হিমানীর স্পর্শ সহ্য করতে না পেরে আপনার কম্বলের মধ্যে ঢুকেছিলাম, তখন আপনার বুকে মালার স্পর্শ অনুভব করে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি কি ফকির, না সন্ন্যাসী? ফকির হলে বলতাম বাড়িঘর পড়ে গেছে, ভয়ে পালিয়ে এসেছি। সব মরে গেছে। আমার বাপের দেশ বাংলাদেশ কলকাতা। সেখানে যাব। অন্য সব কথা বলতাম না। আপনি বললেন, আপনি হিন্দু সন্ন্যাসী। মুহূর্তে মনে আমার আশা হল; দুষ্ট মুসলমানেরা আমাকে আটকে লুকিয়ে রেখেছে, এ জানলে কি আপনি আমাকে বাঁচাবেন না? বলেছিলামও তাই। সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হয়েছিল, যদি চোর হন, ডাকাত হন, তা হলে এক অগ্নিকুণ্ড থেকে আর এক অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়া হবে। দুষ্ট মানুষের লাম্পট্যের নগ্নরূপ আমি দেখেছি। যে ডাকাতের দল আমাকে লুঠ করেছিল, তার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান সব ছিল। আমাকে লুঠে নিয়ে পালাচ্ছিল নৌকোতে। সেই রাত্রে দলের প্রতিটি লোক আমার উপর অত্যাচার করেছে। ওখানে কোন তফাত নেই। আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। ভোরবেলা আমার সবে জ্ঞান হয়েছে। দেহ অসাড়, যন্ত্রণাও বোধ হয় অনুভব করতে পারছি না; মনে আতঙ্ক; গলা থেকে বুক পর্যন্ত শুকনো কাঠ: কোন চিৎকার, কোন দেহ-আক্ষেপ প্রকাশ পায় নি; শুধু অস্পষ্ট দূরের মানুষের কথার মত কথা কানে আসছে। শুনলাম, এই তোমার ভাগ, এই তোমার। একজন বললে, মেয়েটাকে মেরে ফেলে গাঙের পলির নীচে পুঁতে দাও। নইলে বিপদ হবে। ধরা পড়তে

হবে একদিন। আমাদের গরিবের ঘর, ও রূপের মেয়ে দেখলে পাঁচজনে পাঁচকথা কইবে। আর বাঁচিয়ে রাখলেই বা ওকে নেবে কে? একজন বললে, আমি নেব। আমার ভাগের আধা আমি দিয়ে দিচ্ছি। ও আমার। তোদের হিন্দুর ঘর নয় আমাদের। আমি বোরখা পরিয়ে রাখব। সঙ্গে সঙ্গে আরও তিন-চারজন বললে, সে আমরাও পারি। ও আমি নেব। খানিকটা ঝগড়া, শেষে হাতাহাতি হল। তারপর হল আপস। এরা এক গ্রামের তিনজন আমাকে লুঠের সম্পত্তি হিসাবে ভাগে নিলে। তারপর ভোরের অন্ধকারে নিয়ে গেল এক গাঁয়ে। তারপর গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। একদল থেকে অন্যদল। শেষে এনে ফেলেছিল এই গ্রামে। আনোয়ার এখানকার বিখ্যাত পাষণ্ড। দেশ-দেশান্তরে ডাকাতি করে। কতদিন কত রাজপুত এসেছে, দু-চারজন পাঞ্জাবী এসেছে, আনোয়ার আমার দেহ দিয়ে তাদের সম্বর্ধনা করেছে। ঘরের মধ্যে অসহায় অবস্থায় ভগবানকে কত ডেকেছি, আবার ভগবানকে ডাকার জন্যে নিজেকে ব্যঙ্গ করেছি। আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম জীবনটা এমনিই যাবে। হঠাৎ কাল যখন মাটির ভিতর থেকে রেলগাড়ির মত গর্জন উঠল—থর থর ক'রে কাঁপতে লাগল সব, তখন সব চেয়ে আশ্চর্য কী জানেন? আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম। এবং চেয়েছিলাম ভগবানের কাছে। বলেছিলাম—বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও, হে ভগবান, হে ঈশ্বর, হে প্রলয়ঙ্কর, হে করুণাময়! ওদের তুমি ধ্বংস কর, আমাকে বাঁচাও। তাই বাঁচলাম, একখানা কড়ির উপর ধ্বংসস্তূপটা আমার মাথার উপর ঠেকে রইল। রাত্রি হল; চিৎকার শুনলাম, কান্না শুনলাম। আনোয়ারের বাড়ির কারও সাড়া পেলাম না। একসময় ভগবানকে ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে এলাম একটা ফাটলের মধ্য দিয়ে। অন্ধকারের মধ্যেই তাঁর নাম নিতে নিতে চলেছিলাম। তারপর—

একটুক্ষণ থেমে আবার বললে, আপনার কম্বলের মধ্যে ঢুকেছিলাম ভগবানের নাম নিয়ে। কিন্তু বিশ্বাস তো সে নয়। সে দায়ে পড়ে বিশ্বাস, ভয়ে বিশ্বাস। তাই আপনাকে জড়িয়ে ধরে মরণের হিম যে মুহূর্তে কাটল, সেই মুহূর্তে ওই কথা বলেছিলাম, তুমি সন্ন্যাসী, তুমি পুণ্যবান আমার দেহ পাপে ভরা। ওরা ভরে দিয়েছে পাপে। কিন্তু আমার রূপ ছিল, আজও আছে—অন্তরে আছে ভালবাসা। তোমাকে দিয়ে আমি ধন্য হতাম। কিন্তু তুমি সন্ন্যাসী।

কেন বলেছিলাম? অন্তরের ভয়ের তাড়নায়। সন্ন্যাসীর ধর্মে, সত্যে অবিশ্বাস করেই বলেছিলাম। যদি লম্পট হতে, যদি মিথ্যা সন্ন্যাসী হতে, তবে এ আত্মসমর্পণেই তুমি আমাকে বাঁচাতে। কিন্তু তুমি সস্নেহে আমার মুখে হাত বুলিয়ে দিলে। তোমার মুখে মুখ রাখলাম। তুমি আমায় চুমু খেলে, কিন্তু পশুর দংশন তো সে নয়। তার মধ্যে যে স্নেহের স্পর্শ পেলাম আমি। আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছি। তুমি মাথার চুলে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়েছ। তারই মধ্যে আশ্বাস পেয়েছি, বিশ্বাস ফিরেছে। মনে হয়েছে, তুমি সত্য সন্ন্যাসী, যার কথা বইয়ে আছে, যা অবিশ্বাস করেছি। সকাল থেকে সারাটা দিন তোমার সঙ্গে চলেছি, এক আশ্রয়ে সম্মুখে রাত্রি নিয়ে বসে আছি। আজ আমার ভয় নেই, উদ্বেগ নেই। প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেছি, ঈশ্বরের তপস্যা করে এমন একজনের নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছি। যদি রাত্রে আবার ভূমিকম্প হয়, মাটি ফেটে গহ্বর সৃষ্টি হয়, তবে তোমাকে জড়িয়ে ধরে নির্ভয়ে তার মধ্যে যেখানেই যাই আমার ভয় নেই। সারাটা দিনের মধ্যে নিজের কথা বলতে গিয়ে অনেক অবিশ্বাসের কথা বলেছি। কিন্তু এই গৈরিক তুমি বিসর্জন দেবে, সন্ন্যাস তুমি পরিত্যাগ করবে শুনে যে ভয় করছে আমার। ভেবেছিলাম, তোমার কাছে দীক্ষা নিয়ে ডাকব ঈশ্বরকে আর সেবা করব তোমার। তা ছাড়া যে পরিত্রাণের পথ নেই আমার।

গভীর সহানুভূতির সঙ্গে তার কথাগুলি শুনছিলাম। তার করুণ কণ্ঠস্বরে বেদনাভরা কথাগুলি যেন সেই নিশীথ রাত্রে বিলাপের মত মনে হচ্ছিল। কেউ যেন মৃদুগুঞ্জনে বিলাপ করছে। কী সান্ত্বনা দেব তাকে? অবশেষে বললাম, ভয় কী? ঈশ্বর না থাক, আমার সন্ন্যাস না থাক, আমি তো আছি। সে স্তব্ধ হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য; তারপর বললে, হ্যাঁ। তা বটে। তুমি তো আছ। কিন্তু তুমি আমাকে ফেলে দেবে না তো?

—না। না। না। আমার ত্রিসত্যে বিশ্বাস কর।

সে কাঁদতে লাগল। হাত বাড়িয়ে আমার পা ছুঁয়ে সে মাথায় ঠেকাল।

এর পর দুজনেই স্তব্ধ হয়ে গেলাম। কথা ফুরিয়ে গেছে। বাইরেও সব স্তব্ধ। রাত্রি গভীর হয়ে আসছে।

সচেতন হয়ে আমি বললাম, কোন ভয় নেই তোমার। তুমি একখানা কম্বল নাও, জড়িয়ে শুয়ে পড়। আমি ওই দোরের বাইরে একখানা জড়িয়ে পড়ে থাকব।

—না। সে আর্তস্বরে বলেছিল, না। একা আমি থাকতে পারব না।

—বেশ, তুমি ওই দিকটায় শোও। আমি এদিকটায় শুচ্ছি।

তাই শুয়ে ছিলাম। কিন্তু গভীর রাত্রে অনুভব করলাম, সে আমার কাছে এসে গা ঘেঁষে শুয়েছে। নিশ্বাসের শব্দ উঠছে তার। আমি হাত বের করে তার মুখের উপর বুলিয়ে দেখলাম। মুহূর্তে সে হাত চেপে ধরলে। বললে, ভয় করছে আমার। আমার বুক গুরগুর করছে। আমার মাথায় হাত রাখ তুমি।

তাই রাখলাম।

পরমুহূর্তে সে বললে, না, কালকের মত জড়িয়ে ধর তুমি। দুখানা কম্বল চাপা দাও। আমি কাঁপছি।

সত্যিই কাঁপছিল সে। মনে হল জ্বর এসেছে তার। অসঙ্কোচেই জড়িয়ে ধরলাম। দুখানা কম্বল এক করে দুজনে গায়ে দিলাম। তার অঙ্গের উষ্ণতা আমি অনুভব করলাম, সে উষ্ণতা ক্রমশ বাড়ছে। আমার দেহের উষ্ণতায় ক্রমে তার কম্পন থেমে এল। সে ঘুমিয়ে গেল ধীরে ধীরে। নিশ্চিন্ত গভীর ঘুম।

বোধ করি শেষরাত্রি তখন। মাটি আবার একবার কাঁপল। চারিদিকে কোলাহল উঠল, শাঁখ বাজল।

আমি তাকে ঠেলে দিয়ে বললাম, ওঠ। ওঠ। ওঠ।

সে বলল, না। ফাটুক না মাটি।

জ্বর তার তখন অনেক।

শিবনাথের কথা

এর পর সুদর্শনের নূতন জীবন। সাধারণের জীবন। বহু সহস্র কি বহু লক্ষ মানুষের সঙ্গে তার আর পার্থক্য নেই। একান্তভাবে মাটির মানুষ। ঘরসংসার, আর নানান্ সংগ্রহে সেই ঘরকে সাজিয়ে তোলা। ইঁট-কাঠ-পাথর সাজিয়ে ক্ষুদ্র একটি গণ্ডীর মধ্যে বাস্তব স্বর্গ গড়ে তোলা। সে এক সুখের স্বপ্ন-স্বর্গ। মনে হল কী ভুলই না সে করেছে এতদিন!

সমস্তের কেন্দ্রে নলিনী।

ওরা সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীর বেশ পাল্টেছিল ওখান থেকে কলকাতা আসবার পথে। সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনীর বেশ পরিবর্তন করা বাস্তবে বড় কঠিন। লোকের সন্দেহের আর অবধি থাকে না। বিংশ শতাব্দী দু হাজার বছর তো মানুষের ইতিহাসে মহাকালের কয়েকটা পলকপাত। তারও অনেক কাল আগে থেকেই গৃহীর বেশ ত্যাগ করে সন্ন্যাসী বেশ কেউ গ্রহণ করলে লোকের বিস্ময় জাগে না, একজন পাপীকে সন্ন্যাসীর বেশে দেখলেও বিস্ময় জাগে না, মনে হয়, অনুতাপে দগ্ধ হয়েছে লোকটি। শ্রদ্ধা না জাগুক, করুণা জাগে। কিন্তু যে মুহূর্তে সন্ন্যাসী গৈরিক ত্যাগ করে গৃহীর বেশ গ্রহণ করে, সেই মুহূর্তে মানুষের মনে জাগে হাজার সন্দেহ। তার উপর নারী সঙ্গে থাকলে তো কথাই নেই। কথাটা বুঝেছিল সুদর্শন। কিন্তু সমস্যার মীমাংসা করে দিয়েছিল নলিনী। বলেছিল, রাত্রে গাড়িতে দুখানা ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কাট। রাত্রে ট্রেনের কামরায় পোশাক বদল করলেই হবে। চড়ব সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী হয়ে, নামব গৃহী হয়ে। কিন্তু—

—কী কিন্তু?

একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, এ কি না করলেই নয়?

—না। যাতে বিশ্বাস ভেঙে গেছে, তাকে আঁকড়ে পড়ে থাকতে চাই নে। তোমার ভয় নেই, তোমার কাছে আমার বিশ্বাস আমি ভাঙি নি, ভাঙব না। তুমি যদি চাও, তবে যেখানে নামতে চাইবে, নামিয়ে দেব। যদি এই মঠেই থাকতে চাও, থেকে যাও। যদি সঙ্গে যাও, তবে আমার প্রথম কাজ হবে তোমাকে তোমার বাবার খোঁজ করে তাঁর কাছে পৌঁছে দেওয়া।

সে কথার কোন উত্তর দেয় নি, শুধু সে কেঁদেছিল।

—কাঁদছ কেন? প্রশ্ন করেছিল সুদর্শন।

কান্নার মধ্যে বিচিত্র হেসে সে বলেছিল, এত বড় কথাটা তুমি বললে? তারপর একটু চুপ করে থেকে বললে, আজ এক বছর তেরো মাস হয়ে গেল, দেহের উপর পশুর অত্যাচার চলেছে, কানে শুনেছি অশ্লীল কুৎসিত কটু গালিগালাজ। কেউ একটা মিষ্টি কথা বলে নি। শেষের দিকে এক বুড়ী খেতে দিত। সেও গালাগাল দিয়ে চড়-চাপড়টা মেরে যেত। আর কিছুদিন গেলেই আমাকে রাস্তার ধারে এঁটো ছেঁড়া পাতার মত ফেলে দিত। ভিক্ষে করতাম। ফিরে যাবারও ইচ্ছে থাকত না। হয়তো ভিক্ষুকদের মধ্যেই আবার কাড়াকাড়ি পড়ত আমাকে নিয়ে, কুকুরের মত। এও যে এই মহাদুর্যোগের মধ্যে সুযোগ পেয়ে বেরিয়ে পালাচ্ছিলাম, সে কি বাড়ি, না বাবার কাছে?

ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললে, না। পালাচ্ছিলাম অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে। কোথায় তা জানতাম না। অনুদ্দেশ যাত্রা। যেখানে গিয়ে পড়ি। যা ঘটে কপালে। যে হোক, যে জাত, যা অবস্থা, মুটে-মজুর-চাষী-চণ্ডাল, যে স্নেহ করে আশ্রয় দেবে, যে পশু নয়, যার বুকে দুঃখীর প্রতি একটু মমতা আছে—সে যদি স্ত্রীর অধিকার দিয়ে দেহ চায় তাকে দেহ দেব, সঙ্গে সঙ্গে আমার হৃদয় দেব। যে খাটিয়ে খেতে দিতে চায়, দাসী চায়, তার কাছে তাই হয়ে থাকব। তোমাকে পেয়ে সাধ জাগছিল, তোমার কাছে এসব পাব। তোমার শিষ্যা হব, সেবিকা হব, স্নেহ পাব, অধিকার পাব। তুমি সন্ন্যাসী, তাই এসবের উপরে আরও কিছু পাব, যাতে এই এক বছরের সব গ্লানি, সব দুঃখ মুছে যাবে। তুমি সাধনা করে ঈশ্বর পাবে, আমি পাব তার প্রসাদ।

দু চোখ বেয়ে অজস্র ধারায় জল নেমে এল।

সুদর্শন মুগ্ধদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল। এ কী অপরূপ জীবন-মাধুর্য! যে মেয়ে কাঁদে সে মেয়ে এমন লোভনীয় মোহে মোহময়ী হয়ে ওঠে! মোহ তো হাস্যে-লাস্যে, বিলোল কটাক্ষে!

সুদর্শন এখানে কয়েকটি কথা বড় ভাল লিখেছে। এইখানে সে লিখেছে, শিবনাথ, ছেলেবেলা থেকে পুরাণে কাব্যে পড়েছি, সে আমাদের দেশেরই হোক, আর অন্য দেশেরই হোক, তপস্বীর তপস্যা চিরকাল ভেঙেছে নারীর মোহে।

মুনিগণ ধ্যান ভাঙি দেয় পদে তপস্যার ফল,
তোমারি কটাক্ষঘাতে ত্রিভুবন যৌবন চঞ্চল।
... ...
তব স্তন-হার হতে নভস্তলে খসি পড়ে তারা—
অকস্মাৎ পুরুষের বক্ষমাঝে চিত্ত আত্মহারা।
নাচে রক্তধারা।

শিবনাথ, আমি তার চোখের জলে ভেসে গেলাম; ডুবে গেলাম।

তখন ভরা দ্বিপ্রহর। মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা বাজছে, ভোগ হচ্ছে। আমরা রুদ্ধদ্বারকক্ষে বসে কথা বলছিলাম। এর আগে দুদিন রাত্রে সে এসে আমার বুকের তলায় ভীরু আশ্রয়-প্রার্থীর মত আশ্রয় নিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল; আমি তাকে সস্নেহে আশ্রয় দিয়েছিলাম। আজ আমি সপ্রেমে গাঢ় অনুরাগে তার মাথাখানি বুকে চেপে ধরেছিলাম, বলেছিলাম, সংসার স্বর্গসুখ সব আমার তুমি, নলিনী। জীবনে বহু অশান্তি ভোগ করেছি, মরীচিকার পিছনে ছুটেছি। সোনার হরিণ ধরতে গিয়ে নিজের সব হারিয়েছি। মিথ্যার পিছনে ছুটতে আর পারব না, বোল না। সন্ন্যাস নয়, ঘর। ঘর-সংসার, তুমি-আমি। এই সত্য। আমি বলছি, এই সত্য। জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানে জীবন সত্য। অমৃত না থাক্, জীবনে মধু আছে।

আমার বুকের মধ্যে রক্তধারা সত্যই নাচছিল শিবনাথ।

মদনভস্ম অলীক কথা। মদন চিরদিনই তনুর মধ্যে অতনু হয়ে বসতি করেন।

ওখান থেকে পরদিন রওনা হয়ে আমরা মাঝপথে নেমেছিলাম নলহাটিতে। ললাটেশ্বরী দর্শনের ছল করে নেমেছিলাম। ওখান থেকে কলকাতা আসবার পথে ফার্স্ট ক্লাসে বেশ বদল করে সেজেছিলাম গৃহী।

(খ)

অর্থ কিছু সুদর্শনের কাছে ছিল। তার সম্পত্তি বিক্রয় করে যে টাকা সে সংগ্রহ করেছিল, তা সেকালে এবং একজন সুস্থদেহ কৃচ্ছ্রসাধনকারীর পক্ষে কম ছিল না। তার উপর হয়েছিল সেই চোর-সন্ন্যাসীর উত্তরাধিকারী।

আজ সন্ন্যাসবেশ পরিবর্তনের সময় সে প্রথম খরচ করলে সেই টাকা।

অনেক চিন্তা করেই সে কাজটা করেছিল।

ললাটেশ্বরীর আশ্রমে এসে সে পুরোহিতকে বলেছিল, দেখুন বাবা, আমরা স্বামী-স্ত্রী সন্ন্যাস নিয়েছি, কিন্তু ঠিক সন্ন্যাসী নই, ভিক্ষা করে খাই না। আমাদের ইচ্ছা, এখানে আমরা নিজেদের খরচেই থাকি। আর যে উদ্দেশ্যে এখানে আসা, সেটি একটু বিচিত্র। আমরা কখনো আসি নি, আসবার ইচ্ছে করেও আসতে পারি নি। এবারও এখানে আসছিলাম না। যাচ্ছিলাম গয়া হয়ে কাশী, প্রয়াগ, উত্তরভারত। হঠাৎ পথে, গৈবীনাথের ওখানে হল ভূমিকম্প। সেখানে এক মঠে আটকে ছিলাম। সেই মঠেই গত পরশু রওনা হবার আগে ইনি স্বপ্ন দেখেছেন যে, যেন গৃহী হয়ে আমরা সংসারে আছি, সুখে আছি, এবং একটি দম্পতি এসেছেন আমার বাড়ি, তাঁরা বলছেন, আমাদের এবার কাপড়-চোপড় হয় নি, আমাদের কাপড়-চোপড় দাও, মঙ্গল হবে। উনি জিজ্ঞাসা করেছেন, কোথায় বাড়ি মা তোমাদের ? তা মেয়েটি বলেছেন, নলহাটি, ললাটেশ্বরী তলায় স্বামী-স্ত্রীতে থাকি। তাই সকালে উঠেই এখানে রওনা হয়েছি। উদ্দেশ্য কিছু বস্ত্র দান করব। গরিবদের কিছু দেব এবং কোন ভদ্র গৃহস্থের স্বামী-স্ত্রীকে উনি অর্চনা করবেন, শাড়ি, জামা, গন্ধদ্রব্য, ধুতি, পাঞ্জাবি ইত্যাদি দিয়ে। তা কোন ভাল দোকানে আমাকে নিয়ে চলুন।

সুদর্শন লিখেছে, শিবনাথ, বিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিমান মানুষের সংসারের ফটকে পা দিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে বুঝে নিয়েছিলাম, বুদ্ধিমানের জগতে বিশ্বাসের চেয়ে সন্দেহ বড়। সত্যকে এখানে প্রমাণ করতে হয়, সত্যের চেয়ে প্রমাণ বড়। কথাটা বিশেষ করে মনে হয়েছিল নলিনীর দিকে তাকিয়ে।

এমন একটি রূপবতী সন্ন্যাসিনীকে নিয়ে অকস্মাৎ বেশ বদল করে গৃহী সাজা তো সোজা নয়। সত্য বললে মহাবিপদ। বাংলা দেশে লীগ-রাজত্ব। যে মেয়ে এক বৎসরের উপর মুসলমানের ঘরে ছিল, তাকে আর যা-ই কর, হিন্দুর ঘরে হিন্দু বলে নিয়ে যাওয়ার পথে অনেক বাধা-বিপদ।

একা আমার পক্ষেও সোজা ছিল না। সন্ন্যাসে কিছু পাই নি, বিশ্বাস হারিয়ে ঘরে ফিরছি বললেও রেহাই নেই। প্রমাণ করতে হবে তোমাকে যে, সন্ন্যাস-জীবনে কোন অপরাধ তুমি কর নি।

ঈশ্বর খুঁজতে সন্ন্যাসী হয়ে ঈশ্বর না পেয়ে ফিরে এলে, এ সোজা সত্যের তো কোন মূল্য নেই। কারণ, ঈশ্বর পাওয়া বা না পাওয়া তো এ যুগের সমস্যাই নয়।

তার উপর সন্ন্যাসিনী সঙ্গে থাকতে তো কথাই নেই। তাই ভেবে-চিন্তে প্ল্যানটা ঠিক করেছিলাম এবং ওটা আশ্চর্যভাবে ফলবতী হয়ে গেল। পুরোহিতকে বললাম, আপনারা স্বামী-স্ত্রীতে যদি ওর পূজা নেন, তবে আমরা কৃতার্থ হব। কাপড়-চোপড়, প্রসাধনদ্রব্য সব কিনেছিলাম। একশো টাকার উপর খরচ হয়েছিল। কিনেছিলাম—একপ্রস্থ নয়, দু-তিনপ্রস্থ। এক এক প্রস্থ রেখে দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, এ প্রস্থটা অন্যত্র দান করব। ফল হয়েছিল আশ্চর্য !

সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট কেনাতেও কেউ বিস্মিত হয় নি। রটে গিয়েছিল ধনী দম্পতি একমাত্র সন্তান হারিয়ে সন্ন্যাস নিয়ে তীর্থ করে বেড়াচ্ছে।

বিশীর্ণা বিষণ্ণ নলিনীকে দেখে কেউ তা অবিশ্বাস করে নি। আশ্চর্য শিবনাথ, তার বিষণ্ণ উদাসীনতা যেন গাঢ়তর হচ্ছিল একটি মেঘলা দিনের সন্ধ্যার আকাশের মত। আমি

লক্ষ্য করেও লক্ষ্য করি নি।

একবার তুবার কপালে হাত দিয়ে দেখেছিলাম, তার আবার জ্বর এসেছে কিনা। প্রশ্ন করেছিলাম, শরীর খারাপ করছে ?

ঘাড় নেড়ে সে বলেছিল—না।

—তবে ?

একটু ম্লান হেসে বলেছিল—কেমন যেন ভয় করছে।

—আমাকে ভয় হচ্ছে তোমার ?

—তোমাকে ভয় ? না। তুমি আমাকে সকল ভয় থেকে উদ্ধার করেছ।

—তবে ?

—ঠিক জানি না। তবে যেন মনে হচ্ছে, এই গেরুয়া কাপড় আর রুদ্রাক্ষের মালা—এই ছুটো দিন আমাকে আশ্চর্য পাকে জড়িয়ে ফেলেছে।

একটু চুপ করে থেকে আমি বলেছিলাম, এতে যদি তৃপ্তি পাও তো তোমাকে আমি কোন সন্ন্যাসিনীদের আশ্রমে তুলে দিতে পারি।

তার দুঃখের বিষণ্ণ হাসি আরও একটু ফুটে উঠল। সেই আয়ত চোখ দুটি কয়েক মুহূর্ত আমার মুখের উপর আমার চোখের সঙ্গে মিলে স্থির হয়ে রইল, হিমালয়ের তুষারাবৃত অঞ্চলের আকাশপানে চেয়ে থাকা দুটি নিস্তরঙ্গ ছোট হ্রদের মত। আমার ছায়া তার চোখের তারায় ফুটে উঠেছিল। শিবনাথ, অনেক সময় চোখের নীরব দৃষ্টিতে লুকানো কথা যা ব্যক্ত হয়, গভীর আবেগে প্রগল্‌ভতার মধ্যে তার কিছুই ব্যক্ত হয় না। এ সেই দৃষ্টি। কিছুক্ষণ পর সে বলেছিল—তোমায় ছেড়ে আমি তো বাঁচব না।

বিংশ শতাব্দীর সিংহদ্বারে পা দিয়েছি—কলকাতা নামব, নেমে ঢুকব নূতন কালে, নূতন জীবনের মধ্যে। পুরাতন ছেড়েছি। তার কোন মমতা নেই। তবু আমি একথা শুনে হেসে উঠতে পারি নি। বিংশ শতাব্দী—এই বুদ্ধি এবং সকল কিছুকে অস্বীকৃতি, এই অবিশ্বাসের যুগে প্রেম কোথায় ? রাস্তা তো আর মাটির নয়, ঘাস—ঘাসের ফুলের কাব্য কোথায় সেখানে ? পিচের রাস্তা, কংক্রিটের রাস্তা। এখন বনমহোৎসব হয়, গাছ পোঁতা হয়, সে ফুলের জন্য নয়, ঘনতর বর্ষার জন্য। ফুল সে গাছে ফুটলেই বা দেখে কে ? দেখার অবসর কোথায় ? প্রশ্ন—দেখে হবে কী ? আমি মনকে সেই মনে পরিণত করেছি, আমি ফুল চাই না, ফসল চাই। তবু ওর দৃষ্টি এবং কথা শুনে তখন কিছুক্ষণের জন্য উদাসীন হয়ে গিয়েছিলাম। কথার উত্তর দিতে পারি নি।

গাড়ি চলছিল—রাত্রির গাড়ি। দু-দিকের প্রান্তর অন্ধকার। সেদিকে চেয়ে কোন দর্শনতত্ত্ব চিন্তা করবার মত মন আমার ছিল না; আমি ভাবছি সম্মুখের কথা। সিগন্তাল আসছে। গাড়ি চলছে ঝমঝম শব্দ তুলে; লোহার রথ চলছে মানুষের নির্দেশে। মধ্যে মধ্যে স্টেশন। আমি ভাবছি কলকাতার কথা। সে হঠাৎ উঠে বললে—কই সেগুলো ?

—কী ?

কাপড়, ব্লাউজ, শায়া, স্নো-পাউডার চিরুনি ?

—এই যে।

—সেগুলি নিয়ে চলে গেল সে বাথরুমে।

আমি এ ঘরে পোশাক বদল করলাম। গেরুয়া রুদ্রাক্ষ—সব ফেলে দিলাম জানলা গলিয়ে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখলাম। চিনতে কষ্ট হল নিজেকে। একটু বেমানানও

লাগছিল—দাড়ি, গোঁফ, চুল ঠিক খাপ খাচ্ছিল না। বসলাম এসে সীটে।

নলিনী বেরিয়ে এল।

তাকেও চিনতে কষ্ট হচ্ছিল। সে ছিল মূর্তিমতী বৈরাগ্য। আর এ যে এক আধুনিকা অপরূপা তরুণী। তখন মোহ ছিল তার চোখে, তার রাশীকৃত চুলে। এখন মোহ তার সর্বাঙ্গে। চুল আর খোলা নেই, সে আধুনিক ছাঁদে এলোখোঁপা বেঁধেছে। মুখের ত্বকে তার স্নো-পাউডারের মাধুর্য। মোহ তার ব্লাউজের টাইট-হাতার বাইরে নগ্ন আধখানা বাহুতে। মোহ তার ব্লাউজের ভি-গলার অনাবৃত অংশে, মোহ তার কালোপাড় ফরাসডাঙা শাড়ির আধুনিক ছন্দের ছাঁদে ছাঁদে। তার ডাগর চোখে সে কাজল টানতেও ভোলে নি। ফর্দ সে-ই করেছিল, সে কোন কিছুই ভুল করে নি। মোহ তার কাজলটানা দুই আয়ত চোখে। যে নারী সন্ন্যাসিনীর গৈরিকে, রুদ্রাক্ষের মালায় ছিল মূর্তিমতী বৈরাগ্য, সে এই নব বেশভূষা-প্রসাধনে হয়ে উঠেছে জ্যোৎস্না-রাত্রির অজস্র পুষ্পে পুষ্পিতা কামিনী-মালঞ্চ।

আমি দু চোখ ভরে তাকে দেখলাম। সে বিষণ্ণ হাসিমুখেই দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষণ পর বললাম, বোস।

সে বসল। বললে—এত ভাল লাগল আমাকে?

বললাম, এত ভাল লাগল।

সে বললে—আমার ভাগ্য।

বললাম, পৃথিবীর জীবনের মধ্যে অপরূপাকে পাই নি, তাই বোধ হয় ব্যর্থ বৈরাগ্যে অরূপ অব্যক্তকে খুঁজে মরেছি—যা নেই, যা থাকতে পারে না। ভগ্ন মন নিয়ে ফেরার পথে তোমাকে পেলাম। আজ দু দিন তোমাকে আভাসে দেখেছি। আজ পূর্ণ প্রকাশে পেলাম।

কতক্ষণ কেটে গেল স্তব্ধতার মধ্যে। ঝমঝম শব্দে ট্রেন চলেছে। বাইরে রাত্রি স্তব্ধ। মনে হল সারা সৃষ্টির মধ্যে আমরা শুধু দুজন—সে আর আমি। কিছুক্ষণ পরে তাকে বললাম, শোও তুমি।

—তুমি?

—আমিও শোব। কিছুক্ষণ তোমার ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে থাকব।

সে যেন নববধূর মত মধুর, আত্মপরায়ণা হয়ে উঠেছিল। হেসে শুয়ে সে চোখ বুজল। তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আমার মনে হল, তার অপরূপ রূপের সম্পূর্ণ প্রকাশ তখনও হয় নি। কই, ওর ওই মরালীর মত কণ্ঠে স্বর্ণহার কই? কর্ণে কর্ণভূষা কই? তার শীর্ণ অথচ সুন্দর মণিবন্ধে দুগাছি নিটোল সোনার বালা কই? বিনা আভরণে এ-রূপের মর্যাদা কোথায়? আমার পূজা সম্পূর্ণ হল কই?

হঠাৎ আমি উঠলাম, শিবনাথ।

সুদর্শন উঠে এবার কয়েকবার পায়চারি করেছিল গাড়ির মধ্যে।

মেয়েটি নিশ্চিন্ত নিদ্রায় অঘোরে ঘুমুচ্ছে। আজ তার জ্বর হয় নি। মনে ভয় নেই, আতঙ্ক নেই। হয়তো বা সন্ন্যাসিনীর বেশ ছেড়ে তার সহজ স্বাভাবিক বেশে সকল বিষণ্ণতার মধ্যেও একটি প্রসন্নতা জেগেছে, বিষণ্ণ মনের সরোবরের তলায় পদ্মকলির মত ধীরে ধীরে উপরের দিকে উঠেছে। এ প্রসন্নতা পদ্মের মত ফুটে উঠবে। তাকে সে ফোটাবে। তাকে সে সাজাবে। টেনে বের করলে সে সেই বালিশটা। ছিঁড়ে ফেললে। বের করলে সেই সোনার মাখা। এই তো!

চোর বৈরাগী প্রাচীন কালের মন নিয়ে রাধানামের মোহ ছাড়তে পারে নি। সে সোনাও পায় নি, রাধাও পায় নি।

এ যুগে এর নাম পুতুল। এর মূল্য শুধু শিল্পের। শিল্পের চেয়ে বড় মূল্য জীবনের। ওই তো তার জীবনময়ী রাধা। জীবন্ত প্রতিমা। পুতুলে তার প্রয়োজন কী?

তার ব্যাগ থেকে বের করলে সে একটা পাথর। পাথরটা ছিল তার সঙ্গে মশারী খাটাবার পেরেক পোঁতবার জন্য। তারপর মেঝের উপর রেখে তার উপর হানলে আঘাত।

মূর্তিটা প্রায় সোনার টুকরো এবং তালে পরিণত হয়ে এসেছে, তখন মেয়েটির ঘুম ভাঙল। সে সবিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল, তারপর উঠে প্রশ্ন করলে—কী গো?

সুদর্শন বললে, সোনা।

—সোনা?

—হ্যাঁ, একটা সোনার পুতুল ছিল আমার কাছে। সেটা ভেঙে ফেললাম। তোমার গয়না গড়াব, সংসার পাতব, তার জন্যে টাকা লাগবে।

—সোনার পুতুল ভেঙে ফেললে? কী পুতুল?

—রাধামূর্তি। আসলে পুতুল। আমার প্রয়োজন সোনার।

তখন ভোর হচ্ছে, এক্সপ্রেস গাড়িখানা কলকাতার এলাকায় প্রবেশ করছে। নলিনী স্তম্ভিত নির্বাক হয়ে গেছে।

সুদর্শন লিখেছে, আমি একখানা কাপড় পেতে তার উপর ওটাকে ভেঙেছিলাম। কাপড়-খানাকে সযত্নে গুটিয়ে ব্যাগে পুরে উঠে বললাম, মনে আঘাত পেলে?

চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ল। সযত্নে মুছিয়ে দিয়ে বললাম, তুমি আমার জীবন্ত রাধা। আজ ঈশ্বর যেখানে নেই, সেখানে দেবতা কোথায়? ধর্ম কোথায়? ধর্মের চেয়ে জীবন বড়। পূজার চেয়ে ক্ষুধা, আমার নিজের প্রয়োজন বড়। তুমি আমার। তাই তোমাকে সাজাব এই সোনায়। মুখ তোল, আমার দিকে চাও, হাস।

সে হেসেছিল।

গাড়িটা হাওড়া স্টেশনে ঢুকছিল প্রায় সেই মুহূর্তে।

সুদর্শন লিখেছে, হাওড়া স্টেশন দেখেছিলাম শৈশবে। ঠিক মনে ছিল না। বিরাট রেলওয়ে ইয়ার্ড অতিক্রম করে অতিকায় টিনের শেডের তলায় এসে গাড়িখানা দাঁড়াল। আমার মনে হল শিবনাথ, আমাকে স্থান থেকে স্থানান্তরেই নয়, কাল থেকে কালান্তরে, বিংশ শতাব্দীর বিশাল আলোড়নে আলোড়িত জীবনের মধ্যে এনে পৌঁছে দিলে।

দেখে মনে মনে বললাম, হ্যাঁ, এই তো বটে বিংশ শতাব্দীর মর্মকেন্দ্র।

স্টেশনের বাইরে ধ্বনি উঠেছিল—ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ।

সুদর্শনের কথা

এসে উঠেছিলাম হোটেলে। বড় হোটেল নয়; ওই যে শেয়ালদা'র সামনে অনেকগুলো হোটেল আছে, তারই মধ্যে একটায়। গৃহস্থেরা থাকে, পূর্ববঙ্গের লোক বেশী। কৈফিয়ত লাগত হোটেলে সেকালে; বলেছিলাম, বিহারে থাকতাম, সেখানে ভূমিকম্পে সর্বনাশ হয়েছে, দুজনে

প্রাণে বেঁচেছি অদৃষ্টের ফেরে। দুটি খোকাকে বাড়িতে দাইয়ের কাছে রেখে সস্ত্রীক গিয়েছিলাম বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে, সেখান থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফেরবার পথে হয় ভূমিকম্প। আমাদের সামনে কিছুটা দূরে মাটি ফেটে জল উঠল ফোয়ারার মত, আমরা তাতে সেঁধিয়ে গেলাম না; কিন্তু আমার বাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, আমাদের খোকা দুটি তার মধ্যে। ফিরছি, যাব পূর্ববঙ্গে এর বাপের বাড়ি।

আর প্রশ্ন কেউ করে নি।

বিহার ভূমিকম্পে এমন ঘটনা তো অনেক ঘটেছিল।

তারপর একখানা বাড়ি ভাড়া করেছিলাম। বাড়িও ঠিক নয়, ফ্ল্যাটও ঠিক নয়, একখানা দোতলা বাড়ির পিছনের দিকের নীচের তলাটা। দুখানা ঘর, ছোট একটি বারান্দা, তার ওপাশে রান্না-ভাঁড়ারের জায়গা। তা ছাড়া বাথরুম-টুম আছে। বারান্দার সামনে একফালি উঠোন-টুকু ছিল মনোরম; মাথার উপর খোলা আকাশ। উত্তর-কলকাতার পুরনো অঞ্চল হলেও বাড়িখানা নতুন। দেওয়ালে নোনা ধরার দাগ নিয়ে নতুন সংসার পাতার বিরোধী ছিলাম আমি। ভাড়া কুড়ি টাকা।

নলিনী বলেছিল, দুখানা ঘর কী হবে? একখানাই তো যথেষ্ট। কুড়ি টাকা ভাড়া, সে তো কম নয়। আগে উপার্জনের পথ কর।

বলেছিলাম, করব। আগে নিশ্চিন্ত হতে দাও। এই এত বড় শহরটায় সর্বত্র আকাশে বাতাসে যেন সন্দেহ ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। আগে সংসার পাতি। দুটো দিন জীবনকে ভোগ করি। তারপর সে চিন্তা করব।

দুখানা তক্তাপোশ, বিছানা, সামান্য কিছু বাসন কিনে বাড়িটায় রেখে, নলিনীকে হোটেল থেকে নিয়ে বাসায় এসে বলেছিলাম, এবার তোমার ভার। এর পর যা দরকার হবে, সে তুমি নিজে কিনবে। সঙ্গে যাব অনুচরের মত। মুটে ডাকব। ঠেলা ডাকব। দরকার হলে তাদের সঙ্গে ধরে জিনিসপত্র চাপিয়ে দেব। আমার বাকি আছে একটি কাজ, সে কাল করব।

সে কাজ তার গহনা কেনা। সন্ধ্যের মুখে মনে নতুন তাগিদ জেগেছিল। বলেছিলাম, বেরুবে একবার আমার সঙ্গে?

সে তখন নতুন উনুনে আঁচ দিচ্ছে। বললে, কোথায়?

বললাম, এস না, কাজটা কালকের জন্যে ফেলে রাখলে চলবে না। আজ না করলে অঙ্গহীন হবে।

বলেই আমি বের করেছিলাম সেই ভাঙা রাধামূর্তিটা।

—কী হবে? কী করবে?

—বিক্রি করে তোমার গয়না কিনব। তুমি পছন্দ করবে।

—না।

—না কেন?

—না। ও সোনার গয়না আমি পরব না। বোল না আমাকে। তা ছাড়া, ও বিক্রি করতে যাবে—তোমাকে যদি সন্দেহ করে? করবেই। জিজ্ঞাসা করবে নানান কথা। তখন?

কথাটা উপেক্ষা করতে পারি নি। সেটা রেখে নগদ টাকা নিয়েই বেরিয়েছিলাম। আটশো

টাকা সঙ্গে নিয়েছিলাম। শ-চারেক টাকায় তার বালা, গলার হার, কানের গহনা—তখন ঝুমকো উঠেছে—ঝুমকো, আর লালপাথর-বসানো একটা আংটি কিনে দিয়েছিলাম তাকে।

নলিনী দোকানদারকে বলেছিল, আর ওঁর হাতের একটা আংটি, পোখরাজ দেওয়া। আর এক সেট বোতাম।

আমি আপত্তি করি নি। ভাল লেগেছিল তার এই আমার জন্য জিনিস কেনা।

বেরিয়ে এসে একখানা গাড়ি করে ফিরছিলাম। সে বললে, গয়না আমি কিনতাম না। কিন্তু তোমার সাধ।

আমি বলেছিলাম, আজ আমাদের সংসার পেতে নতুন শয্যা পাতা। আজ তোমার অঙ্গে আভরণ নেই দেখব কী করে ?

সে একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, তবে কিছু ফুল কিনে নাও। আমার মাথায় নলহাটিতে সিঁদুর পরিয়ে দিয়েছ, সেই আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে, আজ আমাদের ফুলশয্যা।

শুধু ফুলই কিনি নি, নলিনীই নিয়ে গিয়েছিল জামা-কাপড়ের দোকানে, সেখানে রেডিমেড সিল্কের পাঞ্জাবি, কাঁচি ধুতি, তার নিজের জন্যে ঢাকাই শাড়ি, শৌখিন ব্লাউজ, আর স্টেশনারি দোকানে কিনেছিল এক শিশি দামী এসেন্স। দোকান থেকে খাবারও আমি কিনতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে তা কিনতে দেয় নি। খাবার সে নিজে হাতে তৈরি করবে।

বলেছিল, আজ জীবনটা স্বপ্ন মনে হচ্ছে। জান ? এত কিছু হবার আমার কথা নয়। এত বড় ধ্বংসের মধ্যে কী আশ্চর্যভাবে আমার জীবনটা সব ফিরে পেল বল তো ?

আমি বলেছিলাম, ওটা তোমার পক্ষেই একা সত্যি নয় নলিনী। আমারও তো তাই। নিজে সব ফেলে দিয়ে কৃচ্ছ্রসাধনের মধ্যে শূন্যের পূজা করতে গেলাম। শূন্য হাতে ফেরার পথে গভীর অন্ধকারের মধ্যে তোমার সঙ্গে আমার হাত মিলল। ভাগ্য ভগবান বললে সহজে মীমাংসা হয়। কিন্তু তা তো স্বীকার করতে পারব না।

—তবে ?

—বলতে পারি, এ সবটাই এই কালের গুণ। আগের কাল হলে তুমি কখনই পালাতে না নলিনী। তুমি সকল দুর্ভোগকে ভাগ্য বলে মেনে নিয়ে ওদের ওখানেই থেকে যেতে। কারণ নিজেই ভাবতে তোমার জাত গেছে। যদি বা পালাতেই, তবে হয়তো মর্মান্তিক ক্ষোভে এসে গঙ্গায় ঝাঁপ দিতে। নয়তো সর্বত্র আশ্রয় চেয়ে, না পেয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে মেয়েদের সব থেকে বড় সর্বনাশের নরকে। একালের মেয়ে বলেই তুমি তোমার ঘাড়ে-চাপানো পাপের কথা ভাব নি, তুমি চেয়েছিলে বাঁচতে ; বাঁচবার আশা করতে পেরেছিলে। আমি সেকালকে বিসর্জন দিয়ে একালের পথে ফিরছিলাম বলে অসঙ্কোচে তোমাকে আমার বুকে টেনে নিয়েছিলাম।

সে উত্তর দেয় নি ; চুপ করে ছিল। একটু পরে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কী, কথাটা ঠিক বলে মনে হচ্ছে না ?

সে একটু হেসে বলেছিল, কী জানি ? তবে ভাগ্য বলতে যেন ইচ্ছে হচ্ছে।

কথা হচ্ছিল গাড়ির মধ্যে। তখনও ট্যাক্সির চলন এমনভাবে হয় নি, ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে বসেই কথা হচ্ছিল, হঠাৎ আমার চোখ পড়ল একটা ইলেকট্রিকের দোকানে। হেঁকে বললাম, রোখো তো, রোখো।

সে বললে, কী হবে ?

—একটা রঙিন ইলেকট্রিক বাল্‌ব কিনব। ঘন নীল রঙের। তুমি বোস গাড়িতে।

—না। আমিও নামব।

—গাড়িতে জিনিস রয়েছে।

—থাকুক। মুখ তার কেমন হয়ে গেছে। প্রথমটা বুঝি নি, গাড়ি থেকে সরে দোকানের দরজার কাছে এসে সে অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলেছিল, গাড়োয়ান লোকটা সেই তাদের মত দেখতে।

দোকানে বাল্ব কিনে বেরিয়ে এলাম; সে বললে, দাঁড়াও একটু। গানটা শুনি, ভাল লাগছে।

পাশেই একটা গ্রামোফোনের দোকান। সেখানে রেকর্ড বাজছিল। গানখানা আমারও ভাল লাগল। কার রচনা মনে নেই; তবে সে যেন আমার তার দুজনেরই প্রাণের গান।

"জীবন-সুখ স্বপন সম মধুর রাতি পোহায়ো না।
শেফালি সম ঝরায়ো না
ভাঙায়ো না ঘুম, ভাঙায়ো না।"

আমার জীবনে সেদিন অসীম উল্লাস। বললাম, চল, কিনব।

—কী?

—রেকর্ড আর গ্রামোফোন।

সে আপত্তি করে নি। বোধ করি তারও মনে জীবনের নেশা লেগেছিল। একশো পঁচিশ টাকায় গ্রামোফোন আর খানকয়েক রেকর্ড কিনে বাড়ি ফিরেছিলাম।

ঘরে নীল আলো জেলে, বিছানায় ফুল বিছিয়ে, নিজেরা সাজসজ্জা ক'রে ওই রেকর্ডখানা চালিয়ে দিলাম। অকস্মাৎ ঘরখানা ভরে উঠল গভীর সৌরভে। ফিরে দেখলাম, সে সেই গন্ধের শিশিটা গোটা ঢেলে দিয়েছে বিছানায়, আমার গায়ে, তার নিজের গায়ে। তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়েছিলাম।

রেকর্ডখানা বাজছিল, "জীবন-সুখ স্বপন সম—"

সে আমার জীবনের তার জীবনের স্বপ্ন-রাত্রি, শিবনাথ।

আমি বা নলিনী দুজনেই খুব উচ্চ-সংস্কৃতিবান লোক তো নই। এই দেশের অতীত কালে সবার জীবনে যে গানের সুর বাজত, সে গান অধ্যাত্মবাদী। সেই "তনয়ে তার" তারিণী"। তার একটা লাইন আমার মনে আছে—হয়তো আমার সারা সন্ন্যাস-জীবনটায় যেন ওই কলি দুটিই বেজেছে কেঁদে কেঁদে—

"বল গো মা, বলে দে মা—
(আমার) আমি কোথা পাব ? ও মা!"

সেই হাহাকারের পর অকস্মাৎ জীবন যেন ভরে গেল। এ হাহাকার চিরন্তন শিবনাথ। জন্তুর মধ্যেও বোধ করি এ আছে—তাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতির অনেক নীচে অনেক গভীরে। আসলে ওটা আছে জীবনের মধ্যেই। ওইটেই হয়তো জীবনের প্রশ্ন। নইলে এত দেহ পাল্টাল কেন? আমাদের শাস্ত্রে অর্থাৎ পুরাণে বলে চৌরাশী লক্ষ যোনি পরিভ্রমণ করে মনুষ্যজন্ম। ডারউইন মতবাদ এভ্যুল্যুশন থিয়োরিতেও এর সমর্থন আছে। কিন্তু কেন? জীবনের সব থেকে বড় কামনা যদি যৌন কামনা হয় তবে তো কুক্কুরজন্মেই জীবন সার্থক হতে পারত। যদি আহার হয় তবে অরণ্যচারী হাতীর জীবনেই তৃপ্ত হত। যদি শক্তিবলে প্রতিষ্ঠা হয় তবে তো বাঘ হয়েই তৃপ্ত হওয়া উচিত ছিল। দীর্ঘ পরমায়ু হলে অতিকায় জন্তুরই বার বার

ঘুরে ঘুরে আবির্ভূত হওয়া উচিত ছিল। অবশ্য প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকার একটা সমস্যা প্রচণ্ড সমস্যা। কিন্তু তাই কি সব? না, সব নয়। চৈতন্যর সঙ্গে সঙ্গে সে আত্মপরিচয় চেয়েছে। কে আমি এবং কেন আমি! না শিবনাথ, এ কথাটা আমার শৈশব থেকে যৌবনে ওই সন্ন্যাসজীবন ত্যাগের আগের মুহূর্তের কথা। এবং ফাঁসির হুকুমের পর আবারও সেই কথাটা নতুন করে মনে হচ্ছে। সেদিন অর্থাৎ যেদিন সাধনা করে এর উত্তর পেলাম না— নূতন কালের সৃষ্টিতত্ত্বকে জানলাম, সেই দিন ওটা ভুল, ভুল—ভুল বলেই মনে মনে ঘোষণা করলাম। সেদিন মনে হল—এই খোঁজার গোলকধাঁধায় পড়ে গিয়ে জীবন এত দীর্ঘকাল ঘুরে মরেছে—এবার পথ পেয়ে বেরিয়ে পড়েছে, সোজা পথে সমতলের পথে। মিছে প্রশ্ন করেছে, কেঁদেছে। আমার আমি এই প্রাণবন্ত দেহটাই। এর বাইরে 'আমিকে খোঁজা' একটা কৃত্রিম সমস্যা। আমি কেন—এর উত্তর, এই বস্তুজগৎময় পৃথিবীর জড় উপাদানকে ভোগশক্তিবলে ভোগবুদ্ধিবলে ভোগ। আর বস্তুজগৎময় প্রাণবন্ত নারীদেহকে ভোগ। অর্থ পেয়েছি, শক্তি আছে আমার—নীলকে পেয়েছি। আমার জীবন ভরে গেছে।

ওই গানখানায় আমার মনের কথা পেয়েছিলাম—

"জীবন-সুখ স্বপন সম মধুর রাতি পোহায়ো না
শেফালি সম ঝরায়ো না।"

হয়তো তোমাদের মত একালের সভ্য সাহিত্যিকরা ব্যঙ্গ করবে। তা করুক। আমার কানে এলে আমি ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে অট্টহাস্য করব। আমি হরিদ্বারে শাস্ত্র অনেক পড়েছিলাম; নূতন কালের কাব্য আমি পড়ি নি। আর ১৯৩৪ সনের যদি বিচার কর, শিবনাথ, তবে সাধারণ মানুষও তখন এখনকার মত করে রবীন্দ্রনাথ পড়ে নি। যারা পড়েও ছিল, তারা রবীন্দ্রনাথের ভাবকে গ্রহণ করে নি। গ্রহণ করেছিল ভাষার অপরূপ প্রকাশ ও ব্যঞ্জনাকে। রবীন্দ্রনাথের 'আমি' এক বিরাট 'তুমি'র চরণে প্রণত। তাকে ভালবেসে চির আনন্দমগ্ন। এ যুগে তো সে বিরাট 'তুমি' নেই। আছে শুধু 'আমি'। বল তো শিবনাথ ক'জন রবীন্দ্রভক্ত এই বিরাট 'তুমি'তে বিশ্বাসী? উত্তর দিতে তোমার ভয় হবে। আমি চীৎকার করে বলছি— কেউ না। কেউ তাঁর মত বিশ্বাস করে না সেই বিরাট 'তুমি'কে। থাক্। বলি শোন আমার কথা। সেই 'আমি'র গান বলে মনে হয়েছিল ওই গানখানিকে। ওই দেহের সুখে এত সুখ! তাই ওই গানটাই যদি ভাল লেগে থাকে আমার, তবে মুখ বেঁকিয়ো না।

এক মাস পর ঘোর কেটেছিল। এ ঘোর সব কালেই আছে। বন্যবর্বর কালেও ছিল। বেদের কালেও ছিল, পুরাণের কালেও ছিল, ইতিহাসের কালেও ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও ছিল, বিংশ শতাব্দীতেও আছে। সকল কালেই একটা সময়ের পর সেটা কাটে। যেদিন প্রথম কাটতে শুরু হল, সেদিনকার ছোট্ট ঘটনাটুকু আজও মনে আছে।

সেদিন ঘুম ভেঙে গিয়েছিল একটু বেশী সকালে। বেশীর ভাগ দিনই ঘুম ভাঙতে দেরি হ'ত। রাত্রি জাগতাম অনেক। আবোলতাবোল কথা হত। পুরনো জীবনের কথা। আমার জীবনের কথা শুনে সে শুব্ধ স্তম্ভিত হয়ে যেত। প্রশ্ন করতাম—কী হল? সে বলত—ভাবছি। এই মানুষ আমার আঁচলের খুঁটে কি বাঁধতে পারব? বললাম, পারবে; আমার ভুল ভেঙেছে। তার কথার জন্যে খুব চাপ দিতাম না। তার তো সবই মর্মান্তিক দুঃখের কথা। এমন কি উদাসীন বাপ-ভাইয়ের প্রসঙ্গেও সে চুপ করে থাকত। টাইমপিসে অ্যালার্ম দেওয়া থাকত, কতদিন অ্যালার্ম বেজে ঘড়িটা থেমে যেত, ঘুম ভাঙত না। নীল (নলিনীর নাম তখন আদর

করে দিয়েছি নীল ; নলিনীর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ নয়, নীলটা নলিনীর বিশেষণ ; নীলনলিনী ; নীলপদ্ম)—নীল উঠে অভিযোগ করত, না, আর এমন করে রাত জাগা চলবে না। নিজেও ঘুমুবে না, আমাকেও ঘুমুতে দেবে না। সে উঠে গিয়ে চা করে এনে আমায় ডাকত, তখন আমি উঠতাম।—ওঠ, চা খাও। বাজার বোধ হয় গোটা শহরের লোকের হয়ে গেল। ছি ছি ছি, ঠিকে ঝিটা সব বাড়ির কাজ সেরে আসবে আর মুখ টিপে টিপে হাসবে।

আমি উঠে চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে গ্রামোফোনে ওই রেকর্ডটা চালিয়ে দিতাম।

"জীবন-সুখ স্বপন সম মধুর রাতি পোহায়ো না
শেফালি সম ঝরায়ো না।"

সে একটু হেসে বলত—হয়েছে। যাও, বাজারে যাও। আজ আর মাছ এনো না। বড্ড বেশী মাছ আনছ। আজ কপি এনো, কাঁচকলা, উচ্ছে, সিম ; সুক্তো রাঁধব। খুব ঘন করে মুগের ডাল। আজ নিরামিষ ডে।

সেদিন ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম, যা ভেবেছিলাম ঠিক নয়, অ্যালার্ম বাজতে দেরি আছে। নীল তখনও ঘুমুচ্ছে। আবার শোব ভাবলাম, কিন্তু ইচ্ছে হল না। ঘোর কেটেছে ঠিক প্রত্যক্ষভাবে সেদিন বুঝি নি, তবে আজ বিশ্লেষণ করে বুঝছি এবং বলছি। ওকে ডেকে বললাম, ওঠ। চা কর।

সে উঠে ভুরু তুলে প্রশ্ন করলে—এত সকালে আজ ?

মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কাজ আছে।

—কী কাজ ?

—এসে বলব।

বাজারের পথে ভেবে নিলাম কী কাজ। মন বলে দিল, অনেক কাজ।

বললাম, বল ? নাম বল ?

—কতদিন নারী নিয়ে ভুলে থাকবে ?

বললাম, এ কথা কি নলিনীকে বলা যায় ?

—ঘুরিয়ে বল। কাজের চেষ্টায় বেরুবে।

—চাকরি ? চাকরিতে কী মাইনে পাব ? ম্যাট্রিকও পাস করি নি। তাতে কী মাইনে হবে ? তাতে জীবন ভরবে ?

—ব্যবসা কর।

—কী ব্যবসা ?

—ভেবে দেখ।

ভাবতে ভাবতে এলাম। কী ব্যবসা করব ! চাই অনেক। অনেক। প্রচুর চাই। জীবন-ভরা অফুরন্ত ভোগ চাই। বাড়ি ফিরে এলাম। নলিনী বাজার নিয়ে দেখে বললে, এ কী, তেলের শিশি কই ?

—দোকানে ফেলে এসেছি।

সেটা এনে বললাম, আজ একটু বেরুব।

—কোথায় ? কী কাজ বল তো ?

যা বললাম, সেটাও মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। বললাম, প্রথমে যাব রেল-আপিসে।

কথাটা বলতে ঠিক ইচ্ছে ছিল না। কারণ যথাস্থানে বলছি।

—রেলের চাকরি ?

—না, রেলের চাকরি নয়, তোমার বাবার খোঁজ করব। এতদিন ধরে ওটা কথার কথাই থেকে যাচ্ছে।

নলিনীর বাবার কথা কতদিন হয়েছে। ভাইদের কথাও হয়েছে। বলেছি, খোঁজ করব। নলিনীর খুব একটা ইচ্ছে আগ্রহ দেখি নি। মনে হয়েছে, ওটা বোধ হয় ওর সেই এক বছরের অমর্যাদার—দুর্ভোগ এবং দুর্ভাগ্যের সঙ্কোচ। যে সঙ্কোচে মেয়েরা বলে, এ কালামুখ নিয়ে দাঁড়াব কী করে? মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছে নীল—কী হবে!

আজ সে হঠাৎ বলে ফেললে—যেতে তোমাকে আমি বারণ করছি।

—কেন বল তো? বিস্ময়ের সীমা রইল না আমার।

চুপ করে রইল সে।

প্রশ্ন করলাম, বলতে বাধা আছে?

হেসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে সে বললে—দেখ, নিজের বাপ তো!

বললাম, তবে থাক্।

—সংসারে এক ধরনের নাস্তিক আছে, যারা কিছুই মানে না। আমার বাবা সেই নাস্তিক। পৃথিবীতে নিজে ছাড়া কিছু নেই, কেউ নেই। আমাদের বাড়ি যখন তারা ভাঙছে তখন তিনি পায়খানার উপর উঠে লাফ দিয়ে পালিয়েছিলেন। আমি যুবতী মেয়ে, কটি নাবালক ছেলে—তারা পড়ে রইল। এ মানুষের খোঁজ করে কী করবে? আমার খোঁজ পেলে কী করবেন জান? পুলিসে খবর দিয়ে আমাকে কাঠগড়ায় হাজির করে তাদের সাজা দেওয়ার চেষ্টা কববেন এবং বুক ফুলিয়ে বলবেন—সত্য, সে যত নিষ্ঠুর হোক, ভাল্‌গার হোক্—তাকে প্রকাশ করতে আমি লজ্জা পাই নে। কথাটা আমি মানতাম, যদি তিনি তাদের সঙ্গে লড়াই দিয়ে আহত হতেন।

একটু চুপ করে থেকে আবার বলেছিল—আমার বিয়ের কথা বলেছিল বাবার সহকর্মীরা এই আমাকে ডাকাতি করে নেবার আগেই। কী বলেছিলেন জান?—কর্তব্য! কিসের কর্তব্য? পবিত্র কর্তব্য? ওসব ভুয়ো শাস্ত্র আমি মানি নে। সন্তান-সন্ততি, ছেলে-মেয়ে, নরনারীর মিলনের স্বাভাবিক ফল। ওর মধ্যে ডিভাইন-ফিভাইন কিছু নেই। জানোয়ারের বাচ্চা হয়, দুধ ছাড়লে চলে যায়। বাঁচবার দায়িত্ব তার নিজের। মানুষের বেলায় সেটায় রঙ চড়ালে শাক দিয়ে মাছ ঢাকা হয়। বেশ বাবা, মানুষ করে দিয়েছি, বড় হয়েছে, যখন ইচ্ছে হবে নিজের স্বামী বেছে নেবার দায় ওর, ভার ওর।—এমন বাপের খোঁজ করে কী হবে বল?

ক্রোধও হয়েছিল, কৌতূহলও হয়েছিল। এ তো হয় পশু, নয় পরমহংস।

চোখ জলে উঠেছিল নীলের। সে বলেছিল—তোমার সঙ্গে দেখা যদি না হত তবে আজ আমার পথ হত কোথায় জান? নরকে। নারীর নরকে। যার বাবা ওই কথা বলে তার দেহব্যবসায়ে দোষটা কী বল তো, যদি তাতে প্রচুর অর্থ পাই? না, তার খোঁজ তুমি কোর না।

বলেছিলাম, বেশ, তা হলে যাব না। খোঁজ করব না।

সে এবার কেঁদে ফেলেছিল। কিছুক্ষণ পর চোখ মুছে বলেছিল—দেখ, যে শিক্ষা, অন্তত যেসব যুক্তিতর্ক তাঁর কাছে শিখেছিলাম, তাতে সংসারে সত্য শুধু তোমার শক্তি আর বুদ্ধি। তাই দিয়ে আইন আর সমাজকে ঠেকিয়ে যা করবে কর, তাতে পাপ-পুণ্য ন্যায়-অন্যায় কিছুই নেই। তোমার সঙ্গে ভাগ্যক্রমে দেখা হয়েছিল, তুমি আমাকে বুকের কাছে পেয়েও স্নেহ দিয়ে গ্রহণ করেছ, রক্ষা করেছ। বার বার তোমার কাছে গিয়ে আমার দেহ সঁপে দিয়েছি,

তুমি তার উপর পশুর আচার চালাও নি। তাই অকস্মাৎ একসময়ে মানুষের বন্ধনে বাঁধা পড়লাম। যত মধুর সে বন্ধন, তত তাতে আরও জড়াবার বাসনা। যত জড়াচ্ছি, তত ভয় পাচ্ছি।

—ভয় পাচ্ছ? কেন?

—বলব? রাগ করবে না?

—না, না। রাগ করব কেন?

—তুমি রাধামূর্তিটিকে নিষ্ঠুরভাবে ভেঙে ফেলেছ। মনে হচ্ছে, তোমার মধ্যে হয়তো মহানিষ্ঠুর আছে। আর মনে হচ্ছে যে-শিক্ষায় বাবা বিশ্বাস করেন তাই তুমি নিতে যাচ্ছ। আমার বাবা দুর্বল ভীরু কাপুরুষ। তার এ বিশ্বাসে দুনিয়ার ক্ষতি হয় না, ক্ষতি হয় তারই স্ত্রী-পুত্র-কন্যার। কিন্তু তুমি যদি এই পথ ধর তো কী হবে বল তো।

চোখ থেকে তার জল ঝরে পড়ল।

আমার চোখ দুটো বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছিল।

সে সভয়ে যেন মৃদু আর্তনাদ করে উঠেছিল—ওগো, অমন করে তাকাচ্ছ কেন?

শিবনাথ, আমার চোখে সে সেদিন আজকের আমার ছায়া দেখেছিল। আমার যবনিকার অন্তরালে যে ছিল, সে বোধ হয় একবার উঁকি মেরেছিল।

তিন দিন বসে ভাবলাম।

ভাবলাম—কী করব? এই জীবন কিসে তৃপ্ত হবে? শুধু নীলের সাহচর্যে?

আমার মন স্বপ্নভাঙা মন, ভীষণ শক্ত উগ্র মন—সে ছলনা জানে না। সে বললে—না। নীলকে চাই, তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা চাই। সম্পদ চাই। সুখ চাই। উৎকৃষ্ট গৃহ, উৎকৃষ্ট আহার, সুকোমল শয্যা, বিশাল প্রভুত্ব—জীবনের এই কামনা—আমার শক্তি আছে, আমার তা চাই। নীলকে অস্বীকার করব না, সে আমার কণ্ঠের মালা হয়ে দুলবে।

প্রতিষ্ঠার একটা উপায় এ যুগে রাজনৈতিক নেতা হওয়া। কিন্তু ঈশ্বর-বিশ্বাসী গান্ধীর রাজনীতিতে যোগ দিতে আমার ঘোরতর আপত্তি ছিল।

কংগ্রেসের রাজনীতি আর ইউরোপের ক্রিশ্চান ধর্ম সমান ব্যর্থ বলেই মনে হয়েছিল। বলতে পার শিবনাথ, ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের সাফল্যে বিজ্ঞানবাদ যেদিন তাদের জীবনে আসন জুড়ে বসল, সেদিন ঈশ্বরের পুত্রের পুনর্জীবন, মোজেসের টেন কম্যাণ্ডমেণ্টস্—সমুদ্র ভাগ হয়ে পথ দেওয়ার গ্রন্থখানির সত্যতার মূল্য কোথায় রইল? নেই। শিবনাথ, নেই। আজ ইউরোপের অবশ্যম্ভাবী গতি এবং পরিণতি নাস্তিক্যবাদী কম্যুনিজ্‌মে অথবা এমনি কোন ইজ্‌মে। উপায় নেই তার। এদেশেরও গতি সেই মুখে। গান্ধী রবীন্দ্রনাথের তিরোভাব ঘটেছে। গান্ধীজী থাকতে কংগ্রেসের অহিংসার আস্তিক্যবাদে যে মূল্য সে মূল্য গান্ধীজীর; তিনি আজ নেই। আজ তার মূল্য প্রতিষ্ঠানের, অর্থাৎ দেহের। ক্রিশ্চান ইউরোপের মতই তার পরিণতি হবে দেখো। তবে এইটেই জগতের শেষ পরিণতি নয়—আজ ফাঁসির মঞ্চে পাদক্ষেপের জন্য প্রস্তুত হতে হতে সে কথা বুঝতে পারছি। বাইরের বস্তুজগৎ জুড়ে খোঁজা শেষ করে আবার সেই মনের জগতে প্রবেশ করতে হবে। ওইখানেই আছে চৈতন্যময় প্রাণজগতে প্রবেশের সিংহদ্বার। তার আগে এই খোঁজার পর্ব শেষ করতে হবে। থাক্ যা বলছিলাম। আমার আর একটা পথ ছিল—কম্যুনিস্ট হওয়া। কিন্তু সেখানে সাধারণের স্থান হতে পারে। আমার হবে না। যখন ঈশ্বর নেই তখন আর মানবার আমার কেউ নেই। আমি কেন মানব দলনায়ককে,

এ সেই চিরন্তন 'কেন' শিবনাথ। হোয়াই ?

তাই একক আমার পথে আমি চলব। দেশের রাজার আইন আছে। আইন বাঁচিয়ে অর্থাৎ নিজেকে বাঁচিয়ে স্বেচ্ছাচারের পথ আমার পথ। শুধু আমার নয় শিবনাথ—আজ এইটেই সারা দুনিয়ার মানুষের পথ।

বাঁচতে হবে নিজের জন্য—বাঁচতে হবে নীলের জন্য।

নীল আমার রুক্ষতার মধ্যে স্নিগ্ধতা। মরুভূমির মত আমি, তার মধ্যে সে ওয়েসিস। নাস্তিক হয়েও ওকে অস্বীকার করতে পারছি না, পারব না। এ যদি প্রেম হয় তবে প্রেমকে স্বীকার করছি।

সেই জন্যেই ভেবে—অনেক ভেবে, নিজের জীবনের ঝড়ের মত বেগকে সংযত করে স্থির করলাম—ঘর বাঁধব। ঝড়ের বেগে নয়, ধীরে ধীরে।

বড় ইচ্ছে ছিল বিজ্ঞানের পথে যেতে। ওই পথে নাস্তিকতার শেষ বিন্দুতে পৌছুতে। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। তার থেকে ব্যবসা করব। পথ কিন্তু নাস্তির পথ। উপলব্ধি দিয়ে পৌছব।

ব্যবসা করব, কিন্তু কি করব ঠিক করতে পারছিলাম না।

বড়বাজারের ব্যবসায়ীদের গদি দেখে ইচ্ছে হল, এমনি গদির মালিক হতে হবে আমাকে। সে শক্তি বা পারঙ্গমতা আমার নিশ্চয় ছিল না, কিন্তু তারও পরখ করে দেখি নি। কারণ ওদের গদি আছে, বিপুল ঐশ্বর্য আছে কিন্তু প্রতিষ্ঠা নেই ; সম্মান নেই। বড় বড় আপিস দেখলাম, দেখে এমনি আফিস করব ইচ্ছেও হয়েছিল, কিন্তু তাতে খানিকটা ভয় হয়েছিল। মনে হয়েছিল, ও আমার সাধ্যের বাইরে ; তা ছাড়া ওদেরই বা স্থান কোথায় আপিস আর ওদের ঘরের বাইরে ? পরের মনের খবর জানি নে, নিজের খবর জানি, সেই থেকে অনুমান করি এ তৃষ্ণা, এ আকাঙ্ক্ষা সবার মনের মধ্যেই আছে। হাতে তখনও আমার হাজার আড়াই টাকা রয়েছে, আর সেই সোনাটা।

নীল বলেছিল—এমন কিছু কর যাতে আমি তোমার সাহায্য করতে পারি।

হেসে বলেছিলাম, তা হলে আপিস করতে হয়, তোমাকে টাইপরাইটিং শিখতে হয়। টাইপিস্ট এবং সেক্রেটারি হতে পারবে।

সবিস্ময়ে সে বলেছিল—তুমি আপিস করবে ? কিন্তু—

—কিন্তু কী ? ব্যবসা কখনও করি নি, এই তো ?

—হ্যাঁ।

—নীল, জলে না নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার।

—সে অথৈ জল নয়। সাঁতার শেখে অল্প জলে।

বলেছিলাম, ভেবে দেখি।

পরের দিন বাড়িওয়ালা আমাকে ডেকে বললেন—ও মশাই সুদর্শনবাবু, আপনি ব্যবসা করবেন ? খুব ভাল কথা মশাই, খুব ভাল কথা। ব্যবসা না করেই বাঙালী মরেছে। বাঙালী গেল।

ভদ্রলোক কৃষ্ণবাবু অদ্ভুত কৃতী মানুষ। চাকরি করেন, দালালি করেন, অনেক-কিছু করেন। একখানা বাড়ি করেছেন, আর-একখানা করবেন। মাইনে পান একশো পঁচিশ টাকা। হাতে কবচ আছে, আঙুলে আংটি আছে, তাতে আছে পলা গোমেদ, একটা নীলাও আছে। কাজ করেন পাঁজি দেখে। আর মিথ্যা বলেন মনোহরভাবে। আক্ষেপ করেন,

ভগবান এ যুগে বধির এবং অন্ধ হয়েছেন বলে। বলেন—লোকে ভগবান নেই বলে, আমি তা বলি না। আমি বলি—বয়েস হয়েছে অনেক, বুড়ো হয়ে চোখে ছানি পড়েছে, কানে কালা হয়েছেন। স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে। তা ভয় নেই, ওই সায়েবরাই চোখের ছানি কেটে দেবে। আমরা পারব না, আমরা পারব না।

অসাধারণ সাহেবভক্তি এঁদের।

আমায় বললেন—কী ব্যবসা করবেন ? চালের ? ভাল ব্যবসা। ও মাল অবিক্রি থাকে না। মানে লোকসান হবে না। শুধু সময়ে বিক্রি করতে পারলেই হল।

বলেছিলাম, না।

—ইঁটখোলা করবেন ? কলকাতা বাড়ছে, বাড়বে। ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট স্কীম করছে, আমি খবর রাখছি। অবিশ্যি ওসব অঞ্চলে পুরনো বাড়িও কিনতে পারেন।

—না।

—সবই যদি না করবেন তো পাটের দালালি করুন। খুব ভাল ব্যবসা। পার্টির সঙ্গে আলাপ রাখবেন, মিষ্টি কথা বলবেন, তা হলেই হবে।

বললাম, ভেবে দেখব কেষ্টবাবু। এখন যদি আপনার বাড়ির স্বর্ণকারকে একবার আমার বাড়ি আসতে বলেন তো উপকৃত হই। ওর গয়না সামান্যই, কিছু পুরনো সোনা আছে ভেঙে গড়াই।

—তা বেশ তো। আজই খবর দেব। ঢাকাই কারিগর। চমৎকার হাত। তা দেব।

মনে মনে অর্থ-সংগ্রহের চিন্তা করছিলাম। ভেবেছিলাম, যে গয়না আছে, সেগুলো ভাঙবার সঙ্গে রাধার সোনাটা গলিয়ে বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করব। অর্থ সংগ্রহ করে নিশ্চিন্ত হয়ে কী করব স্থির করব। এমন ব্যবসা করব যাতে আলাদীনের প্রদীপ পেতে পারি। সুখ-সম্পদ প্রচুর।

ওই সূত্রেই গিয়েছিলাম স্বর্ণকারের বাড়ি। বিডন স্ট্রীটে থিয়েটারের পাশে একটা গলির মধ্যে দোকান, সেই দোকান থেকে কাজ সেরে বেরিয়ে আসছি, হঠাৎ চোখে পড়ল একটা টেবিল-চেয়ারে খাবার জায়গা করা একখানা আধুনিক মিষ্টির দোকান। দোকানের ভিতরে নজর পড়ল। দেখলাম, সামনে টেবিলের উপর বাক্স নিয়ে একখানা চেয়ারে বসে আছে বিপ্রপদ। সে স্থূলকায় হয়েছে, মুখে চোখে শহরের মার্জনার জৌলুস দেখা দিয়েছে, চোখে চশমা, গায়ের জামাটা শৌখিন ফ্লানেলের।

আমাকে দাঁড়িয়ে মুখের দিকে চেয়ে থাকতে দেখে সে ডাকলে—আসুন আসুন।

দেওয়ালে একটা লেখন টাঙানো ছিল, 'খরিদ্দার প্রভুর সমান'।

আমি দোকানে উঠে গেলাম। বিস্ময় সম্বরণ করতে পারলাম না। কিন্তু বিস্ময় সম্বরণ করাই আমার উচিত ছিল। তা হলে হয়তো—। থাক্, আক্ষেপ করব না। গিয়ে চেয়ারে বসে বললাম, আপনি বিপ্রপদবাবু ?

সে আমার মুখের দিকে চেয়ে বলে উঠল—আরে, তুমি সুদর্শন ?

—হ্যাঁ। আমি সুদর্শন। তোমাকে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। এ দোকান তুমি করেছ ?

—হ্যাঁ। দেশ ছেড়ে দিয়েছি। বুঝেছ ? বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী। থিয়েটারের সামনে এই দোকান করেছি। ওরে, বাবুকে রাজভোগ দে দুটো আর আমাদের নতুন মিষ্টি। ওরে বেটা, দেখছিস কী হাঁ করে ; আমার দেশের লোক, আমার বন্ধু রে। তারপর, তুমি ? তুমি

এ-বেশে ? তোমাকে আমার চিনতে অনেকক্ষণ লাগল। এ বেশে তো দেখব ভাবি নি। স্বামীজী-টামীজীর পোশাক হলে তক্ষুনি চিনতে পারতুম।

—হ্যাঁ। পাঁচ বছর ঘুরলাম ঈশ্বর-ঈশ্বর করে, শেষে ফিরে এলাম।

হা-হা করে হেসে উঠল বিপ্রপদ। হেসে বললে—কী হল ? লবডঙ্কা পেলে তো ? ঈশ্বর মানেই লবডঙ্কা হে। তোমার যেমন পাগলামি। ছেলেবেলা থেকেই তো পাগল। ওঃ, সে ভাগবতের কথা—

আর একদফা হেসে নিয়ে বললে—সেটা কিন্তু আচ্ছা বলেছিলে হে। বিষ্ঠার মধ্যে সোনা পড়ে থাকলে তা তুলে নেবে। আচ্ছা কথা।

চাকরটা খাবার এনেছিল। বললাম, থাক্। খাওয়ার এখন সময় নয়।

—সে কী ? না না না। তা হবে না। তা কী হয় ?

—না। বিশ্বাস কর। এখন খেতে পারব না।

—আচ্ছা আচ্ছা, ওরে, রাখ্ তুই। চল, আমার সঙ্গে বাসায় চল। সেখানে খাবে। আশ্চর্য হয়ে যাবে। চল।

কাছেই বাসা, একটা গলির ভিতর। দরজার বাইরে থেকেই সে হাঁকলে, দরজা খোল।

উত্তর এল নারীকণ্ঠের : দাঁড়াও একটু।

—আরে, কাকে এনেছি দেখ ! করছ কী ?

—চুল বাঁধছি।

—বাঁধতে বাঁধতেই এস রে বাপু। দেখ না কী ব্যাপার ! কে এসেছে দেখ !

—কী ব্যাপার ? ধীরেনদা বুঝি ?

দরজাটা খুলে গেল। বাঁ হাতে আধখানা-রচা বেণীটা ধরে, মাথায় চিরুনিখানা গুঁজে যে মেয়ে দরজা খুলে দিলে—সে আর কেউ নয়, শান্তি। সে আমায় দেখে চমকে উঠল প্রথমেই, তারপর বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে যেন শক্ত হয়ে গেল।

শান্তির সর্বাঙ্গে সধবার বেশ।

বিপ্রপদ বললে—চিনতে পারছ না ? তোমার গুরুর রক্ষাকর্তা গো। আমাদের সুদর্শন।

সে বললে—চিনেছি বইকি। ভোলার কথা তো নয়। কিন্তু ওকে পেলে কোথায় ?

—পথে। আমার দোকানের সামনে। আমার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। চল চল, ভিতরে চল।

আমি নির্বাক স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। শান্তি যৌবনে রূপে ভরা-গঙ্গার মত ভরে উঠেছে। না, তার চেয়েও বেশী। রূপ যৌবন উপচে পড়ছে কূল ছাপিয়ে।

—অবাক হয়ে গেছ ? না ? সে এবার মুচকি হেসে বললে।

আমি বললাম, তা হয়েছি। তুমি—সেই শান্তি !

—হ্যাঁ। সেই শান্তি।

তারপর খিলখিল করে হেসে উঠল শান্তি। হেসেই বললে—তুমি অবাক হয়ে যাবে বইকি। সন্ন্যাসী, ধার্মিক মানুষ। কিন্তু তোমার অঙ্গেই বা এমন সাজপোশাক কেন ? গেরুয়া কই মহাপুরুষ ?

আমি বললাম—ঈশ্বর নেই তাই সেসব ফেলে দিয়ে ফিরে এসেছি।

শান্তি বলল—ধর্ম ঈশ্বর মানুষের তৈরি—স্বার্থপর মানুষের তৈরি। আফিংয়ের মত নেশা। তাই বিধবার বেশ ফেলে দিয়ে আমিও সধবা সেজেছি।

বিপ্রপদ বললে—ওকে আমি বিয়ে করেছি। তুমি চলে আসার পর ও চলে গেল গুরুর সঙ্গে ; সেখান থেকে মাস কতক পর ফিরল। সমাজে গাঁয়ে খুব হৈ-চৈ। তখন ধীরেনদা, আমাদের ডেটিন্যু ধীরেনবাবু, ওর সহায় হলেন : না, এমন ভাবে নির্যাতন করলে হবে না। ও চলবে না। ওর গুরু তখন দেহ রেখেছে, মঠের মোহ কেটেছে, গুরুর শিষ্য গুরুভাই ওর ওপর হাত বাড়িয়েছিল—

মধ্যপথে বাধা দিয়ে শান্তি বলে উঠল—সেই সময়টা তোমাকে আমি যা চেয়েছিলাম ! বেণীটা সম্পূর্ণ করে খোঁপার ছাঁদে জড়িয়ে বললে—ভাগ্যে ছিলে না। তা হলে আমার আর এই নতুন জীবন হত না। ওঃ, ধীরেনদা আমায় অকূল থেকে টেনে কূলে তুলে দিলেন। আমাকে দেশের কাজে লাগিয়ে দিলেন। শান্তি পেলাম। তারপর থার্টির মুভমেণ্ট—জেলে গেলাম। জেল থেকে ফিরে ধীরেনদার কাছে লেখাপড়া করলাম। মুখে মুখে পড়াতেন। আশ্চর্য জ্ঞানী লোক। ডাক্তারের মত চোখের ছানি কেটে দিলেন যেন। সব ধ্যান-ধারণা উল্টে গেল। ওঃ, কী অন্ধকারেই ছিলাম !

বিপ্রপদ বললে—ধীরেনদা ওখান থেকেই রিলিজড্ হয়ে ওখানেই কংগ্রেস গড়ে কাজকর্ম করছিলেন। থার্টিতে সে একেবারে 'হিন্দুস্থান উথল যায়েগা' হয়ে গেল। আমিও ভাসলাম। লেগে গেলাম। সেইখানেই শান্তির মন পাল্টাল, প্রেম হল, বাস্। জেল থেকে ফিরলাম। তখন শান্তির গর্ভে সন্তান। ধীরেনদা বললে—বিয়ে কর। কলকাতা চলে এসে বিয়ে করলাম। মিষ্টির দোকান করেছি। ভালই আছি। দেখছ তো মোটা হয়েছি। আই অ্যাম এ হ্যাপি ম্যান নাউ।

অবাক হয়েই শুনছিলাম। এতক্ষণে প্রশ্ন করলাম, তুমি তো আগে একটা বিয়ে করেছিলে ?

—সে ডাইভোর্স করে দিয়েছি। মানে তালাক। এখানে এসে দুজনে মুসলমান হয়ে নোটিশ দিয়ে তালাক দিয়ে নিকে করলাম, তারপর শুদ্ধি করে নিলাম। বাস্। ধীরেনদা খুব হেল্প্ করেছেন। অবশ্যি আমার জন্যে তত নয়। শান্তির জন্যে। আমাকে খুব বকেছিলেন। তা আমি বললাম, খুলেই বললাম—আমায় তো জান, সব স্ট্রেট—সোজাসুজি কথা বললাম—ধীরেনদা, ভেবে দেখুন, আমি একটা কালচার্ড লোক, লেখাপড়া না শিখি, সারা জীবন আর্টের চর্চা করছি, আমার স্ত্রী ওই গেঁয়ো মেয়েকে কী করে পছন্দ হবে আমার ? এই শান্তি, ও যতদিন ধর্ম-ধর্ম গুরু-গুরু করছে, ততদিন ওর বিরোধিতা করেছি আমি। এখন দুজনে একসঙ্গে মুভমেণ্টে নামলাম, আমাকে আগেই অ্যারেস্ট করলে—শলাপরামর্শ ওর ওখানেই হত, মেলামেশা করতে গিয়ে ভালবেসে ফেললাম। জিজ্ঞেস করুন শান্তিকে। আমি কোনদিন ওর মনের উপর জোর করি নি। ওকে ছুঁই নি। শেষে থাকতে না পেরে হাঁটু গেড়ে বসে বললাম—'ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি।'

শান্তি খিলখিল করে হেসে উঠল—বাবাঃ, সে কী চণ্ডীদাসী ঢঙ ! এখনও মধ্যে মধ্যে হয়। বুঝেছ ! আমি একটু রাগ করলেই থিয়েটার শুরু হয়ে যায়।

বিপ্রপদ বললে—তা হয়, হয়। এখন স্বামীজীকে খাবার করে খাওয়াও। দোকানে কিছুতেই খেল না।

ঠিক সেই মুহূর্তে দোকানের একটা ছোকরা এসে ডাকল—বাবু, একটা বদমাশ খরিদ্দার গোলমাল লাগিয়েছে। খেয়ে বলছে, খারাপ খারাপ। হুজ্জোত করছে। আপনি আসুন।

—শালা কে রে ? বোস সুদর্শন তুমি। আমি দেখি। শান্তি রইল। ও এখন খুব

প্রোগ্রেসিভ! শান্তি, আমি চললাম। ওকে খাওয়াও।

সে চলে গেল।

শান্তি হাসলে। বিচিত্র হাসি। তারপর দরজাটা দিয়ে এসে বললে—তুমি চলে না এলে ওর সঙ্গে জীবনটা জড়াত না আমার। সে রাত্রে তুমিই আমার মনের বাঁধ ভেঙে দিয়ে এসেছিলে। ধীরেনদা আমাকে সত্য-মিথ্যে বুঝিয়েছে কিন্তু তুমিই আমাকে জাগিয়েছিলে।

তারপর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে—সেও হয়তো ভাল হয়েছে। ওর জন্যে তুমি মন খারাপ কোর না। তোমার সঙ্গে মিললে সেই বা কী হত কে জানে? হয়তো সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী হয়েই জীবন কাটত। ভৈরব-ভৈরবী। আজ এ-তীর্থ, কাল ও-তীর্থ। জীবনের এ স্বাদ পেতাম না। বোস তুমি একটু। আমি বাথরুমে মুখ ধুয়ে আসি। আমাকে বেরুতে হবে। আমার আবার ক্লাস আছে।

—ক্লাস?

—হ্যাঁ। পড়ি আমি, কোচিং ক্লাসে ভর্তি করে দিয়েছেন ধীরেনদা। ম্যাট্রিক পাস করলেই কর্পোরেশনের ইস্কুল চাকরি করে দেবেন। নিজের পায়ে দাঁড়াতেই চাই আমি। ও লোকটা জীবনে জুটে গেছে; কিন্তু ওকে নিয়ে জীবন কাটানো যাবে না। তুমি বরং একটু মিষ্টি খাও। লুচি করে খাওয়াতে আজ পারব না।

একখানা ডিশে একটা রাজভোগ সামনে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল, বললে—খাবে তো আমার হাতে? তুমি আমার যা ধার্মিক লোক!

—খাব। তুমি যাও। বিশ্বাস না হয় দেখেই যাও, খাচ্ছি। কারণ ভাবতে পার তোমার অসাক্ষাতে ফেলে দিয়ে বলছি খেয়েছি। তবে আমারও তো আজ সে বিশ্বাস নেই।

সে বললে—সবারই নেই সুদর্শন, গোটা দুনিয়ারই নেই। সব মিথ্যে যে। থাকবে কেন? কিন্তু এতকালের ভড়ং ছাড়তে পারে না। আমাদের গাঁয়ের বনেদী বাবুদের মত গো। জমিদারি গেছে বাড়ি ভেঙেছে—ঘরে ভিত নেই কিন্তু বাইরে বেরুবার সময় পুরনো শাল গায়ে দিয়ে বেরিয়ে বলে—উই আর দি জমিন্দারস্—আমরা ছোটলোক নই। আমরা বড়লোক। কিছুতেই বলবে না—আমরা শুধু লোক। মানুষ।

এসব ধীরেনবাবুর কথা। আমি শুনেছি কতদিন; তিনি তাঁর ডেটিনুয় কোয়ার্টারের বারান্দায় তক্তপোশে বসে বলতেন—তাঁর কাছে যারা সমাগত হত তাদের।

কথাটা ভুল কি নির্ভুল তা বিচার করি নি সেদিন। আগে অবশ্য করতাম। অর্থাৎ সেকালে। একদিন তাঁর সঙ্গে তর্কও করেছিলাম। বলেছিলাম—বড়লোক ছোটলোক মিথ্যে, ধনীলোক গরীবলোক অন্যায়, কিন্তু পণ্ডিত আর মূর্খ এটা তো সত্য। লীডার আর ওয়ার্কার—এটাও মিথ্যে নয়। বক্তা আর শ্রোতা এটাও সত্য, না সত্য নয়। ধীরেনবাবু স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। রাগে লাল হয়ে উঠেছিল মুখ। বলে ফেলেছিলেন—তোমার ভাল রকম শিক্ষা দরকার। উদ্ধত ছোকরা কোথাকার!

আমি ব্যঙ্গভরে বলেছিলাম—পাঞ্জা লড়বেন নাকি একবার? সেইটেই তো শেষ সত্য।

বলেই আমি হাসতে হাসতে চলে গিয়েছিলাম সেদিন।

আজও, নাস্তিক হই আর আস্তিক হই ওই শেষ যুক্তিটা মিথ্যে হয়ে যায় নি। ধীরেনবাবুর প্রভুত্ব বা গুরুগিরি আর শান্তির শিষ্যত্বও মিথ্যে হয় নি। কিন্তু সে কথাগুলো বলতে ইচ্ছে হল না। বলেই বা কী হবে? শান্তিকে একদিন ভেবেছিলাম—এ মেয়ের জাত আলাদা।

ধারণাটা আমার ভুল। সেদিন আন্দাজে ওর মনের ওজন দৈর্ঘ্য প্রস্থের মাপ নিতে-উপাদানের ধাতুর কস্ট্‌ কষতে ভুল হয়েছিল। যেমন আমাকে নিজেকে যাচাই করতে ভুল হয়েছিল তেমনি। আজ আমারও ভুল ভেঙেছে ওরও ভেঙেছে—ওকে দোষ দেব কেন? তাই ওর গুরুর শেখানো কথার মধ্যে যত ফাঁক থাক্‌—তা বলে ওকে বিরক্ত করি নি। তবে একটা কথা ঠিক বলেছে—গোটা দুনিয়ারই বিশ্বাস ভেঙেছে।

শান্তি বললে, কী ভাবছ আবার? খাও।

খেলাম আমি। জল খেয়ে বললাম, তা হলে আমি যাই।

—না, দাঁড়াও। আমিও বেরুব। একসঙ্গে যাব।

বিস্মিত হয়েই ভাবছিলাম। এই শান্তি ভাল, না সেই শান্তি ভাল! কিছুক্ষণ পরেই সে এসে দাঁড়াল। কখন দাঁড়িয়েছিল খেয়াল করি নি, আধুনিকা শান্তির একখানা ফোটোর দিকে তাকিয়েছিলাম। ভাবছিলাম। সে ডাকলে—কী এত দেখছ? ওই ছবিখানা? ছবি দেখে কী করবে? আমাকে সাক্ষাৎ দেখ না।

একেবারে আধুনিক নিখুঁত সাজ। সজ্জার মধ্যে যত্নের অবহেলার সযত্ন কৌশলটুকুও নিখুঁত। চুলের কয়েকটা গুচ্ছ টেনে কপালের উপর এলোমেলো করে নামিয়ে দিয়েছে। বেণীটা এখন খোলা পিঠে ঝুলছে। কাপড়ের আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে বাঁধা। যাতে বিলাসিনী না বলে বিংশ শতাব্দীর যুদ্ধার্থিনী বলে বলে মনে হয়। কাঁধে একটা ব্যাগ।

দরজায় তালা দিয়ে চাবিটা দোকানে বিপ্রপদর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে—ক্লাসে যাচ্ছি। আমায় বললে—এস।

তারপর হঠাৎ বললে—তোমার কথা কিছু বললে না? সংসারে ফিরে এলে? সন্ন্যাস ভাল লাগল না? ভগবানের ভূত ঘাড় থেকে নামালে কী করে?—বলে খিলখিল করে হেসে উঠল।

আমি বললাম, একেবারে বিংশ শতাব্দীতে ফিরে এসেছি, শান্তি। ওই ফটকেই নেমে গেছে ভগবানের ভূত।

সে বললে—বল কী?

বললাম, হ্যাঁ। এক সন্ন্যাসী দিয়েছিল এক সোনার বিগ্রহ—সোনার রাধা। সেটাকে গালিয়ে বউয়ের গয়না গড়াতে দিয়ে এলাম।

—বউ?

—হ্যাঁ, বউ। বিয়ে করেছি আমি।

সে কয়েক মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। তারপর মুচকে হেসে বলল—অনুমান করা আমার উচিত ছিল। কোন অপ্সরা না হলে ঋষির তপস্যা ভাঙে কী করে?

বললাম, না না, নিতান্তই মানবী। তোমার চেয়েও বেশী করে এ যুগের মেয়ে। এবং তোমার চেয়েও ঘা খেয়েছে জীবনে।

সে বললে—ভাল। তাতে দুঃখ নেই। কারণ প্রতিদ্বন্দ্বিনী তো নই। বলেই আবার খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর বললে—কিন্তু করছ কী?

—কিছু করছি না। কী করব তাই ভাবছি।

—ধীরেনদার সঙ্গে দেখা কোর। তিনি ভাল পরামর্শ দিতে পারবেন। বলব তাঁকে তোমার কথা?

বললাম—না। তোমার গুরু তোমার থাক। আমার দরকার নেই। বলেই চলে এসেছিলাম। চিত্ত আমার এক মুহূর্তে তিক্ত হয়ে গিয়েছিল।

বাড়ি ফিরে এলাম শিবনাথ, এসে দেখি, একটা প্রদীপ জেলে হাতে নিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে নীল ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে চৌকিতে একটি মাটির রাধাকৃষ্ণমূর্তি।

মুহূর্তে আমার কী হয়ে গেল শিবনাথ।

আজ বুঝে দেখেছি, নির্ভুলভাবে বুঝেছি যে আমার মনশ্চক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে আধুনিকা শান্তি ব্যঙ্গভরে খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। আমার নাস্তিক্যবাদ-বিশ্বাসী মনকে সে খোঁচা মেরে খুঁচে দিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর নতুন মানুষ—আমার মত মানুষ, আমার আকাঙ্ক্ষা তো একজনের মধ্যে মেটবার নয়। হয়তো কোন কালেই মেটে না; তিল তিল উত্তম নিয়ে গড়া তিলোত্তমা তো সংসারে চিরকালই কল্পনা করেছে মানুষ। তার মধ্যে আছে তার বহু ভোগের কামনা। তবু সে সেকালে ভালবাসতে চেয়েছে, পেরেছে; অন্তত কাব্যকথায় যখন আছে তখন পেরেছে এবং পারবার চেষ্টা করেছে। আমার হৃদয় ভালবাসাকে স্বীকার করেছিল, ভালবেসেছিল নীলকে; কিন্তু আমার মন, আমার বুদ্ধি তার প্রভাব কাটিয়ে তখন প্রথম জেগেছে, সে তো তা স্বীকার করে নি।

হয়তো নীল যদি সে সন্ধ্যায় আধুনিকার সজ্জায় মনোহারিণী হয়ে আমাকে বিলোল কটাক্ষে অভ্যর্থনা করত, তবে এটা ঘটত না। আমি তাকে সাদরে গ্রহণ করে চিবুক ধরে মুখখানি দেখে মনে মনে বলতাম, শান্তি রূপসী, কিন্তু নীল অপরূপা।

দীর্ঘাঙ্গী, আয়ত চোখ, রাত্রির মত ঘন কালো চুলের রাশি নিয়ে নীল সত্যই শান্তির চেয়ে অনেক রূপসী ছিল। রূপ পবিত্র, শিবনাথ। কিন্তু দেহ-মনে যখন মানবীর রূপ ভোগেরই বস্তু তখন সে রূপের বিলাস-মার্জনা ছাড়া পরিতৃপ্তি হয় না। পবিত্রতার বৈরাগ্য বা শুচিতার সম্ভ্রম সেখানে চিত্তকে সঙ্কুচিত করে। বিংশ শতাব্দীতে ওর স্থান নেই। একালে রুজ-লিপস্টিক সর্ব সময়েই মেয়েদের বোধ হয় তাই না হলেই চলে না।

আমি পুতুলটাকে তুলে নিয়ে হাতের মুঠোয় চেপে ধরলাম।

সে আর্তনাদ করে উঠল—ওটাতে সোনা নেই, মাটি, ভেঙো না, ভেঙো না।

আমার মুঠোর চাপে মড়মড় করে সেটা ভেঙে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে তার হাত থেকে প্রদীপটা পড়ে গেল। আগুন ধরে গেল তার কাপড়ে। কিন্তু সে চমকাল না, শুধু বললে—ভেঙে দিলে?

আমি দুই হাতে চাপড়ে কাপড়ের আগুন নিবিয়ে দিলাম। রূঢ় স্বরেই বললাম, কোথাও পুড়ল কি না দেখ।

—না। বলে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

কোন বিক্ষোভ দেখাল না। সব কাজ করে এসে চুপচাপ শুয়ে পড়ল।

সকালে উঠে দেখলাম, সে নেই। কানের ঝুমকো দুটি খোলা, টেবিলের উপর পড়ে রয়েছে। তার তলায় একখানা চিঠি।

"আমি চললাম। তোমার গেরুয়া কাপড়ে রুদ্রাক্ষের মালায় কিছু ছিল। সেদিন ভোরে সেই নির্জন পাহাড়ে ওই গেরুয়া কাপড় পরার সঙ্গে সঙ্গে তার স্পর্শ আমি পেয়েছিলাম। তুমি তাকে বিসর্জন দিয়েছ, কিন্তু আমাকে তা পেয়ে বসেছে। তা হারাতে পারব না। তাই আমি চলছি। তোমাকে স্বীকার আজীবন করব। কিন্তু আমাকে খুঁজো না। তোমাকে আমার

ভয় করছে। তোমার জন্যে আমার ভয় হচ্ছে।—নীল।"

চিঠি পড়ে আমার ক্রোধ যেন জ্বলে উঠেছিল। টুকরো টুকরো করে চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিলাম। একবার বেরিয়ে গিয়েছিলাম দ্রুতপদে বড় রাস্তা পর্যন্ত। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ফিরে এসেছিলাম। মনে মনে কুৎসিত কথা, নির্মম অভিশাপ দিয়েছিলাম তাকে। ভেবেছিলাম, যাবে কোথায়? কোথায়? মনে ভেসে উঠেছিল কলকাতার বস্তির দেহপণ্যাদের কুৎসিত স্থানগুলি। একবার মনে হয়েছিল, গঙ্গার জলের কথা। কিন্তু পর-মুহূর্তেই তিক্ত ব্যঙ্গ হাসি ফুটে উঠেছিল আমার মুখে। যে মেয়ে এক বৎসর একটা ঘরে বন্দিনী ছিল, দলে দলে পশুর অত্যাচার সহ্য করেও জীবনের মায়া ছেড়ে মরতে পারে নি, সে কখনো মরতে পারে? মরার উপায় হাজার হাজার। পরনে তো তার কাপড় ছিল, গলায় জড়িয়ে মরতে পারত। ভাবতে ভাবতে সে হাসি বেড়ে গিয়েছিল আমার। আপন মনে হাসতে হাসতে তখনকার মত ফিরে এসেছিলাম। একবার যেন খুশী হয়ে ক্রুদ্ধ উন্মাদ আনন্দে বলেছিলাম—কালাপাহাড় দেবমূর্তি ভেঙেছিল, আমি একটা মাটির মূর্তি ভেঙেছি। ' আঃ, আমি যদি কালাপাহাড়ের মত হতে পারতাম বাকি জীবনটা!

তারপর শিবনাথ, অন্তত বৎসরখানেক তাকে খুঁজেছি—বস্তিতে বস্তিতে। কেন খুঁজেছিলাম তা নিয়ে সংশয় জাগত সময়ে সময়ে। কেন—কেন—কেন সেই একটি বহুজনের উচ্ছিষ্টা রুগ্নমন একটা মেয়েকে খুঁজছি! তখন মনে হত প্রতিশোধ। আজ বলছি ভালবাসা। তাকে ভালবেসেছিলাম। সঙ্গে থাকত বিপ্রপদ। বিপ্রপদই নানান স্থানে অনেক বস্তিরক্ষক গুণ্ডাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। কিন্তু খোঁজ তার পেলাম না, বিপ্রপদও আমার অনুচর হয়ে গেল। আসলে বন্দী করলে আমাকে শান্তি। সে আমাকে জড়িয়ে ধরলে যৌবন দিয়ে, ভোগ দিয়ে, উল্লাস দিয়ে। আমি নীলকে ভুলে গেলাম। যাক, একটা ব্যভিচার-বিধ্বস্তা মেয়ে কয়েকদিন এসেছিল জীবনে, মনে রিক্ত, দেহেও রিক্ত, শান্তির তুলনায় সে সত্যই রিক্ত—যাক সে। ভেবেছিলাম—ভাগ্য না মানি, তবু তার প্রতিশব্দ না পেয়েই 'ভাগ্য' শব্দই ব্যবহার করব—বলব, ওই নরকে বাস আর পশুর ব্যভিচারের অত্যাচারে বিধ্বস্ত হওয়াই ওর ভাগ্য।

নতুন বাড়ি ভাড়া করে একসঙ্গে বাস করতে লাগলাম শান্তি এবং বিপ্রপদর সঙ্গে। মাঝে মাঝে শান্তি এসে খিলখিল্ করে হেসে আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ত।

নীল হারিয়ে গেল।

অকস্মাৎ শিবনাথ, এই সেদিন—চোদ্দ বৎসর পর—নীলকে দেখলাম। দেখে কথাটা মনে হল। আমার বিচারের সময় একদিন দেখলাম, আদালতে বসে আছে এক বৈরাগিণী। সেই বর্ষার মেঘের মত ঘন কালো রুক্ষ কেশভার, সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে একটি সিঁদুরের টিপ, গলায় তুলসীর মালা, পরনে একখানি লালপেড়ে কাপড়, আশ্চর্য প্রশান্ত মুখ, সেই আশ্চর্য আয়ত চোখ। সারা আদালত তার দিকে চেয়ে কয়েকটি ক্ষণের জন্য যেন কেমন হয়ে গেল।

উকিল মারফৎ আদালতের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে সে আমার সঙ্গে কয়েকটি কথা বলেছিল।

বলেছিল—আমি তোমার নীল।

বলেছিলাম, চিনেছি। তোমাকে তো কোনদিন ভুলি নি আমি।

—জানি।

বলেছিলাম, তবে তোমার এই পরিণতি আমি কল্পনা করি নি।

সে বলেছিল—কল্পনা করার মত নয়। কিন্তু তোমার সেই গৈরিকের মধ্যেই ছিল যত পুণ্য, যত বিশ্বাস। তার ছোঁয়ায় ধন্য হয়েছি বলেই এ সম্ভবপর হয়েছে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কেন এলে ? আমার পরিণতি দেখতে ?

—না। আর আসব না। বলতে এসেছি, পরিণামকে ভয় কোর না।

সে আর-একদিন আসবে শিবনাথ, আমার সঙ্গে দেখা করতে।

ভয় আমার ছিল না। তার সন্ধানটুকুও নীল মুছে দিয়ে গেছে এবং দেবে।

এই দেখ শিবনাথ, ভুল করে ফেললাম, নীলের কথাটা কত আগে বলে ফেললাম! ক্রমভঙ্গ হয়ে গেল।

শিবনাথের কথা

নীলের বা নলিনীর কথা বলতে গিয়ে সুদর্শন তার নিজের কথাই ভুলে গেছে।

হয়তো মনের খেলা বলতে পার। হয়তো সেই ভয়ঙ্কর, সেই বীভৎস কথা বলতে তার ইচ্ছে হচ্ছিল না, তাই হয়তো শেষের কথাটাই আগে বলে ফেলেছে। কিন্তু সুদর্শন বুঝতে পেরেছিল, নিজেই তাই সে লিখেছে—বলতে বসে শেষের ওই নীলের কথাটা আগে লিখে ফেলে ভাবলাম, শিবনাথ, ভুল হল, পরের কথা আগে লেখা হল—ক্রমভঙ্গে বুঝতে অসুবিধা হবে। কেটে দি। কিন্তু না—কাটতে গিয়ে কাটলাম না, মনে হল ওইটেই আগে লেখা প্রয়োজন। ওই কথাটি আগে না বললে আমাকে বুঝতে পারবে না। আমারও আমাকে বোঝানো হবে না। বলছি সেই কথা।

তারপর লিখেছে, এইবার তোমাকে আমার এই সময়ের মনের ঘরের—মনের চাবিকাঠিটা তোমাকে দিয়ে দি। চাবিকাঠি বলতে পার, আবার সাঙ্কেতিক শব্দ বলতে পার। এক ধরনের তালা আছে, যা তার গায়ে-বসানো বিভিন্ন অক্ষর সাজিয়ে একটি শব্দে বন্ধ হয় এবং সেই শব্দটি সাজালেই খোলে।

ছেলেবেলার সাঙ্কেতিক শব্দ জান, বলেছি। তবু যদি ইংরিজী-জানা মানুষ তোমরা, সেকালের একান্তভাবে ভারতীয় শব্দটি ধরতে না-ই পার, তাই বলে দিচ্ছি—শব্দটি হল সোহং। আমি তো ঈশ্বর খুঁজতে শুধু বের হই নি, তার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে তার সকল অধিকারে অধিকারী হতে বেরিয়েছিলাম। ঈশ্বর পেলাম না। ঈশ্বর নেই। সে গেল। কিন্তু অহং রইল। সে বললে—আই অ্যাম মনার্ক অব অল আই সার্ভে। তা নইলে তৃপ্তি কোথায় ? যারা বলে অনেক চাই, তারা ভীরু; যারা বলে কিছু পেলেই চলবে, তারা দাস। আসলে চাই আমি—সব। আমি সব চাই। নাস্তিক্যবাদের এইটেই চরম সত্য, নগ্ন সত্য। তাই সিদ্ধ পুরুষকে আমরা যাচাই করি তার অলৌকিক শক্তির পরিমাণ করে।

যারা সংসারে শক্তিমান, তারাই একক, চিরদিন একক। তাই তাদের দাবি সবটার, শরিক তাদের সহ্য হয় না।

যাক, ঘটনার কথা বলি।

কী ভাবে এই নাস্তিক জীবনের পরিণতি এই পরিণামের দিকে ছুটল। শুধু আমারই নয় শিবনাথ, বিশ্বমানব-সমাজের মানুষের এই অবস্থা। তবে আমার জীবনের গতি তো সকলের

থেকে বেশী—তাই আমি পরিণতিতে পৌছুলাম এই পঞ্চাশ বছরের মধ্যেই। তাদের পৌছুতে অনেক দেরি লাগবে। হয়তো একশো দুশো বছর। থাক্, শোন।

নীল চলে গেল, বিপ্রপদর সঙ্গে বস্তিতে বস্তিতে ঘুরছিলাম। তখনও শান্তি শুধু বান্ধবী। সম্পর্কটা হাস্য-পরিহাসেই আবদ্ধ। বাসা ছাড়ি নি তখনও। কিন্তু তখন বাসায় থাকি নে। বউ পালিয়ে গেছে—পাড়ায় রটেছে। বাড়িওলা খুঁতখুঁত করছে। শান্তিদের ওখানেই থাকি সারা দিনটা, রাত্রি এগারোটা বারোটা পর্যন্ত, তারপর এসে বাড়িতে শুয়ে পড়ি। এক দিকে নলিনীর উপর কঠিন আক্রোশ, অন্য দিকে নূতন জীবন, নূতন কামনা-আকাঙ্ক্ষার অসন্তোষ-ভরা আগ্রহ আমাকে ধীরে ধীরে অধীর করে তুলছে। এমনি সময় শিবনাথ, পর পর ঘটে গেল দুটি ঘটনা।

প্রথম ঘটনাটা বলি। একদিন আমি বললাম—না, আর না বিপ্রপদ। আর খোঁজে কাজ নেই। বিপ্রপদ বললে—দেখ সুদর্শন, এমনি করে ছুটকো-ছাটকা গুণ্ডাগুলোকে ধরে সন্ধান করে কিছু হবে না। বেটাদের ক্ষমতাই বা কতটুকু, আর ওদের লোভেরও অন্ত নেই। খবর আছে বলে টাকা নেয়, নিয়ে গিয়ে হাজির করে যেখানে হোক ; যোগসাজস করে সাজিয়ে রাখে, মেয়েটাকে শেকল দিয়ে রাখে, শিখিয়ে রাখে গেরস্তঘরের মত সাজ-পোশাক করতে ছেঁড়া কাপড়-জামা পরতে। আমরা চলে আসি, ওরা হি-হি করে হাসে।

নীলের খোঁজে ঘটনাগুলো ঠিক তাই ঘটছিল। এর সঙ্গে বিপ্রপদরও যোগ ছিল।

আমি বলেছিলাম, না থাক, খবর করব না।

সে বলেছিল—না। শেষ আর বাকি রাখবে কেন ? আমি একটা কথা বলি।

প্রশ্ন করেছিলাম, কী ?

—একেবারে উপরের লোকের কাছে চল। অবশ্য কিছু খরচ হবে ভাই। আমি তোমাকে নিয়ে যাব গুণ্ডার রাজার কাছে। একেবারে বাদশা। সে যদি বলে, খুশী হয়, তবে তোমার স্ত্রীকে মেরে যদি কোথাও গেড়ে রেখেও থাকে, তবে লাশটা তোমাকে সে তুলে এনে দেওয়াবে। তবে খরচ করতে হবে।

—সে কত ?

—কত, মানে, সে পাকা জুয়াড়ী। মদ-মেয়েমানুষের নেশার চেয়েও ওই নেশাটাই তার বেশী। তুমি তার সঙ্গে জুয়ো খেলবে এবং ইচ্ছে করে হারবে। বাস্, তা হলেই সে খুশী। বড় বড় লোক আসে তার কাছে জুয়ো খেলতে। ধর কোন মেয়েমানুষকে চায়—অবশ্য বাজারের, অথচ মেয়েটা আর কোন জনের খপ্পরে। ওর কাছে এলে ওর যদি মর্জি হল তো বলে দিল—এই, তুই এই বাবুকে ভজবি। বুঝলি ? না-বোঝা মানে বুঝছ ?

নিজের গলায় নিজের আঙুল চালিয়েই বুঝিয়ে দিলে। তারপর হি-হি করে হাসতে লাগল।

সুদর্শন লিখেছে—বিপ্রপদ শেষ মোটা দাঁওয়ের মোটা কমিশনের প্রত্যাশা ছাড়তে পারবে কেন ?

ভেবেচিন্তে সুদর্শনও রাজী হয়েছিল। নীলকে তখন তার হত্যা করবার প্রতিহিংসা জেগেছে। সুদর্শনের হাতে তখন টাকা সেকাল অনুযায়ী প্রচুর না হলেও কম ছিল না। হাজার পাঁচেকের উপর। স্বর্ণবিগ্রহ ভেঙে গড়ানো গহনাগুলি বিক্রি করতে অসুবিধা হয় নি। বাড়িওলার স্যাকরার কাছে নলিনীর গৃহত্যাগের কথাটা গোপন ছিল না। সে সহানুভূতিরই

সঙ্গে বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করে দিয়েছিল। তা থেকেই সে শ-তিনেক খরচ করেছিল, নানান স্থানে এই ধরনের নানান লোকদের দিয়ে। এবার সে দুশো টাকা নিয়ে ওখানে গিয়েছিল। বিপ্রপদর কথাটা অবিশ্বাসের ছিল না, সে সময় খাঁদুবাবুর নাম ছিল উত্তর-কলকাতার বিখ্যাত নাম। খাঁদুবাবু গুণ্ডার রাজা হলেও সত্যকার বাবু ছিলেন। বাবুর বাড়িরই ছেলে। ধনী এবং মানী ঘরের সন্তান। অর্থসম্পদ যথেষ্ট ছিল। কিন্তু নেশা ছিল জুয়া আর নারীর। আরও একটি সম্পদ ছিল খাঁদুবাবুর, সেটি তাঁর দেহ। ছেলেবয়সে কুস্তি শিখে-ছিলেন, তারপর ডাম্বেল, বারবেল। প্রথম জীবনে নিজের বাড়িতে আখড়া করে অনেক চেলাও তৈরী করেছিলেন। ব্রহ্মচর্য নিয়ে উপদেশও দিতেন। হঠাৎ চোখে পড়ল কাশী মিত্তিরের ঘাটে এক শ্মশানচরদের মেয়ে। চোখে তাঁর যে কী নেশা লাগল তিনিই জানেন। তারপর সেই মেয়েকে নিয়ে ঘর বাঁধলেন বাগানবাড়িতে। জীবনের মোড় ঘুরল। মনের নেশা আর দেহের নেশা, দুটো নদীর মিলিত ধারা। দুটো নদীর মিলিত ধারার বানে ভেসে গেলেন খাঁদুবাবু। তারপর হঠাৎ মনের নদীতে পড়ল চড়া। ভাসল একক দেহের নদীর বানে, একটাতে বান ডাকলে অন্যটায় চড়া পড়ে। কারণ হল, ওই মেয়েটার মৃত্যু। তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন এই দেহপণ্যাদের ঘরে ঘরে, কাকে ধরে তাঁর চোখে! মনে ধরে মন, আর চোখে ধরে রূপ, কিন্তু সংসার যে রূপের হাট। সেখানে কাকে রেখে কাকে ফেলে চোখ? তাই রূপের হাটে ঘুরতে শুরু করলেন এমন একটি রূপের জন্য যাকে পেলে এই চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা-দেখা—তিলোত্তমার স্বর্গ-দেখা চোখ দুটির পরিধি ভরে যায়, ক্ষুধা মেটে, সকল রূপের ছটাকে ঢেকে দিয়ে চোখ ঝলসে যায়। ক্রমে ধনসম্পদ গেল, বাড়ি বিক্রি হল। একখানা নয়, কয়েক-খানা। তাঁর বয়স গেল, সব হারিয়ে পেলেন একটা জিনিস। এই খাঁদুবাবুর নাম ও খ্যাতি। উত্তর-কলকাতার এই অন্ধকারের অন্ধকারচারীদের নেতৃত্ব। লোকে বলে, খুন কয়েকটা তিনি করেছেন, কিন্তু তার কোন সন্ধান কেউ কোনদিন পায় নি। শেষজীবনে আছেন জুয়ার নেশা নিয়ে, আর আছেন এই অন্ধকার রাজ্যের এক বিচিত্র বিধি-বিধানের বিধাতা হয়ে, পুলিসের কর্মচারীরাও তাঁকে খাতির করে। কতকগুলি নিয়ম তাঁর আছে। মেয়ে হারালে, সে মেয়ে যদি ইচ্ছে করে হারিয়ে না থাকে, তবে তাকে তিনি উদ্ধার করে দেন। লোক ঠকাবার জন্য জুয়ো তিনি খেলেন না, স্বার্থের জন্য যে তাঁর কাছে ইচ্ছে করে হারতে আসে, তারই সঙ্গে তিনি জুয়া খেলেন। ওইটেই তাঁর ফী। উপকার করে পয়সা নিয়ে খাঁদুবাবু ছোট হতে চান না।

বিপ্রপদ সুদর্শনকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ওখানে যেতেই তিনি বলেছিলেন—কী রে বেটা মিষ্টি-ওলা, খবর কী? তোর মেয়েছেলেটার পেছনে কেউ লাগছে নাকি? আমি তো বলে দিয়েছি রে। তবে মেয়েটাকে বলিস—এমন ঢং করে বেরোয় কেন? লোচ্চার চোখের দোষ কী বল্? তোদের ধীরেনবাবুকেও তো বলে দিয়েছি রে। ধীরেনবাবুরা এবার শুনছি মেয়ে-দের দলে নিচ্ছে। জমবে ভাল রে।

হো-হো করে হেসে উঠেছিলেন খাঁদুবাবু।

সুদর্শন বুঝতে পেরেছিল, শান্তির কথা বলছেন খাঁদুবাবু।

বিপ্রপদ বলেছিল—না, না। সে আপনি যখন অভয় দিয়েছেন, তখন ভয় কি হয়, না হতে পারে?

—তবে কী? মিষ্টি এনেছিস? এ কে রে?

মিষ্টির একটা মোড়ক নামিয়ে দিয়েছিল বিপ্রপদ। তার দাম অবশ্য দিয়েছিল সুদর্শনই।

নামিয়ে দিয়ে বলেছিল—এ আমার বন্ধু। ভারি শখ খেলায়। কত্তার সঙ্গে একহাত্‌ খেলবার ভারি সাধ।

—ভাল। বোস। কত পর্যন্ত খেলবে ?

—সাধ্য আমার বেশী নয়। সামান্য।

—কিন্তু তোমার দেহটা তো ভাল হে। ননীর পুতুল বড়লোকের ছেলে তো তুমি নও। এ যে বীরের মত ছাতি হে। দেখি, দেখি হাতখানা। দেখি দেখি।

হাতখানা বাড়িয়ে দিয়েছিল সুদর্শন। হাতখানা বেশ শক্ত করে ধরে খাঁতুবাবু বলেছিলেন —বহুত আচ্ছা! মর্দানার হাত।

বিপ্রপদ উৎসাহে বলেছিল—হ্যাঁ কর্তা, ও আচ্ছা মর্দানা। ছেলেবেলা থেকে শরীর ওর আচ্ছা শরীর। ওর ভয়ও নেই। যমকেও না। ঈশ্বর খুঁজতে চলে গিয়েছিল সন্ন্যাসী হয়ে। পাঁচ বছর ঘুরেছে।

চোখ দুটো বড় হয়ে উঠেছিল খাঁতুবাবুর। নিষ্পলক চোখে কয়েক্‌ মুহূর্ত সুদর্শনের দিকে চেয়ে দেখেছিলেন। তারপর বলেছিলেন—ঈশ্বর খুঁজতে গিয়েছিলে, পাঁচ বছর খুঁজেছ ? ফিরে এসে আমার কাছে এসেছ ? কী চাই বল তো ? আমি তো ঈশ্বর দিতে পারব না।

বিপ্রপদ কী বলতে যাচ্ছিল। তাকে খাঁতুবাবু একটা ধমক দিয়ে উঠেছিলেন, চোপরও উল্লুক। বিপ্রপদ চমকে উঠেছিল। খাঁতুবাবু বলেছিলেন—কথা কইছি ওর সঙ্গে, তুই বেটা হড়বড় করিস কেন ? যা তুই, বাইরে যা।

তাঁর তর্জনীটা উদ্যত হয়ে উঠেছিল দরজার দিকে। সে নির্দেশ অমান্যের সাহস কারও ছিল না। বিপ্রপদ বেরিয়ে গেলে খাঁতুবাবু বলেছিলেন—দরজাটা বন্ধ করে দাও তো বাবা। বোস। তুমি ঈশ্বর খুঁজতে গিয়েছিলে ? জাতিতে কী ? জন্ম কোন্‌ কুলে ?

—জন্ম ব্রাহ্মণের ঘরে। কিন্তু আজ জাতও মানি নে, ঈশ্বরও মানি নে।

—তা ভাল। কিন্তু খুঁজতে গিয়েছিলে কেন ?

—তাকে পাবার জন্যে।

—কোন কামনা-বাসনা ছিল না বাবা ?

—না। বলেই এক মুহূর্ত পরে বলেছিল, না-ই বা বলব কেন ? ছেলেবেলা থেকে মনে বাসনা ছিল, অন্যায়কে, পাপকে দমন করব, পুণ্যের প্রতিষ্ঠা করব। জানব, ঈশ্বর কী। এই।

—তা পেলে না ?

—না।

—হুঁ। তা এখন বুঝি উল্‌টো পথে খুঁজবে ?

—উল্‌টো-সোজা জানি নে ; সংসারে ফেরার পথে দেখা হয়েছিল একটি মেয়ের সঙ্গে। তখনও আমার সন্ন্যাসীর বেশ। তাকে নিয়ে ফিরে এসে সংসার বেঁধেছিলাম। সে মেয়ে হয়েছে নিরুদ্দেশ। তাই আপনার কাছে এসেছি।

—সে মেয়ে এই পথে এসেছে, এ ভাবনা ভাবছ কেন ? কারও সঙ্গে পালিয়েছে ?

—না। ভোররাত্রে আমার ঘুমন্ত অবস্থায় ঘর থেকে উঠে চলে গেছে।

—ঝগড়া হয়েছিল ?

—হ্যাঁ।

—তবে ? ভাবছ কেন এ পথে এসেছে ? সে তো বাপের বাড়ি যেতে পারে ?

—বাপের বাড়ি ধরুন নেই। আর মরার কথা ভাবতে ঠিক পারছি নে।

—কেন ? আমাকে সব কথা খুলে বলবে ?

সব কথাই খুলে সে তাকে বলেছিল। সোনার রাধার কথাও গোপন রাখে নি। গোপন রাখলে কোন কথাই বলা হয় না। সব শুনে খাঁদুবাবু অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ছিলেন। তার পর বলেছিলেন—তাকে তো আর পাবে না বাবা। এই জীবনে মেয়ে আমি অনেক দেখেছি। কোন্ রাজা লক্ষ বলি দিয়েছিল। আমার জীবনে লক্ষের বেশী মেয়ে আমি পরখ করেছি। কষ্টিপাথরে কষে দেখেছি। এ মেয়ে এক বছর ধরে দিনে দুটো চারটে পাঁচটা জানোয়ারের কামড় সহ্য করেও মরতে পারে নি ; যুক্তিটা খুব বড় বটে, কিন্তু বাবা, তুমি যে তাকে তোমার গেরুয়ার খুঁটে বাঁধা পরশপাথরের ছোঁয়া দিয়ে পাল্‌টে দিয়েছ। তুমি ফেলে দিয়েছ, সে পেয়েছে। তুমি তাকে এই পথে খুঁজছ, সে হয়তো গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে ভগবানকে পেয়েছে। বাবা, চোর-সন্ন্যাসী তোমাকে পুতুল দিয়েছিল, তোমার ঈশ্বর-সন্ধানে তুমি রাধা পেয়েছিলে। তোমার মতিভ্রম, সোনা রেখে রাধা জলে ভাসিয়ে দিলে তুমি। তা সে রাধা জলে ভাসে নি বাবা। ওই কাপুরুষ নাস্তিকের মেয়ে—যাকে নরকের প্রেতরা চুরি করে, তার বুকে নেচেছে—তার সব মূলধন শেষ করেছে। যে মেয়ে ধ্বংসলগ্নে এল তোমার কাছে, ছদ্মবেশের জন্যে গেরুয়া পরলে, বাবা—এ রাধাকে সেই খুঁটে বেঁধেছে, সেই গেরুয়া কাপড়ের খুঁটে। আর তুমি সব ফেলে দিয়ে—। তা, এ পথেও আছে বাবা। পেতে আলো, পাবে কালো, যা আমি পাব। মরণের সময় অন্ধকার, ভীষণ অন্ধকার, তা ছিঁড়ে-ফুঁড়ে ঢুকে পড়ব।

সুদর্শন চুপ করে বসে ছিল। কথাগুলো তার ভাল লাগে নি। একটা মূর্খ গুণ্ডার কাছে এই ধরনের তত্ত্ব তো সে শুনতে আসে নি।

খাঁদুবাবু বলেছিলেন—ভাল লাগল না আমার কথা ? তা বুঝেছি। তা শোন, তিন দিন পরে এস তুমি। আমি খোঁজ করিয়ে রাখব। কলকাতার কোন খারাপ জায়গায় থাকলে, তুমি তাকে এখানে হাজির দেখতে পাবে। একশোটা টাকা রেখে যাও। খরচ কিছু হবে। তোমার কাছে ফী আমি নেব না। জুয়ো তোমার সঙ্গে খেলব না। একদিন একহাত পাঞ্জা কিন্তু লড়ব।

নির্দিষ্ট দিনে সুদর্শন যখন গেল, তখন খাঁদুবাবু একজন বাবুর সঙ্গে জুয়ো খেলছিলেন। সুদর্শনের জন্য প্রবেশাজ্ঞা দেওয়া ছিল।

সুদর্শনকে দেখে বলেছিলেন—বোস বাবা। বাবুর সঙ্গে খেলাটা সেরে নিই।

দানটা শেষ করেই টাকাটা কোলের কাছে টেনে বাবুকে বলেছিলেন—বাস্, খতম।

বাবু বলেছিল—সে কী ? আরও কিছু খেলব বলে এসেছিলাম।

হেসে খাঁদুবাবু বলেছিলেন—লোহাওলা বাবুসাহেবের অনেক টাকা তা আমি জানি গো। তবে আজ আমার খেলবার ফুরসৎ নেই। এখন আপনার কাজটা হাসিল করে দি ; খেলবেন এর পর। আবারও তো আসবেন গো। ফের এই ফ্যাসাদ করবেন, ফের খাঁদুর কাছে আসবেন।

ব্যঙ্গভরে হেসে কথা শেষ করে ডেকেছিল—এ রে, এই রামবিলাস!

এক মূর্তি, হ্যাঁ, এসব লোকের সংজ্ঞাই হল মূর্তি, অর্থাৎ রামবিলাস নামক ব্যক্তিটি সেলাম করে এসে দাঁড়িয়েছিল।

খাঁদুবাবু হুকুম জারি করেছিলেন—লক্ষ্মী বাড়িউলীর কাছে যা। বলবি, কর্তা পাঠিয়েছে। হুকুম, কাঞ্চন মেয়েটার আর সাধনবাবুর উপর জুলুম চলবে না। উনি পাঁচশো টাকা দেবেন। বাস্। আর লীলাকে বাবু অন্য বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখবেন তাও বলে দিলাম। আপনি.

লীলাকে অন্য বাড়িতে রাখবেন। এক বাড়িতে কাঞ্চনের ঘরে যেতেন আপনি, এখন লীলার ঘরে যাবেন, সেটা ভাল দেখাবে না। হ্যাঁ বিলাস, বলে দিবি, ফের যদি ও বাবুকে চিঠি লেখে, শাসায় তো আমি দেখব। যান বাবু, নিশ্চিন্তি আপনি। লীলাকে মনে ধরেছে, এখন লীলা করুন।

বাবু উঠল। খাঁদুবাবু বললেন—ও-ঘরে পাঁচ মিনিট বসে যাবেন। আরও কিছু বলব।

বাবু ও-ঘরে যেতেই সুদর্শনকে বলেছিলেন খাঁদুবাবু—বাবা মহারাজ, চিড়িয়াখানায় সে পাখি কোথাও নেই বাবা। যে পাখির বাসা নেই, যে শুধু আকাশে ওড়ে তার খোঁজ ব্যাধে পায় না। সে পাখি অনেক উপরে ডানা মেলেছে বাবা। ডানা ভেঙে কোথাও কোন সাগরে সমুদ্রে পড়ে থাকলে সমুদ্রের তলায় গেছে। তুমি ব্রাহ্মণ, আমি কায়স্থসন্তান—বয়সে বড় হলেও তুমি আমার কাছে দেবতা, তুমি ঈশ্বর খুঁজতে বেরিয়েছিলে, আমি মিথ্যে বলি নি।

সুদর্শন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিল—তা হলে উঠি।

—না। বোস।

হেসে বলেছিল—বসে আর কী করব?

—জিজ্ঞেস করছি, গিয়ে কী করবে?

—বাসায় যাব।

—না। তা বলি নি। আরও খোঁজ করবে?

—না। আপনার কথায় আমার এটুকু বিশ্বাস হয়েছে যে, সে এখানে নেই। অন্তত হিন্দুপাড়ায় নেই। হয়তো কলকাতাতেও নেই। সে তো ওই ধাক্কায় আবার সেই তাদের ওখানে গিয়ে থাকতে পারে। অন্তত জাত দিয়েও ঠাঁই কিনতে পারে।

—তুমি বাবা একেবারে নাস্তিক হয়ে গিয়েছ। তা বেশ আরও খোঁজ করব, কী বল?

—না। দরকার নেই।

—তা হলে আমি জিজ্ঞাসা করছি—খোঁজ তো শেষ হল, হাতে তোমার টাকাও আছে, অবশ্য অনুমান। এই বিপ্রপদ ব্যাটাও বলে গেছে আমাকে ইশারায়। মানে আমি যাতে মোচড় দিতে পারি। বেটাকে কষে ধমক দিয়েছি। বেটা জানে না—খাঁদুবাবুও ভালবাসতে জানে। তোমাকে ভালবেসেছি বাবা। তা এখন লজ্জা কোর না, দিল খুলে আমাকে বল তো—সংসারে ভোগ করতে চাও; তা কী করবে? বিয়ে করবে? ভাল পাত্রী—

—না।

—তবে?

—সে ভেবে দেখব পরে।

—ভাল। কিন্তু কিছু কাজকর্ম তো করবে?

—হ্যাঁ, তা করব।

—কী করবে? লোহার ব্যবসা করবে? দেখ, বাবুটিকে বসিয়ে রেখেছি। বড় ব্যবসাদার—ও ইচ্ছে করলে মাসে দুশো পাঁচশো রোজগার করিয়ে দিতে পারবে, খেয়াল হলে হাজার টাকাও পারে। আমার কাছে ওর টিকি বাঁধা। মানে, দু মাস চার মাস অন্তর মেয়েছেলে বদল করে। আমার কথা ও অমান্য করবে না।

অভিভূত হয়ে গিয়েছিল সুদর্শন। বলেছিল—আপনাকে যে কী বলব আমি ভেবে পাই নে।

—কী বলবে? কিছু না। তোমার মত শক্ত মানুষ আমি ভালবাসি। তাই যদি কিছু করে দিতে পারি, কিছু যদি হয় আমার কথায়, খুশী হব আমি। মধ্যে মধ্যে এস; আমার তো বিদ্যে-সাধ্যি নেই—তবে দিয়েছি অনেক, ঠকেছি অনেক, পেয়েছিও অনেক। তবে তা আমি ঠকিয়ে পাই নি বাবা, জোর আছে, আদায় করেছি আপন জোরে। ব্যবসা কর। ইচ্ছে হয় পরে বিয়ে কোর, তবে আর বিয়েতে সুখ পাবে না। সে মেয়ে যা তোমাকে এ ক'মাসে দিয়ে গেছে, তা আর কেউ দিতে পারবে না। বিয়ে না করে থাক, খুব ভাল। ইচ্ছেমত দেহের কামনা মেটানো—সে তোমার হোটেলে খাওয়ার সামিল। ইচ্ছে হয় মিটিয়ে নেবে। বাস্। নাস্তির পথে চলেছ, ও ছাড়া পথ কই তোমার? আমার মুখে খারাপ লাগছে হয়তো, কিন্তু একালের বড় বড় পণ্ডিতকেই জিজ্ঞাসা কোর—তারাও বহুজনে তাই বলবে। যার ঘর নেই সে হোটেলে থাকে, হোটেলে খায়। যার সংসার নেই তার দেহের ক্ষিদেও এমনি করে মেটায়। তবে বাবা, মরণকালে অন্ধকার। সে ভীষণ ভয়ঙ্কর বাবা! মহা ভয়ঙ্কর। জানি না, মুখ্যু মানুষ তো, তাই আমার মনে হয়। • আর মুন্নিও তাই বলে গেছে। সেই চাঁড়ালনী গো। জান তো, এক চাঁড়ালনীকে নিয়ে আমি ভেগেছিলাম। সে তখন বিছানায় পড়ে। বাতব্যাধি হয়েছিল, মাস কয়েক পড়ে ছিল বিছানায়। আমার তখন ক্ষিদের আর শেষ নেই। এসব পাড়াগুলো চষে বেড়াই। হাতে টাকা অনেক। জুড়ি গাড়ি। আর গায়ে অসুরের শক্তি। তা সে আমাকে বলেছিল—"মুখপোড়া, শেষকালে অন্ধকারের পথ ধরলি? মরণ! আমি তোকে ভালবেসে ভজে কুল পেলাম, আর তুই ভালবেসেও বাসতে পারলি নে, সুধা খেয়েও ক্ষুধা মিটল না! রাক্ষসের মত খাই-খাই করে ছুটে বেড়াচ্ছিস! কপাল রে! কপাল! আঃ, আর তো কিছু নয় রে, মরবার পর সব অন্ধকার হবে তোর। হাঁ করে গিলবে।" তাই বিশ্বাস করি আমি। তা এসব বিশ্বাসের কথা নয়। পণ্ডিতেরা বলে সব মিথ্যে। যা ভাল লাগে কর। তোমাকে আমার ভাল লেগেছে, তোমার মনের পথ তো করে দেবার সাধ্যি নেই। তবে সংসারের রুজি-রোজগারের পথে যা পারি করে দি।

তা করে দিয়েছিলেন খাঁদুবাবু।

লোহাওলা—হার্ডওয়ার মার্চেন্ট সাধনবাবু সত্যই মস্ত লোক। বিলেত থেকে মাল এনে কারবার করে। সালকেতে নিজের একটা কারখানা আছে। কারবার লক্ষ লক্ষ টাকার। তিন পুরুষের কারবারী। বাস মফঃস্বলে, জমিদারিও আছে। হুঁশিয়ার লোক। আর নারী নিয়ে নেশা—এও দু পুরুষের। সিধুবাবুর একটা রোগ ধরেছিল, দেশ থেকে নারী সংগ্রহ করে কলকাতায় এনে রেখে তাকে কিছুদিন ভোগ করে আবার নতুন পেলেই তাকে ছেড়ে দিত। সে কাঁদত কিছুদিন, তারপর পড়ে যেত আর কারও চোখে। নারীদেহ নিয়ে ব্যবসায়ের পথ যতদিন খোলা ততদিন রূপ আর যৌবনের মূলধনটুকু থাকা পর্যন্ত দেউলে বড় কেউ হয় না। তখন দেউলে হওয়ার পথ একমাত্র ভালবাসার পথ।

খাঁদুবাবু বলতেন—তা বাবা অডিটারের মত থাকে, হিসেব রাখে বাড়ির বাড়িউলী। সে হুঁশিয়ার করে, শাসন করে।

যাই হোক, এই পথেই সাধনবাবু বিপদে পড়ল এক বাড়িউলীর পাকে। বাড়িউলী একটা মেয়েকে পরামর্শ দিয়ে দিলে উকিলের চিঠি। দাবি অনেক। তখন সাধন এসে পড়েছিল খাঁদুবাবুর কাছে। একবার নয় বার বার, এবার নিয়ে তিনবার। এবারের মেয়েটা ওর বাড়ির

সামনে গিয়ে বসে থাকে। চিঠি দেয়। আর একই বাড়িতে যে একটা নতুন মেয়ের ঘরে সাধনবাবু যায়, সেখানে গিয়ে তুল-তামাল করে। দেহব্যবসায়ের বাজারেও নিয়ম আছে। সেখানে নাকি এক ঘরে বার-কয়েক গেলে অন্য ঘরে যাওয়া নিষিদ্ধ। সাধনবাবু আবার এসেছে খাঁদুবাবুর কাছে।

খাঁদুবাবু সঙ্গে সঙ্গে সাধনবাবুকে ডেকে বলে দিলে—একে আপনার হাতে দিলাম। এর উপকার করলে আমার উপকার করা হবে বাবু। লোহার বাজারে ব্যবসা করবে, আপনি একটু নজর রাখবেন। আর সাহস আছে, শক্তি আছে—আপনার সহায় হবে।

সাধনবাবু বললে—এর আর কথা কী! কাল থেকে আপিসে আসবেন আপনি।

সুদর্শনের কথা

ওই খাঁদুবাবু আমাকে স্নেহের বশে ভালবেসে সাধনবাবুর পৃষ্ঠপোষকতা জুটিয়ে দিলেন। এই প্রথম ঘটনা শিবনাথ। আমাদের দেশের ধনী লোক আর ধন-সঞ্চয়ের পন্থা—সমস্তটার নগ্ন রূপ আমি দেখতে পেলাম। তারই সঙ্গে প্রকট হয়ে উঠল এদের স্বরূপ। এমন কুৎসিত রূপ আমি আর দেখি নি। সাধনবাবু, ওই সোনার রাধা-চোরটা যাদের বাড়ি পুরুত ছিল, তাদের প্রকৃতির লোক। ওর বাড়িতে ঠাকুর আছে পিতৃপুরুষের—তাদের সেবা ভার মনে করে, সাহেব-সুবোর পায়ে তেল দেয়, ঠাকুর-পার্বণের খরচ কমিয়ে বড়দিনে সাহেবদের ডালির বরাদ্দের টাকা বাড়ায়, বাগান-বাড়ি যায়, বিবাহ করে মন্ত্র পড়ে, ভগবানের নাম নিয়ে ব্যভিচার করে, ভগবানকে মানে না বলে আধুনিকত্ব জাহির করে, বিপদে পড়ে কালীঘাটে পুজো দেয়, আইনকে মানে না—ভয় করে, আইনের ফাঁকে পরস্পরকে ফাঁকি দেয়; তবে একটা জিনিস জানে; সেটা হল—কেমন করে জোট বেঁধে জিনিসের দর বাড়িয়ে সাধারণ মানুষকে শোষণ করতে হয়। জগৎ এবং জীবন সম্পর্কে কোন সন্ধানই নেই, কোন কৌতূহলই নেই। যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ। হেসে নাও দুদিন বই তো নয়—এই হল জীবনমন্ত্র। বুদ্ধিমান জন্তুর জীবন।

একবার গঙ্গার ঘাটে এক ধনীপুত্রের পিতার শবদাহ দেখেছিলাম। খাটে চড়িয়ে গরমের দিনে বুড়োর শব ঢাকা দিয়ে বহু লোক ও নামসংকীর্তনের দল নিয়ে এসে প্রচুর মদ্যপান করে, পিতার মুখাগ্নি করে, স্নানান্তে আয়না সামনে রেখে কেশ-প্রসাধন করতে করতে বিলাপ করছিলেন—"বাবা আমার বলে গেছে, ওরে, তোর টেরি-না-কাটা চেহারা দেখলে আমার প্রেতাত্মা অশান্ত অস্থির হবে, তুই টেরি কাটিস, আর মাথা কামাস নে।" এরা তাই। এরা সেই ঈশ্বর-পিতার মৃতদেহ আগলে ধরে বলছে—বাবা মরেছে! আবার কী? বাবা বড় লোক ছিল হে। তবে মরেছে ভাল হয়েছে। কারণ মরাই তার উচিত ছিল। এবং মরেছে সে অনেকদিন। শিবনাথ, সকলে অবশ্য তা নয়; হিমালয়ে, নেই যে ঈশ্বর—তাঁর সন্ধানী পরম পবিত্র মানুষ আমি দেখে এসেছি, সংসারেও দেখেছি। আছে, সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচুর আছে। গৃহস্থ কৃষক বাউল ভিক্ষুক, এদের মধ্যে অনেক আছে। কিন্তু এরা, এই বাবুরা তাই। হাজারে নশো নিরেনব্বুই তাই।

আমি ঈশ্বর মানি না, সুতরাং কোন নীতি-ন্যায়, যা মানুষ গড়েছে, তা তখন আমি মানি

না। কিন্তু এই না-মানা আমার একটা সন্ধান। এর মধ্যে আমার আমি সব চেয়ে বড়। তাকে কারুর কাছে খাটো ছোট করতে পারি না। আমার কথা তুমি বুঝতে পেরেছ শিবনাথ? আমি বলছি, এই কিছু না-মানা, কাউকে না মানার মধ্যে আমার একটা আকূতি আছে, যন্ত্রণা আছে; এদের তার এক বিন্দু নেই।

আমার কাছে স্বার্থ শব্দের অর্থ বড় পবিত্র। এর অর্থ, আমার স্বকীয় অর্থ, আমার ব্যাখ্যা অর্থাৎ আমার অস্তিবোধ—অস্তিত্ব, আমার চৈতন্যের প্রতিষ্ঠা। আর এদের স্বার্থ শব্দের অর্থ, যে-কোন উপায়ে সঞ্চয়, ওই সঞ্চয়েই ওদের অস্তিত্ব নির্ভর করে। এদের জৈব চেতনা আছে, আর কিছুই নেই। তাই এরা মুহূর্তে উদ্ধত, মুহূর্তে পদানত, স্তাবক।

এদের সঙ্গে কি আমার বনে? তাই বনে নি।

সে ঘটনা পরে। তার আগে—ঠিক তার একদিন পর, একটা ঘটনা সন্ধ্যাবেলা ঘটল। আগেরটা আগে বলি। সেদিন খাঁদুবাবুর কাছ থেকে ফিরে আর বিপ্রপদর ওখানে যাই নি। নীলাকে আর পাব না—এ কথায় বুকের মধ্যে আগুন জলেছিল, কি বুক ফেটে বেদনার জলধারা উৎসারিত হয়েছিল জানি না। তবে জল হলে তা লবণাক্ত এবং উত্তপ্ত। সারারাত ঘুমোই নি। কী করে যে আমার ঈশ্বরবিশ্বাস আর নীল এক হয়ে গিয়েছিল, তা বলতে পারব না। সে এক মহা যন্ত্রণা। তার মৃতদেহটা পেলে যে খুশী হই; এবং তা পেতে চাই কোন অহিন্দু বস্তির দেহ-ব্যবসায়ের কুৎসিত হাটে।

পরের দিন সকালে মাথা ভার হয়ে ছিল, বসে ছিলাম; নিজেই চা করে খেয়েছি। হঠাৎ দরজায় কড়া নড়ল।

ঠিকে-ঝিটা দরজা খুলে দিল। কয়েক মুহূর্ত পরেই আমার ঘরের দরজায় হাসিমুখে দাঁড়াল শান্তি।

শিবনাথ, আমি মিথ্যাবাদী নই। মিথ্যা বললে পাপ হয় বলে নয়, বলতে আমার অহঙ্কারে বাধে। আমি বিরক্ত হয়েছিলাম মনে মনে। অবশ্য ক্ষণেকের জন্যে। কিন্তু পরম স্নেহভরে সে বললে—তুমি এমনি ভাবে আমাকে পর ভাব?

ম্লান হেসে বললাম, কেন?

—কেন? কাল তুমি আমার ওখানে গেলে না কেন? আমি ভেবেছিলাম তুমি বড়-লোকের সঙ্গ পেয়েছ তাই বোধ হয় তার সঙ্গে চলে গেছ। আমাদের ভুলে গেছ এক মুহূর্তে। আজ সকালে তবু থাকতে পারলাম না। এসে দেখছি, তুমি সাধনবাবুর সঙ্গে যাও নি, নলিনীর জন্যে কেঁদেছ। চোখ মুখ বলছে তোমার। 'না' বোল না। সারারাত ঘুমোও নি বোধ হয়, না?

সংসারে ঈশ্বর নেই—না থাকুন; ধর্ম মিথ্যে—হোক মিথ্যে; কিন্তু হৃদয়কে অস্বীকার করা যায় না। বুদ্ধিমানের কাছে হৃদয়-ধর্ম-মমতা-স্নেহ যতই নির্বুদ্ধিতা হোক, যতই হাস্যকর ব্যঙ্গের বিষয় হোক, যতই পশুজীবনের জের অঙ্কের হিসাবে প্রমাণিত হোক, ওর প্রভাব কিন্তু রাসায়নিক ক্রিয়ার মত অমোঘ। বুদ্ধি দিয়ে যতই ওকে ব্যারাজ-বাঁধা নদীর মত বেঁধে রাখ, আকাশে অবোধ প্রকৃতি যেদিন মেঘ হয়ে প্রবল বর্ষণ ঢালবে, সেদিন তার লক-গেট দুটো-চারটে ভাঙবেই, অথবা ব্যারাজ ছাপিয়ে সে জলপ্রপাতের বেগে নিজের গতিপথে ছুটবে। এই বিরাট সৃষ্টিতে মানুষের জীবনে পরম দুঃখে, পরম সুখে কাঁদতে পারাটাই তার বড় প্রমাণ। নাস্তিবাদী পণ্ডিতেরা, বুদ্ধিবাদীরা, একালের সভ্যজনেরা কান্নাকে বলেন দুর্বলতা। আমিও নতুন জীবনে কাঁদতে চাই নি। কান্না এলে নিজেকে ধমকেছি। তোমার কাছে প্রকাশ করে বলি,

রবীন্দ্রনাথের একখানি গান শুনে একদিন মনে মনে ব্যঙ্গ করেছি :

"এতদিনে জানলেম, যে কাঁদন কাঁদলেম, সে কাহার জন্য।
ধন্য এ জাগরণ, ধন্য এ ক্রন্দন, ধন্য রে ধন্য।"

যাক গে। গোড়ায় বলেছি, আবার বলি—আয়ু স্বল্প, বিঘ্নও অনেক। আমার সেলের সামনে সেন্ট্রিটা মাঝে মাঝে বিঘ্ন-সৃষ্টি করছে। মধ্যে মধ্যে কথা বলতে চেষ্টা করছে। আমার উপর কী জানি কেন একটা ভক্তি হয়েছে ওর। বোধ করি শুনেছে আমি একসময় সন্ন্যাসী হয়েছিলাম। দাঙ্গার মধ্যে আমার কীর্তিকলাপ শুনেছে। মধ্যে মধ্যে জেল-সুপার আসেন। গল্প করে জানতে চান আমার কথা। দুটো টিকটিকি আছে, তারা খেলা করতে করতে, মারামারি করতে করতে কখনও ছাদ থেকে মাটির উপর পড়ে থপ করে। কখনও আমার অত্যন্ত কাছে এসে কালো পুঁতির মত চোখ দুটো মেলে চেয়ে থাকে। কখনও কখনও আসে দু-একটা চড়াইপাখি। তাদের সঙ্গেও ভাব হয়েছে আমার। মধ্যে মধ্যে ভেসে আসে কয়েদীদের কোলাহল। বিঘ্ন অনেক। মন তখন ছুটে যায়। মধ্যে মধ্যে আকাশের টুকরোর দিকে চেয়ে ভাবি, আমার মত কত মানুষের আত্মার এই মর্মান্তিক যন্ত্রণা ওই আকাশের নীলে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। রেডিয়োর মত কোন যন্ত্র একদিন আবিষ্কৃত হবে, তার মাধ্যমে মানুষ শুনবে সেই যন্ত্রণার মর্মবাণী। জীবনের মানে কী? হে দুর্জ্ঞেয়, নিজেকে জ্ঞাত কর। হে অদৃশ্য, নিজেকে প্রকট কর। তার মধ্যে বুদ্ধের বাণীও ধ্বনিত হবে, ক্রাইস্টের কথা শুনতে পাবে মানুষ, মহম্মদের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হবে; কিন্তু তার সব ডুবে যাবে এই আত্মার কাতর প্রশ্নের মধ্যে। কারণ তাঁদের শোনা কথায় আমার আত্মা তাকে দেখে তাকে অন্তরে বা বাহুবন্ধনে পেয়ে জ্ঞাত হবার তৃপ্তি তো পায় না। তাই তাঁদের বাণী আছে—সে শুনেও মানুষ কাঁদে। বলে, জ্ঞাত কর।

যাক গে। থাক্ ওসব কথা—'আয়ু স্বল্প। সময় নাহি রে।' কথা কটাই বলে নিই। সেদিন ওই কথা কটি বলতে বলতে শান্তির চোখ ফেটে জল বেরিয়েছিল। ওই ক-ফোঁটা চোখের জলের কথা মনে হয়ে আত্মসংবরণ করতে পারলাম না। এত কথা লিখে ফেললাম। লিখে ফেলেছি, সময় গেছে, কাগজ গেছে, কালি গেছে, তাকে আর কাটলাম না। থাক্ পড়ো। পড়ে হেসো। যদি কাঁদ, তবে আমি কিছু বলব না, কিন্তু লোকে হাসবে। বিংশ শতাব্দী হাসির যুগ, কান্নার নয়। পণ্ডিতেরা বুদ্ধিমানেরা কঠিনতম দুর্ঘটনাতেও রসিকতা করতে চান, হেসে উড়িয়ে দিতে চান।' অবশ্য যুক্তি অকাট্য—কান্নায় তো দুঃখভোগ, আত্মনির্যাতন। যা হয়েছে, তা তো ফিরবে না। আত্মনির্যাতনে, দুঃখভোগে কী লাভ? তবে হ্যাঁ, চোখের জল ফেললে যদি সম্মুখের কঠিন পথ নরম হয় তো চোখের জল ফেল। প্রচুর করে ফেল—জনসাধারণকে ডেকে তাদের সামনে।

তবে এতই যখন বললাম তখন আর দুটো বাজে কথা বলে নিই। হ্যাঁ, জীবনে দুটি লোকের কান্না অর্থাৎ চোখের জল চোখে দেখেছি। মনে হয়েছে, এ চোখের জল যদি ধরে রাখত কোন ব্রহ্মা কমণ্ডলুতে, তবে নূতন গঙ্গার সৃষ্টি হত। প্রথম—তখন আমি সন্ন্যাসী, ফিরছি পুরী থেকে খড়্গপুরে। এসে শুনলাম, হিজলী বন্দীশালায় গুলি চলেছে। মারা গেছেন দুজন কর্মী, সন্তোষ আর তারকেশ্বর। কলকাতা থেকে নেতারা এসেছেন, শবদেহ নিয়ে যাচ্ছেন কলকাতা। নেমে পড়েছিলাম দেখবার জন্য। দেখেছিলাম, একখানা ওয়াগনে মৃতদেহ দুটির পাশে উপবিষ্ট সুভাষচন্দ্রকে। সে এক আশ্চর্য মূর্তি। বিষণ্ণ উদাসীন—যেন বর্ষার মেঘমেদুর আকাশ, তারই মধ্যে মাঝে মাঝে চোখের দৃষ্টিতে বজ্রগর্ভ বিদ্যুচ্চমক। চোখে জল দেখেছিলাম। দুটি ধারা, বোধ করি নারদসঙ্গীতবিগলিত বিষ্ণুর স্বেদবিন্দুর মত, আপনা-আপনি বেরিয়ে এসেছিল।

আর দেখেছিলাম দাঙ্গার সময়। তখন আমি বিংশ শতাব্দীর ভয়ঙ্কর মানুষ; নিজে কাঁদি নে, কাঁদতে দেখলে অবজ্ঞা হয়; ব্যঙ্গ আমি করি নে, ওটা আমার স্বভাব নয়। তখন দেখে-ছিলাম আগুনের চোখে জল। দাঙ্গা নিবারণ করতে গিয়ে শচীন মিত্তির, স্মৃতীশবাবু, সুশীলবাবু তিনজন যেদিন ছুরে খেয়ে মারা গেছেন—সেদিন বেলেঘাটায় এক অতর্কিত মুহূর্তে আকস্মিক ভাবে দেখেছিলাম গান্ধীজীর চোখে দু ফোঁটা জল। আমি কঠিন বিরূপতা নিয়ে শান্তিবাদী গান্ধীজীকে দেখতে গিয়েছিলাম। বিতৃষ্ণার সঙ্গে দেখছিলাম। হঠাৎ ওই দু ফোঁটা জল আমার দৃষ্টিতে যেন সমুদ্র হয়ে উঠল। এই দুজনের চোখের জল দেখে বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয়েছি; এ আমার অক্ষয় স্মৃতি। আর একজনের অশ্রুর কথা কল্পনা করতে পারি। রবীন্দ্রনাথের। তাঁর গান শুনে যে, অবাধ্য অশ্রু আমার মত পাথরের চোখ ফাটিয়ে বেরিয়ে আসে। তা হলে একান্ত নিরালায় তিনি কি কাঁদেন নি? রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি। দূর থেকেই। তাঁর চোখে অশ্রু আমি কল্পনা করতে পারি। করতে গেলেই কী জানি কেন নীলকে মনে পড়ে যেত। আমি পাগলের মতই স্পষ্ট সোচ্চারে 'দূর দূর' করে উঠতাম। অথবা 'আঃ!' বলে উঠতাম।

যাক। ঘটনার কথা বলি।

সেদিন শান্তির চোখে ওই কয়েকটি ফোঁটা জল দেখে সেই মুহূর্তে আমি বিগলিত হয়ে গিয়েছিলাম। সেই মুহূর্তে নির্বোধের মত হয়তো কারও চোখ থেকে এমনি কয়েক ফোঁটা চোখের জলের গোপন কামনা আমার অন্তরে ছিল।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেছিলাম, দুঃখ যে একান্তভাবে আমার। তোমার সুখের ঘরে আমার দুঃখ নিয়ে যেতে মন চায় নি। শান্তি খানিকটা হেসেছিল। খিলখিল হাসি নয়; এ হাসি সেই হাসি, যে হাসি দেখলে যে দেখে তার অন্তরটা কেঁদে ওঠে।

আমি বলেছিলাম, না না। আমি তোমাকে পর ভাবি নে শান্তি। তবু সে আমার বড় নিজস্ব।

সে বলেছিল—হয়েছে। এখন ওঠ।

—কোথায়?

—আমার ওখানে। খাওয়া-দাওয়া ওখানেই করবে। ওখানেই দু-চার দিন থাকবে। এখানে কোথায় কী হচ্ছে জানি নে। তবে আজ তোমায় ছেড়ে যাব না। ওঠ।

উঠেছিলাম। সে বলেছিল—এসব একটু সামলে রেখে চল। সব যে আলগা পড়ে রইল।

বলেছিলাম, কী আর আছে? কিছু নেই।

একটা ব্যাগে সামান্য কাপড়-জামা নিয়ে বেরিয়েছিলাম, তার সঙ্গে ব্যাঙ্কের চেক-বইটা।

পথে বিবরণ শুনেছিলাম। গতকাল বিপ্রপদ গিয়েছিল খাঁদুবাবুর কাছে। খাঁদুবাবু তখন মৌজে ছিলেন, মদ খাচ্ছিলেন। বিপ্রপদকে বসিয়ে মদের প্রসাদ দিয়ে সব বিবরণই বলে-ছিলেন। বলেছিলেন—ভাল ছোকরা, ভাল লেগেছে আমার। উসকো হম রাজা বনা দেগা।

বিপ্রপদ মাতাল হয়ে ঘরে ফিরে বলেছিল—ছোড় দেও বাবা, সুদর্শনধারী মহারাজ কো বাত ছোড়ো মেরে ময়না, উ রাজা বন্ গিয়া। উ আর নেহি আয়েগা হামলোককা বাড়িমে। কাহে আয়েগা? খাঁদুবাবুকে নজরমে আ গেয়া, ভাগ্যি খুল গেয়া। শালা—বদমাশ—বেইমান!

শান্তি হেসে বলেছিল—আমার সুখের সংসার বলেছিলে ? এই আমার সুখের নমুনা। মদ খেয়ে মধ্যে মধ্যে যা করে! বলতে বলতেই খিলখিল করে হেসে উঠল আবার। এ সেই আদি অকৃত্রিম শান্তি। হেসে বললে—আবার এক-একদিন মাতাল হয়ে পায়ে ধরে—চণ্ডীদাস হয়ে ওঠে। বাপ রে বাপ!

শান্তির ওখানে খেয়েই সকাল সকাল সেদিন সেই সাধনবাবুর আপিসে গিয়েছিলাম। আপিসে সাধনবাবু আর এক মানুষ। কর্মচারীরা বলত, বাঘ। কিন্তু বাঘের সামনে আমার ভয় ছিল না। ভয় আমার নিজেরই ছিল না, তার উপর খাঁদুবাবুর লোক আমি। সাধনবাবু সেই দিনই আমার পৃষ্ঠপোষকতার নজির দেখাতে—একটা কারবারে দালাল হিসাবে আমাকে পাঁচশো টাকা পাইয়ে দিয়েছিলেন। টাকাটা পকেটে নিয়ে সন্ধ্যায় বাড়ি না ফিরে ফিরেছিলাম শান্তিদের ওখানে। মনের অবস্থা বিচিত্র। টাকা পেয়ে মনটা খুশীও বটে, আবার তিক্তও বটে। অবশ্য সাধনবাবু আমার সঙ্গে ঠিক অনুগৃহীতের মত ব্যবহার করেন নি, তবুও একটু তিক্ততা অনুভব করেছিলাম বইকি।

সাধনবাবুই আমাকে তাঁর গাড়িতে বিডন স্ট্রীটে নামিয়ে দিয়েছিলেন। গাড়িতে সাধনবাবু অন্য মানুষ। লীলার বাড়ি যাচ্ছেন। নতুন বাসার ব্যবস্থা হয়ে গেছে, চিত্ত তাঁর উৎফুল্লের উপর আরও কিছু—একেবারে উচ্ছ্বসিত। আমি জানি সব, সুতরাং আমার কাছে লীলার হাজার গুণ বর্ণনা করেও তৃপ্ত হচ্ছিলেন না। ক্ষণে ক্ষণে হাসিতে ফেটে পড়ছিলেন। বিডন স্ট্রীটে নামিয়ে দিয়ে হাত নেড়ে 'বাই বাই' করে চলে গেলেন। বিপ্রপদর দোকানে দেখলাম, সে নেই। সব থেকে বিচিত্র লাগল খদ্দেরদের মধ্যে এক মাড়োয়ারীকে দেখে। শুনলাম সে বাসায় গেছে।

বাসার দরজায় এসে থমকে দাঁড়ালাম। দরজাটা খোলা অবস্থায় ভেজানো। বাড়ির ভেতর শান্তির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। উত্তপ্ত কণ্ঠস্বর।

—না, দেব না। কিছুতেই দেব না। দোকানের টাকা ভেঙে তুমি বেশ্যাবাড়ি যাবে, মদ খাবে, আর দোকানের দেনার জন্য আমি গয়না দেব ?

বিপ্রপদ চাপা গলায় চিৎকার করে উঠল—আর তুই যে একেবারে সেজেগুজে কেলাস করতে গিয়ে নানান বন্ধুদের সাথে পিরিত করে আসিস ? এবার আবার বাড়িতে আরম্ভ করেছিস ওই সুদর্শনকে নিয়ে! আমি কিছু বুঝি না মনে করছিস ? তুই নিজে বলিস নি আমাকে—সুদর্শন তোকে জাপটে ধরে চুমু খেয়েছিল ? বলিস নি ? পুরনো পিরিত উথলে উঠছে! ওঃ! শোন্, ওর সঙ্গে যা করবি তুই কর্, ওর টাকা আছে, ওর কাছে হাজার টাকা নিয়ে আমাকে দে। মাড়োয়ারী এসে বসে আছে, নালিশ করেছে। নয় তোর গয়না দে। আমার সাফ কথা। নইলে তোকে আমি গুণ্ডার হাতে বেচব।

তারপর বিপ্রপদর সে কী কুৎসিত অশ্লীল কথা!

আমার মাথায় আগুন জ্বলে গেল। আমি দরজা ঠেলে বাড়িতে ঢুকে সন্তর্পণে দরজার খিল বন্ধ করে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। বিপ্রপদ একবার চমকে উঠেই বলে উঠল—এই যে নাগর এসেছেন!

মুহূর্তে আমি তার ঘাড় চেপে ধরে উঁচু করে তুলে মাটিতে আছড়ে ফেলে দিলাম।

চিৎকার করতে যাচ্ছিল, আমি এগিয়ে যেতেই চুপ করলে। তার দাঁত ভাঙার কথা সে ভোলে নি। তার উপর আমার স্বাস্থ্যেই আমার শক্তির পরিচয় ছিল। সে পরিচয় বোধ করি সেই মুহূর্তে নগ্ন ও নিষ্ঠুর ভাবে ফুটে উঠেছিল আমার চোখে। আমার পকেট থেকে পাঁচশো

টাকা তার'দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বললাম, এই পাঁচশো আজ নিয়ে যা। কাল পাঁচশো পাবি।

শান্তিকে কাছে টেনে নিয়ে বললাম, ওকে আমি নিয়ে নিলাম, ওর সঙ্গে তোর কোন সম্বন্ধ রইল না। তুই তো ওকে বেচতে চাচ্ছিলি! আমি কিনলাম।

শান্তি দুই হাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

বিপ্রপদ মার-খাওয়া কুকুরের মত বেরিয়ে গেল।

সে রাত্রির মধ্যে ফিরল না।

আমি সে রাত্রে মদ খেয়েছিলাম। মদ ছাড়া চিত্ত আর সেই উন্মত্ততায় উন্মত্ত হচ্ছিল না, যে উন্মত্ততায় বাহির ভিতর সকল জগতের সব কিছুকে তুচ্ছ করা যায়, ফুৎকারে উড়িয়ে দেওয়া যায়। মদ বিপ্রপদর ঘরেই ছিল। বের করে দিয়েছিল শান্তি। মদ খেয়ে আমি খুশী হয়েছিলাম। এর আগে এক তান্ত্রিকের কাছে তন্ত্রসাধনায় মদ খেয়েছি। তারপর তন্ত্রের সঙ্গে মদও ছেড়েছিলাম। নতুন নাস্তিকতাবাদের জীবনে মদ খেতে চাচ্ছিলাম; কারণ ওটা একটা নাস্তিবাদের অঙ্গ। তোমার শরীরে না কুলোয় তুমি খাবে না। অন্যথায়—যে নাস্তিক্যবাদী সে সংস্কার দিয়ে তৈরী করা মরালিটির প্রতিবাদের জন্যও মদ খাবে।

মদ খেয়ে খুশী হলাম।

ওঃ, সে কী রাত্রি!

সে এক উন্মত্ত রাত্রি শিবনাথ!

পরদিন প্রভাতটা ছিল আশ্চর্যক্রমে মেঘাচ্ছন্ন, ম্লান। আমার মনে তারই ছায়া পড়েছিল, অথবা আমার মনের ছায়া মেঘাচ্ছন্ন প্রভাতটি ম্লান করে আমার সামনে প্রতিভাত হচ্ছিল, তা জানি নে। শান্তি তখনও আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছে। আমার মাথায় একটা যন্ত্রণা হচ্ছিল। রাত্রে মদ্যপানের প্রতিক্রিয়া।

তখন ফাগুনের শেষ। শীতটা যেতে যেতে বর্ষণকে আশ্রয় করে অকস্মাৎ গাঢ় হয়ে উঠেছে। আমি ঘুমন্ত শান্তির দিকে চেয়ে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। তারপর মনে হল, এ কী করলাম? মনে পড়ে গেল আর একদিন ঘুমন্ত শান্তির অর্ধ-অনাবৃত দেহ দেখেছিলাম। এরই মধ্যে শান্তি জেগে উঠেছিল। সে চোখ মেলে, আমার দিকে তাকিয়ে দু হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরে বলেছিল—বড় শীত। আর একটু শুয়ে থাক। এত সকালে উঠে করবে কী!

মাথার যন্ত্রণার উপর মনে সেই তিক্ত 'কী করলাম'-এর সুরের মধ্যে শান্তির প্রেমের সুর ভাল লাগে নি। বলেছিলাম, না।

সে তবু আবদার করে বলেছিল—জান, কাল রাত্রি আমার জীবনের কামনা পূর্ণ হওয়ার রাত্রি। সেই—সেই দিন থেকে মনে মনে তোমাকেই কামনা করে এসেছি। ওই ইতরটার সঙ্গে জীবন জড়িয়ে, ভেবেছিলাম জুড়োবে। জুড়োনো দূরের কথা দ্বিগুণ হয়ে জ্বলছে।

বলেছিলাম, না। মাথা ধরেছে।

সে হেসেছিল। বলেছিল—ধরবে না? কাল মদ কতটা খেয়েছ তার ঠিক আছে? সে যে একেবারে ঢকঢক করে। বলেই সে উঠে পড়েছিল। বুকের আঁচলটাও তোলে নি মাটি থেকে, আঁচলখানা টানতে টানতেই গিয়ে একটা অ্যাসপিরিনের বড়ি আর মদের বোতলটা এনে বলেছিল—ওইটুকু দিয়ে বড়িটা খেয়ে নাও।

আগে মদ খাই নি তা তো নয়, খেয়েছি; এক তান্ত্রিক সাধুর সঙ্গ করেছি ছ মাসের উপর;

কামাখ্যার পাহাড়ে। তখনও মাথা ধরেছে, তখন আরও খানিকটা খেয়ে মাথার যন্ত্রণার উপশমের পন্থা সাধুই বলে দিয়েছেন। এবার তার সঙ্গে অ্যাসপিরিন।

দেহ মন দুই অসাড় হয়ে গেল অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে। সুস্থ হয়ে উঠলাম। স্নান করে সাধনবাবুর আপিসে গেলাম; যেতে খানিকটা দেরি হয়ে গেল। গিয়ে সাধনবাবুর আপিসে ঢুকে সেদিন অবাক হয়ে গেলাম। ডেটিন্যু ধীরেনবাবু বসে আছেন সাধনবাবুর সামনের চেয়ারে। চুলে অল্প পাক ধরেছে। সাধনবাবু তাঁর রূপোর সিগারেট কেসটা খুলে ধরে আছেন। ধীরেনবাবু একটা কর্ক-টিপ্‌ড্‌ সিগারেট ধরে তুললেন।

সাধনবাবু বললেন—পাঁচ মিনিট বাইরে ওদিকে বরং সেল্‌স্‌ ডিপার্টমেণ্টে বসুন। এঁর সঙ্গে কথাটা সেরে নিই।

কিন্তু ধীরেনবাবুই বললেন—না, না। তুমি বোস। তুমি তো সুদর্শন?

বললাম, হ্যাঁ।

—শান্তির কাছে তোমার কথা শুনেছি বলেই চট্ করে চিনতে পারলাম। আরে, তুমি নাকি ঈশ্বর-দর্শনে ব্যর্থ হয়ে, গেরুয়ায় আগুন ধরিয়ে ছাই করে ফিরে এসেছ? আজকাল মহা-বিদ্রোহী তুমি? গুড। গুড। বোস। হা-হা করে হেসে নিলেন খানিকটা; তারপর বললেন—কিন্তু এখানে কী ব্যাপার?

—উনি হার্ডওয়্যারের দালালিতে নেমেছেন।

—ভেরি গুড! তা আমার ওখানে এস না। শান্তিকে বললেই নিয়ে আসবে।

এতক্ষণে সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিলাম, চেষ্টা করব। সেই মুহূর্তেই ক্যাশিয়ার ঘরে ঢুকেছিল, সাধনবাবু বলেছিলেন—বাইরে চলুন। আমি যাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে ধীরেনবাবুও উঠে গিয়েছিলেন। মিনিট দুয়েক পরেই সাধনবাবুই ফিরে এসে বলেছিলেন—এই হয়েছে এক নতুন উপদ্রব।

আমি কোন মন্তব্য করি নি। ওই লোকটিকে দেখে আমি প্রসন্ন হই নি। পাঁচ-ছ বছর আগের সেই স্মৃতি, সে আমার মুছে যায় নি। ঈশ্বর নেই—এই নাস্তিবাদের পথে চলতে শুরু করেও মনে হয় নি, ও আমাকে পথ দেখাতে পারে। কারণ ওর সকল উক্তির মধ্যে আমি চিরন্তন উচ্ছিষ্টের গন্ধ অনুভব করেছি। পুরোহিত পূজক যখন ঈশ্বরের কথা বলে তখন তার মধ্যে যেমন প্রচ্ছন্ন থাকে এই কথা যে, ঈশ্বরকে যা দিয়ে পূজা করবে সব প্রাপ্য ওর এবং তারও উপরে প্রাপ্য যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্য, ঠিক তেমনি ধীরেনবাবুরা যখন নাস্তিক্যবাদী জগতে পথ দেখাতে চায় তখন তার মধ্যে দাবি থাকে দাসখতের।

সাধনবাবু চেয়ারে বসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—চেনেন নাকি ওঁকে?

—চিনি। আমাদের গ্রামে ডেটিন্যু ছিলেন।

—হুঁ। ছাড়া পেয়ে এবার শ্রমিক সংগঠন করছেন। আমার একটা কারখানা আছে সালকেতে—সালকে ওঁর এরিয়া। মাসে পঁচিশ টাকা প্রণামী নিয়ে থাকেন; এবার তিরিশে উঠল। গত মাসে খুব হাঙ্গামা লাগিয়েছিলেন। আবার উনিই মেটালেন। তার দরুণ পঞ্চমুদ্রা অধিক লাগবে এ মাস থেকে।

এসব খবর আমি জানতাম না তা নয়। আমি পড়াশুনা করার সময় শুধু ধর্মশাস্ত্রই পড়ি নি—হরিদ্বারে, কনখলে; এসব বইও কিছু পড়েছি। সে যুগের আলোড়ন-আনা বই হিটলারের 'মেইন ক্যাম্প'খানাও পড়েছি। রামকৃষ্ণ মিশনের এক তরুণ সন্ন্যাসীর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পড়েছিলাম। বার তিনেক ঘুরিয়ে পড়েছি। গোড়ার পাতার প্রশংসাপত্র থেকে শেষের

ইনডেক্স পর্যন্ত। একটা প্রশংসপাত্র মনে আছে—"The whole of the political Hitler is in these brutally candid pages." কথাটা সত্য। শুধু 'মেইন ক্যাম্প'ই নয়, রুশ বিপ্লবের ইতিহাস পড়েছি; অনেক কাহিনীও শুনেছি অনেক শিক্ষিত সন্ন্যাসীর কাছে। দেশে শ্রমিক-কৃষক-আন্দোলনের কথাও কাগজে পড়ি। তখন জনকয়েক সন্ন্যাসী শ্রমিক ও কৃষক নেতা ছিলেন—তাঁদের দু-একজনকেও দেখেছি। কারুর নিন্দা আমি করি না, কিন্তু ও সবই রাজনৈতিক শক্তি নিয়ে কাড়াকাড়ি। ও তো বিংশ শতাব্দীতে মৃত ঈশ্বরের অধিকারের সিংহাসন নিয়ে কাড়াকাড়ি। কিন্তু একালের চরম প্রশ্নের উত্তর কোথায়?

আবার অকস্মাৎ নূতন করে পুরাতন প্রশ্ন সমস্ত মনকে নাড়া দিয়ে জেগে উঠল। জাগল ওই ধীরেনবাবুকে দেখে।

ধীরেনবাবুও নাস্তিক, আমিও নাস্তিক। আজ তবু ওর সঙ্গে আমি এক নই কেন? ওর সঙ্গে মনের কঠিন বিরোধ কেন? মনই উত্তর দিলে—না, ওর নাস্তিক্যবাদ আর তোমার নাস্তিক্যবাদ এক নয়। ওর নাস্তিক্যবাদ ওর গুরুস্থানীয় দলের নির্দেশে—প্রাচীন সমাজের নির্দেশে যেমন সেকালের লোকের নাস্তিক্যবাদের বিশ্বাস, একালে ধীরেনবাবুর নাস্তিক্যবাদের বিশ্বাস তাই। আমার মনের সেই প্রশ্ন তো নীরব হয় নি। ধীরেনবাবুর 'কিছু নেই' উত্তর শেষ উত্তর। আমার প্রশ্ন—যদি আছে তো সে কী? সে কই? যখন পাই না তখন যদি উত্তর হয়—নেই, অর্থাৎ কিছু নেই, তবে আমি কী—আমি কে—আমি কেন? কোথা থেকে এলাম আমি?

কে আমার পিতা? 'ত্বং পিতা নোঽসি।' সে 'ত্বং' অর্থাৎ তুমি কে? সে নেই তো—ডারুইনের মতানুযায়ী জন্তুর সন্তান আমি? অথবা স্বয়ম্ভূ? জন্তুই হোক আর স্বয়ম্ভুই হোক মানুষ—সেক্ষেত্রে মানুষের সঙ্গে মানুষের ভ্রাতৃত্ব কিসের? এই নতুন কালের জ্ঞাতুম্ ইচ্ছা ধীরেনবাবুদের থাকতেও নেই। কিন্তু আমার আছে। শিবনাথ, আমার মনের অন্তস্তলে আবার জেগে উঠল সেই অতৃপ্ত জিজ্ঞাসু মন। মানুষের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যেও, অনন্ত কাল জিজ্ঞাসা করেই চলেছে, বলে চলেছে—হে অজ্ঞেয়, নিজেকে জ্ঞাত কর। যার আজও কোন সিদ্ধান্ত মনঃপূত হয় নি, সেই অনন্তসন্ধানী মন জাগল ধীরেনবাবুকে দেখে। ওই পিতৃপিতামহের দেবোত্তরের সেবায়েত পাষণ্ড সাধনবাবুর দলে আমি যেমন নই, তেমনি ওই ধীরেনবাবুর দলেও নই। বাঘকে আমি সম্ভ্রম করি, শিবনাথ, কিন্তু দলবদ্ধ নেকড়েকে ঘৃণা করে দূরে থাকি। বাঘ তার ক্ষুধার প্রয়োজনে একটা জন্তু বা জীব মারে। দলবদ্ধ নেকড়ের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য অনেক জন্তুর মাংসের প্রয়োজন হয়। ওরা প্রয়োজন হলে নিজেদেরই মেরে খায়, অন্তত যেগুলো আহত হয় তাদের মাংস ওরা খেয়ে ফেলে। আমি বাঘ হতে রাজী আছি, নেকড়ে হতে নয়।

অস্থির চিত্তে ফিরে এলাম। শান্তিদের বাড়ি থেকে নিজের ছোট ব্যাগটা হাতে নিয়ে চলে এলাম বাগবাজারের বাসায়। শান্তিকে সেদিন ভাল লাগল না। ধীরেনবাবুর সংস্রবের জন্য বোধ হয়। মনে পড়ল নীলকে। মনে হল নীলকে পেলে বোধ হয় শান্ত হতে পারব—উত্তর পাই বা না পাই। আহার-নিদ্রায় রুচি রইল না। বসে ভাবতে শুরু করলাম। রাত্রে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসতাম।

অশান্ত মনে প্রশ্ন ধ্বনিত হত—ওই প্রশ্ন। কে আমি—কেন আমি? কোথা থেকে উদ্ভব আমার? কে আমার পিতা?

উত্তর নাই। উত্তর নাই। উত্তর নাই। তবে একটা সত্য খুঁজে পেলাম। গঙ্গার ধারে বসে যেন শুনতে পেলাম—যে প্রশ্ন সোচ্চারে সবল কণ্ঠে আমার মধ্যে ধ্বনিত হচ্ছে সেই প্রশ্ন

ওই অঞ্চলে সব—সব মানুষের মনে ক্ষীণভাবে ধ্বনিত হচ্ছে। বেশ্যাদের দেখেছি, চোরদের দেখেছি, ভণ্ডদের দেখেছি; ধার্মিক পণ্ডিত যারা সব তত্ত্ব জেনেছে বলে, আস্তিক, নাস্তিক—সবার দেখেছি—ওই এক প্রশ্ন মনের গভীরে ধ্বনিত হচ্ছে।

যারা অসাধারণ ধীরেনবাবুর মত তারা পাথর চাপা দিয়েছে। নিশি চোরের কথা মনে পড়ছে। সে আমার বাড়িতে শেষটায় অনুগতজনের মতই আসা-যাওয়া করত সে কথা লিখেছি আগে। আসত, বসে থাকত, এটা-ওটা করে দিত। আমি ব্যস্ত থাকলেও সে চুপচাপ থাকত। মধ্যে মধ্যে দেখতাম, আপনার মধ্যেই গভীর ভাবে মগ্ন হয়ে আছে। জিজ্ঞাসা করলে লজ্জিত হত, বলত, ভাবি মাশায়, একালে এই সব করছি, পরকালে কী হবে?

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বলেছি—আর করিস নে। ভগবানকে ডেকে প্রায়শ্চিত্ত কর্।

হাতে একটা খড় বা কিছু নিয়ে কাটতে কাটতে বলেছে—আঁধার হলে যে থাকতে পারি না, মাশায়।

বলেছি—সেই সময় ভগবানের নাম করবি। বলবি—রক্ষা কর আমাকে।

সে বলেচে—কোথা, মাশায়? কিছুই হয় না ওতে। নিজের মনই বলে ওঠে, দূর শালা, কোথা পাবি ভগবান? মিছে কথা।

তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করেছে—আচ্ছা বাবু, সত্যি বলেন দিকি, ইসবের মানে কিছু আছে? ইসব সত্যি?

বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম—মিথ্যে মনে হয় তো খুশিমত পাপই করে যা।

সে বললে—তাই বা কি করে হবে, মাশায়? এই দেখেন, কাল আতে (রাতে) এক জায়গায় যাবার শলা ছিল। সকালবেলাতে দলের লোকও এয়েছিল। ঠিক যেন যাই। বুয়েচেন। তা দুপহরেই ভাবলাম মদ কিনে এনে রাখি। সন্জে বেলায় হাঁড়ি দরুনে মদ কিনব, অ্যানেক সাক্ষী থাকবে—সি ভাল হবে না। তা সরকার-দীঘির উপাশে পচাইয়ের দোকান। দীঘির ঘাট বরাবর গিয়েছি, ঘাটে রব উঠল—গেল—গেল—গেল। ছুটে ঘাটে গেলাম, দেখি ঘাটে যারা চান করছিল তারা 'হায় হায়, গেল, গেল' করছে। জন তিনেক জন (জোয়ান) ছেলে মাঝপুকুর পানে সাঁতার দিয়ে চলেছে। আর ঠিক মাঝখানে একটা ছেলে ডুবছে আর ভাসছে। মাশায়, কী হল—পড়লাম ঝাঁপ দিয়ে। মাঝখানে যখন গেলাম তখন আর ভাসছে না, ডুবেছে। যে তিনজন সাঁতার দিয়ে এয়েছিল তারা হাঁপাচ্ছে। দম পাবে কোথা? আমি ডুব দেলাম। এক ডুব দু ডুব তিন ডুবে পেলাম। তোললাম—পিঠে ফেলে চেঁচিয়ে বললাম—ঘড়াটড়া একটা দাও। ঘড়া নিয়ে এল। টেনে এনে পাড়ে তুললাম। পাক কতক ঘুরাতেই জল-বমি করলে—চেতন হল। ওরা নিয়ে গেল ডাক্তারের কাছে। আমি, মাশায়, মদ না কিনে ঘর ফিরে এলাম। আর বেরুতে মন হয় না। আর কী যে আনন্দ, মাশায়। তা হলে? পাপপুণ্যি নাই যদি তবে এমন ক্যানে হয়?

একটু চুপ করে থেকে বলেছিল—আবার ছাখেন, সে অ্যানেক দিন, একটা কুকুর আমার বাড়া ভাত খেয়ে দিয়েছিল। পরিবার ভাত দিয়েছে, আমি গাছ থেকে একটা লঙ্কা তুলেছি—খাব ভাতের সঙ্গে। ব্যাটা কোথায় ছিল এসে হাম হাম করে লেগে গেল খেতে। আমার কোরোধ্ চণ্ডাল জাগল—মেরে দেলাম একটা কাঠের চ্যালা কুড়িয়ে ব্যাটার মাথায়। বার দুই কেঁউ কেঁউ করে মরে গেল কুকুরটা। নাক মুখ দিয়ে ভল ভল করে রক্ত পড়ল। মাশায়, সাত দিন ভাত রোচে নাই। আজও কোথাও কুকুর কেঁউ শব্দ করলে পরানটো ছ্যাঁৎ করে ওঠে। ঘেউ করলে ভয় হয় না, বুয়েচেন।

কী বলব ? চুপ করে শুনছিলাম। নিশির তখনও শেষ হয় নি। সে বললে—আবার আতে (রাতে) যখন চুরি করতে যাই তখন ছামুতে যদি কেউ পড়ে আর পালাতে যদি না পারি তবে সে সময় তো অক্ষে থাকে না। মেরে দি। বুয়েচেন—ধরা পড়ার ভয় ছাড়া তারপর কিছুই মনে থাকে না। বুঝলাম না, মাশায়। তখন, মাশায়, মনে হয় সব মিছে। পাপপুণ্যি মিছে কথা। তখন ভগবান ছামুতে পড়লে তার মাথাতেই লাঠি বসাতে পারি। তাথেই তো জিজ্ঞাসা করলাম আপনাকে। আসল কথাটা কী বলেন দিকি! বুয়েচেন, বাবু, পরানটো মধ্যেমাঝে এমন হাঁকুপাকু করে যে মনে হয় কূলকিনেরা হারিয়ে আঁধারে ডুবে মরে গেলাম।

এমন চোর গুণ্ডা ডাকাত অনেক দেখলাম, শিবনাথ, এ জীবনে, যারা মধ্যে মধ্যে ভাবে কে ঈশ্বর, কোথায় ঈশ্বর, পাপপুণ্য আছে কিনা। শুধু তাই নয়, তারা ভাবে—কেনই বা তারা এল, কোথায় তারা যাবে। তারা প্রশ্ন করে—আকুলভাবে।

এই সময়—অর্থাৎ যখনকার কথা বলছি—যখন আমি কয়েকদিন গঙ্গার ধারে গভীর রাত্রি পর্যন্ত এই ভাবনা ভাবি আর কী ভাবে এর উত্তর পেতে পারি তাই চিন্তা করি—সেই সময় এক দিন রাত্রে বসেছিলাম নিমতলার ঘাটে। তখন রাত্রি দশটা।

হঠাৎ একটি মেয়ে এসে ঢুকল—দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে। তরুণী। বেশে-বাসে সাজসজ্জা ছিল না, তবুও তার মধ্যে দেহব্যবসায়িনীর পরিচয় সুস্পষ্ট। মেয়েটি ঘাটে এসে বসল চুপ করে। আমি একটু দূরে। চমকে উঠলাম। ওই দীর্ঘাঙ্গী আকার আর দেহব্যবসায়িনীর বেশ দেখে চট করে কেমন মনে হয়ে গেল—এ তো সেই। নীল! মুহূর্তে উত্তেজনা দেহে বয়ে গেল ইলেকট্রিক কারেন্টের মত। মস্তিষ্কের নেবানো ক্রোধ-হিংসার বাতিটা হাজার-বাতির দীপ্তি এবং উত্তাপ নিয়ে জ্বলে উঠল। আমি উঠে গিয়ে তার কাছে একেবারে সামনে দাঁড়ালাম। সে গঙ্গার বাঁধানো কিনারায় দাঁড়িয়ে একটা জ্বলন্ত চিতার দিকে তাকিয়ে ছিল। চিতার আলো খুব উজ্জ্বল ছিল না, তবুও তার মধ্যেই এক মুহূর্তে দেখলাম—না, এ নীল নয়। অন্য মেয়ে। ভাবলাম, এখান পর্যন্তও এরা আসে শিকার সংগ্রহে! ওঃ! হায়, আস্তিক্যবাদের বিচিত্র পঙ্গু ঈশ্বর! গিয়ে বসলাম আপনার জায়গায়। এখন যেখানে রবীন্দ্রনাথের চিতা—আমি ওই দিকেই বসেছিলাম। সে বসেছিল দক্ষিণ দিকটায়। কিন্তু আশ্চর্য, মেয়েটি তো আমার দিকে তাকায় নি। বারেকের জন্যও তাকায় নি। আমি তো স্বাস্থ্যবান সবল যুবক, আমি কামদেব না হই, কুৎসিত নই, আমার আকর্ষণ আছে। আমার পোশাক-পরিচ্ছদেও তো নিঃস্বতা-রিক্ততার ছাপ নেই। তবে দেহব্যবসায়িনী তাকাল না কেন? আমিই আবার তাকালাম তার দিকে। মেয়েটি গঙ্গার ধারের প্যারাপেটের উপর মাথা রেখেছে।

সেই মুহূর্তেই একটি প্রৌঢ়া এসে ঢুকল। চারিদিক চেয়ে ওকে দেখতে পেয়েই বোধ করি ডাকলে—সোনা! সোনা! তারপর—এই যে! বলে এগিয়ে এসে তার হাত ধরলে। বললে—আয়।

সে বেশ উচ্চ কণ্ঠেই বললে—না—না—না। তুমি যাও।

—ক্ষ্যাপামি করিস নে সোনা—আয়। ঘরে লোক বসে আছে।

—না। চিৎকার করে উঠল সে, তাদের তুমি বিদেয় করে দাও গে।

—বেশ, তাই দেব; কিন্তু এখানে থাকে না—বাড়ি চল্।

আমি এক পা এক পা করে এগিয়ে চলছিলাম। এবার শুনলাম সে বলছে—না, যাব না আমি—আমার খোকা কোথায় গেল—উত্তর না পেলে যাব না।

আমি কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলাম—কী হয়েছে ? কিসের টানাটানি ?

প্রৌঢ়া রূঢ় কণ্ঠে বললে—সে খোঁজে আপনার কী দরকার ?

আমি বললাম—আমি মানুষ। তোমার পরিচয় তোমার মুখে পোশাকে লেখা আছে। একে তুমি টানছ কেন ?

প্রৌঢ়া রূঢ় কণ্ঠেই বললে—ও আমার মেয়ে। ওকে আমি পেটে ধরেছি। ওর ছেলে মারা গেছে এক মাস হল—ও রাত্রে পালিয়ে আসে এখানে। আমি ওকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি।

আমি এবার অপেক্ষাকৃত মিষ্টস্বরেই মেয়েটিকে বললাম—সত্যি ?

সে বললে—সত্যি।

আমিই এবার বললাম—তা হলে ফিরে যাও। কী হবে এখানে থেকে ?

হঠাৎ মেয়েটি উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল—জানা যায় না ? এখানে যদি মানুষ সারাজীবন জেগে বসে থাকে তবে জানা যায় না, মানুষ মরে কোথায় যায় ?

কী উত্তর দেব ? নিরুত্তর রইলাম।

উত্তর দিলে মা—পাগলামি করিস নে সোনালী। চল্, মা—ঘরে চল্। খোকা তোর বেড়াতে গেছে। আবার দেখবি বছর খানেক কি দুয়েক পর ফিরবে।

সে চিৎকার করে উঠল—কোথায় বেড়াতে গেছে ? সে দেশ কোথায় ?

আমি এবার সরে এলাম। দাঁড়াবার যেন সাহস হারাচ্ছিলাম। নিজেকে বোকা মূর্খ মনে হচ্ছিল। মনে হল সে বেদমন্ত্র পাঠ করে প্রশ্ন করছে; আমি ব্রাত্যের মত দাঁড়িয়ে আছি, অনধিকার প্রবেশ করেছি যজ্ঞগণ্ডীর মধ্যে।

আসতে আসতেই শুনলাম, মা বলছে—দেখ্, পঞ্চাশ টাকা দেবে—বড়লোকের ছেলে—খুশী হলে—মন পড়লে—

মেয়েটির লজ্জা ছিল না—হয়তো রাত্রি গভীর বলে, হয়তো সে দেহব্যবসায়িনীর কন্যা দেহব্যবসায়িনী বলে অথবা যে আকৃতিতে, যে মর্মান্তিক যন্ত্রণায় আমার চিৎকার করে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে—কে আমার পিতা ? তং পিতা নোঽসি। সে তুমি কে ? আমি কে ? আমি কেন ?—সেই যন্ত্রণাতেই, সেই আকৃতিতেই সে বলে উঠল—আমি কি জন্তু ? আমি কি কুকুর, না—গরু ? আমার ছেলে গেছে আর আমি—। সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

আমি উঠে চলে এসেছিলাম—বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

কিছুক্ষণ পর অবশ্য মায়ের সঙ্গে সে গেল—কিন্তু ঘাড়ে ভর দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে গেল।

হয়তো তুমি বলবে, শিবনাথ—যে, এ তো দেহব্যবসায়িনী নয়—এ যে চিরন্তন মা। মানি সে কথা। কিন্তু এর পরবর্তী কালে, শিবনাথ—খাঁদুবাবুর স্নেহে আমি তারই উত্তরাধিকারী হয়েছিলাম। দেহব্যবসায়িনী অনেক দেখেছি। তাদের কাছে এই প্রশ্ন অনেক শুনেছি। নানা ভঙ্গিতে। একেবারে প্রমোদোল্লাসের মধ্যেই এ প্রশ্ন উঠেছে এবং সব বাতি যেন দপ করে নিবে গেছে।

এর পর মনে সংকল্প জেগেছিল—বিজ্ঞান পড়ব। গবেষণা করে নতুন পথে সাধনা করব। জানব। তার আগে, শিবনাথ—গিয়েছিলাম এক বিজ্ঞানবিদ্ বিরাট পণ্ডিতের কাছে। কয়েকদিন গিয়ে ফিরে-ফিরে একদিন দেখা পেয়েছিলাম। বলেছিলাম—আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি।

তিনি বেশ একটু করুণা এবং যেন একটু অবজ্ঞা মিশিয়ে লম্বা করে টেনে টেনে উত্তর

দিলেন—ক্কী ক—থা—?

আমি বললাম—পুরাণে জগৎ এবং জীবন-সৃষ্টির যে সব কথা আছে সে সব তো মিথ্যা হয়ে গেছে। কিন্তু সৃষ্টি সম্পর্কে সত্য কথাটা কী? তাই জানতে এসেছি।

বিরাটপুরুষ উঠে বসলেন। মোটা চশমাটা চোখ থেকে খুলে মুছে নিয়ে পরলেন এবং আমার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন—অ্যাঁ! তুমি তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু। তা বেশ। কিন্তু অধ্যয়ন কতদূর করা হয়েছে?

বললাম—পাস কিছু করি নি। ম্যাট্রিকও নয়। তবে পড়াশুনো করেছি কিছু।

—নাটক নভেল ছোটগল্প? রবীন্দ্রকাব্য প্রভৃতি?

—তার সঙ্গে দর্শন-বিজ্ঞানও পড়েছি।

—আচ্ছা! দর্শন-বিজ্ঞানও? বাংলাতে দর্শন-বিজ্ঞান এমন কী আছে গো?

—ইংরেজী সংস্কৃত বইও পড়েছি।

—বুঝতে পেরেছ? ভাষা দুটি তো সহজ নয়!

—দু-চারবার ফিরিয়ে ফিরিয়ে পড়েছি। তাতে মানে বুঝেছি বইকি।

—ভাল। বায়োলজি-ফিজিক্স ভাল করে পড়। জানতে পারবে। পড়েছ বলছ? তা হলে তো কী বিচিত্রভাবে প্রাণ এই পৃথিবীতে সেই অ্যামিবা থেকে—

আমি অসহিষ্ণু হয়ে বললাম—তার আগে?

বললেন—জানি না।

আমি বললাম—আমার প্রশ্ন; ঈশ্বর নেই ভাল কথা; নর বানর থেকে উদ্ভূত হয়েছে—আমি যদি বানরের সন্তান—তবে আমার নীতির মূল্য কী? কেন এসব?

বললেন—কেনর উত্তর নেই প্রগল্ভ বালক।

একটু থেমে হঠাৎ হেসে বললেন—মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই, বাপু। মেনে নিতে হবে। দীজ হোয়াইস আর আন্‌অ্যান্‌সারড্‌। অ্যাণ্ড উইল রিমেন আন্‌অ্যান্‌সারড্‌।

এ কথায় সহানুভূতির সুর ছিল। প্রশ্রয় পেয়ে বললাম—কিছুতেই যে মন মানতে চায় না।

হেসে গম্ভীরভাবে বললেন—তা হলে এক জায়গায় গিয়ে চেষ্টা করে দেখতে পার। রাঁচী। পাগলা-গারদে। অথবা হিমাচলে যেতে পার। তাতে কিঞ্চিৎ খাওয়াদাওয়া-থাকার অসুবিধা হবে অবশ্য। বলে একটু প্রসন্ন হাস্য করেছিলেন।

চলে এসেছিলাম এর পর। এর পর আমি যে-কোন মুহূর্তে একটা অসম্ভব কিছু করে ফেলতে পারতাম। যে আজ ফাঁসির আসামী, শিবনাথ, তার অসাধ্য তো কিছু নেই। আমারও মনে হয়েছিল কি জান? মনে হয়েছিল—আগেকার যাঁরা নিজেদের ব্রহ্মবিদ্‌ বলে মনে করতেন, তাঁরাও ঠিক এই অধ্যাপকের মতই বলতেন।

পড়ার শখ ওইখানেই মিটল।

ও পথে ওই পণ্ডিতই কিছু যখন জানতে পারেন নি, তখন আমার কি আর সে সময় আছে!

ঘরে বসে আরও ক'দিন ভাবলাম। গভীর রাত্রে যেন মনে হত—মানুষের গভীর অন্তরের অতি মৃদু উচ্চারণে উচ্চারিত ওই প্রশ্ন শুনতে পাচ্ছি। বোধ হয় অস্তিবিশ্বাসের কালে একটা স্বস্তি ছিল। আজ নাস্তিবিশ্বাসের কালে মানুষ গভীর কৃষ্ণবর্ণ একটা যবনিকার সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। না—ঢুকেছে। 'কিছু নাই' 'কিছু নাই' চিৎকার করতে করতে চলেছে।

এ মনেরও একটা সময়ের পরিধি আছে। তার প্রান্তে এলেই আবার সে সহজ হয়। নইলে ওই অধ্যাপকের কথাই সত্য—রাঁচী যেতে হয়।

শিবনাথ, একটা মজার কথা ভেবে দেখ—এই নাস্তিবাদের কালে ওই কথা অহরহ ভাবলে অর্থাৎ ওর গণ্ডীর বাইরে আসতে না পারলে—সাধারণ মানুষকে যেতে হয় রাঁচী। আর অস্তিবাদের কালে তাকে যেতে হত বা সে যেত হিমালয়।

যাক্ গে। আমার সময়ও সংক্ষিপ্ত। তুমিও ভাবছ—একটা প্রচণ্ড-চরিত্র খুনীর কাছে এ সব কথা কত শুনব! উত্তরে বলতে পারি, এ যুগে—মানে নাস্তিবাদের যুগে—আমার কথা তোমাকে তেমনি করে শুনতে হবে—যেমন করে অস্তিবাদের যুগে একজন ঈশ্বরসন্ধানী সন্ন্যাসীর কথা শুনতে। কিন্তু তা বলব না। তোমার প্রবল আগ্রহ মেটাবার জন্যে ঘটনার কথাই বলব। বলছি, শোন।

আগেই বলেছি—জীবনের পরিধি বা গণ্ডী স্থানে ও কালে—একটা ঘটনার প্রভাব ঘটনার স্থান থেকে সরে গেলেও অর্থাৎ স্থানান্তরে—কমে, আবার দিন চলে যাওয়ার সঙ্গে অর্থাৎ সময় চলে গেলেও ক্ষীণ হয়। একাগ্রতাকে নানা দিক থেকে নানা সমস্যায় আকর্ষণ করে। গৌতম বুদ্ধকে নির্বাণের তপস্যা থেকে নিষ্ঠুরতম ক্ষুধায় আসন ত্যাগ করিয়েছিল। তিনি অসাধারণ অবতারপুরুষ, তিনি পায়সান্ন খেয়ে তার মিষ্টতায় এবং দেহের তৃপ্তিতে দুগ্ধ, মধু এবং তণ্ডুলের মোহে নির্বাণের কথা ভোলেন নি—আবারও 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্' বলে বোধিদ্রুমের তলায় আবার আসন গ্রহণ করেছিলেন। আমি বুদ্ধ নই—আমি অবতার নই। ছেলেবেলার সেই কৃষ্ণ সাজা এবং সাপ মেরে পাপ দমন করার কথা স্মরণ করে নিজেকে বিদ্রূপ করি। আমি সাধারণ; তবে সাধারণের মধ্যে আমি প্রবল এবং প্রচণ্ড। চামড়ার বাজনার সঙ্গে যদি তুলনা কর এই সাধারণ মানুষকে—তবে আমাকে ঢাক বলতে পার। সাধারণের জীবনে যা মৃদুনাদে বাজে তাই আমার মধ্যে বাজে উচ্চনাদে। সেই এক বুলি—এক বোল—এক তাল মান।

যাক। ওই বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে দেখা করার পর আরও কয়েকদিন বসে রইলাম। ভাবলাম —কী পথ আমার? সাধারণ মানুষের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার আছে; তারা ওই অন্নের সমস্যায় কর্ম করে, কর্মের ধারার মধ্যে মর্মের কথা চাপা পড়ে। কর্মের বিচিত্র পাক, সে সার্থকতার সাফল্যেও বাঁধে, আবার অসাফল্যের ব্যর্থতাতেও বাঁধে—দড়ির প্রান্তভাগে কঠিন বন্ধনে বাঁধা বন্দী ক্রীতদাসের মত টেনে নিয়ে চলে। যে সফল সে ঘোড়ায় চড়ে চলে—তার কোমরে এক প্রান্তের বন্ধন; যে বন্দী সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে—তার হাতে কোমরে গলায় আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধন।

ক'দিন পর টান অনুভব করলাম। সাধনবাবুর লোক এল। পত্র লিখেছেন সাধনবাবু: "আপনি আসিতেছেন না কেন? আমাকে একটা হাঁ-না জবাব পাঠাইবেন। বড় কারবারে দালাল ভিন্ন কাজ চলে না—আপনি বোধ হয় জানেন না।" লোকটির কাছে শুনলাম—বড় জাপানী ফার্মের সঙ্গে কথা হচ্ছে, তারা দরকার হলে টাকা দেবে, তাদের প্রচুর লোহার দরকার। একটা পিগ আয়রনের কারখানার প্ল্যান্ হচ্ছে। তার মাল ষোল আনা তাঁদের দিতে হবে। আরও সব বড় বড় কাণ্ড।

লোকটি চলে যাবার পর এল শান্তি। সঙ্গে বিপ্রপদ। শান্তি শিউরে উঠল—এ কী চেহারা করেছ! কী হয়েছে তোমার?

বিপ্রপদ বললে—তুমি ভাই, যা চেয়েছ তাই করেছি। বল, আর কী করতে হবে? কী দোষ করলাম আমরা?

হঠাৎ আমার মাথায় একটা জেদ চেপে গেল। বললাম—যতক্ষণ ওই ধীরেনবাবুর সঙ্গে তোমাদের সংশ্রব থাকবে ততক্ষণ আমি তোমাদের বাড়ি যাব না।

বিপ্রপদ সোৎসাহে বলে উঠল—তুমি ওই ওকে বল। ওই ওকে। ধীরেনদা, ধীরেনদা, ধীরেনদা! আমি হাল্লাক হয়ে গেছি মাইরি! ওর সঙ্গে আমাদের পোষায়? মাথায় ভূত চেপেছিল, তিরিশ সালে জেলে গিয়েছিলাম। সে সব চুকে গেছে—বাস্, ছাড়ান দাও। জান, ব্যবসাটা আমার ওই লোকটাই খেলে। চ্যালাচামুণ্ডা নিয়ে এসে বসে গেল, রাজভোগ খেলে, উঠে চলে গেল। আমার সঙ্গে হয়েই গেছে, ভাই। ধীরেনবাবু এখন আসে নিজের গরজে। আর ওই—ওই—ওই ছোটে নেশায়! ওই ওকে বল। বিকেলবেলা লেডি সেজে যাবে ওদের আড্ডায়, শুঁড়িপাড়ার ছোঁড়ারা পিছু নেবে। আমাকে যা-তা বলবে। সে সব গ্রাহ্যই নেই। চলবেই। কি, না—লীডারের হুকুম। হংসের মধ্যে বকের মত বসবে। লীডার—লীডার—লীডার! ওকে বল।

শান্তি আমার কথা শুনেই চুপ করেছিল, ধীরেনবাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা সে জানত। অন্তত ধীরেনবাবুর আমার সম্পর্কে ধারণার কথা তো গোপন ছিল না। এবং গ্রামে তাকে এবং তার গুরুকে নিয়ে যা হয়েছিল তাও সে ভোলে নি। এক মুহূর্তে সব স্মৃতিগুলো জেগে উঠে বোধ করি সে বিভ্রান্ত হয়েছিল। এতক্ষণে বিপ্রপদর কথায় তার সে বিভ্রান্তি কাটল। সে ভুরু কুঁচকে মুখঝামটা দিয়ে উঠল—মাতাল যারা হয় তাদের নেশা কি কখনও কাটে না? এখন তো নেশা করে আস নি। কী সব যা-তা আবোলতাবোল বকছ? আমি ধীরেনদাকে বলব; দেখবে, উনি এসে সুদর্শনকে বুঝিয়ে জল করে দেবেন। ও তো তোমার মত ডাং-মুখ্যু নয়।

বলেই আমার হাত ধরে বললে—সে হবে এখন। এখন চল, ও বাসায় চল।

দৃঢ় স্বরে বলেছিলাম—না। হয় ধীরেনবাবু, নয় আমি।

সে আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ চেয়ে ছিল। তারপর বলেছিল—কেন? তোমার কি ধারণা তার সঙ্গে আমার—

—না। সে ধারণা আমার নেই। অবশ্য হলেও আশ্চর্য হতাম না—আপত্তি করতাম না। কিন্তু ওর সঙ্গে—ওদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। রাখতে চাই নে। আমার সঙ্গে যারা থাকবে বা আমি যাদের সঙ্গে থাকব তারা ওদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে—এ হবে না। হতে দেব না। ভেবে দেখ।

কয়েক মুহূর্ত পরে শান্তি বললে—বেশ। তুমিই থাকবে। তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না। তার পর মুহূর্তে কেঁদে ফেললে সে। বললে—কিন্তু ওর হাত থেকে আমাকে বাঁচাও। ওকে টাকাটা তুমি দিয়ে দাও। ওই ওকে।

আমিও মুহূর্তে উঠে বলেছিলাম—চল।

বিপ্রপদ দাঁত মেলে হাসছিল।—আরে বাবা, আমি এমনিই চলে যাচ্ছি।

ভুল হয়তো হয়ে গেল ওইখানেই। শান্তির উপর আমার দেহের আকর্ষণ ছিল, মনের আকর্ষণ একবিন্দু ছিল না। অথচ নারীর প্রতি আকর্ষণ বা নারী সম্পর্কে চেতনা আমার ওই মেয়েটা থেকেই। গ্রামের সেই রাত্রের শেষ প্রহরে। তখন ওর রূপ আলাদা। ওর মন আলাদা। ওর জীবনের ভঙ্গি আলাদা। এখানে যেদিন ওর নবজীবনে ওকে বেণীরচনাপরা অবস্থায় প্রথম দেখলাম, তখন ছবিটা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। একটা গল্প শুনেছি। শ্লীল-অশ্লীল

বিচার প্রসঙ্গে। একখানা নগ্ন নারীমূর্তি নিয়ে প্রশ্ন হয়েছিল—এটা কি অশ্লীল? না। সেটি ছিল শ্লীল-অশ্লীলের প্রশ্নের বাইরে। সে ছিল শুধু সুষমা। কিন্তু নগ্ন নারীদেহের চেয়ে অশ্লীল কী? এ প্রশ্নে একজন ধীমান শিল্পী ওই নগ্ন নারীমূর্তির পায়ে দুটি মোজা এঁকে দিয়েছিলেন। মুহূর্তে লোকে উপলব্ধি করতে পেরেছিল—অশ্লীলতা কী! শান্তির সম্পর্কেও সেই কথা বলা চলে। তাই দেহের আকর্ষণ আমার শান্তির সম্পর্কে ছিল এ কথা স্বীকার করেও বলব—মনের আকর্ষণ ছিল না। সেই কারণেই তার সঙ্গে এক শয্যায় প্রথম রাত্রিযাপনের আয়োজনে ফুলের কথা মনে হয় নি, সেও বলে নি, উল্‌টে বের করে দিয়েছিল মদের বোতল। আজ জেলখানায় মৃত্যুর প্রতীক্ষায় বসে আছি, ভাবছি। আজ মনে হচ্ছে—যে মানুষের মনে এই ভাবনা, এই প্রশ্ন মরে যায়—তার মন কতকগুলি জৈবকোষের বাহন—সে জন্তুর মন—সে মনকে মানুষের মন কামনা করে না। তার সঙ্গে মিলন চুক্তির উপর হয়—প্রেম সেখানে অসম্ভব—যা চিরকালের জন্য নরনারীকে বেঁধে রাখে।

আমি ভুল করে চুক্তির শর্ত দিলাম শান্তিকে। শান্তিও তা গ্রহণ করলে। আমার আর পথ রইল না। শান্তি এবং বিপ্রপদর সঙ্গে আবার চলে যেতে হল ওদের বাড়িতে। এবং পরের দিন গেলাম সাধনবাবুর আপিসে।

শিবনাথের কথা

সুদর্শন লিখেছে : 'কিন্তু সাধনবাবুর সঙ্গেও আমার বনল না, শিবনাথ।' না বনবারই কথা। অমোঘ অলঙ্ঘনীয় শৃঙ্খলায় শৃঙ্খলিত এই আকাশমণ্ডলে ঘূর্ণ্যমান গতিশীল সৃষ্টির মধ্যে একটা প্রদীপ্ত জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড যখন বিচ্ছিন্ন হয়ে জ্বলতে জ্বলতে ছোটে তখন সে তো কারও আকর্ষণেই ধরা পড়ে না। তুলনাটা ও নিজেই দিয়েছে। বলেছে—'অবশ্য সবাই তাই, শিবনাথ। গ্রহ বল, ছোট এক টুকরো পিণ্ড বল—সবের মধ্যেই ওই ক্রিয়া চলছে। অণু-পরমাণু কেন্দ্রের আকর্ষণে ধরা রয়েছে—বাঁধা রয়েছে; কিন্তু ছিঁড়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়বার আবেগ আছে সবার মধ্যেই। যেখানে আবেগ প্রবল, বেগ প্রচণ্ড—সেখানেই উল্কা হয়ে সে ছোটে।

'আমি তাই, শিবনাথ—আমি তাই। তোমরা ছিঁড়তে পার নি—তোমাদের বাঁধন ছেঁড়ে নি। আমি পেরেছি—আমি ছুটেছিলাম জ্বলতে জ্বলতে—নিবতে চলেছি মহাশূন্যে। মহানাস্তিতে। অস্তিনাস্তির কেন্দ্রবিন্দুতে।'

সে যে প্রচণ্ড বেগে সব কিছু থেকেই ছিঁড়ে বের হবে। সে সাধনবাবুর মত আধা-আস্তিক আধা-নাস্তিক, প্লাস ওয়ান এবং মাইনাস ওয়ানের অঙ্ক-ফল যে শূন্য সেই শূন্যমূল্যের গুণের মানুষের সঙ্গে বনাবে কী করে!

দেবোত্তরের সেবায়েত, দু-প্রস্থ-খাতা-রাখা-লিমিটেড কোম্পানির মালিক, সাধুবাবার শিষ্য, সোনাগাছির লীলা নাম্নী দেহব্যবসায়িনীর বাবু, সাধনবাবুরা প্রথম যুদ্ধে দশ হাজার টাকা চাঁদা সই করে জাপানীদের টাকায় এখানে কলকাতার কাছাকাছি পতিত জায়গা কিনে পিগ-আয়রন তৈরির কারখানা খোলবার উদ্যোগ করছিল। আট-দশ দিন যায় নি সুদর্শন, এরই মধ্যে ব্যাপারটা কিছুদিন আগে পোঁতা বীজের অঙ্কুরের মত বেরিয়ে পড়ে দৃশ্যমান হয়েছে। কোম্পানী রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে। সাইনবোর্ড তৈরী হয়ে এসেছে। আপিস বসবে। ফার্নিচারের অর্ডার

গেছে। সেই উপলক্ষ্যে পার্টি। একেবারে ঘরোয়া অন্তরঙ্গমহলের পার্টি। মানে বাগানবাড়ির আয়োজন হচ্ছে। জাপানী ফার্মের হোমরা-চোমরা তিনজন, সাধনবাবু এবং তাঁর সুহৃদ চারজন—তাঁরাও এ ব্যবসায়ে অংশীদার। কলকাতার বিখ্যাত চীনে হোটেলের চীনে এবং বিলিতি ডিশ, ফরাসী ও বিলিতি মদ—নিয়ে যাবে হোটেলের লোকে; তার সঙ্গে ভারতীয় নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান। আয়োজনের জন্য আপিসের বাবুরা হিমসিম খাচ্ছে। সাধনবাবু, তাঁর পার্টনার মিঃ বাসু নৃত্যগীতের ভার নিয়েছেন নিজেরা। নাচিয়ে গাইয়ে মেয়ে চাই। অন্য সব যন্ত্রীদের জন্য চিন্তা নেই—তারা মেয়েদের সঙ্গেই থাকে। অবশ্য সাধনবাবুর লীলা থাকবে—বাসু সাহেবের গোপন-প্রিয়া থাকবে—কিন্তু জাপানী সাহেবদের সঙ্গিনী হবার জন্যে সুন্দরী তরুণীর প্রয়োজন—যারা অনায়াসে শিক্ষিতা সমাজসুন্দরী হিসেবে চলে যেতে পারে। নাচতে গাইতেও পারা চাই।

সুদর্শন লিখেছে—আমাকে সাধনবাবুর দরকার হয়েছিল শিবনাথ, খাঁদুবাবুর কাছে তাকে নিয়ে যাবার জন্য। অথবা খাঁদুবাবুর কাছে আমাকে পাঠিয়ে কার্যোদ্ধারের জন্য।

চতুর লোক। তিনি বুঝেছিলেন—খাঁদুবাবুর একটা মায়া পড়েছে আমার উপর। তখনও সে সত্যটা আমি বুঝলেও সাধনবাবুর মত বুঝি নি। আমার ধারণা ছিল, খেয়ালী বিচিত্রচরিত্র খাঁদুবাবু আমার ইতিহাস শুনে—সন্ন্যাসী হয়ে খুঁজতে গিয়েছিলাম, ফিরে এসেছি না পেয়ে, পথে নীলকে পেয়েছিলাম, সে মেয়ে মাটির রাধা ভাঙার দুঃখে নিজেকে হারিয়ে দিয়েছে শুনে—আমার উপর সদয় হয়ে গিয়েছিলেন হঠাৎ।

সাধনবাবু চতুরবুদ্ধি—সে খাঁদুবাবুকে জানত, চিনত—সে ব্যাপারটা বুঝেছিল। তার নিজের সাহস ছিল না এই কাজের জন্য খাঁদুবাবুর কাছে যেতে। কাজটা ছোট কাজ—একরকম বাজারের দালালির কাজ। কলকাতার এই বাজারের কয়েকটি গরবিনী ছিল যাদের রূপ-যৌবন, নৃত্যগীত-পারঙ্গমতা এবং উচ্চরুচির অসাধারণ খ্যাতি ছিল। কিন্তু তাদের অহঙ্কারও ছিল তেমনি। তাদের অর্থ দিতে সাধনবাবু পশ্চাৎপদ ছিল না, কিন্তু তারা বাগানবাড়িতে কি আসরে নাচতে যেত না। এবং দেহবিনিময়ের ব্যাপারে তাদের রুচি খেয়াল বিধিনিয়ম ছিল প্রায় গল্পের অলঙ্ঘনীয়পণ রাজকন্যার মত। কিন্তু খাঁদুবাবু যদি হুকুম করেন তবে যেতে হবে তাদের। খাঁদুবাবুর কাছে তার নিজের যাবার সাহস ছিল না। খাঁদুবাবু বিচিত্র। বড়ঘরের ছেলে—কয়েক লক্ষ টাকা জীবনে ব্যয় করেছেন ধূলিমুষ্টি মত। দেহে প্রচণ্ড শক্তি। মৃত্যুভয়-হীন—উদ্ধত। কলকাতার একদল অসমসাহসী দুর্দান্ত মানুষ তাঁর কাছে পোষা কুকুরের মত পড়ে আছে। তুমি দায়গ্রস্ত হয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বিচারপ্রার্থীর মত দাঁড়াও—বিচারের নামে হয়তো এই কাজই তিনি করে দেবেন। বলে দেবেন—রামবিলাস, বেদানা বাড়িউলীকে গিয়ে বল—আমার হুকুম—। কিন্তু এক্ষেত্রে যদি হুঙ্কার দিয়ে বলেন—কী, খাঁদুবাবু দালাল! রামবিলাস! বা কোন্ হ্যায় রে—বলে যদি হাঁকেন তবে সেইখানেই লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না এবং আর বোধ হয় ও-অঞ্চলে ঢুকতেই কোনদিন পাবে না সাধনবাবু।

দরকার সুদর্শনকে হয়েছিল সেইজন্য।

আপিসে যাওয়ামাত্র আমাকে বললে সাধনবাবু—বেশ লোক যা হোক। তিন-তিনটে দালালি আপনার জন্যে নিয়ে বসে আছি। দুটো ছোট, একটা বড়—আড়াইশো আড়াইশো আটশো। নিন—দালাল হিসেবে সই করুন। এভাবে অ্যাবসেণ্ট হলে কী করে চলবে?

সুদর্শন অভিভূত একটু অবশ্য হয়েছিল। ১৯৩৫ সাল—টাকার দাম একালের থেকে চার-

গুণ তো ছিলই ; সুতরাং তের শো টাকা—প্রায় একালের পাঁচ-ছ হাজারের প্রভাব বিস্তার করেছিল।

সুদর্শন বলেছিল—না, কামাই আর করব না। শরীর মন ভাল ছিল না কদিন।

এতক্ষণে তার দিকে তাকিয়ে সাধনবাবু বলেছিল—তাই তো, মশাই। কাজের চিন্তায় খেয়াল করি নি। শরীরটা তো সত্যিই ঘা খেয়েছে। কী হয়েছিল ? ইনফ্লুয়েঞ্জা ? বড় পাজী অসুখ, মশাই। শরীরটাকে ধোবী-পাটের আছাড় দিয়ে যায়। সাবধানে থাকবেন। তা এক কাজ করুন। ক্যাশ থেকে টাকা দরকার থাকলে নিয়ে যান। পরে সব হিসেবনিকেশ হবে। বাড়ি চলে যান। তবে একটি কাজ করে দিতে হবে আমার।

সুদর্শন বলেছিল—বলুন।

—আসুন, টাকাটা নিয়ে আসুন। তারপর বলব'খন। কত টাকার ভাউচার করতে বলব ?

• •

হাজার টাকা নিয়েছিল সুদর্শন। বিপ্রপদকে পাঁচ শো টাকা দিয়েছে—আরও দিতে হবে শান্তির দাম। প্রতিশ্রুতি দিয়েছে শান্তিকে। শান্তি ধীরেনবাবুর সংস্রব ত্যাগ করবে। হাজার টাকা প্রায় অগ্রিম, তাও দিতে সাধনবাবু বিন্দুমাত্র আপত্তি করে নি। তারপর তাকে সমাদর করে বসিয়ে চা খেতে খেতে জাপানী অর্থের আনুকূল্যে এক বৃহৎ লোহার কারখানার মনোরম চিত্র তুলে ধরেছিল। এবং তার মধ্যে প্রথমেই এনেছিল আদর্শের কথা—তার সঙ্গে এসেছিল দেশ।

লোহা-ইস্পাতের যুগ। তাকিয়ে দেখুন জার্মানির দিকে। ক্রুপের কারখানাকে ব্যাকগ্রাউণ্ডে রেখে হিটলার বক্তৃতা করে, তাই না এত জোর! এ দেশে গান্ধীর নন-ভায়োলেন্স আর চরখা! আর সাধারণ মানুষের চাষ আর হরিনাম! কলকাতায় বারোয়ারী পূজো! দশপ্রহরণধারিণী জাগো মা! মা জননী মাটির ; গয়না-কাপড় শোলার, সাটিনের ছাঁটের ; অস্ত্র বাখারির। রাম কহো!

তারপর এসেছিল নিজেদের কথা। সাধনবাবু নিজে কতটা উপলব্ধি করেছে তা তার আচরণে প্রকাশ, কিন্তু পাহাড়ী ময়নার মত এ যুগের কথা অনেক আয়ত্ত করেছে। যাক। নিজের ভবিষ্যতের কথা খানিকটা বলেই এনেছিল সুদর্শনের কথা।—কাজ করুন মন দিয়ে। সন্ন্যাসী হয়েছিলেন, কিছু পান নি—ফিরে এসেছেন। দেখবেন, এখানে পাবেন দু হাত ভরে। গোড়াতেই মাসে হাজার টাকা গ্যারান্টি দিচ্ছি আমি। কারখানা চালু হলে আপনি যদি চীফ ব্রোকার হতে পারেন, আড়াই হাজার তিন হাজার পাবেন মাসে। হাজার লোকের অন্নসংস্থান।

তারপর বলেছিল—বলুন, কেমন কাজে হাত দিয়েছি।

সুদর্শন স্বীকার করেছিল—হ্যাঁ, কাজটা কাজের মত কাজ।

সাধনবাবু বলেছিল—এগ্রিমেণ্ট হয়ে গেছে। আপিস খুলছি এক সপ্তাহের মধ্যে। এখন একটা পার্টি দিচ্ছি জাপানী সাহেবদের। দেওয়া উচিত। এগুলো ব্যবসায়ের অঙ্গ। কাজের মধ্যে আনন্দ চাই, ফুর্তি চাই।

তারপর বলেছিল কাজের কথা।

বেশ সুচতুরভাবেই বলেছিল সাধনবাবু—এত বড় ব্যাপার—ঠিক দু-তিন জনে ম্যানেজ করতে পারছি না। একটু খেতে দিতে হবে, ভাই।

সুদর্শন বলেছিল—বলুন, কী করতে হবে।

—খুব বেশী কিছু নয়। একবার খাঁদুবাবুর কাছে যেতে হবে। বলেই নিজের প্রস্তাবটি তাকে জানিয়েছিল। আপনি যাবেন—টাকা দশেকের মিষ্টি নিয়ে যাবেন। ভাল একটা বোতল দেব। বলবেন—এ সব পাঠিয়েছে কোম্পানি—মানে যার মধ্যে আপনিও আছেন। বুঝেছেন! কাজটা পনেরো আনাই হয়ে গেছে—এখন এই জাপানী কয়েকটাকে ভাল করে মুঠোর মধ্যে পুরতে পারলে সব চটপট হয়ে যাবে। মানে আমাদের হয়ে একটু চেপে লিখবে জাপানে আর কী! দেশের একটা কল্যাণ হবে। ঊষা আর টুনি বলে দুটি খুব ভাল নাচিয়ে-গাইয়ে মেয়ে আছে—বড্ড গুমোর তাদের। নানান বায়নাক্কা। উনি তাদের বলে দেবেন—যেতে হবে। এটাতে বড় কাজ হবে। আর ভয় কিছু নেই। পায়ে কাঁটাটি ফুটবে না। টাকা পাবে—এক-একজনকে আড়াইশো টাকা আর চাকরবাকরদের জন্যে পঞ্চাশ টাকা। তবে হ্যাঁ, সেখানে গিয়ে কোনরকম পেজোমি চলবে না। উনি বলে দিলেই হল বাস্। ওঁকে আমরা একশো সেলামি দেব। কেমন? হ্যাঁ। বুঝলেন?

এর মধ্যে সুদর্শন সঙ্গোপনে এবং অতি সতর্কতার সঙ্গে নিহিত কূট অভিপ্রায়টি ঠিক ধরতে পারে নি। ধরতে পারে নি, খাঁদুবাবুকে কথাটা বলতে যাওয়া অন্যায় হবে কোনখানে। কারণ যে ধরনের জীবন-পারিপার্শ্বিকে তিনি বসে আছেন তাতে এ প্রস্তাব তাঁর কাছে উত্থাপন করায় অন্যায় কোথায় সে ধরতে পারে নি। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গেই সে রাজী হয়ে গিয়েছিল—বেশ তো, যাব; বলব তাঁকে।

সাধনবাবু বলেছিল—আজই যান তা হলে। ওঁকে বলে ওঁর লোক নিয়ে ট্যাক্সি করে চলে আসবেন। তারপর আমি লোকটাকে নিয়ে ঊষা-টুনির বাড়ি যাব। কেমন! ওঁর ফী একশো টাকা নিয়ে যাবেন।

কিন্তু সুদর্শন খাঁদুবাবুর বাড়িতে গিয়ে কথাটা বলতে পারে নি। পিছিয়ে এসেছিল। তার নিজের লেখা থেকেই বলি।

সুদর্শনের কথা

শিবনাথ, গিয়ে যা দেখলাম তাতে মনে হল—আমি, আমি—। কী উপমা দিয়ে বোঝাব সে মনের ভাব—ঠিক খুঁজে পাচ্ছি না। আমি হতবাক, স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম।

হ্যাঁ, একটা উপমা খুঁজে পেয়েছি। ঘুঁটে দেয় যারা তাদের দেখেছ? গোবরের ঝুড়ি মাথায় করে চলে, নতুন দেওয়ালে ঘুঁটে দেয়, পড়ো বাড়ির মার্বেলের মেঝেতেও ঘুঁটে দিতে এতটুকু কিছু মনে হয় না। কিন্তু মাটিতে পোঁতা একটা পাথরের গায়ে গোবরের তাল বসাতে বসাতে হঠাৎ যদি কোনক্রমে আবিষ্কার করে যে, ও পাথরটার উল্টো দিকটায় খোদা আছে কোন দেবতার মূর্তি—তবে তার যেমন হাত পঙ্গু হয়ে যায়, মন কেঁপে ওঠে, হতবাক হয়—ঠিক তেমনি, শিবনাথ, ঠিক তেমনি হয়েছিল আমার।

দেবমূর্তি—হোক পুরনো, হোক ভাঙ্গা; পতিত প্রান্তরে থাকার জন্যে হয়তো বহুজনের পায়ের ধুলোয়, জুতোর পেরেকে ধূসরিত ক্ষতবিক্ষত—এমন কী মলমূত্রে অবমানিত কলুষিত। কিন্তু তবু, বিশ্বাসীর কথা ছেড়েই দাও, অবিশ্বাসীও তা শিল্পসৌন্দর্য এবং ঐতিহাসিক মূল্যের জন্য সম্মান করে।

আজ বলছি—সেদিন আমার ঠিক তাই হয়েছিল। মনে হয়েছিল, গোবরের ঝুড়ি নিয়ে যে পাথরে ঘুঁটে দিতে এসেছি, সেটা যেন ধুলোয়-কাদায় পড়ে-থাকা আধ-পোঁতা পতিত একটা বিগ্রহ।

দেখলাম কী জান? দেখলাম একটা ঘরে আসন করে বসে ধ্যান করছে এবং দু চোখে জলের ধারা বইছে।

প্রথমটা বিস্মিত হয়েছিলাম। তারপর হেসেছিলাম। মনে মনে ব্যঙ্গ-শ্লেষ খিলখিল করে হেসে উঠেছিল—খাঁদুবাবুও ধন্য, তার দেবতাও ধন্য এবং এই পূজাবিশ্বাস ধন্য, সঙ্গে সঙ্গে দেশসমাজও ধন্য। বংশ ধন্য—জননী কৃতার্থ।

কিন্তু চোখের জলের ওই স্রোতে সে সব ভেসে গেল। চোখের জল এক অদ্ভুত বস্তু, শিবনাথ; এবং তার প্রভাব, তার গতিও অদ্ভুত। পাথরের মত শক্ত যুক্তিতর্ককেও ভাসিয়ে দেয়—ক্ষয় করে দেয়। দাঁত মেলে মিথ্যে কাষ্ঠহাসি হাসা প্রত্যেক মানুষের দৈনন্দিন ব্যাপার। কতবার হাসে তার ঠিকানা নেই। কিন্তু কাঁদা? ছলনা করে মিথ্যে কাঁদা একেবারে অসম্ভব তা বলি নে, অনেক ভণ্ড ধার্মিক আছে—তারা পারে কাঁদতে। ওটার চর্চা করেছে তারা। কিন্তু সে অল্প দু-চারজন। তুমি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ—অনেক ভিখিরী মিথ্যে কান্না কেঁদে ভিক্ষে করে কিন্তু চোখে তাদের জল বের হয় না, এবং তাদের ওই মিথ্যে চোখের জলশূন্য কান্না শুনলে প্রতিটি দাতা কঠিনভাবে বিরূপ হয়ে ওঠে। কারও কারও রূঢ়তার সীমা থাকে না—মারতে ইচ্ছে করে। চোখের জল বিচিত্র।

একা ঘরে বসে ধ্যান করতে করতে কাঁদছে—খাঁদুবাবু! আশ্চর্য তো!

ফাঁসির আসামী। দিন স্থির হয়ে গেছে। পলে পলে সময় এগিয়ে আসছে এ বিবরণ শেষ করে আমাকে সময় পেতে হবে। যা করেছি তা বিবরণে রইল কিন্তু যার জন্যে করলাম তার উত্তর তো পাই নি। তার জন্যে আমার সময় চাই। যে উত্তর বাইরে পাই নি, অন্তরে তা পাই কিনা দেখব। এই জেলখানায় ফাঁসির সেলে বসে কান পেতে শুনতে চেষ্টা করব। সুতরাং সংক্ষেপে বলি। মধ্যে মধ্যে বোধ করি মনের আবেগে সংযম হারিয়ে ফেলছি। কিন্তু শিল্প হিসেবে এর বিচার কোর না। অনুভব করতে চেষ্টা কোর—আমার জীবন-যন্ত্রণা। আমার জীবন-যন্ত্রণা আমার একার নয়। এ যন্ত্রণা আজ আমার মত সাধারণ মানুষ যারা তাদের সবার। হয়তো তোমার মনের মধ্যেও জীবনাবর্তের এ বিলাপ-কল্লোল শুনতে পাবে।

বিলাপধ্বনির মধ্যে সেই প্রশ্ন।

আমার পিতা কে? পিতা নেই? তবে আমি কী করে আছি? কেন তবে আমার কুলশাসন? কেন এত নিয়ম? কে দেয় নির্দেশ? থাক্। আবার আবোল-তাবোল বকছি। আবোল-তাবোল বইকি! যাদের কাছে বা যারা 'কেন' প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে বলে, তারা স্থির জানে 'কেন' প্রশ্নের উত্তর নেই; যারা ওতেই সন্তুষ্ট তাদের কাছে এ আবোল-তাবোল।

সন্ধ্যে ছটা তখন।

গোড়াতেই খাঁদুবাবুর এক দ্বারপাল আটকেছিল—আভি মুলাকাত নেহি হোগা, বাবুসাব। ঘণ্টেভর বাদ। যাইয়ে—আব যাইয়ে।

সৌভাগ্যক্রমে রামবিলাস উঁকি মেরেছিল।—কৌন রে? হিঁয়াকা কানুন—। এই পর্যন্ত বলেই আমাকে দেখে বলেছিল—আরে, বাবুসাব! আপনি?

—হ্যাঁ, রামবিলাস। এখন দেখা হবে না? আমি তো জানতাম না।

—না, বাবু—দেখা এখুন হয় না। কোই কো ঘরে বৈঠানা ভি মানা হ্যায়। লেকিন—আপ—। একটু চিন্তা করে বলেছিল—আসেন—বসেন। আপনার বাত তুসরা, হুজুর পহেলে রোজ বলে দিয়েসেন হামাকে। ই বাবুকে হামার ভাল লেগেছে, রামবিলাস। হ্যাঁ, বসেন এখানে। চুপচাপ বসেন। সিগারেট ভি পিবেন না। হুজুর পূজামে আছেন। পূজাকে বাদ নিকলবেন।

রামবিলাস চলে গিয়েছিল। আমি বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়েছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে কৌতূহলও হয়েছিল। বন্ধ দরজাটার গায়ে তক্তার জোড়ের ফাঁকে চোখ রেখে দেখেছিলাম। ধ্যানের ভঙ্গিতে স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন খাঁতুবাবু—চোখ দিয়ে তাঁর জল গড়াচ্ছে।

আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বেরিয়ে এসে রামবিলাসকে বলেছিলাম—রামবিলাস!

—বাবুজী!

—খাঁতুবাবু কাঁদছেন!

—হাঁ, বাবু। হুজুর পূজাকে সময় রোয়েন। হররোজ নেহি। লেকিন হপ্তামে চার রোজ রোয়েন।

বিষণ্ণ হাসি হেসেছিল রামবিলাস।

রামবিলাসের কাছেই শুনেছিলাম—খাঁতুবাবু গুণ্ডার সর্দার নন, কারুর কাছে কোন বখরা তিনি নেন না; দেহব্যবসায়িনীদের কাছেও তাঁর কোন মাশুল আদায় হয় না। রামবিলাস বলেছিল—বাবুজী বলেন, এই যে মুল্লুক—যে মুল্লুকে এই কারবার চলে—এই মুল্লুকের বড়লাট করিয়ে ভেজিয়েছেন দিনতুনিয়ার বাদশা। হুজুর মুল্লুকের কানুন করিয়েসেন—ওহি কানুন মাফিক হুজুর রাজ চালান। বাবুজী, পিক্‌পাকিট হোতা, ছেনতাই হোতা, গরিব আদমী হোনেসে হুকুম হোতা—নিকালো মাল। ঘুমা দেও। দেনে হোতা, হুজুর। গুণ্ডালোককে জান ইজ্জত হুজুরকে জিম্মাদারিমে হ্যায়। কসবী লোক আতি হ্যায়—নালিশ পেশ করতি, হুজুর বিচার করকে রায় দে দেতে হ্যায়। বাস্। উসকে উপর বাত নেহি। ছোটা কাম হুজুর হামারা কভি নেহি করতে হ্যায়। বাচ্চা ছোকরা লোক কোই কসবী-মহল্লামে ঘুসতা তো খবর মিলনেসে পাকড়কে লে আনেকা হুকুম হ্যায়। বহুত মিঠি বাত বোলকে উসকো ঘর ভেজতা। দোসরা দফে আনেসে—সাজাই হোতা। তিসরা বারমে ভি সাজাই। উসকে বাদ লাইসেন্ দেতা। যাও জাহন্নমমে। গুণ্ডা-বদমাশকো মেয়াদ হোতা—হুজুর দেখতা উসকো জরু বাল-বাচ্চা বিনা খানেসে মর নেহি যায়, ভিখ না মাঙে। এইসাই, বাবুজী—হুজুর হামারা এই রাজ্‌কে গবর্নর হ্যায়; খুদ্ ভগবান উনকো বহাল কর দিয়া। ভগবানকো ধেয়ানমে বইঠ্‌কে উনকা আঁখসে পানি প্রেমসে নিকালতা, বাবু।

এর পর আমি আর থাকি নি—চলে এসেছিলাম। জিনিসপত্র নিয়েই চলে এসেছিলাম। রামবিলাস বিস্মিত হয়ে বলেছিল—কেন ফিরে যাচ্ছেন বাবু? মুলাকাত তো করুন।

বলেছিলাম—না, রামবিলাস। আমাকে সাধনবাবু পাঠিয়েছিলেন। বহুত ছোট কাজের ভার দিয়ে। এ আমি ওঁকে বলতে পারব না।

—আরে বাবুজী, হামাকে তো বোলেন, কী কাম?

আমি গোপন করি নি। বলেছিলাম। রামবিলাস বলেছিল—যান, বাবু, চলিয়ে যান। আপ ঠিক সমঝিয়েছেন। ই ছোটা কাম। ই তো কসবীলোগকী দালালি হ্যায়।*

আমি বলেছিলাম—উনি সাধনবাবুর সেই ব্যাপারটায়—

—হ্যাঁ, বাবুসাহেব। লীলবাঈ লিয়ে হাঙ্গামা। তা, বাবুজী, উসকে অন্দর মামলা থা। কাঞ্চন কসবী উনকে পাস চিঠ্ঠি লিখকে ডর দেখাচ্ছিল। রূপেয়া বহুত লিয়েছিল। উসি মামলাকে বিচার কর দিয়া হুজুর। দালালি নেহি কিয়া।

যুক্তিগুলো হয়তো অনেকের কাছে অদ্ভুত ঠেকবে। আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকে নি। আমি চলে এসেছিলাম।

সাধনবাবু চটেছিলেন। খুব চটেছিলেন। কিন্তু আমি তো কোনদিন কাউকে ভয় করি নি।

ধীরেনবাবুর নাস্তিক্যবাদী মত ও পথকে ব্যঙ্গ করি, ঘৃণা করি, কারণ তার মধ্যে ধীরেনবাবুর প্রচ্ছন্ন স্বার্থ আমার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট। এদের দলবদ্ধ নাস্তিক্যবাদীদের দু দলের মধ্যে এ ওকে ধরিয়ে দেয়, শিবনাথ। কিন্তু এই বিচিত্র আস্তিক্যবাদী খাঁদুবাবুর পাপপঙ্কে নিমজ্জিত থেকেও ভগবানকে ডাকতে দেখে ব্যঙ্গ করতে পারি নি। কারণ লোকটি নিজের কানুন অনুসারে প্রায় ক্ষুরের ধারের উপর দিয়েই পথ হাঁটে। কোন ভণ্ডামি নেই। ধীরেনবাবুর চেয়ে খাঁদুবাবুকে আমি বড় অবশ্যই বলছি নে, শিবনাথ—তোমাদের সঙ্গে ঝগড়া করতে আমি চাই নে—কিন্তু ছোটও বলব না। আমি নাস্তিক—অন্য ধরনের।

শিবনাথ, নাস্তিক্যবাদে জন্মের আগেও নেই—মৃত্যুর পরেও নেই। সুতরাং থাকার মধ্যে আছে বেঁচে থাকার কয়েকটা দিন। চরম সত্য—বেঁচে থাকা। পরম শব্দটা রাখতে যদি চাও তবে পরম সত্য সুখে বেঁচে থাকা। তার মধ্যে যে নাস্তিকেরা মানবকল্যাণ, সমাজকল্যাণ ইতিহাসে নাম থাকার অমরত্বের লোভ দেখায় তারা হয় ভ্রান্ত, নয় ভণ্ড মিথ্যুক।

তবে এও হতে পারে, শিবনাথ—প্রকৃতিগতভাবে আমি খাঁদুবাবুর সগোত্র। ইমোশনাল ক্রিমিন্যাল। ইণ্টেলেক্চুয়েল নিহিলিস্ট নই।

না, আমি ক্রিমিন্যাল। নাস্তিক্যবাদের পথেও আমি নাস্তির উৎস খুঁজি; রাবণের মত। ধ্রুব হতে চেয়েছিলাম। ব্যর্থ হয়ে ফিরে রাবণ হয়েছি। সাত জন্মের প্রতীক্ষা আমার সইবে না। আমি তিন জন্মে পেতে চাই। ফাঁসির সেলে বসে ভাবছি—এইটেই আমার তৃতীয় জন্ম কিনা!

সাধনবাবু অবশ্যই একটা চেহারা বের করেছিলেন—নতুন চেহারা। কিন্তু ভয় আমি পাই নি। আমি সম্পর্ক খতম করে দিয়ে চলে আসবার জন্যেই প্রস্তুত হয়েছিলাম। ওটার উপর তো কোন মমতাই ছিল না আমার। টাকা নইলে চলে না তাই, তাই মানুষ চাকরি করে—খাটে, নইলে আসল কাজ তো ওই সন্ধান, শিবনাথ। ওই প্রশ্নের উত্তর। সেই কারণেই শিল্পী সাহিত্যিক সাধকের জীবনকে লোকে সার্থক বলে। ওতে জীবিকা আর জীবনসাধনা একসঙ্গে চলে। শুধু জীবিকা যেখানে, সেখানে মোটা মাইনে হলেও সন্তোষ শতকরা আশিজনের মধ্যে নেই। নেই ওই কারণ।

আমার ঠিক তখন জীবিকা খুব একটা বড় সমস্যা ছিল না, কারণ টাকা ছিল। তা ছাড়া জীবনে একা। দেহে প্রচুর শক্তি, মনে প্রবল উগ্র বিদ্রোহ।

চলেই আসছিলাম। হঠাৎ সেই মুহূর্তেই এসেছিল রামবিলাস। সে বলেছিল—রাম রাম, বাবুজী। হুজুর হামাকে ভেজলেন।

—কেন, রামবিলাস?

—আরে, বাহর আসিয়ে হুজুর শুনলো কি আপ আসিয়েছিলেন। পুছলেন—কী কামে?

কুছ কাম ছিল্ব ? হামি বলি না, তো জোর ধমকানি দিলেন। হামি বললাম সব। শেষে ই ভি বললাম—উনি তো জানতো না। হাম যব সব বলিয়েছি তব ওহি মিনটমে বাবুজী সব লেকে চলিয়ে গেলেন। কইলেন কী, মেরা কসুর হো গয়া। থোড়া বাদ হামকে ডাকিয়ে বোল দিলেন কী, উ হামারা ইজ্জৎ রাখা হায়—উসকো কাম হাম নেহি করেগা, তু কর্ দে। উষা টুনিকে যা-কে বোল্—উ লোককী জান কী ইজ্জৎ কী জিম্মেদার খাঁদুবাবু। হম যানে নেহি বোলতা। লেকিন যায়েগী—উ লোক কী হিস্ছা হোগা—যাস্তি রোজগার হোগা তো যানে বোল। ইজ্জৎ আওর জান ই ছুনোকে জিম্মেদার হম! আউর বাবুলোককো—সাধনবাবুকো কহনে বোলা—রূপেয়াকে ফয়সলা উ লোককে সাথ কর লে। আউর যো চিজবিজ রূপেয়া হুজুরকো ভেজা, উ হামলোগোঁকে দেনে বোলা।

রামবিলাস একটু হেসেছিল। অবশ্যই সে এতে প্রসন্ন হয়েছিল। তবে এটা বলব—রামবিলাসেরা—বিশেষ করে রামবিলাস আর হু-তিনজন টাকার চেয়েও খাঁদুবাবুকে শ্রদ্ধা করত বেশী।

সংবাদটা শুনে সাধনবাবু খুশী হয়ে বলে উঠেছিলেন—বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা। কেল্লা ফতে।

রামবিলাস বলেছিল—চলিয়েগা আভি উষা-টুনিকে পাশ ? সেটল্ কর লেগা। হম যায়েগা, হুজুরকে বাত বোল দেগা।

সে কী তাণ্ডব বাগান-পার্টিতে! আমি জীবনে ধাপে ধাপে অনেক নেমেছি—সমাজের বিচারে, রাষ্ট্রের বিচারে। নারী নিয়ে অনেক খেলা করেছি। দেহের তাড়নায় করেছি, এবং ঈশ্বর-সমাজ-নীতি মানি না—এই বোধকে প্রবলতর করবার জন্য জোর করেই করেছি। কিন্তু এই বাগান-পার্টিতে সাধনদের যে চেহারা দেখেছি তা আমি কখনও করি নি—করতে পারি নি।

আর একটা কথা বলে নিই। সেটা মনে হলে আজও আমার হাসি পায়। এই সাধনবাবু ভারতবর্ষের সংস্কৃতির নমুনা ওই জাপানীদের দেখাবার জন্য নগ্ন গায়ে বাঘের চামড়ার রঙের একখানা কম্বল পরে পায়ে ঘুঙুর বেঁধে ধেই ধেই করে নেচেছিলেন, একটা মেয়ে 'প্রলয় নাচন নাচলে যখন' গানটা গেয়েছিল।

অবশ্য বলবার কিছু নেই। এ পৃথিবীতে সর্বদেশে সর্বকালে আছে। স্তাবকতার জন্য বানর-নৃত্য এবং অর্থ নৈতিক-রাজনৈতিক স্বার্থসাধনের জন্য নারী-উপহার। শুধু অর্থনীতি-রাজনীতিকেই বা দুষি কেন, আধ্যাত্মনৈতিক তপস্বীকে ভ্রষ্ট করবার জন্য দেবতারাও স্বর্গ থেকে মেনকা-উর্বশী-রম্ভাকে পাঠাতেন।

আমার বিস্ময় লাগে, শিবনাথ—আমার সন্ন্যাসত্যাগের মুহূর্তে নীলকে কে পাঠিয়েছিল ? ঈশ্বর কি আমাকে ভালবাসতেন পরম স্নেহে !

যাক। পরের কথা শোন।

সাধনবাবুর কাছে খাতির আমার বেড়েছিল। উপার্জনও বেড়েছিল। ধীরেনবাবুর সঙ্গে শান্তির সম্পর্ক ছিঁড়েছে। বিপ্রপদকে টাকা দিয়েছি। কিন্তু চিত্ত তৃপ্ত নয়। তৃপ্তি আসবে কোথা থেকে ? আমার প্রশ্নের উত্তর ভিন্ন তৃপ্তি হবে কিসে ?

নেই, কিছু নেই বললেও তো সমস্যা মেটে না। আমি জীবন দিয়ে বুঝে গেলাম, শিবনাথ,

—জগৎজোড়া মানুষের সব অতৃপ্তির মূল ওখানে।

কিছু নেই তো, আমি কী ? আমি কেন ?

কিছু আছে তো—অর্থাৎ সে আছে তো—জগৎ জুড়ে এত অবিচার কেন ?

আর কী জানি কেন, শান্তিকে একটা মুহূর্তের উত্তেজনায় বিপ্রপদর অশ্লীল কুৎসিত গালাগালির উত্তেজনায় কাছে টেনে নিয়ে যেন অশান্তি আমার বেড়েছিল বেশী। কিন্তু তাকে পরিত্যাগের পথ পাই নি।

ওদিকে সাধনবাবুদের নতুন আপিস হচ্ছে। তার মধ্যে একদিন তাঁর ঘরে শুনলাম——ধীরেনবাবুর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর। দাঁড়ালাম দরজায়। ভয় দেখাচ্ছেন ধীরেনবাবু।

—ভাল বলছি আপনাকে। মিটিয়ে ফেলুন। নইলে আপনার কারখানায় আগুন জ্বলে যাবে।

সাধনবাবু বললেন—যা পারেন করুন আপনি। আমি না-হয় ও কারখানা বন্ধ করে দেব। আর মজুরি বাড়াতে পারব না আমি।

ধীরেনবাবু বললেন—বড় কারখানা করতে চলেছেন, সাধনবাবু। এ স্ট্রাইক হলে দুর্নাম হবে। ক্ষতি হবে।

—দেখা যাবে।

ধীরেনবাবু প্রত্যাশা করেন নি এ উত্তর। বললেন—আচ্ছা। দেখা যাবে। কিন্তু জোরটা কিসের এত ? ওই ছোকরার ?

শিবনাথ, বুদ্ধিমান লোকেও ব্যক্তিগত জীবনের লাভক্ষতিতে বোকার মত কথা বলে। ছোকরা মানে আমি। তবে ধীরেনবাবুর তথ্য ছিল বক্তব্যের পিছনে। বললেন—পার্টির জন্যে যারা নারী সংগ্রহ করে সাধনবাবু, তাদের হাতে গুণ্ডা দু-চারটে থাকলেও তাদের দিয়ে স্ট্রাইক রোখা যায় না।

বলে বেরিয়ে চলে গেলেন। চোখোচোখি হল। তিনিও তাকালেন, আমিও তাকালাম। তিনি বের হয়ে গেলেন; আমি ঢুকলাম। সরাসরি বললাম—আমি স্ট্রাইকে ওদের সঙ্গে লড়তে রাজী।

—পারবেন ? সাধনবাবু বিস্মিত হলেন।

বললাম—পারব। বলুন কম সংখ্যায় কতজন মজুর হলে আপনার কারখানা চালু থাকবে ?

নেমে পড়লাম শিবনাথ। লড়ব ওই ধীরেনবাবুর সঙ্গে। তখন সেটা ১৯৩৫ সাল। এ দেশে ট্রেড ইউনিয়ন তখন সবে গড়ছে। নেতারা খুব পাকা নয়। ইয়োরোপের ট্রেড ইউনিয়নের ইতিহাস পড়ে তার উপর নির্ভর। আমারও পড়া ছিল। বলেছি তো দিল্লিতে পড়েছিলাম—হিমালয় থেকে শীতকালে নেমে। তবে আসল মূলধন হল সাহস আর শক্তি। ও যার আছে সে জিতবেই—একথা বলি নে; তবে লড়াই না করে সে হারে না। এবং যে লড়াই সে দেয়—সে লড়াই শক্ত লড়াই।

খাঁদুবাবুর স্নেহের সুযোগ নিলাম। রামবিলাসকে নিলাম চেয়ে। রামবিলাস আশ্চর্য। নতুন কাজের স্বাদে সে খুব খুশী হল। জন কুড়ি মজুর যোগাড় করতে খুব বেগ পেতে হল না। ধীরেনবাবুর উপর বিরূপতাই এর কারণ। নইলে শ্রমিকদের কিছু মজুরি বাড়াবার প্রতিশ্রুতি আমিও নিয়েছিলাম।

শেষ অস্ত্র ব্যবহার করলেন ধীরেনবাবু। দাঙ্গা লাগালেন।

রামবিলাসের কল্যাণে আমার লোকের অভাব হয় নি। রামবিলাসকে নিয়েছিলাম খাঁদুবাবুকে বলে। তারা দাঙ্গায় সমর্থ লোক। চতুর লোক। ধীরেনবাবুর দল হটে গেল। শুধু হটে গেল না, জখম হল কয়েকজন। একজন শেষ। শেষরাত্রে এসেছিল আগুন লাগাতে। দারুণ ক্রোধে এমন আঘাত তাকে করেছিল যে, সে পড়ে গিয়ে আর ওঠে নি। আমি রাত্রেই তাকে কলসী বেঁধে গঙ্গার জোয়ারে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।

তবু ধীরেনবাবু হেরেও জিতলেন। সাধনবাবু মামলায় এগুতে ভয় পেলেন। মোটা টাকা দিয়ে সব মিটিয়ে নিলেন। শ্রমিকদের মজুরি কিছু বাড়ল। বোধ করি দু আনা কি দশ পয়সা।

সাধনবাবু আমাকে বললেন—যা হয় আপনি নিজে করে খান, মশায়। আপনি সর্বনেশে লোক। দয়া করে আমাকে রেহাই দিন।

আমি সকলের চেয়ে বেশী ঘৃণা করি এই কাপুরুষগুলোকে। আমি নিঃশব্দে চলে এলাম। গিয়ে গঙ্গার ধারে বসে রইলাম সারাদিন। ভেবে ঠিক করে নিলাম, ওই ব্যবসার মহলে, ডালহৌসি ক্লাইভ স্ট্রীট অঞ্চলে আর যাব না। খুব রক্ষা পেয়েছি, নইলে আর কিছুদিনের মধ্যেই ওই সাধনবাবুর স্তাবক হয়ে যেতাম। অথবা আর এক সাধনবাবুই হতাম। কিছুদিন আগে সাধনবাবুদের আর একটি রূপ দেখেছিলাম। দেখে ঘৃণা কানায় কানায় ভরে উঠেছিল, এবার উপচে পড়ল।

সাধনবাবুর সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দুদিন গঙ্গার ধারে বসে ছিলাম, শেষ দিন বাসায় ফেরার পথে সেণ্ট্রাল অ্যাভেন্যুর উপর 'টু লেট' লেখা দেখে থমকে দাঁড়ালাম। এবং খোঁজ করে বাড়িওলার কাছে গিয়ে ভাড়া নিলাম। ঘরখানা প্রশস্ত। চমৎকার রেস্টুরেণ্ট হবে। তাই করব। ওই ব্যবসায়ী মহলে আর নয়। এবার এইখানে চায়ের রেস্টুরেণ্টই করব। এ ব্যবসা অনেক ভাল। বিপ্রপদর মিষ্টির দোকানে দেখেছি—শুধু স্বাধীনতাই নয়, ভাল করে চালাতে পারলে উপার্জন ভালই হয়। ভেবেছিলাম ওই উপলক্ষ করেই রাজনীতিতে শ্রমিক সংগঠনে নেমে যাব। কিন্তু যাই নি। ভাল লাগে নি। সব শুনে শান্তি খুশী হয় নি। বলেছিল—ওর সঙ্গে না বনে, নিজে স্বাধীনভাবে কর ব্যবসা।

বলেছিলাম, না।

বিপ্রপদ খুশী হয়েছিল। সম্ভবত সে ভেবেছিল, তাতে আমাতে একশ্রেণীভুক্ত হয়ে গেলাম। সে মিষ্টি-ওলা, আমি চা-ওলা। সবশেষে খাঁদুবাবুর কাছে গিয়েছিলাম, তাঁর কাছে না গিয়ে আমার যেন আর পথ ছিল না। তিনি যেন বেঁধেছিলেন আমাকে। লোকটিকে ভাল লাগুক বা না লাগুক, তাঁর ভালবাসা বড় ভাল লাগত। কখনও কিছু গোপন করি নি তাঁর কাছে। শান্তির কথাও না। একটু খুঁতখুঁত করেছিলেন খাঁদুবাবু।

বার বার বলেছিলেন—হ্যাঁ বাবা, যদি ঘরই করবে তবে ও মেয়ে কেন? বিয়ে করলে না কেন? ভাল মেয়ে অনেক আছে, বাবা। আমি দেখে দিতাম। না—না—না।

আমি বলেছিলাম, কেন? আমি তো কিছু মানি না আপনি জানেন। ঈশ্বর মানি না, তা ধর্ম পুণ্য বিবাহ!

—আমি ঈশ্বর মানি বাবা, কিন্তু বাকীগুলো মানি নে এ তো দেখছ। তুমি যে ঈশ্বরকে মানতে না, বাকীগুলোকে মানতে। ক্রমে মানবে না তাও জানতাম। কিন্তু ও মেয়েটা—। মেয়ের সঙ্গে ঘর বাঁধা সে তো শুধু রাত্রির ভোগ নয় বাবা, ওতে যে দিনের আনন্দও জড়ানো।

সুখ তো পাবে না, বাবা। এ যে যেচে দুঃখ বাড়ালে। দেখ, আমাদের বাগবাজারের ঘোষ মশায়—মস্ত লেখক, মস্ত অ্যাক্টর, পরমহংসের শিষ্য, তিনি বলতেন, দেখ, চুনো মাছ পচলে পেঁয়াজ লঙ্কা দিয়ে কড়া করে রাঁধলে খাওয়া যায়, কিন্তু পাকা মাছ পচলে তাকে আঁস্তাকুঁড়ে ফেলতে হয়। ও মেয়ে তাই। বাসি নয়, পচা পাকা মাছ। ধীরেনবাবুর বিলিতি মশলা ওর গায়েই লেগেছে, ভেতরে যায় নি। তবে দেখ। তুমি সন্ন্যাসী থেকে গৃহী হয়েছ, তুমি হজম করলেও করতে পার। আমি আপত্তি কিছুতে করি না।

আমি বলেছিলাম—না। সে কথা আমার সঙ্গে হয়ে গেছে। ধীরেনবাবুদের সঙ্গে কোন সংস্রব থাকবে না।

খাঁদুবাবু বলেছিলেন—ভাল রে বাবা! তা স্বীকার করেছে? ভাল। কিন্তু—

আমি বলেছিলাম—আবার কিন্তু কী? থাকলেও ভয় করি নে আমি।

খাঁদুবাবু বলেছিলেন—ওরা মুসলমান হয়েছিল জান তো?

বলেছিলাম—জানি।

—বাস্, তবে আর বলবার কিছু নেই। তবু সাবধানে থেকো।

তারপর আমার সংকল্পের কথা শুনে বলেছিলেন—মনে যা চায় তাই কর। সাধনবাবুদের সঙ্গে তোমার বনবে না, এ সন্দেহ আমার হয়েছিল। ও জাত আলাদা বাবা। সে চিরকাল। তবে একালে আবার কোম্পানি অ্যাক্টে ব্যবসা চলে; কায়দাও বিলিতি। এ বাবা আমাদের যে ঋষি বলেছিলেন—ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ,—তাঁরও হজম হত না। ঘিয়ে চর্বির ভেজাল। তোমারও হজম হবার নয়, হয় নি। তা চায়ের দোকান করবে? এই পাড়ায়? কর্মফের আর কী! তা কর, যদি ভাল করে করতে পার, মন্দ হবে না। অনেকগুলো ছোঁড়া-টোঁড়ার গতি হবে। কাজে লাগিয়ে দিয়ো।

চায়ের দোকান করে প্রথম কিছুদিন ভাল ছিলাম, শিবনাথ। আমার মনের মোড় আবার ফেরবার অবকাশ পেয়েছিল এই ব্যবসাটির মধ্যে। বসে বসে ভাবতাম।

বিংশ শতাব্দীর সব-অস্বীকারী আমি, কিন্তু আমার জীবন-প্রশ্নকে অস্বীকার করি নি। অস্বীকার করতে চাইলেই বা পারব কেন? গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করা যায়, কিন্তু আত্মাকে ফাঁসি দেব কী করে? আত্মার আর্তনাদ-করা প্রশ্নের সম্মুখে আমার মত বিংশ শতাব্দীর মানুষের যে লজ্জার সীমা নেই, আত্মগ্লানির অবধি নেই।

আমার পিতা কে? আমার কুলধর্ম কী?

আমার মত মানুষ বিংশ শতাব্দীতে কম নেই। অনেক। অনেক। অনেক। এ যুগে অর্থনীতিশাস্ত্র, রাজনৈতিক দর্শন প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছে, কিন্তু ও প্রশ্ন থামে নি। আবার প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে লাগলাম। শান্তির সঙ্গে সম্পর্ক প্রায় উঠিয়ে দিলাম। বাড়িতে রইল একান্ত আশ্রিতার মত।

পড়াশুনা আরম্ভ করলাম। দোকান ভালই চলছিল। পাড়ার ছেলেরা আড্ডা দিত। তাদের তর্ক শুনতাম। মধ্যে মধ্যে তরুণ-তরুণী আসত, কেবিনের খদ্দের। দোকানের জন্য পুরনো মাসিকপত্র কিনে এনে রাখতাম। নিজে পড়তাম। তার মধ্যে মনের প্রশ্নের প্রতিধ্বনি পেতাম মধ্যে মধ্যে। মৃত ঈশ্বরকে নিয়ে কবিতা, প্রবন্ধ। এরই মধ্যে মহাপ্রয়াণ করলেন রবীন্দ্রনাথ। বাস্, শেষ হয়ে গেল। আর 'তুমি'কে নিয়ে কেউ কাব্য রচনা করবে না। এবার শুধু 'আমি'। বাস্। শেষ।

এরই পর এল যুদ্ধ। না, ভুল হল। যুদ্ধ এসেছিল, কিন্তু যুদ্ধ তখনও স্ব-রূপে নিজেকে

প্রকাশিত করে নি। বিয়াল্লিশ সনে অকস্মাৎ পুরনো কালের পর্দাটা ছিঁড়ে গেল—না, ঝড়ে উড়ে গেল। বিংশ শতাব্দীর পর্দাটা প্রকাশিত হল আপন স্বরূপে। আমার মনের চোখে কী দেখলাম জান? একটা মরুভূমির দৃশ্যপট। জল নেই, সবুজ নেই, ছায়া নেই, দগ্ধ প্রান্তর, দগ্ধ আকাশ, বিলীন দিগন্ত। তারই সম্মুখে মরীচিকার মত—না, রঙ্গমঞ্চে রঙমাখা নর্তকীর মত নাচছে অর্থনীতির রঙ্গিণীর দল; রাজনৈতিক দর্শনবিদ পরিষদের দল উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা করছে; আর পৃথিবীসুদ্ধ মানুষ পরস্পরের টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবার জন্য বদ্ধপরিকর। রক্তে পৃথিবী ভাসছে। দুর্ভিক্ষে মানুষ মরছে পথে পথে। সত্যের সবুজ নিঃশেষে শুকিয়ে মরে গেছে। ঘর গেছে, পরিবার গেছে। এসপ্ল্যানেডে ধর্মতলায় হাওয়ায় নোট ওড়ে; সেই নোট ধরবার জন্য স্বামী নিয়ে যায় স্ত্রীকে, পিতা নিয়ে যায় কন্যাকে, ভাই নিয়ে যায় ভগ্নীকে। মিলিটারী এলাকায় নোট ওড়ে; সেই নোট ধরতে ছুটছে দলে দলে মানুষ।

আবার বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম।

মনে হল, 'কে আমার পিতা'—এ প্রশ্নের সমাধান হয়ে গেছে। উত্তর পেয়েছে মানুষ;—সে স্বয়ম্ভু। তার ভাই নেই, জ্ঞাতি নেই। শুধু সে আছে। দল আছে। দলের নেতা আছে। বুনো জানোয়ারের দল। নখদন্তের বদলে তার হাতে উদ্যত খড়্গ। দলে দলে জাতিতে জাতিতে তাই এই হানাহানির মধ্যে মীমাংসা হচ্ছে—কে থাকবে, কে থাকবে না। অথবা আদি নেই, অন্ত নেই—জন্মের আগেও শূন্য, মৃত্যুর পরেও শূন্য; মধ্যে আছে শুধু বর্তমানটা—সেটা কেন থাকবে অর্থহীনভাবে? সুতরাং সেটাকেও শেষ করে দাও নিজেরাই, নিজের হাতে। শক্তি ছিন্নমস্তা হয়েছিলেন কি এই চিন্তাতেই? পরীক্ষা করে দেখেছিলেন? কে জানে? আর কী উল্লাস কী উদ্দীপনা এর মধ্যে! অর্থনীতির রঙ্গিণীরা নৃত্য করছে, তাদের অঙ্গ থেকে ঝরে পড়ছে অর্থ। সেই অর্থ যে যত পার কুড়িয়ে নাও। প্রচুর ভোগ চারিদিকে, ভোগ কর আর মরণ-বহ্নিতে ঝাঁপ দাও। প্রশ্ন নেই—প্রশ্ন নেই।

আমি সামান্য মানুষ নই, কিন্তু আমার চেয়ে অসামান্য মানুষ তো অনেক। যারা অঙ্ক কষে ব্রহ্মাণ্ডের পরিধি নির্ণয় করে, শক্তিকে নব নব রূপে ভঙ্গিতে আবিষ্কার করে, পরমাণুর মধ্যে মহাবিরাটের অবস্থান কল্পনা করে—তারা, শিবনাথ, তারাও সেদিন এই হানাহানির বিভ্রান্তির মধ্যে, সেই বিরাট বিপুলের মধ্যে অমৃত, যার মধ্যে 'আমার পিতা কে'—এই চিরন্তন প্রশ্নের উত্তরের আভাস মিলিলেও মিলতে পারত, সে দিকে দৃষ্টি দিলে না। তারা অমৃতকে আবিষ্কার না করে আবিষ্কার করলে মৃত্যুকে। মৃত্যু চিরকালই যবনিকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে। আবৃত করে রেখেছে চিরন্তন অজ্ঞাতকে। তাকে তুলতে গিয়েও তুলতে পারলে না, বিভ্রান্ত হয়ে গেল। মৃত্যু-শক্তির অধিকারী হয়ে ভাবলে—বোধ হয় আমিই ঈশ্বর। আমারও তাই হল। বিভ্রান্তিতে পড়লাম। 'কিছু নাই'—এও আর থাকল না; হল 'আমিই সব'।

সুভাষচন্দ্র দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। দেশের স্বাধীনতা আনবেন। বক্রহাস্য করলাম। গান্ধীজী 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' বলে ডাক দিলেন। চিত্ত বিদ্রোহী হল। কেন? করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে কেন শুধু? ওর সঙ্গে 'মারেঙ্গে'ও নয় কেন? মনে মনে মধ্যে মধ্যে বলতাম, রাম রাম ছাড় গান্ধীজী, নিমতলার ঘাটের পথেই ও-নামটা ভাল।

এসব অবশ্য তখন কোন গভীর গম্ভীর মুহূর্তে কখনও কখনও মনে উদয় হয়। তা ছাড়া অন্য সকল সময়েই কানে বাজে টাকা-গেঁথে-তৈরি-করা অর্থনীতির রঙ্গিণীদের চরণের নূপুরধ্বনি।

ছোট একটা ঘটনা বলি। যা থেকে বিভ্রান্তি আমার উন্মত্ততায় পরিণত হল। তেতাল্লিশের গরমের সময়। তখন মধ্যে মধ্যে খাঁদুবাবুর রাজত্বের মেয়েদের লোক প্রায় আসত একশো টাকার নোট ভাঙাতে। এসপ্ল্যানেডের বাজার দেখেছি; এদের সন্ধ্যের সময় সেজেগুজে যেতে দেখেছি। হাসতাম, টাকা রাখতাম, ভাঙিয়ে দিতাম। খাঁদুবাবুর তখন অসুখ—শেষশয্যা। আমি তাঁকে দেখাশুনা করতাম। ওই মানুষটাকে অবজ্ঞা অবহেলা করতে পারি নি। তাঁর অনুরোধে এদের সুখ-সুবিধে দেখতে হত আমাকে। শুধু ওদের নয়, খাঁদুবাবুর চেলার দলও আমার পাশে ঘুরত ফিরত। আমার দোকানের আনাচে-কানাচে, গলির ভিতর রাত্রিকালে মদও বিক্রি করত। আমার রোজগার তখন কমে নি, কিন্তু বাজারদরের টানে চৌবাচ্চার জল-নিকাশী নালাটা ভেঙে বড় হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে। মনে মনে ভাবলাম, এর সঙ্গে পিছনে মদের দোকান করলে হয় না? আমি নিজেও তখন মদ খাই। নিত্যই খাই। না খেলে শান্তিকে সহ্য করতে পারি না; চিন্তায় রাত্রে ঘুম হয় না। মধ্যে মধ্যে মদ্যপান করতে হোটেলে যেতাম। হোটেলে নূতন কালের হাওয়াটা জোরালো হয়ে বইছে। মনে জোর পেতাম। কেন জান? দেখতাম উকিল ডাক্তার এঞ্জিনীয়ার, খবরের কাগজের সম্পাদক, সাহিত্যিক প্রফেসার শিল্পী লীডার সব টলতে টলতে বেরুচ্ছে। ছাত্রও দেখেছি। মেয়েও দেখেছি, সভ্য মেয়ে—সম্ভ্রান্ত মেয়ে। নিতান্ত তরুণীও দেখেছি, মুখে শিক্ষার মার্জনা, গৃহস্থ ঘরের ছাপ। তবে মেয়েদের ভিড় এসপ্ল্যানেডে। সেখানে গোরার ভিড় বেশী—তার মধ্যে আমেরিকানরা প্রধান। তাই জোর পেতাম। নইলে বাড়িতে তো মজুতই থাকত। শান্তিও খেত। আমার তাতে আপত্তি করার তো কিছুই পাই নি। খেতে চায়, খাক। মনে আপসোস হত, কেন ওকে ধীরেনবাবুর সংস্রব থেকে জোর করে বিচ্ছিন্ন করলাম। ওদের সঙ্গে থাকলে অন্তত ভেসে যেতে পারত—যে দিকে হোক। এখানে এসে চড়ায় আটকে গেল যে। বিপ্রপদ আছে। আসে যায়। নিতান্তই আশ্রিত অনুগৃহীতের মত।

ওদিকে খাঁদুবাবু তখন শয্যাশায়ী। এই লোকটি আমাকে যত দিলে অমৃত, তত দিলে বিষ। ও আমাকে ভালবাসত। আমিও ভাল না বেসে পারি নি। নিত্যই যেতাম। চিকিৎসার ব্যবস্থা করতাম। অর্থ তাঁর ছিল। সেবা করবার লোকেরও অভাব ছিল না। রামবিলাস যে কী সেবা করত তা বলা যায় না। ওদের মায়া-মমতা দেখে মনে হত—না-ই বা থাকল ঈশ্বর, মানুষ তো আছে! কিন্তু বাইরে এসে সাধনবাবুকে-ধীরেনবাবুকে দেখে ভাবতাম—না, মানুষ নেই, পশু আছে। খাঁদুবাবুর দলকেও আমাকেই দেখতে হয়। তারা নিজে থেকেই আসে। মধ্যে মধ্যে খাঁদুবাবুও পাঠিয়ে দেন; পুলিসের খাতায় নাম উঠেছে। পাড়ার লোকেরা ঘৃণাও করে, সম্ভ্রমও করে।

সেদিন রাত্রে দোকান থেকে বাসায় ফিরছি। মদ সেদিন তখনও পর্যন্ত সামান্য খেয়েছি; বাড়ি গিয়ে খাব; হোটেলে যাই নি। বাসার গলিটার মোড়ের সামনেই দাঁড়াল একখানা ট্যাক্সি। নামল একটি তরুণী আর তরুণ। ট্যাক্সিতে আরও লোক ছিল, ওদের নামিয়ে দিয়েই চলে গেল। ব্ল্যাক আউটের আব্‌ছা অন্ধকার। হঠাৎ গলি থেকে দুজন গুণ্ডা বেরিয়ে ওদের দুপাশে দাঁড়াল। একজন ছোরা তুললে, অন্যজন মেয়েটার ব্যাগটা ছিনিয়ে নিয়ে হাত থেকে টেনে খুলে নিলে বালাটালা কিছু। তারপর কান থেকে ছিঁড়ে নিলে দুল দুটো। মেয়েটা চিৎকার করে উঠল। কান ছিঁড়ে গেছে তার। আর্ত চিৎকারের প্রতিধ্বনি আছে শিবনাথ, সেটা হৃদয় আপনি দেয়। গুণ্ডা দুটো আমার চেনা। আমি ধমক দিয়ে উঠলাম, এইও! খবরদার!

আমার গলা চিনে গুণ্ডা দুটো ছুটে পালাল। কিন্তু মেয়েটা বসে পড়ল। পুরুষটা উল্লুকের মত হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। তবে কাঁপছিল থরথর করে।

গিয়ে দেখলাম, আমার পাড়ার মেয়ে। আজ এই ক-বছর ধরে ওকে প্রায় নিত্য দেখে আসছি। বেণী ঝুলিয়ে ইস্কুলে যেত। তারপর কলেজে। মা মরেছে মাস ছয়েক আগে; সৎকারে আমি কাঁধ দিয়েছি। তারপর বড় একটা দেখি নি। বোধ করি বাড়ির ভারটা মায়ের অভাবে ওর ওপরেই পড়েছিল। ছোঁড়াটা ওরই বড় ভাই; বছর চব্বিশ বয়স, ফুলপ্যাণ্ট আর হাফশার্ট পরে ঘুরে বেড়ায়।

আমাকে দেখেই হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল।—সব কেড়ে নিয়ে গেল!

গালে একটা চড় কষিয়ে দিয়ে বললাম, তুই লড়তে পারলি নে?

হয়তো আরও একটা চড় দিতাম, কিন্তু মেয়েটার দিকে তাকিয়ে তা পারলাম না। মেয়েটার দু কান ছিঁড়ে রক্ত পড়ছে, এক কানের পেটি দুখানা হয়ে গেছে। বললাম, এঃ, এ যে বেশ কেটেছে! এস, আমার বাড়ি এস।

—না।

বেশ কড়া সুরেই বললাম—না নয়, চল। ডাক্তার ডেকে দেখাই। তোমার বাড়ি দূর খানিকটা। আর, কী গিয়েছে বল, আমি দেখি ফিরে পাওয়া যায় কিনা!

বাড়িতে গিয়ে শান্তিকে বললাম, কান দুটো ধুয়ে দাও। আর কতটা কেটেছে দেখ।

শান্তি একটু বিস্ময়ের সঙ্গেই বললে—এ যে লতিকা! আমি প্রথমটা চিনতে পারি নি।

হ্যাঁ, চেনা একটু কষ্টকর বটে। লতিকার গালে রুজ-পাউডারের প্রসাধন, ঠোঁটে লিপস্টিক, চুলগুলো পর্যন্ত সিঙ্গ্‌ল করে কাটা এবং শ্যাম্পু-করা। হাত দুটো খালি, বোধ করি গহনা ছিনিয়ে নিয়েছে। গলায় একছড়া নকল মুক্তোর খাটো মালা। আমি হাসলাম। বুঝতে কিছু বাকী রইল না। বিপ্রপদকে বললাম, আমাদের ডাক্তারকে ডাক তো।

মেয়েটা বললে—না। ডাক্তারের জন্তে আসি নি। আপনি জিনিসগুলো পারেন তো আনিয়ে দিন।

—হুঁ। বিপ্র, তুই যা, রামবিলাসকে বল্—ছোলে আর ইব্রাহিম কোথায় দেখতে। বল্, আমি ডেকেছি। বুঝলি? এই রাত্রে। আসতে ভয় হয়, জিনিসগুলো ফিরিয়ে দিতে বলবি। কী কী ছিল, বল?

—ব্যাগে দুখানা একশো টাকার নোট। রিস্টওয়াচ—ওটা খুব দামী। পাঁচশো টাকা দাম নিয়েছে, এই সেদিন কিনেছি। আর দুল দুটো।

বিপ্রপদ চলে গেল, তখন সে ছিল আমার গোলাম।

শান্তি অবাক হয়ে চেয়ে ছিল লতিকার দিকে।

আমি বললাম, দুশো টাকা এক রাত্রির রোজগার?

মেয়েটি চুপ করে রইল।

—রোজ এমনি হয়?

ঘাড় নাড়লে—না।

—মুখে বল না—লজ্জা কী?

—না। লজ্জা কিসের? রোজ হয় না। কোন কোন দিন শুধুই।

—বেশীর ভাগ?

ঘাড় নেড়ে সায় দিলে—হয়।

—কত ?

—পঞ্চাশ। একশো। দুশো। সেদিন একজন পাঁচশো টাকা দিয়ে ঘড়ি কিনে দিয়েছে।

—বহুত আচ্ছা।

মেয়েটা ফোঁস করে উঠল—ঠাট্টা করছেন ? কেন ? ইজ্জৎ ! ধর্ম ! কী করব নিয়ে ? ওসব আমি মানি না। ঈশ্বর ইজ্জৎ কিছু মানি না। কেন মানব ? মানতে গেলে উপোস করতে হয়।

হেসে বললাম, না, তোমাকে 'বহুত আচ্ছা' বলে ঠাট্টা করি নি আমি। আমি 'বহুত আচ্ছা' বলে সাবাস দিচ্ছিলাম তোমাকে। আমিও ওসব মানি না কিনা!

মেয়েটা এবার বোধ হয় যেন লজ্জা পেয়েছিল।

আরও প্রশ্ন করতাম, কিন্তু এই সময়ে ফিরে এল রামবিলাস। ব্যাগটা নামিয়ে দিয়ে বললে —ইসকা ভিতর সব আছে বাবুজী। ওরা ভয়ে এল না।

মেয়েটা ব্যাগ খুলে দেখে বললে—এ যে এক শো টাকা ! আর একখানা নোট ?

—রামবিলাস !

—হামি জানি না বাবু। তব বিপ্রোবাবু লিয়ে হোবেন।

বিপ্রপদ বললে—হ্যাঁ। একশো টাকা ফী আমরা নিয়েছি।

গালে চড় কষিয়ে দিলাম। কী জানি, হয়তো ওই মেয়েটার মোহ আমাকে পেয়েছিল। বোধ হয় আমার বীরত্ব ওকে দেখাবার জন্য চড়টা মেরেছিলাম। বলেছিলাম, নিকাল্।

সভয়ে বিপ্রপদ বের করে দিয়েছিল।

মেয়েটা চলে গেল। রামবিলাসকে বললাম, সঙ্গে যাও।

আমিও কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম জানলা ধরে। মেয়েটা যেন কিছু একটা করে দিয়ে গেল। চিত্ত আমার চঞ্চল হয়েছে। আদিম রিপু ! ঈশ্বরবিশ্বাস যখন ছিল তখন এই নারী থেকেই হত পদস্খলন—এই থেকে তাই বার বার সাবধান করেছে। মানুষ যখন নাস্তিক হয় তখন বোধ হয় তার অজ্ঞাতসারে এই প্রবৃত্তিই প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে ওঠে। আস্তিকা-বাদীরা যখন অসহায়ভাবে পশুত্বের তাড়নায় এই কাজ করে তখন তারা এটা গোপন করে এই কারণেই। ওটা তার আত্মগ্লানি। বিশেষ করে মনোমিলশূন্য দেহমিলন। ওটা একেবারে অরণ্যের আদিম অন্ধকার জীবনে মানুষকে উপনীত করে দিয়ে বলে—তুমি জন্তু, তুমি জন্তু, তুমি জন্তু ! জন্তুতে আপত্তি থাকে বল—জীব, তুমি জীব, তুমি জীব। আমি বুঝতে পারছি সেই অন্ধকার আমাকে হাতছানি দিচ্ছে।

আমি ঘুরে এসে আলমারি থেকে মদের বোতল বের করলাম—পাখাটা বাড়িয়ে দিলাম। গরম ছিল খুব। বিপ্রপদ চড় খেয়ে চলে গেছে। শান্তি চুপ করে বসে ছিল, আমি গ্লাসে মদ ঢেলেছি দেখে সে উঠে কাছে এসে বসল। মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—আমাকে ডাকলে না যে !

আমি বললাম—তুই কি আমার ডাকের অপেক্ষা রাখিস ? তুই তো আগে থেকেই খেয়ে বসে থাকিস। এর আর ডাকব কী ? বলে অন্য একটা গ্লাসে তাকে ঢেলে দিলাম।

গ্লাস হাতে করে বললে—তুমি তো আগে এমন ছিলে না !

গ্লাসে চুমুক দিয়ে বললাম—তা হলে তোর সঙ্গে ঘর বাঁধব কেন ? আগের আমাকে তো দেখেছিস—তোর গুরু হার মেনেছিল। এ কি সেই আমি ?

শান্তি মদের গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলেছিল—ওকে তুমি অমন করে চড়টা মারলে কেন ?

—আমার কথা শোনে নি কেন ?

আর এক গ্লাস নিজে ঢেলে নিয়েছিলাম।

শান্তি বলেছিল—ভাল। আমার এমন সর্বনাশ করলে কেন ?

—তোর সর্বনাশ আমি করেছি ? ফেটে পড়েছিলাম হেসে।

শান্তি চীৎকার করে উঠেছিল—হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমরা তো ঘর বেঁধে ঝগড়াঝাঁটি করেও এক-রকম করে ছিলাম। ধীরেনদা—

ধমক দিয়ে উঠেছিলাম—শান্তি!

হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে শান্তি বলেছিল—আমি চলে যাব কাল।

—কোথায় ? কোন্ চুলোয় ? কলকাতার চুলোর আগুন আমার হাতে।

—আচ্ছা। দেখাব।

—আচ্ছা, দেখাস।

—দেখাব। আমি তোমার কাছে তেতো হয়েছি, না ? নতুনে মন পড়েছে!

—যদি পড়ে থাকে তাতে তোর কী বলবার আছে ? তুই জানিস আমি কিছুই মানি না। পাপ, পুণ্য, ধর্ম, ঈশ্বর—কিছু না। কিন্তু কথা রাখি। ওই মেয়েটাকে দেখে মন চঞ্চল হয়েছে, কিন্তু কই, সুবিধে তো নিই নি।

চুপ করে কিছুক্ষণ থেকে হঠাৎ সে বলে উঠল—তুমিও কিছু মান না, আমিও কিছু মানি না। আমি মুসলমান হয়ে ওকে বিয়ে করেছিলাম। সে বিয়েও ভাসিয়ে দিয়েছি। আমি অনেক পারি—বলে দিলাম। এইভাবে আমি থাকতে পারব না। বলে সে এক গ্লাস মদ ঢেলে নিয়েছিল। পরিপূর্ণ নাস্তিবাদের মধ্যে আমরা যেন স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছিলাম দুজনেই। কথা-কাটাকাটি কম হয় নি। সে আমার গায়ে থুথু দিয়েছিল। আমি তাকে মেরেছিলাম চড়। একটা নয় কয়েকটা। তারপর অনেক আদর করেছিলাম। কোথাও কোনখানে যে কোন অদৃশ্য বিচারকর্তা নেই, সেদিন তা যেন উপলব্ধি করেছিলাম স্পষ্টভাবে এরই মধ্যে। হঠাৎ ঝড় উঠে সব আলোচনায় ছেদ টেনে দিয়েছিল। একটা দমকা ঝাপ্‌টায় ঘরের সব তছনছ করে দিয়েছিল।

•

ঝড়টা বোধ হয় কালের ঝড়। ঝড়ে আবার তাঁবু উড়ল। হল কী জান ? পরের দিন দুপুরবেলা বাসায় ফিরে দেখলাম, শান্তি নেই। কোথায় গেল ? বড় রাস্তার উপর পানওয়ালা অনুগত গোষ্ঠীর একজন, তাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, সেজেগুজে সে কোথায় বেরিয়েছে। সঙ্গে বিপ্রপদ। সন্দেহ রইল না কী ঘটেছে। টাকাকড়ি ব্যাঙ্কেই থাকত। অল্প টাকা আর গহনা-গাঁটি যা ছিল তার কিছুই নেই। বিপ্রপদর দোকান ইদানীং খাটিয়ে-গুটিয়ে ছোট আকার ধারণ করেছিল, সেখানেও সে নেই। যা বিক্রি হয়েছিল—চার-পাঁচ টাকার মত, তাই নিয়েই সে চলে গেছে। কিছু বলে যায় নি।

প্রচণ্ড ক্রোধ জেগে উঠল। রামবিলাসকে বললাম—খোঁজ কর, রামবিলাস।

সন্ধ্যে আটটা নাগাদ খোঁজ এল। আমি তখন চায়ের দোকানে বসে—মদ খেয়েছি। ওরা প্রথম মুসলমান হয়ে বিয়ে করবার সময় যে নাম নিয়েছিল, সেই নাম নিয়ে পার্ক সার্কাস অঞ্চলে চলে গিয়ে ডেরা নিয়েছে। সম্ভবত আমার অধীন খাঁদুবাবুর দলের ভয়ে। চমকে উঠলাম। এটা তো ভাবি নি। তারিফ করলাম শান্তির। এ বুদ্ধি শান্তির। ওই লতিকার কথায় শান্তি খাঁচা ছেড়ে এসপ্ল্যানেডের মিষ্ট ফলে ভরা বনস্পতির উদ্দেশে উড়েছে। বুদ্ধি করে

মুসলমানী কবচ নিয়েছে। কাল সে বলেও ছিল—এককালে মুসলমান হওয়ার কথা। হুঁ। লীগ রাজত্ব। প্রচুর মদ খেতে হয়েছিল। দোকানেই মদ থাকত তখন। মদ খেয়ে বলেছিলাম, বহুত আচ্ছা। মন জেগে উঠেছিল—পাপপুণ্যবিচারহীন মনের সেই আদিম অরণ্যের বাসনা। জান্তব দেহতাড়না।

রামবিলাসকে ডেকে বলেছিলাম, রামবিলাস!

—বাবু!

—কালকের সেই ছোকরী ফিরলেই আটক করে বলবে—বাবু ডেকেছেন।

—উ তো আজ নিকালে নাই বাবু। উসকা ভাইঠো বসিয়ে আছে পানের দোকানের নগিচে।

—উসকো বোলাও।

তাকে বলেছিলাম, তোমার বোনকে গিয়ে বল—কথা আছে, আমি ডাকছি। আমার বাসায়। এখানে নয়। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে সে ভয় পেয়েছিল। কথা বলে নি, ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে চলে গিয়েছিল।

আমি বাসায় গিয়ে বসেছিলাম।

লতিকাও এসেছিল। 'আমায় ডেকেছেন?'

—হ্যাঁ। বোস।

চারিদিকে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করেছিল—তিনি কোথায়? আপনার স্ত্রী?

—আমার স্ত্রী সে নয়। তোমার মত বিশ্বাস আমারও কিছুতে নেই, তারও নেই। আজ আট বছর একসঙ্গে ঘর করছিলাম। কাল তোমার কাছে তোমার রোজগারের কথা শুনে তিনি ভেগেছেন।

সে হতভম্ব হয়ে গেল।

বললাম—তোমাকে তার অভাব পূর্ণ করতে হবে। তুমি বাধ্য। তোমার কোন আশঙ্কা থাকবে না পাড়ায়; তুমি যা কর, কেউ কথাটি বলবে না।

বলে আর সম্মতির অপেক্ষা করি নি। তাকে সবলে বুকে টেনে নিয়েছিলাম। আমি তখন জন্তু।

বিংশ শতাব্দীর স্বয়ম্ভু মানুষ—পিতৃপরিচয়হীন মানুষ—তার আবার অন্যায়ই বা কী, ন্যায়ই বা কী? হ্যাঁ, আইন আছে। কিন্তু আইনে ফাঁকি দেওয়া যায়; তেমন শক্তি থাকলে আইন অমান্য করা যায়।

লতিকা খুব পীড়িত বোধ করে নি। মাত্র কয়েক ঘণ্টা নয়, সমস্ত রাত্রিই সে আমার কাছে ছিল। ভোরবেলা আমি টাকা দিতে গেলাম।

সে বললে—না।

বললাম, সেদিনের প্রতিদান—দাম? তা আমি নিই না।

—না, তাও নয়।

—তবে কী? ভালবাসা?

—না। হেসে বলেছিল সে, ভালবাসার যুগ এটা নয়, প্যাক্টের যুগ। প্যাক্ট—এ পাড়ায় আপনার আশ্রয়।

—আবার আসবে তো?

—ডাকলেই আসব। নইলে প্যাক্ট থাকবে কেন? মেয়েটা প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছিল এক রাত্রেই।

—রোজ ?

—সাধ্য থাকতে অমান্য করব না।

—প্রেজেণ্ট দিলে নেবে তো ?

—নিশ্চয়, দু হাত মেলে নেব।

শিবনাথ, কিছু নেই বলে ঈশ্বরসন্ধানের পথ ছেড়ে যেদিন গেরুয়া ছাড়ব মনে করেছিলাম সেদিন ভূমিকম্পের সেই প্রচণ্ড দুর্যোগের মধ্যে নীল আমার কম্বলের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে আমাকে বলেছিল—তুমি মানুষ, আমি মানুষ। নীল চলে গেল, তারপর যেদিন টাকা নিয়ে শান্তিকে বিপ্রপদর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিলাম সেদিন মদ্যপান করে অচেতন হয়েছিলাম। আজ অচেতন হই নি। আজ অনুভব করলাম—ঈশ্বর নেই এ বিশ্বাস আমার পূর্ণ হয়েছে। ঈশ্বর-বিশ্বাসহীন জীবনের রূপ আমি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করলাম। আমি জন্তু! সাধনবাবুরা আসলেই জন্তু, তাই ঠিক বুঝতে পারে না। আমি মানুষ ছিলাম, তাই আজ প্রত্যক্ষ করলাম—মানুষ আসলে জন্তু।

সমাজ একটা সার্কাস—মানুষ তার মধ্যে শিক্ষিত জন্তু। তার মধ্যে যে সার্কাসের খাঁচা ভাঙতে পারে সে আবার বন্য স্বভাব ফিরে পায়। মানুষ যদি ঈশ্বরের সন্তান না হয় তবে এ সার্কাসের খাঁচা ভেঙে আবার অরণ্য-জীবনে ফিরে যাবে।

এর ঠিক দু দিন পরে খাঁদুবাবু মারা গেলেন। মরবার সময় প্রলাপ বকেছিলেন—আলো সব কোথায় গেল রে ? সব যে অন্ধকার!

সৎকার আমিই করেছিলাম। ভুল বললাম—উপলক্ষ আমি। লোক অনেক এসেছিল। অনেক। আসে নি সাধনবাবু। শুধু সাধনবাবু কেন—ওদের দল।

সেদিন লতিকা নিজে থেকেই এসেছিল। খাঁদুবাবুর সঙ্গে আমার স্নেহের সম্পর্ক সে জানত এবং বুঝেছিল। সান্ত্বনা দিতেও এসেছিল এবং খবরও একটা এনেছিল। শান্তি বিবি-সেজে এসপ্ল্যানেডে ঘুরছে। সঙ্গে বিপ্রপদ।

এর পর আর কি ঘটনা বলবার প্রয়োজন আছে ?

আছে। এ তো আমার ভয়ঙ্কর রূপের পরিচয় নয়। ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠাটা অকস্মাৎ। নিতান্ত অকস্মাৎ। বরং উলটো একটা মনোভাব, হতাশাই তখন আমার উপর ছায়া ফেলেছে।

যুদ্ধটা অকস্মাৎ শেষ হয়ে গেল। সুভাষচন্দ্র হলেন নিরুদ্দেশ। তাঁর মৃত্যু আজ যুক্তিতে বিশ্বাস না করে উপায় নেই, কিন্তু আমি মনে মনে বিশ্বাস করি না। ওটা আমার ঈশ্বর-বিশ্বাসের মত। আমার মধ্যে অতীত দিনের সে সন্ধানীর মৃত্যু অনেক দিন ঘটেছে। আমার শক্তি, সাধনা—সবই একালের বিজ্ঞানীদের মারণ-অস্ত্র তৈরি করে পরিতুষ্ট হওয়ার মত ব্যভিচার আর শক্তির উদ্ধতপনার মধ্যেই স্বাভাবিকভাবে পরিতুষ্ট হয়েছে। ওটাকেই ভাবি নাস্তিবাদের সাধনা। সাধারণ যুক্তিতর্কে ওর মধ্যে অস্বাস্থ্যকর আচার যথেষ্ট আছে, কিন্তু স্বাস্থ্যের বিচারও স্বাস্থ্যবানের শক্তির উপর নির্ভর করে। আমার মত নাস্তিবাদী এ যুগে অসংখ্য—বাড়ছে দিনে দিনে, কিন্তু তারা আমার মত স্বাস্থ্যবানও নয়, শক্তিমানও নয়, সাহসীও নয়। মানি না কিছুই। সেদিন খবর রটেছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র আর নেই। নিষ্ঠুর যন্ত্রণা অনুভব করেছি। সুভাষচন্দ্র কিন্তু নাস্তিবাদী আদৌ ছিলেন না। ঈশ্বরকে তিনি ডাকতেন শুনেছি। তিনি বিজয়ী হয়ে দেশে ঢুকলে আমাকে জেলে তো পুরতেনই;

গুলি করেও মারতে পারতেন এ জানি। তবু তাঁর পরিণাম শুনে দোকান থেকে উঠে চলে এলাম। সেদিন দীর্ঘদিন পর সারাদিন মদ খেলাম না, দোকানে এলাম না, বাড়িতে বসে শুধু কাঁদলাম। কান্নার সঙ্গে নলিনীর স্মৃতির একটা গোপন নিগূঢ় সম্পর্ক ছিল আমার। তাকেও মনে পড়ে গেল। আর একটা ঘটনা ঘটল। অনেক রাত্রে দরজায় কড়া নড়ল। একটা মৃদু মিষ্ট গন্ধে কে তা বুঝেও জিজ্ঞাসা করলাম—কে?

—আমি লতি।

—আজ না। ফিরে যাও।

—ফিরব না। দরজা খুলুন।

মৃদু হাসির শব্দ হয়েছিল একটু। হেসে লতি বলেছিল—কেউ আছে বুঝি ঘরে?

মুহূর্তে দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিলাম, না।

সভয়ে লতি পিছিয়ে গিয়েছিল। লতির চেহারা আমার অতি পরিচিত। তার ঠোঁটের কোণ দুটিতে আশ্চর্য এক বাঁক ছিল—ব্যঙ্গ-হাসিতে যা গুণটানা ধনুকের কোণ দুটির মত দুটি কোণের সৃষ্টি করত। আমার তা মনে আছে। তবে সেদিন ভয়ে তার মুখ কেমন হয়েছিল মনে নেই।

অবশ্য কয়েকদিনেই সামলে গিয়েছিলাম। পরের দিনই লতিকে খবর দিয়েছিলাম এবং সন্ধ্যা থেকেই তার সঙ্গে কাটাতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু পারি নি। ভাল লাগে নি। বলেছিলাম—যাও, বাড়ি যাও। আর এসো না।

তবুও মেয়েটি আসত। পরের দিনই এসেছিল। রূঢ়ভাবে বলেছিলাম—তোমায় আসতে যে আমি বারণ করেছিলাম।

সে বলেছিল—তবুও এসেছি। কিন্তু যে জন্যে আসতাম তার জন্যে নয়। আপনাকে দেখতে এসেছি।

—কী হয়েছে আমার?

সে বলেছিল—তা তো জানি না। তবে কিছু হয়েছে। আশ্চর্য লাগছে। মনে হচ্ছে, বোধ হয় খুব দুঃখ পেয়েছেন। শুনলাম একা একা বসে থাকছেন। তাই এসেছি। একটু গল্প করব, তারপর চলে যাব।

এতে আপত্তি করতে পারি নি।

তখন থেকেই আমার মনের সেই প্রশ্নের আগুনভরা পাহাড়টা ধোঁয়াতে শুরু করেছিল। দুটো অ্যাটম বোমায় দুটো শহর ধূলিসাৎ হয়ে গেল, ঝলসে গেল, তাতেই যুদ্ধটা শেষ হল। কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেল কি মানুষ স্বয়ম্ভূ! ওখানকার বাতাসে ধুলোয় নাকি তেজস্ক্রিয়তা পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। তার মধ্যে শুধু মৃত্যু। কিন্তু সৃষ্টির তত্ত্বে অমৃত কোথায়? আবার দীর্ঘদিন পর মধ্যে মধ্যে আমার অজ্ঞাতসারেই বোধ করি বলে উঠতাম—"যেনাহং নামৃতঃ স্যাম্ তেনাহং কিং কুর্যাম্।" কখনও আয়নায় নিজের ছবিকে প্রশ্ন করতাম তুমি স্বয়ম্ভূ?

লতি একদিন শুনে ফেলেছিল। শুনে সবিস্ময়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—কী বলছেন?

হেসে বলেছিলাম, উপনিষদের শ্লোক।

—উপনিষদ পড়েছেন আপনি?

—পড়েছি। শুধু তাই নয়, পাঁচ বছর সন্ন্যাসী হয়ে ঈশ্বর-ঈশ্বর করে ঘুরেছি।

সেই মুহূর্ত থেকেই মেয়েটার সহজ ছন্দ কেটে গিয়েছিল। পরের দিন থেকেই আসা-যাওয়া কমে গেল। সপ্তাহখানেক পর প্রায় এক সপ্তাহ এল না। মেয়েটা সত্যি এ যুগের মেয়ে। তারপর একদিন এল হাসিমুখে। সে হঠাৎ একটা বড় ফার্মে রিসেপ্‌সনিস্ট-এর চাকরি পেয়েছে। খবরটা দিয়ে বলেছিল—আজ থেকে আমায় রেহাই দিন।

চাকরি করে দিয়েছিল একজন রাত্রির আনন্দ-সাথী। প্রশ্ন করেছিলাম—তাকে বিয়ে করবে?

বলেছিল—না। বিয়ে? ও পোষাবে না। কেটে যাবে জীবন এইভাবে। আপনার কাছে বিদায় নিতে এসেছি।

বলেছিলাম—বিদায়।

সে এর পর পাড়া থেকে—বাপের কাছ থেকেও ছেড়ে চলে গিয়েছিল কোথায় কোন হোটেলে বা বোর্ডিং-এ। আর-একবার মাত্র সে এসেছিল আমার কাছে। দাঙ্গার সময়। তারপর আবার চলে গিয়েছিল। সে কথা বলব পরে। এখন বোধ হয় বিদেশে। নইলে আমার বিচারের সময় সে নিশ্চয় আসত কোর্টে।

যাক।

এরই মধ্যে হঠাৎ এল উনিশশ ছেচল্লিশের ষোলই আগস্ট। না, তার আগে এসেছিল আজাদ হিন্দ আন্দোলন। তাতে মেতে গিয়েছিলাম। নেতাজীর আকর্ষণ—সে কে অস্বীকার করবে! তবে আমার আকর্ষণের স্বরূপ তো সকলের মত এক হবার কথা নয়। আমি তো তখন পতিত। পশু! হ্যাঁ, ওর মধ্যে যে বীর্যের আকর্ষণ ছিল। নেমেছিলাম। বোমা তৈরি করেছিলাম। ছুঁড়েছিলাম। কিন্তু তার সঙ্গে ১৬ই আগস্টে যে ডাক পেয়েছিলাম তার তুলনা করব না। ১৬ই আগস্ট—১৯৪৬ সাল। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বেধে গেল। সকাল থেকেই গুজব রটেছিল। মনটা কেমন টান হয়ে উঠেছিল। সকালবেলা থেকেই খাঁদুবাবুর রাজ্যের যারা অনুচর তারাও চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। দলের চার-পাঁচজন চলে গেছে। মানিক-তলার মোড়ে মিষ্টির দোকানে লুঠ হয়েছে, রূপবাণীর কাচ ভেঙেছে—খবর আসছিল। দশটার সময় বস্তির ছোঁড়াদের নতুন জুতো নিয়ে গলিতে ঢুকতে দেখলাম। পাটি বেপাটি যে যা পেয়েছে। কতকগুলো ছোঁড়ার হাতে ঘুড়ি। বুঝলাম, এ পক্ষও লেগেছে। দুপুরবেলা খবর পেলাম, শোভাবাজারে হাবু গুণ্ডা ঝাণ্ডা ওড়াচ্ছে আর চিৎকার করছে। খেয়ে একটু শুয়ে ছিলাম। ঘুম ভাঙল চিৎকারে। বেরিয়ে এসে দেখলাম, লীগের মিছিল যাচ্ছে। মিছিলটা এগিয়ে চলে যেতে শুনলাম, মিছিলের একটা অংশ বাগবাজারে ঢুকেছিল, মিষ্টির দোকানের কাচ ভেঙেছে, শাস্ত্রীদের বাড়ির একটা কবরেজখানা ভেঙেছে। ফিরে গেছে অবশ্য, কিন্তু বাগবাজার নাকি লোকে লোকারণ্য। বেরিয়ে পড়লাম। মনে হল—কে যেন ডাকছে আমাকে। কে? নীল?

সন্ধ্যে হতে হতে—তখন রাত্রি আটটা—তাণ্ডব নৃত্য শুরু হয়ে গেল। রাত্রি সাড়ে দশটার সময় মদ খেয়ে ভম হয়ে বসে আছি। আমাদের এলাকার খানিকটা দূরে কলাবাগান। শুনলাম কলেজ স্ট্রীট মার্কেট লুঠ হয়েছে। কয়েকটা দোকানে পেট্রোল ঢেলে আগুন দিয়েছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে। ধর্মতলায় হানা চলছে—সারা ধর্মতলা জুড়ে। কী জানি কেন, মনের মধ্যে বার বার জেগে উঠছে নীলের মুখ। মনের পাহাড়টা যেন প্রচুর ধোঁয়া বেরিয়ে সব ঝাপ্‌সা করে দিচ্ছে, আত্মার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এমনই সময় ছুটে এল রামবিলাস।

—বাবু!

—কী ?

—পাড়াতে হাঙ্গামা শুরু হল।

—কোথায় ?

—তুলাওয়ালা রহমন উসকা আদমী আর কলাবাগানের আদমী নিয়ে ছোট একঠো রাধা-কিষণের মন্দির বরবাদ কর দেগা। কিষণজীর মুরত তোড় দেগা। রাধাটো সোনেকা মাফিক ধাতুকে তৈয়ার, সেঠো লুঠ কর লেগা।

আমার সামনে আমি দেখতে পেলাম সোনার রাধা। বুকে করে দাঁড়িয়ে আছে নীল। তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে। মনে হল নীলকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। টেনে নিয়ে যাচ্ছে বিপ্রপদ। শাস্তি বীভৎস হাসি হাসছে। আমাকে এর আগেই রাঁচি পাঠানো উচিত ছিল। মাথার তখন গোলমাল শুরু হয়ে গেছে।

আমি একটা পাশব চিৎকার করে উঠেছিলাম।

বোমা তৈরী ছিল। আজাদ হিন্দ আন্দোলনে আমার এই জীবনের প্রথম ভূমিকা তৈরি হয়েছিল।

বললাম, নিকালো বোমা। আর বের কর দা আর ছোরা।

দাখানা থাকত দেওয়ালে টাঙান, ছোরাখানা থাকত সঙ্গে। রাত্রে বালিশের তলায়।

বোতলের বাকি মদটা গলায় ঢেলে বেরিয়ে পড়েছিলাম।

ছুটে গিয়ে হাজির হলাম। দেখলাম, এদিকে একদল প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে, ওদিকে একটা গলির মোড়ে ওরা। সর্বাগ্রে তুলোওয়ালা রহমন। গলিটা ধরে সরাসরি কলাবাগান বস্তির সঙ্গে যোগ। রহমন বর্শাফলকের মত এগিয়ে এসে গলি আর এই ছোট রাস্তার উপরে তুলোর দোকান করেছিল। তারপর একে একে চারখানা ঘোড়ার গাড়ি করে দোকানের সামনেই একটা স্ট্যাণ্ড করে নিয়েছিল। এক-একখানা গাড়িতে তিনটে লোক—চারখানা গাড়িতেই বারোজন অনুচর নিয়ে এ রাস্তায় সে লড়াই করে রাজত্ব স্থাপনের স্বপ্ন দেখত। সে-যুদ্ধ সে করেছে আজ নির্ধারিত দিনে। কিন্তু ভুল করেছে, লগ্নটা ঠিক হয় নি, আর ভুল করেছে হিন্দুর বাড়ি না লুঠে। সর্বাগ্রে হানা দিতে এসেছে একটি মন্দিরে—রাধাকৃষ্ণ-মন্দির।

আমার জীবনে সেই সোনার রাধা যে ভেঙে গলে টাকাতে পরিণত হয়েও এমনভাবে অরূপ-রতন হয়ে অক্ষয় হয়ে গেছে, তা সেই মুহূর্তের আগে জানতে পারি নি।

রাধাকৃষ্ণের মন্দির কথাটা শুনেই আমার জীবনের নাস্তিবাদের লোহার খোলাটা ফাটিয়ে বেরিয়ে এল জীবনের সব শক্তি—বহ্নিমান হয়ে। এ বিচিত্র! এ বিচিত্র! আবার বাল্যবিশ্বাস—সংস্কার ? না, আমার পিতৃরক্তধারায় নিহিত চৈতন্যময় মহাবীর্য ? কে জানে!

আমার কণ্ঠে একটা আশ্চর্য চিৎকার আছে। সেই চীৎকার করেই আমি বোমাটা ছুঁড়েছিলাম। একটা প্রচণ্ড শব্দ করে সেটা ফাটল। ধোঁয়ায় ভরে গেল। কিন্তু কাজ কিছু হল না। সঙ্গে সঙ্গে ওরা হঠল, সকলের পিছনে রহমন। সে একটু বেশী এগিয়ে এসেছিল। ছুটল সে। আমিও ছুটে গিয়ে আমার দাখানা দিয়ে তাকে আঘাত করলাম।

আমার পিছনে আমার দল। কৃষ্ণ তৈরি করেছিলেন নারায়ণী সেনা। শিবের ছিল ভূতসেনা। এ সেনা তৈরী করেছেন খাঁদুবাবু। চণ্ডালিনী তার জীবনে ছিল একমাত্র প্রেমের পাত্রী। তার সেনা চণ্ডালসেনা। সেই সেনা সংখ্যায় তিরিশের কম নয়। তারা চিৎকার করে ছুটল। দেখতে দেখতে লড়াইটা চলে গেল গলির ও-মোড়ে। গলিটার মধ্যে ঢুকেছিলাম। হিন্দু বসতি। তাদের ঘরে ঘরে আর্তনাদ উঠেছে। ঘরের মধ্যে ঢুকেছিলাম। পেয়েছিলাম

কয়েকটা প্রত্যাচারীকে।

কী হয়েছিল আর জানতে চেয়ো না আমি নিজেও লিখতে পারব না। দক্ষযজ্ঞনাশেও প্রেতেরা এত ভয়ঙ্কর হয় নি।

তবে আমি আমাকে সেদিন স্পষ্ট দেখলাম, সেদিনের সেই রাত্রির দর্পণে।

আমি মহাভয়ঙ্কর।

এই ভয়ঙ্কর সকলের মধ্যেই আছে শিবনাথ। কিন্তু তারা ভয়ঙ্করত্ব প্রকাশ পেতে দিতে লজ্জা পায়,—ভয় পায়; পিতৃনাম কলঙ্কিত হবে, পিতার আদেশ লঙ্ঘনে তিনি রুষ্ট হবেন। এবং তারা অতি সাধারণ, তারা পিতৃপরিচয়ে বিশ্বাস করে। না দেখুক তাঁকে—তবু বিশ্বাস করে গতানুগতিকভাবে। আমার লজ্জা নেই, আমার ভয় নেই; কারণ আমি বিশ্বাসই যে করি না। আমার মধ্য থেকে আমার স্বরূপকে আমি দেখলাম। আমি মহাভয়ঙ্কর। আমার যবনিকা ছিঁড়ে সে বেরিয়ে এসেছে।

• •

এক রাত্রে আমি নেতা পরিত্রাতা হয়ে গেলাম শিবনাথ।

পরদিন কলকাতায় গুজবের শেষ ছিল না। পুলিস পঙ্গু হয়েছে। সেখানেও হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ। একটা বিচিত্র চিন্তায় আমার মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। গতরাত্রের ছবি মধ্যে মধ্যে চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। আমি ভাবছিলাম, এ কী হল? এ কি শুধু ইতিহাসের প্রতিঘাত? এ কি ইংরেজের সৃষ্টি? শুধু রাজনীতি? যে যাই বলুক, আমি সেদিন শুনলাম কী জান? অর্ধসমাপ্ত যুদ্ধ যে সমাপ্তিতে উপনীত হতে ভয় পেয়েছে, অক্ষম হয়েছে, যার জন্যে সে আবারও যুদ্ধ করবে; এবার যে যুদ্ধ করবে বিজয়ীরা দু ভাগে বিভক্ত হয়ে, আমাদের দেশে তারই ভূমিকার চিৎকার উঠেছে।

আত্মা চিৎকার করছে—কে আমার পিতা?

একদল বলছে—ঈশ্বর ভগবান।

অন্যদল বলছে—না। আল্লা—খোদা।

শুধু গান্ধী অনেক দিন থেকে বাউলের মত গেয়ে বেড়াচ্ছে—'ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম; সবকো সৎমতি দে ভগবান।" কিন্তু সে গান কেউ শোনে না। সে হিন্দুও না, মুসলমানও না। এতে তোমার হাসি পাবে। পাবারই কথা হয়তো। নতুন কালের শিক্ষিত সভ্য মানুষ তোমরা। আমি তা নই। তা ছাড়া বলেছি তো—হয়তো মাথায় গোলমালও হয়েছিল। হয় গভীর অন্তর্দৃষ্টি, নয় মাথার গোলমাল। কারণ সব অধ্যাপক পণ্ডিত, মানে গুরুরা, তোমাদের দিক। মাথারই গোলমাল।

সে চিন্তা করবার অবকাশ পাই নি। একখানা বড় গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে ছিল বাড়ির সামনে। ড্রাইভারের পাশে অস্ত্রধারী দারোয়ান সঙ্গে আমার কাছে এসেছিলেন স্বয়ং সাধনবাবু।—আপনার কাছে এসেছি সুদর্শনবাবু একবার চলুন, আমাদের বড় বড় লোকেরা সব এক হয়ে আপনার কাছে পাঠালেন। কালকের কথা সকলেই শুনেছেন। তাঁরা যা জানতেন না, তা আমি বলেছি'। বলেছি, ছাই-চাপা আগুন, একসময় পাঁচ বৎসর সন্ন্যাসী হয়ে সাধনা করেছেন। আজ রক্ষা শুধু টাকায় হবে না। গুণ্ডায় হবে না। এমনি সাধক চাই। আসতে হবে।

গিয়েছিলাম। বিরাট বিরাট প্রতিষ্ঠাশালী ধনী লোকের সমাবেশ। সকলে আমাকে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। তরুণেরা উঠে দাঁড়ালেন। বাইরে অনেক হিন্দু ছেলে। জোয়ান, প্যাঁকাটি অনেক।

এ অঞ্চল রক্ষার ভার নিতে হবে আমাকে। টাকা যত চাই পাব।

সঙ্গে সঙ্গে গত রাত্রের নানা অত্যাচারের বর্ণনা। কজন সাংবাদিকও ছিলেন। তাঁরা বললেন—সব আমরা ছাপি নি, ছাপাতে পারি নি।

ভার নিতেই হবে।

পাথর গড়ালে তার থামা আর তার হাতে নির্ভর করে না শিবনাথ। গড়িয়েছিলাম অনেকদিন আগেই। এবার অনেক পাথর উপর থেকে গড়িয়ে এসে আমাকে ধাক্কা দিলে।

আমার দল বললে—এ করতেই হবে হুজুর।

ছেলের দল বললে—এ আমাদের দাবি।

ভার নিলাম। টাকার তোড়া এল, কিছু অস্ত্র এল, পেট্রোল এল, গাড়ি এল। কোন অভাব রইল না। যেটুকু অভাব ছিল পূর্ণ করে বিকেলবেলা এল লতিকা। আতঙ্কে বিহ্বল, বিবর্ণ মুখ। বোর্ডিং তার ফিরিঙ্গিপাড়ায়। সেখান থেকে বহুকষ্টে পালিয়ে এসেছে একবস্ত্রে। বস্ত্রে নয়, পরনে তার ফ্রক—ফিরিঙ্গি মেয়ের সাজ।

আমার ঘরের দরজার বাজু দুটো ধরে সে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল।

চিনতে আমার দেরি লেগেছিল। চিনে সবিস্ময়ে বলেছিলাম, লতিকা!

সে শুধু বলেছিল—হ্যাঁ।

—এ কী অবস্থা?

—বহুকষ্টে বেঁচে এসেছি। একটু জল খাব।

জল খেয়ে বলেছিল—ফিরিঙ্গিপাড়ায় বোর্ডিং-এ যত ফিরিঙ্গি, তত মুসলমান। ওই পাড়াতেই থাকে—শান্তি আর বিপ্রপদ। তারা কাল থেকেই বলে দিয়েছে সে অর্থাৎ লতিকা ক্রীশ্চান নয়, সে হিন্দু। বহুকষ্টে নাইট ক্লাবের বন্ধু এক সাহেবকে মিনতি জানিয়ে, টেলিফোন করে রক্ষা পেয়েছে। রাত্রেই সাহেব তাকে গাড়ি করে তার বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল। সকালবেলা শান্তি আর বিপ্রপদকে সঙ্গে করে গুণ্ডারা এসে বোর্ডিংটা তল্লাশ করে গেছে। এখনও সেখানে পাহারা দিচ্ছে তারা। রটনা করেছে, সুদর্শন গুণ্ডার পেয়ারের মেয়েমানুষ লতিকা। লতিকা বলেছিল—আপনি নাকি কী করেছেন কাল রাত্রে! একেবারে মুসলমানদের মারধর খুনজখম করে যা-তা করেছেন! আজ বিকেলবেলা সাহেব ভয় পেয়েছিল তাই গাড়ি নিয়ে ফ্রক পরিয়ে আমাকে তুলে, অনেক ঘুরে—ময়দান স্ট্র্যাণ্ড হয়ে এখানে নামিয়ে দিয়ে গেছে।

অভয় দিয়ে বললাম—বিশ্রাম কর। কোন ভয় নেই।

রাত্রে সর্বাগ্রে রহমনদের বস্তির টুকরোটা জ্বালিয়ে কয়েকটা লাশ ফেলে বাসায় এলাম, তখন সে মনোহারিণী বেশে ছাদে দাঁড়িয়ে আস্তিক্যবাদের যুদ্ধের বহ্নিলীলা দেখছে।

আমার দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলেছিল—এ এক নতুন চেহারা আপনার।

আমি তার দিকে তাকিয়ে হেসে বলেছিলাম—হ্যাঁ। তুমি নতুন দেখছ বটে। কিন্তু তুমি-কাছে এসো না। আমার মাথার ঠিক নেই। আমার মাথায় তখন আবার আগুন জ্বলেছে, শিবনাথ। সেই প্রশ্নের আগুন। অবশ্য নতুনভাবে। আমার পিতা ঈশ্বর—না আল্লা?

সে সভয়ে ও-ঘরে চলে গিয়েছিল।

রামবিলাস এসে ডাক দিয়েছিল—শুনছি স্টীমলঞ্চে ওদের দল এসে নামবে গঙ্গার ঘাটে। মিলবে হাবুদের সঙ্গে।

আমি উঠে পড়েছিলাম: চল। হাবুর পাপ আজ রাত্রেই শেষ করব।

লতিকা ও-ঘর থেকেই বলেছিল—আমি কী করব? একলা থাকব?

বলেছিলাম—কোন ভয় নেই। ছাদে উঠে ফায়ার ওয়ার্কস্ দেখ। শোভাবাজারে জ্বলবে।

শোভাবাজারে কয়েকটা খুন করে হাবু সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল। দলটা ভারী দল। কিন্তু আমিও ভয়ঙ্কর শিবনাথ।

বস্তি জ্বালিয়ে, হাবুকে মেরে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রেখে এসেছিলাম।

লতিকা বলেছিল—আপনি ঘুমোন এবার, আমি চুলে হাত বুলিয়ে দি।

—না। তুমি যাও। আমাকে ভাবতে দাও।

এসব আর কত বলব, শিবনাথ!

কলকাতার দাঙ্গার একতরফের যত বীভৎসতা যদি আমাতে আরোপ কর, আপত্তি করব না। আমি তখন মহাভয়ঙ্কর।

পূর্ণ এক বৎসর। পূর্ণ এক বৎসর—চিন্তা না, সংশয় না, শুধু উন্মত্ততা। চিন্তার অবসর কোথায়? পিতার নাম—আল্লা, না, তার নাম ঈশ্বর? 'ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম'—বন্ধ কর ও গান। বিংশ শতাব্দীর যে যুদ্ধে নির্ণয় হবার কথা পিতা আছে বা আমরা স্বয়ম্ভু এই প্রশ্নের —সে যুদ্ধ পরমাণুর মধ্যে মৃত্যুশক্তি দেখে স্তব্ধ হয়েছে। তাদের মধ্যেও আবার ধোঁয়াচ্ছে প্রশ্নের আগুন। সর্বাধিপত্যের সিংহাসনের দিকে লক্ষ্য রেখে আবার সাজছে। আমাদের মধ্যেও ওই একটি লোক ছাড়া সবাই সিংহাসনের অধিকারটার দিকে লক্ষ্য রেখে মানুষের এই প্রশ্নের মর্মান্তিক যাতনার সুযোগ নিচ্ছে। ফৌজদারির পর দেওয়ানি হবে। হোক। আমি আমার কাজ নিয়ে আছি।

একদিন ধীরেনবাবু এসে আমাকে শাসিয়েছিলেন।

—এ সব কী হচ্ছে?

হয়তো খুন করতাম। করাই উচিত ছিল। কিন্তু দেখা হয়েছিল সেই রাধাকৃষ্ণের মন্দিরের সামনে। তার উপর দিনের বেলা; তিনি বেরিয়েছিলেন—পীস কমিটি করতে। তাই নিজেকে সংযত করেছিলাম। বলেছিলাম—তার জবাবদিহি তোমার কাছে করব না।

—আচ্ছা। কিন্তু পরে এর জবাবদিহি করতেই হবে।

বলেছিলাম—করব। মুখে নয়, জীবন দিয়ে। এখন যাও। ফিরে তাকিয়েছিলাম, শিবনাথ, সেই রাধাকৃষ্ণের দিকে। কী যে একটা হয়েছিল মনে, দিনান্তে একবার ওই মূর্তিটি না দেখলে মন বিষণ্ন হত।

দেখতে দেখতে নোয়াখালি, নোয়াখালির পর বিহার, তারপর পাঞ্জাব। গান্ধী নোয়াখালি গেলেন, আমি ব্যঙ্গ করলাম। না, ব্যঙ্গ ঠিক করি নি। মনে মনে বলেছিলাম, ব্যর্থ হবে তুমি। আগে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ কর, প্রকট কর মানুষের সামনে, তারপর বোল—'ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম'। তাকেই বলাও—আমার নাম ঈশ্বর আল্লা দুই-ই। তবে শুনব।

তারপর স্বাধীনতা। আল্লার সন্তান আর ঈশ্বরের সন্তানের মধ্যে দেশ ভাগ হল। গান্ধীজী এলেন কলকাতায়। আমার মনের অবস্থা তখন বিচিত্র। বোঝাতে পারব না। স্বাধীনতা এল। যদি এল—যখন এল তখন ঈশ্বর নেই কে বললে? কেন আমি পশুত্বের সাধনা করলাম? কেন? কেন? কিন্তু লোকে বলছে—বইয়ের বিশ্বাস বুঝেছি—স্বাধীনতা আসাটাই ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নয়। প্রমাণিত হয় না—ডারউইন থিয়োরি মিথ্যা। স্বাধীনতা এসেছে

মানুষের বুদ্ধিতে, মানুষের কৌশলে। বড় বড় প্রবন্ধ লেখা হচ্ছিল—পড়লাম। এদিকে যে সংগ্রামে নেমেছি তা শেষ হয় নি। সরে দাঁড়ালে নেতৃত্ব যাবে। অপর পক্ষ অসহায় পেয়ে হত্যা করবে। মরতে ভয় আমার নেই। মৃত্যুভয়টা বড় ছিল না। বড় ছিল—নতুন প্রতিষ্ঠার একটা নেশা। আর একটা আক্রোশ—নীলের জন্য আক্রোশ, শান্তি-বিপ্রপদর জন্য আক্রোশ। থামব কী করে? বেলেঘাটায় তখন আমারই অভিযান চলেছে। গান্ধী বেলেঘাটায় এসে মুসলমানদের রক্ষার জন্য আসন পাতলেন। আমারই হুকুমে গান্ধীজীর বাসস্থানের সম্মুখে বিক্ষোভ দেখালে আমারই অনুগামীরা। বিশ্বাস কর, শিবনাথ, ইচ্ছা আমার খুব ছিল না। কিন্তু এক দিকে সাধনবাবু, অন্য দিকে ধীরেনবাবু। সাধনবাবু এসে হাত ধরে অনুরোধ করলেন তাঁরই বেলেঘাটার এক বন্ধুর জন্য, সেখানটায় মুসলমানদের না দমালে বাস করা অসম্ভব। অন্য দিকে ধীরেনবাবুর দল সুযোগ পেয়ে হল্লা করছে—শান্তি-শান্তি। অশান্তিকারীদের দমন কর। শুনলাম পুলিশের কাছে আমাদের এবং আরও কয়েকজনের নাম পাঠিয়েছে। জ্বলে উঠলাম। এদের জানি। যুদ্ধের সময় একদলের অন্যদলের লোককে ধরিয়ে দেওয়ার কথা জানি। বেলেঘাটায় গান্ধীজীর প্রায় চোখের সামনে আমারই ব্যবস্থায় মুসলমানের লরির উপর বোমা পড়ল। গান্ধীজী অনশন শুরু করলেন।

আশ্চর্য। সমস্ত মনটা যেন একটা আশ্চর্য কিছুতে ধাক্কা খেয়ে থমকে দাঁড়াল। একটা কিসে—সেটা অসামান্য কিছু, এক বিরাট পাহাড়ের মত অলঙ্ঘনীয়। বিস্ময় বোধ করলাম। আশ্চর্য! হিংসা ক্রোধ বিষয়বুদ্ধি অন্ধ স্বার্থের আবেগ—এই চার-ঘোড়াটানা রথখানা যেন রুদ্ধগতি হয়ে থেমে গেল। চারটে ঘোড়াই যেন থরথর করে কেঁপে হাঁটু দুমড়ে বসে গেল।

নেমে আশ্চর্য লোকটিকে দেখতে গেলাম।

প্রশ্ন করব, পিতাকে আপনি দেখেছেন?

যদি বলেন—হ্যাঁ, তবে বলব, আমাকে দেখাবেন?

সেই সন্ন্যাসীকে একবার বলেছিলাম, দীক্ষা দেবেন আমাকে? তেমনি করে বলব, দীক্ষা দেবেন আমাকে? পিতাকে দেখাবেন?

দেখতে গেলাম।

গিয়ে দেখলাম, অসাধারণ কিছুই নয়, ক্ষীণতনু শান্ত শ্যামবর্ণ একটি ছোটখাটো মানুষ স্তব্ধ হয়ে বসে আছেন; দুটি চোখভরা জল টলমল করছে।

শান্তি স্থাপন করতে গিয়ে শচীন মিত্তির ছুরি খেয়ে মারা গেছেন।

এমন দু ফোঁটা জল আমি জীবনে দেখি নি শিবনাথ। ভয় হল। আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। বিশ্বাস কর, মনে হল ওই জল ঝরবে আর ১৯৪২ সালের মেদিনীপুরের সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মত আমাকে এসে গ্রাস করবে। আমার প্রশ্ন করা হল না, সমস্ত জীবন-সন্ধানের উত্তর নেওয়া হল না। আমি পালিয়ে এলাম। গেলাম কাঁটাপুকুরে শচীন মিত্তিরের শবদেহ দেখতে। লোকে লোকারণ্য। সব মানুষ দাঙ্গায়-মাতা মানুষ। আমারই মত অন্ধভাবে একই প্রশ্নের উত্তর-খোঁজা মানুষ। তার সঙ্গে রাজনৈতিক বুদ্ধিবাদীরাও। দেখলাম না শুধু ধীরেনবাবুকে। খুঁজিও নি। ভিড় ঠেলে গেলাম ভিতরে; ফুলে ঢাকা খাটে শুয়ে প্রশান্তমুখ তরুণ। তার পাশে এক আশ্চর্য বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি এক নারী। চোখে জল টলমল করছে। আঁচলে মুছে নিচ্ছেন। আমি পালিয়ে এলাম। মৃত্যুর পূর্বে হাসপাতালে কেন যাই নি, এর জন্যে আপসোস হল। জিজ্ঞাসা করতাম, পিতাকে দেখতে পাচ্ছেন? তিনি এসেছেন?

শিবনাথ, তখন মধ্যে মধ্যে আমার বিচিত্র অবস্থা হত। মাথায় যন্ত্রণা হত। সংজ্ঞাহীনের

মত পড়ে থাকতাম। ডাক্তার বলেছিল, হয়তো পাগল হয়ে যেতে পারেন। সাবধানে থাকবেন।

সে সময় সুস্থ করবার, সেবা করবার ভার ছিল রামবিলাসের। লতি তখন নেই। নইলে সে নিশ্চয় আসত। আগেই বলেছি, দাঙ্গার প্রথম ধাক্কা মেটবার পরই চলে গিয়েছিল। তার আপিসের বন্ধু এসে তাকে নিয়ে গিয়েছিল। বদলি করে দিয়েছিল মাদ্রাজ আপিসে। একা থাকতাম। নিত্য যেতাম সেই রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে। কাউকে সহ্য করতে পারতাম না।

সেদিন—শচীন মিত্তিরের মৃত্যুর দিন, রাত্রে শুয়ে পড়বার আগে হুকুম দিলাম, সমস্ত অস্ত্র দিয়ে এস বেলেঘাটায়।

রামবিলাস বিস্মিত হয়ে বললে—সব!

বললাম, সব—সব—সব। আর শোন, কাউকে যেন ডেকো না। খবরদার!

—ডাকব না?

—না। না।

তিন দিন পড়ে থেকে উঠে গেলাম রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে। ফিরে এলাম। রামবিলাস বললে—একটা কাম হয়ে গিয়েছে বাবু।

—কী?

—বাবুলোক সব বন্ধ কর দিয়া।

—বন্ধ করে দিয়েছে?

—হাঁ। সাধনবাবু বলে দিয়েছে—কী করব, কেতো দেবো! চিরকাল কি পুষব আমরা?

—হুঁ।

—ওহি ছোকরারা, ওহি হেমন্ত ছোকরাকে দল, একঠো দোকান লুঠ লিয়া।

—লুঠ?

—হ্যাঁ, মোটরসে যায়কে পিস্তল, বোমা দমাদম মারকে টাকা লুঠকে চলা গিয়া। উ লোক কুছু টাকা দে গিয়া!

বললাম, ইচ্ছে হয় তোরা নিগে বিলাস। আমায় ছুটি দে।

—ছুটি?

—হ্যাঁ। আমাকে খানচারেক কাপড় গেরুয়ায় ছুপিয়ে দে। আর খানতিনেক কম্বল, বুঝলি? আমি বেরিয়ে পড়ব।

—পুলিসকে কুছু জুলুম হোগা? ওয়ারেণ্ট নিকলা?

বললাম—হ্যাঁ।

কী বোঝাব ওকে? ও তো কাঁদবে। ছাড়বে না আমাকে। সত্যিই গেরুয়া পরে একটা সামান্য ঘরে বাসা নিলাম। কলকাতা ছেড়ে যেতে চেয়েও পারলাম না। দিনান্তে একবার এই মন্দিরে গিয়ে রাধামূর্তিটি দর্শন না করলে পারতাম না। তোমাদের মনস্তত্ত্ববিদদের জিজ্ঞাসা করতে পার, কী এর ব্যাখ্যা! আর একটা ব্যাখ্যা আমি জানি যা তোমাদের ঠোঁটের ডগায় লেগে আছে—সেটা হল প্রতিক্রিয়া। ও আমি মানি নে।

যাক্। শোন, শেষ হয়ে এসেছে কথা।

হঠাৎ একদিন সকালবেলা তখন, ঘর থেকে উঠে বেরিয়েছি, কলাবাগানের একটা গলির ভিতর দেখলাম শান্তি আর বিপ্রপদ।

আমি জানতাম, ওরা চলে গেছে অন্য দেশে। শিবনাথ, দপ করে আগুন জ্বলে ওঠার মত মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। কোমরে হাত দিলাম।

শিবনাথ, পৃথিবীতে এইটে বুঝে গেলাম—যেটাকে সংসারে পাপ বলি, সেটাকে প্রশ্রয় দিলে বা তাকে আশ্রয় করলে সে সহজে ছাড়ে না। গেরুয়া পরেছিলাম, সব ছেড়ে বসে বসে ভাবতাম, হল কী! উত্তর কই? রামবিলাস টাকা যোগাত। খবর করতাম না কোথা থেকে আসে। সন্ধ্যায় মন্দিরে গিয়ে রাধার দিকে চেয়ে নীলকে মনে করতে চেষ্টা করতাম। মনে পড়ত না তার মুখ। তার বদলে ভাসত শান্তির মুখ। আমি বার বার 'আঃ—আঃ' বলে মুখখানাকে সরাতে চেষ্টা করতাম। সরত, আবার আসত। আর একটা বিচিত্র অসামঞ্জস্য নিজের অজ্ঞাতসারে ঘটিয়েছিলাম, তাও কোনদিন খেয়াল করি নি। গেরুয়ার আলখাল্লার নীচে ছোরাখানা রাখতাম। মনে প্রশ্নও হয় নি, কেন রাখি? উত্তর সহজ। জীবন তো নিরাপদ ছিল না। সেদিন নিজেকে নিরাপদ করার কাজে নয়, মুহূর্তে দারুণ প্রতিহিংসায় ছোরাখানা বের করে ছুটে গেলাম। কলাবাগান তখন প্রায় শূন্য। স্বাধীনতার পর গুণ্ডারা পালিয়েছে।. আছে নিরীহরা। গিয়ে দুজনকে ধরে একটা চিৎকার দিলাম।

তার পর?

সে যাক। নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলাম দুটোকে। বুক দুটো চিরে হৃৎপিণ্ড বের করে দিয়েছিলাম।

নিরাপদেই চলে এলাম। কে ধরবে আমাকে? তখনও আমি নায়ক।

রামবিলাস এল। বললে—ঠিক করিয়েসেন। কিন্তু হিঁয়া নেহি। আপনি কোলকাতা ছাড়ুন।

যাব। তার আগে আমার কাজ শেষ করতে হবে। শান্তি, বিপ্রপদ—ও দুটো তো কীট-পতঙ্গ। আছে, আরও আছে। দেহব্যবসায়িনী পল্লীর সব আমার নখদর্পণে। রাত্রি বারোটার সময় উঠে চলে গেলাম। সঙ্গে রামবিলাস। সে অনুনয় করলে—গুরুজী, আমাদের হুকুম করুন।

বললাম—না। এ কাজ আমাকে নিজ হাতে করতে হবে।

দাঁড়ালাম গিয়ে সাধনবাবুর প্রণয়িনীর বাড়ির গলির মুখে। সাধনবাবু একটার সময় বের হতেন ওখান থেকে, আমি জানতাম। অতি নির্জীব হে লোকটা! আমি ছোরা তুলতেই সে বোধ হয় মরে গিয়েছিল। শেষ করে দিয়ে চলে এলাম। দেখল অনেকে। কিন্তু আমার মত ভয়ঙ্করকে ধরবে কে? বাস্, রইল ধীরেনবাবু—কাল। শুয়ে পড়লাম। বাকী রাত্রিটা, পরের সারাদিন আচ্ছন্নের মত পড়ে রইলাম। কিন্তু সে ঘুম নয়। তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যে এলোমেলো স্বপ্ন। ঘুমের ওষুধ খেলাম। তারপর এল ঘুম। ঘুম যখন ভাঙল তখন রাত্রি আটটা। কিসে যেন টানছিল। রাধাদর্শন! বেরিয়ে পড়লাম। যে লোকটি পাহারায় ছিল, সে বললে—হুজুর! গুরুজী!

গ্রাহ্য করলাম না। বেরিয়ে গেলাম। কোমরের ছোরাটা খুলে ফেলে দিলাম। এবার মনে পড়েছিল। রাধার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আর একখানা মুখ মনে করবার চেষ্টা করছি, এমন সময় ঝাপটে ধরলে কেউ পেছন থেকে।

জানতাম; পুলিস। আঃ, একটা বাকী রইল!

আক্ষেপ নেই, শিবনাথ। কোন আক্ষেপ নেই।

বিচারকের রায়টা পড়ো; আমার কোন আপত্তি নেই। আমার ভয় নেই। কিন্তু আমার আত্মার যন্ত্রণাটা বিচারক বুঝলেন না। এ মানুষের চিরকালের আর্তনাদ।

বিংশ শতাব্দীতে এই আর্তনাদ অ্যাটমবোমার বিস্ফোরণে আকাশ-বাতাস আলোড়িত করে পরিব্যাপ্ত। কান থাকলে শুনতে পেতেন, মানুষের মনে এ আর্তনাদ আরও পরিব্যাপ্ত।

আমার পিতা কে?

তোমার পিতা নেই। তুমি স্বয়ম্ভু।

—না—না—না।

এ আর্তনাদ শুনতে পান নি তিনি। যাক, তাতেও আক্ষেপ নেই। কষ্টও নেই। যেদিন রায় দেন বিচারক, সেদিন নীল এসেছিল। সে কথা আগে বলেছি, শিবনাথ। ভোল নি বোধ হয়। বুকে তখনও একটা উদ্বেগ।

আশ্চর্য, শিবনাথ, আমি তাকে চিনতে পারি নি। বৈরাগিণী-তপস্বিনী মূর্তি! তবু মনটা উথলে উঠেছিল—কে? কে? ও কে? সে যখন বিচারকের অনুমতি নিয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললে—আমি নীল। তখন শুধু বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। নীল! আমার নীল! এত রূপ! এত শান্ত! এত স্নিগ্ধ! আঃ! বোধ হয় আপনা-আপনি মুখ থেকে বেরিয়েছিল।

নীল! সব উদ্বেগ আমার এক মুহূর্তে শান্ত হয়ে গেল।

নীল বললে—ভুলে যাচ্ছি সব কথা শিবনাথ—মনে পড়ছে শেষ কথাটি; ভয় করো না।

না। ভয় আমার ছিল না। উদ্বেগ একটু হয়েছিল, নীল মুছে দিল। ভয় করব না। ফাঁসিকাঠে নির্ভয়ে গিয়ে চড়ে মনে মনে বলব, মৃত্যু, আমার প্রশ্নের উত্তর তুমি দাও। আমার পিতা কে?

পিতা! যদি তুমি থাক—তুমি আছ—তুমি মৃত্যু-যবনিকার ওপার থেকেই বল—আমি আছি। আমি অতি সাধারণ, শিবনাথ। কিন্তু সাধারণ বহুর মধ্যে যে অসাধারণ মানুষের চোখে পড়ে না, আমি তাই। সে চোখে পড়ে একটা নিদারুণ বিপ্লবে—মানুষের অভ্যুত্থানের মধ্যে।

এই শেষ শিবনাথ। আছি ফাঁসির প্রতীক্ষায়। আর নীল আসবে দেখা করতে।

শিবনাথের কথা

সুদর্শনের খাতার শেষের দিকে সাদা পাতাগুলোর মধ্যে কতকগুলি কবিতা এবং টুকরো লেখা পেয়েছি। সুদর্শনের নিজের লেখা নয়। বিশিষ্ট কবির লেখা। স্মৃতি থেকে লিখেছে। সেও তুলে দিচ্ছি। শুরু করেছে রবীন্দ্রনাথ থেকে।

ভগবান, তুমি যুগে যুগে দূত পাঠায়েছ বারে বারে—

মাঝের ক'লাইন নেই। একেবারে স্ট্যাঞ্জার শেষ লাইন।

আজি দুর্দিনে ফিরানু তাঁদের ব্যর্থ নমস্কারে।

তারপর এ কবিতাটি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের—

ভগবান,—ভগবান

অতীতের অলীক আত্মীয় ভগবান—
অভিব্যাপ্ত আবির্ভাবে আজ—
আমার স্বতন্ত্র শূন্যে করো তুমি আবার বিরাজ !

তারপর এটি কার আমি জানি—সুদর্শন নাম লেখে নি।

সোঁদর বন—
আমার শ্যামল শিরায় বহিছে সারাক্ষণ
সোঁদর বন।
সোঁদর বনের আত্মা আমার রাত্রিদিন
খুঁজছে কোথায় ব্যাঘ্রদিন,
যেথায়, ঘর—
তীক্ষ্ণ থাবায় ভয়ঙ্কর—

নীচে লেখা—আশ্চর্য ! লতির সঙ্গে দেখা হওয়ার দিন এই কবিতাটি বোধ হয় দোকানে পড়ে এসেছিলাম।

তারপর প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা—

বিজ্ঞানের অতীত তমিস্রায়
আমি তাঁর পক্ষধ্বনি শুনি
শুনি বিশাল পক্ষ সঞ্চালনের
গুরুগুরু মৃদঙ্গ বোল

তারপর নিজে লিখেছে—এইখানে লাইনটা জুড়ে দিলেই এটা আমার মনের কবিতা—

"বিজ্ঞানাতীত শক্তির কুজ্ঝটিকায়
অন্তরাল থেকে চাই দেবতা।"

সেই তো—সেই তো আমার পিতা।

শেষ লেখা—

আজ আমার প্রণতি গ্রহণ করো, পৃথিবী,
শেষ নমস্কারে অবনত দিনাবসানের বেদিমূলে।

•

ফাঁসির দিন ভোরবেলা আমিও গিয়েছিলাম জেলখানার ফটকে।

আকাশ সন্থ ফরসা হচ্ছে। অন্ধকার কেটেছে। সেই কুহেলির মধ্যে দেখলাম এক আশ্চর্য নারীমূর্তি। দীর্ঘাঙ্গী, গৈরিক-পরা এক অপরূপা সন্ন্যাসিনী। আয়ত চোখ। শুধু মিলল না —সুদর্শন দেখেছিল যে মদিরার মাদকতা তা। আমি দেখলাম উদাসীন বৈরাগ্য। হয়তো পরিবর্তন হয়ে থাকবে। রুক্ষ কেশভার কিন্তু ঠিক আছে। সে মূর্তি সেই কুহেলির মধ্যে পরমাশ্চর্য মনে হল। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পাশে একটি খাটিয়া এবং কয়েকজন লোক।

এগিয়ে গিয়ে নমস্কার করে বললাম, আমি শিবনাথ। সুদর্শনের বাল্যবন্ধু। আপনি নীলনলিনী দেবী ?

—হ্যাঁ। বিষণ্ণ হাস্যে মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তারপর বললেন—কাল শেষ দেখার সময়ও আপনার কথা বলেছেন।

সৎকারে আমিও গিয়েছিলাম শ্মশানে। সৎকারশেষে প্রশ্ন করলাম, এখন কোথায় যাবেন ?

বললেন—বরাবর স্টেশনে। সেখান থেকে আশ্রমে। হিমালয়ের এক জায়গায় একটি আশ্রম করেছি। অন্ধ খঞ্জ এদের নিয়ে ছোট ঘরকন্না। ভিক্ষায় চলে। ওদের কল্যাণে আমারও চলে।

একটু থেমে বললেন—সব তো জানেন আপনি। তাঁর গেরুয়া কাপড়ের সঙ্গে তাঁর অসমাপ্ত তপস্যা কোথায় জড়ানো ছিল। সেদিন পরবার সঙ্গে সঙ্গে সেটা আমায় অর্শালো। সেটা শেষ করে যাব। মানে, শেষদিন পর্যন্ত করে যাব। তাঁকে পাব কি না জানি না। তবে শান্তি পেয়েছি—সুখ পেয়েছি। এই পর্যন্ত।

বলে ফেললাম, সুদর্শনের জন্য দুঃখ হয়। আপনাকে নিয়ে সে সুখী হতে পারত। শান্তি পেত।

হেসে তিনি বললেন—সে কি সেই মানুষ? যুগ-যুগের কোন এক যোগভ্রষ্ট আত্মা। জন্মে জন্মে খুঁজে আসছে। তাঁকে দেখলাম, তখনও ভাবছেন। বললাম—আর ভেবো না, আত্ম-সমর্পণ কর। ভয় কোরো না। বললেন—ভয়? না। ভয় আমার ছিল না, উদ্বেগ কিছু হয়েছিল, সে তুমি মুছে দিয়েছ। কিন্তু না ভেবে কি পারি? ঠিক ভাবি নি। মনে মনে বলছি—তুমি যদি থাক, তবে তোমাকে ডাকছি আমার জীবন-মূল্যে, উত্তর দাও। তুমি শুনতে পাচ্ছ কিনা জানি না—বিংশ শতাব্দীর মানুষের আর্তনাদ, তার আকৃতি! অণুপরমাণু ভেঙে সে তোমাকে খুঁজছে। আমি বললাম—তাঁকে মনে খোঁজ, প্রেমে খোঁজ, নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে খোঁজ। বললেন কী জানেন? বললেন—না, তাঁকে বাইরে খুঁজব, মনে খুঁজব, প্রেমে খুঁজব, হিংসায় খুঁজব, জীবন দিয়ে খুঁজব, জীবন নিয়ে খুঁজব, পাপে-পুণ্যে, আলোয়-অন্ধকারে —সব কিছুতে খুঁজব। দেহ চিরে চিরে খুঁজব, পৃথিবী ভেঙে ভেঙে খুঁজব। উত্তর চাই। বিংশ শতাব্দীতে তাঁকে উত্তর দিতে হবে। না পাই উত্তর, ধ্বংস করব নিজেই নিজেকে। কী প্রয়োজন এই জন্মের, এই জীবনের—যেখানে নিজেই জানি না আমার পিতা কে? আমি মনে মনে বলছি—আমার ফাঁসির পূর্বে যেন যবনিকা ছিঁড়ে বা ওপার থেকে তার একটা উত্তর আমাকে দিয়ো। এর উত্তর আমার চাই। না পাই, জন্মান্তরে ভয়ঙ্করতর মূর্তিতে এসে প্রশ্ন করব—বল, আমার পিতা কে?

তারপর অবশ্য বললেন—তবে একটা রূঢ় অসন্তুষ্ট পদক্ষেপ যেন শুনতে পাচ্ছি। মনের ভ্রান্তি হতে পারে। তবে মনে হচ্ছে, কেউ যেন আসছেন, তাঁর ললাট তিরস্কারে ভ্রূকুটিকুটিল।

বললাম—তাঁকেই প্রণাম কর।

বললেন—আগে আসুন তিনি। ভ্রম যদি না হয় লুটিয়ে পড়ব। যবনিকা ছিঁড়ুক।

মুখখানা একটু আরক্ত হয়ে উঠল, বললেন—গোপন করব না, শেষে বলেছিলে—তোমাকে শেষ একটি চুম্বনের কামনা এখনও আমার রয়েছে। কিন্তু না, থাক। তোমার তপস্যা ভঙ্গ করব না।

কিন্তু আমি অসঙ্কোচে মুখ এগিয়ে দিয়েছিলাম।

তিনি বলেছিলেন—কোন খেদ আর রইল না আমার, এইবার শেষ প্রশ্নের উত্তর। একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন—নীল, এই মুহূর্তে যেন উত্তরের খানিকটা পাচ্ছি। শুনছি—খোঁজ, আরও খোঁজ। পাবে বইকি উত্তর। আমি নেই তো তুমি কী করে সম্ভবপর হলে! ছিন্ন কর, যবনিকা ছিন্ন কর। তুমি ঈশ্বরের সন্তান না হও, তুমি পশুরও সন্তান নও। তুমি মানুষ। আমাকে খোঁজ। নীল, ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমি যবনিকা ছিঁড়ব। অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছি আমি। কোন খেদ নেই। কোন দুঃখ নেই। আমি জানব, জানতে পারব—

আমার পিতা কে ?

আমি অবাক হয়ে এই তপস্বিনীর অপরূপ অসঙ্কোচ মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তিনি বলেছিলেন—আমি যাই। নমস্কার।

একা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আমারও চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হল, কে ? কে আমার পিতা ?

কোথায় একটা বিস্ফোরণের শব্দ হল। কী একটা রাজনৈতিক আন্দোলন চলছে। কী বলছে ? আমি যেন শুনছি—ওই কথা ! কে আমার পিতা ?